ফিকাহুস সুন্নাহ
২য় খন্ড

সাইয়্যেদ সাবেক

সাইয়্যেদ সাবেক

ফিক্‌হুস সুন্নাহ

২য় খণ্ড

সাইয়্যেদ সাবেক

সাইয়্যেদ সাবেক

ফিক্‌হুস সুন্নাহ

২য় খণ্ড

কুরআন ও হাদিসের ভিত্তিতে লেখা
ইসলামের বিধি-বিধান ও মাসায়েল

সাইয়্যেদ সাবেক

অনুবাদ
আকরাম ফারূক
আবদুস শহীদ নাসিম

সম্পাদনা
আবদুস শহীদ নাসিম

শতাব্দী প্রকাশনী

ফিক্হুস সুন্নাহ ২য় খণ্ড
সাইয়্যেদ সাবেক

ISBN : 978-984-645-052-1
শ প্র : ৬৯

প্রকাশক
শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেইলগেট, ঢাকা-১২১৭
ফোন: ৮৩১৭৪১০, মোবা: ০১৭৫৩৪২২২৯৬
ই-মেইল: shotabdipro@yahoo.com

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০১০ ঈসায়ী
দ্বিতীয় প্রকাশ : মে ২০১৫ ঈসায়ী

কম্পোজ
এ জেড কম্পিউটার এণ্ড প্রিন্টার্স

মুদ্রণে
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা

মূল্য : ৪৬০.০০ টাকা মাত্র

FIQHUS SUNNAH By Sayyed Sabiq, Published by Shotabdi Prokashani, 491/1 Mogbazar Wirless Railgate, Dhaka-1217. Phone: 8317410, Mob: 01753422296, E-mail: shotabdipro@yahoo.com. 1st Edition: July 2010, 2nd Print: May 2015.

Price Tk. 460.00 Only

আমাদের কথা

আমাদের স্রষ্টা, প্রতিপালক ও প্রভু মহান আল্লাহ্ই সমস্ত প্রশংসার মালিক। আমাদের প্রতি তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ সীমাহীন অবারিত। সালাত ও সালাম আমাদের নেতা ও পথ প্রদর্শক আখেরি নবী মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সা.-এর প্রতি।

মহান আল্লাহ্র অশেষ রহমতে সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী আধুনিক কালের প্রখ্যাত ফকীহ্ ও শরিয়া বিশেষজ্ঞ আল উস্তায সাইয়্যেদ সাবেক প্রণীত ফিক্হুস্ সুন্নাহ গ্রন্থখানি আরবি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও সম্পাদনা শেষ করে বাংলাভাষী পাঠকগণের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করছে। গ্রন্থটি তিন খণ্ডে প্রকাশিত।

এ গ্রন্থটি ফিক্হ শাস্ত্রের এক অমর কীর্তি। শহীদ হাসানুল বান্নার অনুরোধ, উৎসাহ ও পরামর্শে আল উস্তায সাইয়্যেদ সাবেক গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। গ্রন্থখানি আধুনিক বিশ্বে ইসলামের অনুসারী (Practicing Muslim) শিক্ষক ও ছাত্রদের গাইড বই।

ফিক্হ শাস্ত্রের ইতিহাসে এ গ্রন্থটি একটি মাইলস্টোন হয়ে থাকবে। এ যাবত সাধারণত মাযহাব ভিত্তিক ফিক্হ গ্রন্থাবলি রচিত হয়ে আসছে। কিন্তু এ গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য সেসব গ্রন্থ থেকে ভিন্ন এবং উজ্জ্বল। সংক্ষেপে এ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো :

০১. এটি কোনো মাযহাব ভিত্তিক ফিক্হ গ্রন্থ নয়।

০২. এটি দলিল ভিত্তিক ফিক্হ গ্রন্থ।

০৩. শরয়ী বিধি বিধান আলোচনার ক্ষেত্রে প্রথমেই সংশ্লিষ্ট স্বব্যাখ্যাত আয়াতসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

০৪. বিধান আলোচনার ক্ষেত্রে দ্বিতীয়ত রসূলুল্লাহ্ সা.-এর সংশ্লিষ্ট সুন্নাহ উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্ধৃত করা হয়েছে সে সংক্রান্ত হাদিস সমূহ।

০৫. সাহাবায়ে কিরামের আছার উল্লেখ করা হয়েছে।

০৬. ইজতিহাদ কিয়াস এবং ব্যাখ্যা সাপেক্ষ আয়াত ও হাদিসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ী মুজতাহিদগণের ব্যাখ্যা ও মতামত উল্লেখ করা হয়েছে।

০৭. পরবর্তীকালের মুজতাহিদ ফকীহ্গণের মতামত উল্লেখ করা হয়েছে।

০৮. বিভিন্ন মাযহাবের এবং মাযহাবের ইমামগণের মতামত উল্লেখ করা হয়েছে।

০৯. যেসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও প্রাপ্ত হয়েছে, বিভিন্ন ইসলামী আদালতের রায় ও পর্যবেক্ষণ উল্লেখ করা হয়েছে।

১০. কোথাও কোথাও অগ্রাধিকারযোগ্য মত ও পথের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

সার্বিক বিবেচনায় এই গ্রন্থখানি সাধারণ মুসলিম, আহলুল হাদিস, আহলুর রায় এবং বিভিন্ন মাযহাবের মুকাল্লিদ (অনুসারী)- সকলের অনুসরণযোগ্য এক অসাধারণ গ্রন্থ।

ইসলামী শরিয়তের বিশুদ্ধ ও সঠিক অনুসরণের জন্যে সকল শিক্ষিত মুসলিমেরই গ্রন্থখানা পাঠ করা প্রয়োজন এবং সকলের ঘরে ঘরে থাকা প্রয়োজন মনে করছি।

এ গ্রন্থের অনুবাদ এবং মুদ্রণের ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি যদি কারো নযরে আসে, তাহলে প্রকাশকের ঠিকানায় লিখিতভাবে কিংবা ফোন করে জানালে পরবর্তী মুদ্রণে সংশোধন করে নেয়া হবে ইনশাল্লাহ।

গ্রন্থখানি থেকে ইসলামের অনুসারিগণ উপকৃত হলেই সার্থক হবে আমাদের চিন্তা, পরিকল্পনা ও সার্বিক শ্রম। মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন।

আবদুস শহীদ নাসিম
পরিচালক
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী ঢাকা
তারিখ : জানুয়ারি ১৯, ২০১০ ঈসায়ী

শহীদ ইমাম হাসান আল বান্নার ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালার। আর সালাত ও সালাম আমাদের নেতা মুহাম্মদ এবং তাঁর অনুসারীদের ও সাহাবাদের প্রতি।

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.

অর্থ : মুমিনদের সকলের এক সাথে বের হওয়া জরুরি ছিলনা। কিন্তু কতোই না ভালো হতো যদি তাদের প্রত্যেক গোষ্ঠী থেকে একটা দল অন্তত বেরিয়ে আসতো, তারা দীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করতো এবং ফিরে এসে নিজ নিজ কওমের মানুষকে সতর্ক করতো, যাতে তারা সতর্ক হয়। (সূরা ৯, আত্-তাওবা : আয়াত ১২২)

মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় হলো ইসলামের জ্ঞান ও দাওয়াতের প্রসার ঘটানো, সেই সাথে ইসলামী বিধিমালা বিশেষত, ফিকহী বিধিমালার প্রসার ঘটানো, যাতে করে সর্বস্তরের জনগণ তাদের ইবাদত ও আমল সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করতে পারে। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন :

"আল্লাহ তায়ালা যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের গভীর জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেন। শিক্ষার মাধ্যমেই জ্ঞান অর্জন করা যায়। নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম) দুনিয়ায় টাকা কড়ি রেখে যাননি, তাঁরা রেখে গেছেন শুধু দীনের জ্ঞান। এই জ্ঞান যে অর্জন করবে তার তা প্রচুর পরিমাণেই অর্জন করা উচিত।"

ইসলামী ফিক্হ, বিশেষত ইবাদত সংক্রান্ত বিধিমালা এবং সর্বস্তরের মুসলমানদের জন্য উপস্থাপিত সাধারণ ইসলামী বিষয়সমূহ অধ্যয়নের সবচেয়ে সরল, উপকারী, হৃদয়গ্রাহী ও মনমগজ আকৃষ্টকারী পদ্ধতি হলো, ফিকহ্কে নির্দিষ্ট শাস্ত্রীয় ও বিদ্যাগত পরিভাষা ও কল্পিত খুঁটিনাটি বিধিসমূহ থেকে মুক্ত রাখা। সেই সাথে ফিক্হকে যতোদূর সম্ভব সহজভাবে কুরআন ও সুন্নাহর উৎসসমূহের সাথে সম্পৃক্ত করা এবং যতোটা সুযোগ পাওয়া যায় ইসলামের যৌক্তিকতা ও কল্যাণময় দিকগুলো সম্পর্কে পাঠককে সচেতন করা, যাতে করে ফিক্হ অধ্যয়নকারীগণ উপলব্ধি করতে পারেন যে, এই অধ্যয়ন দ্বারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি হতে যাচ্ছে এবং এতে দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে। ইসলামের অধিকতর জ্ঞান অর্জনে এটা তাদের সবচেয়ে বেশি উৎসাহ যোগাবে।

আল্লাহ তায়ালা বিশিষ্ট প্রবীণ আলেম আল উস্তায সাইয়্যেদ সাবিককে এই পথে পদচারণার প্রেরণা ও তৌফিক দান করেছেন। তাই তিনি উৎসের সহজ ও সাবলীল উল্লেখসহ বিপুল তত্ত্ব ও তথ্য সম্বলিত এই গ্রন্থখানি রচনা করেছেন এবং এতে অতীব সুন্দর পদ্ধতিতে ফিক্হী বিধিসমূহ বিশ্লেষণ করেছেন। আল্লাহ চাহেন তো এর দ্বারা তিনি আল্লাহর কাছ থেকে যেমন উত্তম প্রতিদান লাভ করবেন, তেমনি ইসলামকে নিয়ে গর্ববোধকারী সারা বিশ্বের মুসলিম জনতাকেও করতে পারবেন অভিভূত। দীন ও উম্মতের প্রতি তাঁর এই সুমহান কীর্তি এবং দীনের দাওয়াতে তাঁর এই মূল্যবান অবদানের জন্য আল্লাহ তাঁকে যথোচিতভাবে পুরস্কৃত করুন, তাঁর দ্বারা মানুষকে উপকৃত করুন এবং তাঁর হাত দিয়ে তাঁর নিজের ও জনগণের কল্যাণ সাধন করুন। আমীন।

হাসান আল-বান্না

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

গ্রন্থকারের কথা

সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা লাভের মালিক আল্লাহ, যিনি মহাজগতের মালিক, প্রতিপালক ও পরিচালক। সালাত ও সালাম আমাদের পথ প্রদর্শক মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি, যিনি পূর্বাপর সকল মানুষের নেতা এবং তাঁর অনুসারীদের প্রতি, আর সেইসব লোকদের প্রতিও, প্রতিদান দিবস অনুষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত যারা তাঁর দেখানো পথে চলবে।

আমরা সম্মানিত পাঠকগণের উদ্দেশ্যে ফিকহুস সুন্নাহ্ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড পেশ করছি। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেনো গ্রন্থটিকে পাঠকগণের জন্যে কল্যাণময় করেন, এটিকে শুধুমাত্র তাঁর সন্তুষ্টি লাভের কারণ বানিয়ে দিন। তিনিই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম দায়িত্বশীল।

সাইয়্যেদ সাবেক

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা
	অপবাদ আরোপকারীর ইহকালীন শাস্তি	৩৫৪
	তওবা কিভাবে করবে	৩৫৬
	পিতামাতা কর্তৃক সন্তানের বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ	৩৫৬
	একই ব্যক্তির বিরুদ্ধে বারংবার অপবাদ আরোপ	৩৫৬
	দলীয় পর্যায়ে অপবাদ আরোপ	৩৫৭
	হদ আল্লাহর হক, না মানুষের হক?	৩৫৭
	অপবাদের শাস্তি কখন রহিত হয়	৩৫৮
৫.	মুরতাদ হওয়ার শাস্তি	৩৫৮
	মুরতাদের সংজ্ঞা	৩৫৮
	কোনো কাফের তার ধর্মত্যাগ করে অন্য কুফরি ধর্মে প্রবেশ করলে সেও কি মুরতাদ গণ্য হবে?	৩৫৯
	পাপে লিপ্ত হওয়ার দরুন কোনো মুসলমানকে কাফের বলা যাবে না	৩৬০
	মুসলমান কখন মুরতাদ হয়?	৩৬১
	কুফরি নির্দেশক কতিপয় আলামত	৩৬১
	মুরতাদের শাস্তি	৩৬২
	মুরতাদের মৃত্যুদণ্ডের যৌক্তিকতা	৩৬৪
	মুরতাদের তওবা করানোর চেষ্টার আবশ্যকতা	৩৬৫
	মুরতাদের আইনী বিধি বিধান	৩৬৬
	যিন্দিক-এর শাস্তি	৩৬৭
	জাদুকর কি হত্যাযোগ্য?	৩৬৯
	জোতিষী ও গণক-এর শাস্তি	৩৬৯
৬.	ডাকাতি, রাহাজানি, সন্ত্রাস ও বিদ্রোহের শাস্তি	৩৭০
	সংজ্ঞা	৩৭০
	ডাকাতি, রাহাজানি, সন্ত্রাস ও বিদ্রোহ বৃহত্তর অপরাধ	৩৭১
	ডাকাতি, সন্ত্রাস ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার শাস্তির শর্তাবলি	৩৭১
	ডাকাতি, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের শাস্তি	৩৭৪
	আয়াতে যে শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে	৩৭৬
	'অথবা' কথাটি স্বাধীনতাবোধক এই মতের প্রবক্তাদের যুক্তি	৩৭৬
	যারা বলে 'অথবা' কথাটি স্বাধীনতা নয় বৈচিত্র বুঝায় তাদের যুক্তি	৩৭৭
	অপরাধের শ্রেণীভেদে শাস্তির প্রকারভেদের ব্যাখ্যা	৩৭৯
	একটি আপত্তির জবাব	৩৮১
	ডাকাতি ও সন্ত্রাসী তৎপরতার ব্যাপারে শাসক ও সমাজের করণীয়	৯৮২
	নাগালে পাওয়ার আগেই যদি সন্ত্রাসী ও ডাকাতরা তওবা করে	৩৮২
	তওবার শর্তাবলি	৩৮৪
	অপরাধীকে শাসকের নিকট নেয়ার আগে তওবা করলে শাস্তি মাফ	৩৮৫
	মানুষের আত্মরক্ষা ও অন্যের জানমাল রক্ষার লড়াই	৩৮৬

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিবাহ

নারী পুরুষের মিলন আল্লাহ্ তায়ালার প্রাকৃতিক বিধানসমূহের অন্যতম। এই নিয়ম ও বিধান তিনি সকল সৃষ্টির মধ্যে প্রকৃতিগত করে দিয়েছেন। মানুষ, জীব জন্তু এবং উদ্ভিদজগৎ কেউই এ প্রাকৃতিক বিধানটি থেকে মুক্ত নয়। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۔

অর্থ : আমি প্রতিটি জিনিসই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যাতে করে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো। (সূরা আয যারিয়াত : আয়াত ৪৯)

তিনি আরো বলেন :

سُبْحٰنَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَايَعْلَمُوْنَ ۝

অর্থ : পবিত্র নিখুঁত সেই মহান স্রষ্টা, যিনি জুড়ি সৃষ্টি করেছেন সবকিছুর- উদ্ভিদের, স্বয়ং তাদের (মানুষের) এবং এমন সব কিছুরও যাদের তারা জানেনা। (সূরা ইয়াসিন : আয়াত ৩৬)

জন্ম ও বংশ বৃদ্ধির জন্যে আল্লাহ্ তায়ালা এই রীতিই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। বিপরীত লিঙ্গ অর্থাৎ পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করে তিনি জীবন ও সৃষ্টির ধারা অব্যাহতভাবে জারি করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন :

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ط

অর্থ : হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ এবং একজন নারী থেকে। (সূরা আল হুজুরাত : আয়াত ১৩)

তিনি আরো বলেন :

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا۝

অর্থ : হে মানুষ! তোমরা সতর্ক হও তোমাদের সেই মহান প্রভুর ব্যাপারে, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একজন মাত্র ব্যক্তি থেকে এবং তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে, আর তাদের থেকেই সৃষ্টি করেছেন বিপুল সংখ্যায় পুরুষ আর নারী। (সূরা নিসা :১)

আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের অবস্থা অন্যান্য সৃষ্টির মতো করতে চাননি। এজন্যে মানব পুরুষ ও নারীর মিলনের বিষয়টি তিনি নিয়ম ও বন্ধনবিহীন করেননি। বরং এর জন্যে তিনি মানুষের সম্মান ও মর্যাদার উপযোগী নিয়ম ও বিধি ব্যবস্থা প্রদান করেছেন।

এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তায়ালা নারী পুরুষের মিলনের অত্যন্ত মর্যাদা বাহক বৈবাহিক ব্যবস্থা

প্রদান করেছেন। এ ব্যবস্থার ভিত্তি হলো পারস্পরিক সম্মতি, সম্মতির প্রমাণ স্বরূপ ইজাব-কবুল (প্রস্তাব সমর্থন) এবং তাদের পরস্পরকে প্রস্তাব সমর্থনের মাধ্যমে গ্রহণ করার সাক্ষী। নারী-পুরুষের মিলন এবং বংশ সংরক্ষণের এটিই সবচাইতে সম্মানজনক এবং মনবোচিত পন্থা। এর মাধ্যমেই নারীরা নিরাপত্তা লাভ করে গণলালসার হাত থেকে। এ পন্থাই পরিবার ও বংশলতাকে প্রবাহিত করে পবিত্র ধারায়। এ পদ্ধতিতেই মায়ের হৃদয়ভরা মমত্বে আর পিতার কোমল তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠতে পারে মানব সন্তান। এতে সৃষ্টি হয় সর্বোত্তম শস্যক্ষেত আর নিখুঁত ফল ফসল। মানুষের জন্যে এটাই আল্লাহর মনোনীত ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থাই জারি এবং বিধিবদ্ধ করেছে ইসলাম। আর রহিত করে দিয়েছে এছাড়া অন্যসব পদ্ধতি।

১. যেসব বিবাহ পদ্ধতি রহিত করেছে ইসলাম

ইসলাম নারী পুরুষের যেসব মিলন পদ্ধতি নিষিদ্ধ করেছে তন্মধ্যে একটি হলো ছেলে মেয়েদের মধ্যে গোপন প্রেম স্থাপন পদ্ধতি।

ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে বউ বদল পদ্ধতি। জাহেলি যুগে এ ধরনের প্রচলন ছিলো যে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলতো, "তোমার বউ আমাকে দাও, আমার বউ তোমাকে দেবো এবং তোমাকে কিছু বেশি দেবো।" -এটি বর্ণনা করেছেন দারু কুতনি। তবে এ বর্ণনাটির সূত্র একেবারেই দুর্বল।

এ দুটি ছাড়াও আয়েশা রা. থেকে জাহেলি যুগে প্রচলিত নারী পুরুষের আরো কয়েকটি মিলন পদ্ধতি জানা যায়। যেগুলো ইসলাম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। আয়েশা রা. বলেন : জাহেলি যুগে চার ধরনের বিয়ের প্রচলন ছিলো। সেগুলো হলো :

১. এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কাছে নিজের কন্যা বা অভিভাবকত্বে থাকা মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দিতো। সে প্রস্তাব মেনে নিতো এবং তার কাছে মেয়েটিকে বিয়ে দিতো।

২. অন্য পুরুষের সাথে সংগম করানো : কখনো কখনো এমনটি করা হতো যে, স্ত্রী মাসিক থেকে পবিত্র হবার পর স্বামী তাকে বলতো, অমুকের কাছে যাও এবং তাকে বলো তোমাকে সংগম করতে-যাতে করে তার দ্বারা তুমি গর্ভবতী হও। অতপর গর্ভধারণ স্পষ্ট হবার পূর্ব পর্যন্ত সে তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হতোনা। অতপর যখন তার স্ত্রী ঐ পরপুরুষটি দ্বারা গর্ভবতী হয়েছে বলে স্পষ্ট হতো, তখন সে স্ত্রীর সাথে মিলিত হতো।

৩. কখনো একদল লোক (যাদের সংখ্যা দশের অধিক হতোনা) একজন নারীর কাছে যেতো এবং তারা সবাই তাকে সঙ্গম করতো। অতপর মেয়েলোকটি গর্ভবতী হতো এবং সন্তান প্রসব করতো। সন্তান প্রসবের কয়েকদিন পর সে ঐ পুরুষদের সবাইকে ডেকে পাঠাতো। তার ডাকে অপারগতা প্রকাশ করার সাধ্য কারোই থাকতোনা। সবাই নির্দিষ্ট সময় তার কাছে এসে উপস্থিত হতো। তখন মেয়ে লোকটি তাদের উদ্দেশ্য করে বলতো : তোমরা যে কাজ করেছো, তাতো তোমরা জানো। তোমাদের সে কাজের ফলে আমি গর্ভবতী হয়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ করেছি। হে অমুক, এটি তোমার সন্তান। মেয়েলোকটি তাদের মধ্যে থেকে যাকে ইচ্ছা তার প্রতিই সন্তানটি আরোপ করতো। তার কথা অস্বীকার করার উপায় ঐ পুরুষটির থাকতোনা।

৪. চতুর্থ প্রকার বিয়ে ছিলো এ ধরনের যে : একজন নারীর কাছে অগণিত পুরুষ

আসতো। তারা তার ঘরে প্রবেশ করতো। তাকে সঙ্গম করতো। এদের কাউকে সে ফিরিয়ে দিতোনা। এরা ছিলো বেশ্যা। তারা তাদের ঘরের দরজায় এ ব্যবসার প্রতীক স্বরূপ একটা পতাকা লাগিয়ে রাখতো। যে কেউ ইচ্ছা করলে তার ওখানে প্রবেশ করতে পারতো। এদের কারো দ্বারা যখন গর্ভবতী হয়ে সে সন্তান প্রসব করতো, তখন তাদের সবাইকে ডেকে পাঠাতো। তারা উপস্থিত হলে তাদের সাথে সন্তানটির আকৃতির মিল খুঁজতো। অতপর নিজের ইচ্ছেমতো কোনো একজনকে বলতো এটি তোমার সন্তান এবং তার সাথে শিশুটির বংশধারা জুড়ে দিতো, তার সন্তান বলে ঘোষণা দিতো। লোকটি এ ঘোষণা অস্বীকার করতে পারতোনা। এসব চলছিল।

এরি মধ্যে আখেরি নবী মুহাম্মদ সা.-এর আবির্ভাব ঘটে। তিনি এসে প্রথম পদ্ধতি ছাড়া বাকি সব পদ্ধতির বিয়ে এবং মিলন নিষিদ্ধ করে দেন। এ পদ্ধতিটিই ইসলাম চালু করেছে এবং এর সাথে ইজাব (প্রস্তাব) কবুল (সমর্থন) এবং সাক্ষীর শর্তসহ কিছু শর্ত এবং নিয়ম কানুন জুড়ে দিয়েছে। এ পদ্ধতিতে আল্লাহর শরিয়ত একজন পুরুষ এবং একজন নারীর মধ্যে বিবাহ এবং মিলনকে বৈধ করেছে। এ পদ্ধতিতেই স্বামী স্ত্রী উভয়কে প্রদান করা হয়েছে কিছু অধিকার এবং কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য।

২. বিয়ের প্রতি উৎসাহ প্রদান

ইসলাম বিভিন্নভাবে বিয়ের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছে। বলেছে বিয়ে নবী রসূলগণের সুন্নত (আদর্শ)। তাঁরা ছিলো আমাদের নেতা, তাই তাঁদের আদর্শের অনুসরণ করা আমাদের কর্তব্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ط

অর্থ : (হে মুহাম্মদ!) তোমার পূর্বেও আমি অনেক রসূল পাঠিয়েছি এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান দিয়েছি। (সূরা ১৩ আর রা'দ : আয়াত ৩৮)

রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "এই চারটি জিনিস রসূলগণের সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত : ১. মেহিদী ব্যবহার, ২. সুগন্ধি ব্যবহার, ৩. মেসওয়াক করা (দাঁত মাজা) এবং ৪. বিয়ে করা।" (তিরমিযি : আবু আইয়ুব রা.)

বিয়ে এবং সন্তান লাভকে আল্লাহর অনুগ্রহ উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ط اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ○

অর্থ : আল্লাহ তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকেই তোমাদের জন্যে জোড়া (স্ত্রী/স্বামী) সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের (স্বামী-স্ত্রীর) জুড়ি থেকেই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্যে পুত্র কন্যা আর নাতি-নাতনী। (সূরা ১৬ আন নহল : আয়াত ৭২)

বিপরীত লিঙ্গের জুড়ি সৃষ্টি এবং উভয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ককে আল্লাহ তায়ালা তাঁর একটি নিদর্শন বলে উল্লেখ করেছেন :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ○

অর্থ : আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের (মানব জাতির মধ্য থেকেই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্যে (বিপরীত লিঙ্গের) জুড়ি, যাতে করে তোমরা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পারে। এ উদ্দেশ্যে তিনি তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন হৃদ্যতা-বন্ধুতা আর দয়া-অনুগ্রহ-অনুকম্পা। এতে রয়েছে বিপুল নিদর্শন চিন্তাশীল লোকদের জন্যে। (সূরা ৩০ আর রূম : আয়াত ২১)

অনেক সময় যুবকরা দারিদ্র্য এবং বেকারত্বের কারণে বিয়ে করার ক্ষেত্রে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এবং নৈরাশ্যে নিপতিত হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ط إِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

অর্থ : বিবাহ সম্পাদন করো। যারা তোমাদের মধ্যে রয়েছে একাকী (অর্থাৎ যার স্ত্রী নেই, কিংবা স্বামী নেই), আর তোমাদের দাসদাসীদের মধ্যে যারা সৎ যোগ্য এবং উপযুক্ত তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হয়ে থাকলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। কারণ, আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, মহাবিজ্ঞ। (সূরা ২৪ আন নূর : আয়াত ৩২)

রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "তিন ব্যক্তির অধিকার রয়েছে আল্লাহর সাহায্য লাভ করার। তারা হলো : ১. আল্লাহর পথে জিহাদে নিরত ব্যক্তির, ২. সেই করজদার যে করজ পরিশোধ করার সংকল্পে তৎপর থাকে, ৩. সেই বিবাহ উদ্যোগী যে নিজেকে পবিত্র রাখার সংকল্প নিয়ে অগ্রসর হয়।" তিরমিযি : আবু হুরাইরা রা.।

সাওবান রা. বর্ণনা করেন, যখন নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হলো :

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ ○

অর্থ : আর যারা সোনা রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখে এবং সেগুলো আল্লাহর পথে ব্যয় করেনা, তাদেরকে সংবাদ দাও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির। (সূরা ৯ আত তাওবা : আয়াত ৩৪)

তখন আমরা রসূল সা.-এর সাথে কোনো একটি সফরে ছিলাম। আমাদের কেউ কেউ বললো, আয়াতটি শুধুমাত্র সোনা রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখা প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। কিন্তু কোন্ সম্পদ উত্তম তা জানতে পারলে আমরা সেটাই সংগ্রহ করতাম! তখন রসূলুল্লাহ সা. বললেন : উত্তম সম্পদ হলো- আল্লাহকে স্মরণকারী যবান, কৃতজ্ঞ হৃদয় আর এমন মুমিন স্ত্রী যে ঈমানের পথে চলতে স্বামীকে সাহায্য করে।" -তিরমিযি, ইবনে মাজাহ।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : চারটি জিনিস এমন আছে, যে ব্যক্তিকে সেগুলো দান করা হয়, তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দান করা হয়। সেগুলো হলো : ১. কৃতজ্ঞ হৃদয়, ২. আল্লাহকে স্মরণকারী যবান, ৩. বিপদে অটল অবিচল থাকার মতো স্বাস্থ্য এবং ৪. এমন স্ত্রী যে নিজের ব্যাপারে এবং স্বামীর অর্থ-সম্পদের ব্যাপারে কোনো প্রকার পাপ কাজে অগ্রসর হয়না। -তাবারানি, সনদ ভালো।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস্ রা. বর্ণনা করেন, রসূল সা. বলেছেন : "দুনিয়াটা জীবন সামগ্রী, আর এর মধ্যে সর্বোত্তম জীবন সামগ্রী হলো সৎ-সুস্থ ও যোগ্য স্ত্রী।" -সহীহ মুসলিম।

দেখা যায়, লোকেরা আধ্যাত্মিক সাধনার জন্যে নির্জনতা অবলম্বন করে এবং বৈষয়িক যাবতীয় কার্যক্রমের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে সারারাত নামায পড়ে, প্রতিদিন রোযা রাখে এবং স্ত্রী সংসর্গ পরিত্যাগ করে। এভাবে তারা মানব প্রকৃতির বিরুদ্ধে বৈরাগ্য চর্চায় লিপ্ত হয়।

ইসলামের শিক্ষা হলো, বৈরাগ্য মানব প্রকৃতি বিরোধী একটি কাজ এবং এর দ্বারা দীনের মধ্যে বিকৃতি সাধিত হয়। শেষ নবী মুহাম্মদ সা. ছিলেন সর্বাধিক আল্লাহভীরু। তিনি কোনো দিন রোযা রাখতেন, কোনো দিন রাখতেননা। তিনি রাত্রে নামাযও পড়তেন, আবার ঘুমাতেনও। তিনি বিয়ে শাদীও করেছেন। সুতরাং যে কেউ তাঁর প্রদর্শিত কর্মনীতি ও কর্মপন্থা থেকে বিচ্যুত হবে, সে আসলে তাঁর সাথে সম্পর্কই ছিন্ন করে। সহীহ্ বুখারি ও মুসলিমে আনাস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে : তিন ব্যক্তি রসূল সা.-এর বিবিগণের কক্ষসমূহের কাছে এসে রসূল-এর ইবাদত বন্দেগি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে থাকে। তাঁরা যখন রসূল সা.-এর ইবাদত বন্দেগি সম্পর্কে তথ্য দিলেন, তখন লোকগুলো তাঁর ইবাদত বন্দেগি অপ্রতুল বলে আখ্যায়িত করলো। তারা বললো : নবী সা.-এর তুলনায় আমরা কতো নগণ্য, তাঁর পূর্বাপর গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। তাদের একজন বললো : 'আমি জীবনভর সারারাত নামায পড়বো।' আরেকজন বললো : 'আমি বছর জুড়ে রোযা রাখবো, একটিও ভাংবোনা।' অপরজন বললো : 'আমি নারী সংসর্গ বর্জন করবো, কখনো বিয়েই করবোনা।'

এ সময় রসূলুল্লাহ সা. বেরিয়ে এসে বললেন : 'তোমরাই কি এই এই কথা বলেছিলে?... শোনো, আমি তোমাদের সবার চাইতে আল্লাহকে অধিক ভয় করি। রাতে নামায পড়ি, আবার ঘুমাই। আমি রোযা রাখিও আবার ভাঙ্গিও। আর আমি বিয়ে শাদীও করেছি। যে ব্যক্তি আমার কর্মনীতি থেকে বিচ্যুত হবে, সে আমার লোক নয়।'

সৎ নারী হয়ে থাকে ভাগ্যবতী এবং তার কারণে ঘর খুশি ও আনন্দে ভরপুর থাকে। আবু উসামা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : 'একজন মুমিন স্বামীর জন্যে তাকওয়ার পর সবচাইতে উপকারী ও কল্যাণকর পুঁজি হলো সৎ ও সত্যবাদী স্ত্রী- যাকে আদেশ করলে পালন করে, যার দিকে তাকালে খুশিতে মন ভরে উঠে, অনুপস্থিতিতে যে নিজের ইজ্জত ও স্বামীর অর্থ সম্পদের হেফাজত করে।' - ইবনে মাজাহ।

সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আদম সন্তান তিনটি সৌভাগ্য এবং তিনটি দুর্ভাগ্য লাভ করে থাকে। তিনটি সৌভাগ্য হলো : ১. সতী সাধ্বী স্ত্রী, ২. উত্তম বাসস্থান এবং ৩. ভালো বাহন। আর তিনটি দুর্ভাগ্য হলো : ১. অসৎ স্ত্রী, ২. মন্দ বাসস্থান এবং ৩. মন্দ বাহন। -সহীহ্ সূত্রে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে মুসনাদে আহমদে। এছাড়াও তাবারানি, বাযযার হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হাকেম বলেছেন, এটি সহীহ্ হাদিস।

হাকেম বর্ণিত অপর একটি হাদিসে এ হাদিসটির ব্যাখ্যা ও সমর্থন পাওয়া যায়। তাতে রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : সৌভাগ্যের জিনিস তিনটি : ১. নেক স্ত্রী-যাকে দেখলে তোমার মন আনন্দিত হয়, যার থেকে অনুপস্থিত থাকলে সে নিজেকে এবং তোমার অর্থ সম্পদের হেফাজত করে, ২. অনুগত দ্রুতগামী সওয়ারী যে তোমাকে সময়মত তোমার সাথিদের কাছে পৌঁছে দেয়, ৩. খোলামেলা প্রশস্ত ঘর। দুর্ভাগ্যের জিনিসও তিনটি : ১. এমন স্ত্রী, যাকে দেখলেই তোমার মন খারাপ হয়, যে তোমার সমালোচনা করে, তোমার অনুপস্থিতিতে তার নিজের এবং তোমার সম্পদের আমানত রক্ষা করে না; ২. এমন

সওয়ারী যে খুব ধীরগতির, তাকে মারলে সে তোমাকে প্রতিঘাত করে, না মারলে সময়মতো তোমার সাথিদের নিকটি পৌঁছে দেয়না এবং ৩. এমন আবাস যা সংকীর্ণ, স্বাভাবিক বসবাস যাতে কষ্টকর।

বিয়ে একটি ইবাদত। এর দ্বারা মানুষের দীনের অর্ধেক পূর্ণ হয়। এর মাধ্যমে মানুষ পবিত্র পরিচ্ছন্ন অবস্থায় তার প্রভুর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করে। আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : 'আল্লাহ্ যাকে সৎ ও যোগ্য স্ত্রী দান করেছেন, আল্লাহ্ এর মাধ্যমে তার দীনের অর্ধেক সাহায্য তাকে করেছেন। বাকি অর্ধেকের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় করো।' তাবারানি, হাকেম। হাকেম বলেছেন, হাদিসটির সূত্র বিশুদ্ধ।

রসূলুল্লাহ্ সা. আরো বলেছেন : 'যারা পবিত্র পরিচ্ছন্ন জীবন নিয়ে আল্লাহর সম্মুখীন হতে চায় তারা স্বাধীন নারীদের বিয়ে করে।' হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজাহ, হাদিসটি সূত্রগত দুর্বলতা আছে। ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন : 'আমার জীবনের যদি মাত্র দশদিন বাকি থাকে এবং আমি যদি জানতে পারি দশম দিনে আমার মৃত্যু হবে, তাহলে আমার সামর্থ্য থাকলে ফিতনার আশংকায় এই দশদিনের জন্যেও আমি অবশ্যি বিয়ে করবো!'

৩. বিয়ের উপকারিতা

বিয়ের মধ্যে নিজের, জাতির এবং গোটা মানব সমাজের প্রভূত কল্যাণ রয়েছে। এ জন্যে ইসলাম বিয়ের প্রতি এতোটা গুরুত্বারোপ করেছে এবং উৎসাহ প্রদান করেছে। এখানে বিয়ের কয়েকটি কল্যাণ ও উপকারিতার কথা তুলে ধরা হলো :

১. মানুষের মধ্যে প্রদান করা হয়েছে প্রচণ্ড জৈবিক কামনা। এ কামনা চরিতার্থ করার জন্যে মানুষ সবসময় উদগ্র হয়ে থাকে। এ কামনা পূর্ণ করতে না পারলে মানুষ চরম মানসিক অশান্তিতে নিমজ্জিত হয় এবং এ কার্য সম্পাদনের বৈধ প্রক্রিয়া না পেলে মন্দ ও অসৎ উপায়ে কামনা চরিতার্থ করার চেষ্টা করে। বিয়ে হচ্ছে এ সমস্যা সমাধানের স্বাভাবিক ও সর্বোত্তম পন্থা। বিয়ের মাধ্যমেই মানুষের পক্ষে মানসিক তৃপ্তি সহকারে জৈবিক তথা যৌন চাহিদা নিবারণ করা সম্ভব। এভাবে একজন ব্যক্তি লাভ করতে পারে মানসিক প্রশান্তি, চারিত্রিক পবিত্রতা আর অবৈধ দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা। আল্লাহ্ বলেন :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

অর্থ : আল্লাহর নিদর্শনসমূহের একটি হচ্ছে তিনি তোমাদের (মানব বংশের) মধ্য থেকেই তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন (বিপরীত লিঙ্গের) জুড়ি যাতে করে তোমরা তার কাছে প্রশান্তি লাভ করো, এ উদ্দেশ্যে তিনি তোমাদের মাঝে বন্ধুতা এবং সহানুভূতি সৃষ্টি করে দিয়েছেন। (সূরা ৩০ আর রূম : আয়াত ২১)

আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : 'নারী শয়তানের আকৃতিতে সামনে আসে এবং শয়তানের আকৃতিতে পিছে ফেলে যায়। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন কোনো পরনারী দেখে মুগ্ধ হয়, তখন সে যেনো নিজের স্ত্রীর কাছে চলে যায়। এতে তার মনের বাসনা পূর্ণ হয়ে যাবে।' -মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি।

২. বিয়ে সন্তান লাভের সর্বোত্তম পন্থা। এটাই বংশ বৃদ্ধির সঠিক উপায়। এটাই জীবনকে

ফুলে ফলে সুশোভিত করার এবং বংশ নিরাপত্তার উপায়। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : 'তোমরা বন্ধুসুলভ এবং অধিক সন্তান জন্মদানের যোগ্য মেয়েদের বিয়ে করো, কারণ কিয়ামতের দিন আমি অন্য নবীগণের উম্মতের সমন্বিত সংখ্যার চাইতে তোমাদের সংখ্যা বেশি নিয়ে হাজির হবো।'

আহ্নাফ ইবনে কায়েস রা. একবার মুয়াবিয়া রা.-এর দরবারে প্রবেশ করেন। তার সামনে ছিলেন ইয়াযিদ। তিনি মুগ্ধচিত্তে তার দিকে তাকিয়ে থাকেন। তখন মুয়াবিয়া রা. জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবু বাহার! সন্তান সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কী? আহ্নাফ তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে জবাব দিলেন : 'হে আমিরুল মুমিনীন! সন্তানরা আমাদের বংশের খুঁটি; আমাদের আশার ফসল; আমাদের চক্ষু শীতলকারী; তাদের মাধ্যমেই আমরা শত্রুদের মোকাবেলা করি; তারাই আমাদের উত্তর পুরুষ। তাদের জন্যে উর্বর ভূমি আর ছায়াদার আকাশ রেখে যান। তারা যা চাইবে, তাদের দিয়ে দিন। তারা আপনার সন্তুষ্টি চাইলে তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। তাদের প্রতি আপনার মুক্ত হস্তকে মুষ্টিবদ্ধ করবেন না। এমনটি করলে তারা নৈকট্যে থাকবেনা, আপনার বেঁচে থাকাকে অপছন্দ করবে এবং আপনার মৃত্যু কামনা করবে।' এ বক্তব্য শুনে মুয়াবিয়া বলে উঠলেন : হে আবু বাহার! আল্লাহ আপনার হায়াত দারাজ করুন, আপনি যেমনটি বলেছেন, সন্তানরা ঠিক তেমনিই হয়ে থাকে।[১]

৩. শিশু সন্তানের লালন পালনের মাধ্যমেই বিকাশ এবং পূর্ণতা লাভ করে পিতৃত্ব এবং মাতৃত্ব। এরি মাধ্যমে মানুষের মধ্যে বিকশিত হয় স্নেহ ভালোবাসা, মায়া মমতা ও দয়া কোমলতার গুণাবলী। পিতৃত্ব এবং মাতৃত্বের এ মর্যাদা এমন একটি মর্যাদা, যা ছাড়া মানুষের মানবিক গুণাবলী পূর্ণতা লাভ করেনা। এ মর্যাদা অর্জনের জন্যে বিয়ে অপরিহার্য।

৪. দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন এবং সন্তানদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের বিকাশ ঘটে। এখানে স্বামী হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে, পিতা হিসেবে, মাতা হিসেবে যে রকম নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা হয়, বৃহত্তর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এটা একটা বিরাট প্রশিক্ষণ।

৫. দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন গঠনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে কর্ম উদ্দীপনা জেগে উঠে এবং কার্যব্যবস্থাপনার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। একজন নারী সন্তান পালন, সন্তানের সুষ্ঠু বিকাশ সাধন, সন্তানের সুশিক্ষা, ঘর ব্যবস্থাপনা, আত্মীয় স্বজনের আপ্যায়নসহ অনেকগুলো ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে থাকেন। অপরদিকে পুরুষ ঘর ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক ব্যয়ভার বহন করেন। এ জন্যে তিনি উপার্জন প্রচেষ্টায় বেরিয়ে পড়েন। এ জন্যে তিনি চরম খাটা খাটুনি করেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম সম্পাদন করেন। এভাবে নারী পুরুষ উভয়ে কর্মব্যস্ত থাকেন নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে। এই স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করেন আর এর ফলে বরকতময় হয়ে উঠে পরিবার, সমাজ, দেশ, জাতি।

৬. বিয়ের মাধ্যমে মানুষের মাঝে সামাজিক বন্ধন গড়ে উঠে। বন্ধন ও আত্মীয়তার সম্পর্কের বিস্তার ঘটে। এতে করে সমাজ সংহত হয়। সমাজে দয়া, ভালোবাসা ও পারস্পরিক সহানুভূতি বৃদ্ধি পায়।

৭. ১৯৫৯ সালের ৬ জুন শনিবারে গৃহীত জাতিসংঘের প্রস্তাবনায় বলা হয়, বিবাহিত দম্পতি অবিবাহিতদের চেয়ে দীর্ঘ জীবন লাভ করে।

এ প্রস্তাবনা থেকেও প্রমাণিত হয় যে, বিয়ে এবং দাম্পত্য জীবন নারী পুরুষ উভয়ের সুস্থতা ও দীর্ঘ জীবন লাভের ক্ষেত্রে উপকারী।

৪. বিয়ের শরয়ী বিধান

১. ওয়াজিব বিয়ে : যারা অশ্লীলতা এবং সীমালঙ্ঘন থেকে আত্মরক্ষা করতে চায় এবং সামর্থ্য রাখে, তাদের জন্যে বিয়ে করা ওয়াজিব। কারণ হারাম কার্য থেকে নিজেকে পবিত্র রাখা মুমিনের জন্যে ওয়াজিব। আর বিয়ে ছাড়া এটা সম্ভব নয়। ইমাম কুরতুবি বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের জীবন ও দীনের পবিত্রতা নষ্ট হওয়ার আশংকা করে, সামর্থ্য থাকলে তার জন্যে বিয়ে করা ওয়াজিব। কারণ বিয়ে ছাড়া তার পক্ষে পবিত্রতা রক্ষা করা সম্ভব নয়। এ ব্যক্তির উপর বিয়ে ওয়াজিব হবার ব্যাপারে কোনো মতপার্থক্য নেই। আর যার বিয়ের প্রয়োজন কিন্তু বিয়ে করার আর্থিক সামর্থ্য নেই তিনি আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ মোতাবেক সামর্থ্য অর্জন হওয়া পর্যন্ত পবিত্রতা রক্ষা করে চলবেন। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন : "যাদের বিয়ের সামর্থ্য নেই, আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেনো সংযম অবলম্বন করে।" (সূরা ২৪ নূর : আয়াত ৩৩)

এ ধরনের লোকদের উচিত বেশি বেশি রোযা রাখা। অনেকগুলো হাদিস গ্রন্থে ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : যে যুবকেরা! তোমাদের মধ্যে যারা সামর্থ্য রাখে তারা যেনো অবশ্যি বিয়ে করে। কারণ, বিয়ে দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করে এবং যৌন জীবন পবিত্র রাখে। আর যার সামর্থ্য নেই, সে যেনো রোযা রাখে। কারণ রোযা তার পবিত্রতা রক্ষা করে।

২. মুস্তাহাব বিয়ে : যার বিয়ে করার অর্থনৈতিক সামর্থ্য আছে বটে, কিন্তু নিজেকে হারাম থেকে রক্ষা করার এবং পবিত্র থাকার যোগ্যতাও আছে, তার জন্যে বিয়ে করা মুস্তাহাব। তবে নির্জনে ইবাদত করার চাইতে বিয়ে করা তার জন্যে উত্তম। কারণ, ইসলামে বৈরাগ্যের স্থান নেই। তাবারানি সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন : 'আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের জন্যে বৈরাগ্যবাদের পরিবর্তন করে দিয়েছেন।' হাকেম আবু উমামা রা. এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : 'তোমরা বিয়ে করো, এতে আমার উম্মতের সংখ্যা অধিক হবে। তোমরা খৃষ্টানদের মতো বৈরাগ্য অবলম্বন করোনা।' উমর রা. আবু যাওয়ায়েদকে বলেছিলেন : 'কোনো ব্যক্তি বিয়ে থেকে বিরত থাকতে পারে কেবল বৃদ্ধ হবার করণে, অথবা অশ্লীলতায় নিমজ্জিত হবার জন্যে।' ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন : 'বিয়ে ছাড়া কুরবানি পূর্ণ হয়না।'

৩. হারাম বিয়ে : যার যৌন সামর্থ্য নেই এবং অর্থনৈতিক সামর্থ্যও নেই, তার জন্যে বিয়ে করা হারাম।

কুরতুবি বলেছেন, কোনো বিয়ের উদ্যোগী যদি জানে, সে স্ত্রীর ভরণপোষণ, মোহরানা এবং অন্যান্য অধিকার আদায়ে অক্ষম, তবে এ বিষয়গুলো পাত্রীকে পরিষ্কারভাবে জানানো ছাড়া বিয়ে করা তার জন্যে বৈধ নয়। একইভাবে তার মধ্যে যদি যৌন ত্রুটি বা অক্ষমতা থাকে তবে সেটাও পরিষ্কারভাবে জানাতে হবে যাতে পাত্রী প্রতারিত না হয়। এমনি করে বংশ, সম্পদ, ব্যবসা ইত্যাদির মিথ্যা বর্ণনা দেয়াও পাত্রের জন্যে না জায়েয।

পাত্রীর ব্যাপারটিও অনুরূপ। সে যদি জানে, সে স্বামীর অধিকারসমূহ আদায় করতে অক্ষম, কিংবা যদি তার মানসিক রোগ থাকে, কিংবা কঠিন যৌন রোগ থাকে, অথবা অন্য মারাত্মক রোগ থাকে, তবে এ বিষয়গুলো পূর্বেই পাত্রকে পরিষ্কারভাবে জানানো তার জন্যে ওয়াজিব, যাতে করে পাত্র প্রতারণার শিকার না হয়।

বিয়ের পর স্বামী বা স্ত্রী যদি এ ধরনের কোনো ত্রুটি স্ত্রী বা স্বামীর মধ্যে পায়, যা সে বিয়ের পূর্বে জানায়নি, তবে বিয়ে ভেঙ্গে দেয়া তার জন্যে জায়েয। স্ত্রী যদি এ ধরনের কিছু গোপন রেখে থাকে, তবে প্রকাশ হবার পর স্বামী বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে মোহরানা ও অন্যান্য খরচা বা দান ফেরত নিতে পারে।

৪. মুবাহ বিয়ে : বিয়ের কাঙ্ক্ষিত শর্তাবলী এবং নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর অবর্তমানে বিয়ে করা মুবাহ।

৫. বিয়ের সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্যে বৈরাগ্য নিষিদ্ধ

১. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে এসে নিজের চরম দারিদ্র্যের কথা এবং বিয়ে করার অসামর্থ্যের কথা উল্লেখ করলো। সে আরো বললো : আমি কি খাসি হবো? রসূল সা. বললেন : যে ব্যক্তি খাসি হয় কিংবা খাসি হতে চায় সে আমাদের লোক নয়। -তাবারানি

২. সাআদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. উসমান ইবনে মাযউনের নির্জনে বসে ইবাদত করার প্রস্তাব রদ করে দেন। তিনি যদি তাকে অনুমতি দিতেন, তাহলে আমরা অন্যরা খাসি হতাম। -বুখারি। সাআদ রা.-এর বক্তব্য হলো, রসূল যদি তাঁকে বৈরাগ্যের অনুমতি দিতেন, তবে সে অনুমতি আমাদেরকে খাসি হতে অনুপ্রাণিত করতো। তাবারি বলেছেন, উসমান ইবনে মাযউন যে নির্জনতা অবলম্বনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তা দ্বারা তিনি মূলত বিবাহ বর্জন করতে, সুগন্ধি ত্যাগ করতে এবং অন্যান্য জৈবিক স্বাদ গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে চেয়েছিলেন। তাঁর প্রসঙ্গেই আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতটি নাযিল করেছিলেন : "হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহ তোমাদের জন্যে যেসব ভালো ও পবিত্র জিনিস হালাল করেছেন, তোমরা সেগুলোকে হারাম করোনা এবং সীমালঙ্ঘন করোনা। আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেননা।" (সূরা মায়েদা : ৮৭)

হজ্জের আগে বিয়ে : যদি কোনো ব্যক্তির বিয়ে করা জরুরি হয়ে পড়ে এবং বিয়ে না করলে সীমালঙ্ঘনের আশংকা থাকে, সে ক্ষেত্রে হজ্জ ওয়াজিব হলেও তার আগে বিয়ে করা কর্তব্য। আর সীমালঙ্ঘনের আশংকা না থাকলে আগে হজ্জ করবে। একইভাবে সীমালঙ্ঘনের আশংকা না থাকলে ফরযে কেফায়া জাতীয় আমলসমূহের যেমন ইলম হাসিল করা, জিহাদে অংশ নেয়ার কাজে বিয়ের পূর্বে অংশ নেয়া যাবে।

বিয়ে না করা এবং তার কারণ : এ যাবতকার আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয়েছে, বিয়ে মানব জীবনের এক অতীব জরুরি বিষয়। বিয়ে থেকে মুক্ত থাকার সুযোগ নেই। বিয়ের ক্ষেত্রে বাধা শুধু দুটি জিনিস : ১. অক্ষমতা ও বার্ধক্য, ২. ব্যভিচার বা অবৈধ যৌনাচার। এ বক্তব্য আমীরুল মুমিনীন উমর রা.-এর। ইসলামে বৈরাগ্যের কোনো প্রকার স্থান নেই। বিয়ে না করলে মানুষ অসংখ্য কল্যাণ এবং সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত হয়।

বর্তমানকালে অশ্লীলতা বেহায়াপনা, অবাধ মেলামেশা এবং মেয়েদের বহির্মুখী বিচরণ বিয়ের ক্ষেত্রে এক বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। এভাবে একদিকে পরিবার প্রথা ভেঙ্গে পড়ছে, অপরদিকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া এবং বিয়ে করার প্রবণতা কমে গেছে।

মেয়েদের বহির্মুখী সাজসজ্জা, বিবাহপূর্ব অবাধ আচরণ বৈবাহিক বন্ধনের ক্ষেত্রে সন্দেহ, সংশয় ও অনাস্থার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। বিরাট অংকের মোহরানা, জাকজমকপূর্ণ খোরপোষ এবং বিভিন্ন প্রকার অপব্যয় বিয়ের ক্ষেত্রে বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।

অবাধ মেলামেশার ফলে একটি ছেলে বা একটি মেয়ে যখন বিয়ে করতে উদ্ধত হয় তখন সন্দেহ তাকে বিয়ের ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করে। এর ফলে বিয়ে যেমন নিরুৎসাহিত হচ্ছে, অপরদিকে বেড়েই চলছে বিবাহ বিচ্ছেদের হার।

এজন্যে পরিবার প্রথাকে মজবুত করা, সন্তানদের সুশিক্ষা প্রদান এবং পরিবারে ইসলামের প্রভাব ও পরিবেশ সৃষ্টি করা মুসলিমদের অবশ্য কর্তব্য।

৬. কনে নির্বাচন করা

স্ত্রী হলো স্বামীর শান্তি ও স্বস্তির পাত্রী, স্বামীর শষ্যক্ষেত, স্বামীর জীবন সঙ্গিনী, স্বামীর ঘরের ব্যবস্থাপক, তার সন্তানদের মা, তার, আকাঙ্ক্ষার স্থল তার গোপনীয়তা সমূহের কেন্দ্রস্থল। স্ত্রী স্বামীর পরিবারের সবচে' গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ' তার সন্তানদের মূল প্রতিপালনকারিণী। তার থেকেই সন্তানরা লাভ করে সুন্দর ও উত্তম গুণাবলীর উত্তরাধিকার। তার থেকে সন্তানরা লাভ করে স্নেহ ভালোবাসা, আদর যত্নের স্রোতধারা। সন্তানদের শিক্ষা দীক্ষা, আদব আখলাকের মূল শিক্ষক তিনিই। সন্তানরা তাঁরই সর্বাধিক ভক্ত অনুরক্ত হয়ে থাকে। তার অভ্যাসেই অভ্যস্ত হয়ে থাকে। তার ধর্মই তারা গ্রহণ করে থাকে। তার থেকেই শিখে থাকে ধর্মীয় এবং সামাজিক রীতিনীতি।

এ কারণেই ইসলাম সৎ শুদ্ধ ও দীনদার স্ত্রী নির্বাচনের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। উত্তম স্ত্রী সন্ধানের কাজকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বলে আখ্যায়িত করেছে। উত্তম স্ত্রীকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে অভিহিত করেছে। একজন উত্তম, সৎ, শুদ্ধ স্ত্রীই পারে স্বামীর দীনকে হেফাজত করতে, পরিবারকে কল্যাণ ও বরকতে ভরপুর করে দিতে, স্বামীর অধিকার রক্ষা করতে এবং সন্তানদের সঠিকভাবে গড়ে তুলতে।

পক্ষান্তরে স্ত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে শুধু তার সৌন্দর্য আর সম্পদ ইসলামে একেবারেই গুরুত্বহীন যদি সেখানে না থাকে দীন, সততা ও শুদ্ধতা। এ ধরনের স্ত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইসলাম পাত্রকে সতর্ক করে দিয়েছে। দীন, সততা ও শুদ্ধতাবিহীন নারী, যতোই সুন্দরী, সম্পদশালী, বংশীয় কিংবা কোনো বিশেষ পেশায় পারদর্শী হোক, তার দ্বারা দাম্পত্য জীবনে ফিতনা সৃষ্টির সমূহ আশংকা থাকে। দাম্পত্য জীবনের সুখ শান্তি ভেঙ্গে যেতে বাধ্য হয়। সন্তানদের সুন্দরভাবে গড়ে তোলা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তখন দাম্পত্য জীবন হয়ে পড়ে তিক্ত বিষাক্ত। অবশেষে পারিবারিক জীবন হয়ে পড়ে ধ্বংসোন্মুখ। কারণ নারীর দীনবিহীন সৌন্দর্য একটা ফিতনা, তার সম্পদ ফিতনা, তার বংশ ফিতনা এবং তার অন্যান্য বৈষয়িক দিকগুলোও ফিতনা। এ জন্যেই আল্লাহর রাসূল সা. এ ধরনের নারীদের বিয়ের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : "মন ভুলানো আঁচল থেকে সতর্ক থাকো।" জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! মন ভুলানো আঁচল কি? তিনি বললেন : "সেইসব সুন্দরী যাদের স্বভাব চরিত্র মন্দ।" -দারু কুতনি।

রসূলুল্লাহ সা. আরো বলেছেন : "তোমরা কেবল সুন্দরী হবার কারণে নারীদের বিয়ে করোনা। কারণ তার সৌন্দর্য তাকে বেয়াড়া বানাতে পারে। কিংবা কেবল সম্পদ থাকার কারণেও নারীদের বিয়ে করোনা। কারণ তার সম্পদ তাকে বিদ্রোহী করে তুলতে পারে। তোমরা নারীদের বিয়ে করো তাদের দীনদারী দেখে, নাক কান বোঁচা একটি দাসীও দীনদার হলে তাদের চাইতে উত্তম।" হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবদুর রহমান ইবনে হোমায়েদ।

অপর একটি হাদিসে আল্লাহর রসূল সা. বলেছেন : "যে ব্যক্তি সম্পদের জন্যে কোনো নারী বিয়ে করে, আল্লাহ তার দারিদ্র্য বাড়িয়ে দেন। যে ব্যক্তি বংশের কারণে কোনো নারীকে বিয়ে করে, আল্লাহ তার মান মর্যাদা কমিয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি তার দৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত রাখার এবং যৌন পবিত্রতা হেফাযতের উদ্দেশ্যে কিংবা বংশ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কোনো নারীকে বিয়ে করে, আল্লাহ তার এই স্ত্রীর মধ্যে কল্যাণ দান করেন এবং স্ত্রীকেও তার স্বামীর মধ্যে বরকত দান করেন।" -ইবনে হিব্বান (তার জয়ীফ হাদিসের সংকলনে)।

এ হাদিসগুলোর বক্তব্য সতর্কতামূলক। দীনবিহীন নারীদের বিয়ে করে অশান্তিতে নিমজ্জিত হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। কিন্তু দীনদারীর সাথে সাথে এসব গুণবৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়াতে দোষ নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রসূল সা. বলেন : "চারটি বৈশিষ্ট্যের কারণে কোনো নারীকে বিয়ে করা যেতে পারে। ১. তার সম্পদের কারণে, ২. তার বংশের কারণে, ৩. তার সৌন্দর্যের কারণে এবং ৪. তার দীনদারীর কারণে। তোমার কল্যাণ হোক দীনদারী দেখে বিয়ে করো।"-বুখারি, মুসলিম।

মূলত সৎ শুদ্ধ উত্তম স্ত্রী হলো তারা, যারা সুন্দরী, অনুগত সৎ এবং বিশ্বাসী। রসূল সা. বলেন, "উত্তম স্ত্রী হলো সে, যার দিকে তাকালে তোমার মন আনন্দে ভরে উঠে, তুমি আদেশ করলে বিনয়ের সাথে পালন করে, তার প্রতি অভিমান করে শপথ করলে সে তোমাকে প্রেম ভালোবাসা দিয়ে অভিমান ভাঙ্গায় এবং তোমার অনুপস্থিতিতে সে নিজেকে এবং তোমার অর্থ সম্পদকে হেফাযত ও সুরক্ষা করে।" -নাসায়ী এবং অন্যান্য গ্রন্থ সহীহ সূত্রে।

পাত্রীর মধ্যে মেজাজের ভারসাম্য থাকা জরুরি। শারীরিক গঠন ভালো থাকা দরকার। বিশেষ করে তাকে অহংকার মুক্ত সুন্দর মনের অধিকারী হওয়া উচিত। কারণ তাকে তো সন্তান লালন পালন এবং স্বামীর অধিকারের ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে। রসূলুল্লাহ সা. উম্মে হানিকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে তিনি অক্ষমতা প্রকাশ করে জানান, আমার অনেকগুলো সন্তান আছে, বিয়ে করলে এদের লালন পালনে ব্যাঘাত ঘটবে। তখন রসূলুল্লাহ সা. বলেন : "কুরাইশের উষ্ট্রারোহী সৎ শুদ্ধ উত্তম গুণাবলীর নারীরা নারী সমাজের মধ্যে উত্তম। তারা হয়ে থাকে সন্তান বৎসল এবং স্বামীর অধিকারের ব্যাপারে সচেতন। একজন মুমিনকে অবশ্যি ভালো পাত্রীর সন্ধান করতে হবে। কারণ ভালো বীজের ভালো ফল। আল্লাহর রসূল সা. বলেছেন : "মানুষ সোনার এবং রূপার খনির মতো। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যারা ভালো থাকে, ইসলাম গ্রহণের পরেও তারা উত্তম হয়, যদি দীনের বুঝ তার মধ্যে প্রবেশ করে।" এ হাদিসের তাৎপর্য হলো খনির কাঁচা সোনা পাকা করলে সোনাই থাকে, রূপা হয়না। আর খনির কাঁচা রূপা পাকা করলে রূপাই থাকে, সোনা হয়না। তেমনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যার মধ্যে ভালো গুণাবলী থাকে, ইসলাম গ্রহণের পরে তার মধ্যেই সেসব গুণাবলীই বর্তমান থাকে এবং বিকশিত হয়।

বিয়ের প্রথম উদ্দেশ্য সন্তান জন্মদান। এ জন্যে সুস্থ সবল পাত্রী বাছাই করতে হবে। এ

ক্ষেত্রে তুলনার জন্যে তার অন্যান্য বোন এবং খালাদের স্বাস্থ্যের এবং সন্তান ধারণের ক্ষমতার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা যেতে পারে। এক ব্যক্তি এক বন্ধ্যা মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়- যার পক্ষে সন্তান ধারণ করা সম্ভব নয়। তখন রসূলুল্লাহ সা. বললেন : "অধিক সন্তান গ্রহণে সামর্থ্যবান বন্ধুসুলভ নারীদের বিয়ে করো। কারণ আমি তোমাদের মাধ্যমে অধিক সংখ্যক উম্মত নিয়ে কিয়ামতের দিন হাজির হবো। লোকেরা সাধারণত সুন্দরী নারীদের প্রতিই বেশি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু সে অধিক সন্তান প্রজননে কতটা সক্ষম এবং স্বামীর প্রতি কতটা বন্ধুসুলভ হবে সেদিকটা বিবেচনায় রাখেনা। এ কারণেই রসূল সা. এ বক্তব্য দিয়েছেন।

কিন্তু আল্লাহর রসূল সা. রূপ সৌন্দর্যের অবহেলা করতে বলেননি। কারণ, মানুষ সৌন্দর্যের প্রতিই বেশি আকৃষ্ট হয়। একটি সহীহ হাদিস থেকে জানা যায়, রসূল সা. বলেছেন : "আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকেই পছন্দ করেন।" মুগিরা বিন শুবা রা. এক মহিলার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান এবং বিষয়টি রসূল সা. কে অবহিত করেন। তখন রসূল সা. তাকে বলেন : "যাও তাকে এক নজর দেখে আসো, এর মাধ্যমে তোমাদের উভয়ের মাঝে স্থায়ী ভালোবাসা ও বন্ধুতা সৃষ্টি হবে।" অপর একজন সাহাবী এক আনসার মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান এবং বিষয়টি রসূল সা. কে অবহিত করেন। তখন তিনি তাকে বলেন : "তাকে দেখে আসো, কারণ আনসার মহিলাদের চোখে কিছু একটা (ত্রুটি) থাকে।" জাবির ইবনে আবদুল্লাহ যাকে বিয়ে করতে চাইতেন তাকে আড়াল থেকে দেখে নিতেন, যাতে করে মনের প্রশান্তি নিয়ে তাকে বিয়ে করতে পারেন। রসূলুল্লাহ সা. প্রস্তাবিত পাত্রীর কাছে কোনো মহিলাকে পাঠাতেন, তার মধ্যে কোনো ত্রুটি আছে কিনা তা দেখে আসতে। বিয়ের পাত্রী হিসেবে কুমারী মেয়েরা উত্তম। কারণ আর কোনো পুরুষের সাথে তার অঙ্গিকার করতে হয়নি। ফলে তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক হয় তরতাজা, মধুর এবং অধিকতর আনন্দঘন এবং মজবুত। সে তার স্বামীকে হৃদয়ের অন্তমূল থেকে ভালোবাসবে। কারণ, প্রথম বন্ধুর জন্যেই অধিক ভালোবাসা থাকে।

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ যখন এক বিধবাকে বিয়ে করেন, তখন রসূল সা. তাকে বলেন : "কেন একজন কুমারীকে বিয়ে করলেনা, তাহলে তুমি তার সাথে এবং সে তোমার সাথে আনন্দ ফুর্তি এবং খেলাধুলা করতে পারতে?" তখন জাবের জানান অহুদ যুদ্ধে তার পিতা আবদুল্লাহ শাহাদাত বরণ করার সময় অনেকগুলো ছোট ছোট সন্তান রেখে গেছেন। ওদেরকে লালন পালনের জন্যেই তিনি বিধবা বিয়ে করেছেন।

পাত্র পাত্রীর বয়সের ব্যবধান খুব কাছাকাছি হওয়া দরকার। সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থাও কাছাকাছি হওয়া দরকার।

এ বিষয়গুলো দেখা পরবর্তী দাম্পত্য জীবনের জন্যে অধিকতর কল্যাণকর।

৭. বর নির্বাচন করা

সৎ শুদ্ধ পাত্রীর পক্ষে সব সময় সরাসরি বর নির্বাচন করার সুযোগ থাকেনা। বরের যেসব গুণাবলী দেখা দরকার সেগুলো দেখার সুযোগ তার হয়না। যে কারণে বর খোঁজার ব্যাপারে কনের অভিভাবকদের দায়িত্বই অধিক। অভিভাবকদের উচিত পাত্রীর মতামত বিবেচনা করা এবং সৎ চরিত্রবান, ভদ্র, নম্র সুস্বাস্থ্যবান উত্তম পাত্র সন্ধান করা।

ইমাম গাযযালি তার 'ইহইয়াউল উলুম আদদীন' গ্রন্থে বলেছেন, বর খোঁজার ক্ষেত্রে কনের

অধিকারের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে লক্ষ্য রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে স্বামী তালাকের অধিকার রাখে। তাই পাত্র খোঁজার সময়ই এমন পাত্র নির্বাচন করতে হবে, যে হবে সৎ, ভদ্র, নম্র এবং স্ত্রীর অধিকারের প্রতি সচেতন। নতুবা স্বামী যদি যালিম, ফাসিক, মদখোর, বিদআতী হয়, তাহলে তাদের কন্যাকে সারাজীবন অশান্তি আর অস্বস্তিতে দিনাতিপাত করতে হবে। সম্পর্কও ছিন্ন হতে পারে। আত্মীয়রা অপমানিত হতে পারেন। এক ব্যক্তি হাসান বিন আলী রা. কে বললেন : "আমার একটি কন্যা আছে। আপনি ওর জন্যে কেমন পাত্র নির্বাচন করতে বলেন?"

হাসান বললেন : 'তাকে এমন ছেলের কাছে বিয়ে দাও, যে আল্লাহকে ভয় করে, যে তাকে ভালোবাসবে, সম্মান ও মর্যাদা দেবে। কখনো রাগ করলে তার প্রতি যুলুম করবেনা।' আয়েশা রা. বলেছেন : "বিয়ে একটি প্রেম মহব্বত ও ভালোবাসার বন্ধন, সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তিরই ভেবে দেখা উচিত সে তার প্রাণের টুকরাকে কোন্ পাত্রে বিয়ে দিচ্ছে।" রসূল সা. বলেছেন :"যে ব্যক্তি তার প্রাণের টুকরা কন্যাকে কোনো ফাসিকের কাছে বিয়ে দেয়, সে মূলত রক্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে।" - ইবনে হিব্বান তার জয়ীফ হাদিসের সংকলনে আনাসের সূত্রে এবং শা'বী সহীহ সূত্রে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন : "ফাসিকি কাজে যে ব্যক্তি বাড়াবাড়িতে নিমজ্জিত তার কাছে কনে বিয়ে দেয়া উচিত নয়।"

৮. বিয়ের খিতবা (প্রস্তাব)

খিতবা কি : খিতবা হলো প্রচলিত নিয়মে আনুষ্ঠানিকভাবে মোহরানা প্রদান করার প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে কোনো মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব প্রদান করা। খিতবা হলো বিয়ের সূচনা পদক্ষেপ। এ অনুষ্ঠানে উভয় পক্ষের স্বজনরা উপস্থিত থাকেন। অনুষ্ঠানের তিনটি মৌলিক অংশ থাকে : প্রস্তাব, প্রস্তাবক, প্রস্তাবিত। এ অনুষ্ঠানে বর এবং কনে উভয়ের পরিচিতি, তাদের গুণাবলী আলোচনা এবং আত্মীয় স্বজন ও বংশ পরিচয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এভাবে পারস্পরিক পরিচয় জেনে শুনে বিচক্ষণতার সাথে বিয়ের সঠিক পদক্ষেপ নেয়ার বিষয়টি আল্লাহ তায়ালাই নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

কোন্ মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া বৈধ : ১. যে মহিলা কারো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ নয়, যাদেরকে বিয়ে করা বৈধ এবং যাদের (ইদ্দত ইত্যাদি কারণে) বিয়েতে শরিয়তগত কোনো বাধা নেই। ২. যে মহিলা কারো বাগদত্তা নয়। অর্থাৎ ইতোপূর্বে অন্য কেউ তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়নি। কিংবা প্রস্তাব দিলেও তারা সুস্পষ্টভাবে সে প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছে।

ইদ্দত পালনকারী মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া : ইদ্দত পালনরত মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া নিষেধ। চাই সে ইদ্দত পালন স্বামীর মৃত্যুর কারণে হোক, কিংবা তালাকের কারণে। তালাকের কারণে হয়ে থাকলে চাই সে তালাক রিজয়ী হোক, কিংবা বায়েন হোক তাতে কিছু যায় আসেনা। মহিলা যদি রিজয়ী (ফেরতযোগ্য) তালাকের কারণে ইদ্দত পালনকারিণী হয়ে থাকেন, সে অবস্থায় তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হারাম। কারণ তিনি মূলত স্বামীর বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছেন। তার স্বামী ইচ্ছে করলে তাকে এ সময়ের মধ্যে ফেরত নিতে পারে। আর যদি (দুই তালাকের মাধ্যমে) বায়েন তালাকের কারণে তিনি ইদ্দত পালনকারিণী হয়ে থাকেন, সে অবস্থায়ও তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া নিষেধ। কারণ, তার (তালাকদাতা) স্বামীর অধিকার রয়েছে, সে যে কোনো সময় নতুন করে তাকে বিয়ে

করে নিতে পারে। এ ক্ষেত্রে অন্য কেউ তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তার তালাকদাতা স্বামীর অধিকার ক্ষুণ্ন হবার আশংকা থাকে। তবে এ ক্ষেত্রে মহিলা যদি তার পূর্ব স্বামীকে আর গ্রহণ করতে রাজি না হয়, তাহলে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া বৈধ। তবে প্রস্তাবটা পরোক্ষভাবে প্রদান করে তার মনোভাব যাচাই করতে হবে।

ইদ্দত পালনকারিণী যদি স্বামীর মৃত্যুর কারণে ইদ্দত পালনরত থাকে, তবে ইশারা ইঙ্গিত বা পরোক্ষভাবে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া বৈধ, সরাসরি নয়। কারণ মৃত্যুর কারণে তার স্বামীর সাথে তার ইহজীবনের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে তার উপর তার মৃত স্বামীর অধিকার বর্তমান থাকে না। তবে ইদ্দত পালনকালে সরাসরি তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া বৈধ নয়। কারণ এ সময় সে শোক সন্তপ্ত থাকে। তাছাড়া এতে মৃত স্বামী এবং তার উত্তরাধিকারীদের ব্যাপারে তার শোকানুভূতিতে আঘাত লাগতে পারে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ط عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ط وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ج وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ○

অর্থ : (স্বামীর মৃত্যুর কারণে ইদ্দত পালনকারী) নারীদের কাছে তোমরা ইঙ্গিতে বিয়ের প্রস্তাব করলে অথবা বিষয়টা তোমাদের অন্তরে গোপন রাখলে তাতে তোমাদের কোনো পাপ নাই। আল্লাহ জানেন, তোমরা তাদের বিষয়ে অবশ্যি আলোচনা করবে। কিন্তু প্রকাশ্য প্রচলিত নিয়মে ছাড়া গোপনে তাদের নিকট কোনো প্রতিশ্রুতি দিওনা, নিওনা। নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ হবার পূর্বে বিয়ের কাজ সম্পাদন করার সংকল্প করোনা। জেনে রাখে, আল্লাহ্ অবশ্যি জানেন তোমাদের অন্তরে কী আছে? সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আর জেনে রাখো, আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম সহনশীল ও মর্যাদাবান। (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ২৩৫)

এ আয়াতে ইদ্দত পালনকারী নারী বলতে 'স্বামীর মৃত্যুর কারণে ইদ্দত পালনকারী নারী' বুঝানো হয়েছে। কারণ পূর্বের আয়াতে স্বামীর মৃত্যুর কথা পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। এখানে ইশারা ইঙ্গিতে বা পরোক্ষভবে প্রস্তাবের যে কথা বলা হয়েছে, তার মর্ম হলো : তাকে এমনভাবে বলা যা মুখে প্রকাশ করা হবেনা। যেমন : 'আমার বিয়ে করা প্রয়োজন।' 'আমি তো বিয়ে করতে চাই।' 'আমি চাই আল্লাহ আমাকে একজন ভালো নারী মিলিয়ে দিন।' 'আল্লাহ আপনাকে একজন ভালো স্বামী মিলিয়ে দিন' ইত্যাদি।

ইদ্দত পালনকারিণীর কাছে পরোক্ষ প্রস্তাব হিসেবে উপহার পাঠানো জায়েয। পরোক্ষ প্রস্তাব হিসেবে ইদ্দত পালনকারিণীর কাছে নিজের প্রশংসা করাও জায়েয। এমনটি করেছিলেন আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন। সকিনা বিনতে হানযালা বলেন : মুহাম্মদ পরোক্ষভাবে আমাকে বিয়ের প্রস্তাব করেন, অথচ তখন স্বামীর মৃত্যুর কারণে আমি ইদ্দত পালন করছিলাম। তিনি আমাকে বলেন : আমি রসূলুল্লাহ্ সা.-এর

একজন নাতি এটা আপনি জানেন। আমি আলীরও একজন নাতি এটাও জানেন। আরবে আমার মর্যাদা সম্পর্কেও আপনি জানেন।' তখন আমি তাকে বললাম : 'হে আবু জাফর! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন! আপনি কি আমার ইদ্দত চলাকালে আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছেন?' তখন তিনি বললেন :"আমি তো রসূলুল্লাহ সা. এবং আলীর সাথে আমার রক্ত সম্পর্কের বিষয়টি আপনাকে জানালাম।" (ইদ্দতের পর তাদের বিয়ে সম্পন্ন হয়)।

বিচ্ছিন্ন সনদে দারু কুতনিতে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, উম্মে সালামা রা. স্বামীর মৃত্যুর কারণে বিধবা হলে রসূলুল্লাহ সা. তাকে বলেন : "তুমি জানো আমি আল্লাহর রসূল এবং তাঁর মনোনীত। তাছাড়া আমার কওমের মধ্যে আমার মর্যাদা এবং অবস্থান সম্পর্কেও তুমি জানো।" এটি ছিলো মূলত বিয়ের প্রস্তাব।

মোটকথা সব ধরনের ইদ্দত পালনরত নারীর কাছেই সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব দেয়া নিষিদ্ধ। স্বামীর মৃত্যু এবং বায়েন তালাকের কারণে ইদ্দত পালনরত বিধবার কাছে বিয়ের পরোক্ষ ইঙ্গিতে প্রস্তাব দেয়া মুবাহ। আর রিজয়ী তালাকপ্রাপ্ত নারীকে ইদ্দত পালন কালে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হারাম।

একজনের প্রস্তাবের উপর আরেকজনের প্রস্তাব দেয়া : কেউ যদি কোনো মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়, তবে তার উপর অন্য কারো প্রস্তাব দেয়া নিষেধ। অবশ্য প্রস্তাবদাতা যদি প্রস্তাব থেকে ফিরে আসে, অথবা পাত্রী পক্ষ যদি সেই প্রস্তাব সুস্পষ্টভাবে ফেরত দেয়, সে ক্ষেত্রে ভিন্ন কথা। উকবা ইবনে আমের রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "একজন মুমিন আরেকজন মুমিনের ভাই। তাই কোনো মুমিন কিছু কেনার জন্যে দাম বললে তার উপর দাম বলা অপর মুমিনের উচিত নয় এবং তার মুমিন ভাই কোনো নারীকে বিয়ের প্রস্তাব করলে তার উপর প্রস্তাব দেয়াও তার উচিত নয়, যতোক্ষণ না সে প্রস্তাব ত্যাগ করে।" আহমদ, মুসলিম।

নিষেধাজ্ঞা হলো সেই প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দেয়া, যেখানে পাত্র পক্ষ পাত্রী পক্ষের নিকট সরাসরি এবং সুস্পষ্ট প্রস্তাব প্রদান করে এবং পাত্রী পক্ষ যতোক্ষণ না পরিষ্কারভাবে তাদের প্রস্তাব ফেরত দেয়। তবে পাত্র পক্ষ যদি ইশারা ইঙ্গিতে প্রস্তাব দেয়, কিংবা সরাসরি প্রস্তাব দিলেও পাত্রী পক্ষ যদি তা গ্রহণ না করে সেক্ষেত্রে নতুন প্রস্তাব দেয়া বৈধ। এ কনের ব্যাপারে কেউ প্রস্তাব দিয়েছে এটা যদি জানা না থাকে, সেক্ষেত্রে প্রস্তাব দেয়া যায়। অথবা প্রথম প্রস্তাবক অনুমতি দিলেও প্রস্তাব দেয়া বৈধ। তিরমিযি ইমাম শাফেয়ী থেকে নিম্নরূপ হাদিস উল্লেখ করেছেন : "কেউ যদি কোনো নারীকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় এবং পাত্রী তা কবুল করে নেয় এবং সম্মতি প্রকাশ করে, তবে অন্য কারোর জন্যে তার উপর আর প্রস্তাব দেয়া বৈধ নয়। তবে পাত্রী পক্ষ সম্মতি দিয়েছে বলে জানা না থাকলে প্রস্তাব দেয়া যাবে। প্রথম প্রস্তাবককে সম্মতি দেয়ার পরও যদি দ্বিতীয় কেউ প্রস্তাব দেয় এবং সেই দ্বিতীয় প্রস্তাবক তাকে বিয়ে করে, তবে তাদের বিয়ে শুদ্ধ হবে, কিন্তু তাদের গুনাহ হবে জেনে শুনে প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দেয়ার জন্যে। তবে দ্বিতীয় প্রস্তাবকের সাথে বিয়ে বৈধ হবে। কারণ এখানে নিষেধাজ্ঞা বিয়ের ক্ষেত্রে নয় প্রস্তাব দেয়ার ক্ষেত্রে।

৯. প্রস্তাবিত পাত্র পাত্রী দেখা

দাম্পত্য জীবনকে সুন্দর, সুস্থ ও মধুর করার জন্যেও অনিষ্ট থেকে নিরাপদ করার জন্যে প্রস্তাবের পূর্বে কাঙ্ক্ষিত পাত্রীটি দেখে নেয়া উচিত। এতে করে তার সৌন্দর্য এবং ভালো

মন্দ গুণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা যাবে এবং তার ব্যাপারে হাঁ, বা না সিদ্ধান্ত নিতে সহজ হবে। কাঙ্ক্ষিত পাত্রীর ভালো মন্দ জানার আগে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দেয়া ঠিক নয়। আমাশ বলেছেন : "পাত্র-পাত্রী না দেখে এবং না জেনে শুনে বিয়ে করলে সেই বিয়ের পরিণতি হয় দুশ্চিন্তা এবং দুর্ভোগ। এই দেখাটা এবং জানা শোনাটা শরিয়ত সম্মত। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি হাদিস উল্লেখ করা হলো :

১. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন কোনো নারীকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে সংকল্প করবে, তখন সে যদি তার আকর্ষণীয় দিকগুলো দেখে নিতে সক্ষম, তবে যেনো দেখে নেয়।' জাবির বলেন, একথা শোনার পর আমি সালামা গোত্রের এক মহিলাকে বিয়ে করার জন্যে প্রস্তাব দিতে সংকল্প করি। তখন আমি আড়াল থেকে তার গঠন, সৌন্দর্য, চালচলন ও বৈশিষ্ট্য দেখে নিই, 'যেগুলো তাকে বিয়ে করতে আমাকে আকৃষ্ট করে।' -আবু দাউদ।

২. মুগিরা বিন শুবা থেকে বর্ণিত, তিনি এক মহিলাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করেন। বিষয়টি রসূল সা. কে অবহিত করলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন : "তুমি তাকে দেখে নিয়েছো?" মুগিরা বলেন : 'জী-না।' তখন রসূল সা. বললেন : যাও তাকে দেখে নাও। এটা তোমাদের দু'জনের মধ্যে স্থায়ী ও হৃদ্যতা ও মহব্বত বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। -নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, তিরমিযি। তিরমিযি বলেছেন হাদিসটি হাসান।

৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি এক আনসার মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। বিষয়টি সে রসূল সা. কে অবহিত করলে তিনি তাকে বলেন : তুমি তাকে দেখে নিয়েছো কি? সে বললো : না। তখন তিনি বললেন : যাও তাকে দেখে নাও। আনসার নারীদের চোখে ছোট খাটো ত্রুটি থাকে।

কনের কোন্ কোন্ অঙ্গ দেখবে : অধিকাংশ আলেমের মতে, পাত্র তার প্রস্তাবিত কনের মুখমণ্ডল এবং দুই হাতের তালু দেখবে। এর বাইরে নয়। কারণ মুখমণ্ডল দ্বারা সৌন্দর্য এবং হাত দ্বারা শরীরের গঠন বুঝা যায়। ইমাম দাউদ যাহেরি বলেছেন :"পুরো শরীরের গঠন দেখবে-চলতে ফিরতে যেভাবে দেখা যায়।" তবে কি কি দেখবে সে বিষয়ে হাদিসে কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। বরং যতোটুকু দেখলে পছন্দ অপছন্দ নির্ণয় করা যায় তাই দেখতে বলা হয়েছে। (ফাতহুল আল্লাম ২য় খণ্ড ৮৯ পৃষ্ঠা)। এর দলিল আবদুর রাজ্জাক ও সায়ীদ ইবনে মনসুরের বর্ণনা। তারা বলেছেন : "উমর রা. আলী রা.-এর কাছে তাঁর কন্যা উম্মে কুলছুমকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন। তখন আলী বলেন, সে তো এখনো খুব ছোট। আমি তাকে আপনার কাছে পাঠাবো। দেখে পছন্দ হলে বিয়ে করবেন। অতপর আলী তাকে পাঠান। উমর তার পায়ের নলা উন্মুক্ত করে দেখেন।

কনে দেখার পর পছন্দ না হলে চুপ থাকা ভালো। কারণ অন্য কারো পছন্দ হতে পারে।

কনে কর্তৃক বরকে দেখা : এই বিধি শুধু পুরুষের মধ্যে সীমিত নয়, স্ত্রীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। হবু স্ত্রী তার হবু স্বামীকেও দেখতে পারবে। কেননা স্ত্রীর সৌন্দর্য যেমন পুরুষের ভালো লাগে, তেমনি পুরুষের সৌন্দর্য স্ত্রীর ভালো লাগে।

উমর রা. বলেছেন : তোমরা তোমাদের মেয়েদেরকে কুৎসিত পুরুষের সাথে বিয়ে দিওনা। কেননা সুশ্রী স্ত্রী যেমন পুরুষের প্রিয়, তেমনি সুদর্শন পুরুষ নারীরও পছন্দনীয়।

দোষগুণ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া : পুরুষ বা স্ত্রী সুশ্রী না কুৎসিত তাতো দেখেই

চেনা যায়। কিন্তু স্বভাবগত ও চারিত্রিক দোষ গুণ মানুষের কাছ থেকে বিবরণ শুনে, অনুসন্ধান করে বা জিজ্ঞাসা করে ছাড়া জানা যায়না। জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধান দ্বারা তথ্য সংগ্রহের এ কাজ এমন লোকদের সাহায্য নিয়ে করতে হয় যারা প্রস্তাবিত পাত্র বা পাত্রীর সাথে সামাজিকভাবে বা প্রতিবেশি হিসেবে মেলামেশা করে থাকে। অথবা উভয়ের এমন আত্মীয়ের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে যার উপর নির্ভর করা যায়, যেমন মা ও বোন। হাকেম, তাবারানি, বায়হাকি ও আহমদ বর্ণনা করছেন : রসূলুল্লাহ সা. উম্মে সুলাইমকে জনৈকা মহিলার নিকট পাঠিয়ে বলে দিয়েছিলেন যে, তার পায়ের গোড়ালির উপরের মোটা রগটি দেখবে এবং তার দুই কাঁধের বা মুখের ঘ্রাণ শুকবে।

ইমাম গাযযালি ইহ্ইয়াউল উলুমে বলেছেন : পাত্রীর সৌন্দর্য ও স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে শুধু এমন লোককেই জিজ্ঞাসা করা উচিত যে একাধারে সূক্ষ্মদর্শী, সত্যভাষী, গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে বিশেষত যে পাত্র বা পাত্রীর প্রতি এতটা অনুরক্ত নয় যে, মাত্রারিক্ত প্রশংসা করবে এবং এতটা ঈর্ষাপরায়ণও নয় যে প্রাপ্য প্রশংসা করতেও কসুর করবে। মনে রাখা উচিত, বিয়ে সংক্রান্ত তথ্য আদান প্রদানে ও পাত্রীদের দোষগুণ বর্ণনায় বাড়াবাড়ি করা সাধারণ মানুষের স্বভাবসুলভ প্রবণতা। এ বিষয়ে নির্ভেজাল সত্য ও ভারসাম্যপূর্ণ তথ্য প্রদানকারীর সংখ্যা নিতান্তই অল্প। বরঞ্চ ধোঁকা দেয়া ও প্রলুব্ধ করার প্রবণতাই বেশি। নিজের স্ত্রী ব্যতিত অন্য বেগানা নারীর প্রতি কৌতূহলী হয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে যার ভয় ও সংকোচ বোধ হয়, তার জন্য এ ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করাই শ্রেয়।

পাত্র ও পাত্রীর নির্জনে মিলিত হওয়া নিষিদ্ধ : বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে এমন নারীর সাথে নির্জনে মিলিত হওয়া হারাম। কেননা প্রস্তাবকারীর সাথে বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত উভয়ে পরস্পরের জন্য নিষিদ্ধ। পাত্র পাত্রীর পরস্পরকে দেখা ব্যতিত শরিয়ত আর কিছুরই অনুমতি দেয়নি। কাজেই সে বিয়ের আগ পর্যন্ত যেমন নিষিদ্ধ ছিলো, তেমন নিষিদ্ধই থাকবে। তাছাড়া নির্জনে মিলিত হলে যেহেতু উভয়ে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হবেনা এমন নিশ্চয়তা নেই, তাই নিভৃত সাক্ষাৎকার নিষিদ্ধ। তবে পাত্র ও পাত্রীর সাক্ষাতের সময় কোনো মাহরাম ব্যক্তি উপস্থিত থাকলে নিভৃত সাক্ষাৎ বৈধ। কেননা মাহরাম ব্যক্তির উপস্থিতিতে অবৈধ কাজ সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়। জাবের রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে, সে যেন কিছুতেই এমন মহিলার সাথে নির্জনে মিলিত না হয় যার সাথে তার কোনো মাহারাম আত্মীয় নেই। এরূপ মিলিত হলে শয়তান হয় তৃতীয় জন।" -আহমদ।

আমের বিন রবীয়া রা. থেকে বর্ণিত, "রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : একজন গায়রে মাহারাম নারীর সাথে কোনো পুরুষ কোনক্রমেই নির্জনে সাক্ষাৎ করবেনা। তবে কোনো মাহারাম ব্যক্তি উপস্থিত থাকলে ভিন্ন কথা। -আহমদ।

নির্জনে সাক্ষাতের ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শনের ঝুঁকি ও তার সম্ভাব্য কুফল : এ ব্যাপারে অনেকে শৈথিল্যের নীতি অবলম্বন করে থাকে। ফলে নিজের মেয়ে বা আত্মীয়কে তার বাগদানকারীর সাথে মেলামেশা করতে এমনকি মুরব্বীদের তদারকিবিহীন নিভৃত সাক্ষাতের অনুমতি দিয়ে থাকে। যেখানে নিয়ে যেতে চায় সেখানেই তার সাথে যেতে দিতে সম্মত হয় কোনো ধরনের নজরদারী ছাড়াই। এ ধরনের তদারকিবিহীন নিভৃত সাক্ষাৎ ও মেলামেশার ফলে মেয়েরা কখনো নিজের সম্মান, মর্যাদা এমনকি সতিত্ব পর্যন্ত

খুইয়ে বসে। এরপর ঐ পাত্রের সাথে বিয়ে না হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। তখন বিবাহযোগ্যা মেয়ের বিয়ে না হওয়া একটা বাড়তি বিপত্তি হয়ে দেখা দেয়। আবার এর বিপরীত পক্ষে রয়েছে এমন এক গোড়াঁ গোষ্ঠী, যারা প্রস্তাবকারী পাত্রকে প্রস্তাব দেয়ার পর পাত্রী দেখার অনুমতিই দেয়না এবং আগে ভাগেই পাত্রের কাছ থেকে বিয়ে করার সম্মতি আদায় না করা পর্যন্ত দেখতে দিতে চায়না। তারা চায়, বর ও কনে একেবারে বাসর রাতে ছাড়া পরস্পরকে না দেখুক। আর বাসর রাতের দর্শন দ্বারা কখনো কখনো আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে যায়। তখন নব পরিণীত দম্পতি এক অনাকাঙ্ক্ষিত পরিণতি অর্থাৎ অবনিবনা ও বিচ্ছেদের সম্মুখীন পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে।

কেউ কেউ ছবি দেখাকেই যথেষ্ট মনে করে থাকে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তা প্রশান্তিদায়ক ও সন্তোষজনক কোনো ফল দেয়না। ছবি বাস্তব সত্তাকে অবিকল ও নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত করেনা। সর্বোত্তম কর্মপন্থা হলো ইসলামের প্রদর্শিত কর্মপন্থা। কেননা এতে একদিকে যেমন স্বামী স্ত্রীর উভয়ে উভয়কে দেখার অধিকার নিশ্চিত হয়। অন্যদিকে তেমনি নির্জনে সাক্ষাৎ এড়িয়ে যাওয়ার মান সম্ভ্রমও সুরক্ষিত থাকে।

১০. বাগদান থেকে ফিরে যাওয়া ও তার ফলাফল

বাগদান হলো বিয়ের চুক্তি সম্পাদনের ভূমিকা। অনেক ক্ষেত্রে বাগদানের অব্যবহিত পর দেনমোহর পুরোপুরি বা আংশিক অগ্রিম পরিশোধ করা হয় এবং নতুন সম্পর্ককে নিশ্চিত করা ও দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে উপহার ও উপঢৌকনাদি দেয়া হয়। আবার কখনো কখনো বাগদত্ত বা বাগদত্তা কিংবা উভয়ে বাগদান প্রত্যাহার করে ও বিয়ে সম্পন্ন করতে অসম্মত হয়।

সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন দেখা দেয়, শরিয়তের দৃষ্টিতে এটি ঠিক কিনা এবং বাগদত্তাকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তা ফেরত দেয়া হবে কিনা? বস্তুত বাগদান বিয়ের প্রতিশ্রুতি মাত্র। এটা বাধ্যতামূলক কোনো চুক্তি নয়। এই চুক্তি সম্পাদন থেকে বিরত থাকা উভয় পক্ষের একটা ন্যায়সংগত অধিকার। শরিয়ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য এমন কোনো আর্থিক বা দৈহিক শাস্তি নির্ধারণ করেনি, যা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীকে ভোগ করতে হয়। অবশ্য এটা নৈতিক দিক দিয়ে একটা গর্হিত কাজ। একে মুনাফিকের বৈশিষ্ট্যরূপে গণ্য করা হয়েছে। কেবল সেই ক্ষেত্রে এর অনুমতি আছে যখন প্রতিশ্রুতি পালন না করা অনিবার্য প্রয়োজনের দাবি হয়ে দাঁড়ায়। সহীহ বুখারিতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি : যখন সে কথা বলে তখন মিথ্যা বলে, যখন সে প্রতিশ্রুতি দেয় তখন তা ভঙ্গ করে, আর যখন তার নিকট আমানত রাখা হয়, তখন তার খেয়ানত করে।

আবদুল্লাহ ইবনে উমরের রা. যখন মৃত্যু ঘনিয়ে এলো, তখন কুরাইশের এক ব্যক্তির নামোল্লেখ করে বললেন : তোমরা তাকে খুঁজে বের করো। কারণ আমি তাকে আমার মেয়ে সম্পর্কে এমন একটা কথা বলেছি, যা প্রতিশ্রুতির কাছাকাছি। আমি চাইনা মুনাফিকির এক তৃতীয়াংশ নিয়ে আল্লাহর কাছে যাই। তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি আমি তার সাথে আমার মেয়ে বিয়ে দিলাম। (তাযকিরাতুল হুফফায)

আর বাগদত্ত মোহরানা হিসেবে যা দিয়েছে তা ফেরত নেয়ার অধিকার রয়েছে। কেননা তা দেয়া হয়েছে বিয়ের বিনিময়ে। যেহেতু বিয়ে হয়নি, সেহেতু মোহরানা বাগদত্তার প্রাপ্য নয়। তাই তা তার মালিককে ফেরত দিতেই হবে। কেননা ওটা নিরঙ্কুশভাবে তার সম্পদ।

আর উপহার দানের পর্যায়ভুক্ত। দান যদি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে করা হয় এবং তার বিনিময়ে অন্য কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্যে না করা হয় তবে তা ফেরত নেয়া ঠিক নয়। কেননা যাকে কোনো জিনিস দান করা হয়, সে তা অবগত করা মাত্রই তার মালিকানাভুক্ত হয়ে যায় এবং সে তা যে কোনভাবে কাজে লাগানো অধিকার তার থাকে। সুতরাং দাতা যদি তা ফেরত নেয় তবে সেটা হবে ঐ ব্যক্তির মালিকানাভুক্ত সম্পত্তিকে তার সম্মতি ব্যতিত ছিনিয়ে নেয়ার শামিল যা শরিয়ত ও যুক্তি উভয়ের দৃষ্টিতে অবৈধ ও অচল।

পক্ষান্তরে কেউ যদি বিনিময়ে কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্যে কোনো উপহার দেয়, অথচ যাকে উপহার দেয়া হয়েছে সে তা না দেয়, তাহলে তার প্রদত্ত উপহার ফেরত নেয়া বৈধ হবে। এখানে দাতার দান ফেরত নেয়ার অধিকার শরিয়ত সম্মত। কেননা তার দান ছিলো আদান প্রদানের পর্যায়ের। কাজেই বিয়ে যখন হয়নি, তখন বিয়ের উদ্দেশ্যে দেয়া উপহার সে ফেরত নিতেই পারে। এক্ষেত্রে যে মূলনীতি অনুসরণ করা হয় তা নিম্নোক্ত হাদিস কটিতে ফুটে উঠেছে :

১. আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছে, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : কোনো ব্যক্তির কাউকে কিছু দান করার পর বা উপহার দেয়ার পর তা ফেরত নেয়া হালাল নয়। কেবল পিতামাতা তার সন্তানকে কিছু দিয়ে ফেরত নিতে পারে।

২. ইবনে আব্বাস রা. আরো বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি দান করে তা ফেরত নেয়, সে ঐ ব্যক্তির মতো, যে বমি করে তা আবার খায়।

৩. সালেম তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি কাউকে কিছু দান করে, সে যতোক্ষণ তার বিনিময় না পায় ততোক্ষণ উক্ত দান ফেরত পাওয়ার ব্যাপারে অগ্রগণ্য।

এই হাদিসগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের উপায় 'ইলামুল মুকীয়ীন' গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৫০ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হয়েছে : "যে উপহারদাতা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে এবং কোনো বিনিময় লাভের আশা ছাড়াই উপহার দেয়, তার তা ফেরতে নেয়া বৈধ নয়। আর যে উপহারদাতা তার উপহারের বদলায় কিছু পাওয়ার আশা করে, কিন্তু যাকে উপহার দেয়া হলো সে বদলা দিলনা, সে দান সে ফেরত আনতে পারে। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, রসূলুল্লাহ সা.-এর সকল সুন্নত পালন করা জরুরি। একটিকে বাদ দিয়ে আর একটি গ্রহণ করা বৈধ নয়।

ফকীহদের অভিমত : তবে যে কর্মপন্থাটি আদালতের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে আসছে, তা হলো বাগদাতা তার বাগদত্তাকে যা কিছুই দিয়ে থাকুক, তা যদি ভিন্নরূপে রূপান্তরিত না হয়ে থাকে, তবে তা সে ফেরত নিতে পারবে। এটা হানাফী মাযহাবের মত।

সুতরাং হাতের বালা, আংটি, হার ঘড়ি বা অনুরূপ অন্যান্য জিনিস যদি আগের অবস্থায় বহাল থাকে, তবে বাগদাতাকে ফেরত দিতে হবে। কিন্তু যদি আগের অবস্থায় বহাল না থাকে বরং খোয়া যায় অথবা বিক্রি হয়, অথবা তার সাথে বাড়তি উপাদান যুক্ত হয়ে তার রূপান্তর ঘটে থাকে, কিংবা সেটি খাদ্য সামগ্রী ছিলো এবং খাওয়া হয়ে গেছে, অথবা কাপড় ছিলো, পরে তা সেলাই করে পোশাক বানানো হয়েছে, তাহলে বাগদত্তা তা কিংবা পরবর্তীতে অন্য কিছু ফেরত চাইতে পারবেনা।

তানতার ইসলামী নিম্ন আদালত ১৯৩৩ সালের ১৩ই জুলাই এই মর্মে এক রায় দেয় যে :

১. বাগদত্তের পক্ষ থেকে তার বাগদত্তাকে যা কিছু দেয়া হয়, তা যদি বিয়ের চুক্তি সম্পাদনের উপযুক্ত কোনো জিনিস না হয়, তবে তা উপহার হিসেবে গণ্য হবে।

২. আর উপহার দানেরই সমার্থক শব্দিক অর্থ ও বিধি উভয় দিক দিয়েই।

৩. দান হচ্ছে মালিকানা অধিকার সম্বলিত একটা চুক্তি। সংশ্লিষ্ট সামগ্রীটি হস্তগত করা দ্বারাই এ চুক্তি পূর্ণতা লাভ করে। যাকে দান করা হয়, সে প্রাপ্ত সামগ্রীটি ক্রয়-বিক্রয় বা অন্য কোনো পন্থায় হস্তান্তর করতে পারে এবং তার এই হস্তান্তর আইনের দৃষ্টিতে কার্যকর।

৪. প্রদত্ত সামগ্রী ধ্বংস বা নষ্ট হলে তা ফেরত পাওয়ার অযোগ্য।

৫. সামগ্রীটি শুধু অক্ষত থাকলেই দাতা ফেরত চাইতে পারে, নচেত নয়।

মালেকী মাযহাবে এ ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হলো, বাগদান প্রত্যাহার করা হয়েছে কার পক্ষ থেকে বরের না কনের? যদি বরের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তবে সে প্রদত্ত উপহার ফেরত চাইতে পারবেনা। আর যদি কনের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তবে সে প্রদত্ত উপহার সম্পূর্ণরূপে ফেরত নেয়ার অধিকারী- চাই তা অক্ষত থাক বা নষ্ট হয়ে গিয়ে থাক। নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকলে সে তার বদলা পাবে। অবশ্য ভিন্নরূপ শর্ত বা সংজ্ঞা দেয়া থাকলে তদনুসারে কাজ করা হবে। পক্ষান্তরে শাফেয়ী মাযহাবে প্রদত্ত উপহার সর্বাবস্থায় ফেরত দেয়া হবে, চাই তা বহাল থাক বা নষ্ট হয়ে যাক। বহাল থাকলে হুবহু তা ফেরত দেয়া হবে। অন্যথায় তার জন্য মূল্য দেয়া হবে।

১১. আকদ বা বিয়ে

বিয়ের মূল উপাদান হলো উভয় পক্ষের সম্মতি এবং দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনে উভয় পক্ষের ইচ্ছার সমন্বয় বা মিল হওয়া এবং একমত হওয়া। যেহেতু উভয় পক্ষের এই সম্মতি, ইচ্ছার সমন্বয় ও ঐক্যমত্য একটা মনস্তাত্বিক বিষয় এবং তা অন্যদের জানা সম্ভব নয়, সেহেতু সম্পর্ক গড়া ও স্থাপনের সুদৃঢ় ইচ্ছা ও অকাট্য সিদ্ধান্তের সংকেত বা অভিব্যক্তি স্বরূপ কোনো বাক্য উচ্চারিত হওয়া অপরিহার্য।

এই সম্মতি ঐক্যমত্য ও ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়ে বিভিন্ন বাক্য উচ্চারণের রীতি বিয়ের পক্ষদ্বয়ের মধ্যে প্রচলিত আছে। দু'পক্ষের কোনো এক পক্ষ থেকে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছা ব্যক্ত করে সর্বপ্রথম যে বাক্য উচ্চারিত হয়, তাকে 'ইজাব' (প্রস্তাব দান) বলা হয়। 'ইজাব' অর্থ ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক করা। যে পক্ষ প্রথম ইচ্ছা ব্যক্ত করে, অপর পক্ষ সম্মতি ব্যক্ত করলে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা তার জন্য ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। তাই একে ইজাব বলা হয়। আর দ্বিতীয় বারে অপর পক্ষ থেকে সম্মতি ও প্রথম পক্ষের প্রস্তাব গ্রহণের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপক যে বাক্য উচ্চারিত হয়, তাকে 'কবুল' নামে আখ্যায়িত করা হয়। এজন্য ফকীহগণ বলে থাকেন : বিয়ের রুকন অর্থাৎ মূল স্তম্ভ হলো ইজাব ও কবুল। (প্রস্তাব দান ও প্রস্তাব গ্রহণ)

ইজাব ও কবুল শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী : এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্তাবলী পূরণ না হলে বিয়ে সম্পন্ন হয়না এবং এর ভিত্তিতে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়না।

১. ভালো মন্দ ও ন্যায় অন্যায় বাছবিচারের ক্ষমতা বর ও কনে উভয়ের মধ্যে থাকা চাই। সুতরাং কোনো একজন যদি পাগল বা এত কম বয়স্ক হয় যে, ভালো মন্দ বুঝেনা, তাহলে

বিয়ে সম্পন্ন হবেনা।

২. ইজাব ও কবুল উভয়টি একই বৈঠকে হওয়া চাই। অর্থাৎ ইজাব ও কবুলের মাঝে অন্য কোনো বক্তব্যের অবতারণা না হওয়া অথবা এমন কিছু না ঘটানো চাই যাকে প্রচলিত অর্থে বিয়ের প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করা বা এ প্রসঙ্গ বর্জন করে অন্য প্রসঙ্গে যাওয়ার সমার্থক মনে করা হয়। তবে ইজাবের পরে তাৎক্ষণিকভাবে ও সরাসরি কবুল করা শর্ত নয়। বৈঠক যদি দীর্ঘায়িত হয় এবং কবুলের ঘোষণা ইজাব থেকে বিলম্বিত হয় এবং উভয়ের মাঝে এমন কোনো বক্তব্য উচ্চারিত না হয়, যা অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করার লক্ষণ, তাহলে সেটিকে একই বৈঠক ধরা হবে। এটাই হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবের অভিমত। 'আল-মুগনী' গ্রন্থে বলা হয়েছে : কবুল যদি ইজাব থেকে বিলম্বিত হয় তবে উভয় পক্ষ বৈঠকে থাকলে এবং প্রসঙ্গ পাল্টে অন্য প্রসঙ্গে না গেলে বিয়ে শুদ্ধ হবে। কেননা বৈঠকে থাকা শরিয়তের দৃষ্টিতে বিয়ের আকদ সম্পাদনের অবস্থায় থাকার শামিল। কিন্তু কবুলের পূর্বে উভয় পক্ষ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হলে ইজাব বাতিল হয়ে যায়। কেননা এটা কবুলের অর্থবোধক নয়। বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া দ্বারা অপর পক্ষ থেকে প্রত্যাখ্যান ব্যক্ত করা হয়েছে। কাজেই প্রস্তাবটি গৃহীত হবেনা। অনুরূপ বিয়ের আলোচনায় ছেদ ঘটিয়ে উভয় পক্ষ অন্য প্রসঙ্গে গেলে বা অন্য কাজে লিপ্ত হলে সেটিও প্রত্যাখ্যানের অর্থবোধক হবে। কেননা এক্ষেত্রেও অপর পক্ষ প্রস্তাব গ্রহণ না করে বিয়ের আকদ বর্জন করেছে।

আহমদ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তির কাছে কয়েক ব্যক্তি গিয়ে বললো : অমুককে বিয়ে করাও। সে বললো : একশো দিনারের মোহরানায় তাকে বিয়ে করালাম। এর অব্যবহিত পর ঐ লোকগুলো বরের কাছে গিয়ে তাকে জানালো যে, তাকে একশো দিনার মোহরানায় বিয়ে করানো হয়েছে। সে তৎক্ষাণাত বললো : আমি কবুল করলাম। ইমাম আহমদকে জিজ্ঞাসা করা হলো, এটা কি বিয়ে বলে গণ্য হবে? তিনি বললেন : হাঁ। শাফেয়ী মাযহাব অনুসারে তাৎক্ষণিকভাবে কবুল করা শর্ত। আর যদি বর ইজাব ও কবুলের মাঝে একটা বক্তৃতা দিয়ে ব্যবধান সৃষ্টি করে। যেমন : কনের অভিভাবক বরকে বললো : তোমার সাথে আমার অমুক মেয়েকে বা আত্মীয়াকে বিয়ে দিলাম।" আর বর বললো : আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি, আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা এবং আল্লাহর রসূলের উপর দরূদ ও সালাম, আমি উক্ত মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব কবুল করলাম-" তাহলে এ সম্পর্কে দুটি মত রয়েছে : শেখ আবু হামেদ ইসফারাইনীর মতে, বিয়ে শুদ্ধ হবে। কেননা আকদের জন্য খুতবা বা ভাষণ দানের তো আদেশ আছেই। সুতরাং তা বিয়ে শুদ্ধ হওয়ার অন্তরায় হতে পারেনা। যেমন দুই নামাযের মাঝে তাইয়াম্মুমের ব্যবধান নামাযের বিশুদ্ধতার অন্তরায় হয়না। দ্বিতীয় মত হলো, বিয়ে শুদ্ধ হবেনা। কেননা এই ভাষণ ইজাব ও কবুলের মাঝে ছেদ ঘটিয়েছে। তাই শুদ্ধ নয়, যেমন খুতবা ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা ব্যবধান সৃষ্টি করলেও শুদ্ধ হয়না। তাইয়াম্মুমের সাথে এটি তুলনীয় নয়। কেননা তাইয়াম্মুম দুই নামাযের মাঝেই করার আদেশ দেয়া হয়েছে। আর খুতবার আদেশ দেয়া হয়েছে আকদের পূর্বে। ইমাম মালেক ইজাব ও কবুলের মাঝে স্বল্প বিরতির অনুমতি দিয়েছেন। এই মতভেদের কারণ হলো, ইজাব ও কবুল উভয় পক্ষ থেকে একই সময়ে হওয়া শর্ত কিনা সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

৩. ইজাব ও কবুলের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য না থাকা চাই। ইজাব ও কবুলে যদি এমন পার্থক্য থাকে, যা প্রস্তাবকের কাছে আরো উত্তম বিবেচিত হয়, তাহলে সেটা অধিকতর

জোরদার সম্মতি বিবেচিত হবে। যেমন প্রস্তাবক বললো : আমার অমুক মেয়েকে তোমার সাথে একশ' পাউন্ড মোহরানার বিনিময়ে বিয়ে দিলাম।" এর জবাবে অপর পক্ষ বললো : "আমি দুইশো পাউন্ড মোহরানার বিনিময়ে কবুল করলাম।" এ ক্ষেত্রে বিয়ে শুদ্ধ ও সম্পন্ন হবে। কেননা এমন ভাষায় কবুল করা হয়েছে, যা অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

৪. বর পক্ষ ও কনে পক্ষ উভয়ের পরস্পরের কথা এতটা শোনা চাই যা দ্বারা তারা মোটামুটি এতটুকু বুঝতে পারে যে, এই আলোচনার উদ্দেশ্য হলো বিয়ের চুক্তি সম্পাদন ও বৈবাহিক স্থাপন। উভয় পক্ষ কর্তৃক উভয় পক্ষের কথাবার্তার প্রতিটি শব্দ শোনা ও বুঝা জরুরি নয়। কেননা উদ্দেশ্য ও নিয়তই প্রকৃত গুরুত্ববহ ও বিবেচ্য বিষয়।

ইজাব ও কবুলের শব্দ : বর পক্ষ ও কনে পক্ষ উভয় পক্ষের বোধগম্য ভাষায় বিয়ের অর্থ ব্যক্ত করে এমন শব্দ প্রয়োগ এবং উভয় পক্ষের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ইচ্ছা প্রতিফলিত হয় এমন কথা বলা দ্বারাই বিয়ে সম্পন্ন হয়।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া 'আল ইখতিবারাতুল ইলমিয়া' গ্রন্থের ১১৯ পৃষ্ঠায় বলেছেন : সাধারণ মানুষ যাকে বিয়ে বলে জানে তা দ্বারাই বিয়ে সম্পন্ন হবে, চাই তা যে কোনো ভাষা যে কোনো শব্দ বা যে কোনো কাজ দ্বারাই বুঝানো হোক না কেন। শুধু বিয়ে নয়, অন্য সকল চুক্তির ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য।" কবুলের ক্ষেত্রে ফকীহগণ এই মতই সমর্থন করেছেন। কোনো বিশেষ শব্দ দ্বারা কবুল ব্যক্ত করার শর্ত আরোপ করেননি। সম্মতি ও সমর্থন বুঝায় এমন যে কোনো শব্দ দ্বারাই কবুল কার্যকর হবে : যেমন, কবুল করলাম, সম্মতি দিলাম, মেনে নিলাম, অনুমোদন করলাম, কার্যকর করলাম ইত্যাদি। কিন্তু ইজাবের ব্যাপারে আলেমগণ একমত হয়ে বলেছেন যে, বিয়ে দিলাম বা নিকাহ দিলাম বা বিয়ে ও নিকাহ শব্দ থেকে নিষ্পন্ন অনুরূপ অর্থবোধক যে কোনো বাক্য দ্বারা বিয়ে শুদ্ধ হবে। কেননা এ দুটি শব্দ কাঙ্ক্ষিত জিনিসকে প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্ত করে। এ দুটো শব্দ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ ব্যবহারে বিয়ে হবে কিনা তা নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। যেমন কেউ যদি বলে : অমুক মেয়ে তোমাকে দান করে দিলাম বা সদকা করে দিলাম, বা তোমাকে তার মালিক করে দিলাম বা তোমার কাছে তাকে বিক্রি করে দিলাম, তাহলে হানাফীদের মতে, বিয়ে শুদ্ধ হবে। ছাওরী, আবু হাওর, আবু উবাইদ ও আবু দাউদের মতেও বিয়ে শুদ্ধ হবে। কেননা এটা এমন একটা চুক্তি, যার ব্যাপারে নিয়তই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। কোনো বিশেষ শব্দ ব্যবহার করা এখানে শর্ত নয়। যে শব্দ দ্বারাই শরিয়তের কাঙ্ক্ষিত অর্থ বুঝা যাবে, সে শব্দই ব্যবহার করা বৈধ হবে।' অর্থাৎ যে শব্দের অর্থ ও শরিয়তের কাঙ্ক্ষিত অর্থ একই রকম, সে শব্দ দ্বারাই বিয়ে শুদ্ধ হবে। কেননা রসূলুল্লাহ সা. এক ব্যক্তিকে জনৈকা মহিলার সাথে বিয়ে দেয়ার সময় বললেন : তোমার কাছে কুরআনের যে শিক্ষা সঞ্চিত রয়েছে, তার বিনিময়ে উক্ত মহিলাকে তোমার মালিকানায় সমর্পণ করলাম।" -বুখারি।

তাছাড়া যেহেতু 'হেবা' অর্থাৎ 'দান' শব্দ দ্বারা যখন রসূলুল্লাহ সা.-এর বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে তখন তার উম্মতের বিয়ে সম্পন্ন হবে। আল্লাহ বলেন :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ إلى قوله وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ .

অর্থ : হে নবী, আপনি আপনার যে সকল স্ত্রীকে মোহরানা দিয়ে বিয়ে করেছেন তাদেরকে আমি আপনার জন্য হালাল করেছি এবং সেই মুমিন মহিলাকেও হালাল করেছি যে নিজেকে নবীর নিকট সমর্পণ করে দিয়েছে। (সূরা আহযাব)

তাছাড়া যেহেতু বিয়ে রূপক শব্দ দ্বারা শুদ্ধভাবে সম্পন্ন করা যায়, তাই তা সাংকেতিক শব্দ দ্বারাও সম্পন্ন করা যাবে, যেমন তালাক সাংকেতিক শব্দ দ্বারাও দেয়া যায়। (হানাফীদের মূলনীতি হলো বিয়ে এমন যে কোনো শব্দ দ্বারা সম্পন্ন হবে, যা কোনো বস্তুকে তাৎক্ষণিকভাবে কারো স্থায়ী মালিকানায় সমর্পণ করার অর্থ বুঝায়। এই মূলনীতি অনুসারে হালাল করে দেয়া বা বৈধ করে দেয়া শব্দ দ্বারা বিয়ে বৈধ হবেনা। কেননা এ দ্বারা স্থায়ীভাবে মালিকানায় অর্পণ করা বুঝা যায়না। অনুরূপ 'ধার দেয়া' 'ভাড়া দেয়া' শব্দ দ্বারাও নয়। কেননা এ দুটো শব্দ বস্তুর নয়, বস্তুর উপকারিতা বা সেবার মালিক বানানো বুঝায়। 'ওসিয়ত' শব্দ দ্বারাও নয়। কেননা এ দ্বারা মৃত্যুর পরে মালিক বানানো বুঝায় তাৎক্ষণিকভাবে নয়। আর শাফেয়ী, আহমদ, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব ও আতার মতে বিয়ে বা নিকাহ শব্দ দ্বারা গঠিত বাক্য দ্বারাই বিয়ে সম্পন্ন হবে। কেননা অন্যান্য শব্দ যেমন দান করা, মালিক বানানো ইত্যাদি বিয়ে অর্থে ব্যবহৃত হয়না। তাছাড়া যেহেতু সাক্ষ্য তাদের নিকট বিয়ে শুদ্ধ হওয়ার শর্ত, তাই দান শব্দ দ্বারা বিয়ে সম্পন্ন করা হলে সাক্ষ্য বিয়ের উপর আরোপিত হবেনা।

আরবি ব্যতিত অন্য ভাষায় বিয়ে : ফকীহগণ এ বিষয়ে একমত যে, আরবি ব্যতিত অন্য যে কোনো ভাষায় বিয়ে সম্পাদন করা বৈধ, যদি বর ও কনে উভয়ে অথবা দু'জনের একজন আরবি বুঝতে অক্ষম হয়। আর উভয়ে যখন আরবি বুঝে ও আরবিতে বিয়ে সম্পাদন করতে সক্ষম হয়, তখন অন্য ভাষায় বৈধ হবে কিনা তা নিয়ে ফকীহগণের মতভেদ হয়েছে। ইবনে কুদামা আল মুগনীতে বলেছেন : যে ব্যক্তি আরবিতে নিকাহ শব্দ উচ্চারণ করতে সক্ষম, তার অন্য ভাষায় বিয়ে সম্পাদন করা বৈধ হবেনা। এটি ইমাম শাফেয়ীর দুটি মতের একটি। ইমাম আবু হানিফার মতে, আরবি ব্যতিত অন্য যে কোনো ভাষায় বিয়ে বৈধ হবে। কেননা সে তার নিজস্ব শব্দ প্রয়োগ করেছে, তাই তাতেই বিয়ে শুদ্ধ হয়েছে, যেমন আরবি শব্দ দ্বারা শুদ্ধ হয়।

আমাদের নিকট প্রকৃত সত্য হলো, এটি একটি অন্যায় কড়াকড়ি। অথচ আল্লাহর দীন একটা সহজ ও উদার বিধান। আর আমরা আগেই বলেছি বিয়ের মূল উপাদান হলো উভয় পক্ষের সম্মতি। ইজাব ও কবুল এই সম্মতিরই প্রমাণ ও লক্ষণ। কাজেই ইজাব ও কবুল যখন ঘোষিত হয়, তখন সেটাই যথেষ্ট হবে, তা যে ভাষাতেই হোক না কেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন : বিয়ে যদিও একটা আত্মীয়তা, তথাপি তা মালিকানা ও দান সদকার মতোই। তাই এর জন্য আরবি বা অন্য কোনো ভাষার শব্দ নির্দিষ্ট করা যায়না। আর একজন অনারব যদি তাৎক্ষণিকভাবে আরবি শিখেও নেয়, তথাপি সে যে ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত, সে ভাষার মতো আরবি ভাষার শব্দের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য নাও বুঝতে পারে।

হাঁ যদি বলা হতো বিনা প্রয়োজনে অনারবীয় ভাষায় চুক্তি সম্পাদন মাকরূহ বা অসমীচীন যেমন অন্য যাবতীয় ধরনের লেনদেন ও আদান প্রদান বিনা প্রয়োজনে অনারবীয় ভাষায় অসমীচীন, তাহলে কথাটা বিবেচনার যোগ্য হতো।

বোবার বিয়ে : কনের বোধগম্য হওয়া সাপেক্ষে ইশারা ইঙ্গিতে বোবার বিয়ে বৈধ হবে। যেমন তার বেচাকেনা বৈধ। কেননা ইশারা মনোভাব প্রকাশের একটা বোধগম্য পন্থা ও মাধ্যম। তবে অপর পক্ষ ইশারা না বুঝলে বৈধ হবেনা। কেনন এটা হচ্ছে দু'ব্যক্তির মধ্যকার পারস্পরিক চুক্তি। কাজেই একজনের বক্তব্য অপরজনের কাছে বোধগম্য হওয়া অপরিহার্য।

অনুপস্থিত ব্যক্তির বিয়ে : বিয়ের এক পক্ষ যখন অনুপস্থিত থাকে এবং বিয়ে করতে ইচ্ছুক হয়, তখন তাকে অপর পক্ষের বিয়ের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে চিঠি বা দূত পাঠাতে হবে। প্রতিপক্ষ যদি প্রস্তাব গ্রহণে আগ্রহী থাকে, তবে তার কর্তব্য হলো, কতিপয় সাক্ষী উপস্থিত করে তাদেরকে চিঠির ভাষ্য বা দূতের বার্তা শোনাবে। তাদেরকে বৈঠকে সাক্ষী বানিয়ে তাদের সামনে ব্যক্ত করবে যে, সে বিয়েতে রাজি। এক্ষেত্রে বৈঠকের মধ্যে ঘোষিত সম্মতিই গ্রহণযোগ্য হবে।

আকদের উপযুক্ত শব্দ : ইজাব ও কবুলে ব্যবহার্য শব্দের জন্য ফকীহগণ শর্ত আরোপ করেছেন যে, তা এমন দুটি শব্দ হওয়া চাই যার উভয়টি হবে অতীত কাল বাচক ক্রিয়া, অথবা একটি হবে অতীত কাল বাচক এবং অপরটি ভবিষ্যৎ বাচক। প্রথমটির উদাহরণ হলো : প্রথম প্রস্তাবকারী বলবে : "তোমার সাথে আমার মেয়ের বিয়ে দিলাম।" আর প্রস্তাব গ্রহণকারী বলবে : "আমি কবুল করলাম।" দ্বিতীয়টির উদাহরণ হলো : প্রস্তাবকারী বলবে : "আমার মেয়েটি তোমার সাথে বিয়ে দেবো।" আর প্রস্তাব গ্রহণকারী বলবে : "আমি গ্রহণ বা কবুল করলাম।"

ফকীহদের এরূপ শর্ত আরোপের কারণ এই যে, বিয়ে সম্পাদনের আসল স্তম্ভ হলো উভয় পক্ষের সম্মতির বিদ্যমানতা ও উভয়ের ইচ্ছার পরিপূর্ণ সমন্বয় ও ঐক্য। আর ইজাব ও কবুল হলো এই সম্মতির অভিব্যক্তি, প্রকাশ ও প্রতিফলনের মাধ্যম। এই দুটি শব্দ এমন হতে হবে যে, তা বিয়ে সম্পাদন তথা ইজাব ও কবুলের সময় কার্যত ও বাস্তবিকপক্ষে উভয়ের সম্মতির বিদ্যমানতার সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটায় ও অকাট্য প্রমাণ দর্শায়। যাবতীয় চুক্তি সম্পাদনের জন্য শরিয়ত অতীত কাল বাচক শব্দ ব্যবহার করেছে। কেননা তা উভয়পক্ষের সম্মতি অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করে এবং অন্য কোনো অর্থ বহন করেনা। বর্তমান ও ভবিষ্যৎকাল বাচক শব্দ সুস্পষ্ট ও অকাট্যভাবে প্রমাণ করেনা যে, কথা বলার সময়ে কার্যকর সম্মতি বিদ্যমান।

যেমন প্রস্তাবক যদি বলে : "আমি তোমার সাথে আমার মেয়ে বিয়ে দেব বা দিচ্ছি" আর অপর পক্ষ বলে : "কবুল করবো বা করছি।" এরূপ বলা হলে এ দ্বারা বিয়ে সম্পন্ন হবেনা। কেননা এ শব্দ দ্বারা নিছক প্রতিশ্রুতি বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। বস্তুত ভবিষ্যতে বিয়ের ওয়াদা বর্তমানে তার জন্য বিয়ে নয়। আর যদি প্রস্তাবক বলে, "আপনার মেয়েকে আমার সাথে বিয়ে দিন।" আর তার জবাবে অপর পক্ষ যদি বলে, "আমার মেয়েকে তোমার সাথে বিয়ে দিলাম।" তাহলে বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যাবে। কেননা আমার সাথে বিয়ে দাও বাক্যটা উকিল নিয়োগের সমর্থক। কোনো ব্যক্তি উভয় পক্ষের উকিল হয়ে বিয়ের কাজ সম্পন্ন করলে তা বৈধ। তাই প্রস্তাবক যখন বলেছে : আমার সাথে বিয়ে দাও, আর অপর পক্ষ বলেছে, গ্রহণ করলাম। তখন তার অর্থ দাঁড়ায়, প্রথম জন দ্বিতীয় জনকে উকিল নিয়োগ করেছে। আর দ্বিতীয় জন উভয় পক্ষের উকিল হিসেবে বিয়ে সম্পন্ন করেছে।

বিয়ে সম্পাদন শর্তহীন হওয়া জরুরি : ফকীহগণ এরূপ শর্ত আরোপ করেছেন যে, বিয়ে সব রকম শর্তমুক্ত হওয়া চাই। এর উদাহরণ এই যে, কোনো ব্যক্তি বিবাহেচ্ছু ব্যক্তিকে

বলবে : আমার মেয়েকে তোমার সাথে বিয়ে দিলাম।" আর বিবাহেচ্ছু ব্যক্তি বলবে : কবুল করলাম।" এ বিয়ে সম্পূর্ণ শর্তহীনভাবে সম্পন্ন হবে। এভাবে সকল প্রয়োজনীয় শর্ত পূর্ণ হলে বিয়ে শুদ্ধ হবে এবং তার ভিত্তিতে দাম্পত্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে।

কখনো কখনো বিয়ের প্রস্তাবে ব্যবহৃত শব্দ কোনো শর্তের ওপর নির্ভরশীল। ভবিষ্যতের কোনো সময়ের সাথে যুক্ত বা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারে। এ ধরনের শব্দ দ্বারা বিয়ে সম্পন্ন হবেনা। এ ধরনের বিয়ের ব্যাখ্যা হলো :

১. শর্তবোধক শব্দ দ্বারা বিয়ের প্রস্তাব : শর্তবোধক কোনো শব্দ দ্বারা বিয়েকে অন্য কোনো জিনিস সংঘটিত হওয়ার ওপর নির্ভরশীল বানানো। যেমন প্রস্তাবক বলবে : আমি যদি অমুক চাকরিতে যোগ দেই, তাহলে আপনার মেয়েকে বিয়ে করবো।" এর জবাবে মেয়ের পিতা বলবে : আমি সম্মতি দিলাম বা কবুল করলাম।" এ ধরনের কথা দ্বারা বিয়ে সম্পন্ন হবেনা। কেননা এখানে বিয়ে সম্পন্ন হওয়া এমন জিনিসের উপর নির্ভরশীল যা ভবিষ্যতে হতেও পারে, নাও হতে পারে। অথচ বিয়ে এমন একটা চুক্তির নাম, যা তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট নারীর সাথে যৌন সম্ভোগের অধিকার প্রদান করে। এ অধিকার বিলম্বিত হয়না। অথচ চাকুরিতে যোগদানের যে শর্ত আরোপিত হয়েছে, কথা বলার সময়ে তার অস্তিত্ব ছিলনা। যে জিনিসের অস্তিত্ব নেই, তার উপর নির্ভরশীল জিনিসেরও অস্তিত্বও নেই। সুতরাং বাস্তবতা এটাই যে, বিয়ে সম্পন্ন হয়নি। পক্ষান্তরে বিয়ে যদি এমন জিনিসের উপর নির্ভরশীল রাখা হয়, যা বর্তমানে বিদ্যমান, তাহলে বিয়ে সম্পন্ন হবে। যেমন পাত্র বললো : আপনার মেয়ের বয়স যদি কুড়ি বছর হয়, তাহলে আমি তাকে বিয়ে করবো।" তখন মেয়ের পিতা বললো : আমি সম্মত বা রাজি। আর দেখা গেলো, বাস্তবেও মেয়ের বয়স কুড়ি বছর। অনুরূপ যদি কনে বরকে বলে : আমার আব্বা রাজি থাকলে তোমাকে বিয়ে করবো।" তখন বর বললো : আমি কবুল করলাম"। আর কনের পিতা একই বৈঠকে বললো : "আমি রাজি।" কেননা এ ক্ষেত্রে শর্তটা নাম মাত্র। যে জিনিসের উপর বিয়েকে নির্ভরশীল রাখা হয়েছে; তা তাৎক্ষণিকভাবেই নিষ্পন্ন হয়ে গেছে।

২. ভবিষ্যতের কোনো নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠেয় ও তার উপর নির্ভরশীল বিয়ের প্রস্তাব : এর উদাহরণ হলো, পাত্র বলবে : "আপনার মেয়েকে আগামীকাল বা এক মাস পরের জন্য বিয়ে করলাম।" তখন মেয়ের বাপ বলবে : "আমি সম্মতি দিলাম।" এ প্রস্তাব দ্বারা বিয়ে সম্পন্ন হবেনা, বর্তমানেও নয়, বর্ণিত পরবর্তী সময়েও নয়। কেননা ভবিষ্যতের সাথে যুক্ত করা বিয়ের আকদের পরিপন্থী, যা তাৎক্ষণিক যৌন সম্ভোগের অধিকার নিশ্চিত ও অবধারিত করেনা।

৩. বিয়ের আকদকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত করে এমন প্রস্তাব : যেমন এক মাস বা তার কম বা বেশি সময়ের জন্য বিয়ে করা। এ ধরনের বিয়ে বৈধ নয়। কেননা বিয়ের উদ্দেশ্যই হলো সন্তান প্রজনন, বংশ রক্ষা ও সন্তান প্রতিপালনের লক্ষ্যে স্থায়ী জীবন সঙ্গী বা সঙ্গিনী হওয়া। এজন্য ফকীহগণ মুত্‌য়া বিয়ে ও হিল্লা বিয়ে বাতিল ও অবৈধ বলে রায় দিয়েছেন। কেননা মুত্‌য়া বিয়ের উদ্দেশ্য নিছক অস্থায়ী যৌন সম্ভোগ আর হিল্লা বিয়ের উদ্দেশ্য স্ত্রীকে তার প্রথম স্বামীর জন্য হালাল করে দেয়া।

এই দুটি ক্ষণস্থায়ী অবৈধ বিয়ের বিস্তারিত বিবরণ সম্মুখে আসছে :

১২. মুত্‌য়া বিয়ে

এর আর এক নাম সাময়িক বা অস্থায়ী বিয়ে। এর অর্থ একজন পুরুষ কর্তৃক একজন মহিলাকে একদিন, এক সপ্তাহ বা এক মাসের জন্য বিয়ে করা। একে মুত্‌য়া বিয়ে অর্থাৎ ভোগের বিয়ে নামকরণ করার কারণ এই যে, এই বিয়ে দ্বারা পুরুষ কেবল নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত স্ত্রীকে ভোগ করে। সকল মাযহাব ও সকল ইমাম এই বিয়ের হারাম হওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ একমত। তারা বলেছেন : এ বিয়ে যে মুহূর্তে সংঘটিত হবে সেই মুহূর্তেই বাতিল হয়ে যাবে। (ইমাম যুফারের মতে, বিয়ে টিকে থাকবে। কেবল তার নির্দিষ্ট মেয়াদ বাতিল হবে। অবশ্য 'বিয়ে' শব্দ যোগে যদি আক্‌দ সম্পন্ন হয়। মুতয়া শব্দ ব্যবহারপূর্বক আক্‌দ অনুষ্ঠিত হলে যুফারের মতেও এ বিয়ে তৎক্ষণাত বাতিল গণ্য হবে।) এ প্রসঙ্গে যুক্তি প্রমাণ নিম্নরূপ :

১. কুরআনে বিয়ে, তালাক, ইদ্দত ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যেসব বিধি রয়েছে, এই বিয়ের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তাই অন্যান্য বাতিল বিয়ের মতো এ বিয়েও বাতিল না হয়ে পারেনা।

২. বিভিন্ন হাদিস দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ বিয়েকে হারাম ও অবৈধ বলে আখ্যায়িত করেছে। সাবরা জুহানী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন : তিনি মক্কা বিজয়ের অভিযানে রসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। তাদেরকে তিনি মুতয়া বিয়ে করার অনুমতি দেন। কিন্তু বিজয় শেষে মক্কা থেকে বের হবার আগেই তিনি তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ইবনে মাজার বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে : রসূলুল্লাহ সা. মুতয়া বিয়ে হারাম ঘোষণা করে বলেন : হে জনতা আমি তোমাদেরকে মুতয়া বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন আল্লাহ কেয়ামত পর্যন্ত এ ধরনের বিয়ে হারাম করে দিয়েছেন।" আর আলী রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. খয়বরের যুদ্ধের সময় মুত্‌য়া বিয়ে ও গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া হারাম ঘোষণা করেন।" (ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেছেন : আমি মুত্‌য়া বিয়ে ব্যতিত এমন আর কোনো জিনিস জানিনা, যাকে আল্লাহ দুবার হালাল করেছেন এবং দু'বার হারাম করেছেন।)

৩. উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খেলাফত আমলে মিম্বরের উপর থেকে মুতয়া বিয়ে হারাম ঘোষণা করেছেন এবং সাহাবিগণ তাঁর এ ঘোষণাকে সমর্থন করেছেন। তিনি যদি ভুল করতেন। তাহলে সাহাবিগণ তার ভুল কাজ সমর্থন করতেন না।

৪. খাত্তাবী বলেছেন : শীয়াদের কিয়দংশ ব্যতিত সমগ্র মুসলিম উম্মাহ মুতয়া বিয়েকে সর্বসম্মতভাবে হারাম মানে। আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকেও বর্ণিত, মুতয়া বিয়ে রহিত ও বাতিল হয়েছে। বায়হাকি জাফর মুহাম্মদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তাকে মুতয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : এটা যেনা ছাড়া আর কিছু নয়।

৫. যেহেতু মুতয়ার উদ্দেশ্য নিছক যৌন সম্ভোগ ও কামোত্তেজনা চরিতার্থ করা এবং বংশ বৃদ্ধি ও সন্তান পালন যা বিয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য মুতয়া বিয়ের উদ্দেশ্য তা নয়। তাই এটি যেনার সাথে পরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ দ্বারা যৌন সম্ভোগ ছাড়া আর কিছু কামনা করা হয়না। তাছাড়া মুত্‌য়া বিয়ে নারীর জন্য ক্ষতিকর। কেননা এটা তাকে নিছক ভোগের সামগ্রীতে পরিণত করে এবং সে ক্রমাগত একজনের নিকট থেকে আরেকজনের নিকট হস্তান্তরিত

হতে থাকে। সন্তানদেরও ক্ষতি সাধন করে মুতয়া বিয়ে। কারণ তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করার কোনো বাসস্থান পায়না। ফলে তাদের শিক্ষাদীক্ষাও অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে।

এতদসত্ত্বেও কতিপয় সাহাবী ও তাবেয়ী মুতয়া বিয়ে হালাল মনে করেন বলে জানা যায়। এ ব্যাপারে ইবনে আব্বাস রা.-এর নামই বেশি শোনা যায়। তাহযীবুস সুনান গ্রন্থে বলা হয়েছে : ইবনে আব্বাস জরুরি প্রয়োজনের সময় এটি অনুমোদনযোগ্য বলে মত নিয়েছেন। সর্বাবস্থায় ও শর্তহীনভাবে নয়। পরে যখন জানতে পারলেন, লোকেরা ব্যাপকভাবে এটা করছে, তখন এ মত প্রত্যাহার করলেন এবং যার প্রয়োজন নেই, তার জন্য হারাম বলে রায় দিলেন।

খাত্তাবী বলেছেন, সাঈদ বিন জুবাইর বলেন : আমি ইবনে আব্বাসকে বললাম : আপনি জানেন, কেমন ফতোয়া আপনি জারি করেছেন? আপনার ফতোয়ার ভিত্তিতে কাফেলা চলছে এবং কবিরা কবিতা রচনা করছে। তিনি বললেন : কবিরা কী বলছে? বললাম : তারা বলছে : শেখ যখন দীর্ঘ সফরে আটকা পড়ে গেলেন, তখন তাকে বললাম, আপনি কি ইবনে আব্বাসের ফতোয়া কাজে লাগাতে আগ্রহী? এই অনুমতি ব্যবহার করে একজন কুমারীকে কি পেতে চান? লোকজন ফিরে আসা পর্যন্ত সে আপনার আশ্রয়স্থল হবে।"

ইবনে আব্বাস বললেন : ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন! আল্লাহর কসম, আমি ফতোয়াটা এভাবে দেইনি। এটা আমার উদ্দেশ্যও ছিলনা। যে অবস্থায় আল্লাহ মৃত জন্তু রক্ত ও শুকরের গোশত হালাল করেছেন, আমি শুধু সেই অবস্থায় এর অনুমতি দিয়েছি। ঐসব নিষিদ্ধ রক্ত কেবল নিরূপায় ব্যক্তির জন্য হালাল। মুতয়া বিয়ে তো মৃতদেহ, রক্ত ও শুকরের গোশতের মতোই।"

ইমামিয়া শীয়া সম্প্রদায়-এর বৈধতার পক্ষপাতি। তাদের মতে এর স্তম্ভ চারটি :

১. 'তোমার সাথে বিয়ে দিলাম', 'তোমার সাথে নিকাহ দিলাম', 'তোমার সাথে মুতয়া বিয়ে দিলাম'- এই তিন ধরনের বাক্যের মধ্য থেকে যে কোনো একটি প্রয়োগে প্রস্তাব দিতে হবে। এসব শব্দ সম্বলিত প্রস্তাব দ্বারা মুতয়া বিয়ে সম্পন্ন হবে।

২. প্রস্তাবিত স্ত্রীর মুসলমান অথবা ইহুদী বা খৃষ্টান হওয়া শর্ত। মুমিন নেক নারীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করা মুস্তাহাব। ব্যভিচারিণীকে গ্রহণ করা মাকরূহ।

৩. দেন মোহর উল্লেখ করা শর্ত। উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে এর পরিমাণ নির্ধারিত হবে চাই তা এক মুঠো গমের বিনিময়েই হোক না কেন।

৪. মেয়াদ : এটা মুতয়া বিয়ের শর্ত। বর ও কনের সম্মতিক্রমেই মেয়াদ নির্ধারিত হবে। এই মেয়াদ দিন, মাস ও বছরের সংখ্যায় নির্ণিত হতে পারে। মেয়াদ যাই হোক নির্ধারিত হতেই হবে।

তাদের নিকট এই বিয়ের প্রচলিত কিছু বিধি উল্লেখ করা যাচ্ছে :

১. বিনিময় উল্লেখের সাথে সাথে মোহরের উল্লেখের ব্যত্যয় ঘটলে বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে। আর মেয়াদ উল্লেখ না করে মোহরানা উল্লেখ করলে বিয়ে স্থায়ী হয়ে যায়।

২. পাত্রীর সন্তান স্বামীর দায়ভুক্ত হয়।

৩. মুতয়া বিয়েতে তালাক নেই এবং লিয়ানও নেই। (স্ত্রীর ওপর ব্যভিচারের অভিযোগ আরোপের সুযোগ নেই)

৪. মুত্‌য়া বিয়েতে স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের উত্তরাধিকারী হওয়ার সুযোগ নেই।

৫. তবে স্বামী স্ত্রী সন্তানের এবং সন্তান তাদের উত্তরাধিকারী হবে।

৬. ঋতুবতী মহিলার ক্ষেত্রে দুই মাসিক স্রাবের মধ্য দিয়ে ইদ্দত শেষ হবে। ঋতুবতী হওয়া সত্ত্বেও মাসিক স্রাব না হলে তার ইদ্দত পয়তাল্লিশ দিন।

ইমাম শওকানি বলেছেন : আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে যে বিধিবিধান আমাদের নিকট পৌঁছেছে, তা নির্দ্বিধায় ও অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নেয়া সর্বাবস্থায় আমাদের কর্তব্য। আমাদের নিকট মুতয়া বিয়ে চিরতরে নিষিদ্ধ হওয়া অকাট্যভাবে প্রমাণিত। কতিপয় সাহাবি কর্তৃক এর বিরোধিতার কারণে এর নিষিদ্ধ হওয়া ব্যাহত হয়না। এটি নিষিদ্ধ বলে মেনে নিতে ও তা বাস্তবায়িত করতে ওযর আপত্তি দেখানোরও সুযোগ নেই, কেননা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবি এটি হারাম ও নিষিদ্ধ বলে মেনে নিয়েছেন, তদনুসারে আমল করেছেন এবং তা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। এমনকি ইবনে মাজার বর্ণনা অনুযায়ী ইবনে উমর রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. আমাদেরকে তিনবার মুতয়া বিয়ের অনুমতি দিয়েছিলেন, তারপর তা নিষিদ্ধ করেন। আল্লাহর কসম, কোনো বিবাহিত ব্যক্তি মুতয়া বিয়ে করেছে জানলেই আমি তাকে পাথর মেরে হত্যার শাস্তি দিয়েছি।" আবু হুরায়রা রা. রসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেন, তালাক, ইদ্দত ও উত্তরাধিকার এই তিন জিনিস-এর অনুপস্থিতি মুতয়া বিয়েকে বাতিল করেছে। -দার কুতনি।

১৩. তালাক দেয়ার নিয়ত লুকিয়ে রেখে যে বিয়ে করা হয়

ফকীহগণ এই মর্মে একমত যে, কোনো ব্যক্তি যদি বিয়ের মেয়াদ ব্যক্ত না করে বিয়ে করে, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর তাকে তালাক দেয়ার নিয়ত পোষণ করে, অথবা যে শহরে সে বর্তমানে অবস্থান করছে, সেখানে প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ার পর তাকে তালাক দিয়ে চলে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে, তবে এই বিয়ে শুদ্ধ হবে।

ইমাম আওযায়ীর মতে, এটি এক ধরনের মুতয়া বিয়ে এবং অবৈধ।

এ বিষয়ে শেখ রশীদ রেযা তাফসীর আল মানারে মন্তব্য করেন : "প্রাচীন ও আধুনিক আলেমদের পক্ষ থেকে মুতয়া বিয়ের বিরুদ্ধে এত কঠোর অবস্থান গ্রহণ করা হয়েছে যে, তালাক দেয়ার ইচ্ছা নিয়ে বিয়ে করাকেও তা অবৈধ সাব্যস্ত করে, যদিও ফকীহগণ বলে থাকেন যে, স্বামী নির্দিষ্ট মেয়াদ মনে মনে নির্ধারিত করে ও বিয়ের প্রস্তাবে তা উল্লেখ না করে বিয়ে করলে সে বিয়ে বৈধ হবে। তবে স্বামী কর্তৃক এই মেয়াদকে গোপন রাখা একটা প্রতারণা ও ধোঁকা গণ্য হবে। এ ধরনের বিয়ে মুতয়া বিয়ের চেয়েও অনভিপ্রেত ও বাতিলযোগ্য যদিও তা স্বামী, স্ত্রী ও স্ত্রীর অভিভাবকদের সম্মতি ও সমঝোতার মাধ্যমে হয়। কিন্তু মুতয়া বিয়েতে মানব সমাজের সার্বক্ষণিক মর্যাদাপূর্ণ সম্পর্ক দাম্পত্য বন্ধনকে ছিনিমিনি খেলার বিষয়ে পরিণত করা হয়। একে ভোগবাদী ও ভোগবাদিণীদের হাতে প্রতিনিয়ত হস্তান্তরযোগ্য ভোগ্য পণ্যে পরিণত করা হয় এবং এ থেকে আরো অনেক অনভিপ্রেত কর্মকাণ্ডের উদ্ভব হয়। তথাপি মনে মনে মেয়াদ লুকিয়ে রেখে প্রতারণার আশ্রয় নেয়াতে যে ক্ষতি সাধিত হয়, তা মুতয়া বিয়েতে হয়না। আর যে বিয়েতে প্রকাশ্যে নির্দিষ্ট মেয়াদের শর্তারোপ করা হয়না, অথচ তা উহ্য থাকে, তা প্রতারণামূলক ও প্রবঞ্চনামূলক

এবং তা শত্রুতা ও আস্থাহীনতাসহ নানা অনভিপ্রেত জিনিসের জন্ম দিয়ে থাকে। এমনকি যে সকল সৎ মানুষ আন্তরিকতার সাথে কামনা করে যে, বিয়ের দ্বারা তার ঈপ্সিত যথার্থ সুফল তথা স্বামী ও স্ত্রীর সতীত্ব, পরস্পরের জন্য একনিষ্ঠতা এবং একটি সৎ মুসলিম পরিবার গঠনে উভয়ের সহযোগিতা অর্জিত হোক, তাদের এ বিয়ের প্রতি আস্থা থাকেনা।"

১৪. হিল্লা বিয়ে

যে মহিলা স্বামী কর্তৃক তিন তালাক প্রাপ্ত হয়েছে, তাকে তার ইদ্দতের পর বিয়ে করা ও সহবাসের পর তাকে তালাক দেয়া, যাতে তালাকদাতা প্রাক্তন স্বামীর জন্য তাকে বিয়ে করা বৈধ হয়- এই ধরনের বিয়েকে হিল্লা বিয়ে বলা হয়।

হিল্লা বিয়ে হারাম ও কবীরা গুনাহ : এ ধরনের বিয়ে হারাম, কবীরা গুনাহ, ভয়ঙ্কর অশ্লীল ও বেহায়াপনার কাজ এবং এর কর্তাকে আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "যে ব্যক্তি হিল্লা বিয়ে করে এবং যার জন্য করে উভয়ের উপর আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন। -আহমদ সহীহ সনদ সহকারে।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেছেন : যে ব্যক্তি কারো জন্যে হালাল করার উদ্দেশ্যে বিয়ে করে এবং যার জন্য করে, উভয়কে রসূলুল্লাহ সা. অভিসম্পাত করেছেন। -তিরমিযি।

সাহাবিগণের মধ্য থেকে উমর ইবনুল খাত্তাব, উসমান বিন আফফান, আব্দুল্লাহ বিন উমর প্রমুখ ও ফকীহ এবং তাবেয়ীগণ এ হাদিস অনুসারেই আমল করেছেন।

উকবা ইবনে আমের রা. থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আমি কি তোমাদেরকে বলবো ভাড়াটে পাঁঠা কে? লোকেরা বললো, হে রসূলুল্লাহ সা. বলুন। তিনি বললেন : যে ব্যক্তি কারো জন্যে হালাল করার উদ্দেশ্যে কোনো মহিলাকে বিয়ে করে। যে ব্যক্তি হালাল করার উদ্দেশ্যে বিয়ে করে এবং যার জন্য করে, উভয়কে আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন। -ইবনে মাজাহ, হাকেম।

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. কে হালাল করার উদ্দেশ্যে বিয়ে করে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : না। কেবল আগ্রহের সাথে নিজের জন্যে যে বিয়ে করা হবে সেটাই বৈধ। ধোঁকাবাজি চলবেনা, আল্লাহর কিতাবের সাথে নিজের জন্যে তামাশাও করা চলবেনা। যতোক্ষণ স্ত্রী স্বামীকে উপভোগ করবে ততোক্ষণ (দাম্পত্য) বন্ধন বহাল থাকবে। -আবু ইসহাক। উমর রা. বলেছেন : যে ব্যক্তি হালাল করার উদ্দেশ্যে বিয়ে করে ও যার জন্য বিয়ে করে, আমার কাছে আনা হলে উভয়কে আমি রজম (পাথর মেরে হত্যা) করবো।" এ ব্যাপারে তার ছেলের কাছে ব্যাখ্যা চাইলে তিনি বললেন : তারা উভয়ে ব্যভিচারী। -ইবনুল মুনযির, ইবনে আবি শায়রা, আব্দুর রাজ্জাক। এক ব্যক্তি ইবনে উমর রা. কে জিজ্ঞাসা করলো : জনৈকা মহিলাকে আমি বিয়ে করেছি, যাতে তাকে তার সাবেক স্বামীর জন্য হালাল করে দেয়া যায়। এ ব্যাপারে সেই স্বামী আমাকে কোনো আদেশ দেয়নি, এমনকি সে জানেওনা। এ সম্পর্কে আপনার মত কি? ইবনে উমর রা. তাকে বললেন, না এটা চলবেনা। একমাত্র সাগ্রহে নিজের জন্যে বিয়ে করতে হবে। তারপর ভালো লাগলে তাকে রেখে দেবে, না হলে ছেড়ে দেবে। রসূলুল্লাহ সা.-এর আমলে এ ধরনের বিয়েকে আমরা ব্যভিচার গণ্য করতাম। তারা যদি একত্রে

বিশ বছরও কাটায় এবং জানা যায় যে, সে তাকে হালাল করতে চায়, তবু তারা উভয়ে ব্যভিচারী থেকে যাবে।

হিল্লা বিয়ে সম্পর্কে শরিয়তের বিধান : উল্লিখিত সুস্পষ্ট হাদিসসমূহ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ ধরনের বিয়েকে বাতিল ও অবৈধ প্রতিপন্ন করছে। অন্যান্য বাতিল চুক্তির ফলাফলের ন্যায় এই বিয়ের ফলাফলও অগ্রাহ্য হবে। এ দ্বারা উক্ত মহিলা তার প্রাক্তন স্বামীর জন্য বৈধ সাব্যস্ত হবেনা। কেননা শরিয়তে অবৈধ কাজের উপরই অভিসম্পাত হয়ে থাকে। বিয়ের সময় যদি হালাল করার উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করা নাও হয়, তথাপি হালাল করার উদ্দেশ্য যতোক্ষণ পোষণ করা হয়, ততোক্ষণ বিয়ে অবৈধই থাকবে এবং তা স্ত্রীকে প্রাক্তন স্বামীর জন্য হালাল করবেনা। কেননা নিয়ত ও উদ্দেশ্যই প্রকৃত বিবেচ্য বিষয় চাই তা ব্যক্ত করা হোক বা না হোক।

ইবনুল কাইয়েমের অভিমত : ফকীহ, আহলে হাদিস ও আহলে মদিনার নিকট হালাল করার উদ্দেশ্য মনে মনে পোষণ করা ও ব্যক্ত করাতে কোনো পার্থক্য নেই। কেননা সকল চুক্তির ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যই বিবেচ্য ও গ্রহণযোগ্য। আর নিয়তের উপরই সকল আমল নির্ভরশীল। যে শর্তের উপর চুক্তি সম্পাদনকারী উভয় পক্ষ একমত, তা ব্যক্ত না করলেও ব্যক্ত কৃত বিষয়ের পর্যায়ভুক্ত। কেননা যে শব্দ দ্বারা কোনো উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়, সে শব্দের নিজস্ব কোনো পৃথক সারবত্তা নেই, বরং যে উদ্দেশ্য মনের মধ্যে নিহিত রয়েছে, তা ব্যক্ত করার জন্যই শব্দের উৎপত্তি ও উচ্চারণ। তাই উদ্দেশ্য যখন জানা, তখন আর শব্দের কোনো গুরুত্ব নেই। উদ্দেশ্য যখন বাস্তবায়িত হয়েছে, তখন তার উপর তার বিধি কার্যকর হবেই চাই শব্দ দ্বারা তা ব্যক্ত করা হোক বা না হোক। এ বিয়ে দ্বারা স্ত্রী তার প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে একথা কিভাবে বলা যাবে? দাম্পত্য জীবন যাপনে তার ইচ্ছাও নেই। আর বিয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য যেন সন্তান প্রজনন ও সন্তান পালন, তাও বিদ্যমান নেই। এই বাহ্যিক বিয়ে একটা প্রতারণা ও মিথ্যাচার। আল্লাহ তার দীনে এ বিয়ের অনুমতি কারো জন্যই দেননি, এ বিয়েকে তিনি শরিয়তের আওতাভুক্ত করেননি। আর এ বিয়েতে যে ক্ষতিকর দিকগুলো নিহিত রয়েছে, তা কারোই অজানা নয়।

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার অভিমত : আল্লাহর দীন এত পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ যে, একজন নারীকে হারাম ঘোষণা করবে আর তাকে হালাল করার জন্য একটা পাঠা ধার করে আনবে। সেই পাঠাকে সে বিয়ে দিতে ও আত্মীয় কুটুম্ব বানাতেও আগ্রহী হবেনা। তাকে নারীর স্থায়ী জীবন সঙ্গী বানানোও তার লক্ষ্য হবেনা। বরং সে শুধু নারীকে ভোগ করবে, আর তাতেই সে আরেক পুরুষের জন্য হালাল হয়ে যাবে। আল্লাহর দীন এত হীন ও নিচ নয় যে, এ ধরনের একটা ব্যবস্থাকে সে প্রশ্রয় দেবে ও বৈধ করবে। এটা তো সুস্পষ্ট যেনা ব্যভিচার। আল্লাহর রসূল সা.-এর সাহাবিগণ একে হারাম বলে আখ্যায়িত করেছেন। একটা হারাম কাজ কিভাবে কাউকে হালাল করতে পারে? কিভাবে একটা নোংরা কাজ কোনো জিনিসকে পবিত্র করতে পারে? যার বক্ষকে আল্লাহ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং যার অন্তরকে ঈমানের আলোকে আলোকিত করেছেন, তার এ কথা বুঝতে মোটেই কষ্ট হওয়ার কথা নয় যে, এটা একটা জঘন্যতম পাপাচার, যা একজন বুদ্ধিমান ও রুচিবান মানুষের বিবেক কল্পনাও করতে পারেনা, নবীদের আনিত পূতপবিত্র শরিয়ত, বিশেষত শ্রেষ্ঠতম শরিয়ত কর্তৃক এর অনুমতি দেয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না।

বস্তুত এটাই যথার্থ সত্য কথা। ইমাম মালেক, আহমদ, ছাওরী, হাসান, নাখয়ী, কাতাদা, লাইছ ও ইবনুল মুবাবক প্রমুখ ফকীহ এই মতই পোষণ করেছেন। অন্যদের মত এই যে, বিয়ের আকদে যদি নির্দিষ্ট সময়ের পরে তালাক দিয়ে দেয়ার শর্তের উল্লেখ না থাকে, তাহলে এ বিয়ে বৈধ হবে। কেননা বাহ্যিক অবস্থার আলোকেই বিচার ফায়সালা হয়ে থাকে, উদ্দেশ্য কী ও অন্তরে কি লুকানো আছে, তার ভিত্তিতে নয়। তাদের মতে কোনো যুক্তিতে নিয়ত বিচার্য বিষয় নয়।

ইমাম শাফেয়ীর অভিমত : হালালকারী যদি হালাল করার উদ্দেশ্যেই বিয়ে করে অতপর তালাক দিয়ে দেয়, তবে তার বিয়ে অবৈধ হবে। কিন্তু সে যদি বিয়ের আকদে এ ধরনের শর্ত আরোপ না করে তবে তার আকদ বৈধ।

ইমাম আবু হানিফার অভিমত : আকদ সম্পাদনের সময় যদি এরূপ শর্ত আরোপ করা হয় যে, সে প্রাক্তন স্বামীর জন্য তাকে হালাল করবে, তবে প্রাক্তন স্বামীর জন্য হালাল হবে। কিন্তু এ বিয়ে মাকরূহ হবে। কেননা বিয়ের আকদ অবৈধ শর্তের কারণে বাতিল বা অকার্যকর হয় না। তাই দ্বিতীয় স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পর অথবা স্বামীর মৃত্যুর পর ও তার ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর উক্ত স্ত্রী তার প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফের মতে, এ ধরনের আকদ অকার্যকর। কেননা এটা একটা অস্থায়ী ও সাময়িক বিয়ে। ইমাম মুহাম্মদ মনে করেন, দ্বিতীয় বিয়ে শুদ্ধ, কিন্তু তা প্রথম স্বামীর জন্য স্ত্রীকে হালাল করবে না।

কোন্ বিয়ে দ্বারা তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী প্রথম স্বামীর জন্য বৈধ হয় : যখন স্বামী তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়, তখন সেই স্বামীর জন্য ঐ স্ত্রীকে ঘরে ফিরিয়ে আনা বৈধ হবে কেবল তখনই যখন ঐ স্ত্রী ইদ্দত শেষে অন্য স্বামীকে বৈধভাবে বিয়ে করবে-প্রাক্তন স্বামীর জন্য হালাল হবার উদ্দেশ্যে নয়। দ্বিতীয় স্বামী যখন স্বাভাবিক ও স্বতস্ফূর্তভাবে বিয়ে করবে, তার সাথে যথাযথভাবে দাম্পত্য জীবন যাপন করবে, সহবাস করবে, অতপর তালাক বা মৃত্যুর মধ্য দিয়ে উভয়ের বিচ্ছেদ ঘটবে। তখন স্ত্রী ইদ্দত পূর্ণ হবার পর প্রথম স্বামীর জন্য তাকে পুনরায় বিয়ে করা হালাল হবে।

ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, বুখারি ও মুসলিম আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, রিফায়া কারযীর স্ত্রী রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট এলো এবং বললো : আমি রিফায়ার কাছে ছিলাম। সে আমাকে তালাক দিয়েছে। অতপর তিন তালাক দিয়েছে। এরপর আমাকে আব্দুর রহমান ইবনে যুবাইর বিয়ে করেছে। কিন্তু তার কাছে কাপড়ের পাড়ের মতো ব্যতিত আর কিছু নেই (অর্থাৎ তার পুরুষাঙ্গ শিথিল)। একথা শুনে রসূলুল্লাহ সা. মুচকি হেসে বললেন : তুমি কি রিফায়ার কাছে ফিরে যেতে চাও? -- না, নতুন স্বামীর সাথে সহবাস না করা পর্যন্ত তা পারবে না।[১]

এ জন্য উভয়ের জননেন্দ্রিয়ের মিলিত হওয়া যথেষ্ট। কেননা এতেই ব্যভিচারের শাস্তি ও গোসল অবধারিত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গেই নাযিল হয় সূরা বাকারার এ আয়াত :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللّٰهِ.

---

১. আলেমগণ এ দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, নিজেকে হালাল করার ব্যাপারে স্ত্রীর নিয়তের কানাকড়িও মূল্য নেই। সে বা তার অভিভাবক যতোই হালাল করার ইচ্ছা পোষণ করুক, দ্বিতীয় স্বামীর

অর্থ : এরপর যদি স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেয় (অর্থাৎ দুই তালাকের পর) তাহলে ঐ স্ত্রী আর তার জন্য হালাল হবেনা, যতোক্ষণ পর্যন্ত সে অন্য স্বামীর সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ না হয়। সেই স্বামী যদি তাকে তালাক দেয়, তাহলে তারা দু'জনে পুনরায় বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে কোনো বাধা নেই। যদি তারা মনে করে যে, আল্লাহর সীমা রক্ষা করতে পারবে।" সুতরাং স্ত্রী প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে কেবল তিন শর্তে : ১. দ্বিতীয় বিয়ে শুদ্ধ হতে হবে ২. দ্বিতীয় বিয়ে স্বতস্ফূর্তভাবে হতে হবে।[২] ৩. আকদের পর দ্বিতীয় স্বামী তার সাথে সহবাস করবে ও স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন যাপন করবে।

হিল্লা বিয়ে নিষিদ্ধ হওয়ার যৌক্তিকতা : মুফাসসির ও আলেমগণ এ প্রসংগে বলেছেন : যখন স্বামী জানতে পারবে যে, তিনবার তালাক দেয়ার পর স্ত্রী তার জন্য আর হালাল হয়না, যতোক্ষণ না সে অন্য স্বামীকে বিয়ে করে ও তার সাথে যথারীতি সহবাসসহ দাম্পত্য জীবন যাপন করে, তখন সে সাবধান হয়ে যাবে। কেননা নিজের স্ত্রী অন্য স্বামীর ঘর করে আবার তার কাছে আসবে- এটা কোনো পুরুষের আত্মমর্যাদাবোধের কাছে গ্রহণযোগ্য ও সহনীয় হয়না। বিশেষতঃ যখন সেই ভিন্ন স্বামী প্রথম স্বামীর শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী হয়।

তাফসীর আল-মানারের লেখক (দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৯২ পৃ:) বলেন : "যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পর উপলব্ধি করে যে, তার নিকট তার মুখাপেক্ষিতা রয়েছে, তাই সে অনুতপ্ত হয়ে তালাক প্রত্যাহার করে ও তাকে ফিরিয়ে আনে। অতপর পুনরায় ঐ স্ত্রীর সাহচর্য তার কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে এবং পুনরায় তাকে তালাক দেয়, তারপর পুনরায় তার কাছে প্রতিভাত হয় যে, ঐ স্ত্রী তার কাছে অগ্রগণ্য এবং তাকে ছাড়া তার চলবেনা। তাই সে দ্বিতীয়বার তালাক প্রত্যাহার করে তাকে ফিরিয়ে আনে, তার এই স্ত্রী সম্পর্কে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা জন্মে ও ঐ স্ত্রী তার কাছে পরীক্ষিত হয়ে যায়। কেননা প্রথমবারের তালাক হয়তো বা সে ভালো করে ভেবে চিন্তে দেয়নি এবং ঐ স্ত্রীর প্রতি তার প্রয়োজন ও মুখাপেক্ষিতা সম্পর্কে হয়তো তখনো তার যথাযথ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়নি। কিন্তু দ্বিতীয় তালাক সে ধরনের হবেনা। কেননা প্রথমবারে যা ঘটেছে তার উপর অনুতাপ ও অনুশোচনা এবং সেটি অন্যায় ও ভুল হয়েছে এই মর্মে পরিপূর্ণ উপলব্ধি ব্যতিত তা সংঘটিত হয়নি। এজন্যই আমরা বলেছি যে, এ দ্বারা তার পরীক্ষা পূর্ণতা লাভ করে। তাই দ্বিতীয় তালাকের পরও যখন সে তা প্রত্যাহার করে, তখন সেটা ঐ স্ত্রীকে বর্জন করার পরিবর্তে তাকে বহাল রাখার অগ্রাধিকারই প্রতিষ্ঠিত করে। পরীক্ষা পূর্ণতা লাভের পর ঐ স্ত্রীকে ত্যাগ করা চলেনা বুঝতে পারার পরও সে তাকে আবার ত্যাগ করার দিকে ঝুঁকে পড়বে এটা ধারণা করা যায়না। তথাপি সে যদি পুনরায় সে দিকে ঝোঁকে ও তৃতীয় তালাক দেয়, তবে বুঝতে হবে তার বুদ্ধিমত্তা ও শিষ্টাচার অসম্পূর্ণ। কাজেই স্ত্রীকে নিয়ে সে ছিনিমিনি খেলবে, যখন চাইবে ছুড়ে ফেলবে এবং যখন চাইবে ফিরিয়ে আনবে- এ সুযোগ তাকে আর দেয়া যায়না এবং সে তখন আর স্ত্রীকে জর দাবার গুটি বানিয়ে

ইচ্ছা না থাকলে তাতে কোনো কাজ হবেনা। অনুরূপ প্রথম স্বামীরও তাতে কোনো হাত নেই। কেননা সে এখন তৃতীয় ব্যক্তি ও পরপুরুষ। সে তার সাবেক স্ত্রীর হিল্লা বিয়ের ওজুহাতে তাকে পুনরায় বিয়ে করলে সে হবে ব্যভিচারী ও অভিশপ্ত।

২. কেননা অশুদ্ধ বিয়ে তিন তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে হালাল করেনা। দ্বিতীয় স্বামী সহবাসের পর স্ত্রীকে তালাক দেবে এরূপ শর্তে বিয়ে দিলে সেই বিয়ে অবৈধ ও অশুদ্ধ।

রাখার যোগ্যতা রাখেনা। বরং এখন স্ত্রীর সাথে তার পুরো বিচ্ছেদ ঘটে যাক এবং তার নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে যাক এটাই যুক্তিসঙ্গত প্রতীয়মান হয়। এরপর তারা দু'জনে মিলে মিশে জীবন যাপন করতে পারবে এবং আল্লাহর সীমানা রক্ষা করতে পারবে, তার আর নিশ্চয়তা নেই।

এরপর যদি কাকতালীয়ভাবে এমন ঘটনা ঘটে যে, স্ত্রী স্বেচ্ছায় অন্য কোনো পুরুষকে বিয়ে করলো এবং সেই স্বামী কাকতালীয়ভাবে তাকে তালাক দিলো বা তাকে রেখে মারা গেলো, অতপর তার প্রতি পুনরায় প্রথম স্বামী আগ্রহী হলো ও তাকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক হলো, তবে যেহেতু প্রথম স্বামী ইতিমধ্যে জানতে পেরেছে যে, তার স্ত্রী অন্য স্বামীর ঘর করে এসেছে এবং সে তার কাছে ফিরতে রাযী হয়েছে, সেহেতু এবার তারা এক সাথে মিলে মিশে থাকতে পারবে এবং আল্লাহর সীমানা রক্ষা করতে পারবে এমন আশা খুবই জোরদার হয়। তাই স্ত্রী ইদ্দত পালনের পর তার জন্য হালাল হয়।

১৫. আকদের সাথে যুক্ত রকমারি শর্ত

আকদ বা বিবাহ বন্ধনের সাথে যখন কোনো শর্ত যুক্ত করা হয়, তখন দেখতে হবে, সেই শর্ত উক্ত আকদের সাথে সংগতিপূর্ণ ও তার চাহিদা মোতাবেক কিনা বা তার পরিপন্থী ও সাংঘর্ষিক কিনা, অথবা স্ত্রীর জন্য উপকারী কিনা, অথবা শরিয়তে নিষিদ্ধ কিনা। এর যেটাই হোক, তার জন্য স্বতন্ত্র বিধি রয়েছে, যা আলাদা আলাদাভাবে নিম্নে উল্লেখ করা যাচ্ছে :

১. যে সকল শর্ত পালন করা জরুরি : কিছু শর্ত এমন রয়েছে, যা পালন করা অপরিহার্য। সেগুলো বিয়ের আকদেরই দাবি এবং তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যস্বরূপ। সেসব শর্ত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কোনো হুকুম লঙ্ঘন বা পরিবর্তন করেনা। যেমন : উভয়ে উভয়কে প্রচলিত রীতি প্রথা মোতাবেক দাম্পত্য সাহচর্য দান ও পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা করবে, স্বামী স্ত্রীর খোরপোষের সামর্থ মতো ব্যয় নির্বাহ করবে এবং তার জন্য যথাবিহিত আবাসনের ব্যবস্থা করবে। স্ত্রীর কোনো প্রাপ্য অধিকার প্রদানে স্বামী বিরত থাকবেনা। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরে তার অনুমতি ছাড়া কাউকে প্রবেশের অনুমতি দেবেনা এবং তার অর্থ সম্পদে তার সম্মতি ছাড়া কোনো ধরনের ব্যয় ব্যবহার বা রদবদল ঘটাবেনা ইত্যাদি।

২. যে সকল শর্ত মানা জরুরি নয় : কিছু শর্ত এমনও রয়েছে, যা পালন করা জরুরি নয়- যদিও তাতে আকদ বিশুদ্ধ থাকবে। যেমন আকদের দাবির পরিপন্থী কোনো শর্ত, যথা : খোরপোষ বহন না করা, সহবাস বর্জন করা, মোহরানা না দেয়া, জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা। স্ত্রীর স্বামীর ভরণ পোষণ করতে হবে বা কোনো জিনিস তাকে দিতে হবে, কিংবা সপ্তাহে স্বামী তার কাছে মাত্র এক রাত থাকবে, কিংবা শুধু দিনে থাকবে- এই মর্মে শর্ত আরোপ করা। এসব শর্ত আপনা আপনিই বাতিল হয়ে যাবে। কেননা এগুলো আকদের পরিপন্থী। তাছাড়া এসব শর্ত আরোপ করার কারণে এমন কিছু অধিকার আকদ সম্পন্ন হবার আগেই রহিত করা হয়, যা কেবল আকদ দ্বারাই প্রাপ্য হয়। তাই এসব শর্ত শুদ্ধ হয়না। তবে আকদ শুদ্ধই থাকবে। কেননা এসব শর্ত আকদের অতিরিক্ত একটা জিনিসের সাথে সংশ্লিষ্ট। সে জিনিসের উল্লেখ করা বিয়ের জন্য শর্ত নয়, আর তা না জানাও ক্ষতিকর নয়। তাই আকদ বাতিল হবেনা। যেমন আকদে যদি মোহরানা স্বরূপ এমন জিনিস দেয়ার শর্ত আরোপ করা হয় যা হারাম। তবে সেই শর্ত বাতিল হবে এবং বিয়ে শুদ্ধ থাকবে। যেহেতু

বিয়ের মোহরানা অজানা থাকলেও বিয়ের আকদ বৈধ, সেহেতু যে কোনো অবৈধ শর্ত আরোপ সত্ত্বেও বিয়ে বৈধ হবে।

৩. যে সকল শর্ত স্ত্রীর জন্য উপকারী : কিছু কিছু শর্ত এমনও থাকতে পারে যা স্ত্রীর জন্য উপকারী ও তার স্বার্থ রক্ষাকারী। যেমন স্বামী তাকে এমন প্রতিশ্রুতি দিলো যে, সে তাকে তার পিতৃগৃহ বা পিতৃশহর থেকে বের করে অন্যত্র নিয়ে যাবেনা। বা তাকে নিজের সাথে সফরে নেবেনা। কিংবা তার উপস্থিতিতে অন্য বিয়ে করবেনা ইত্যাদি। আলেমদের কেউ কেউ মনে করেন, এ ধরনের শর্ত আরোপ সত্ত্বেও বিয়ে বৈধ থাকবে, শর্ত বাতিল গণ্য হবে এবং স্বামী তা মানতে বাধ্য থাকবেনা। আবার কেউ কেউ মনে করেন, স্ত্রীকে প্রতিশ্রুতির আকারে দেয়া শর্ত পূরণ করা বাধ্যতামূলক। পূরণ না করলে বিয়ে বাতিল করার অধিকার স্ত্রীর থাকবে। প্রথমোক্ত মতটি আবু হানিফা, শাফেয়ী ও বহু সংখ্যক আলেমের। তাদের প্রমাণ হলো :

১. রসূল সা. বলেছেন : "মুসলমানরা নিজেদের আরোপিত শর্ত পালনে বাধ্য। তবে যে শর্ত হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল করে, তা নয়।" এই শর্ত হালালকে অর্থাৎ বিয়ে করা, অতিরিক্ত স্ত্রী গ্রহণ করা ও তাকে নিয়ে সফর যাওয়াকে হারাম তথা নিষিদ্ধ করে। অথচ এই কাজগুলো সবই হালাল ও বৈধ।

২. রসূলুল্লাহ সা. আরো বলেছেন : আল্লাহর কিতাবে নেই, এমন যে কোনো শর্ত বাতিল, চাই এমন শর্ত একশোটাই হোক না কেনো।

আবু হানিফা প্রমুখ বলেছেন : উল্লিখিত শর্ত আল্লাহর কিতাবে নেই। শরিয়তের দৃষ্টিতে এ শর্ত কাংখিত নয়।

৩. তারা বলেন : এসব শর্ত আকদের জন্য উপকারীও নয় এবং তার জন্য কাঙ্ক্ষিতও নয়।

আর দ্বিতীয় মতটি উমর ইবনুল খাত্তাব রা.। সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, মুয়াবিয়া, আমর ইবনুল আ'স, উমর ইবনে আবদুল আযীয, জাবের বিন যায়দ, তাউস, আওযায়ী, ইসহাক ও হাম্বলী মাযহাবের। তাদের প্রমাণাদি নিম্নরূপ :

১. আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

হে মুমিনগণ, তোমরা চুক্তিসমূহ পালন করো।" (সূরা মায়েদা, আয়াত-১)

২. রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : মুসলমানরা যেরূপ শর্ত আরোপ করবে, সেরূপই হবে তাদের আচরণ।'

৩. বুখারি, মুসলিম প্রমুখ উকবা বিন আমের রা. থেকে বর্ণনা করেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে সকল শর্ত দ্বারা তোমরা বিয়ের আকদ সম্পাদন করো, সে সকল শর্ত পালন করা সর্বাধিক জরুরি।" কোনো বিয়ের শর্ত নিয়ে সর্বাধিক সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

৪. আছরাম রা. থেকে বর্ণিত : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বাসস্থান দেয়ার বিনিময়ে (অর্থাৎ মোহরানা হিসেবে বাসস্থান দেয়ার বিনিময়ে) বিয়ে করলো। পরে স্ত্রীকে সেই বাড়ি থেকে স্থানান্তরিত করার ইচ্ছা করলো। এতে স্ত্রীর পক্ষের লোকেরা উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর নিকট অভিযোগ নিয়ে হাযির হলো। উমর রা. বললেন : তাকে যে শর্ত দেয়া হয়েছে, তা (অর্থাৎ বাসস্থান) তার প্রাপ্য। "শর্ত পালনই প্রাপ্য দেয়ার নিশ্চয়তা দেয়।"

৫. যেহেতু এটা এমন শর্ত, যা স্ত্রীর জন্য উপকারী, তার স্বার্থের অনুকূল এবং বিয়ের

উদ্দেশ্য সিদ্ধির অন্তরায় নয়, তাই এ ধরনের শর্ত পালন করা বাধ্যতামূলক, যেমন বর্ধিত মোহর দেয়া বাধ্যতামূলক।

ইবনে কুদামা এই মতটিকে অগ্রগণ্য আখ্যায়িত করে ও প্রথমোক্ত মতকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন : আমরা যে সকল সাহাবির নামোল্লেখ করেছি, তাদের বক্তব্যকে তাদের সমকালীন কেউ খণ্ডন করেছে বলে আমাদের জানা নেই। কাজেই এর উপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর রসূল সা. যে বলেছেন : "আল্লাহর কিতাবে নেই এমন যে কোনো শর্ত বাতিল, চাই এ রকম শর্ত শতটিই হোক না কেন।" এর অর্থ হলো, আল্লাহর শরিয়তে যে শর্ত নেই, তা বাতিল। অথচ এ শর্ত শরিয়ত সম্মত এবং এর শরিয়ত সম্মত হওয়ার প্রমাণ আমরা উল্লেখ করেছি। এখন যখন এর শরিয়ত সম্মত হওয়া নিয়ে বিতর্ক, তখন যারা বলেন, এটি শরিয়ত সম্মত নয়, তাদেরকে এর প্রমাণ দর্শাতে হবে।

তারা বলেন : 'এ শর্ত হালালকে হারাম করে।' কিন্তু আমাদের বক্তব্য হলো, এ শর্ত হালালকে হারাম করেনা। কেবল স্বামী শর্ত পালন না করলে স্ত্রীর জন্য বিয়ে বাতিল করার অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। তারা বলেন : এ শর্ত বিয়ের অনুকূল নয়। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হলো : আমরা এটা স্বীকার করিনা। কেননা এটা তো স্ত্রীর স্বার্থের অনুকূল। আর যে জিনিস চুক্তি সম্পাদনকারীর স্বার্থের অনুকূল, তা চুক্তির অনুকূল বলেই বিবেচিত হবে।

ইবনে রুশদ বিদায়াতুল মুজতাহিদ দ্বিতীয় খণ্ডের ৫৫ পৃষ্ঠায় বলেছেন : তাদের মতভেদের কারণ হলো, একটা ব্যাপক অর্থবোধক উক্তি দ্বারা নির্দিষ্ট অর্থবোধক উক্তির বিরোধিতা বা খণ্ডন, ব্যাপক অর্থবোধক উক্তি হলো আয়েশা রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদিস। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে শর্ত দ্বারা তোমরা বিয়ের আকদ সম্পাদন করো, সে শর্ত পালন করা সর্বাধিক জরুরি।" উভয় হাদিস সহীহ এবং বুখারি ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত।

তবে উসুলে ফেকাহ শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞদের নিকট যে মূলনীতিটি প্রসিদ্ধ তা হলো, নির্দিষ্ট অর্থবোধক উক্তি দ্বারা ব্যাপক অর্থবোধক উক্তির ফায়সালা করা, অর্থাৎ স্বীকৃত শর্ত পালন করা বাধ্যতামূলক। ইবনে তাইমিয়া বলেছেন : বুদ্ধিমান লোকদের লক্ষ্য যখন বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদনের উপর কেন্দ্রীভূত হয় এবং তা যখন সদুদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়, তখন তার কোনো অংশই বৃথা যাবেনা। যেমন বিনিময় চুক্তির মেয়াদ এবং স্বামী স্ত্রীর যে কোনো একজনের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ পেশার শর্ত আরোপ। আর শর্ত আরোপ করলে যে অর্থ বুঝায়, শর্ত আরোপ না করলে সে অর্থ না-ও বুঝাতে পারে। এমনকি শর্ত আরোপ ব্যতিত তার বিপরীত অর্থও বুঝাতে পারে।

৪. **নিষিদ্ধ শর্তাবলী :** কিছু কিছু শর্ত শরিয়তে নিষিদ্ধ এবং তা পালন করা হারাম। এর একটি হলো, বিয়ের সময় কনে কর্তৃক তার সতিনকে তালাক দেয়ার শর্ত আরোপ করা। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি যেখানে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে, সেখানে অপর ব্যক্তি কর্তৃক বিয়ের প্রস্তাব দিতে অথবা একজন যে জিনিস ক্রয়ের আগ্রহ প্রকাশ করেছে, সেই জিনিস ক্রয়ের জন্য আরেক জনের আগ্রহ ব্যক্ত করতে রসূলুল্লাহ সা. নিষেধ করেছেন। তিনি আরো নিষেধ করেছেন যেনো কোনো নারী কোনো পুরুষের কাছে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার আবদার না করে, যাতে ঐ স্ত্রীর খোরপোষ নিজের কুক্ষিগত করতে পারে। তার জানা উচিত যে, তার জীবিকার ভার আল্লাহর উপর ন্যস্ত।" -বুখারি ও মুসলিম। অন্য হাদিসে বলা হয়েছে তালাক দেয়ার শর্ত আরোপ করতে নিষেধ করেছেন"।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : এক মহিলার তালাকের বিনিময়ে অপর মহিলার বিয়ে হওয়া বৈধ নয়। -আহমদ।

সুতরাং এই নিষেধাজ্ঞা দ্বারা নিষিদ্ধ কাজটি অবৈধ প্রমাণিত হলো। কেননা এক্ষেত্রে কনে বরের উপর তার সতিনের সাথে তার বিদ্যমান বৈবাহিক সম্পর্ক বাতিল করা এবং স্বামী ও স্ত্রীর অধিকার বিনষ্ট করার শর্ত আরোপ করেছে। তাই শর্ত আরোপকারিণীর প্রস্তাবিত শর্তযুক্ত বিয়ে শুদ্ধ হয়নি।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, বিদ্যমান স্ত্রীকে তালাক দেয়ার শর্ত আরোপ করা ও পরবর্তীতে আর বিয়ে না করার শর্ত আরোপ করার পার্থক্য কোথায়? কেনইবা পরে বিয়ে না করার শর্ত আরোপকে বৈধ ও বিদ্যমান স্ত্রীকে তালাক দেয়ার শর্ত আরোপকে অবৈধ বলা হচ্ছে?

জবাবে ইবনুল কাইয়েম বলেছেন : বিদ্যমান স্ত্রীকে তালাক দেয়ার শর্ত আরোপ করাতে উক্ত স্ত্রীর ক্ষতি সাধন করা, তার মনে কষ্ট দেয়া, তার সংসার ভেঙ্গে দেয়া এবং তার শত্রুদেরকে বিদ্রুপ করার সুযোগ করে দেয়ার মাধ্যমে যে জুলুম করা হয়, অন্য নারীকে বিয়ে না করার শর্ত আরোপে সে জুলুম নেই। হাদিসে এ দুটির মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। তাই এ দুটিকে এক করে দেখা ও একটিকে আর একটির সাথে তুলনা করা বৃথা ও অবৈধ।

৫. অন্যায় শর্তযুক্ত বিয়ের আর একটি উদাহরণ হলো 'শিগার' বা বিয়ের বিনিময়ে বিয়ে : এই বিয়েতে কোনো মোহরানা থাকেনা। জাহেলি যুগে এই বিয়ের রেওয়াজ ছিলো। রসূলুল্লাহ সা. এই বিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন : ইসলামে 'শিগার' বিয়ে বৈধ নয়। -মুসলিম, ইবনে মাজাহ, তিরমিযি এবং তিরমিযি কর্তৃক হাসান ও সহীহ অভিহিত।

ইবনে উমর রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. 'শিগার' বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন।

শিগারের স্বরূপ হলো, 'ক' খ কে বলবে : আমার সাথে তোমার মেয়ে বা বোনকে বিয়ে দাও, তার বিনিময়ে আমি তোমার সাথে আমার মেয়ে বা বোনকে বিয়ে দেবো। এ বিয়েতে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোনো মোহরানা লেনদেন হয়না। -ইবনে মাজাহ।

এ সম্পর্কে আলেমদের মতামত : অধিকাংশ আলেম উল্লিখিত হাদিস দুটি থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, শিগার বিয়ে আদৌ বৈধ হয়না এবং তা বাতিল। কিন্তু আবু হানিফা বলেন, বিয়ে বৈধ হবে, কিন্তু উভয় মেয়ের স্বামীর উপর "মোহরে মিছল" দেয়া বাধ্যতামূলক হবে। কেননা তারা উভয়ে মোহরানার স্থানে এমন জিনিসের উল্লেখ করেছে, যা মোহরানা হওয়ার যোগ্য নয়। কারণ একজন নারীকে আরেক নারীর বিনিময় বানানো চলেনা। কেননা সে তো কোনো সম্পদ নয়।

কাজেই শিগার বিয়ের অবৈধতা আসছে মোহরানা না থাকার কারণে। অথচ মোহরানা থাকা না থাকা বিয়ে বাতিল হওয়ার কারণ হতে পারেনা। মোহরানা হিসেবে মদ বা শূকর দিলে যেমন মোহরানা বাতিল, কিন্তু বিয়ে শুদ্ধ, তেমনি এই বিয়েও শুদ্ধ হবে। তবে "মোহরে মিছল" দিতে হবে। (মা, ফুফু ইত্যাদির সমান মোহরানাকে "মোহরে মিছল" বলা হয়।)

শিগার বিয়ে নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ : যারা এ ধরণের বিয়ে নিধিদ্ধ মনে করেন, নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ নিয়ে সেই আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন : এর

কারণ হলো, বিয়েকে একটা শর্তের উপর নির্ভরশীল করে রাখা। ব্যাপারটা দাঁড়ায় এরকম : "আমার মেয়ের বিয়ে তোমার সাথে ততোক্ষণ হবেনা, যতোক্ষণ তোমার মেয়ের বিয়ে আমার সাথে না হয়।"

অন্যরা বলেন : এর কারণ হলো, এক মহিলাকে আরেক মহিলার মোহরানায় পরিণত করা। অথচ দু'জনের কেউই এ দ্বারা উপকৃত হয়না। ফলে মোহরানা তার কাছে প্রত্যাবর্তিত হয়না। বরং তা তার অভিভাবকের কাছে প্রত্যাবর্তিত হয়। এটা উভয় মহিলার উপর যুলুম এবং উভয়কে তাদের জন্য লাভজনক হয় এমন মোহরানা থেকে বঞ্চিত করার নামান্তর।

১৬. বিয়ে বৈধ হওয়ার শর্তাবলি

বিয়ে বৈধ হওয়ার শর্ত দুটি

যেসব শর্তের উপর বিয়ের বৈধতা এমনভাবে নির্ভরশীল যে, সেগুলো যখন বর্তমান থাকে, তখনই বিয়ে শরিয়ত অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে বলে বিবেচিত হয় এবং বিয়ের যাবতীয় বিধিবিধান ও অধিকারসমূহ কার্যকর হয়, সেসব শর্তকেই বিয়ের বৈধতার শর্ত বলা হয়। এ ধরনের শর্ত দুটো। প্রথম শর্ত : যে পুরুষ প্রস্তাবিত মহিলাকে বিয়ে করতে চায়, সেই পুরুষের সাথে উক্ত মহিলার বিয়ে বৈধ হওয়া চাই। উক্ত মহিলা উক্ত পুরুষের জন্য হারাম বা নিষিদ্ধ না হওয়া শর্ত- চাই নিষিদ্ধ হওয়ার পেছনে সাময়িক কারণ থাকুক বা স্থায়ী কারণ থাকুক। এ বিষয়টি পরবর্তীতে "নিষিদ্ধ মহিলা" শিরোনামে বিশদভাবে আলোচিত হবে।

দ্বিতীয় শর্ত : বিয়ের সাক্ষী।

এ বিষয়টি তিন পর্যায়ে আলোচিত হবে :

১. সাক্ষ্য সংক্রান্ত বিধি
২. সাক্ষ্যের শর্ত
৩. মহিলাদের সাক্ষ্য

বিয়ের সাক্ষ্য সংক্রান্ত বিধি

অধিকাংশ আলেমের মতে সাক্ষী ব্যতিত বিয়ে সম্পন্নই হয়না। আর সাক্ষীরা বিয়ে সম্পাদনের সময় উপস্থিত না থাকলেও হবেনা- এমনকি সাক্ষী যদি অন্য কোনো পদ্ধতিতে নিজের বিদ্যমানতা ঘোষণা করে তাহলেও নয়। আর যদি সাক্ষীরা উপস্থিত হয় এবং বিয়ে সম্পাদনকারী দম্পতি তাকে বিয়ের বিষয়টি গোপন রাখার ও প্রকাশ না করার অনুরোধ করে, তাহলে বিয়ে বৈধ হবে।* এ মতের সপক্ষে তাদের প্রমাণাদি নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

---

* ইমাম মালেক ও তার শিষ্যগণের মত এই যে, বিয়ের উপর সাক্ষী হওয়া ফরয নয়। এজন্য বিয়ের বিষয়টি ঘোষিত হওয়া ও জানাজানি হওয়াই যথেষ্ট। তাদের যুক্তি হলো, আল্লাহ তায়ালা ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে চুক্তির সময় সাক্ষী উপস্থিত রাখার বিষয়টি উল্লেখ করা সত্ত্বেও তা ফরয নয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। অথচ বিয়ের ব্যাপারে সাক্ষী উপস্থিত রাখার বিষয়ে কুরআনে কোনো উল্লেখই নেই। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখাটা যে বিয়ের জন্য শর্তও নয়, ফরযও নয়, তা আরো জোরদারভাবে প্রমাণিত হয়। বংশ পরিচয় রক্ষার জন্য বিয়ের বিষয়টি প্রকাশ ও জানাজানি হওয়াটাই মূলতঃ লক্ষ্য। সাক্ষীর উপস্থিতি দম্পতির মধ্যে সংঘটিত বিবাদ ও বিতর্ক নিরসন করে বিয়েকে রক্ষার নিশ্চয়তা দেয়। কিন্তু সাক্ষীর অনুপস্থিতিতে বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার পর সহবাসের পূর্বে সাক্ষী হাজির করা হলে বিয়ে বহাল থাকবে। সাক্ষী হাজির হওয়ার আগেই সহবাস করলে বিয়ে বাতিল হবে এবং বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে।

১. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : যে সকল নারী সাক্ষী না রেখেই নিজেদের বিয়ে সম্পাদন করে তারা ব্যভিচারিণী। -তিরমিযি।

২. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্র সা. বলেছেন : একজন অভিভাবক ও দু'জন সৎ সাক্ষী ব্যতিত বিয়ে বৈধ নয়। -(দারুকুতনি)। এ হাদিস থেকে সাক্ষীর উপস্থিতি যে বিয়ের বৈধতার শর্ত, তা অবধারিত হয়ে যায়।

৩. আবুয যুবাইর মক্কী থেকে বর্ণিত : উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর নিকট এমন একটা বিয়ের অভিযোগ আনা হলো, যার উপর একজন পুরুষ ও একজন মহিলা ব্যতিত কোনো সাক্ষী ছিলোনা। উমর রা. বললেন : এটা একটা গোপন বিয়ে। আমি এটি অনুমোদন করিনা। আমি এ ঘটনায় উপস্থিত থাকলে 'রজম' (প্রস্তরাঘাতে হত্যার শাস্তি) কার্যকর করতাম। -মুয়াত্তায়ে মালেক।

তিরমিযি বলেছেন, তাবেয়ী ও তার পরবর্তীদের মধ্যে যারা অভিজ্ঞ ছিলেন, তারা এই মতই অনুসরণ করেছেন এবং বলেছেন : "সাক্ষী ছাড়া কোনো বিয়ে হয়না।" এ বিষয়ে তাদের পূর্বসূরী কেউ দ্বিমত পোষণ করেননি। তবে উত্তরসূরীদের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিমত প্রকাশ করেছেন।

৪. এর সাথে দম্পতির অধিকার সংশ্লিষ্ট। এই অধিকার হলো সন্তানের বৈধতার নিশ্চয়তা লাভের অধিকার। তাই এতে সাক্ষী রাখার শর্ত আরোপিত হয়েছে, যাতে সন্তানের পিতা তাকে অস্বীকার না করে এবং তার বংশ পরিচয় হারিয়ে না যায়। কিছু সংখ্যক আলেমের মতে সাক্ষী ছাড়াও বিয়ে বৈধ হয় : এদের মধ্যে রয়েছে শিয়া আলেম আবদুর রহমান মাহদী, ইয়াযীদ বিন হারূন, ইবনুল মুনযির, দাউদ। আর ইবনে উমর ও ইবনে যুবাইর সাক্ষী ছাড়া বিয়ে করেছেন তারপর তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন।

ইবনুল মুনযির বলেছেন, বিয়েতে দু'জন সাক্ষী লাগবে এই মর্মে কোনো হাদিস প্রমাণিত হয়নি। ইয়াযীদ বিন হারূন বলেছেন : আল্লাহ্ তায়ালা বেচাকেনায় সাক্ষী রাখার আদেশ দিয়েছেন, বিয়েতে নয়। আর যখন বিয়ে সম্পন্ন হয়, সংশ্লিষ্ট লোকেরা যদি তা গোপন করে এবং পরস্পরকে তা গোপন করার পরামর্শ দেয়, তখন সে বিয়ে বৈধ হবে। কিন্তু মাকরূহ হবে। কেননা বিয়েকে প্রকাশ করার আদেশ লঙ্ঘন করা হয়েছে। এটাই শাফেয়ী, আবু হানিফা ও ইবনুল মুনযিরের অভিমত। তবে উমর, উরওয়া, শা'বী ও নাফে প্রমুখ একে মাকরূহ আখ্যায়িত করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম মালেকের মতে বিয়ে ভেঙ্গে দিতে হবে। এক ব্যক্তি দু'জন পুরুষ সাক্ষীর উপস্থিতিতে বিয়ে করে এবং তাদেরকে বিয়ের কথা গোপন রাখতে অনুরোধ করে। ইমাম মালেক রায় দেন, তালাকের মাধ্যমে বিয়ের বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে এবং বিয়ে বৈধ হবেনা। সহবাস করা হলে স্ত্রীকে মোহরানা দিতে হবে। সাক্ষীদেরকে শাস্তি দেয়া হবেনা।

কেমন সাক্ষী রাখা শর্ত : এমন ব্যক্তিদেরকে সাক্ষী রাখতে হবে যারা প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্ক এবং স্বামী স্ত্রী উভয়ের কথা শুনতে পারে এবং বুঝতে পারে যে, তাদের উদ্দেশ্য বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। (সাক্ষীরা অন্ধ হলে কণ্ঠস্বর সম্পর্কে তাদের নিশ্চিত হতে হবে এবং স্বামী স্ত্রী উভয়ের কণ্ঠস্বর তাদের সন্দেহাতীতভাবে চিনতে হবে।) অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বা শিশু, উন্মাদ, মাতাল বা বধিরের সাক্ষ্যে বিয়ে শুদ্ধ হবেনা। কেননা এদের সাক্ষী থাকা ও না থাকা সমান।

সাক্ষীর সৎ হওয়া শর্ত : সাক্ষীদের সৎ হওয়ার শর্ত নিয়ে মতভেদ রয়েছে। হানাফীদের মতে এটা শর্ত নয়। তাদের মতে ফাসেক সাক্ষীদের উপস্থিতিতেও বিয়ে শুদ্ধ হবে। আর বিয়েতে অভিভাবক হবার যোগ্যতা রাখে এমন যে কোনো ব্যক্তি সাক্ষী হওয়ার যোগ্য। তাছাড়া মনে রাখতে হবে যে, সাক্ষী রাখার উদ্দেশ্য হলো বিয়ের বিষয়টি প্রকাশ করা এবং গুপ্ত থাকতে না দেয়া।

পক্ষান্তরে শাফেয়ী মাযহাবের মতে সাক্ষীদের সৎ লোক হওয়া জরুরি। কেননা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হাদিসে বলা হয়েছে যে, "একজন অভিভাবক দু'জন সৎ সাক্ষী ছাড়া বিয়ে সম্পন্ন হয়না।" তবে অপরিচিত চরিত্রধারী ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে বিয়ে অনুষ্ঠিত হলে তাদের মতে বিয়ে শুদ্ধ হবে। কেননা গ্রামাঞ্চলে ও শহরে সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে যে বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়, তাতে উপস্থিত লোকদের সততা সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা সম্ভব হয়না। তাই সততাকে বিবেচনায় নেয়া দুঃসাধ্য। সুতরাং বাহ্যিক অবস্থাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়। আর সাক্ষীর চরিত্র অজানা থাকাই তাকে অসৎ সাব্যস্ত করেনা। তবে বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর যদি জানা যায় যে, সে একজন ফাসেক বা অসৎ লোক, তবে তাতে বিয়ের ক্ষতি হবেনা। কেননা সততার যে শর্ত রাখা হয়েছে, তা বাহ্যিক পরিচিতির ভিত্তিতে রাখা হয়েছে যেন সে প্রকাশ্যভাবে অসৎ না হয়। সেটুকু যখন উপস্থিত, তখন বিয়ে শুদ্ধ হবে।

মহিলাদের সাক্ষ্য : শাফেয়ী ও হাম্বলীগণ শর্ত আরোপ করেছেন যে, সাক্ষীদের পুরুষ হওয়া চাই। একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা সাক্ষীর উপস্থিতিতে বিয়ে অনুষ্ঠিত হলে তা শুদ্ধ হবেনা। কেননা যুহরী থেকে আবু উবাইদ বর্ণনা করেছেন যে, "রসূলুল্লাহ সা. থেকেই এরূপ সুন্নত চালু হয়ে এসেছে যে, শরিয়তী শাস্তি তথা হুদুদ বিয়ে ও তালাক-এর কোনোটাতেই মহিলাদের সাক্ষ্য জায়েয নয়।" তাছাড়া যেহেতু বিয়ে কোনো আর্থিক চুক্তি নয়, এর উদ্দেশ্যও ধন সম্পদ নয়, আর এতে প্রধানত পুরুষরাই উপস্থিত হয়ে থাকে, সেহেতু শুধু দু'জন সাক্ষীর মাধ্যমে তা শুদ্ধ হবেনা- যেমন হুদুদে শুদ্ধ হয়না।

হানাফীগণ এই শর্ত আরোপ করেননা। তারা মনে করেন, দু'জন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলার সাক্ষ্য যথেষ্ট। কেননা আল্লাহ তায়াল বলেন :

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ج فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّ امْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاۤءِ ○

"তোমরা দু'জন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত রাখো। দু'জন পুরুষ না পাওয়া গেলে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা রাখো সাক্ষী হিসেবে যারা তোমাদের কাছে সন্তোষজনক তাদের মধ্য থেকে।" (সূরা ২ আল বাকারা : ২৮২)

যেহেতু বিয়ে একটা আদান প্রদান সম্বলিত চুক্তি। তাই ওটা ব্যবসায়ের সাথে তুলনীয়। কাজেই ব্যবসায়ের মতো বিয়েও একজন পুরুষের সাথে দু'জন মহিলা সাক্ষী দ্বারা সম্পন্ন হবে।

স্বাধীন হওয়া : ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ী শর্ত আরোপ করেছেন, সাক্ষীদেরকে স্বাধীন হতে হবে। আহমদ স্বাধীনতার শর্ত আরোপ করেননি। তিনি মনে করেন, দু'জন দাসের উপস্থিতিতেও বিয়ে শুদ্ধ হয়, যেমন- অন্যান্য লেনদেনের চুক্তিও শুদ্ধ হয়। কেননা কুরআন ও সুন্নাহতে এমন কোনো বক্তব্য নেই, যা দাসের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করে- যদি সে সৎ, পরহেজগার ও সত্যবাদী হয়।

মুসলমান হওয়া : বিয়ে যদি একজন মুসলমান নারী ও পুরুষের হয়, তাহলে সাক্ষীদের মুসলমান হওয়ার শর্ত সম্পর্কে ফকীহদের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। তবে শুধু স্বামী মুসলমান হলে অমুসলিম সাক্ষীর বৈধতা নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। আহমদ, শাফেয়ী ও মুহাম্মদের মতে বিয়ে শুদ্ধ হবেনা। কেননা এটা একজন মুসলমানের বিয়ে। এতে কোনো অমুসলিমের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। আর যখন কোনো মুসলমান পুরুষ ইহুদী বা খৃস্টান মহিলাকে বিয়ে করে তখন দু'জন ইহুদী বা খৃস্টান সাক্ষীর সাক্ষ্য আবু হানিফা ও আবু ইউসুফের মতে বৈধ।

সাক্ষীদের উপস্থিতি : বিয়ের মূল উপাদান ও শর্তাবলী বর্তমান থাকলে বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যায়। কিন্তু সাক্ষীদের উপস্থিতি ও সাক্ষ্য ব্যতিত তার আইনী ফলাফল ও কার্যকারিতা সৃষ্টি হয়না। সাক্ষীদের উপস্থিতি দু'পক্ষের সম্মতির বাইরের ও তা থেকে পৃথক জিনিস। কাজেই এ দৃষ্টিকোণ থেকে এটা একটা অবয়ব সর্বস্ব বিয়ে। এটা সম্মতিপূর্ণ বিয়ের বিপরীত। সম্মতিপূর্ণ বিয়ে হলো, প্রস্তাবের (ইজাব) অব্যবহিত পর সম্মতি (কবুল) জ্ঞাপন যে বিয়ে সম্পাদনে যথেষ্ট হয়। কেবল দুইপক্ষের সম্মতিই এ বিয়েকে পরিপূর্ণ রূপ দান করে এবং তার যাবতীয় আইনী ফলাফল ও কার্যকারিতা সৃষ্টি হয়। আইন এ বিয়েকে সংরক্ষণ করে এবং তা অন্য কোনো জিনিসের উপর নির্ভরশীল ও মুখাপেক্ষী থাকেনা।

বিয়ের কার্যকারিতার শর্তাবলি : বিয়ে যখন বিশুদ্ধভাবে সম্পন্ন হয়ে যায়, তখন তা অন্য কারো অনুমোদন ব্যতিরেকেই কার্যকর হওয়ার জন্য দুটো শর্ত রয়েছে :

১. বিয়ের উদ্যোগ গ্রহণকারী ও চুক্তি সম্পাদনকারী উভয়েরই প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়া। দু'জনের একজন যদি অপেক্ষাকৃত অযোগ্য, তথা পাগল বা নির্বোধ হয়, কিংবা অপ্রাপ্ত বয়স্ক কিন্তু ভালো মন্দ অনুধাবনের ক্ষমতার অধিকারী হয়, অথবা দাস হয়, তবে সে যে বিয়ের চুক্তি সম্পাদন করে, তা শুদ্ধ হবে। কিন্তু অভিভাবকের বা মনিবের অনুমোদন সাপেক্ষ হবে। তিনি অনুমোদন করলে কার্যকর, নতুবা বাতিল হবে।

২. উভয়ের এরূপ যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া চাই যা তাকে বিয়ের চুক্তি বা আকদ সম্পাদনের ক্ষমতা দান করে। সে যদি এমন অথর্ব হয় যে, চুক্তি সম্পাদন করেছে বটে, কিন্তু প্রতিনিধি হিসেবেও নয়, অভিভাবক হিসেবেও নয়, অথবা প্রতিনিধি হিসেবে সম্পাদন করেছে, কিন্তু যেভাবে চুক্তি সম্পাদন করতে তাকে প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়েছে, সেভাবে করেনি। অথবা সে অভিভাবক হয়েছে, কিন্তু তার চেয়ে নিকটতর আত্মীয় অধিকতর অগ্রগণ্য অভিভাবক বিদ্যমান, তাহলে এসব ব্যক্তির সম্পাদিত চুক্তি সম্পাদন ও বিশুদ্ধতার যাবতীয় শর্ত পূরণ করলে শুদ্ধ হবে, কিন্তু তা যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে।

১৭. বিয়ে কার্যকর হওয়ার শর্তাবলি

বিয়ের চুক্তি বা আকদে যখন সকল মূল উপাদান বর্তমান থাকে এবং বিশুদ্ধতা ও বাস্তবায়নের সকল শর্ত পূরণ হয়, তখন তা কার্যকর হয়ে যায়। আর কার্যকর হয়ে যাওয়ার পর সাক্ষী, স্ত্রী বা অন্য কারো তা ভেঙ্গে দেয়া বা বাতিল করার ক্ষমতা থাকেনা। একমাত্র তালাক বা স্বামী-স্ত্রীর কোনো একজনের মৃত্যুর মাধ্যমে ব্যতিত বিয়ের অবসান ঘটেনা। বিয়ের আকদের ক্ষেত্রে এটাই মূল কথা। কেননা যে সকল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শরিয়তে বিয়ের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে, যথা দাম্পত্য জীবনের স্থিতিশীলতা, সন্তান লালন পালন ও

তাদের যাবতীয় দায়িত্ব পালন- তা বিয়ের আকদ কার্যকর হওয়া ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন সম্ভবই নয়।

এ জন্য আলেমগণ এক বাক্যে বলে থাকেন, বিয়ে কার্যকর হওয়ার সকল শর্তের মূলে রয়েছে একটি শর্ত। আর তা হলো, আকদ সম্পাদিত হওয়া, বিশুদ্ধভাবে অনুষ্ঠিত হওয়া ও কার্যকর হওয়ার পর তা বাতিল করার ক্ষমতা স্বামী ও স্ত্রী দু'জনের কারোই যেন না থাকে।

আকদ বাধ্যতামূলক হয়না কখন : নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে আকদ কার্যকর বা বাধ্যতামূলক থাকেনা : যখন জানা যায়, পুরুষটি মহিলাটিকে প্রতারিত করেছে, অথবা মহিলাটি পুরুষটিকে ধোকা দিয়েছে। এর উদাহরণ হলো, পুরুষটি নিজে বন্ধ্যা হওয়া সত্ত্বেও তা স্ত্রীর কাছ গোপন করে তাকে বিয়ে করেছে। এমতাবস্থায় স্ত্রী যখনই জানতে পারবে, তখনই বিয়ে বাতিল করতে পারবে। অবশ্য সে যদি পুরুষটিকে স্বেচ্ছায় স্বামী হিসেবে বরণ করে নেয় এবং তার জীবন সঙ্গিণী হতে রাজী হয়ে যায়, তবে সে কথা স্বতন্ত্র। জনৈক বন্ধ্যা পুরুষ জনৈকা মহিলাকে বিয়ে করলে উমর রা. তাকে বললেন, তুমি মহিলাকে জানিয়ে দাও তুমি বন্ধ্যা এবং তাকে ক্ষমতা দাও যে, বিয়ে বাতিল করুক বা বহাল রাখুক। নিজেকে সৎ রূপে জাহির করে বিয়ে করার পর যদি জানা যায় যে, সে পাপাসক্ত (বা পাপাসক্তা) তাহলে অপর পক্ষের বিয়ে বাতিল করার অধিকার থাকবে।

এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন : যখন কোনো ব্যক্তি কোনো মহিলাকেক কুমারী জেনে বিয়ে করে, পরে জানা যায় তার বিয়ে হয়েছিল, তখন স্বামীর বিয়ে বাতিল করার ক্ষমতা থাকবে, উপরন্তু সে মোহরানার ক্ষতিপূরণ দাবি করার অধিকারী হবে। অর্থাৎ বিবাহিতার মোহরানার চেয়ে যতোটুকু বেশি দিয়েছে, তা ফেরত চাইতে পারবে। এরূপ অবস্থায় যখন সহবাসের পূর্বেই বিয়ে ভেঙ্গে দেয়া হবে, তখন মোহরানা সম্পূর্ণ রহিত হয়ে যাবে। অনুরূপ স্বামী যখন স্ত্রীর মধ্যে এমন ত্রুটি দেখতে পায়, যা পরিপূর্ণ যৌন তৃপ্তি উপভোগকে ঘৃণা বা বিরক্তিজনক করে তোলে, তখনও আকদ মেনে নেয়া বাধ্যতামূলক থাকেনা। যেমন সে যদি স্থায়ীভাবে মুস্তাহাযা অর্থাৎ অনিয়মিত ঋতুবতী হয়, তাহলে এটা এমন ত্রুটি, যা বিয়ে বাতিলকরণকে ন্যায়সঙ্গত করে দেয়। অনুরূপ, যখন স্ত্রীর মধ্যে এমন কোনো ত্রুটি পাওয়া যায়, যা সহবাসে বাধা দেয়, যেমন স্ত্রীর যৌনাংগের দ্বার রুদ্ধ থাকা। পুরুষকে বিয়ে বাতিল করার অধিকার দেয় এমন আরেকটি কারণ হলো, স্ত্রীর ঘৃণার উদ্বেককারী রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া, যেমন কুষ্ঠরোগ, উন্মাদ রোগ ও বিকলাঙ্গতা। অনুরূপ পুরুষ যখন কুষ্ঠরোগী, উন্মাদ, অপ্রাপ্ত বয়স্ক, বিকলাঙ্গ, নপুংসক বা লিংগ শৈথিল্য হেতু সহবাসে অক্ষম হয়, তখন স্ত্রীরও বিয়ে ভেঙ্গে দেয়ার অধিকার থাকবে।

ত্রুটির কারণে বিয়ে বাতিলকরণ সম্পর্কে ফকীহদের মতামত : ১. ইমাম দাউদ যাহেরী ও ইবনে হাযমসহ কিছু সংখ্যক ফকীহের মত এই যে, যে ধরনের দোষত্রুটিই হোক না কেন, তার কারণে বিয়ে বাতিল করা যায়না। (ইবনে হাযম এরূপ মতও পোষণ করেন যে, স্বামী যদি বিয়ের জন্য কোনো শর্ত আরোপ করে এবং বিয়ের সময় দেখতে পায় সে শর্ত পূরণ হয়নি, তাহলে সে বিয়ে বাতিল করার অধিকারী।)

আর রওযাতুন নাদিয়া গ্রন্থে বলা হয়েছে : শরিয়তের অপরিহার্য দাবি দ্বারা প্রমাণিত, বিয়ের আকদ মেনে নেয়া বাধ্যতামূলক এবং তা দ্বারা দাম্পত্য বিধিমালা কার্যকর হয়। যেমন যৌন সংগমের বৈধতা, স্ত্রীর খোরপোষ দেয়ার বাধ্যবাধকতা, উত্তরাধিকার সাব্যস্ত হওয়া এবং অন্য যাবতীয় বিধিমালা। শরিয়তের অপরিহার্য দাবি দ্বারা এটাও প্রমাণিত যে,

বিয়ের অবসান একমাত্র তালাক বা মৃত্যু দ্বারাই ঘটে। সুতরাং যে ব্যক্তি দাবি করবে, যে কোনো কারণেই বিয়ের অবসান ঘটানো যায়, তাকে এ দাবির সপক্ষে যথাযথ প্রমাণ দেখাতে হবে। আর অন্য যেসব ত্রুটি ফকীহ্গণ উল্লেখ করে থাকেন, তা দ্বারা বিয়ে বাতিল করার বৈধতার সপক্ষে কোনো অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়না। যে মহিলাকে তার স্বামীর ত্রুটি ব্যক্ত করার পর রসূল সা. বলেছিলেন, "তুমি তোমার বাপের বাড়ি চলে যাও" -তাঁর এ উক্তিটা তালাকের অর্থবোধক, বিয়ে বাতিল করার নয়। আর যদি বা ধরে নেয়া হয় যে, এ দ্বারা দুটোরই (বিয়ে বাতিল করা ও তালাক দেয়া) সম্ভাবনা রয়েছে, তথাপি একে সুনিশ্চিত অর্থেই গ্রহণ করতে হবে- সম্ভাব্য অর্থে নয়। অনুরূপ নপুংসকতা বা সহবাসে অক্ষমতার কারণে বিয়ে বাতিল করার বৈধতার পক্ষেও কোনো অকাট্য প্রমাণ নেই (এ ক্ষেত্রে তালাক প্রযোজ্য)। মূলত বিয়ে ততোদিন বহাল থাকবে, যতোদিন না তা থেকে সরে দাঁড়াবার কারণ সংঘটিত হয়।

২. কোনো কোনো ফকীহ্ মনে করেন, বিশেষ বিশেষ কারণে বিয়ে বাতিল করা যায় এবং সেসব কারণ ছাড়া বিয়ে বাতিল করা যায়না। ফকীহদের এই দলটিই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাদের এই মতের সপক্ষে তারা নিম্নোক্ত হাদিসগুলো থেকে প্রমাণ দর্শান :

প্রথমত: কা'ব বিন যায়েদ বা যায়েদ বিন কা'ব থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বনু গিফার গোত্রের এক মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। বাসর রাতে সহবাসের প্রাক্কালে তার কোমর থেকে পাঁজর পর্যন্ত সাদা দেখতে পাওয়া মাত্রই তিনি বিছানা থেকে সরে গেলেন এবং বললেন, তুমি নিজেকে পোশাকে আবৃত করে নাও। অত:পর তিনি তাকে যা কিছু দিয়েছিলেন, তা থেকে কিছুই ফেরত নিলেননা। -আহমদ ও সাঈদ বিন মানসূর।

দ্বিতীয়ত: উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : কোনো মহিলা পাগল, কুষ্ঠ রোগি বা বিকলাংগ একথা না জেনে বা প্রতারণার শিকার হয়ে কেউ যদি তাকে বিয়ে করে, তবে তার সাথে সহবাস করলে তাকে মোহরানা দিতে হবে। তবে যে ব্যক্তির দ্বারা সে প্রতারিত হয়েছে- মোহরানা তার উপরই বর্তাবে। - মালেক ও দারুকুতনি।

এই সকল ফকীহ কোন্ কোন্ দোষত্রুটির কারণে বিয়ের চুক্তি বাতিল করা যায় সে সম্পর্কে মতভেদ পোষণ করেছেন। আবু হানিফার মতে কেবল স্বামীর পুরুষত্বহীনতা বা পুরুষাংগ কর্তিত হওয়ার কারণেই এটা করা যায়। মালেক ও শাফেয়ী পাগলামী, কুষ্ঠরোগ, বিকলাংগতা এবং যোনিপথ বন্ধ থাকাকেও এর সাথে যুক্ত করেছেন। ইমাম আহমদের মতে কারো যোনি ও মলদারের মাঝের অংশ বিদীর্ণ হয়ে একাকার হয়ে গেলে সে ক্ষেত্রেও বিয়ে বাতিল করা যাবে।

বিষয়টির সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ : বস্তুত: উপরোক্ত মতগুলোর কোনটাই বিবেচনার যোগ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে দাম্পত্য জীবনের ভিত্তি হলো দয়া, মমতা ও প্রীতি ভালোবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত। দু'জনের কারো মধ্যে যদি এমন কোনো দোষ-ত্রুটি বা খুঁত থাকে, যা একজনের প্রতি অপরজনের বিরাগ বা ঘৃণার উদ্রেক করে, তাহলে দাম্পত্য জীবনের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব সম্ভব নয়। পরস্পরের প্রতি বিরক্তি ও ঘৃণা সৃষ্টিকারী খুঁত ও রোগব্যাধির উপস্থিতিতে বিয়ের উদ্দেশ্য পূরণ হয়না। এজন্যই শরিয়ত স্বামী ও স্ত্রীকে বিয়ে গ্রহণ বা বর্জনের স্বাধীনতা দিয়েছে। ইমাম ইবনুল কাইয়েম এ বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন : অন্ধত্ব, বধিরতা বাক শক্তিহীনতা, উভয় হাত কাটা হওয়া, উভয় পা কাটা হওয়া, এক হাত কাটা হওয়া, এক পা কাটা হওয়া স্ত্রী বা স্বামী যারই হোক

না কেন- সর্বাধিক ঘৃণা সৃষ্টিকারী ব্যাপার। আর এটা আগে ভাগে প্রকাশ না করা নিকৃষ্ঠতম প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি, যা ইসলামের পরিপন্থী। এক ব্যক্তি জনৈক মহিলাকে বিয়ে করলো। লোকটি ছিলো প্রজনন ক্ষমতাহীন। খলিফা উমর রা. তাকে বললেন : মহিলাটিকে জানিয়ে দাও তুমি প্রজনন ক্ষমতাহীন, আর সাথে সাথে তাকে স্বাধীনতা দাও, ইচ্ছা করলে তোমার বৈবাহিক বন্ধন বহাল রাখো, নচেত বাতিল করো।

ইবনুল কাইয়েম বলেন : যুক্তির আলোকে বলতে হয় যে, স্বামী বা স্ত্রীর একজনের মধ্যে যদি এমন কোনো দোষ বা খুঁত থাকে, যা অপরজনকে তার প্রতি বিতৃষ্ণ করে তোলে এবং তা দ্বারা বিয়ের মূল উদ্দেশ্য, মমতা ও ভালোবাসা অর্জিত না হয় তাহলে সেই বিয়ে বহাল রাখা বা বাতিল করার ব্যাপারে দম্পতির স্বাধীনতা অবশ্যই থাকবে। আর কোনো ব্যক্তি যখন কারো দ্বারা প্রতারিত হয় কিংবা ক্ষতির শিকার হয়, তবে সেই প্রতারণা ও ক্ষতিকে বরদাশত করা ও মেনে নেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ ও রসূলের পক্ষ থেকে তার উপর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। যে ব্যক্তি ইসলামী শরিয়তের উৎসসমূহে শরিয়তের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, সুবিচার, ন্যায়নিষ্ঠতা, যৌক্তিকতা, বিচক্ষণতা ও কল্যাণময়তার অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করবে, তার কাছে ইবনুল কাইয়েমের উপরোক্ত বক্তব্যের অগ্রগণ্যতা, যৌক্তিকতা এবং শরিয়তের মূলনীতিগুলোর সাথে তার সাযুজ্য ও ঘনিষ্ঠতা প্রতিভাত না হয়ে পারবেনা। ইয়াহিয়া বিন সাঈদ আনসারী সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব রা. থেকে বর্ণনা করেন, উমর রা. বলেছেন : কোনো পাগলিনী, কুষ্ঠ রোগিনী বা অংগহানিপ্রাপ্তা মহিলার বিয়ে হয়ে যাওয়া এবং তার সাথে সহবাস সম্পন্ন হওয়ার পর যদি তার এসব অসুস্থতার কথা জানা যায়, তবে তার দেহ স্পর্শের কারণে সে তার নির্ধারিত মোহরানার অধিকারী হবে। তবে তার কাছ থেকে এই বিষয়টি গোপন রেখে যে অভিভাবক তাকে প্রতারিত করেছে ও ঠকিয়েছে, মোহরানার অর্থ যোগাড় করে দেয়ার দায়িত্ব তার উপরই বর্তাবে।

আলি রা. থেকে শা'বি বর্ণনা করেন, কোনো কুষ্ঠ রোগিনী, পাগলিনী, বিকলাংগিনী বা যৌনাংগে এমন কোনো সমস্যা রয়েছে, যা সহবাসের অন্তরায়, এমন মহিলাকে এসব সমস্যার কথা না জেনে বিয়ে করলে তার স্বামীর তাকে স্পর্শ করার পূর্ব পর্যন্ত বহাল রাখা বা তালাক দেয়ার স্বাধীনতা থাকবে। স্পর্শ করলে যৌনাংগ উপভোগ করার কারণে স্ত্রীর মোহরানা প্রাপ্য হয়ে যাবে। ওকি বলেন : উমর রা. বলেছেন, স্ত্রী অন্ধ হোক বা কুষ্ঠ রোগিনী হোক, বিয়ের পর সহবাস করা হলে সে মোহরানার অধিকারী হবে, তবে যে ব্যক্তি তাকে প্রতারিত করেছে, তার কাছ থেকে মোহরানার অর্থ আদায় করতে পারবে। এ থেকে প্রমাণিত হয়, উমর রা. পূর্বোল্লিখিত ত্রুটি ও খুঁতগুলোর উল্লেখ করে একথা বুঝাননি যে, ব্যাপারটা শুধু ওগুলোর মধ্যেই সীমিত এবং এছাড়া অন্য কোনো খুঁতের বেলায় স্বামী তাকে ত্যাগ করতে পারবেনা। ইসলামের ইতিহাসের প্রখ্যাত বিচারপতি শুরাইহ রা. যিনি তার দীনদারী, সততা ও বিচক্ষণতার জন্য স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন- তিনিও এই মূলনীতির আলোকে বিচার ফায়সালা করতেন। ইবনে সিরীন রা. জানান, জনৈক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিচারপতি শুরাইহের নিকট অভিযোগ দায়ের করলো যে : এই ব্যক্তি আমাকে বলেছে, আমি তোমাকে সবচেয়ে সুন্দরী মহিলার সাথে বিয়ে করিয়ে দেবো। তারপর সে আমাকে এনে দিয়েছে এক অন্ধ মহিলাকে। শুরাইহ বললেন : সে যদি তোমার কাছ থেকে কোনো দোষ গোপন করে থাকে তবে সেটা বৈধ হয়নি।" বিচারপতি শুরাইহের এই ফায়সালা ও উক্তি লক্ষ্য করুন যদি সে তোমার কাছ থেকে কোনো দোষ

গোপন করে থাকে, তার এ উক্তি প্রমাণ করে যে, স্ত্রী কোনো দোষ গোপন রেখে থাকলে স্বামীর বিয়ে প্রত্যাখ্যান করার অধিকার থাকবে।

যুহরি বলেন, যে কোনো দুরারোগ্য ব্যাধির কারণে বিয়ে প্রত্যাখ্যান করা যায়। সাহাবিগণ ও পূর্বতন মনীষীদের ফতোয়াসমূহ পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, তারা কোনো নির্দিষ্ট দোষ ত্রুটির মধ্যে বিয়ে বাতিল করার অধিকারকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। কেবল উমর রা. এর কথিত একটি উক্তি এর ব্যতিক্রম। সেটি হলো : "চারটি খুঁত ব্যতিত আর কোনো কারণে মহিলাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া যাবেনা : মস্তিষ্ক বিকৃতি, কুষ্ঠ রোগ, বিকলাংগতা এবং যৌনাংগের রোগ।" এই বর্ণনা অপেক্ষাকৃত কম নির্ভরযোগ্য হলেও ইবনে আব্বাস রা. থেকে নির্ভরযোগ্য সনদেও এটা বর্ণিত হয়েছে। তবে এসবই কেবল সেই ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যখন স্বামী তার হবু স্ত্রী কেমন হওয়া চাই, সে সম্পর্কে কোনো শর্ত আরোপ করেনা। যখন সে তার নিখুঁত হওয়ার শর্ত আরোপ করে কিংবা সুন্দরী হওয়ার শর্ত আরোপ করে অথচ পরে কুশ্রী প্রমাণিত হয়, অথবা অল্প বয়সী তরুণী হওয়ার শর্ত আরোপ করে, অথচ পরে বুড়ি প্রমাণিত হয় কিংবা ফর্সা হওয়ার শর্ত আরোপ করে, কিন্তু পরে কালো প্রমাণিত হয়, কিংবা কুমারী হওয়ার শর্ত আরোপ করে কিন্তু পরে প্রমাণিত হয় যে কুমারী নয়, তাহলে এই সকল ক্ষেত্রে তার বিয়ে বাতিল করার অধিকার থাকবে। ইতিমধ্যে সহবাস সংঘটিত না হয়ে থাকলে মোহরানা দেয়া লাগবেনা। কিন্তু যদি সহবাস সংঘটিত হয়, তবে মোহরানা দিতে হবে। তবে স্ত্রীর অভিভাবক প্রতারণার জন্য দায়ী হয়ে থাকলে এই মোহরানার দায় তার ঘাড়ে জরিমানা হিসেবে আরোপিত হবে। আর যদি স্ত্রী নিজেই প্রতারণার জন্য দায়ী হয়ে থাকে, তাহলে তার মোহরানা রহিত হবে। আর ইতিমধ্যে সে মোহরানা নিয়ে থাকলে স্বামী তার কাছ থেকে তা ফেরত নিতে পারবে। ইমাম আহমদ থেকে বর্ণিত দু'টি মতের মধ্যে একটি এই মতের পক্ষে।

ইমাম আহমদের শিষ্যগণ বলেছেন : স্ত্রী যদি তার কোনো হবু স্বামীর জন্য বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্যের শর্ত আরোপ করে, কিন্তু পরে সে তার বিপরীত প্রমাণিত হয়, তাহলে তার বিয়ে বাতিল করার অধিকার থাকবেনা। তবে একটি ক্ষেত্রে অধিকার থাকবে। সেটি হলো, সে যদি শর্ত আরোপ করে যে, তাকে স্বাধীন মানুষ হতে হবে, কিন্তু পরে দেখা গেল সে দাস শ্রেণীভুক্ত, তাহলে সে বিয়ে বাতিল করার ক্ষমতার অধিকারী হবে। আর বংশ মর্যাদার ব্যাপারে শর্ত আরোপ করার পর যদি তার বিপরীত প্রমাণিত হয়, তাহলে দু'রকম মত পাওয়া যায়। কারো মতে তার বিয়ে বাতিল করার ক্ষমতা থাকবে, কারো মতে থাকবেনা। ইমাম আহমদের মাযহাব ও মূলনীতিসমূহের দাবি হলো, স্বামীর ও স্ত্রীর শর্তারোপে কোনো পার্থক্য নেই। বরঞ্চ স্ত্রীর আরোপিত শর্ত অপূর্ণ থাকলে তার বিয়ে বাতিল করার বা বহাল রাখার ক্ষমতা অগ্রগণ্য। কেননা তালাক দিয়ে বিচ্ছেদ ঘটানোর ক্ষমতা তার নেই। স্বামীর যখন তালাক দিয়ে বিচ্ছেদ ঘটানোর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বিয়ে বাতিল করার ক্ষমতা রয়েছে, তখন তালাকের ক্ষমতাহীন স্ত্রীর বিয়ে বাতিল করার ক্ষমতা থাকাটা অবশ্যই অগ্রগণ্য হবে। আর সেই ক্ষেত্রেও স্ত্রীর বিয়ে বাতিল করা বৈধ হবে, যখন প্রমাণিত হবে যে, স্বামী অত্যন্ত নিচু পেশাজীবী মানুষ যদিও সে পেশা স্বামীর ধর্ম বা সম্ভ্রমের কোনো কলঙ্ক লেপন করেনা, কেবল তার দ্বারা স্ত্রীর পরিপূর্ণ আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ এবং তাকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করার পথে বাধার সৃষ্টি করে। ধরা যাক, স্ত্রী শর্ত দিয়েছিল তার জন্য সুস্থ সবল সুদর্শন যুবক স্বামী চাই। কিন্তু পরে দেখা গেল, তার স্বামীটি অন্ধ,

কুৎসিত, কালো, বুড়ো, বোবা ও বধির। তাহলে কিভাবে সে তার সংসার করবে এবং কিভাবে তাকে বিয়ে ভেংগে দেয়া থেকে বিরত রাখা যাবে? বস্তুত: এটা একেবারেই অন্যায়, অসমীচীন, অযৌক্তিক ও শরিয়তের বিধিমালার পরিপন্থী।

তিনি বলেন : দম্পতির কোনো একজনকে অপরজনের শরীরে এক দানা পরিমাণ কুষ্ঠ রোগ থাকলেই বিয়ে বাতিল করার ক্ষমতা দেয়া হবে, অথচ সামান্য পরিমাণ কুষ্ঠের চেয়ে অনেক বেশি ছোয়াচে দীর্ঘস্থায়ী ও দুরারোগ্য চর্মরোগ থাকলে সে ক্ষমতা দেয়া হবেনা- এটা কিভাবে সমীচীন হতে পারে? অন্যান্য জটিল রোগের বেলায়ও একথা প্রযোজ্য। রসূলুল্লাহ সা. যখন পণ্যের খুঁত গোপন করা বিক্রেতার জন্য হারাম ঘোষণা করেছেন এবং বিক্রেতা ছাড়া অন্য কারোও যদি সেই খুঁত সম্পর্কে জানা থাকে, তবে তার জন্যও তা ক্রেতার কাছ থেকে গোপন করা নিষিদ্ধ করেছেন, তখন বিয়ের ক্ষেত্রেই বা কেন দোষত্রুটি গোপন করা অবৈধ হবেনা? কায়েসের মেয়ে ফাতেমা যখন রসূলুল্লাহ সা. এর নিকট মুয়াবিয়া ও আবু জুহাম সম্পর্কে পরামর্শ চান, তখন তিনি বললেন : মুয়াবিয়া একে তো কৃপণ, তদুপরি তার কোনো ধনসম্পদ নেই, আর আবু জুহাম নিজের কাঁধ থেকে লাঠি নামায়ই না (অর্থাৎ সর্বক্ষণ প্রহারে প্রস্তুত থাকে)। সুতরাং এটা ধ্রুব সত্য। বিয়ের ক্ষেত্রে দোষত্রুটি প্রকাশ করা অধিকতর অগ্রগণ্য ও অপরিহার্য। আর এটা যখন অপরিহার্য, তখন তা লুকিয়ে রাখা ধোঁকা দেয়া ও অবৈধভাবে প্রতারণা করা সত্ত্বেও তাকে সারা জীবনের জন্য মেনে নিতেই হবে কেন? তাকে তীব্রভাবে ঘৃণা করা সত্ত্বেও নিজের কাধে একটা অবিচ্ছেদ্য জোয়ালের মতো চাপিয়ে রাখতে স্ত্রী বাধ্য হবে কেন? বিশেষত সে যখন আগে থেকেই এ জাতীয় খুঁত থেকে মুক্ত হওয়ার শর্ত আরোপ করেছে। এ থেকে বুঝা গেল, এ জাতীয় বিয়ে মেনে নেয়ার বাধ্যবাধকতাকে শরিয়তের বিধিমালা ও তার বাস্তব আচরণ রীতি স্বীকৃতি দেয়না।

আবু মুহাম্মদ ইবনে হাযম বলেন, স্বামী যখন স্ত্রীর দোষত্রুটি মুক্ত হওয়ার শর্ত আরোপ করেছে, অথচ বিয়ের পর তার মধ্যে কোনো না কোনো ত্রুটি দেখতে পেল, তখন বিয়ে আদৌ সম্পন্ন হয়নি বরং তা প্রথম থেকেই বাতিল। এতে কোনো পুনর্বিবেচনার অবকাশ থাকবেনা। আবাসন, খোরপোষ ও উত্তরাধিকারের প্রশ্নও উঠবেনা। তিনি বলেন : যে নারীকে তার ঘরে ঢোকানো হয়েছে, তার সাথে তার বিয়েই হয়নি। যার সাথে বিয়ে হয়েছে, এ নারী সে নারী নয়। কেননা নিখুঁত ও খুঁতযুক্ত যে এক নয়, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। আর তাকে যখন সে বিয়ে করেনি, তখন তারা দু'জন তো বেগানা নারী ও পুরুষ। তাই তাদের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক হতেই পারেনা।

১৮. যেসব নারীকে বিয়ে করা হারাম

সকল নারীকে বিয়ে করা যায়না। যাকে বিয়ে করার ইচ্ছা করা হবে, সে যেন নিষিদ্ধ নারী না হয়, অন্য কথায় তার "গয়রে মাহারম" নারী হওয়া চাই। চাই চিরস্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ হোক অথবা সাময়িকভাবে। চিরস্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ হওয়ার অর্থ হলো, সে কখনোই ঐ পুরুষের স্ত্রী হতে পারবেনা। আর সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ হওয়ার অর্থ হলো, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঐ পুরুষের সাথে তার বিয়ে নিষিদ্ধ। অবস্থা পরিবর্তত হলে ও সাময়িক নিষেধাজ্ঞা অতিক্রান্ত হলে সে তার জন্য বৈধ হয়ে যাবে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার কারণ তিনটি :

১. নিকট আত্মীয়তা বা রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়তা, ২. বৈবাহিক সূত্রীয় আত্মীয়তা, ৩. দুধ সম্পর্কিত আত্মীয়তা।

পবিত্র কুরআনের ভাষ্য হলো :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَأَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْأَخِ وَبَنٰتُ
الْأُخْتِ وَأُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِىْٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ
الّٰتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِىْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ز فَإِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ز وَحَلَآئِلُ أَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ لا وَأَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ
الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ط إِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

অর্থ : তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে তোমাদের মাকে, মেয়েকে, বোনকে, ফুফুকে, খালাকে, ভাইঝিকে, ভাগ্নীকে, দুধমাকে, দুধবোনকে, শাশুড়িকে, তোমাদরে অভিভাবকত্বে থাকা তোমাদের স্ত্রীদের পূর্বতন স্বামীর ঔরসজাত মেয়েকে যে স্ত্রীদের সাথে তোমরা সহবাস করেছ, সহবাস যদি না করে থাকো, তাহলে নিষিদ্ধ নয়। আরো নিষিদ্ধ করা হয়েছে তোমাদের ঔরসজাত ছেলের বোনকে এবং নিষিদ্ধ করা হয়েছে দুই বোনকে একত্রে বিয়ে করা। তবে অতীতে যা হয়েছে,.তার কথা ভিন্ন। আরো নিষিদ্ধ করা হয়েছে সকল বিবাহিত নারীকে। ..." (সূরা নিসা : আয়াত ২৩)

নিকট আত্মীয়তার কারণে নিষিদ্ধ নারী

১. মা, ২. মেয়ে, ৩. বোন, ৪. ফুফু, ৫. খালা, ৬. ভাই এর মেয়ে, ৭. বোনের মেয়ে, মা বলতে এমন প্রত্যেক নারীকে বুঝায়, যার মাতৃত্বের ছায়ায় তোমার অবস্থান। তাই এর আওতায় রয়েছে মা, নানী, মায়ের নানী ও দাদী, বাবার মা, বাবার দাদী ও নানী এভাবে যতো উর্ধ্বে উঠুক। আর মেয়ে বলতে এমন প্রত্যেক নারীকে বুঝায়, জন্ম সূত্রে যার পিতৃত্ব তোমার দিকে আবর্তিত হয়, চাই এক স্তর বা কয়েক স্তরের ব্যবধানে হোক। কাজেই মেয়ে বলতে ঔরসজাত মেয়ে ও মেয়ের মেয়েদেরকে বুঝাবে। আর বোন হলো এমন প্রত্যেক নারী, যে একই মা ও একই বাবার প্রত্যক্ষ সন্তান অথবা শুধু একই মার অথবা শুধু একই বাবার সন্তান। ফুফু হচ্ছে এমন প্রত্যেক মহিলা, যে তোমার বাবার আপন বোন বা সৎ বোন অথবা তোমার দাদার ঔরসজাত অথবা সৎ মেয়ে। মায়ের ফুফুও নিজের ফুফুর মতো নিষিদ্ধ নারীদর অন্তর্ভুক্ত। খালা হচ্ছে মায়ের আপন বা সৎ বোন। বাবার খালাও নিজের খালার মতো নিষিদ্ধ নারী। ভাইঝি ও ভাগ্নিও অনুরূপ ভাই ও বোনের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সন্তান এবং নিষিদ্ধ নারী।

বৈবাহিক সম্পর্কভিত্তিক নিষদ্ধ নারী

১. শাশুড়ী, শাশুড়ীর মা, শ্বশুরের মা, চাই যত উর্ধ্বে উঠুক না কেন। আল্লাহ বলেন : "এবং তোমাদের স্ত্রীদের মায়েরাও তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ।" এই শ্রেণীর মহিলার নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য স্ত্রীর সাথে সহবাস করা শর্ত নয়, বরং শুধুমাত্র আকদ হলেই স্ত্রীর মা, নানী ও দাদী নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। (ইবনে আব্বাস ও যায়দ বিন ছাবেত থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি

কোনো মহিলার সাথে আকদ সম্পন্ন করেছে, কিন্তু সহবাস করেনি, তার জন্য ঐ স্ত্রীর মাকে বিয়ে করা বৈধ।)

২. যে স্ত্রীর সাথে সহবাস হয়েছে, তার মেয়ে। স্ত্রীর মেয়ের মেয়ে ও ছেলের মেয়েও এর আওতাভুক্ত, চাই যতো নিচে নামুক না কেন। কেননা তারা তারই মেয়ে। সূরা নিসার আয়াত নং-২৩ দেখুন। যাহেরী মাযহাব অনুসারে স্ত্রীর পূর্বতন স্বামীর ঔরসজাত মেয়ে যদি বর্তমান স্বামীর অভিভাবকত্বে না থাকে তাহলে সে নিষিদ্ধ নয়। কোনো কোনো সাহাবীও এই মত পোষণ করতেন বলে বর্ণিত আছে।

মালেক বিন আওস বলেন : আমার স্ত্রী একটা সন্তান রেখে মারা গেলে আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম। আলী রা. আমাকে দেখে বললো : তোমার কী হয়েছে? আমি বললাম : আমার স্ত্রী মারা গেছে। আলী রা. বললো : তার কোনো মেয়ে আছে? আমি বললাম : হ্যাঁ, তায়েফে আছে। তিনি বললেন : সে কি তোমার অভিভাবকত্বে ছিলো? আমি বললাম : না। তিনি বললেন : তাহলে তাকে বিয়ে করো। আমি বললাম : সূরা নিসার ২৩নং আয়াতে আল্লাহ যে বলেছেন তোমাদের স্ত্রীদের মেয়েও নিষিদ্ধ? তিনি বললেন : সেতো শুধু অভিভাবকত্বের আওতাধীন মেয়ে। কিন্তু অধিকাংশ আলেম এই মত নাকচ করেছেন। তারা বলেছেন : আলী রা.-এর এ হাদিস প্রামাণ্য নয়।

৩. ছেলের বৌ, পৌত্রের বৌ, তার পৌত্রীর মেয়ে- চাই যতো নিচ পর্যন্ত যাক। (সূরা আন্ নিসা আয়াত-২৩ দ্রষ্টব্য)

বাবার স্ত্রী

বাবার স্ত্রীকে বিয়ে করা ছেলের জন্য নিষিদ্ধ, চাই তার বাবার সাথে মহিলার শুধু আকদ সম্পন্ন হয়ে থাকুক এবং সহবাস না হোক। জাহেলি যুগে এ ধরনের ব্যাপক প্রচারণা ছিলো। এ বিয়েকে তারা 'ঘৃণিত বিয়ে' বলে আখ্যায়িত করতো। মহান আল্লাহ এ বিয়ের নিন্দা করেছেন এবং এর প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করিয়েছেন। ইমাম রাযী বলেছেন : "তিন কারণে যে কোনো জিনিস নিন্দিত হয়! যুক্তির দিক দিয়ে নিন্দনীয় হওয়া, শরিয়তের দিক দিয়ে নিন্দনীয় হওয়া এবং সামাজিক কারণে নিন্দনীয় হওয়া। আল্লাহ এ বিয়েকে উল্লিখিত তিন দিক দিয়েই নিন্দনীয় বলেছেন। প্রথমে বলেছেন : "এটি একটি লজ্জাজনক কাজ।" এ দ্বারা যুক্তির আলোকে এর নিন্দনীয় অবস্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। তার পর বলেছেন : "এটি একটি ঘৃণিত কাজ।" এ দ্বারা শরিয়তের দৃষ্টিতে এর নিন্দনীয় অবস্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। তারপর বলেছেন : "এটি একটি খারাপ কাজ।" এ দ্বারা সামাজিক দিক দিয়ে এর নিন্দনীয় অবস্থান ব্যক্ত করা হয়েছে।" ইবনে সা'দ এই আয়াতের নাযিল হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন:

وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ط اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّ مَقْتًا ط وَسَآءَ سَبِيْلًا ۝

কেউ তার স্ত্রীকে রেখে মারা গেলে তার ছেলে তাকে বিয়ে করার অগ্রাধিকারী বিবেচিত হতো যদি সে ঐ ছেলের মা না হতো, অথবা যার সাথে ইচ্ছা তাকে বিয়ে দিতো। আবু কাইস যখন মারা গেলো, তখন তার ছেলে তার স্ত্রীকে বিয়ে করার অধিকার উত্তরাধিকার সূত্রে পেলো। সে তার খোরপোষ দিলোনা এবং সম্পত্তি থেকে কোনো উত্তরাধিকারও

তাকে দিলোনা। তখন ঐ মহিলা রসূল সা.-এর নিকট এলো এবং পুরো অবস্থা তার নিকট ব্যাখ্যা করলো। রসূলুল্লাহ সা. তাকে বললেন : "তুমি তোমার মৃত স্বামীর গৃহে ফিরে যাও। হয়তো আল্লাহ তোমার সম্পর্কে কিছু নাযিল করবেন।" অতপর এ আয়াত নাযিল হলো : (২২ নং আয়াত : সূরা নিসা)

"তোমাদের বাবারা যে সকল মহিলাকে বিয়ে করেছিল, তাদেরকে তোমরা বিয়ে করোনা। তবে অতীতে যা হয়ে গেছে, তার কথা আলাদা। এটা খুবই লজ্জাকর ঘৃণ্য ও অন্যায় পন্থা।"

হানাফী মাযহাব মতে, যে ব্যক্তি কোনো মহিলার সাথে ব্যভিচার করেছে, অথবা কামাবেগসহকারে তাকে স্পর্শ বা চুম্বন করেছে কিংবা তার যৌনাংগে কামাবেগসহকারে দৃষ্টি দিয়েছে তার উর্ধতন ও অধোস্তন সবাই তার জন্য হারাম হয়ে যাবে এবং সেই মহিলা ঐ ব্যক্তির উর্ধতন বা অধোস্তন সবার জন্য হারাম হয়ে যাবে। কেননা তাদের নিকট ব্যভিচার এবং ব্যভিচারের উদ্বুদ্ধকারী যাবতীয় কাজ দ্বারা সেসব মানুষ হারাম হয়ে যায়, যারা বিয়ের কারণে হারাম হয়। তারা বলেছেন : কোনো ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর মেয়ে বা মেয়ের সাথে ব্যভিচার করে, তাহলে সেই স্ত্রী তার ওপর চিরতরে হারাম হয়ে যাবে। কিন্তু অধিকাংশ আলেমের মতে, বৈবাহিক সম্পর্কের দরুন যাদের বিয়ে করা হারাম হয়, ব্যভিচারের কারণে তাদেরকে বিয়ে করা হারাম হয়না। তাদের মতের সপক্ষে প্রমাণাদি নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. সূরা নিসার আয়াত নং-২৪ এর নিম্নোক্ত উক্তি :

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ. "আর এ ছাড়া আর সবাইকে তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে।" নিষিদ্ধ নারীদেরকে চিহ্নিত করার পর এ উক্তি দ্বারা যাদেরকে বিয়ে করা হালাল করা হয়েছে তাদেরই বিবরণ দেয়া হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা হয়নি যে, ব্যভিচার কারো বিয়ে নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

২. আয়েশা রা. বর্ণনা করেছন : "এক ব্যক্তি জনৈকা মহিলার সাথে ব্যভিচার করলো। অতপর তাকে বা তার মেয়েকে বিয়ে করতে ইচ্ছা করলো। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সা.কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি জবাব দিলেন : কোনো হারাম কাজ কোনো হালালকে হারাম করেনা। একমাত্র বিয়ের মাধ্যমে যা হয় (অর্থাৎ সহবাস)। তা হালালকে হারাম করে।" -ইবনে মাজাহ।

৩. ফকীহগণ যে ব্যাপারে এ সকল বিধি লিপিবদ্ধ করেছেন, তা একটা প্রয়োজনীয় বিষয় এবং কখনো কখনো তা ব্যাপক আকারে দেখা দেয়। এসব বিষয়ে শরিয়ত চুপ থাকবে, কুরআনেও কোনো আয়াত নাযিল হবেনা, সুন্নাহ থেকেও কোনো পথনির্দেশ আসবেনা, কোনো বিশুদ্ধ হাদিসও থাকবেনা কোনো সাহাবিরও কোনো কথা বা কাজ এ সম্পর্কে পাওয়া যাবেনা, অথচ তারা ব্যাপক ব্যভিচার কলঙ্কিত জাহেলি যুগের নিকটতম সময়ের অধিবাসী ছিলেন এটা অসম্ভব। তাদের কেউ যদি বুঝতে পারতেন, ব্যভিচারের দরুন শরিয়তে কোনো হালাল নারী হারাম হয়, অথবা এর কোনো যুক্তি বা কারণ তাদের দৃষ্টিগোচর হতো, তাহলে তারা তা নিয়ে অবশ্যই প্রশ্ন করতেন এবং যে কারণে তারা কষ্ট ভোগ করেন, তা উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজন অত্যন্ত ব্যাপক আকারে দেখা দিতো।" -আল মানার, ৪র্থ খণ্ড, ৪৭৯ পৃ:।

৪. যেহেতু ব্যভিচার এমন একটা ব্যাপার, যার কারণে নারী বিছানায় পরিণত হয়না,

(অর্থাৎ তার উপর সন্তানের বংশ পরিচয় নির্ভরশীল থাকেনা) তাই বৈবাহিক কারণে যে সকল নারীর সাথে বিয়ে হারাম হয়, ব্যভিচার দ্বারা সে সকল নারীর সাথে বিয়ে হারাম হয়না।

যে সকল নারী দুধপানজনিত কারণে নিষিদ্ধ

যে সকল নারী রক্ত সম্পর্কের কারণে নিষিদ্ধ, তারাই দুধ পানের কারণে নিষিদ্ধ। রক্ত সম্পর্কের কারণে যারা নিষিদ্ধ, তারা হচ্ছে : মা, মেয়ে, বোন, ফুফু, খালা, ভাই-এর মেয়ে ও বোনের মেয়ে। এটাই আল্লাহ সূরা নিসার ২৩নং আয়াত : "তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে"... তে উল্লেখ করেছেন।

সূরা নিসার উক্ত ২৩নং আয়াতে দুধ মাকে আসল মার পর্যায়ে স্থান দেয়া হয়েছে এবং যে দুধ খেয়েছে, তার জন্য তাকে এবং জন্মদাতা মার দিক দিয়ে যারা নিষিদ্ধ, তাদের সকলকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং দুধ পানের কারণে নিষিদ্ধ হবে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ :

১. ধাত্রী, যিনি দুধ পান করিয়েছেন। কেননা তিনি দুধ পান করানোর কারণে যে দুধ খেয়েছে তার মা হিসেবে গণ্য হয়েছেন।

২. ধাত্রীর মা। কেননা তিনি তার নানী।

৩. ধাত্রীর স্বামীর মা। কেননা তিনি তার দাদী।

৪. ধাত্রীর বোন। কেননা তিনি তার খালা।

৫. ধাত্রীর স্বামীর বোন। কেননা তিনি তার ফুফু।

৬. ধাত্রীর ছেলের মেয়েরা ও মেয়ের মেয়েরা। কেননা তারা তার ভাইঝি ও ভাগ্নি।

৭. দুধ বোন, চাই সে আপন দুধ বোন হোক বা সৎ দুধ বোন হোক।

(আপন দুধ বোন : আপন মা যাকে দুধ পান করিয়েছে, চাই দুধ খাওয়া শিশুর সাথে হোক বা তার আগে বা পরে। সৎ দুধ বোন : যাকে সৎ মা অথবা অন্য পুরুষের সাথে বিবাহিত আপন মা দুধ পান করায়।

যে ধরনের দুধ পান করানো দ্বারা বৈধ নারী অবৈধ হয়ে যায় : যে ধরনের দুধ পান করানো দ্বারা বৈধ নারী অবৈধ হয়ে যায় তা হচ্ছে : শর্তহীন দুধ পান করানো। অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গভাবে দুধ পান করানো চাই। এর অর্থ : শিশু স্তন চুষতে আরম্ভ করবে এবং কোনো বাধা বিঘ্ন ছাড়াই যখন ইচ্ছা হবে স্তন ছাড়বে। একবার দু'বার চুষলে তাতে নারী নিষিদ্ধ হয়না। কেননা সেটা দুধ পান করানোর আওতায় পড়েনা এবং তার খাবারের প্রয়োজন মেটায়না।

আয়েশা রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : এক বা দুই চুষায় হালাল নারী হারাম হয়না। (বুখারি ব্যতিত সকল সহীহ হাদিস) এ বিষয়ে আলেমদের রকমারি মতামত রয়েছে। যার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ :

আয়াতে যেহেতু দুধ পান করানোর কোনো পরিমাণ উল্লেখ করা হয়নি। তাই দুধ যতোটুকুই পান করুক, নারীকে অবৈধ করার ব্যাপারে সমান কার্যকর। বুখারি ও মুসলিম উকবা ইবনুল হারেছ থেকে বর্ণনা করেছেন : উকবা বলেন : "আমি উম্মে ইয়াহিয়াকে বিয়ে করলাম। এরপর জনৈকা কালো দাসী এসে বললো : আমি তোমাদের দু'জনকেই দুধ খাইয়েছি। আমি তৎক্ষণাত রসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে গেলাম এবং তাকে বিষয়টা জানালাম। শুনে তিনি বললেন : "সে কি কথা? সত্যিই বলেছে নাকি? ... একে ছেড়ে

দাও।" এখানে এটা স্পষ্ট, রসূলুল্লাহ্ সা. দুধের পরিমাণ জিজ্ঞাসা করেননি। সরাসরি তাকে ত্যাগ করার আদেশ দিয়েছেন।

এ দ্বারা প্রমাণিত হয়, শুধু দুধ পান করানোই যথেষ্ট। পরিমাণ যা-ই হোক। তাই যেখানেই এটা পাওয়া যাবে, সেখানেই এর জন্য নির্ধারিত বিধি প্রযোজ্য হবে। তাছাড়া যেহেতু এটি এমন একটি কাজ, যা দ্বারা কিছু সংখ্যক মানুষ হারাম হয়ে যায়। সুতরাং এর পরিমাণ কম হোক বা বেশি হোক, তাতে কিছু আসে যায়না। এটা সহবাসের মতোই, যার কারণে সংশ্লিষ্ট কিছু মানুষ হারাম হয়ে যায়। কারণ দুধ পান কম হোক বা বেশি হোক, তার ফলে কিছু না কিছু গোশত ও হাত তৈরি হয়ই। এ মতটি আলি রা. ইবনে আব্বাস রা. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, যুহরি, হাসান বাসরি, কাতাদা, হাম্মাদ, আওযায়ি, ছাওরি, আবু হানিফা, মালেক ও আহমদের একটি রেওয়ায়াত অনুসারে।

২. পৃথকভাবে কমের পক্ষে পাঁচবার দুধ পান করা ছাড়া কোনো মানুষ হারাম হয় না। কেননা মুসলিম, আবু দাউদ, ও নাসায়ি বর্ণনা করেছেন, আয়েশা রা. বলেছেন : প্রথমে কুরআনে নাযিল হয়েছিল : "দশবার দুধ পান করলে তা হারাম করে?" অতপর তা "পাঁচবার" দ্বারা পরিবর্তিত হয়। এরপর রসূলুল্লাহ্ সা. যখন ইন্তিকাল করলেন, তখনো এই পাঁচবার" কথাটা কুরআনে ছিলো ও পঠিত হতো।"

এ বর্ণনা কুরআন ও সুন্নাহর শর্তহীন বক্তব্যকে শর্তযুক্ত করে দেয়। শর্তহীন বক্তব্যকে শর্তযুক্ত করা দ্বারা আগের উক্তিকে রহিতও করা হয় না, অনির্দিষ্ট বক্তব্যকে নির্দিষ্টও করা হয়না। বরং এ দ্বারা একটা অস্পষ্ট বক্তব্যকে স্পষ্ট করা হয় মাত্র। এই মতটির বিরুদ্ধে এরূপ আপত্তি তোলা হয়েছে যে, কুরআনের কোনো অংশ 'মুতাওয়াতির' (বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা কর্তৃক শ্রুত, স্মৃতিতে সংরক্ষিত ও বর্ণিত) হওয়া ছাড়া প্রামাণ্য ও গ্রহণযোগ্য হয়না। এ আপত্তি যদি না তোলা হতো এবং আয়েশা রা. যা বলেছেন, ব্যাপারটা যদি সে রকমই হতো, তাহলে বিরোধীদের নিকট তা অজানা থাকতো না, বিশেষত: আলি রা. ও ইবনে আব্বাসের নিকট তো নয়ই। আমাদের বক্তব্য হলো, এ মতটির বিরুদ্ধে যদি এ আপত্তি না তোলা হতো, তাহলে এটাই হতো সবচেয়ে শক্তিশালী মত। এ কারণেই ইমাম বুখারি এই বর্ণনা প্রত্যাহার করেছেন। এটা আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর, আতা, তাউস, শাফেয়ী, ইবনে হাযম ও অধিকাংশ হাদিস বিশারদের মত। এটি আয়েশা রা. থেকেও একটি রেওয়ায়াতে বর্ণিত এবং ইমাম আহমদেরও সর্বাধিক পরিচিত মত।

৩. তিন বা ততোধিকবার দুধ পান করলেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ হারাম হয়ে যাবে। কেননা রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : "এক ঢোক বা দুই ঢোক দুধ পান করলে তা কাউকে হারাম করে না।" এ দ্বারা স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত, তিনবারের কম দুধ পান দ্বারা কেউ নিষিদ্ধ হয় না। বরং দু'বারের উপরে দুধ পান দ্বারাই নিষিদ্ধ হতে পারে। এটা আবু উবাইদ, আবু ছাওর, দাউদ যাহেরি, ইবনুল মুনযির ও আহমাদ থেকে প্রাপ্ত একটি বর্ণনা মত।

ধাত্রীর দুধ শর্তহীনভাবে নিষিদ্ধ করে : ধাত্রীর দুধ দ্বারা দেহের পুষ্টি সাধন হলেই তা দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ নিষিদ্ধ হবে, চাই শিশু স্তন চুষে দুধ পান করুক অথবা স্তন নিংড়িয়ে দুধ বের করে শিশুর গলায় ঢেলে দেয়া হোক, কিংবা অন্য কোনোভাবে তার পাকস্থলীতে ঢোকানো হোক, যা দ্বারা শিশুর পুষ্টি হয়, ক্ষুধা দূর হয় এবং একবার দুধ পান করার সমান

হয়। কেননা এ দ্বারা দুধ পানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, গোশত ও হাড় তৈরি হয়। নিষিদ্ধকরণে এর ভূমিকা স্বাভাবিক দুধ পানের মতই।

অন্য জিনিসের সাথে মিশ্রিত স্তনের দুধ : যখন কোনো মহিলার দুধ কোনো খাবারের সাথে, পানীয়ের সাথে, ওষুধের সাথে বা ছাগল বা অন্য কোনো জন্তুর দুধের সাথে মিশ্রিত হয় এবং দুগ্ধপোষ্য শিশু তা পান করে, তখন তাতে যদি মহিলার দুধের পরিমাণ বেশি থাকে, তাহলে তা নিষিদ্ধ করবে। নচেত নিষিদ্ধ করবে না। এটা হানাফী মাযহাবের মত। মুযনি এবং আবু ছাওরের মতও তদ্রূপ।

মালেকী মাযহাবের ইবনুল কাশেম বলেছেন : মহিলার দুধ যখন পানিতে বা অন্য কিছুতে মিশে যায়, তারপর তা শিশুকে পান করানো হয়, তখন তা নিষিদ্ধকারী হয়না। শাফেয়ী, ইবনে হাবিব, মুতরাফ ও ইবনে মাজেসুন মালেকীর মতে এতেও নিষিদ্ধ হবে। যেমন দুধ যদি না মিশতো কিংবা মিশলেও তার আকৃতি অবিকৃত থাকতো তাহলে নিষিদ্ধ হতো।

ইবনে রুশদের অভিমত : ইবনে রুশদ বলেন, ফকীহদের মতভেদের কারণ হলো, দুধ যখন অন্য খাবারের সাথে মিশ্রিত হয়, তখন নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা কি তাতে বহাল থাকে, না কি থাকে না? কোনো নাপাক জিনিস পাক জিনিসের সাথে মিশ্রিত হলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, এখানেও সেই অবস্থার সৃষ্টি হয়। এখানে যে মূলনীতি অবলম্বন করা হয় তা হলো তাকে দুধ বলে অভিহিত করা যায় কিনা। যদি করা যায়, তাহলে নিষিদ্ধ করবে, নচেত করবেনা।

ধাত্রীর বিবরণ : যে ধাত্রীর দুধ দ্বারা নিষিদ্ধ হয়, সে সাবালিকা হোক বা নাহোক এবং মাসিক ঋতুস্রাব থেকে অব্যাহতি লাভ করুক বা না করুক, তাতে কিছু আসে যায়না। স্তনে দুধ থাকা ও তা ঝরাই যথেষ্ট। সে সধবা না বিধবা, গর্ভবতী না অগর্ভবতী তাও বিবেচ্য বিষয় নয়।

দুধ খাওয়ার বয়স : যে দুধ পান কাউকে নিষিদ্ধ করে, তা শিশুর দু'বছর বয়সের মধ্যেই সম্পন্ন হওয়া শর্ত। এটা স্বয়ং আল্লাহই নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ বলেন :

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ط

"মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পুরো দু'বছর দুধ খাওয়াবে। এটা সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে দুধ খাওয়ানোর মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়।" কেননা দুগ্ধ পালিত শিশু এই সময় এত ছোট থাকে যে, দুধ তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। দুধ দ্বারা তার গোশত তৈরি হয়। ফলে সে যার দুধ খায়, তার দেহের অংশে পরিণত হয়ে যায়। তাই ধাত্রী যেমন তার সন্তানদের জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যায়, তেমনি নিষিদ্ধ হয়ে যায় তার দুধ পালিত শিশুর জন্যে।

দারু কুতনী ও ইবনে আদী ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : "কেবল দু'বছরের মধ্যেই দুধ খাওয়াতে হবে।"

আর রসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণিত : "যতোদিন হাড় শক্ত হবে ও গোশত তৈরি হবে, ততোদিনই দুধ খাওয়ানো চলবে।" -আবু দাউদ। বস্তুতঃ দু'বছর বয়সের মধ্যেই হাড় শক্ত হয় এবং গোশত তৈরি হয়।

উম্মে সালামা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "দুধ পান দ্বারা তখনই কোনো মানুষ

নিষিদ্ধ হয়, যখন তা পরিপাক তন্ত্রের আন্তসংযোগ ও পুষ্টি সাধন করে এবং যা দুধ ছাড়ানোর বয়সের আগে সম্পন্ন হয়।" -তিরমিযি কর্তৃক বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত ও বর্ণিত।

কোনো দুধ পালিত শিশু যদি দু'বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই দুধ খাওয়া ছেড়ে দেয় এবং সাধারণ খাবার গ্রহণ করে দুধ থেকে অব্যাহতি নেয়, তারপর পুনরায় কোনো মহিলা তাকে দুধ খাওয়ায়, তবে আবু হানিফা ও শাফেয়ীর মতে তা দ্বারা ঐ মহিলা নিষিদ্ধ হবে। কেননা রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যই তো দুধ খাওয়া।" ইমাম মালেকের মতে, দু'বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পরে দুধ খাওয়া আর পানি খাওয়া একই কথা। বেশি থাক বা কম থাক, তাতে কেউ নিষিদ্ধ হয়না।

তিনি বলেছেন : "শিশু যখন দু'বছর পূর্ণ হওয়ার আগে দুধ ছেড়ে দেয় অথবা দুধ খাওয়া থেকে বিরত থেকে তার প্রতি অনিহা প্রদর্শন করে, তখন এরপরে যা কিছুই দুধ খাক, তার কারণে কেউ নিষিদ্ধ হবেনা।"

বয়স্কের দুধ পান : উল্লিখিত কারণে বয়স্ক মানুষ দুধ পান করলে উপরোক্ত প্রমাণাদির ভিত্তিতে অধিকাংশ আলেমের মতে তাতে কেউ নিষিদ্ধ হবেনা। কিন্তু একদল আলেম মনে করেন, দুধ পানকারীর বয়স যতো বেশিই হোক, শিশুর দুধ পানের মতোই তাতে সংশ্লিষ্টরা নিষিদ্ধ হবে। এটা আয়েশা রা. আলী রা. উরওয়া ইবনুয যুবাইর রা. আতা ইবনে আবি রিবাহ, লাইছ বিন সা'দ ও ইবনে হাযমের মত। এর পক্ষে তারা প্রমাণ দর্শান ইবনে শিহাব থেকে মালেক কর্তৃক বর্ণিত হাদিস থেকে : ইবনে শিহাবকে বয়স্ক ব্যক্তির দুধ খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : উরওয়া ইবনে যুবাইর রা. আমাকে জানিয়েছেন যে, রসূলুল্লাহ সা. সাহলা বিনতে সুহায়েলকে আদেশ দিয়েছিলেন সালেমকে দুধ খাওয়াতে। তদনুসারে তিনি দুধ খাওয়ালেন। সাহলা তাকে নিজের ছেলে মনে করতেন। উরওয়া বলেন : আয়েশা রা. সাহলা যা করেছেন, তার অনুসরণ করতেন এবং যে সকল ছেলের তার কাছে যাওয়া তিনি পছন্দ করতেন, তাদেরকে দুধ পান করাতেন। উপরন্তু তিনি তার বোন উম্মে কুলসুম ও তার ভাইঝিদেরকে আদেশ দিতেন যেন তারা যে সকল ছেলের তার কাছে যাওয়া পছন্দ করতেন তাদেরকে যেন দুধ পান করায়। মালেক ও আহমদ বর্ণনা করেছেন : আবু হুযায়ফা সালেমকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন জনৈকা আনসারি মহিলার মুক্ত গোলাম। রসূল সা. যেমন যায়েদকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, ঠিক তেমনি আবু হুযায়ফা সালেমকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আর জাহেলি যুগের রেওয়াজ ছিলো, কেউ যদি কোনো ছেলেকে পালিত পুত্ররূপে গ্রহণ করতো, তাহলে জনগণ তাকে তার ছেলে বলে আখ্যায়িত করতো এবং সে তার উত্তরাধিকারও পেতো। এ রেওয়াজ সূরা আহযাবের নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হওয়া পর্যন্ত চালু ছিলো : "তোমরা তাদেরকে তাদের বাবার নামে ডাকো। এটাই আল্লাহর নিকট অধিকতর ন্যায়সঙ্গত। আর যদি তোমরা তাদের বাবার পরিচয় না জানো, তাহলে তারা তোমাদের দীনি ভাই এবং তোমাদের বন্ধু তো বটেই।" এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর লোকেরা তাদেরকে তাদের বাবাদের কাছে ফিরিয়ে দেয়। যাদের পিতৃ পরিচয় জানা যায়নি, তাদেরকে বন্ধু ও দীনি ভাইরূপে গণ্য করে। এরপর সাহলা এসে বললো : হে রসূলুল্লাহ, আমরা সালেমকে নিজের ছেলে হিসেবে দেখতাম, আমার সাথে ও আবু হুযায়ফার সাথে থাকতো এবং আমাকে সাংসারিক কাজকর্মে নিয়োজিত অবস্থায় এক কাপড়ে দেখতো। অথচ আপনি তো ভালো করেই জানেন আল্লাহ তার মতো পালিত

পুত্রদের সম্পর্কে কী নাযিল করেছেন। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন : "ওকে পাঁচবার দুধ খাইয়ে দাও।" এর ফলে সে দুধ ছেলেতে পরিণত হলো। (অর্থাৎ এরপর তার সামনে পর্দা করার প্রয়োজন রইল না)।

যয়নব বিনতে উম্মে সালামা রা. বর্ণনা করেন : উম্মে সালমা আয়েশা রা. কে বললেন : তোমার কাছে যে উঠতি বয়সের ছেলেটা আসা যাওয়া করে, সে আমার কাছে আসা যাওয়া করুক, তা আমি পছন্দ করবোনা।" আয়েশা রা. বললেন : তোমার জন্য কি রসূলুল্লাহর সা. মধ্যে কোনো উত্তম আদর্শ নেই? উম্মে সালামা বললেন : আবু হুযায়ফার স্ত্রী বলেছিল, হে রসূলুল্লাহ, সালেম আমার কাছে আসা যাওয়া করে। অথচ সে একটা পুরুষ (বয়স্ক কিশোর)। আর আবু হুযায়ফা তার আসা যাওয়াকে ভালো চোখে দেখেনা। তখন রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন : "ওকে দুধ খাইয়ে দাও, যাতে তোমার কাছে আসা যাওয়া করতে পারে।"

এই দুটো বক্তব্যের মধ্য থেকে যে জিনিসটি গ্রহণযোগ্য, তা আল্লামা ইবনুল কাইয়েমের বিশ্লেষণে স্পষ্ট। তিনি বলেছেন : "সাহলার হাদিস মানসুখও (রহিত) নয়, ব্যতিক্রমীও নয় এবং সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্যও নয়। বরঞ্চ ওটা হচ্ছে কেবল প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে একটু রেয়াত বা নমনীয়তা, যা মহিলার নিকট আসা যাওয়া না করেই পারেনা অথচ মহিলার জন্য তার থেকে পর্দা করাও নিদারুণ কষ্টকর। এমন ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট। এর একটি উদাহরণ হলো, আবু হুযায়ফার স্ত্রীর সাথে সালেমের অবস্থা। এ ধরনের বয়স্ক কিশোরকে যখন প্রয়োজনের খাতিরে মহিলা দুধ খাইয়ে দেয়, তখন সেই দুধ খাওয়ানো কার্যকর হবে। কিন্তু এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে শিশু অবস্থায় ব্যতিত দুধ খাওয়ানোতে লাভ হবেনা। এটা শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ারও অভিমত।

এছাড়া অন্য যেসব হাদিসে বয়স্ককে দুধ খাওয়ানোর অনুমতি পরিলক্ষিত হয়, তা যদি সংশ্লিষ্ট হাদিসে শর্তহীন থাকে তবে সেটা সাহলার হাদিস দ্বারা শর্তযুক্ত হবে। আর যদি দৃশ্যত সকল অবস্থায় প্রযোজ্য প্রতীয়মান হয়, তবে উল্লিখিত অতীব প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রের সাথে তা নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। এটা হাদিসকে মানসুখ বা রহিত মেনে নেয়া বা ব্যক্তি বিশেষের সাথে নির্দিষ্ট মনে করার চেয়ে ভালো। এ ব্যাখ্যা উভয় পক্ষ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সকল হাদিসের উপর আমল করার জন্য অধিকতর উপযোগী ও সহজতর। তাছাড়া শরিয়তের মূলনীতিও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

দুধ খাওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দান : দুধ খাওয়ার ব্যাপারে একজন মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য, যদি সে ধাত্রী হয়। কেননা উকবা ইবনুল হারিছ বর্ণনা করেন, তিনি উম্মে ইয়াহিয়াকে বিয়ে করার পর সহসা জনৈকা কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা এসে বললো, আমি তোমাদের দু'জনকেই দুধ খাইয়েছি। একথা শুনে আমি পৃথক হয়ে গেলাম এবং রসূল সা.কে জানালাম। তিনি বললেন : সে কিভাবে দাবি করলো যে, সে তোমাদের দু'জনকে দুধ খাইয়েছে? অতপর তিনি তাকে উম্মে ইয়াহিয়ার সাথে মেলামেশা করতে নিষেধ করে দিলেন। তাউস, যুহরি, আওযায়ি, প্রমুখ এবং একটি বর্ণনা অনুসারে আহমদও এ হাদিস দ্বারা প্রমাণ দর্শান যে, একজন মহিলার সাক্ষ্য দুধ খাওয়ার ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য। তবে অধিকাংশ আলেমের মতে, ধাত্রীর সাক্ষ্য এ ব্যাপারে যথেষ্ট নয়। কেননা এটা তার নিজের কাজের ব্যাপারে দেয়া সাক্ষ্য। উমর, মুগীরা, আলি ও ইবনে আব্বাস রা. এরূপ সাক্ষ্যের

ভিত্তিতে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো থেকে বিরত থাকতেন বলে আবু উবাইদ জানিয়েছেন। উমর রা. বলেছেন : "কোনো অকাট্য সাক্ষ্য প্রমাণ যদি পাও, তবে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাও। নচেত স্বামী ও স্ত্রী যেমন আছে তেমন থাকতে দাও। অবশ্য তারা যদি স্বেচ্ছায় সতর্কতাবশত আলাদা হয়ে যেতে চায় তবে সেটা ভিন্ন কথা।"

হানাফী মাযহাব মতে দুধ খাওয়ার ব্যাপারে দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রী লোকের সাক্ষ্য জরুরি। এতে কেবল মহিলার সাক্ষী গ্রহণ করা হবেনা। কেননা আল্লাহ বলেছেন : "তোমাদের পুরুষদের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী সংগ্রহ করে নিয়ে এসো। দু'জন পুরুষ যদি না পাওয়া যায়, তাহলে এমন একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রী লোক সাক্ষী প্রয়োজন, যাদেরকে তোমরা গ্রহণযোগ্য মনে করো।"

বায়হাকি বর্ণনা করেন : উমর রা.-এর নিকট এমন একজন মহিলাকে আনা হলো, যে জনৈকা পুরুষ ও তার স্ত্রী সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিলো যে, সে তাদেরকে দুধ খাইয়েছে। একথা শুনে উমর রা. বললেন : "না, যতোক্ষণ দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রী সাক্ষ্য না দেবে, ততোক্ষণ আমি এ সাক্ষ্য গ্রহণ করবোনা।"

ইমাম শাফেয়ীর মতে, এতেও প্রমাণিত হবে, আবার চারজন স্ত্রীর সাক্ষ্য দ্বারাও প্রমাণিত হবে। কেননা দু'জন মহিলা একজন পুরুষের সমকক্ষ। তাছাড়া প্রসবের ন্যায় দুধ খাওয়ার ব্যাপারটাও মহিলারা বেশি জানে। ইমাম মালেকের মতে, দুধ খাওয়ার বিষয়ে দু'জন মহিলার সাক্ষ্য এই শর্তে গ্রহণযোগ্য যদি সাক্ষ্য দানের আগেই তাদের দুধ খাওয়া সংক্রান্ত বক্তব্য জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়ে যায়।

ইবনে রুশদ বলেন : কেউ কেউ উকবার হাদিসকে মুস্তাহাব অর্থে গ্রহণ করেছেন। একটি বর্ণনা মতে এটি ইমাম মালেকেরও মত।

ধাত্রীর স্বামী দুধ খাওয়া শিশুর বাবা : যখন কোনো মহিলা কোনো শিশুকে দুধ খাওয়ায়, তখন তার স্বামী দুধ খাওয়া শিশুর বাবা হয়ে যায়। আর তার ভাই হয়ে যায় চাচা। এর প্রথম প্রমাণ ইতিপূর্বে বর্ণিত হুযায়ফার হাদিস। আর দ্বিতীয় প্রমাণ আয়েশা রা. বর্ণিত হাদিস। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "হে আয়েশা, আবুল কুয়াইসের ভাইকে বাড়ির মধ্যে আসার অনুমতি দাও। কারণ সে তোমার চাচা।" আবুল কুইয়াসের স্ত্রী আয়েশাকে রা. দুধ খাইয়েছিল।

ইবনে আব্বাস রা.কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল : এক ব্যক্তির দু'জন দাসী তাদের একজন একটি দাসীকে এবং অপরজন একজন দাসকে দুধ খাওয়ালো। এই দাস কি দাসীটিকে বিয়ে করতে পারবে? তিনি জবাব দিলেন : না। কারণ স্তনদানকারিণী একজনই।" এটা চার ইমাম, আওযায়ি ও ছাওরির অভিমত। সাহাবিদের মধ্য থেকে আলি ও ইবনে আব্বাসের মতও অনুরূপ।

স্তনের দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে শৈথিল্য : স্তন দানের ব্যাপারে অনেকেই শৈথিল্য প্রদর্শন করে। সন্তানকে যে কোনো এক বা একাধিক মহিলার দুধ খাওয়ায়। অথচ যে মহিলার দুধ খাওয়ানো হলো, তার সন্তান, ভাইবোন ও ভিন্ন স্ত্রীর গর্ভ জাত ও তার স্বামীর সন্তানদের ও ভাইবোনদের চিনে রাখার কোনো প্রয়োজন অনুভব করেনা। ফলে স্তন দুধ খাওয়ানোর কারণে বিয়ে হারাম হওয়াসহ যেসব বিধিবিধান বলবত হয় এবং শরিয়তের পক্ষ থেকে স্তন দুধ খাওয়ানো জনিত এই নতুন আত্মীয়তাকে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তার সমমর্যাদা দেয়ার

কারণে এর সাথে যে সকল হক সম্পৃক্ত হয়, সেই সবই তাদের অজানা থেকে যায়। আর অজানা থাকার কারণে অনেকে নিজের দুধ বোন, দুধ ফুফু, দুধখালাকে বিয়ে করে থাকে। অথচ এ ক্ষেত্রে সতর্কতা করা জরুরি। যাতে মানুষ নিষিদ্ধ কাজে জড়িত হয়ে না পড়ে।

বিয়ে নিষিদ্ধকরণের যৌক্তিকতা

তাফসীর আল মানারের ৪র্থ খণ্ডের ৪৭০ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে : "আল্লাহ তায়ালা মানব সমাজে বহু রকমের সম্পর্কের সৃষ্টি করেছেন, যাকে উপলক্ষ করে তারা পরস্পরের প্রতি মায়া মমতা ও দয়া দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করে এবং যার দ্বারা তারা বিভিন্ন ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধে ও সাফল্য অর্জনে পরস্পরে সহযোগিতা করে। এসব সম্পর্কের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী সম্পর্ক হচ্ছে রক্ত সম্পর্ক ও বৈবাহিক সম্পর্ক। এই দুটো সম্পর্কেরই বিভিন্ন মাত্রার বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা রয়েছে। রক্ত সম্পর্কের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী সম্পর্ক হলো পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যকার ও সন্তানদের পরস্পরের মধ্যকার স্নেহ ও মমতার স্বতঃস্ফূর্ত সম্পর্ক। কেউ যদি সন্তানের প্রতি পিতার স্নেহ বাৎসল্যের রহস্য অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়, তাহলে দেখতে পাবে, তার হৃদয়ে এমন একটা জন্মগত আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান, যা তাকে অন্তত তার সমান করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে লালন পালন করতে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে সে সন্তানের দিকে এমনভাবে তাকায় যেন, তার নিজ অংগ প্রত্যংগের দিকে তাকাচ্ছে। সে আগামী দিনে সন্তানের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। আর সন্তানের মনে সে এরূপ অনুভূতি দেখতে পায় যে তার বাবাই তার অস্তিত্বের উৎস, তার শিক্ষাদীক্ষার নিয়ামক ও মর্যাদার প্রতীক। এই অনুভূতির কারণেই সন্তান বাবাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে। আর সেই স্বতঃস্ফূর্ত মায়া ও মমতার কারণেই বাবা সন্তানকে স্নেহ করে ও সাহায্য করে। এ কথা বলেছেন ইমাম মুহাম্মদ আবদুহু।

এ কথা সবার জানা, সন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহ বাবার স্নেহের চেয়ে অনেক বেশি জোরদার। তার দয়া ও মমতা বাবার দয়া ও মমতার চেয়ে শক্তিশালী ও গভীর। কেননা মা অধিকতর বিনম্র ও কোমল এবং অধিকতর তীব্র অনুভূতিপ্রবণ। তাছাড়া সন্তান যখন মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, তখন মায়ের রক্ত থেকেই জন্ম গ্রহণ করে। আর রক্ত হচ্ছে তার জীবনের মৌলিক উপাদান। জন্মের পর শিশু সন্তান যখন মায়ের দুধ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে, তখন তার স্তন থেকে দুধ চুষে খাওয়ার সময় প্রত্যেক চোষার সাথে সাথে নতুন করে সে স্নেহ মমতা লাভ করে।

এই স্নেহ মমতার ধারা মায়ের হৃদয় থেকেই উৎসারিত হয়। ফলে শিশু পৃথিবীতে মাকেই সর্বপ্রথম ভালোবাসতে শেখে। মায়ের আগে আর কারো সাথে তার স্নেহ মমতার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়না। মায়ের পরে সে ভালোবাসে বাবাকে। কিন্তু তা মায়ের চেয়ে কম, যদিও সে মায়ের চেয়ে বাবাকে অধিক শ্রদ্ধা করে। তাই পিতামাতা ও সন্তানের মাঝে জন্মলগ্ন থেকেই সৃষ্ট এই সুগভীর মায়া মমতা পার্থিব জীবনের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও পবিত্র সম্পর্ক। এই মহৎ ও পবিত্র সম্পর্কে যদি কামোদ্দীপনার লেশমাত্রও মিশ্রণ থাকতো, তাহলে সেটা কি মানুষের সহজাত স্বভাব প্রকৃতির উপর আগ্রাসন হতোনা? এতে কি ঐ পবিত্রতম সম্পর্কটি বিনষ্ট হতোনা? অবশ্যই হতো। আর এজন্যই আয়াতে মায়েদের বিয়ে নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। আর মায়ের পরই উল্লিখিত হয়েছে মেয়ের নিষিদ্ধ হওয়ার বিধি। সহজাত স্বভাবপ্রকৃতির উপর আগ্রাসন

চালানো, তা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা ও তার ক্ষতিসাধন করার প্রবণতা থেকে সাধারণভাবে মানুষকে সুরক্ষিত করা হয়েছে। নচেত যে কোনো সুস্থ প্রকৃতিসম্পন্ন মানুষ মা ও মেয়েকে নিষিদ্ধকরণের এ বিধি দেখে বিস্ময়বোধ করতো। কেননা তার প্রকৃতি আপনা থেকেই উপলব্ধি করে যে, মা ও মেয়েকে বিয়ে করার প্রতি আগ্রহী হওয়া অসম্ভব। ভাই ও বোনের সম্পর্কটাও মাতাপিতা ও সন্তানের সম্পর্কের মতোই। কেননা তারা একই দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মতো। ভাই ও বোনের জন্মের উৎস তারা একই মাতাপিতার সন্তান। তারা উভয়ে একই মাতাপিতার সাথে সমভাবে সম্পৃক্ত। এতে কোনো পার্থক্য ও ভেদাভেদ নেই। তাছাড়া তারা উভয়ে একই মায়ের কোলে লালিত পালিতও। এই লালনপালনও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে একই পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়ে থাকে। উভয়ের মধ্যকার ভ্রাতৃত্বের বন্ধনও একই ধরনের মায়ামমতায় মণ্ডিত। একজনের মধ্যকার বন্ধন আরেক জনের মধ্যকার বন্ধনের চেয়ে বেশি শক্তিশালী নয়। যেমন পিতা ও মাতার সন্তান বাৎসল্য সন্তানের পিতৃ বা মাতৃ বাৎসল্যের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। এজন্য ভাইবোনের পরস্পরের প্রতি মমত্ববোধ সমভাবাপন্ন, যার সাথে অন্য কোনো মমত্ববোধের তুলনা হয়না। মানব সমাজে বিদ্যমান আর কোনো সম্পর্ক ও বন্ধনে এমন পরিপূর্ণ সমতা ও এমন মমতা ও বিশ্বস্ততার অস্তিত্ব নেই।

কথিত আছে, ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম মুসলিম শাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নিকট জনৈকা মহিলা তার স্বামী, ছেলে ও ভাই-এর প্রাণভিক্ষা চেয়েছিল। হাজ্জাজ উক্ত তিনজনকেই হত্যা করতে বদ্ধপরিকর ছিলো। হাজ্জাজ জানিয়ে দিলো তার অনুরোধে সে উক্ত তিনজনের একজনকে প্রাণভিক্ষা দেবে। মহিলা যে কোনো একজনকে নির্বাচন করতে পারে। মহিলা তার ভাইকে নির্বাচন করলো। হাজ্জাজ এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে জানালো : "ভাই এর কোনো বিকল্প নেই। কেননা পিতামাতা মারা গেছে। স্বামী মারা গেলে আর একজন স্বামী গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে। আর সন্তান মারা গেলেও পুনরায় সন্তান পাওয়া যেতে পারে।" হাজ্জাজ এ জবাব শুনে মুগ্ধ হলো এবং তিনজনকেই মুক্তি দিলো। হাজ্জাজ বললো : "সে যদি ভাই এর পরিবর্তে স্বামীকে নির্বাচন করতো, তাহলে আমি কাউকেই প্রাণভিক্ষা দিতামনা।"

মোট কথা, ভাই বোনের সম্পর্ক জন্মগত ও অটুট সম্পর্ক। ভাই ও বোন পরস্পরকে ভোগ করতে উৎসুক হয়না। কেননা ভ্রাতৃত্বের বন্ধন নিজেই মানুষের উপর এমন দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা আরোপ করে, যা প্রকৃতির নির্দেশিত সম্পর্ক ছাড়া তাদের মধ্যে অন্য কোনো সম্পর্কের অবকাশ রাখেনা। তাই শরিয়তের বিধানের বিচক্ষণতা এই যে, বোন বিয়ে করাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, যাতে স্বাভাবিক জৈবিক চাহিদা মেটাতে মানুষ ভাইবোনের পবিত্র সম্পর্ককে কলুষিত না করে ভিন্ন পথ খুঁজে নেয়।

ফুফু ও খালার বিয়ে নিষিদ্ধ করার যুক্তি হলো, তারা মা বাবার মতোই রক্ত সম্পর্কীয়।

রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : চাচা হলো পিতার মতো। অর্থাৎ তারা এক জোড়া গাছের মতো। যা একই মূল থেকে নির্গত। আর যেহেতু চাচা ও ফুফুর সাথে বিদ্যমান সম্পর্ক পিতৃত্ব থেকে এবং মামা ও খালার সাথে বিদ্যমান সম্পর্ক মাতৃত্ব থেকে উদ্ভূত, তাই এরই সূত্র ধরে ফকীহগণ বলেছেন : নানী ও দাদীর নিষিদ্ধ হওয়া মায়ের নিষিদ্ধ হওয়ারই ফল ও তার আওতাভুক্ত। আর সে কারণে চাচা-ফুফু ও মামা-খালার সাথে বিদ্যমান মমতার বন্ধন সযত্নে সংরক্ষণ করা, তাদের সাথে সৌহার্দ্য ও সহযোগিতা বজায় রাখা ও তাদের

সাথে কোনো যৌন সম্পর্ক না হওয়া স্বভাবধর্ম ইসলামের সৌন্দর্যেরই দাবি। এই দাবি বাস্তবায়িত হতে পারে ফুফু ও খালার বিয়ে নিষিদ্ধকরণেরই মাধ্যমে। আর ভাতিজী ও ভাগ্নির নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ এই যে, তারা নিজের মেয়ের পর্যায়ভুক্ত। কেননা ভাই ও বোন নিজের মতোই। তবে একথা সত্য, নিজের মেয়ের প্রতি মানুষের স্নেহ ও ভালোবাসা ভাতিজী ও ভাগ্নের স্নেহের চেয়ে অধিকতর জোরদার। কেননা মেয়ে যেমন তার লালন পালনে ও স্নেহযত্নে বড় হয়েছে, ভাতিজী ভাগ্নি তা হয়নি। আর ভাই ও বোনের প্রতি যে ভালোবাসা, তা তাদের মেয়েদের প্রতি ভালোবাসার চেয়ে বেশি গভীর হয়ে থাকে।

ফুফু ও খালার সাথে ভাগিনী ও ভাতিজীর পার্থক্য হলো। ভাগিনী ও ভাতিজীর প্রতি মমত্ব ও ভালোবাসা স্নেহজাত, আর ফুফু ও খালার প্রতি মমত্ব ও ভালোবাসা সম্মান ও শ্রদ্ধাজনিত। কামোদ্দীপনাজনিত সম্পর্ক থেকে উভয়ই সমান দূরত্বে অবস্থিত। পবিত্র কুরআনের বর্ণনার ধারাবাহিকতায় খালা ও ফুফুর উল্লেখ প্রথমে হওয়ার কারণ হলো, তারা বাবা ও মার নিকটতর। তাই তাদের সাথে বিদ্যমান সম্পর্ক ভাই ও বোনের সাথে সম্পর্কের চেয়ে অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন ও সম্মানার্হ।

এ হচ্ছে সেসব নিকটাত্মীয়ের কয়েকটি শ্রেণী, যার মাধ্যমে মানুষ পরস্পরে মায়া, মমতা, স্নেহ, প্রীতি ও সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং যার প্রতি আল্লাহ মানুষের মনে প্রচুর আকর্ষণ, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সৃষ্টি করেছেন। আর এ কারণেই আল্লাহ এসব নিকটাত্মীয়ের মধ্যে বিয়ে হারাম করেছেন, যাতে দাম্পত্য সম্পর্ক অপেক্ষাকৃত দূরের লোকদের মধ্যে গড়ে ওঠে। যাদের মধ্যে সম্পর্ক দুর্বলতর, যেমন অনাত্মীয় ও নিকটাত্মীয়দের দূরবর্তী স্তরের আত্মীয়, যেমন ফুফাতো চাচাতো মামাতো ও খালাতো ভাইবোন ইত্যাদি। এভাবে মানব জাতির মধ্যে নিত্য নতুন বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যা প্রীতি ও ভালোবাসায় রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তার মতই গাঢ় ও নিবিড় হয়। ফলে মানুষের মধ্যে প্রীতি ভালোবাসার সম্পর্ক ব্যাপকতর হতে থাকে। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধকরণে শরিয়তের বিধির যৌক্তিকতা এখানেই নিহিত।

ইমাম মুহাম্মদ আবদুহু এরপর বলেন : এর পেছনে একটা বিরাট জৈব ও দৈহিক যুক্তিও নিহিত রয়েছে। সেটি হলো, নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক প্রজনন দুর্বলতার একটা উল্লেখযোগ্য কারণ। এ সম্পর্ক যখন ধারাবাহিকভাবে ও অব্যাহতভাবে চলতে থাকে, তখন এই দুর্বলতাও অব্যাহত থাকে যতোক্ষণ না এই ধারা বন্ধ হয়। এই দুর্বলতা দুই কারণে দেখা দেয় : প্রথমতঃ ফকীহগণ যেমন উল্লেখ করেছেন, প্রজনন ক্ষমতার তীব্রতা স্বামী ও স্ত্রীর যৌন উদ্দীপনার তীব্রতা অনুসারে হয়ে থাকে। কিন্তু এ জিনিসটা নিকটাত্মীয়দের মধ্যে অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়ে থাকে বলে অনেকের ধারণা। আর এ কারণেই তারা চাচাতো ও ফুফাতো বোন ইত্যাদি বিয়ে করা মাকরূহ বলে রায় দিয়েছেন। এর কারণ হলো, কামোদ্দীপনা একটা মানসিক চেতনার নাম, আত্মীয়তাজনিত প্রীতির অনুভূতি তার বিপরীত জিনিস। শেষোক্তটি প্রথমোক্তটিকে হয় বিনষ্ট করবে, নতুবা দুর্বল ও নড়বড়ে করে দেবে। দ্বিতীয় কারণ চিকিৎসাবিদদের নিকট পরিচিত। সাধারণ মানুষকে বুঝাতে একটা উদাহরণ ব্যবহৃত হয়, যা কৃষকদের নিকট পরিচিত। সেটি হলো, যে জমিতে বারবার একই ধরনের শস্যের বীজ বোনা হয়, সেখানে ক্রমান্বয়ে এই ফসলের উৎপাদন কমতে থাকবে। কমতে কমতে এক সময় গোটা উৎপাদন শূন্যের কোঠায় চলে যাবে। কেননা যেসব উপকরণ থেকে এর প্রধান খাদ্য সংগৃহিত হয়, তা প্রয়োজনের চেয়ে

কম, আর যেসব উপকরণ থেকে শস্যের খাদ্য ও পুষ্টি সংগৃহিত হয়না, তা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি বিদ্যমান। অথচ শেষোক্তটি তার খাদ্য গ্রহণের পথে অন্তরায়। ঐ শস্য যদি অন্য জমিতে অন্য শস্য বোনা হতো তাহলে দুটোই প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো। কৃষকদের কাছে এটা একটা জাজ্বল্যমান সত্য। কোনো শস্যের বিভিন্ন প্রকারের বীজ বোনা অধিকতর ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, যখন কোনো বিশেষ ধরনের গম বীজ কোনো জমিতে বোনা হয়। অতপর তার ফসল থেকে বীজ গ্রহণপূর্বক ঐ একই জমিতে তা বপন করা হয়। তখন তার ফসল অপেক্ষাকৃত কম উৎপন্ন হয়। আর যখন অন্য শ্রেণীর গম থেকে বীজ নিয়ে তা ঐ জমিতে বপন করা হয়, তখন তা অপেক্ষাকৃত বেশি ফসল জন্মায়। তদ্রূপ মহিলারাও এক ধরনের শস্য ক্ষেত। সেখানে সন্তানের বীজ বোনা হয়। আর বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর মানুষ বিভিন্ন শ্রেণীর ফসল ও বীজের মতো। সুতরাং এক বংশের পুরুষের অন্য বংশে বিয়ে করাই বাঞ্ছনীয়, যাতে নির্ভেজাল সন্তান জন্মে। কেননা সন্তান তার মাতাপিতার মেজাজ, তাদের দৈহিক গঠন ও উপাদান, তাদের স্বভাব চরিত্র এবং আত্মীক বৈশিষ্ট্যসমূহ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে থাকে। আবার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যে সন্তান মা বাবার বিপরীতও হয়ে থাকে। বস্তুত উত্তরাধিকার সূত্রে পিতামাতার গুণ বৈশিষ্ট্য কিংবা তার বিপরীত গুণ বৈশিষ্ট্য অর্জন করা সৃষ্টির রীতি ও প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম। এ দুটোর প্রত্যেকটিই নিজ নিজ ভূমিকা পালন করার সুযোগ দেয়া প্রয়োজন, যাতে মনুষ্য বংশধারা ক্রমান্বয়ে উন্নতি অর্জন করে। মানুষ একে অপরের কাছাকাছি আসে এবং একে অপর থেকে শক্তি সঞ্চয় করে। কিন্তু ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে বিয়ে এই উদ্দেশ্য অর্জনের অন্তরায়। বস্তুতঃ এ থেকে প্রমাণিত হলো, দৈহিক ও মানসিক উভয় দিক দিয়েই নিকট আত্মীয়ের মধ্যকার বিয়ে ক্ষতিকর, প্রকৃতি বিরোধী, সামাজিক সম্পর্কগুলোর প্রতিবন্ধক এবং মানবীয় উন্নয়নের অন্তরায়।

ইমাম গাযযালী ইহ্‌য়াউল উলুমে উল্লেখ করেছেন : "যে সমস্ত গুণ বৈশিষ্ট্য নারীর মধ্যে পাওয়ার আশা করা হয়, তা পাওয়ার জন্য নারীর নিকট আত্মীয় না হওয়া জরুরি। উদাহরণ স্বরূপ, নিকট আত্মীয় মহিলাকে বিয়ে করলে তার উদরজাত সন্তান দুর্বল হবে।" এ সম্পর্কে তিনি এমন একটা হাদিস উল্লেখ করেছেন, যা সহীহ্ নয়। তবে ইবরাহীম হারবী বিরল হাদিসের তালিকায় বর্ণনা করেছেন : উমর রা. সাইবের পরিবারকে উপদেশ দিয়েছিলেন :

"তোমরা অপরিচিতদের মধ্যে অবস্থান করো, তাহলে দুর্বল হবেনা।" অর্থাৎ অনাত্মীয় মহিলাদেরকে বিয়ে করো, যাতে তোমাদের বংশধর শারীরিকভাবে দুর্বল না হয়। ইমাম গাযযালী এর সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে বলেন :

"দৃষ্টি কিংবা স্পর্শজনিত অনুভূতির তীব্রতায় কামোদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। আর এই অনুভূতি অধিকতর তীব্র হয় নতুন ও অচেনা মানুষের সান্নিধ্যে। যে মানুষ সুপরিচিত এবং যার ওপর প্রতিনিয়ত দৃষ্টি পড়ে। তাকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করা ও তা দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার জন্য অনুভূতি তীব্র হয়না এবং তার প্রতি কামভাবও জাগ্রত হয়না। তবে গাযযালীর এ যুক্তি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

দুধপানজনিত কারণে বিয়ে নিষিদ্ধ হওয়ার যৌক্তিকতা

দুধপানজনিত কারণে বিয়ে নিষিদ্ধ হওয়ার যুক্তি হলো, দুধপানকারী শিশুর দেহের কিছু

অংশ যে মহিলা দুধপান করায়, তার দুধ দ্বারা তৈরি হয়। আর এর ফলে এই শিশু মহিলার গর্ভজাত সন্তানের মতোই মায়ের স্বভাবচরিত্রের উত্তরাধিকারী হয়। বস্তুত এটা মানবজাতির উপর আল্লাহর একটা বিরাট রহমত যে, দুধপানজনিত সম্পর্ককে রক্তের সম্পর্কের পর্যায়ে উন্নীত করে তিনি আমাদের আত্মীয়তার বলয়কে প্রশস্ততর করেছেন।

দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে বিয়ে নিষিদ্ধ হওয়ার যৌক্তিকতা

দাম্পত্য সম্পর্কের কারণে বিয়ে নিষিদ্ধ হওয়ার যুক্তি হলো, স্ত্রীর মা ও অন্য স্বামীর ঔরসজাত মেয়ে তার জন্য সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ। কেননা পুরুষের স্ত্রী স্ত্রীর আত্মার অংশ। এমনকি তার মানবীয় স্বভাব প্রকৃতিরও স্থীতিস্থাপক ও পরিপূরক। সুতরাং স্ত্রীর মান সম্মান ও মর্যাদায় তার নিজের মায়ের সমপর্যায়ের হবেন- এটাই কাঙ্ক্ষিত। তিনি স্ত্রীর সতিন হলে সেটা হবে খুবই ঘৃণিত ব্যাপার। কেননা দাম্পত্য সম্পর্কজনিত আত্মীয়তা বংশীয় আত্মীয়তার সমপর্যায়ের। কোনো পুরুষ যখন কোনো পরিবারে বিয়ে করে, তখন সে সেই পরিবারের সদস্যের মতো হয়ে যায়। তার অন্তরে তাদের জন্য একটা নতুন মমত্ববোধ সৃষ্টি হয়। তাই মা ও মেয়ে কখনো একই স্বামীর স্ত্রী হতে পারেনা। এটা দাম্পত্য সম্পর্ক ও তজ্জনিত আত্মীয়তার যৌক্তিকতার পরিপন্থী এবং পারিবারিক শান্তি ও শৃংখলার জন্য ক্ষতিকর। সুতরাং প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সার্বিক কল্যাণের নিয়ামক হলো, মা ও শাশুড়ী এবং পালিত কন্যা ও ঔরসজাত কন্যাকে সমান মর্যাদা প্রদান করা। অনুরূপ ছেলের বৌকেও নিজের মেয়ের মতো দেখতে হবে ও একই রকম স্নেহ ও আদর দিতে হবে। যেমন সৎ মাকে দিতে হবে আপন মায়ের সমান মর্যাদা।

আর যেহেতু দুই বোনকে একই সাথে দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ রাখাকে নিষিদ্ধ করা আল্লাহর বিশেষ কৃপাপূর্ণ ও বিজ্ঞতাপূর্ণ ব্যবস্থা। আর এর উদ্দেশ্য হলো, বৈবাহিক বন্ধনকে একটা নির্ভেজাল ও পরিপূর্ণ প্রেম ও প্রীতির বন্ধনে পরিণত করা এবং সকল ধরনের পারস্পরিক ঘৃণা বিদ্বেষ ও ক্ষতির কলুষতা থেকে তাকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র করা, সেহেতু স্ত্রীর নিকট সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি যথা শাশুড়ী, শালী, সৎ মা ও ছেলের বৌকে স্ত্রীর বর্তমানে বিয়ে করা কোনক্রমেই বৈধ হতে পারেনা। স্বয়ং আল্লাহ জানিয়েছেন, বিয়ের নিগূঢ় উদ্দেশ্য হলো, স্বামী ও স্ত্রী উভয়কে পরস্পর দ্বারা পরিপূর্ণ মানসিক শান্তি ও পরিতৃপ্তি দান করা। পক্ষান্তরে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও ভালোবাসার সম্পর্ক স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ও স্বামী-স্ত্রীর সাথে রক্ত সম্পর্কীয় বন্ধনে আবদ্ধ লোকদের মধ্যে ব্যাপকতর পরিসরে বিস্তৃত করাই বিয়ের উদ্দেশ্য। আল্লাহ বলেন :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ○

অর্থ : আল্লাহর একটি নিদর্শন হলো, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তার নিকট শান্তি ও তৃপ্তিপূর্ণ আশ্রয় পাও, আর তিনি তোমাদের সকলের মধ্যে ভালোবাসা, প্রীতি ও মমত্ব সৃষ্টি করেছেন। (সূরা রূম : আয়াত ২১)

এখানে স্পষ্ট, তিনি ব্যক্তিগত মানসিক শান্তি ও তৃপ্তিকে বৈবাহিক সম্পর্কের সাথে নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ করেছেন, কিন্তু প্রীতি ও মমত্বকে বৈবাহিক সম্পর্কের সাথে নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ করেননি। কেননা শেষোক্তটি স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কেও বিরাজমান থাকে।

স্বামী-স্ত্রীর সাথে রক্ত সম্পর্কীয় যে সকল আত্মীয় রয়েছে, তাদের মধ্যেও বিরাজ করে এবং সন্তান দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক ঘনীভূত ও দৃঢ়তর হয়।

যেসব নারীকে বিয়ে করা সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ

১. নিষিদ্ধ একাধিক নারীকে একত্রিত করা : দুই বোনকে এক সাথে স্ত্রী হিসেবে একত্রিত করা, স্ত্রীর সাথে তার ফুফুকে ও খালাকে একত্রিত করা এবং এমন দু'জন মহিলাকে একত্রিত করা নিষেধ, যাদের একজন পুরুষ হলে তাদের উভয়ের মধ্যে বিয়ে বৈধ হতোনা। এর প্রমাণ :

মহান আল্লাহ্র উক্তি : وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ .

"দুই বোনকে একত্রিত করা হারাম। তবে অতীতে যা হয়েছে, তা ভিন্ন ব্যাপার।" (নিসা : ২৩)

বুখারি ও মুসলিম আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. স্ত্রী এবং তার ফুফু ও খালাকে একই সাথে স্ত্রীরূপে একত্রিত করতে নিষেধ করেছেন।

ফীরোয দায়লামি থেকে আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্, তিরমিযি বর্ণনা করেছেন, ফীরোয দায়লামি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন দুই সহোদরা মহিলা তার স্ত্রী ছিলো। তখন রসূলুল্লাহ সা. তাকে বললেন : এদের যে কোনো একজনকে তালাক দাও।

ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. ফুফু ও খালার সাথে ভাতিজী ও ভাগিনীকে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন : এতে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি হবে।" -কুরতুবি।

আবু দাউদ হুসাইন বিন তালহা থেকে বর্ণনা করেছেন : আত্মীয়তার বিচ্ছেদের আশংকায় রসূল সা. স্ত্রীর বর্তমানে তার বোনকে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন। বস্তুত ইবনে আব্বাস ও হুসাইন বিন তালহার হাদিসে এ ধরনের বিয়ে নিষিদ্ধ করার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়েছে। সেটি হলো, রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের মধ্যে বিচ্ছেদ থেকে আত্মরক্ষা। কেননা রক্ত সম্পর্কীয় দুই আত্মীয়াকে একত্রিত করলে পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষ ও ঈর্ষা মাথা চাড়া দেয়া অনিবার্য। দুই সতিনের মাঝে প্রতিহিংসামুক্ত সম্পর্ক খুবই বিরল। দুই মাহরাম তথা রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়াকে এক সাথে শুধু স্ত্রীর মর্যাদায় রাখাই নিষিদ্ধ নয়, বরং ইদ্দতের মেয়াদে বিয়ে করাও নিষিদ্ধ। আলেমগণ একমত হয়ে বলেছেন : কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে রজয়ী তালাক দিলে তার ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার বোনকে বিয়ে করা বা সে ছাড়া চারজন স্ত্রী গ্রহণ করা জায়েয নয়। কেননা বিয়ে তখনো বহাল রয়েছে এবং যে কোনো সময় তালাক প্রত্যাহার করার অধিকার তার রয়েছে। তবে বায়েন (অপ্রত্যাহারযোগ্য) তালাক দিলে কী হবে, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। আলি, যায়দ বিন ছাবেত, মুজাহিদ, ইবরাহিম নাখয়ী, সুফিয়ান ছাওরি, হানাফী মাযহাব ও ইমাম আহমদের মতে এক্ষেত্রেও তার বোনকে বা চারজন মহিলাকে বিয়ে করা ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে জায়েয নয়। কেননা ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে আইনত বহাল থাকে। ইদ্দতকালে স্ত্রী ভরণ পোষণের অধিকারী। কিন্তু ইবনুল মুনযির বলেছেন, আমাদের মতে ও ইমাম মালেকের মতে, সে স্ত্রীর বোনকে বা স্ত্রী ব্যতিত আরো চারজন মহিলাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে পারে। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, হাসান ও শাফেয়ীর মতেও এটা জায়েয। কেননা তাদের মতে, বায়েন তালাক দ্বারা বিয়ের চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং

এখন স্ত্রীর বোনকে বা চারজনকে বিয়ে করা নিষিদ্ধদেরকে একত্র করা বিবেচিত হবেনা।

দু'জন নিষিদ্ধ মহিলাকে একত্র করলে, যেমন দুবোনকে স্ত্রীরূপে একত্রিত করলে দেখতে হবে, তাদেরকে একই আকদ দ্বারা বিয়ে করেছে, না আলাদা আলাদা আকদ দ্বারা। একই আকদ দ্বারা বিয়ে করলে দেখতে হবে দু'জনের একজনকে বিয়ে করাতে শরয়ী বাধা আছে কিনা। যদি না থাকে তবে দু'জনের আকদই বাতিল হয়ে যাবে এবং এ বিয়ে বাতিল বিয়েরূপে পরিগণিত হবে। এক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রী উভয়ের বিয়ে বাতিল করে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ওয়াজিব। তারা বিচ্ছিন্ন না হলে আদালত তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। আর এই বিচ্ছেদ যদি সহবাসের পূর্বে ঘটে, তবে দু'জনের কেউই মোহরানা পাবেনা। এ ধরনের আকদ শরিয়তের দৃষ্টিতে আদৌ আকদ হিসেবেই গণ্য হবেনা। আর যদি সহবাসের পরে হয়, তবে যার সাথে সহবাস হয়েছে, তাকে "মোহরে মিছল", অথবা "মোহরে মিছল" ও নির্ধারিত মোহরের মধ্যে যেটি কম, তা দিতে হবে। তার সাথে সহবাসের দরুন সেই সমস্ত ফলাফলই আবর্তিত হবে, যা অবৈধ বিয়ের দরুন হয়ে থাকে।

আর যদি দু'জনের একজন এমন হয় যে, তাকে বিয়ে করা শরিয়ত মতে অবৈধ, যেমন সে অন্য কোনো ব্যক্তির স্ত্রী অথবা তালাকপ্রাপ্তা কিন্তু ইদ্দত অতিবাহিত হয়নি। আর অপর জন এমন যে, তাকে বিয়ে করা বৈধ, তাহলে যাকে বিয়ে করা বৈধ, তার বিয়ে শুদ্ধ হবে এবং অপরজনের বিয়ে বাতিল হবে।

আর যদি দু'জনকে আলাদা আলাদা আকদ দ্বারা বিয়ে করে, উভয় আকদের প্রয়োজনীয় শর্ত ও রুকন পূরণ হয় এবং কোন্‌টি প্রথমে সম্পন্ন হয়েছে তা জানা যায়। তবে প্রথমটি বৈধ ও দ্বিতীয়টি বাতিল হবে। আর যদি দুটোর শুধু একটা বিশুদ্ধতার শর্তাবলী পূরণ করে, তবে সেটিই বৈধ হবে চাই আগে হোক বা পরে হোক। আর যদি কোন্‌টি প্রথমে হয়েছে জানা না যায়। অথবা জানা গেলো, কিন্তু মনে নেই। যেমন একজন অপর একজনকে উকিল নিযুক্ত করলো তাকে বিয়ে করিয়ে দেয়ার জন্য। পরে সেই উকিল দুটি মহিলার সাথে তার বিয়ে করিয়ে দিলো। পরে জানা গেলো, তারা দু'জন সহোদরা বোন। অথচ দু'টি আকদের কোন্‌টি আগে, কোন্‌টি পরে, জানা গেলনা। অথবা জানা গেলো কিন্তু স্মরণ থাকলোনা। এরূপ ক্ষেত্রে উভয় মহিলার বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে। কেননা একটিকে অপরটির উপর অগ্রাধিকার দেয়ার কোনো বৈধ ভিত্তি নেই। উভয় বিয়ের উপর বাতিল বিয়ের বিধি প্রযোজ্য হবে। (পারিবারিক বিধান, আবদুল ওয়াহাব খাল্লাফ)

২-৩. অপরের বিবাহিতা অথবা ইদ্দত পালনরতা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী : অপরের বিবাহিতা স্ত্রী অথবা ইদ্দত পালনরতা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর হারাম। কেননা এতে স্বামীর অধিকার ক্ষুণ্ন হয়। মহান আল্লাহ বলেছেন :

وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاۤءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۝

"নারীদের মধ্য থেকে যারা বিবাহিত, তারাও নিষিদ্ধ। তবে দাসীরা নয়।" (সূরা নিসা : ২৪)

অর্থাৎ যুদ্ধবন্দিনীরা বিবাহিত হলেও একবার মাসিক স্রাব দ্বারা জরায়ু বীর্যমুক্ত হওয়ার পর আটককারীর জন্য হালাল হয়ে যায়। কেননা মুসলিম ও ইবনে আবি শায়বা, আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. আওতাসে একটা বাহিনী পাঠালেন। সেখানে একদল শত্রু সেনার সাথে তাদের যুদ্ধ হয়। মুসলিম বাহিনী বিজয়ী হয় এবং বেশ কিছু

মহিলা তাদের হাতে বন্দী হয়। রসূলুল্লাহ্ সা.-এর সাহাবীদের কেউ কেউ তাদের সাথে সহবাস করা থেকে বিরত থাকছিলেন। কেননা তাদের স্বামীরা ছিলো মুশরিক। এ জন্য আল্লাহ উক্ত আয়াত নাযিল করে জানিয়ে দিলেন যে, একটি মাসিক দ্বারা জরায়ুর বীর্যমুক্ত হওয়ার মাধ্যমে ইদ্দত পালিত হওয়ার পর তারা তাদের জন্য হালাল। হাসান বলেন : সাহাবিগণ বন্দিনীদেরকে স্ত্রীরূপে গ্রহণের আগে একবার মাসিকের সুযোগ দিয়ে জরায়ু বীর্যমুক্ত করে নিতেন। ইদ্দত পালনরতাদের সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

৪. তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী : তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তার প্রথম স্বামীর জন্য ততোক্ষণ পর্যন্ত হালাল হয়না যতোক্ষণ না উক্ত স্বামী ব্যতিত অন্য কারো সাথে বিশুদ্ধভাবে তার বিয়ে হয়। (অর্থাৎ কোনো রকম তাহলিল বা অন্য কোনো শর্ত ব্যতিরেকে)

৫. ইহরামরত ব্যক্তির বিয়ে : ইহরামরত ব্যক্তির বিয়ের আকদ করা হারাম, চাই নিজের জন্য করুক, অভিভাবক হিসেবে অন্য কারো জন্য করুক অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকিল বা প্রতিনিধিরূপে অন্য কারো জন্য করুক। এ ধরনের আকদ সম্পন্ন করা মাত্রই তা বাতিল হয়ে যাবে এবং শরিয়ত অনুযায়ী তার কোনো ফলাফল তার উপর বলবৎ হবেনা। কেননা মুসলিম প্রমুখ উসমান বিন আফফান রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : ইহরামরত ব্যক্তি নিজেও বিয়ে করবেনা, অন্য কাউকেও বিয়ে করাবেনা। এমনকি বিয়ের প্রস্তাবও দেবেনা। -তিরমিযি। অবশ্য তিরমিযিতে 'প্রস্তাবও দেবেনা' কথাটা নেই। কোনো কোনো সাহাবী এই হাদিস অনুসারেই আমল করতেন। ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাকের মতও তদ্রূপ। তারা ইহরামরত ব্যক্তির বিয়ে বৈধ মনে করেননা। সে বিয়ে করলে তা তৎক্ষণাত বাতিল হয়ে যাবে। রসূল সা. মাইমুনা রা.কে যখন বিয়ে করেছিলেন, তখন তিনি ইহরামে ছিলেন মর্মে যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা মুসলিম বর্ণিত হাদিস দ্বারা খণ্ডিত হয়। ঐ হাদিসের বক্তব্য অনুযায়ী তিনি ইহরামমুক্ত অবস্থায় তাকে বিয়ে করেন। তিরমিযি বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. কর্তৃক মাইমুনাকে বিয়ে করা নিয়ে মতভেদ হয়েছে। কেননা তিনি মাইমুনাকে বিয়ে করেছিলেন মক্কা যাত্রার পথে। এ কারণে কেউ বলেন, তিনি ইহরামমুক্ত থাকা অবস্থায় তাকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু তার বিয়ের খবর প্রচারিত হয় তাঁর ইহরাম বাঁধার পর। তারপর তার সাথে বাসর করেন ইহরামমুক্ত অবস্থায় মক্কার পথে সার্ফ নামক স্থানে। অবশ্য হানাফী মাযহাবে ইহরামরত ব্যক্তির বিয়ে করা বৈধ। কেননা ইহরাম নারীর বিয়ের অধিকার খর্ব করেনা। খর্ব করে শুধু সহবাসের অধিকার। আকদের বিশুদ্ধতা ইহরাম দ্বারা কোনো মতেই বাধাগ্রস্ত হয়না।

৬. স্বাধীন নারী পাওয়া সত্ত্বেও দাসী বা বাদী বিয়ে করা : দাস কর্তৃক দাসীকে বিয়ে করা, স্বাধীন নারী কর্তৃক নিজের ও অভিভাবকের সম্মতি সাপেক্ষে দাসকে বিয়ে করা এবং নিজের মালিকানাধীন দাসকে বিয়ে করার বৈধতা সম্পর্কে সকলে একমত। সকলে এই মর্মেও একমত যে, কোনো মহিলা নিজের স্বামীর মনিব হয়ে গেলে তৎক্ষণাত বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে। তবে দাসীর সাথে স্বাধীন পুরুষের বিয়ের বৈধতা নিয়ে মতভেদ সংঘটিত হয়েছে। অধিকাংশ আলেমের মতে দাসীর সাথে স্বাধীন পুরুষের বিয়ে দুই শর্তে জায়েয : (১) স্বাধীন নারীকে বিয়ে করার অসমর্থ হওয়া, (২) অবিলম্বে বিয়ে না করলে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা। যারা এই মতের প্রবক্তা, তারা কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণ দর্শান :

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ إلى قوله تعالى : ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ○

অর্থ : তোমাদের মধ্যে যার স্বাধীন সতী মেয়েদের বিয়ে করার আর্থিক সামর্থ্য নেই, সে যেন তোমাদের দাসীদের মধ্য থেকে মুমিন যুবতীদের কাউকে বিয়ে করে। ....

তোমাদের মধ্য হতে সেই ব্যক্তির জন্য এ বিধান, যে ব্যভিচারের আশংকা করে। ধৈর্যধারণ করা তোমাদের জন্য উত্তম। (সূরা আন্‌নিসা)

কুরতুবি বলেন : "দাসী বিয়ে করার চেয়ে ধৈর্যধারণ করে অবিবাহিত থাকা উত্তম। কেননা দাসী বিয়ে করলে তার গর্ভজাত সন্তানও দাস হিসেবে জন্ম নেবে। এ ধরনের বদান্যতার চেয়ে আত্মসংযম ও মহৎ চরিত্র নিয়ে ধৈর্যধারণ করা উত্তম। উমর রা. বলেছেন : কোনো স্বাধীন ব্যক্তি কোনো দাসীকে বিয়ে করলে তার অর্ধেক অর্থাৎ তার সন্তান পরাধীন দাসে পরিণত হয়। দাহহাক বিন মুযাহিম বলেছেন : আনাস বিন মালেক রা. কে বলতে শুনেছি, রসূল সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি পবিত্র ও পবিত্রকৃত অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়, তার স্বাধীন নারীদেরকে বিয়ে করা উচিত। - (ইবনে মাজাহ্)। আবু হানিফার মতে, স্বাধীন নারী বিয়ে করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও দাসী বিয়ে করা স্বাধীন পুরুষের জন্য বৈধ। তবে যার আগে থেকে কোনো স্বাধীন নারী স্ত্রী হিসেবে বিদ্যমান, তার জন্য দাসী বিয়ে করা বৈধ নয়। স্বাধীন মহিলার সম্মান রক্ষার্থে এটা নিষিদ্ধ।"

৭. ব্যভিচারীকে বিয়ে করা : তওবা না করা পর্যন্ত কোনো ব্যভিচারী নারীকে বিয়ে করা পুরুষের জন্য এবং কোনো ব্যভিচারী পুরুষকে বিয়ে করা মহিলার জন্য বৈধ নয়।

এর প্রমাণ নিম্নে দেয়া গেলো : ১. আল্লাহ তায়ালা নারী পুরুষ উভয়ের সতিত্বকে বিয়ের পূর্বশর্ত ধার্য করেছেন। তিনি বলেছেন :

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ط وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ص وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ز وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ○

অর্থ : আজ তোমাদের জন্য সকল পবিত্র খাদ্য হালাল করা হলো। আর যারা কিতাব পেয়েছে, তাদের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য হালাল। আরো হালাল করা হলো সতী মুমিন মহিলাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বে যারা কিতাব পেয়েছে তাদের মধ্যকার সতী নারীদেরকে যখন তাদেরকে তোমরা তাদের প্রাপ্য মোহরানা দিয়ে দেবে সতিত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে, ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে নয়, বান্ধবী ও উপপত্নী গ্রহণের উদ্দেশ্যেও নয়।" (সূরা আল-মায়েদা : আয়াত ৫)

অর্থাৎ আল্লাহ যেমন পবিত্র খাদ্য এবং ইহুদী ও খৃস্টানদের খাদ্য হালাল করেছেন, তেমনি হালাল করেছেন মুসলমান সতী নারীদেরকে এবং ইহুদী খৃস্টান সতী নারীদেরকেও- যখন তোমরা স্বামীরাও সৎ হবে, ব্যভিচার প্রয়াসী ও উপপত্নী গ্রহণে ইচ্ছুক হবেনা।

আল্লাহ্ এ বিষয়টির উল্লেখ করেছেন স্বাধীন মহিলা বিয়ে করতে অসমর্থ হওয়ার কারণে দাসীদেরকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ প্রসঙ্গে। সূরা নিসার ২৫ নং আয়াতে আল্লাহ উল্লেখ করেন :

فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ○

“অতএব তোমরা দাসীদেরকে তাদের মনিবদের অনুমতি নিয়ে বিয়ে করো এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদেরকে তাদের মোহরানা দাও। তাদেরকে সতী স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করো, ব্যভিচারিণী ও উপপত্নী হিসেবে নয়।”

এর সমর্থনে কুরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ○

অর্থ : ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারিণী অথবা মোশরেক মহিলাকে ছাড়া বিয়ে করবেনা, আর ব্যভিচারিণীকে একজন ব্যভিচারী বা মোশরেক পুরুষ ছাড়া অন্য কেউ বিয়ে করবেনা। মুমিনদের উপর এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (সূরা নূর : আয়াত ৩)।

অর্থাৎ এ ধরনের আকদ শুদ্ধ হবেনা। মুমিনদের উপর এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে অর্থাৎ ব্যভিচারী বা মোশরেক হিসেবে চিহ্নিত নারী ও পুরুষকে বিয়ে করা মুমিনদের জন্য নিষিদ্ধ। একমাত্র কোনো ব্যভিচারী বা মোশরেকই এ রকম কাজ করতে পারে।

আমর বিন শুয়াইব বর্ণনা করেন, মুরছাদ গানাওয়ী মক্কায় অবস্থানরত বন্দীদেরকে নিয়ে যেতেন। মক্কায় উনাক নাম্নী জনৈকা ব্যভিচারী মহিলা থাকতো। সে ছিলো জাহেলি যুগে মুরছাদের বান্ধবী। মুরছাদ বলেন : আমি রসূল সা.কে জিজ্ঞাসা করলাম, উনাককে কি বিয়ে করবো? তিনি কোনো জবাব দিলেননা। এরপর নাযিল হলো : “ব্যভিচারিণীকে একজন ব্যভিচারী বা মোশরেক ছাড়া আর কেউ বিয়ে করবেনা।” অতপর রসূল সা. আমাকে ডেকে বললেন : “উনাককে বিয়ে করোনা।” আবু দাউদ, তিরমিযি ও নাসায়ী কর্তৃক বর্ণিত।

আবু হুরায়রা রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : বেত্রাঘাতে দণ্ডিত ব্যভিচারী তারই মতো ব্যভিচারিণীকে ছাড়া বিয়ে করবেনা। আহমদ ও আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত।

শওকানী বলেন : উপরোক্ত বিবরণটি প্রধানত সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যার ব্যভিচারপ্রবণতা প্রকাশ্য হয়ে পড়েছে। এ দ্বারা প্রমাণিত হয়, কোনো পুরুষের জন্য ব্যভিচারে জড়িত বলে জানাজানি হয়েছে এমন মহিলাকে বিয়ে করা বৈধ নয়। অনুরূপ, কোনো মহিলার জন্যও বৈধ নয়, ব্যভিচারে জড়িত বলে জানাজানি হয়েছে এমন পুরুষকে বিয়ে করা। সূরা নূরের ৩নং আয়াত এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কেননা এর শেষাংশে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছে : “এটা মুমিনদের জন্য নিষিদ্ধ।” এ উক্তি দ্বারা ব্যভিচারী নারী ও পুরুষকে জেনে শুনে বিয়ে করা সুস্পষ্টভাবে হারাম করা হয়েছে।

‘ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান’ নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে : বিয়ে ও ব্যভিচারে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। বিয়ে হচ্ছে সমাজের ভিত্তি ও তার অস্তিত্বের উৎস। এটা হলো সেই

প্রাকৃতিক আইন, যার ভিত্তিতে গোটা বিশ্ব পরিচালিত। এটা হচ্ছে সেই প্রাকৃতিক বিধান, যা জীবনের মূল্য ও মর্যাদা নিরূপণ করে। বিয়ে হচ্ছে প্রকৃত ভালোবাসা নিষ্কলুষ মমতা, জীবন যাপনে সহযোগিতা, পরিবার গঠনে অবদান রাখা ও বিশ্ব বিনির্মাণের আরেক নাম।'

ব্যভিচারী নারী ও পুরুষকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ হওয়ার তাৎপর্য : ইসলাম একজন মুসলিম পুরুষকে কোনো ব্যভিচারী নারীর এবং একজন মুসলিম নারীকে কোনো ব্যভিচারী পুরুষের কাছে জিম্মী করতে চায়নি। ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর ঘৃণিত ও কলুষিত মন এবং তার বিবিধ রোগ জীবাণু জর্জরিত দেহের প্রভাবাধীন করতে চায়নি পূতঃপবিত্র ও সচ্চরিত্র একজন পুরুষ বা মহিলাকে। ইসলাম তার সকল আদেশ ও নিষেধে মানব জাতির সুখ ও শান্তি নিশ্চিত করতে এবং তাকে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে।

ব্যভিচারিরা ভয়াবহ রোগের উৎস : ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীরা পার্থিব জীবনে কিভাবে সুখী হবে? তারা তো সবচেয়ে মারাত্মক ও দুরারোগ্য ব্যাধি বহন করে। তারা যে রোগ বহন করে তা তাদের শরীরের সকল অংগ প্রত্যংগকে আক্রান্ত করে। এইডস্, গনোরিয়া ও সিফিলিসই সম্ভবত সেই নিকৃষ্টতম যৌন ব্যাধি, যা ব্যভিচারীদেরকে এমন সর্বব্যাপী ও সুদূর প্রসারী আপদে পরিণত করে, যাকে পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করা অপরিহার্য। যে মানব সমাজে এসব ব্যভিচারীর বসবাস, সে সমাজ কখনো সুখী হতে পারেনা। কারণ তারা পরবর্তী বংশধরকে তাদের মানসিক রোগের পাশাপাশি পুরুষানুক্রমিক মরণব্যাধি উত্তরাধিকারস্বরূপ হস্তান্তর করে থাকে। এমনকি ব্যভিচারের কারণে যৌনাংগে এমন প্রচণ্ড প্রদাহ জন্মে, যার কারণে সন্তানদের দৈহিক ও চারিত্রিক বিকৃতি ঘটার আশংকা থাকে।

ব্যভিচারী ও মুশরিকদের মধ্যে সদৃশ্যের কারণ : পবিত্র কুরআন ও রসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নাহর শিক্ষা ও কৃষ্টি দ্বারা নিজের জীবনকে গড়ে তুলেছে, এমন একজন পবিত্র ও সচ্চরিত্র মুসলমান তার মতো চিন্তাধারার অধিকারী নয় এবং তার মতো নিষ্কলুষ জীবন যাপনকারী নয় এমন একজন ব্যভিচারিণী মহিলার সাথে সহাবস্থান করতে পারেনা। যে মহিলার চেতনা ও অনুভূতি তার সমমানের নয়, তার সাথে সে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করতে ও বজায় রাখতে পারেনা। কেননা সে আল্লাহর এই উক্তি সম্পর্কে অবহিত :

خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ○

অর্থ : তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জন্য এমন জুড়ি সৃষ্টি করেছেন, যাদের সাথে তোমরা শান্তিতে বসবাস করবে এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যে তিনি দয়া ও সম্প্রীতি স্থাপন করেছেন।" (সূরা রূম : আয়াত-২১)

একজন সৎ ও চরিত্রবান মুসলমানের সাথে একজন ব্যভিচারী মহিলার সম্প্রীতি ও ভালোবাসা কিভাবে গড়ে উঠবে? বিশুদ্ধ ঈমানের অধিকারী একজন মুমিনের মন একজন ব্যভিচারী নারীর কাছ থেকে কিভাবে শান্তি পাবে এবং কিভাবে তার সাথে শান্তিতে বসবাস করবে?

অনুরূপ, যে মুসলমান একজন ব্যভিচারিণী মহিলাকে তার বিকৃত মানসিকতা ও আবেগ অনুভূতির কমতির কারণে বিয়ে করতে পারেনা। সে মুসলমান একইভাবে তার মতো

আকিদা ও ঈমানে বিশ্বাসী নয় এবং জীবন সম্পর্কে তার মতো দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন নয় এমন একজন মুশরিক মহিলার সাথেও জীবনযাপন করতে পারেনা। একজন মুসলমানের দীন ও ঈমান তার উপর যে সকল পাপাচার ও অনাচারকে নিষিদ্ধ করে, মুশরিকের ধর্ম তার উপর সেসব পাপাচার ও অনাচারকে নিষিদ্ধ করেনা এবং ইসলামের সুমহান মানবীয় নীতিমালাকে স্বীকার করেনা। শিরকের রয়েছে স্বতন্ত্র বাতিল আকিদা বিশ্বাস। শিরকের চিন্তাধারা ইসলামের চিন্তাধারা থেকে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করে এবং মুশরিকের বিবেক বুদ্ধি মুসলমানের বিবেক বুদ্ধির সাথে কোনো সংশ্রবই রাখেনা। এজন্যই আল্লাহ বলেছেন :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ط وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ج وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ط وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ط اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ج وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ج وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ○

অর্থ : মুশরিক নারীরা ঈমান না আনা পর্যন্ত তাদেরকে তোমরা বিয়ে করোনা। একজন মুশরিক নারীর চেয়ে একজন মুমিন দাসীও ভালো, যদিও মুশরিক নারী তোমাদেরকে মুগ্ধ করে। আর মুশরিক পুরুষদের সাথে তোমরা মেয়ে বিয়ে দিওনা, যতোক্ষণ না তারা ঈমান আনে। একজন মুশরিক তোমাদের যতোই ভালো লাগুক, তার চেয়ে একজন মুমিন দাসীও ভালো। তারা তো দোযখের দিকে ডাকে। অথচ আল্লাহ ডাকেন জান্নাতের দিকে এবং তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী ক্ষমার দিকে। তিনি মানুষের কাছে তাঁর আয়াতগুলো সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। যেন তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।" (সূরা বাকারা : আয়াত ২২১)

তওবা অতীতের সকল গুনাহ মোচন করে : ব্যভিচারী পুরুষ ও মহিলা যদি ক্ষমা প্রার্থনা, অনুশোচনা ও গুনাহ বর্জনের মাধ্যমে খাঁটি তওবা করে এবং উভয়ে নতুনভাবে পরিচ্ছন্ন, পাপমুক্ত ও কলুষমুক্ত জীবন শুরু করে, তাহলে আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন এবং নিজ দয়ায় তার সৎ বান্দাদের দলভুক্ত করবেন। আল্লাহ বলেছেন :

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ج وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ○ يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا ○ اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

অর্থ : আল্লাহর প্রিয় দাসতো তারা যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোনো মা'বুদের ইবাদত করেনা, একমাত্র ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া প্রাণবধ করেনা যা আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন এবং ব্যভিচার করেনা। এসব কাজ যে করবে, সে শাস্তি ভোগ করবে। কেয়ামতের দিন তার আযাব দ্বিগুণ করা হবে এবং সে অনন্তকাল ধরে তা ভোগ করবে। তবে যে ব্যক্তি তওবা করবে, ঈমান আনবে ও সৎ কাজ করবে, তাদের অসৎ কাজগুলোকে আল্লাহ সৎ কাজে রূপান্তরিত করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" (সূরা ফুরকান : আয়াত ৬৮-৭০)

এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাস রা.কে জানালো : আমি একটি মেয়ের সাথে সম্পর্ক রাখতাম এবং আল্লাহ্ যে কাজ আমার উপর হারাম করেছেন, তার সাথে তা করতাম। অতপর আল্লাহ্ আমাকে তা থেকে তওবা করার সুযোগ দিয়েছেন। এখন আমি তাকে বিয়ে করতে চাই। কিন্তু একদল লোক বলে : "একজন ব্যভিচারী ব্যভিচারী বা মুশরিক রমণীকে ছাড়া বিয়ে করেনা।" ইবনে আব্বাস বললেন : এখানে সে কথা প্রযোজ্য নয়। তুমি তাকে বিয়ে করো। এতে যদি কোনো গুনাহ হয়, তবে তার দায় আমি বহন করবো। -ইবনে আবি হাতেম বর্ণিত।

ইবনে উমর রা.কে জিজ্ঞাসা করা হলো, জনৈক ব্যক্তি একজন মহিলার সাথে ব্যভিচার করেছে। সে কি তাকে বিয়ে করবে? তিনি বললেন : উভয়ে যদি তওবা করে ও চরিত্র সংশোধন করে তবে...। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ও এ ধরনের জবাব দিয়েছেন। ইবনে জারির বর্ণনা করেছেন যে, ইয়ামানে এক ব্যক্তির বোন ব্যভিচার করলো। বোনটি অতপর নিজের ঘাড়ের রগের উপর ছুরির পোঁচ দিয়ে আহত করলো। পরে লোকেরা তাকে চিকিৎসা করে আরোগ্য করে তুললো। এরপর তার চাচা স্বীয় পরিবারকে নিয়ে মদিনায় চলে গেলো। সেখানে মেয়েটি কুরআন শিখলো ও আল্লাহ্র ইবাদত করলো। অবশেষে সে ঐ পরিবারের সবচেয়ে পরহেজগার মহিলায় পরিণত হলো। এরপর তার চাচার নিকট তার জন্য বিয়ের প্রস্তাব এলো। চাচা তার ব্যভিচারের কথা গোপন করা পছন্দ করছিলেন না। তাই তিনি উমর রা.-এর নিকট গিয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। উমর রা. বললেন : তুমি যদি মেয়েটির অতীতের গুপ্ত তথ্য ফাঁস করো, তবে আমি তোমাকে শাস্তি দেবো। তোমার কাছে সৎ পুরুষ প্রস্তাব নিয়ে এলে তার সাথে তার বিয়ে দিয়ে দাও। অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে : উমর রা. বললেন : তুমি কি মেয়েটির গুপ্ত তথ্য ফাঁস করতে চাও? আল্লাহ যা গোপন করেছেন, তা প্রকাশ করতে চাও? আল্লাহ্র কসম, তুমি যদি তার সম্পর্কে কাউকে কিছু জানাও, তাহলে আমি তোমাকে এমন শাস্তি দেবো, যা সমগ্র দেশের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে যাবে। বরঞ্চ তাকে সতী মুসলিম নারীর মতো বিয়ে দিয়ে দাও। উমর রা. একবার বললেন : আমার ইচ্ছা, ব্যভিচার করেছে, এমন কোনো মুসলমানকে কোনো সতী মেয়ে বিয়ে করতে না দেই। একথা শুনে উবাই বিন কা'ব তাকে বললেন : আমীরুল মুমিনীন, শিরক তো ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক। অথচ কেউ তা থেকেও তওবা করলে তা কবুল করা হয়।"

ইমাম আহমদের মতে, ব্যভিচারী মহিলার তওবা খাঁটি কিনা তা জানা যাবে, তাকে ব্যভিচারের প্রস্তাব দিলে। সে যদি প্রস্তাবে রাজী হয়, তাহলে তার তওবা খাঁটি নয়। আর যদি প্রত্যাখ্যান করে, তবে তওবা খাঁটি।

ইবনে উমর রা. থেকেও অনুরূপ মত বর্ণিত হয়েছে। তবে তাঁর শিষ্যরা বলেছেন : কোনো মুসলিমের পক্ষে কোনো মহিলাকে ব্যভিচারের আহ্বান জানানো ও সেজন্য ফুসলানো জায়েয নয়। কেননা এ ধরনের ফুসলানো নির্জন সাক্ষাতে ছাড়া সম্ভব নয়। নির্জন স্থানে কোনো গয়রে মুহারম্ মহিলার সাথে মিলিত হওয়া কুরআন শিখানোর উদ্দেশ্যে হলেও বৈধ নয়। সুতরাং ব্যভিচারের আহ্বান জানাতে তা কিভাবে বৈধ হয়? তাছাড়া তওবা খাঁটি কিনা পরীক্ষা করার জন্য ব্যভিচারের আহ্বান জানালে সে তাতে রাজী হয়ে পুনরায় পাপ কাজে ফিরে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। তাই এ ধরনের ঝুঁকি নেয়া জায়েয নয়। কেননা তওবা সকল গুনাহ থেকেই মাফ করার বিধান রয়েছে, সকল মানুষের জন্যই তার সুযোগ

অবারিত, সকল আদেশে নিষেধের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। তওবার আগে ব্যভিচারী পুরুষ বা মহিলাকে বিয়ে দেয়া যে জায়েয নয়, সে ব্যাপারে ইমাম আহমদ, ইবনে হাযম, ইবনে তাইমিয়া ও ইবনে কাইয়েমও একমত। তবে ইমাম আহমদ তওবার সাথে আরো একটা শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। তা হলো ইদ্দত অতিবাহিত হওয়া। যে ব্যক্তি তওবা ও ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে কোনো ব্যভিচারিণীকে বিয়ে করবে, তার বিয়ে বৈধ হবেনা এবং সে ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীকে আলাদা করে দিতে হবে।

এ ধরনের মহিলার ইদ্দত কি তিন মাসিক স্রাব, না এক মাসিক স্রাব? উভয় মতের সপক্ষে তার পক্ষ থেকে বর্ণনা রয়েছে। পক্ষান্তরে হানাফী, শাফেয়ী ও মালেকী মাযহাব মতে, ব্যভিচারী নারী ও পুরুষের মধ্যে বিয়ে শর্তহীনভাবে জায়েয। ব্যভিচার তাদের মতে বিয়ের বিশুদ্ধতার অন্তরায় নয়। ইবনে রুশদ বলেছেন : এই মতভেদের কারণ নিহিত রয়েছে এই আয়াতের মর্ম অনুধাবনে : "ব্যভিচারিণীকে ব্যভিচারী বা মুশরিক ছাড়া কেউ বিয়ে করবেনা। মুমিনদের জন্য এটা নিষিদ্ধ।" এ দ্বারা ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর বিয়ের নিন্দা করা হলো, না নিষিদ্ধ করা হলো- এই প্রশ্নের জবাবেই মতভেদ নিহিত। "মুমিনদের জন্য এটা নিষিদ্ধ" একথা দ্বারা ব্যভিচার নিষিদ্ধ না বিয়ে নিষিদ্ধ বুঝানো হয়েছে? অধিকাংশ আলেমের মতে, আয়াতটিতে ব্যভিচারীর বিয়ের প্রতি ইংগিত করা ও তার নিন্দা করা হয়েছে, নিষিদ্ধ করা হয়নি। এর প্রমাণস্বরূপ তারা নিম্নোক্ত হাদিস তুলে ধরেন : এক ব্যক্তি রসূল সা.-এর নিকট তার স্ত্রী সম্পর্কে বললো : "তাকে কেউ স্পর্শ করলে সে তার হাত সরিয়ে দেয়না।"

রসূল সা. বললেন : "তাকে তালাক দাও।" সে বললো : "আমি তাকে ভালোবাসি।" তখন তিনি বললেন : "তবে তালাক দিওনা।"

[ইমাম আহমদ বলেন : এ হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়। ইবনুল জাওযি এ হাদিসকে মনগড়া বলে আখ্যায়িত করেছেন। আবু উবাইদ বলেছেন : এ হাদিস কুরআন ও সুপ্রসিদ্ধ হাদিসসমূহের পরিপন্থী। কেননা আল্লাহ কেবলমাত্র সতী মেয়ে বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছেন। আর স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থিত হলে সে ক্ষেত্রে 'লিয়ান' (পরস্পরকে অভিশাপ দিয়ে বিচ্ছেদ) এর আয়াত প্রযোজ্য। রসূলুল্লাহ সা. এ ধরনের দম্পতির বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছেন। সুতরাং এই দুই স্বামী স্ত্রী কখনো একত্রে বসবাস করতে পারেনা। এমতাবস্থায় এটা বিশ্বাসযোগ্য নয় যে, তিনি এমন স্ত্রীকে বহাল রাখবেন, যে তার সাথে ব্যভিচারে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে প্রত্যাখ্যান করেনা। ইবনুল কাইয়েম বলেছেন : এ হাদিসটি মুতাশাবেই তথা দুর্বোধ্য এবং ব্যভিচারিণীদের বিয়ে সংক্রান্ত সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞার বিপরীত।

তাছাড়া ব্যভিচারিণীদের বিয়ে বৈধ বলে যারা রায় দিয়েছেন। তারা তাদের ইদ্দতকালে বিয়ে করা জায়েয কিনা সে ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন। ইমাম মালেকের মতে জায়েয নয়। স্বামীর বীর্যের সম্মানার্থে এবং বৈধ সন্তান ও অবৈধ সন্তানের মিশ্রণ রোধকল্পে তিনি এ মত পোষণ করেন। কিন্তু আবু হানিফা ও শাফেয়ীর মতে, সে গর্ভবতী হলেও সেই গর্ভাবস্থায়ই তাকে বিয়ে করা যাবে। কেননা এই গর্ভজাত সন্তান সম্মান লাভের যোগ্য নয়। তবে আবু ইউসুফ একটি বর্ণনা অনুসারে আবু হানিফাও বলেছেন, সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত তাকে বিয়ে করা জায়েয নয়। কেননা স্বামীর পানি (বীর্য) দ্বারা অন্যের ফসলের সেচ হবে এটা সমীচীন নয়। রসূলুল্লাহ সা. তো গর্ভবতী যুদ্ধবন্দিনীর সাথে সহবাসও প্রসবের

পূর্বে নিষিদ্ধ করেছেন। অথচ সেই মহিলা ও তার গর্ভজাত সন্তান উভয়ই মনিবের মালিকানাভুক্ত দাসদাসী। অতএব ব্যভিচারের দরুন গর্ভবতী মহিলার সাথে স্বামীর সহবাসের আগে সন্তান প্রসব হওয়া জরুরি। কেননা ব্যভিচারীর বীর্য সম্মানার্হ না হলেও স্বামীর বীর্য সম্মানার্হ। এমতাবস্থায় ব্যভিচারের বীর্যের সাথে তার বীর্যের মিশ্রণ কিভাবে মেনে নেয়া যায়? অন্যের দ্বারা গর্ভবতী হওয়া যে মহিলা যুদ্ধবন্দিনী হয়ে এসে কোনো মুসলমানের দাসীতে পরিণত হয়, তার পেটের সন্তান তার বাবা থেকে বিচ্ছিন্ন ও উক্ত মুসলমানের গোলাম হওয়া সত্ত্বেও তার সাথে সহবাসকারীকে রসূল সা. অভিসম্পাত করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। অন্য একটি বর্ণনা মোতাবেক আবু হানিফার মতে তাকে বিয়ে করা বৈধ। কিন্তু সন্তান প্রসব করার আগে সহবাস করা বৈধ নয়। (তাহযীবুস সুন্নাহ, ৩য় খণ্ড)

সূচনাকালীন অবস্থা ও চলমান অবস্থার পার্থক্য : আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত, বৈধভাবে বিবাহিত স্ত্রী অথবা স্বামী ব্যভিচার করলে বিয়ে বাতিল হয়না। কেননা সূচনাকালীন অবস্থা ও চলমান অবস্থায় পার্থক্য রয়েছে। হাসান ও জাবের রা. থেকে বর্ণিত : বিবাহিতা স্ত্রী ব্যভিচার করলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো জরুরি। ইমাম আহমদের মতে, বিচ্ছেদ মুস্তাহাব। তিনি বলেন : এ ধরনের স্ত্রীকে রাখা সমীচীন মনে করিনা। কেননা তার উপর আস্থা রাখা যায়না। সে স্বামীর বংশকে কলুষিত করে ফেলতে পারে এবং তাকে এমন সন্তানের বাবা বানাতে পারে যা তার ঔরসজাত নয়।

৮. যে স্ত্রীর সাথে 'লিয়ান' হয়েছে তাকে বিয়ে করা হারাম : যে স্ত্রীর সাথে স্বামী 'লিয়ান' (অভিশাপ বিনিময় এবং) অভিযোগ করেছে, তাকে পুনরায় বিয়ে করা তার জন্য বৈধ নয়। কেননা 'লিয়ান' সংঘটিত হওয়ার পর সে চিরতরে হারাম হয়ে যায়। আল্লাহ সূরা নূরের ৬-৯ আয়াতে বলেন :

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاۤءُ اِلَّاۤ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۢ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ○ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۢ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ○ وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَاۤ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

অর্থ : যারা তাদের স্ত্রীদের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আরোপ করে এবং তারা নিজেরা ছাড়া (অর্থাৎ অভিযোগ আরোপকারী স্বামী ছাড়া) তাদের আর কোনো সাক্ষীও নেই, তাদের একজনই (অর্থাৎ স্বামী) আল্লাহর কসম খেয়ে চার বার সাক্ষ্য দেবে সে যে অভিযোগ আরোপ করেছে তা সত্য। আর পঞ্চমবারে বলবে, সে যদি মিথ্যে অভিযোগ আরোপ করে থাকে তবে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ পড়ুক। আর স্ত্রীর শাস্তি এভাবে রহিত হবে যে, সে আল্লাহর কসম খেয়ে চারবার সাক্ষ্য দেবে যে, অভিযোগকারী মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবারে বলবে, সে যদি সত্যবাদী হয়ে থাকে তবে তার (স্ত্রীর) উপর আল্লাহর গযব পড়ুক।" (সূরা আন নূর : আয়াত ৬-৯)

৯. মুশরিক নারীকে বিয়ে করা : আলেমগণ এই মর্মে একমত যে, কোনো মুসলমানের পক্ষে কোনো পৌত্তলিক, নাস্তিক, ইসলাম পরিত্যাগকারী, গরু পূজারী, সব কিছুই বৈধ এমন মত পোষণকারী নারীকে বিয়ে করা বৈধ নয়। এর প্রমাণ সূরা বাকারার এই

আয়াত: "মুশরিক নারী যতোক্ষণ ঈমান না আনে, তাকে তাকে বিয়ে করোনা। একজন মুমিন দাসী মুশরিক অপেক্ষা উত্তম, সে তোমার কাছে যতোই চিত্তাকর্ষক হোক। মুশরিক পুরুষদের সাথে মেয়ে বিয়ে দিওনা যতোক্ষণ না তারা মুসলমান হয়। একজন মুসলমান গোলাম একজন মুশরিক-এর চেয়ে উত্তম, চাই সে তোমার কাছে যতোই মনোপূত হোক। তারা তো দোযখের দিকে ডাকে। আর আল্লাহ্ ডাকেন বেহেশত ও ক্ষমার দিকে তাঁর অনুমতিক্রমে।" (সূরা বাকারা : আয়াত ২২১)

এ আয়াত নাযিল হওয়ার উপলক্ষ্য কি? - সে সম্পর্কে ১. মুকাতিল বলেছেন : এ আয়াত আবু মুরছাদ গানাওয়ী সম্পর্কে নাযিল হয়। কেউ কেউ বলেন : মুরছাদ বিন আবু মুরছাদ কান্নায সম্পর্কে নাযিল হয়। রসূলুল্লাহ সা. তাকে গোপনে মক্কায় পাঠিয়েছিলেন মুশরিকদের হাতে আটক জনৈক সাহাবিকে মুক্ত করে মদিনায় নিয়ে আসতে। মক্কায় মুরছাদের জাহেলি যুগের জনৈকা বান্ধবী ছিলো, যাকে তিনি ভালবাসতেন। তার নাম ছিলো "আনাক।" আনাক মুরছাদের আগমন টের পেয়ে তার কাছে এলো এবং তাকে আগের মতো ব্যভিচারের প্ররোচনা দিলো। মুরছাদ বললেন : "এখন আর ওসব হবেনা। ইসলাম জাহেলি যুগের সমস্ত খারাপ কাজ নিষিদ্ধ করেছে।" আনাক বললো : তাহলে আমাকে বিয়ে করো। তিনি বললেন : অপেক্ষা করো যতোক্ষণ না আমি রসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করি। অতপর তিনি রসূলুল্লাহর সা. নিকট গিয়ে অনুমতি চাইলেন। রসূলুল্লাহ সা. আনাককে বিয়ে করতে তাকে নিষেধ করলেন। কেননা মুরছাদ মুসলমান, আর আনাক মুশরিক। -আল জামে লিআহকামিল কুরআন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৭।

আর সুদ্দী ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াত আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তাঁর একজন কৃষ্ণাঙ্গ দাসী ছিলো। তার উপর রাগ হয়ে তিনি তাকে একটা থাপপড় দিয়েছিলেন। এরপর তিনি ঘাবড়ে যান এবং রসূল সা.-এর নিকট গিয়ে পুরো ঘটনা জানান। রসূল সা. তাকে বললেন : আবদুল্লাহ, মেয়েটি কেমন? তিনি বললেন : হে রসূল, সে নামায রোযা করে, সুন্দরভাবে ওযু করে এবং সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, আপনি তাঁর রসূল। তখন রসূল সা. বললেন : আবদুল্লাহ, সে তো একজন মুমিন। আবদুল্লাহ বললেন : আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন, আমি তাকে স্বাধীন করবোই এবং বিয়ে করবোই। পরে তিনি যথার্থই তাকে স্বাধীন করে বিয়ে করলেন। এর ফলে মুসলমানদের একটি দল এই বলে তাকে টিটকারি দিতে লাগলো যে, তিনি একটি বাদীকে বিয়ে করেছেন। তারা মুশরিকদের মেয়ে বিয়ে করতে ও তাদের সাথে মেয়ে বিয়ে দিতে উদগ্রীব ছিলো। কেননা তাদের বংশীয় আভিজাত্যের প্রতি তাদের ঝোঁক ছিলো। তাই আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন।

আল মুগনীতে বলা হয়েছে : আহলে কিতাব ছাড়া আর যতো কাফের গোষ্ঠী রয়েছে, যেমন মূর্তি পূজারী, পাথর পূজারী, গাছ পূজারী ও পশু পূজারী ইত্যাদি তাদের মেয়েদের বিয়ে করা ও তাদের যবাই করা জন্তুর গোশত খাওয়া সর্বসম্মতভাবে হারাম। আর ইসলাম ত্যাগী মহিলা যে ধর্মেই ধর্মান্তরিত হোক, তাকে বিয়ে করা মুসলমানদের জন্য হারাম।

১০. আহলে কিতাবের মহিলাদের বিয়ের বৈধতা প্রসঙ্গ : মুসলমানদের জন্য আহলে কিতাবের মহিলাদের বিয়ে করা জায়েয। কেননা আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন :

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ط وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ص وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ز وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ط وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ز وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

অর্থ : আজ তোমাদের জন্য সমস্ত পবিত্র জিনিস হালাল করে দেয়া হলো। আহলে কিতাবের খাবার জিনিস তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাবার জিনিসও তাদের জন্য হালাল। ঈমানদার সতী নারী এবং আহলে কিতাবের সতী নারী তোমাদের জন্য হালাল। তবে শর্ত এই যে, তোমাদেরকে মোহর আদায় করে বিয়ের মাধ্যমে তাদেরকে হেফাযতে রাখতে হবে। নিছক যৌন লালসা পূরণ বা গোপন প্রেম করা চলবেনা।" (সূরা আল মায়েদা : আয়াত ৫)

ইবনুল মুনযির বলেছেন : প্রাচীন মনীষীদের কেউ এটিকে হারাম আখ্যায়িত করেছেন এমন কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পাওয়া যায়না। তবে ইবনে উমর রা. সম্পর্কে বর্ণিত আছে : তাকে যখন কোনো মুসলমান কর্তৃক ইহুদী বা খৃস্টান মহিলাকে বিয়ে করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হতো, তখন তিনি বলতেন : আল্লাহ মুমিনদের জন্য মুশরিক মহিলাদেরকে হারাম করেছেন। আর কোনো মহিলা যদি বলে, তার খোদা ঈসা, অথবা আল্লাহর আর কোনো বান্দা তার খোদা, তবে এর চেয়ে বড় আর কোনো শিরক আছে বলে আমি মনে করিনা।

ইমাম কুরতবি বলেন, ইবনে উমর রা. এর উপরোক্ত উক্তি সাহাবীদের যে অংশের অভিমত প্রামাণ্যরূপে গৃহীত হয়ে আসছে, তার বিপরীত। কেননা উসমান, তালহা, ইবনে আব্বাস, জাবের ও হুযায়ফা প্রমুখ সাহাবীসহ সাহাবী ও তাবেয়ীদের একটি দল আহলে কিতাবের মহিলাদেরকে বিয়ে করা বৈধ বলে রায় দিয়েছেন। তাবেয়ীদের মধ্য হতে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, সাঈদ ইবনুল জুবাইর, হাসান, মুজাহিদ, তাউস, ইকরামা, শা'বী, দাহহাক ও আঞ্চলিক ফকীহগণ এই দলের অন্তর্ভুক্ত। যে আয়াতে মুশরিক নারীদেরকে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং সূরা মায়েদার উপরোক্ত আয়াতের (৫নং আয়াত) মধ্যে কোনো বৈপরিত্য ও বৈসাদৃশ্য নেই। কেননা "শিরক" শব্দটি বাহ্যিক ও শাব্দিক অর্থের দিক দিয়ে আহলে কিতাবকে অন্তর্ভুক্ত করেনা। যেমন আল্লাহ বলেন :

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ○

"আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্য হতে যারা কুফরি করেছে, (মুহাম্মদ সা.কে প্রত্যাখ্যান করেছে) তারা তাদের কাছে অকাট্য প্রমাণ না আসা পর্যন্ত কুফরি থেকে বিরত থাকতে প্রস্তুত ছিলনা।" এখানে মুশরিক ও আহলে কিতাবকে দুটো পৃথক শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করে এবং "আহলে কিতাব ও মুশরিক" এই দুটোর মধ্যে "ও" অব্যয় দ্বারা সংযোজন করে স্পষ্টতই বুঝানো হয়েছে যে, এই দুটো হুবহু এক নয়, বরং উভয়ের মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে। উসমান রা. খৃস্টান মহিলা নায়েলাকে বিয়ে করেছিলেন, যিনি তার সংসারে যাওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেন। তাছাড়া হুযায়ফা রা. মাদায়েনের জনৈকা ইহুদী মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। আর জাবের রা.কে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, ইহুদী ও খৃস্টান

মহিলাকে বিয়ে করা বৈধ কিনা, তখন বললেন : সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের নেতৃত্বাধীন থাকা অবস্থায় আমরা বিজয়ের যুগে তাদেরকে বিয়ে করতাম।

তবে তাদের বিয়ে করা মাকরূহ : ইহুদী ও খৃস্টান মহিলা বিয়ে করা জায়েয হলেও মাকরূহ। কেননা স্বামী তার দিকে অতিমাত্রায় ঝুঁকে পড়তে পারে। আর এই সুযোগে স্ত্রী তাকে ধর্মান্তরিত করে ফেলতে পারে, অথবা স্ত্রীর ধর্মাবলম্বীদেরকে সে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে পারে। এমনটি হবেনা একথা নিশ্চিত করে বলা যায়না। আর মহিলা যদি অমুসলিম অঞ্চলের অধিবাসী হয়, তাহলে সেটা হবে আরো তীব্র মাকরূহ। কেননা এটা ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন অমুসলিমদের জনশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। কোনো কোনো আলেমের মতে অমুসলিম শাসিত অঞ্চলে বসবাসকারী ইহুদী ও খৃস্টান মহিলাকে বিয়ে করা হারাম। ইবনে আব্বাস রা.কে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন : এটা জায়েয নয়। অতপর নিম্নোক্ত আয়াত পড়ে শোনান : (সূরা তওবা)

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ ○

"যেসব আহলে কিতাব আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করেনা, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করেছেন, তাকে হারাম বলে মান্য করেনা এবং সত্য দীনের আনুগত্য স্বীকার করেনা, তারা যতোক্ষণ বশ্যতা স্বীকারপূর্বক স্বহস্তে জিযিয়া না দেয়, ততোক্ষণ তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও।"

কুরতুবি বলেন : ইবরাহীম নাখয়ী একথা শুনে মুগ্ধ হয়ে যান।

ইহুদী ও খৃস্টান মহিলা বিয়ের অনুমতির যৌক্তিকতা ও তাৎপর্য : ইসলাম তাদের সাথে বিয়ে বৈধ করেছে শুধু এ উদ্দেশ্যে যেন আহলে কিতাব ও মুসলমানদের মাঝে দূরত্ব ঘুচে যায়। বিয়ের মাধ্যমে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মেলামেশা ও সামাজিক লেনদেনের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং উভয়পক্ষের পরিবারদ্বয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। এর ফলে ইসলামকে শেখা ও এর তত্ত্ব, নীতিমালা ও বাস্তব উদাহরণসমূহ জানা ও প্রত্যক্ষ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এটা মুসলমান ও আহলে কিতাবের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও নৈকট্য সৃষ্টি এবং সত্য দীন ও হেদায়াতের একটা অন্যতম দাওয়াতী পন্থা। সুতরাং যে মুসলমান ইহুদী বা খৃস্টান মহিলাকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক হবে, তার কর্তব্য হবে এই ঘনিষ্ঠতাকে দাওয়াতী পন্থারূপে গ্রহণ করার মহৎ উদ্দেশ্যে বিয়ে করা।

মুশরিক মহিলা ও আহলে কিতাবের মহিলার পার্থক্য : তফসির "আল মানার" ২য় খণ্ডের ৩৫৬ ও ৩৫৭ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে : "মুশরিক মহিলা এমন কোনো ধর্ম অনুসরণ করেনা, যা বিশ্বাসঘাতকতাকে হারাম করে, তার উপর সততা ও বিশ্বস্ততাকে বাধ্যতামূলক করে, তাকে সৎ কাজের আদেশ দেয় ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে। সে জন্মগতভাবে যে স্বভাব চরিত্রের অধিকারী হয়েছে এবং নিজের পরিবার থেকে যে ধরনের শিক্ষা পেয়েছে ও যে ধরনের আচরণে অভ্যস্ত হয়েছে, সে সম্পূর্ণরূপে তার উপরই নির্ভরশীল। জন্মসূত্রে ও পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত তার এই পুঁজি পৌত্তলিকতার উদ্ভট ধ্যানধারণা ও শয়তানী প্ররোচণা ছাড়া আর কিছু নয়। আর এগুলো তাকে তার স্বামীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে ও তার সন্তানের আকিদা বিশ্বাস বিকৃত করতেই উদ্বুদ্ধ করে। যে সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে সে

মুশরিক মহিলাকে বিয়ে করেছিলো, সেই সৌন্দর্য যদি তাকে ক্রমাগতভাবে মোহিত করেই রাখে, তাহলে সেটা ঐ মহিলাকে তার বিপথগামিতায় আরো গভীরভাবে নিমগ্ন হতে এবং স্বামীকে বিপথগামী করতে সহায়ক হবে। আর যদি স্ত্রীর চেহারার সৌন্দর্যের প্রতি চোখ বিরক্ত হয়ে ওঠে এবং তার আকিদা বিশ্বাসের নোংরামির প্রতি ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা স্বামীর মনে প্রবল হয়ে ওঠে, তাহলে দৈহিক সৌন্দর্য উপভোগ তার নিকট দুর্বিসহ হয়ে উঠতে পারে এবং এই অসহনীয় দাম্পত্য জীবনের উপর তার প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা জন্মে যেতে পারে। কিন্তু কিতাবী মহিলা ও মুসলিম পুরুষের মধ্যে এত বড় বৈপরিত্য জন্মেনা। কেননা কিতাবী মহিলাও আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, তার ইবাদত করে, নবীদের প্রতি আখেরাতের প্রতিফলে বিশ্বাস করে এবং সৎ কাজের বাধ্যবাধকতা ও অসৎ কাজের নিষেধাজ্ঞার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে। তাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য শুধু মুহাম্মদ সা.-এর নবুয়তে বিশ্বাসের ও অবিশ্বাসের। যে ব্যক্তি সাধারণভাবে নবুয়তে বিশ্বাস করে, তার শেষ নবীর প্রতি বিশ্বাস থেকে বিরত থাকার একমাত্র কারণ হলো, তিনি যে শরিয়ত নিয়ে এসেছেন, সে সম্পর্কে অজ্ঞতা। সে জানেনা যে, অন্যান্য নবী যে ধরনের জীবন বিধান নিয়ে এসেছিলেন, শেষ নবীও তদ্রূপ বিধান নিয়ে এসেছেন। চলমান যুগের উন্নতি ও অগ্রগতির দাবি অনুযায়ী অধিকতর বিধি ব্যবস্থাও তাতে বিদ্যমান এবং যা কিছু তাতে বর্তমানে বিদ্যমান তার চেয়ে আরো বেশি বিধি ব্যবস্থা ভবিষ্যতে সংযোজনের সুযোগ ও অবকাশও রয়েছে। শেষ নবীর প্রতি ঈমান আনা থেকে বিরত থাকার আরো একটা কারণ হলো, অন্তরে বিশ্বাস পোষণ করা সত্ত্বেও বাহ্যিকভাবে হঠকারিতা ও জেনে শুনে সত্যের বিরোধিতা করা। তবে এ কারণটা খুব কম ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। প্রথম কারণটাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মুসলিম স্বামীর সাহচর্যে স্ত্রীর নিকট স্বামীর ধর্মটাই অধিকতর সঠিক ও ন্যায় সংগত এবং তার শরিয়তই অপেক্ষাকৃত ভালো বলে প্রতীয়মান হতে পারে। এর ফলে সে এই মহান ইসলামী বিধানের বাহক মুহাম্মদ সা.-এর পবিত্র জীবন চরিত এবং তার মোজেযা ও নিদর্শনাবলী সম্পর্কে অবহিত হবার সুযোগ পেতে পারে। এতে করে তার ঈমান পূর্ণতা পেতে পারে ও ইসলামে দীক্ষিত হতে পারে। মহিলা যথার্থ সৎ কর্মশীলা হলে সে এভাবে দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করতে পারে।"

১১. সাবেঈ নারী বিয়ে করা : সাবেঈ এমন একটি সম্প্রদায়, যাদের অবস্থান অগ্নি উপাসক, ইহুদী ও খৃস্টানের মাঝখানে। তাদের কোনো আলাদা ধর্ম নেই। মুজাহিদ বলেছেন : তারা আহলে কিতাবের মধ্য হতে একটি সম্প্রদায়। তারা দাউদ আ. এর উপর নাযিলকৃত কিতাব যাবুর পাঠ করে। হাসান বসরি বলেছেন, তারা ফেরেশতাদের পূজা করে। আবদুর রহমান বিন যায়দ বলেন : তারা একটা ধর্মের অনুসারী ছিলো। মোসেল দ্বীপে তারা বাস করতো। তারা শুধু বলতো : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এছাড়া তাদের কোনো কিতাবও ছিলনা, নবীও ছিলনা। তারা শুধু এক আল্লাহতে বিশ্বাস করতো। কোনো নবীর প্রতিই তারা ঈমান আনেনি। এ কারণেই মুশরিকরা রসূল সা.-এর সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বলতো : "ওরা সাবেঈদের মতো বলে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই।"

কুরতুবি বলেছেন : বিভিন্ন আলেমের বক্তব্য থেকে যা জানা যায় তা হলো, তারা একত্ববাদী, তবে নক্ষত্রসমূহের প্রভাব ও ক্ষমতায় বিশ্বাস করতো। ইমাম রাযীর মতে : তারা নক্ষত্রের পূজা করে। তবে তা এই অর্থে যে, আল্লাহ এগুলোকে দোয়া ও ইবাদতের কেবলা বানিয়েছেন, অথবা এই অর্থে যে, আল্লাহ বিশ্ব জগতের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার

দায়িত্ব এগুলোর নিকট অর্পণ করেছেন। এ কারণে এই সম্প্রদায়ের মহিলাদেরকে বিয়ে করা সংক্রান্ত বিধি নিয়ে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। কেউ বলেন : তারা এমন একটি আসমানী কিতাবের অধিকারী, যা বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়ে গেছে, যেমন ইহুদী ও খৃস্টানদের কিতাবের বিকৃতি ঘটেছে। এ জন্য সূরা মায়েদার আয়াত : "আজ তোমাদের জন্য হালাল করা হলো, সকল পবিত্র খাবার" অনুযায়ী তাদেরকে বিয়ে করা বৈধ। এটা ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর দুই শিষ্যের মত। কোনো কোনো ফকীহ এই সম্প্রদায়ের প্রকৃত পরিচয় উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়ে বলেন : "ইসলামের মূলনীতিতে তারা যদি ইহুদী ও খৃস্টানদের সমমনা হয়, অর্থাৎ রসূলগণকে মানে ও কিতাবে বিশ্বাস করে, তাহলে তারা তাদের দলভুক্ত। আর মূলনীতিতে তাদের বিরোধী হলে তাদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবেনা, বরং মুশরিক গণ্য হবে। ইমাম শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের মতও অনুরূপ।

১২. অগ্নি উপাসক মহিলাদের বিয়ে করা : ইবনুল মুনযির বলেন : অগ্নি উপাসককে বিয়ে করা ও তাদের যবাই করা পশু খাওয়া সর্বসম্মতভাবে নিষিদ্ধ নয়। তবে অধিকাংশের মতো নিষিদ্ধ। কেননা তাদের কোনো আসমানী কিতাব নেই এবং তারা কোনো নবুয়তেও বিশ্বাসী নয়। তারা আগুনের পূজা করে। ইমাম শাফেয়ী বর্ণনা করেছেন যে, উমর রা. অগ্নি উপাসকদের প্রসঙ্গে বলেছেন : "তাদের সাথে কী আচরণ করবো শুনেছি, বুঝছিনা।" আবদুর রহমান বিন আওফ বলেছেন : "আমি রসূলুল্লাহ সা.কে বলতে শুনেছি, তাদের সাথে আহলে কিতাবের মতো আচরণ করো। অর্থাৎ তাদের প্রাণের নিরাপত্তা দিতে হবে এবং জিযিয়া দিয়ে বসবাসের অনুমতি দিতে হবে।" এ দ্বারা প্রমাণিত হয়, তারা আহলে কিতাব নয়। ইমাম আহমদকে জিজ্ঞাসা করা হলো : অগ্নি উপাসকদের আসমানী কিতাব আছে, একথা কি সত্য? তিনি বললেন : এটা মিথ্যা কথা। তিনি এ কথাটা খুব গুরুত্বসহকারে বলেছেন। আবু ছাওরের মতে অগ্নি উপাসক নারীকে বিয়ে করা বৈধ। কেননা তারা ইহুদী ও খৃস্টানদের মতো জিযিয়া দেয়ার অনুমতিপ্রাপ্ত।

১৩. ইহুদি ও খৃস্টান ব্যতিত অন্যান্য কিতাবধারীদের সাথে বিয়ে : হানাফিদের মতে, আল্লাহর কাছ থেকে আগত যে কোনো ধর্মে বিশ্বাসী ও যে কোনো আসমানী কিতাবের অনুসারী যথা ইবরাহিম আলাইহিস সালামের গ্রন্থাবলী, শিস আলাইহিস সালামের গ্রন্থাবলী ও দাউদ আলাইহিস সালামের যাবুর গ্রন্থের অনুসারীদের সাথে বিয়ে এবং তাদের যবাই করা পশুর গোশত খাওয়া জায়েয, যদি তারা মুশরিক না হয়। হাম্বলি মাযহাবের একটি গোষ্ঠীর মতও অনুরূপ। কেননা তারা আল্লাহর কিতাবসমূহের মধ্য থেকে একটি কিতাব আঁকড়ে ধরে রেখেছে। এজন্য ইহুদি ও খৃস্টানদের সাথে তাদের সাদৃশ্য রয়েছে। পক্ষান্তরে শাফেয়ী মাযহাবের মতে ও হাম্বলি মাযহাবের একাংশের মতে তাদের সাথে বিয়েও জায়েয নয়, তাদের যবাই করা জন্তুও খাওয়া জায়েয নয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : أَنْ تَقُولُوٓا إِنَّمَآ أُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا .

"যেন তোমরা না বলতে পারো যে, কিতাব তো শুধু আমাদের পূর্বেকার দুটি গোষ্ঠীর কাছেই নাযিল হয়েছিল ..." তাছাড়া এ যুক্তিও তুলে ধরেন যে, প্রাচীনকালের ঐসব গ্রন্থ ছিলো শুধু উপদেশাবলী, উদাহরণাবলী ও নীতিমালা পরিপূর্ণ। কোনো আইনী বিধিমালা তাতে ছিলনা। তাই ঐসব গ্রন্থ আইনী বিধিমালা সম্বলিত গ্রন্থের (যথা তাওরাত ও ইনজীল) সমকক্ষ নয়।

১৪. অমুসলিম পুরুষের সাথে মুসলিম নারীর বিয়ে : আলেমদের সর্বসম্মত মত হলো, অমুসলিম পুরুষের সাথে মুসলিম নারীর বিয়ে অবৈধ, চাই সে পুরুষ মুশরিক হোক বা আহলে কিতাব হোক। এর প্রমাণ, আল্লাহ তায়ালার বাণী :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَاۤءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ، اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ج فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ ، لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ .

অর্থ : হে মুমিনগণ, যখন তোমাদের কাছে মুমিন নারীরা হিজরত করে আসে, তখন তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা করে নিও। তাদের ঈমান সম্বন্ধে আল্লাহ সবচেয়ে বেশি জানেন। যদি তোমরা জানতে পারো তারা ঈমানদার, তবে তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠিয়ো না। তারাও কাফেরদের জন্য হালাল নয়, কাফেররাও তাদের জন্য হালাল নয়। (সূরা মুমতাহিনা : আয়াত ১০)

এ আয়াতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দেয়া হয়েছে, মুমিন নারীদের বিয়ে কাফেরদের সাথে হালাল নয়। এখানে পরীক্ষা করার অর্থ হলো, তাদের হিজরত করে চলে আসার কারণ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে নিশ্চিত হওয়া যে, তারা আল্লাহ ও রসূলের ভালোবাসার টানে এবং ইসলামের বিধান অনুযায়ী জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে এসেছে কিনা? যদি সেই উদ্দেশ্যেই এসে থাকে, তাহলে তাদের এ বক্তব্য গ্রহণ করতে হবে ও তাদেরকে ফেরত পাঠানো যাবেনা।

এ বিধির যৌক্তিকতা হলো, স্ত্রীর উপর স্বামীর কর্তৃত্বের অধিকার রয়েছে এবং সে যা কিছু ন্যায়সঙ্গত আদেশ দেবে, তা প্রতিপালন করা স্ত্রীর জন্য বাধ্যতামূলক। এ বিষয়ে তার উপর স্বামীর অভিভাবকসুলভ ও শাসকসুলভ ক্ষমতা রয়েছে। অথচ একজন মুসলমান পুরুষ বা নারীর উপর কোনো কাফেরের কর্তৃত্ব ও শাসন ক্ষমতা নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ۝

"আল্লাহ কখনো মুমিনদের উপর কাফেরদের কোনো কর্তৃত্ব রাখবেন না।" (নিসা : ১৪১)

তাছাড়া, অমুসলিম স্বামী মুসলিম স্ত্রীর ধর্মকে স্বীকার করেনা, বরং তার কিতাবকে ও তার নবীর নবুয়্যতকে প্রত্যাখ্যান করে। এমন ব্যাপক মত পার্থক্য ও কট্টর বিভেদ নিয়ে কোনো দাম্পত্য জীবন স্থিতিশীল হতে পারেনা এবং কোনো সহাবস্থান স্থায়ী হতে পারেনা। পক্ষান্তরে কোনো মুসলমান পুরুষ যখন কোনো কিতাবি (ইহুদি বা খৃস্টান) নারীকে বিয়ে করে, তখন সে তার ধর্মকে স্বীকার করে। কেননা সে জানে, তার কিতাব ও তার নবীর প্রতি ঈমান তার নিজের ঈমানেরই অংশ, যা ছাড়া তার ঈমান পূর্ণতা লাভ করে না।

১৫. চারটির বেশি বিয়ে করা হারাম : এক সাথে চারজনের বেশি নারীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করা পুরুষের জন্য হারাম। কারণ চারজনই যথেষ্ট। আল্লাহ দাম্পত্য জীবনকে সুস্থ ও সাচ্ছন্দ রাখার জন্য পারস্পরিক সদাচার ও সুবিচারের যে বাধ্যবাধকতা রেখেছেন, চারের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করলে তা মানা সম্ভব নয়। এর প্রমাণ আল্লাহর নিম্নোক্ত উক্তি :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوْا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذٰلِكَ أَلَّا تَعُوْلُوْا

অর্থ : আর যদি তোমাদের আশংকা হয়, এতিম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবেনা, তাহলে অন্য নারীদের মধ্য হতে পছন্দমতো, বিয়ে করে নাও, দুই, তিন কিংবা চারজন পর্যন্ত। কিন্তু যদি আশংকা করো যে, তাদের মধ্যে সুবিচার করতে পারবেনা, তাহলে একজনকেই বিয়ে করো অথবা তোমাদের মালিকানাধীন দাসীকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকো। এতেই অবিচার থেকে রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।" (সূরা নিসা : আয়াত ৩)

অর্থাৎ তোমাদের ধারণা যদি এই মর্মে প্রবলতর হয় যে, এতিম নারীকে বিয়ে করলে তার প্রতি সুবিচার করতে পারবেনা, তাহলে এতিম ছাড়া অন্যান্য নারীকে বিয়ে করো। এখানে "যদি তোমাদের আশংকা হয়" কথাটা প্রকৃতপক্ষে শর্ত আরোপ বুঝায়নি। কেননা মুসলমানদের সর্বসম্মত মত হলো, এতিমদের প্রতি সুবিচার করতে না পারার আশংকা থাক বা না থাক, উভয় অবস্থায় চারজন পর্যন্ত মহিলাকে বিয়ে করা বৈধ।

আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ : বুখারি, আবু দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযি উরওয়া ইবনুয যুবাইর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : "যদি তোমরা আশংকা করো যে, এতিমদের প্রতি সুবিচার করতে পারবেনা ..." এ আয়াত সম্পর্কে উরওয়া আয়েশা রা. কে জিজ্ঞাসা করলেন। জবাবে আয়েশা রা. বললেন : হে আমার ভাগ্নে, এ হচ্ছে সেই এতিম নারীর কথা, যে তার অভিভাবকের নিকট লালিত পালিত হয়। তার ধনসম্পদ তার অভিভাবকের ধনসম্পদে মিশ্রিত থাকে। এক পর্যায়ে তার সম্পদ ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তার অভিভাবক তাকে বিয়ে করতে আগ্রহী হয়, কিন্তু তাকে সুবিচারের দাবি অনুযায়ী মোহরানা দিতে চায় না। অন্য কোনো পুরুষের মতোই তাকে মোহরানা দিতে চায়। তাই অভিভাবককে সুবিচারমূলকভাবে এবং উচ্চতর মোহরানা দিয়ে বিয়ে করতে না পারলে এতিম নারীদেরকে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন সে ক্ষেত্রে এতিমের পরিবর্তে সাধারণ মহিলাকে বিয়ে করে। আয়েশা রা. বললেন : এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর লোকেরা রসূলুল্লাহ সা.কে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। এর জবাবে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হলো :

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَاءِ ط قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ لا وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ فِيْ يَتٰمَى النِّسَاءِ الّٰتِيْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ أَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ ○

অর্থ : তারা তোমাকে স্ত্রীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বলো : আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের সম্পর্কে বিধি জানাচ্ছেন। সেই সাথে তিনি সেসব বিধির কথাও স্মরণ করাচ্ছেন যা আগে থেকেই এই কিতাবে তোমাদেরকে পড়ে শুনানো হয়। ঐ এতিম মেয়েদের সম্পর্কে বিধি জানানো হচ্ছে, যাদের প্রাপ্য মোহরানা তোমরা দিতে চাওনা, অথচ তাদেরকে তোমরা বিয়ে করতে চাও ..."। (সূরা নিসা : ১২৭)

আয়েশা রা. বলেছেন, আল্লাহ যে বলেছেন, এই কিতাবে তোমাদেরকে পড়ে শুনানো হয়, তা হচ্ছে পূর্ববর্তী আয়াত, যাতে আল্লাহ বলেছেন : "আর যদি তোমরা আশংকা করো যে,

এতিম মেয়েদের প্রতি তোমরা সুবিচার করতে পারবেনা, তাহলে তোমাদের মনোপুত মেয়েদেরকে বিয়ে করো ...”

পুরুষরা যে সকল এতিম মেয়ের সম্মান ও সৌন্দর্যে প্রলুব্ধ হয়, শুধু তাদেরকেই বিয়ে করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন এ ক্ষেত্রে সুবিচার করে এবং সম্পদে ও সৌন্দর্যে যে সকল এতিম মেয়ে পিছিয়ে থাকে, তাদের প্রতিও যেন আগ্রহী হয়।

সুতরাং আয়াতের মর্ম হলো, আল্লাহ্ তায়ালা এতিমদের অভিভাবকদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন : এতিম মেয়ে যখন তোমাদের কাছে লালিত পালিত হয়, তোমাদের অভিভাবকত্বের অধীনে থাকে এবং তোমরা তাকে মোহর মিছলও দিতে ইচ্ছুক হওনা, তখন এই এতিম মেয়েদের পরিবর্তে সাধারণ মেয়েদেরকে বিয়ে করো। তারা তো সংখ্যায় প্রচুর এবং সে ক্ষেত্রে আল্লাহ্ কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি, বরং এক থেকে চারজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন। আর একজনের বেশি বিয়ে করলে ন্যায়বিচার করতে পারবেনা এমন আশংকা থাকলে একজন স্ত্রী গ্রহণ করেই ক্ষান্ত থাকা চাই অথবা দাসী থাকলে তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা চাই।

চার স্ত্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাই আয়াতের তাৎপর্য : ইমাম শাফেয়ী বলেছেন : মহান আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত রসূল সা.-এর সুন্নত এই যে, রসূলুল্লাহ্ সা. ব্যতিত আর কারো জন্য চারজনের বেশি স্ত্রী এক সঙ্গে গ্রহণ করা জায়েয নেই। ইমাম শাফেয়ীর এই মতের উপর আলেমদের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেবল একটি শিয়া গোষ্ঠীর মতে, এক সাথে চারজনের বেশি স্ত্রী গ্রহণ জায়েয। এমনকি তাদের কেউ কেউ মনে করেন, যতো ইচ্ছা স্ত্রী এক সাথে গ্রহণ করা জায়েয। তাদের কেউ কেউ এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ সা.-এর ন্যায় চার থেকে নয়জন পর্যন্ত স্ত্রী একত্রে গ্রহণ করার নীতি পক্ষপাতি।

ইমাম কুরতুবী এই প্রশ্নের জবাবে বলেছেন : কুরআনের “দুই, তিন ও চারজনকে বিয়ে করো” এই কথাটা দ্বারা নয়জন স্ত্রী এক সাথে গ্রহণের বৈধতা বুঝায়না। যারা বলে বৈধতা বুঝায় তারা কুরআন ও সুন্নাহকে সঠিকভাবে বুঝেনি। উপরন্তু তারা মুসলিম উম্মাহর প্রাচীন শীর্ষ নেতৃবৃন্দের অনুসৃত নীতিকে আগ্রহ্য করেছে। তারা মনে করেছে, এখানে যে আরবি অব্যয় ওয়াও অর্থাৎ ‘ও’ ব্যবহৃত হয়েছে, তা সংযোজন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (অর্থাৎ ২+৩+৪=৯)। তদুপরি রসূল সা. কর্তৃক এক সাথে নয়জন স্ত্রী গ্রহণ করার দৃষ্টান্তকে সম্বল করে তারা ঐ ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছে এবং উক্ত মত অবলম্বন করেছে। এ মতটির প্রবক্তা হলো রাফেজী গোষ্ঠী ও রাফেজীদের একাংশ। এমনকি জাহেরী গোষ্ঠীর কেউ কেউ আরো খারাপ মত অবলম্বন করেছে। তারা বলেছে, আয়াতের ‘মাসনা’ অর্থ দুই+দুই, ‘সুলাস’ অর্থ তিন+তিন, ‘রুবা’ অর্থ চার+চার। আর ‘ওয়াও’ অব্যয় সংযোজন অর্থে ব্যবহৃত। সুতরাং সর্বমোট আঠারো জন স্ত্রীকে এক সাথে গ্রহণ করা তাদের মতে বৈধ। (২ + ২ + ৩ + ৩ + ৪ + ৪ = ১৮) তাদের এই ভ্রান্ত মতের ভিত্তি আরবি ভাষা ও সুন্নাহ সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং সমগ্র উম্মাহর ঐকমত্যের বিরোধিতা। কেননা কোনো সাহাবী ও তাবেয়ী সম্পর্কে কখনো শোনা যায়নি যে, তিনি এক সাথে চারজনের বেশি স্ত্রী গ্রহণ করেছেন।

ইমাম মালেক মুয়াত্তায় এবং নাসায়ী ও দারু কুতনিতে বর্ণনা করেছেন : গাইলান বিন উমাইয়া সাকাফী যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তার দশজন স্ত্রী ছিলো। রসূলুল্লাহ্ সা.

তাকে বললেন, "ওদের মধ্য হতে চারজনকে বেছে নাও, আর বাকী সবাইকে তালাক দাও।"

আবু দাউদে হারেস বিন কায়েস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : "আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করি, তখন আমার আটজন স্ত্রী ছিলো। এ কথা যখন রসূল সা.কে জানালাম, তখন তিনি বললেন, "ওদের মধ্য থেকে চারজনকে বেছে নাও।"

মুকাতিল বলেছেন : কায়েস ইবনুল হারেসের আটজন সম্ভ্রান্ত স্ত্রী ছিলো। এ আয়াত নাযিল হলে রসূলুল্লাহ সা. তাকে আদেশ দিলেন, চারজনকে তালাক দাও এবং চারজনকে বহাল রাখো। আবু দাউদের মতে, ইনি কায়েস বিন হারেস নয়, হারেস বিন কায়েস আসাদী।

উল্লেখ্য, রসূলুল্লাহ সা.কে চারজনের বেশি স্ত্রী রাখার যে অনুমতি আল্লাহ দিয়েছেন, সেটি তার একক বৈশিষ্ট্য।

স্ত্রীদের মধ্যে সুবিচার করা ওয়াজিব : আল্লাহ একাধিক বিয়ের অনুমতি দিয়েছেন, তবে এর সংখ্যা চারের মধ্যে সীমিত করেছেন। তাদের মধ্যে খাদ্য, বাসস্থান, পোশাক, রাত্র যাপন ও অন্যসব বস্তুগত বিষয়ে ইনসাফ বজায় রাখা এবং ধনী ও দরিদ্র, অভিজাত ও সাধারণে কোনো বিভেদ ও বৈষম্য না করা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। কেউ যদি আশংকা করে, সকল স্ত্রীর সাথে সুবিচার করতে ও সবার অধিকার দিতে পারবে না, তাহলে তার জন্য একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা হারাম। যদি তিনজনের অধিকার দিতে পারে কিন্তু চতুর্থ জনের অধিকার দিতে না পারে, তাহলে চতুর্থ স্ত্রী গ্রহণ করা হারাম। অনুরূপ যে ব্যক্তি মনে করে দ্বিতীয় স্ত্রীর প্রতি তার অবিচার করার আশংকা আছে, তার পক্ষে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করা হারাম। কেননা আল্লাহ বলেছেন : "তোমরা দু'জন তিনজন বা চারজন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারো। তবে যদি আশংকা করো, সুবিচার করতে পারবে না, তাহলে মাত্র একজন স্ত্রী গ্রহণ করো অথবা দাসীকে (নিয়েই সন্তুষ্ট থাকো)। এটাই সুবিচারের নিকটতম পন্থা।"

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "যে ব্যক্তির দু'জন স্ত্রী থাকে এবং সে তাদের একজনের দিকে ঝুঁকে পড়ে, সে কেয়ামতের দিন যখন উপস্থিত হবে তখন তার শরীরের একাংশ বাঁকা থাকবে।" আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ।

কারো ধারণা হতে পারে, একদিকে এ আয়াতে আল্লাহ স্ত্রীদের মধ্যে সুবিচার করা বাধ্যতামূলক করে বিধি নাযিল করেছেন, অপরদিকে সূরা নিসার অপর আয়াতে মানুষ কখনো সুবিচার করতে পারবে না বলেছেন। এভাবে এ দু'আয়াতে বৈপরিত্য রয়েছে। আসলে এ ধারণা ঠিক নয়। অপর আয়াতটি হলো :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوٓا اَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ .

অর্থ : তোমরা স্ত্রীদের প্রতি সুবিচার করতে চাইলেও তা কখনো করতে পারবেনা। কাজেই একজনের প্রতি সর্বোতভাবে ঝুঁকে পড়ো না। যার ফলে তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় ফেলে রাখবে।" (সূরা নিসা : আয়াত ১২৯)

বস্তুত যে সুবিচারের আদেশ দেয়া হয়েছে, তা হলো বাহ্যিক সুবিচার যা মানুষের সাধ্যের আওতাভুক্ত। প্রীতি ও ভালোবাসার ক্ষেত্রে সুবিচার করার আদেশ দেয়া হয়নি। কেননা

সেটা কেউ করতে সক্ষম নয়। শেষোক্ত আয়াতে যে বলা হয়েছে "তোমরা কখনো স্ত্রীদের মাঝে সুবিচার করতে পারবেনা" সেটা প্রীতি, ভালোবাসা ও সহবাসের সুবিচার। মুহাম্মদ ইবনে সিরীন বলেছেন : আমি উবায়দাকে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন" "ওটা হচ্ছে ভালোবাসা ও সহবাসে সুবিচার।" আবু বকর ইবনুল আরাবী বলেন : "এটা সঠিক। কেননা ভালোবাসায় সমতা ও সুবিচার করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা প্রত্যেক মানুষের মন আল্লাহর দুই আংগুলের মাঝে অবস্থান করে। তিনি তাকে যেভাবে ইচ্ছা ঘুরাতে থাকেন। সহবাসের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এক নারীর প্রতি যতোখানি কামোত্তেজনা সৃষ্টি হয়, ততোখানি অপর নারীর প্রতি নাও হতে পারে। এটা যখন মানুষের ইচ্ছাকৃত নয়, তখন এতে তার কোনো জবাবদিহিতা থাকতে পারেনা। কেননা এটা তার সাধ্যাতীত ব্যাপার। তাই এ বিষয়ে কাউকে দায়ী করা চলেনা। আয়েশা রা. বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সা. স্ত্রীদের মাঝে সুবিচারসহকারে সবকিছু বণ্টন করতেন এবং বলতেন : اَللّٰهُمَّ هٰذَا قَسْمِىْ فِيْمَا أَمْلِكُ، فَلَاتَلُمْنِىْ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ .

"হে আল্লাহ, আমার যে বিষয়ে সুবিচার করার ক্ষমতা আছে, সে বিষয়ে সুবিচার করলাম। যে বিষয়ে আমার সুবিচারের ক্ষমতা নেই, বরং তোমার আছে, সে বিষয়ে আমাকে ভর্ৎসনা করোনা।"

আবু দাউদ বলেছেন : "যে বিষয়ে সুবিচারের ক্ষমতা নেই।" এ দ্বারা হৃদয়কে বুঝানো হয়েছে। আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ।

খাত্তাবী বলেছেন : এ হাদিসে স্বাধীন সতিনদের মধ্যে সমবণ্টনকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আর মেলামেশার ক্ষেত্রে একজনের দিকে এমনভাবে ঝুঁকে পড়া অপছন্দনীয় যা কারো হক নষ্ট করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হৃদয়ের টান ও ঝোঁক দূষণীয় নয়। কেননা হৃদয় কারো আয়ত্তে ও নিয়ন্ত্রণে থাকেনা। এজন্য রসূলুল্লাহ সা. তাঁর স্ত্রীদের মাঝে যাবতীয় বস্তু সমানভাবে বণ্টন করে বলতেন : "হে আল্লাহ, এ ক্ষেত্রে আমার সমবণ্টনের ক্ষমতা আছে। আমি এখানে সমবণ্টন করলাম ..." আর এ সম্পর্কেই সূরা নিসার আয়াত "তোমরা কখনো তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে সুবিচার করতে পারবেনা ..." নাযিল হয়েছে।

স্বামী যখন সফরে যাবে, তখন যে স্ত্রীকে ইচ্ছা সাথে নিতে পারবে। তবে তাদের মাঝে লটারি করে বাছাই করলে ভালো হয়। স্ত্রীদের মধ্য থেকে কেউ নিজের হকের দাবি ছেড়ে ত্যাগ স্বীকার করতে পারে। সেটা একান্তভাবে তার নিজের এখতিয়ারভুক্ত। নিজের পাওনা সে অন্যকে দিয়ে দিতে পারে। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত : "রসূলুল্লাহ সা. যখন কোনো সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন তার স্ত্রীদের মধ্যে লটারি করতেন। যার নামে 'লটারি উঠতো, তাকে সাথে নিয়ে যেতেন। প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য তার প্রাপ্য দিন ধার্য করতেন। কেবল সওদা বিনতে যামা' তার দিনটি আয়েশা রা. কে দিয়ে দিয়েছিলেন।

খাত্তাবী বলেছেন : এ হাদিস থেকে (অধিকারের বিষয়ে) লটারি শরিয়তসম্মত প্রমাণিত হয়। আরো প্রমাণিত হয় যে, দিন অথবা রাত, উভয়টিই বণ্টনের আওতায় আসতে পারে। অনুরূপ, দাম্পত্য সাহচর্য বা সম্পদ সংক্রান্ত হক, উভয়টিই অন্য সতিনকে দেয়া যেতে পারে। অধিকাংশ আলেম এ ব্যাপারে একমত যে, যে স্ত্রী স্বামীর সাথে সফরে যাবে সে যদি লটারি অনুযায়ী গিয়ে থাকে তবে তার সফরের সেই দিনগুলো অন্যান্য সতিনদের প্রাপ্য হবেনা এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে তারা যেদিনগুলোতে স্বামীর সঙ্গ ত্যাগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তা তাদের বেলায় গণনায় আসবেনা। কোনো কোনো আলেমের মতে,

গণনায় আসবে এবং অবশিষ্ট স্ত্রীদেরকে তাদের স্বামী সঙ্গ বঞ্চিত দিনগুলো পরিশোধ করে সমতা বিধান করতে হবে। তবে প্রথমোক্ত মতটিই অগ্রগণ্য। কেননা অধিকাংশ আলেম এ ব্যাপারে একমত। এর সপক্ষে একটা বাড়তি যুক্তি হলো, তাকে সফরের অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয় বলেই এই অতিরিক্ত দিনগুলো দিয়ে তাকে সফরসঙ্গিনী করা হয়েছে। যারা ঘরে বসে থাকে, তাদের এই কষ্ট ভোগ করতে হয়না। তাই এ ক্ষেত্রে তাকে যদি অন্যান্য স্ত্রীর সমপর্যায়ে নিয়ে আসা হয়, তাহলে সে সুবিচার থেকে বঞ্চিত হবে।

স্ত্রীর অধিকার রয়েছে তার উপর আর কোনো স্ত্রী গ্রহণ না করার শর্ত আরোপের : স্বামীর সুবিচারের সামর্থ্য থাকলে ইসলাম যেমন তাকে চারজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণের অধিকার দিয়েছে, তেমনি স্ত্রীকে বা তার অভিভাবককে এই অধিকারও দিয়েছে যে, তার উপর আর কোনো স্ত্রী গ্রহণ না করার শর্ত আরোপ করতে পারে। আকদে স্বামীর উপর এরূপ শর্ত আরোপ করলে সে শর্ত বৈধ এবং তা পালন করা বাধ্যতামূলক হবে। স্বামী এ শর্ত পূরণ না করলে স্ত্রীর বিয়ে ভেংগে দেয়ার ক্ষমতা থাকবে এবং স্ত্রী স্বয়ং এ অধিকার রহিত করা ও স্বামী কর্তৃক শর্ত লঙ্ঘন করায় সম্মত হওয়া ব্যতিত তার বিয়ে ভাংগার এ ক্ষমতা রহিত হবেনা। এটাই ইমাম আহমদেরও অভিমত এবং ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়েম এ মতকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ক্রয়-বিক্রয় ও ভাড়া ইত্যাদির ক্ষেত্রে শর্ত যতোটা ঝুঁকিপূর্ণ, বিয়ের ক্ষেত্রে তা ততোধিক ঝুঁকিপূর্ণ। তাই শর্ত পূরণ করা বিয়ের ক্ষেত্রে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও বাধ্যতামূলক।

তাঁদের এই অভিমতের পক্ষে তারা নিম্নোক্ত প্রমাণসমূহ উপস্থাপন করেছেন :

১. বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে শর্তের বিনিময়ে তোমরা স্ত্রীদের সাথে যৌন মিলন বৈধ করেছ, সে শর্তগুলো পালন করাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।"

২. বুখারি ও মুসলিম আব্দুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকা থেকে বর্ণনা করেছেন : মিসওয়ার বিন মাখরামা তাকে জানিয়েছেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ সা.কে মিম্বরে বলতে শুনেছেন : বনু হিশাম তাদের মেয়েকে আলী বিন আবু তালিবের সাথে বিয়ে দেয়ার জন্য আমার অনুমতি চেয়েছে। আমি তাদেরকে অনুমতি দিচ্ছিনা। আবারো বলছি, অনুমতি দিচ্ছিনা। আবার বলছি, অনুমতি দিচ্ছিনা। কেবল তখন অনুমতি দিতে পারি, যখন আলী আমার মেয়েকে তালাক দিতে ইচ্ছুক হয় এবং তাদের মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। কেননা আমার মেয়ে আমারই অংশ। যে জিনিস থেকে তার মনে সংশয় জন্মে, সে জিনিস থেকে আমারও সংশয় জন্মে, আর যে জিনিস তাকে কষ্ট দেয়, তা আমাকেও কষ্ট দেয়। অপর বর্ণনায় রয়েছে : "ফাতেমা আমার অংশ। আমি আশংকা করি, সে তার ধর্মের ব্যাপারে ফেতনায় পড়ে যাবে। (অর্থাৎ বনু হিশাম গোত্রের মেয়ে তার সতিন হয়ে এলে সে অনেক গঞ্জনা দেবে, ফলে ফাতেমা সঠিকভাবে দীনী দায়িত্ব পালন করতে পারবেনা।) এরপর তিনি বনু আবদ শামস গোত্রে তার জনৈক জামাই-এর নামোল্লেখ করলেন, অতপর তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে তার প্রচুর প্রশংসা করলেন। বললেন : সে আমার সাথে যা ওয়াদা করেছে, তা পূরণ করেছে, যে কথা বলেছে সত্য বলেছে। আর আমি কোনো হালালকে হারাম করছিনা এবং কোনো হারামকে হালাল করছি না। তবে আল্লাহর কসম, আল্লাহর রসূলের মেয়ে ও আল্লাহর দুশমনের মেয়ে (অর্থাৎ আবু জাহলের মেয়ে) কখনো এক পরিবার একত্রিত হতে পারেনা।

ইবনুল কাইয়েম বলেন : এই বিধি থেকে কয়েকটি বিষয় জানা যায় : স্বামী যখন স্ত্রীকে এই শর্তে বিয়ে করে যে, তার জীবদ্দশায় সে আর কোনো বিয়ে করবেনা, তখন তার জন্য এই শর্ত পূরণ করা বাধ্যতামূলক। যদি তার জীবদ্দশায় বিয়ে করে, তবে স্ত্রীর বিয়ে বাতিল করার অধিকার থাকবে। যেহেতু রসূল সা. জানিয়েছেন, ফাতেমা বেঁচে থাকতে আলীর অন্য বিয়ে করলে তা ফাতেমাকে সন্দেহ-সংশয় ও মনোকষ্টে জর্জরিত করবে। আর ফাতেমার মনোকষ্ট স্বয়ং রসূল সা.-এর মনোকষ্টের কারণ হবে। অথচ এ কথা সুনিশ্চিতভাবে জানা যে, আলীর সাথে ফাতেমাকে বিয়ে দেয়া হয়েছে এই শর্তে যে, তিনি ফাতেমাকে ও তাঁর পিতাকে কোনো প্রকার কষ্ট দেবেননা এবং তাদের মনে কোনো ধরনের সংশয় সৃষ্টি করবেননা। যদিও আকদের ভাষ্যে সরাসরি এ শর্তের উল্লেখ ছিলনা। কিন্তু এ শর্ত যে আরোপিত ছিলো, তা সবারই সুনিশ্চিতভাবে জানা ছিলো।

অন্য জামাতার উল্লেখ এবং সে সত্যভাষী ও ওয়াদা পালনকারী ছিলো বলে তার প্রশংসা দ্বারা রসূল সা. আলী রা.কে পরোক্ষভাবে তার অনুকরণে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আর এ দ্বারা এটাও বুঝা যায় যে, আলীও এই মর্মে তার সাথে ওয়াদা করেছেন যে, ফাতেমার মনে কষ্ট দেবেননা ও সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করবেননা। অন্য জামাতার মতো আলীও যাতে এই ওয়াদা পালন করেন সেজন্য তাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এ থেকে বুঝা যায়, প্রচলিত রীতি ও প্রথার আলোকে যে শর্ত আরোপিত হয়, তা শাব্দিকভাবে আরোপিত শর্তের মতোই। সে শর্ত পূরণ না করলে শর্ত আরোপকারী সংশ্লিষ্ট চুক্তিটি ভেঙ্গে দিতে পারে। যদি ধরে নেয়া যায়, কোনো সমাজে এরূপ রীতি চালু রয়েছে যে, তারা তাদের মহিলাদেরকে তাদের বাড়ি থেকে বের করেনা, স্বামীকে কোনক্রমেই বাড়ি থেকে বাইরে নিয়ে যেতে দেয়না এবং তাদের এই রীতি অব্যাহত থাকে। তাহলে এটা একটা কথিত বা লিখিত শর্তের মতোই গণ্য হবে। বস্তুতঃ এটা মদিনার অধিবাসীদের রীতি প্রথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইমাম আহমদের মূলনীতি হলো, প্রথাসিদ্ধ শর্ত কথিত বা লিখিত শর্ত সমান মর্যাদা সম্পন্ন। এজন্য প্রথাগতভাবে মজুরি নিয়ে কাজ করে এমন ধোপার কাছে যদি কাপড় ধুতে দেয়া হয়, এমন বাবুর্চির কাছে রুটি বানাতে আটা বা অন্য কোনো খাবার রান্না করতে খাবারের উপকরণ দেয়া হয়, অথবা গোসলখানায় গিয়ে এমন ব্যক্তিকে কাপড় ধোয়ার কাজে লাগানো হয়, মজুরির বিনিময়ে কাজ করাই যার অভ্যাস, তাহলে মজুরির শর্ত আরোপ না হলেও প্রচলিত হারে তাকে মজুরি দিতে হবে। অনুরূপ, এমন কোনো পরিবার থেকে যদি মেয়ে বিয়ে করে আনা হয়, যে পরিবারের মেয়ের উপর স্বামী কখনো সতিন চাপিয়ে দেয়না। তাকে সে সুযোগও দেয়া হয়না এবং এটাই তাদের চিরাচরিত রীতি, তাহলে সেটা হবে আরোপিত শর্তের মতো।

সুতরাং যে মহিলা সারা দুনিয়ার নারীদের নেত্রী এবং সমগ্র মানব জাতির নেতার মেয়ে, তিনি অন্য সকল নারীর তুলনায় এ অধিকারের সব চেয়ে বেশি হকদার। আলী রা. যদি আকদের ভাষ্যের মধ্যেই একটা শর্ত হিসেবে উল্লেখ করতেন, তাহলে তা দ্বারা তিনি ফাতেমার অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতেননা। বরং সংহত ও জোরদার করতেন মাত্র। আর একই পরিবারে এক সাথে ফাতেমা রা. ও আবু জাহলের মেয়েকে একত্রিত থেকে আলী রা.কে নিবৃত্ত করার পেছনে অত্যন্ত মনোজ্ঞ যুক্তি রয়েছে। সেটি হলো স্ত্রী সাধারণভাবে মর্যাদার দিক দিয়ে স্বামীর অনুগামী হয়ে থাকে। কোনো স্ত্রী যদি নিজেই উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হয়, আর স্বামীও তদ্রূপ হয়, তাহলে সে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যেও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন,

স্বামীর বৈশিষ্ট্যের সুবাদেও উচ্চ মর্যাদার অধিকারিণী। ফাতেমা রা.-এর অবস্থা এ রকমই। আবু জাহলের মেয়েকে ফাতেমার সাথে একই মর্যাদার অধিকারিণী করতে আল্লাহ ইচ্ছুক ছিলেননা, চাই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের বলেই হোক বা স্বামীর সুবাদেই হোক। তাদের মাঝে যে বিরাট ব্যবধান ছিলো সেটাতো সুবিদিত। সুতরাং সে সারা বিশ্বের নারীদের নেত্রী'র সতিন হয়ে আসুক, এটা কোনভাবেই পছন্দনীয় ছিলনা। রসূলুল্লাহ সা. এই অমোঘ সত্যের দিকেই ইংগিত করেছেন এই বলে : "আল্লাহর কসম, একই পরিবারে আল্লাহর রসূলের মেয়ে ও আল্লাহর শত্রুর মেয়ে কখনো একত্রে বাস করতে পারেনা।"

এ ধরনের শর্ত আরোপ করার অধিকার যে মহিলাদের রয়েছে, সে সম্পর্কে ফকীহদের মতামত ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

একাধিক বিবাহের যৌক্তিকতা : এক. আল্লাহ যে মানুষকে একাধিক বিয়ের অনুমতি দিয়েছেন, এটা মানুষের উপর আল্লাহর বিশেষ রহমত ও মহানুভবতা। এ অনুমতিকে তিনি চারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন। একজন পুরুষ এক সাথে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে, তবে তা এই শর্তে যে, তাদের মধ্যে খোরপোষ ও রাত্র যাপনের দিক দিয়ে সুবিচার প্রতিষ্ঠায় তাকে সক্ষম হতে হবে। সুবিচার করতে পারবেনা এবং দায়দায়িত্ব পালন করতে পারবেনা এ আশংকা বোধ করলে তার উপর একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা হারাম। একাধিক বিয়েতো দূরের কথা, একজন স্ত্রীর হক আদায় করতে অক্ষম হলে তার জন্য ততোক্ষণ বিয়ে করাও হারাম যতোক্ষণ সে বিয়ে করার সামর্থ্য অর্জন না করে।

তবে একাধিক বিয়ে ওয়াজিবও নয়, মুস্তাহাবও নয়। এটা কেবল মুবাহ। কেননা সমাজ ও সভ্যতার অনিবার্য প্রয়োজনে ও সংস্কারমূলক কাজের চাহিদা অনুসারে আইন প্রণেতারা এটা বিবেচনা না করে পারেননা।

দুই. ইসলামের একটা উচ্চতর মানবিক মিলন বা লক্ষ্য রয়েছে, যার বাস্তবায়ন ও সর্বস্তরের জনগণের নিকট তা প্রচার করার দায়িত্ব মুসলমানদের উপর অর্পণ করা হয়েছে। এই লক্ষ্য বাস্তবায়ন তাদের পক্ষে সম্ভব কেবল তখনই যখন তাদের হাতে শক্তিশালী রাষ্ট্র থাকবে এবং সেই রাষ্ট্রের হাতে রাষ্ট্রের যাবতীয় উপায় উপকরণ পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকবে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপায় উপকরণ হলো : প্রতিরক্ষা বাহিনী, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি যার উপর রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল এবং যা না থাকলে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, বল, বিক্রম ও রাষ্ট্রীয় নীতি বাস্তবায়নের ক্ষমতা থাকেনা। আর এসব অপরিহার্য উপায় উপকরণ জনশক্তির আধিক্য ব্যতিত অর্জিত হওয়া সম্ভব নয়। মানবীয় কর্মতৎপরতার প্রতিটি ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মী বাহিনী পাওয়া নিশ্চিত করতে হলে বিপুল জনশক্তির সরবরাহ অপরিহার্য। এজন্যই বলা হয়, সম্মান ও মর্যাদা পেতে হলে আগে চাই জনবল ও ধনবলের প্রাচুর্য। আর এই প্রাচুর্য নিশ্চিত করার একমাত্র উপায় হলো অল্প বয়সে বিয়ে করা ও একাধিক বিয়ে করা। আধুনিক উন্নত দেশগুলো জনসংখ্যার আধিক্যের গুরুত্ব কত বেশি এবং উৎপাদনে, যুদ্ধ বিগ্রহে ও প্রভাববলয় সম্প্রসারণে তার অবদান ও সুফল কত বিপুল, তা উপলব্ধি করতে পেরেছে। এজন্যই বিয়ে করতে উৎসাহ প্রদান ও প্রজাদের সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধিতে ক্ষতিপূরণ প্রদানের নীতি অবলম্বনের মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, যাতে রাষ্ট্রের সামগ্রিক শক্তি ও প্রতিরক্ষা ক্ষমতা নিশ্চিত হয়।

জার্মান পরিব্রাজক পল আশমীদ মুসলমানদের প্রজনন ক্ষমতার ব্যাপকতা উপলব্ধি করে এটিকে তাদের শক্তির অন্যতম উৎস বলে আখ্যায়িত করেছেন। ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত "ইসলাম আগামী দিনের বিশ্বশক্তি" নামক পুস্তকে তিনি বলেছেন : "মুসলিম অধ্যুষিত প্রাচ্যে শক্তির উৎস তিনটি উপাদানে নিহিত :

১. "ধর্ম হিসেবে ইসলামের শক্তিমত্তার, তার প্রতি বিশ্বাসে, তার বাস্তব দৃষ্টান্তে এবং বিভিন্ন জাতিসত্তা, বর্ণ ও কৃষ্টির মধ্যে তার সৌভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার অতুলনীয় ক্ষমতায়।

২. পশ্চিমে মরক্কোর সীমান্ত সংলগ্ন আটলান্টিক উপকূল থেকে পূর্বে ইন্দোনেশীয় সীমান্ত সংলগ্ন প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রাকৃতিক সম্পদের অঢেল মজুদ। মুসলমানরা পরস্পর ঘনিষ্ঠ হলে ও সহযোগিতা করলেই এসব রকমারি প্রাকৃতিক সম্পদ এমন একটি শক্তিশালী ও নিখুঁত অর্থনৈতিক একক গড়ে তুলতে পারে এবং এমন সমৃদ্ধশালী স্বনির্ভরতার উদ্ভব ঘটাতে পারে, যা মুসলমানদেরকে ইউরোপ ইত্যাদির বিন্দুমাত্রও মুখাপেক্ষী রাখবেনা।

৩. সর্বশেষে তৃতীয় উপাদানটির উল্লেখপূর্বক তিনি বলেন : "মুসলমানদের প্রচুর প্রজনন 'ক্ষমতা' তাদের জনশক্তিকে একটি ক্রমবর্ধমান শক্তিতে রূপান্তরিত করেছে।" তারপর বলেন : "এই তিনটি শক্তি যখন একত্রিত হবে, তারপর মুসলমানদের একই আকিদা ও একই বিশ্বাসের ভিত্তিতে ভাই ভাই হিসেবে ঐক্যবদ্ধ হবে। একই আল্লাহর একত্বের মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হবে এবং যখন তাদের প্রাকৃতিক সম্পদ তাদের বর্ধিত জনসংখ্যার প্রয়োজন পূরণ করবে, তখন ইসলামী শক্তি এমন ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে যে, গোটা ইউরোপকে ধ্বংসের হুমকি ছুড়ে দেবে এবং এমন একটা অঞ্চল থেকে গোটা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অর্জন করবে, যে অঞ্চলটি সমগ্র বিশ্বের কেন্দ্র।"

শুধু সরকারি পরিসংখ্যানের বরাত দিয়ে নয়, বরং মুসলমানদের ইতিহাসে এবং তাদের উপর তাদের শত্রুদের হামলা ও আগ্রাসনের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিতে তারা যুগে যুগে সংঘবদ্ধ অভিযান চালিয়েছেন। তার ইতিহাসে ইসলামী আকিদা ও ঈমানের যে অজেয় শক্তির পরিচয় তিনি পেয়েছেন তার বরাত দিয়ে "পল ইশমিদ" উক্ত তিনটে উপাদানের বিশদ বিবরণ দেয়ার পর নিম্নরূপ প্রস্তাব তুলে ধরেন : "খৃস্টবাদী পাশ্চাত্যের সকল সরকার ও জাতির ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভিন্নতর আকারে ও যুগোপযোগী কায়দায় তবে অত্যন্ত কার্যকর পন্থায় ও চূড়ান্তভাবে পুনরায় ক্রুশযুদ্ধ শুরু করা উচিত।" (অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আল-বাহী কর্তৃক ফরাসী থেকে আরবিতে ভাষান্তরিত)।

তিন. ইসলামী রাষ্ট্র প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহের হুমকির মুখোমুখি হয়ে থাকে। এর ফলে বহুসংখ্যক মানুষ তাকে হারাতে হয়। এসব শহীদের বিধবাদের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালন করা রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব। আর এ দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করার একমাত্র উপায় হলো তাদেরকে বিয়ে দেয়া। যারা হারিয়ে যায়, তাদের ক্ষতিপূরণ একমাত্র জনসংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারাই সম্ভব। আর জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটা উপায় হলো একাধিক বিয়ে।

চার. কখনো কখনো কোনো কেনো জাতিতে মহিলার সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেশি হতে পারে। এটা সাধারণত যুদ্ধবিগ্রহের পর হয়ে থাকে। এমনকি অধিকাংশ জাতিতে শান্তির সময়েও মহিলার সংখ্যা বেশি হতে দেখা যায়। এর কারণ সম্ভবত এই যে, পুরুষের অত্যন্ত কঠিন পরিশ্রম করতে বাধ্য হওয়ার দরুন তাদের আয়ুর গড় মহিলাদের তুলনায় নিচে নেমে যায়।

আর নারীদের এই সংখ্যা বৃদ্ধি বহু বিবাহকে অনিবার্য করে তোলে এবং বর্ধিত নারীদেরকে প্রতিপালন ও তাদের সতিত্ব রক্ষার লক্ষ্যে এটা জরুরি হয়ে পড়ে। নচেত তারা বিপথগামী হতে ও ব্যভিচারে লিপ্ত হতে বাধ্য হবে। ফলে সমাজ বিকারগ্রস্ত ও চরিত্রভ্রষ্ট হয়ে পড়বে। অথবা, তারা বৈধব্যের দুঃখকষ্ট ও বঞ্চনার বেদনার ভেতর দিয়েই জীবন কাটিয়ে দিতে বাধ্য হবে। এতে তারা স্নায়ুবিক বৈকল্যের শিকার হবে এবং এমন একটি মানব সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যাবে, যা জাতির জন্য শক্তিতে পরিণত হতে পারতো এবং বাড়তি শক্তি যোগান দিতে পারতো।

যেসব দেশে নারীর সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেশি হয়ে গেছে, সেসব দেশের কোনো কোনোটি বহু বিবাহ চালু করতে বাধ্য হয়েছে। কেননা এটা তাদের ধারণা বিশ্বাসের পরিপন্থী এবং তাদের চিরাচরিত রীতি প্রথার বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও এর চেয়ে উত্তম কোনো সমাধান তারা খুঁজে পায়নি।

ডক্টর মুহাম্মদ ইউসুফ মূসা বলেছেন : "আমার মনে পড়ে, আমি ও আমার কতিপয় মিশরীয় ভাই ১৯৪৮ সালে প্যারিসে অবস্থানকালে জার্মানীর মিউনিখ শহরে অনুষ্ঠেয় বিশ্ব যুব সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ পাই। আমি ও আমার জনৈক মিশরীয় সহকর্মী যুদ্ধোত্তর জার্মানীতে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা কয়েক গুণ বৃদ্ধিজনিত সমস্যা নিয়ে আলোচনারত একটি ওয়ার্কশপে যোগদানের সুযোগ পেলাম। এ সমস্যার একটা উত্তম সমাধান উদ্ভাবন ঐ ওয়ার্কশপের লক্ষ্য ছিলো। সেখানে উত্থাপিত সকল সমাধানের পর্যালোচনা ও সবকটি প্রত্যাখ্যানের পর আমি ও আমার সহকর্মী এর একমাত্র প্রাকৃতিক সমাধানটি তুলে ধরলাম। সেটি একাধিক বিবাহের অনুমতি দান ও প্রজনন বৃদ্ধি। শুরুতে আমাদের উপস্থাপিত মতটি খানিকটা বিস্ময় ও অনীহার সাথে আলোচ্য সূচিতে স্থান পেল। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের পর আলোচকগণ দেখতে পেলেন এ ছাড়া এ সমস্যার আর কোনো সমাধানই নেই। এর ফল দাঁড়ালো এই যে, এটি বিশ্ব যুব সম্মেলন কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবসমূহের মধ্যে স্থান পেল। ১৯৪৯ সালে আমি যখন স্বদেশে ফিরে এলাম, তখন একথা জেনে খুবই আনন্দিত হলাম, একটি মিশরীয় পত্রিকা এই মর্মে সংবাদ ছেপেছে যে, তৎকালীন পশ্চিম জার্মানীর রাজধানী বনের অধিবাসীরা দাবি জানিয়েছে, সংবিধানে একাধিক বিবাহ অনুমোদন করা হোক।

পাঁচ. পুরুষের প্রজনন ক্ষমতা নারীর তুলনায় বেশি। যৌবন প্রাপ্তির সূচনাকাল থেকে শুরু করে জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত সে যৌন মিলনে সক্ষম। অথচ নারী প্রতি মাসে ঋতুস্রাবকালীন প্রায় দশদিন. প্রসবোত্তর ও প্রসাবসহ পায় চল্লিশ দিন এবং গর্ভধারণ ও স্তন দানের মেয়াদের কিছু কিছু পরিস্থিতিতে আদৌ সংগমের যোগ্য থাকেনা। আর নারীর সন্তান প্রসবের যোগ্যতা পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সকালে শেষ হয়ে যায়। অথচ পুরুষ ষাট বছরের পরও সন্তান প্রজননে সক্ষম। এসব পরিস্থিতি বিবেচনা ও এর শান্তিপূর্ণ সমাধান উদ্ভাবন অত্যন্ত জরুরি। স্ত্রী যখন এসব পরিস্থিতিতে দাম্পত্য দায়িত্ব পালনে অক্ষম থাকে। তখন স্বামী এ সময়ে কী করবে? একজন অতিরিক্ত স্ত্রী গ্রহণ কি তার জন্য উত্তম নয়, যে তাকে তার জননেন্দ্রিয়ের সততা ও চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষায় সাহায্য করবে, নাকি তার একজন উপপত্নী গ্রহণ করা উচিত, যার সাথে তার সম্পর্ক শুধু পশুসুলভ দৈহিক সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে? এই সাথে এ বিষয়টিও বিবেচনা করা প্রয়োজন যে, ইসলাম ব্যভিচারকে সবচেয়ে কঠোর ভাষায় নিষিদ্ধ করেছে যেমন আল্লাহ বলেন :

وَلَاتَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ط وَسَآءَ سَبِيْلًا○

"ব্যভিচারের কাছেও যেওনা। এটা একটা অশ্লীল কাজ ও জঘন্য পদ্ধতি।"

শুধু তাই নয়। যে ব্যক্তি এই জঘন্য কাজে লিপ্ত হয় তার জন্য ঘোষণা করেছে প্রতিহতকারী কঠিন শাস্তি। আল্লাহ্ বলেন :

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَّلَاتَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ج وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ○

অর্থ : ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী উভয়কে একশোটি করে চাবুক মারো। তোমরা যদি আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী হয়ে থাকো, আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে তোমাদেরকে যেন তাদের প্রতি সহানুভূতি পেয়ে না বসে। আর তাদের এই শাস্তি মুমিনদের একটি দলের প্রত্যক্ষ করা উচিত।" (সূরা নূর : আয়াত ২)

ছয়. স্ত্রী কখনো বন্ধ্যা ও সন্তান প্রজননের অযোগ্য হতে পারে, অথবা এমন রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকতে পারে, যা থেকে আরোগ্য লাভের আশা করা যায়না। এতদসত্ত্বেও সে দাম্পত্য জীবন বহাল রাখতে আগ্রহী হতে পারে। পক্ষান্তরে স্বামী একদিকে সন্তান প্রজননও কামনা করে, অপরদিকে সংসার পরিচালনায় দক্ষ স্ত্রীটি বহাল থাকুক, তাও চায় এমতাবস্থায় এটা কি স্বামীর জন্য সমীচীন যে, এই কষ্টকর অবস্থাকে মেনে নেবে এবং সন্তান প্রজননে সক্ষম স্ত্রী ব্যতিরেকেই বন্ধ্যা স্ত্রীর সাহচর্য ও সংসার পরিচালনায় সক্ষম কোনো মহিলাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ না করে রুগ্ন স্ত্রীর সাহচর্যে সন্তুষ্ট থাকবে? আর সংসারের এত সব ক্ষয়ক্ষতি একাই বহন করবে? নাকি এই সংসারে টিকে থাকতে ইচ্ছুক হওয়া সত্ত্বেও বন্ধ্যা ও রুগ্ন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তাকে অধিকতর দুঃখ যন্ত্রণায় নিক্ষেপ করা সমীচীন? বরঞ্চ, এই স্ত্রীর ইচ্ছা ও আগ্রহের সাথে স্বামীর ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার সমন্বয় সাধন করে আর এক মহিলাকে বিয়ে করা এবং বিদ্যমান স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বহাল রেখে স্বামীর ও নিজের কল্যাণ নিশ্চিত করাই উত্তম নয় কি? আমি মনে করি শেষোক্ত সমাধানই সবচেয়ে সঠিক, ন্যায়সঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য কোনো সচেতন বিবেকবান ও সহৃদয় মানুষের পক্ষে এ সমাধানকে গ্রহণ না করা ও এতে সন্তুষ্ট না হওয়া সম্ভব নয়।

সাত. বিশেষ ধরনের দৈহিক ও মানসিক স্বভাব প্রকৃতির কারণে কোনো কোনো পুরুষ মাত্রাতিরিক্ত কামাসক্ত হয়ে থাকে। তাই সে এক স্ত্রীতে তৃপ্তি নাও পেতে পারে। বিশেষত কোনো কোনো গরম প্রধান অঞ্চলে এ রকম দেখা যায়। সে ক্ষেত্রে তাকে চরিত্র ধ্বংসকারী উপপত্নী বা বান্ধবী গ্রহণের পরিবর্তে হালাল ও বৈধ পন্থায় যৌন চাহিদা পূরণের নিমিত্তে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়েছে।

আট. এ হচ্ছে ইসলামের স্বীকৃত কয়েকটি সাধারণ ও বিশেষ কারণ। ইসলাম কোনো বিশেষ যুগ বা কোনো বিশেষ প্রজন্মের জন্য আইন রচনা করেনা, বরং আইন রচনা করে সমগ্র মানব জাতির জন্য এবং কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য। তাই এ ক্ষেত্রে স্থান, কাল, ব্যক্তিগত সুবিধা বা অসুবিধা এসবই বিবেচনা করা জরুরি। আর মুসলিম জাতির

জনসংখ্যা বাড়িয়ে যুদ্ধ ও শান্তি উভয় সময়ের জন্য তার পর্যাপ্ত জনশক্তি প্রস্তুত রাখার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ নিশ্চিত করা ইসলামী আইন প্রণেতার সর্বাধিক গুরুত্বপর্ণ লক্ষ্যসমূহের অন্যতম।

নয়. মুসলিম বিশ্বে এই আইন অনুসৃত হওয়ার কল্যাণেই তা বহুবিধ সামাজিক ও নৈতিক দোষক্রটি থেকে পবিত্র ও মুক্ত রয়েছে। অথচ অন্যান্য সমাজে একাধিক বিবাহ অস্বীকার করার কারণে ঐসব সমাজে সামাজিক ও নৈতিক অনাচারের সয়লাব বয়ে যাচ্ছে। একাধিক বিবাহ অবৈধ ঘোষণাকারী সমাজে যেসব নৈতিক অনাচারের প্রচলন দেখা যায় তা নিম্নরূপ :

১. ব্যভিচার এত ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে, ব্যভিচারিণী মহিলাদের সংখ্যা বিবাহিতাদের চেয়ে অধিক হয়ে গেছে।

২. এ কারণে জারজ সন্তানের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি কোথাও কোথাও জারজের অনুপাত মোট জনসংখ্যার শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশি।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর দুই লাখেরও বেশি জারজ সন্তান জন্মে। ১৯৫৯ সালের আগস্ট মাসে "আশ-শায়াব" (জনতা) পত্রিকায় নিম্নোক্ত প্রতিবেদন ছাপা হয় :

"মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী জারজ সন্তানদের অস্বাভাবিক সংখ্যা বৃদ্ধিতে আমেরিকার নৈতিক অধপতনের ভয়াবহতা নিয়ে নতুন করে আলোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। আর জারজদের এই বিশাল বাহিনীর খরচ যোগাতে গিয়ে মার্কিন করদাতাদের যে বিরাট করের বোঝা বহন করতে হচ্ছে তা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করা হচ্ছে। এই ক্ষোভ প্রকাশে অবাক হবার কিছু নেই। কারণ সেখানে প্রতি বছর দুই লাখ জারজ সন্তান জন্ম নিচ্ছে। এই সমস্যার মোকাবিলা করার লক্ষ্যে কোনো কোনো দেশে সরকারি মহল ভাবতে শুরু করেছে ধর্মীয় নীতিমালা থেকে একেবারে দূরে সরে যাওয়া নারীদের বন্ধ্যাকরণ করা যায় কিনা। আবার কোথাও কোথাও একাধিক জারজ সন্তানের জননীদের সরকারি সাহায্য কমিয়ে দেয়ার প্রস্তাব নিয়ে বাকবিতণ্ডা চলছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়গুলো জানিয়েছে : মার্কিন করদাতারা এ বছর জারজ সন্তানদের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২১০ মিলিয়ন ডলার কর দেবে, যার অর্থ দাঁড়ায় প্রতি শিশু বাবদ মাসে ২৭ ডলার ২৯ সেন্ট। সরকারি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, জারজ সন্তানদের সংখ্যা ১৯৩৮ সালে ছিলো ৮৭,৯০০, আর ১৯৫৭ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ২,০১,৭০০। আর সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী ১৯৫৮ সালে এই শিশুদের সংখ্যা দাঁড়ায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের ধারণা, প্রকৃত সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশি। সর্বশেষ পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, এসব অবৈধ সন্তানের হার সাম্প্রতিকতম দুই প্রজন্মে প্রতি হাজারে তিন গুণ বেড়েছে। এটা এমন বৃদ্ধি, যা কিশোরী মেয়েদের জন্য আতঙ্ক সৃষ্টি করে। সমাজ বিজ্ঞানীরা আরেকটি তথ্য জানিয়েছে, অভিজাত পরিবারগুলো সাধারণতঃ তাদের কোনো মেয়ে অবৈধভাবে গর্ভধারণ করে থাকলে তা ধামাচাপা দিয়ে থাকে এবং নবজাতককে চুপিসারে দত্তক গ্রহণকারী কোনো পরিবারের নিকট পাঠিয়ে দেয়।"

৩. এসব ঘৃণ্য দৈহিক মিলনের ফলে নানাবিধ রোগব্যাধি, মানসিক জটিলতা ও স্নায়ুবিক অস্থিরতার সৃষ্টি হচ্ছে।

৪. শরীর ও মন দুর্বলতা ও অবসাদের শিকার হচ্ছে।

৫. স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের বন্ধন শিথিল হচ্ছে, দাম্পত্য জীবন দ্বন্দ্ব কলহে জর্জরিত হচ্ছে এবং পারিবারিক যোগসূত্র ছিন্ন হচ্ছে। ফলে এর আর কোনো মর্যাদা থাকছেনা।

৬. প্রকৃত বংশ পরিচয় এমনভাবে বিকৃত হয়ে যাচ্ছে যে, কোনো স্বামী নিশ্চিত করে বলতে সক্ষম নয় যে, সে যে ছেলেমেয়েকে লালন পালন করছে, তারা তারই ঔরসজাত।

এসব বিকৃতি ও বিপর্যয় স্বভাবধর্মের পরিপন্থী আচরণ ও আল্লাহর নির্দেশাবলী লঙ্ঘনের স্বাভাবিক কুফল ছাড়া কিছু নয়। এটা সবচেয়ে অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, ইসলামী জীবনাচার সবচেয়ে নিরাপদ জীবনাচার, আর এর আইন ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী মানুষের জন্য সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ আইন। আকাশে বিচরণকারী ফেরেশতাদের জন্য নয়।

সর্বশেষে আলফন্স এটিন দিনেহার প্রশ্ন ও উত্তর উদ্ধৃত করে আমাদের এ আলোচনার ইতি টানছি। তিনি প্রশ্ন তুলে ধরেন :

"একাধিক বিয়ে রহিত করার কি কোনো নৈতিক সুফল পাওয়া যাবে?" অতপর নিজেই এর জবাব দেন : "এটা নিশ্চিত করে বলা যাবেনা। যে ব্যভিচার ও বেশ্যাবৃত্তির অস্তিত্ব বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম দেশে বিরল, তা একদিন ঐসব দেশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে এবং তার ধ্বংসাত্মক কুফল প্রকাশ পাবে। তাছাড়া মুসলিম দেশগুলোতে নারীদের কুমারিত্ব নামক ব্যাধির ব্যাপক প্রাদুর্ভাব ঘটবে, যা একাধিক বিয়ের প্রচলন সেই এমন দেশগুলোতে তার ক্ষতিকর কুফল সহকারে আত্মপ্রকাশ করবে। ইতিমধ্যে এটা ঐসব দেশে আশংকাজনক হারে দেখা দিয়েছে, বিশেষত যুদ্ধোত্তর যুগে।

একাধিক বিয়ে সীমিত বা নিষিদ্ধ করা : ইসলামী আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন না হওয়া এবং ইসলামী শিক্ষার অনুসরণ না করাকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করিয়ে একাধিক বিয়ে নিষিদ্ধকরণের প্রবক্তারা এটিকে সীমিত করতে চেয়েছে এবং স্বামীকে বিচারক বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তার অবস্থা, তার আর্থিক সামর্থ্য পর্যালোচনাপূর্বক পুনরায় বিয়ে করার অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত আর একজন স্ত্রী গ্রহণ নিষিদ্ধ করতে চেয়েছে। কারণ পারিবারিক জীবন অত্যন্ত ব্যয়বহুল। তাই একাধিক বিয়ের দরুন পরিবারের লোকসংখ্যা বাড়লে স্বামীর দায়দায়িত্ব বাড়বে, সে তাদের ব্যয়ভার বহনে অক্ষম হবে। তাদেরকে সৎ মানুষরূপে গড়ে তোলার জন্য যে ধরনের শিক্ষাদীক্ষা দেয়া প্রয়োজন, জীবন যাপনের ব্যয় নির্বাহে প্রয়োজনীয় জীবিকা উপার্জনের যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য যে ধরনের শিক্ষাদীক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন, তা দিতে পারবেনা। ফলে মূর্খতা ও অশিক্ষা ব্যাপক আকার ধারণ করবে, বেকারত্ব বাড়বে, মুসলিম উম্মাহর বহু সদস্য বাস্তুভিটে ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হবে এবং তরুণ প্রজন্মের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা ও দুর্নীতির বিস্তৃতি ঘটবে।

তাছাড়া আজকাল কোনো পুরুষ অর্থের লোভ অথবা যৌন লালসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্য ব্যতিত আর কোনো উদ্দেশ্যে একাধিক বিয়ে করেনা। তাই সে একাধিক বিয়ের কোনো যুক্তি আছে কিনা বা তাতে কোনো কল্যাণ আছে কিনা, তা খুঁজে দেখে না। বরং প্রায়শঃ পূর্ববর্তী স্ত্রীর হক ও স্বার্থ নষ্ট করে, তার পক্ষের সন্তানদের ক্ষতিসাধন করে ও তাদেরকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করে। এর ফলে সতিনদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে পারস্পরিক

শত্রুতা ও প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে ওঠে, সেই প্রতিহিংসার আগুন পরিবারগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, ফলে শত্রুতা তীব্র আকার ধারণ করে, প্রত্যেক স্ত্রী অপর স্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণে তৎপর হয় এবং এসব ছোটখাটো বিরোধ বৃহত্তর আকার ধারণপূর্বক কখনো কখনো হত্যাকাণ্ড পর্যন্তও ঘটিয়ে ছাড়ে। এভাবেই বহু বিবাহের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরে তা থেকে বিয়ের সংখ্যা সীমিত করার পক্ষে যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়।

এর জবাবে আমরা বলতে চাই : আল্লাহ যা বৈধ করেছেন, তাকে অবৈধ করা এ সমস্যার সমাধান নয়। সমাধান খুঁজতে হবে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে এবং জনগণকে ইসলামের বিধান শেখানোর মাধ্যমে। মানুষের জন্য পানাহারও আল্লাহ বৈধ করেছেন কিন্তু এই শর্তে যে, সে যেন সীমালঙ্ঘন না করে। পানাহারে অপব্যয় ও অপচয় করে রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে সেজন্য পানাহার দায়ী হবেনা। দায়ী হবে পানাহারে অপচয় ও বাড়াবাড়ি। এ ধরনের সমস্যার সমাধান পানাহার নিষিদ্ধ করে করা যাবেনা। সমাধান করা যাবে শুধু নিয়ম ও নৈতিকতা শিক্ষা দিয়ে। ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য যার অনুসরণ করা হবে। বিচারকের অনুমতি ব্যতিরেকে একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধকরণের প্রবক্তারা যদিও একাধিক বিয়ের ফলে সংঘটিত ক্ষতির বাস্তবতাকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করে থাকে, কিন্তু তারা এটা নিষিদ্ধ করার ফলে যে বৃহত্তর ক্ষতি সংঘটিত হওয়া অনিবার্য, তা হয় জানেননা, অথবা জেনেও না জানার ভান করে। প্রকৃতপক্ষে বহু বিবাহ অনুমোদনের ক্ষতির চেয়ে তা নিষিদ্ধকরণের ক্ষতি ঢের বেশি। তাই লঘুতর ক্ষতিকে মেনে নিয়ে গুরুতর ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষা করা জরুরি। কেননা মূলনীতি হলো দুই ক্ষতির মধ্যে যেটি লঘুতর, সেটিকেই মেনে নিতে হয়। আর যেখানে ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়, সেখানে বিষয়টি বিচাররকের নিয়ন্ত্রণে সোপর্দ করা বাঞ্ছনীয়। কেননা মানুষের অবস্থা জানার কোনো নিখুঁত মাপকাঠি নেই। আবার কখনো কখনো একাধিক বিয়ে বন্ধ করার ক্ষতি তার উপকারিতার চেয়ে নিকটতম হয়ে থাকে। মুসলমানরা প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে বর্তমানকাল পর্যন্ত একাধিক বিয়ে করতে অভ্যস্ত ছিলো। তাদের কেউ এভাবে একাধিক বিয়েকে নিষিদ্ধ বা সীমিত করার চেষ্টা করেছে বলে শোনা যায়নি যেভাবে এখন করতে বলা হচ্ছে। সুতরাং যে রীতিকে তারা মেনে নিয়েছেন ও বহাল রেখেছেন তা আমাদেরও মেনে নেয়া ও বহাল রাখা উচিত। আল্লাহ সুপ্রশস্ত রহমতকে সংকীর্ণ করা আমাদের পক্ষে শোভনীয় নয়। আর যে আইনের উত্তম বৈশিষ্ট্যগুলোর পক্ষে আমাদের বন্ধুরা তো বটেই, শত্রুরাও সাক্ষ্য দিয়েছে, তাতে খুঁত ধরতে চেষ্টা করা আমাদের উচিত নয়।

একাধিক বিবাহের পটভূমি : বস্তুত একাধিক বিবাহ প্রথা ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে বহু সংখ্যক জাতিতে প্রচলিত ছিলো। তন্মধ্যে ইহুদী জাতি, জাহেলি যুগের আরব জাতি সিসিলীয় জাতিসমূহ, সাভ জাতিসমূহ উল্লেখযোগ্য। নিম্নোক্ত দেশগুলোর অধিবাসীদের অধিকাংশ এসব জাতিরই অন্তর্ভুক্ত :

রাশিয়া, লিথুয়ানিয়া, এস্তোনিয়া, পোল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া (বর্তমানে দ্বিখণ্ডিত), যুগোস্লাভিয়া (বর্তমানে বহু খণ্ডে বিভক্ত)। অনুরূপ জার্মানী, অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ড, বেলজিয়াম, হল্যান্ড, ডেনমার্ক, সুইডেন, নরওয়ে ও ইংল্যান্ডেও বহু বিবাহের প্রচলন ছিলো। সুতরাং ইসলামই বহু বিবাহের প্রবর্তন করেছে বলে যে দাবি করা হয়, তা সঠিক

নয়। এমনকি আজও চীন, জাপান, আফ্রিকা ও ভারত প্রভৃতি অমুসলিম অধ্যুষিত ভূখণ্ডে একাধিক বিয়ের প্রথা প্রচলিত রয়েছে। তাই শুধু মুসলিম জাতি ও দেশসমূহেই এ প্রথা চালু রয়েছে একথাও সত্য নয়। অনুরূপ, একথাও সত্য যে, খৃস্টধর্মের মূল বিধানেও বহু বিবাহ নিষিদ্ধ ছিলনা। কেননা বাইবেলে একটি বাক্যও এমন পাওয়া যায়না যাতে সুস্পষ্টভাবে বহু বিবাহকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে সর্বাগ্রে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত ইউরোপবাসীর এক স্ত্রীর নীতির অনুসারী হওয়ার পেছনে যে কারণ নিহিত রয়েছে তা হলো, পৌত্তলিকতাবাদী ইউরোপীয় জাতিসমূহের মধ্যে যারা সূচনালগ্নেই খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল, যথা গ্রীস ও ইটালীয় জাতিদ্বয়, তাদের ঐতিহ্য তাদের জন্য একাধিক বিবাহিত স্ত্রী রাখা নিষিদ্ধ করেছিল। খৃস্টধর্ম গ্রহণের পরও গ্রীস ও ইটালীয় জাতি হয় তাদের উক্ত পৈতৃক কৃষ্টিকে আঁকড়ে ধরে রাখে। তাই একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, এক বিবাহ প্রথা তাদের কাছে নবাগত খৃস্টধর্মের আমদানিকৃত কোনো অপরিচিত ও আনকোরা প্রথা ছিলনা, বরং এটা ছিলো একটা প্রাচীন রীতি, যা তাদের আদিম পৌত্তলিক ধর্মের যুগে চালু হয়েছিল। পরবর্তীকালে গীর্জা প্রবর্তিত বিধিসমূহে বহু বিবাহকে স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ করা হয় এবং এই নিষেধাজ্ঞাকে ধর্মীয় শিক্ষার আওতাভুক্ত ধরে নেয়া হয়। অথচ বাইবেলের কোথাও এই নিষেধাজ্ঞার ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়না। একথাও অকাট্য সত্য, বহু বিবাহ প্রথা সভ্যতার পথে অগ্রগামী জাতিগুলোর মধ্যেই দর্শনীয়ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। পক্ষান্তরে প্রাচীন অনগ্রসর জাতিগুলোতে এ প্রথার প্রচলন খুবই বিরল অথবা একেবারেই নেই। বিশ্বের বিভিন্ন সভ্যতার ইতিহাস নিয়ে যারা গবেষণা করে এবং যারা সমাজ বিজ্ঞানে পারদর্শী, তারা এই মতই পোষণ করেন।

লক্ষ্য করা গেছে, এক বিবাহের প্রথা অধিকাংশ অনুন্নত ও প্রাচীনপন্থী জাতিগুলোতে সমধিক প্রচলিত। এগুলো হচ্ছে প্রধানত শিকার নির্ভর, ফলমূল উৎপাদক ও কৃষিনির্ভর জাতি। পক্ষান্তরে বহু বিবাহ প্রথা কেবল উন্নতি ও অগ্রগতির পথে অনেকখানি অগ্রসর প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যেই প্রচলিত। সমাজ বিজ্ঞানী ও সভ্যতার ইতিহাস প্রণেতাগণ মনে করেন অনাগতকালে বহু বিবাহ প্রথার ব্যাপকতর প্রসার অবধারিত এবং নগর জীবন ও সুসভ্য জীবনের ব্যাপ্তি ঘটার সাথে সাথে এই প্রথার অনুসারী জাতিগুলোর সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাবে। তাই এরূপ দাবি সঠিক নয় যে, বহু বিবাহ প্রথা সাংস্কৃতিকভাবে পিছিয়ে পড়ার সাথে সংশ্লিষ্ট। বরং এর বিপরীত কথাই বাস্তবতার সাথে পুরোপুরিভাবে সামঞ্জস্যশীল। ঐতিহাসিক দিক দিয়েও এটা বহু বিবাহ প্রথার যথার্থ ও প্রকৃতস্বরূপ। এ সম্পর্কে খৃস্টবাদের দৃষ্টিভঙ্গীও এটাই। এ প্রথার প্রসার যতোটুকু ঘটেছে এবং সভ্যতার অগ্রগতির সাথে এর যেটুকু সংশ্রব রয়েছে, এটাই তার বাস্তব রূপ। এই প্রথাকে টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে আমরা একথা বলিনি। শুধু সত্য ও ইতিহাসের বিকৃতি উদঘাটনের জন্যই এ কথাগুলো বলেছি।

১৯. বিয়ের অভিভাবকত্ব

অভিভাবকত্বের তাৎপর্য

অভিভাবকত্ব শরিয়ত প্রদত্ত একটা অধিকার। এই অধিকারবলে এর অধিকারী অন্যের উপর তার আদেশ জোরপূর্বক প্রয়োগ করতে পারে। অধিকার দু'রকম : সাধারণ অভিভাবকত্ব ও বিশেষ অভিভাবকত্ব। বিশেষ অভিভাবকত্ব আবার দু'রকম : সত্তার উপর

অভিভাবকত্ব, সম্পদের উপর অভিভাবকত্ব। এখানে সত্তার উপর অভিভাবকত্বই আলোচ্য বিষয়। অর্থাৎ বিবাহ যোগ্য মানুষের অভিভাবক হওয়া।

অভিভাবক হবার শর্তাবলী

অভিভাবক হবার শর্ত তিনটে : স্বাধীন হওয়া, সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়া, বয়োপ্রাপ্ত হওয়া। যার অভিভাবক হওয়া নিয়ে কথা, সে মুসলমান কি অমুসলমান, তাতে কিছু আসে যায়না। সুতরাং কোনো পরাধীন, পাগল এবং শিশু বা বালক কারো অভিভাবক হতে পারবেনা। কেননা এসব লোকের নিজের অভিভাবক হবারও যোগ্যতা নিজের নেই। তাই তাদের অন্যের অভিভাবক হওয়ার প্রশ্নই ওঠেনা। অভিভাবকত্বের জন্য চতুর্থ আরেকটি শর্ত রয়েছে। সেটি হলো মুসলমান হওয়া। এ শর্ত তখনই প্রযোজ্য, যখন অধীনস্থ ব্যক্তি মুসলমান হবে। কেননা একজন অমুসলমানের কোনো মুসলমানের অভিভাবক হবার অধিকার নেই। আল্লাহ্ বলেছেন : "আল্লাহ্ কখনো মুমিনদের উপর কাফেরদেরকে কোনো কর্তৃত্ব দেবেননা।" (আন-নিসা : আয়াত ১৪১)

সততার শর্তমুক্ত

অভিভাবক হওয়ার জন্যে সততার শর্ত আরোপ করা হয়নি। কেননা অসৎ ও পাপাচারী হওয়ার কারণে অধীনস্থকে বিয়ে দেয়ার যোগ্যতা বিনষ্ট হয়না। তবে অভিভাবকের অসততা যদি এত গুরুতর হয় যে, লাম্পট্যের পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে অভিভাবককে তার অধীনস্থ সম্পর্কেও নিরাপদ মনে করা যায়না। তাই তার অভিভাবকত্বের অধিকার কেড়ে নেয়া হবে।

বিয়ের ক্ষেত্রে নারীর স্ব-অভিভাবকত্ব

বহু সংখ্যক আলেম মত ব্যক্ত করেছেন যে, নারী নিজে নিজেকেও বিয়ে দিতে পারেনা, অন্যকেও নয়। তার কর্তৃত্বে বিয়ের চুক্তি সম্পাদিত হয়না। কেননা অভিভাবক থাকা বিয়ের বিশুদ্ধতার জন্য শর্ত। অন্য কথায় বলা যায়, অভিভাবকই বিয়ের চুক্তি সম্পাদনকারী। এর সপক্ষে নিম্নোক্ত প্রমাণগুলো উপস্থাপন করা হয় :

১. সূরা নূরের ৩২ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ .

"তোমরা তোমাদের মধ্যকার বিবাহহীনদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ ও যোগ্য তাদেরও।" (সূরা নূর : আয়াত ৩২)

২. সূরা বাকারার ২২২ নং আয়াতে বলা হয়েছে : 'মুশরিক পুরুষদের সাথে তোমরা তোমাদের মেয়েদেরকে বিয়ে দিওনা, যতোক্ষণ না তারা ঈমান আনে।" এ দু'টি আয়াত থেকে প্রমাণ দর্শানো হয়েছে এভাবে যে, আল্লাহ তায়ালা বিয়ে দেয়ার আদেশটি পুরুষদেরকে সম্বোধন করে দিয়েছেন, মহিলাদেরকে নয়। অন্য কথায় শেষোক্ত আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এ রকম : হে পুরুষ অভিভাবকগণ, তোমরা তোমাদের অধীনস্থ নারীদেরকে মুশরিক পুরুষদের সাথে বিয়ে দিওনা।"

৩. আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : অভিভাবক ব্যতিত বিয়ে হবেনা। -আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি. ইবনে হিব্বান, হাকেম।

হাদিসটিতে “বিয়ে হবেনা” একথার অর্থ হলো, বিয়ে শুদ্ধ হবেনা। কাজেই অভিভাবক বা ওলি ব্যতিত সম্পাদিত বিয়ে বাতিল গণ্য হবে।

৪. বুখারি হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন : মা'কাল বিন ইয়াসার বলেছেন : সূরা বাকারার ২৩২ নং আয়াত তার সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। তিনি বলেন : আমি আমার এক বোনকে এক ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিয়েছিলাম। পরে সে তাকে তালাক দিল (অর্থাৎ দুই তালাক)। তারপর ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর পুনরায় তাকে বিয়ে করার জন্য এসে প্রস্তাব দিল। আমি তাকে বললাম : আমি তোমাকে বিয়ে করালাম, তোমার বাসস্থান প্রস্তুত করে দিলাম এবং তোমাকে সম্মানের সাথে প্রতিষ্ঠিত করলাম, তারপরও তুমি আমার বোনকে তালাক দিলে। এখন আবার তাকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব নিয়ে এসেছ। না, আল্লাহর কসম, তুমি আর কখনো তাকে ফিরে পাবেনা। আসলে লোকটি মন্দ ছিলনা। বোনটিও তার কাছে ফিরে যেতে ইচ্ছুক ছিলো। তখন আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করলেন। ইদ্দত পূর্ণ হবার পর তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদেরকে তাদের স্বামীর সাথে পুনর্বিবাহে বাধা দিওনা। আমি বললাম : হে রসূলুল্লাহ, (যেহেতু আল্লাহ এ ধরণের বিয়েতে বাধা দিতে নিষেধ করেছেন, তাই) এখন আমি বিয়ে দেব। তারপর তাকে তার সাথে পুনরায় বিয়ে দিলাম।

হাফেয ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে বলেছেন : উল্লিখিত আয়াতে নাযিল হওয়ার উক্ত কারণই এর সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ। এখানেই অভিভাবকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার সবচেয়ে অকাট্য ও সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। নচেত ভাইয়ের বাধা দেয়ার কোনো অর্থ থাকতোনা। আর বোনটির যদি নিজের বিয়ে করার বৈধতা থাকতো তাহলে সে তার ভাই এর মুখাপেক্ষী হতোনা। যে ব্যক্তি নিজের কাজে স্বনির্ভর, তার সম্পর্কে একথা খাটেনা যে, অমুক তাকে তার কাজে বাধা দিয়েছে।

৫. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে মহিলা নিজের অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া কাউকে বিয়ে করবে, তার বিয়ে বাতিল, তার বিয়ে বাতিল, তার বিয়ে বাতিল। এভাবে বিয়ে সম্পাদিত হওয়ার পর স্বামী যদি তার সাথে সহবাস করে, তবে তার সাথে যৌন সম্ভোগ করার কারণে সে মোহরানার অধিকারী হবে। আর যদি তার কোনো নির্দিষ্ট অভিভাবক না থাকে এবং সবাই তাকে বিয়ে দেয়া থেকে বিরত থাকে, তাহলে অভিভাবকহীনের জন্য শাসকই অভিভাবক।” আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী। কুরতুবি বলেছেন, এ হাদিসটি বিশুদ্ধ। এ হাদিস উম্মুল মুমিনীন আয়েশা, উম্মে সালামা, ও যয়নব থেকেও বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে বলে হাকেম উল্লেখ করেছেন।

ইবনুল মুনযির বলেছেন : এ হাদিসের বিপক্ষে কিছু পাওয়া যায়নি।

৬. ফকীহগণ যুক্তি প্রদর্শন করে বলেছেন : বিয়ের একাধিক উদ্দেশ্য রয়েছে। মহিলারা প্রায়ই ভাবাবেগ দ্বারা চালিত হয়। ফলে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন করতে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনা। তাই তারা বিয়ের উদ্দেশ্যগুলো অর্জন করতে পারেনা। এজন্যই তাদেরকে আক্দ সম্পাদন করা থেকে বিরত রাখা হয়েছে এবং এ কাজটি তার অভিভাবকের নিকট সমর্পণ করা হয়েছে, যাতে বিয়ের যাবতীয় উদ্দেশ্য পূর্ণাঙ্গভাবে অর্জিত হয়।

তিরমিযি বলেছেন : উমর ইবনুল খাত্তাব, আলী ইবনে আবি তালেব, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবু হুরায়রা, ইবনে উমর, ইবনে মাসউদ ও আয়েশা রা. প্রমুখ বিজ্ঞ সাহাবির মতে, অভিভাবক ব্যতিত বিয়ে হবেনা- রসূল সা.-এর এই হাদিস অনুসারেই আমল হবে।

তাবেয়িদের মধ্য হতে, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, হাসান বসরি, শুরাইহ, ইবরাহিম নাখয়ি ও উমর ইবনে আব্দুল আযিয প্রমুখেরও মত এটাই। এ মত সুফিয়ান সাওরি, আওযায়ি, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, শাফেয়ি, ইবনে শাবরামা, আহমদ, ইসহাক, ইবনে হাযম, ইবনে আবি লায়লা, তাবারি ও আবু সাওরও সমর্থন করেন।

তাবারি বলেছেন : হাফসা যখন স্বামীহীনা হলেন, তার পিতা উমর রা. তার বিয়ে সম্পাদন করলেন, হাফসা নিজে করলেননা। এ থেকেই জানা যায়, নিজের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলার অভিভাবক ছাড়াই নিজের বিয়ে সম্পাদনের অধিকার রয়েছে একথা ভুল। যদি এ অধিকার কোনো মহিলার থাকতো, তবে রসূলুল্লাহ সা. হাফসার বিয়ের প্রস্তাব তার কাছে দেয়া থেকে বিরত থাকতেননা। কেননা হাফসা রা. তার নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে তার পিতার চেয়ে অধিকতর যোগ্য ও অগ্রগণ্যা ছিলেন।

আবু হানিফা ও আবু ইউসুফের মতে, প্রাপ্ত বয়স্কা ও সুস্থ মস্তিষ্কের মহিলা কুমারী হোক বা অ-কুমারী হোক, নিজের বিয়ে নিজেই সম্পাদন করতে পারে। তবে অভিভাবকের উপর এ কাজ সমর্পণ করা মুস্তাহাব, যাতে এক দল অপরিচিত পুরুষের মাঝে বিয়ের চুক্তি সম্পাদন করতে গিয়ে তাকে বিব্রত ও লজ্জিত না হতে হয়।

মহিলার অভিভাবক যদি তার উত্তরাধিকারী হয় তবে তার বিয়ে সম্পাদনে আপত্তি উত্থাপনের অধিকার অভিভাবকের কেবল তখনই থাকবে, যখন সে কোনো 'কুফু'হীন (অসম) পুরুষের সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইবে এবং তার মোহরানা 'মোহরে মিছল' এর চেয়ে কম হবে। আর যদি সে 'কুফু'হীন পুরুষের সাথে নিজের বিয়ে সম্পাদন করে এবং তাতে তার ওলি বা অভিভাবকের অনুমতি না থাকে, তাহলে আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ থেকে যে মত বর্ণিত হয়েছে তা হলো, তার বিয়ে শুদ্ধ হবেনা। এই মত অনুসারেই হানাফী মাযহাবে ফতোয়া দেয়া হয়ে থাকে। কেননা সকল ওলি ভালোভাবে আদালতে অভিযোগ তোলেনা, আর সকল বিচারক ন্যায় বিচারও করেনা। তাই তারা বিয়ে শুদ্ধ হবেনা বলে ফতোয়া দিয়েছেন, যাতে আদালতে অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের অবকাশ সৃষ্টি না হয়।

কোনো কোনো বর্ণনা হতে, ওলির আপত্তি তোলার অধিকার রয়েছে। সে শাসকের কাছ থেকে বিয়ের বিচ্ছেদ চাইতে পারে, যাতে কলঙ্কের বোঝা বইতে না হয়। স্বামীর দ্বারা সে গর্ভবতী না হওয়া পর্যন্ত বা প্রকাশ্য গর্ভ না দেখা যাওয়া পর্যন্ত এই অধিকার থাকে। কেননা গর্ভবতী হওয়া বা গর্ভ প্রকাশ্য হওয়ার পর তার বিচ্ছেদ-দাবি করার অধিকার রহিত হয়ে যায়। কারণ গর্ভের সন্তান নষ্ট হতে দেয়া যায়না। সন্তান গর্ভে এসে যাওয়ার পর তার সংরক্ষণ সংশ্লিষ্ট সকলের কর্তব্য। আর যদি স্বামী 'কুফু' হয় এবং মোহর মোহরে 'মিছল'-এর চেয়ে কম হয়, তবে সে ক্ষেত্রে স্বামী আকদ গ্রহণ করলে তা আবশ্যিকভাবে সম্পাদিত হবে, আর প্রত্যাখ্যান করলে তা বাতিল করার জন্য বিচারকের নিকট তোলা হবে। আর যদি মহিলার এমন কোনো ওলি না থাকে যে উত্তরাধিকারী হবে, চাই আদৌ কোনো ওলিই রইলনা, অথবা ওলি আছে কিন্তু সে উত্তরাধিকারী হবেনা, তাহলে মহিলার সম্পাদিত আকদের উপর আপত্তি তোলার অধিকার কারো থাকবেনা, চাই সে 'কুফু'সহ বিয়ে করুক কিংবা 'কুফু'বিহীন বিয়ে করুক, কিংবা মোহরে 'মিসল'-এর চেয়ে কম মোহরে বিয়ে করুক। কেননা এ ক্ষেত্রে বিয়ের যাবতীয় দায়দায়িত্ব এককভাবে শুধু ঐ মহিলার উপরই বর্তাবে। কারণ সে নিজের নিরঙ্কুশ অধিকারেই হস্তক্ষেপ করেছে। 'কুফু'

ছাড়া বিয়ে করাতে কলঙ্ক বোধ করতে পারে এমন কোনো ওলি তার নেই। আর মোহরে মিছলের দাবি স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেয়ায় তা রহিত হয়ে গেছে।

অধিকাংশ হানাফী ফকীহ তাদের এই মতের সপক্ষে নিম্নোক্ত প্রমাণাদি পেশ করেন :

১. মহান আল্লাহ বলেছেন :

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَاتَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ○

"এরপর যদি সে স্ত্রীকে তালাক দেয়, (অর্থাৎ তৃতীয় তালাক) তাহলে সে স্ত্রী তারপর আর তার জন্য হালাল হবেনা যতোক্ষণ না সে অন্য স্বামীকে বিয়ে করে।" (বাকারা : ২৩২)।

২. আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ ○

অর্থ : যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে (দুই বারে) তালাক দাও, আর তারা যখন ইদ্দত পূর্ণ করে, তখন তাদেরকে তাদের স্বামীদের সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধা দিওনা।" (সূরা বাকারা : আয়াত ১৩২)

এ দুটো আয়াতে বিয়ের ক্ষমতা স্ত্রীকে দেয়া হয়েছে। আর ক্ষমতা তাকেই দেয়া যায়, যার হাতে প্রকৃত কর্তৃত্ব থাকে।

৩. তাছাড়া ক্রয় বিক্রয় প্রভৃতি সংক্রান্ত চুক্তিতে যখন মহিলারা স্বাধীন, তখন বিয়ের চুক্তিতেও স্বাধীন। কেননা এক চুক্তির সাথে অন্য চুক্তির কোনো পার্থক্য নেই। বিয়ের চুক্তিতে যদিও তার ওলির কিছু অধিকার থাকে, কিন্তু ওলি এ চুক্তিকে বাতিল করতে পারেনা। কারণ বাতিল করতে পারে কেবল তখনই, যখন মহিলা তার অধিকারের অপব্যবহার করে এবং কুফুহীন বিয়ে করে। আর অধিকারের অপব্যবহার ওলির মুখেই কলঙ্ক লেপন করে।

হানাফি ইমামদের যুক্তি হলো, বিয়েতে ওলি বা অভিভাবকের শর্ত কেবল এমন মেয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যার যোগ্যতা ও পরিপক্কতার অভাব রয়েছে যেমন অপ্রাপ্ত বয়স্কা বা পাগলিনী। অবশ্য উসুলে ফিকহ্ শাস্ত্রবিদদের কেউ কেউ 'কিয়াস' প্রয়োগের মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে উক্ত শর্ত প্রয়োগ বৈধ মনে করেন।

বিয়ের আগে কনের অনুমতি নেয়া জরুরি

কনের অভিভাবকত্ব নিয়ে যতো রকম মতামতই থাক, তার মতামত নিয়ে বিয়ের আয়োজন শুরু করা এবং আকদের আগে তার সম্মতি নেয়া ওলির জন্য বাধ্যতামূলক। কারণ বিয়ে হচ্ছে পুরুষ ও স্ত্রীর মাঝে একটা স্থায়ী সহাবস্থান ও যৌথ জীবন যাপনের নাম। কনের সম্মতি জ্ঞাত না হওয়া পর্যন্ত দু'জনের মধ্যে টেকসই ভালোবাসা, সমন্বয় ও সৌহার্দ্য সৃষ্টি হতে পারেনা। এজন্য শরিয়ত কনেকে বিয়েতে বাধ্য করতে নিষেধ করেছে, চাই সে কুমারী হোক বা অকুমারী। যে বিয়েতে কনের মত নেই, সে বিয়ে জোরপূর্বক সম্পাদন করা জায়েয নয়। তার অনুমতি ব্যতিত তার উপর আক্দ চাপিয়ে দেয়া অবৈধ। কোনো ওলি বলপূর্বক এ ধরনের আক্দ চাপিয়ে দিলে তা বাতিল করার দাবি জানানোর অধিকার কনের রয়েছে। এর প্রমাণ নিম্নরূপ :

১. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "অকুমারী মেয়ে নিজের

বিয়ের ব্যাপারে তার ওলির চেয়ে অধিক ক্ষমতার অধিকারী। আর কুমারীর বিয়ের জন্য তার অনুমতি নিতে হবে। কুমারী মেয়ের নিরবতাই তার অনুমতি।" -বুখারি ব্যতিত সকল সহিহ্ হাদিস গ্রন্থ। "অকুমারী মেয়ে নিজের বিয়ের ব্যাপারে তার ওলির চেয়ে অধিক ক্ষমতার অধিকারী" অর্থাৎ তার সম্মতি ব্যতিরেকে ওলি তার বিয়ে সম্পাদন করতে পারবে না এই বিষয়ে তার ক্ষমতা অকুমারীর তুলনায় বেশি। আর "কুমারীর নিরবতাই তার অনুমতি" এর অর্থ হলো, সে যদি কিছুই না বলে, তাহলে বুঝতে হবে সে সম্মতি দিয়েছে।

আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসায়ীর অপর এক বর্ণনায় রয়েছে : "কুমারী মেয়ের পিতা তার মতামত গ্রহণ করবে।" অর্থাৎ আকদের আগে তার সম্মতি গ্রহণ করতে হবে।

২. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : "বিধবা বা স্বামীহারাকে তার সুস্পষ্ট সম্মতি ও কুমারীকে তার অনুমতি ব্যতিত বিয়ে দেয়া যাবেনা।" লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো : হে রসূলুল্লাহ্, কিভাবে কুমারীর অনুমতি নেয়া হবে। তিন বললেন : তার নিরবতাই অনুমতি।" বিধবা বা স্বামীহারার সুস্পষ্ট উচ্চারিত বা অন্য কোনোভাবে ব্যক্ত সম্মতি অপরিহার্য।

৩. হাসনা বিনতে খাদ্দাম রা. থেকে বর্ণিত : তার পিতা তাকে তার অমতে বিয়ে দিয়েছিল। অথচ তিনি ছিলেন অকুমারী। অতপর তিনি রসূল সা.-এর নিকট অভিযোগ করলেন। ফলে রসূল সা. তার বিয়ে বাতিল করে দিলেন। -মুসলিম ব্যতিত সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থ।

৪. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত : জনৈকা কুমারী দাসী রসূল সা.-এর নিকট এসে জানালো, তার পিতা তার অসম্মতি সত্ত্বেও তাকে বিয়ে দিয়েছে। রসূল সা. তাকে বিয়ে বাতিল করা বা বহাল রাখার স্বাধীনতা দিলেন। -আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারু কুতনি।

৫. আব্দুল্লাহ ইবনে বুরাইদা রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট জনৈকা যুবতী এসে জানালো, তার পিতা তাকে তার ভাতিজার সাথে বিয়ে দিয়েছেন, যাতে আমার দ্বারা তার বদ স্বভাব দূর হয়ে যায়। রসূল সা. তাকে তার বিয়ের ব্যাপারে স্বাধীনতা দিলেন। সে বললো : আমি আমার পিতা যা করেছেন, তা মেনে নিয়েছি। তবে মহিলাদেরকে জানাতে চাই, এ ব্যাপারে পিতার কোনো কর্তৃত্ব নেই।" -ইবনে মাজাহ।

অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ের বিয়েতে অভিভাবকত্ব

এতোক্ষণ যা কিছু আলোচিত হলো, তা ছিলো প্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ে সংক্রান্ত। এক্ষণে অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ের বিষয়ে আলোচনা করা যাচ্ছে।

যেহেতু অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ের মতামত থাকেনা, সে বাবা বা দাদা দ্বারা লালিত পালিত হয় ও তাদের হেফাজতে থাকে, তাই তার অনুমতি ছাড়া তাকে বিয়ে দেয়া বৈধ। আবু বকর সিদ্দিক রা. উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা.কে বালিকা বয়সে তার অনুমতি ছাড়াই রসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। কেননা তখন তার যে বয়স ছিলো, তাতে তার মতামত বিবেচনার যোগ্য ছিলনা। অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ের বিয়ে হওয়ার পর যখন সে বয়োপ্রাপ্ত হয়, তখন সে ঐ বিয়ে বাতিল করার ক্ষমতা রাখে। শাফেয়ী মাযহাবে বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার আগে ও অনুমতি ছাড়া বিয়ে না দেয়াকে মুস্তাহাব মনে করা হয়, যাতে সে নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও দাম্পত্য বন্দীদশায় নিক্ষিপ্ত না হয়। তবে অধিকাংশ আলেমের মতে, বাবা, দাদা প্রভৃতি ওলির পক্ষে অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েকে বিয়ে দেয়া জায়েয নেই এবং বিয়ে দিলে তা শুদ্ধ হবে

না। আবু হানিফা, আওয়াযি ও প্রাচীন ইমামদের একটি দল বলেন, সকল ওলির পক্ষেই এটা জায়েয, তবে বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার পর মেয়ের স্বাধীনতা থাকবে বিয়ে বাতিল করা বা বহাল রাখার। কেননা রসূলুল্লাহ্ সা. হামযার মেয়ে উমামাকে অপ্রাপ্ত বয়স্কা অবস্থায় বিয়ে দিয়েছিলেন এবং বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার পর তার স্বাধীনতা থাকবে বলেও জানিয়ে দিয়েছিলেন। রসূলুল্লাহ্ সা. তাকে নিজের আত্মীয় হিসেবে এবং তার অভিভাবক হিসেবে বিয়ে দিয়েছিলেন। নারী হিসেবে বিয়ে দেননি। নারী হিসেবে যদি বিয়ে দিতেন, তাহলে বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার পরও উমামা বিয়ে বাতিল করার অধিকারী হতোনা। কারণ আল্লাহ্ বলেছেন :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ۝

"আল্লাহ্ ও তার রসূল যখন কোনো ব্যাপারে ফায়সালা করেন, তখন কোনো মুমিন নারী কিংবা পুরুষের তাদের নিজস্ব ব্যাপারে কোনো স্বাধীনতা থাকেনা।" (সূরা আহ্যাব : ৩৬)

সাহাবিদের মধ্য হতে উমর, আলী, আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, ইবনে উমর ও আবু হুরায়রা এই মত অবলম্বন করেছেন।

ওলির ক্ষমতা

ভালোমন্দ বাছবিচারে অক্ষম অধীনস্থ ব্যক্তি, যথা পাগল ও বালক বালিকা এবং ভালোমন্দ বাছবিচারে আংশিক অক্ষম বালক বালিকা বা নির্বোধ অধীনস্থ ব্যক্তির উপর ওলির নিরঙ্কুশ ক্ষমতা রয়েছে। এই নিরঙ্কুশ ক্ষমতা থাকার অর্থ হলো, অধীনস্থের সম্মতি ছাড়াই তাকে বিয়ে দেয়ার ক্ষমতা ওলির রয়েছে। সে সম্মতি না দিলেও এই বিয়ে বৈধ ও কার্যকর হবে। শরিয়ত ওলিকে এই ক্ষমতা দিয়েছে অধীনস্থের কল্যাণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে। কেননা সে তার অযোগ্যতা বা অপরিপক্কতার কারণে নিজের কল্যাণ অকল্যাণ বুঝতে পারেনা। সে যেসব চুক্তি সম্পাদন করবে বা যেসব কাজ করবে, তাতে কিভাবে তার স্বার্থরক্ষা হবে, তা বুঝবার মতো বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা তার নেই তার অপ্রাপ্ত বয়স্কতা, পাগলামি বা নির্বুদ্ধিতার কারণে। এজন্য এসব অযোগ্য বা আংশিক অযোগ্যদের যাবতীয় কাজের ক্ষমতা তাদের ওলির হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। উক্ত দুই শ্রেণী, অযোগ্য ও আংশিক অযোগ্যদের মধ্যে পার্থক্য শুধু এই যে, অযোগ্য ব্যক্তি কোনো বিয়ের আক্দ সম্পন্ন করলে সে আক্দ বাতিল হয়ে যাবে। কেননা তার ভালোমন্দ বাছবিচারের ক্ষমতা নেই। অথচ এই ক্ষমতাটাই যে কোনো চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতার ভিত্তি ও মূল উপাদান। পক্ষান্তরে আংশিক অযোগ্য ব্যক্তি যখন বিয়ের আক্দ সম্পাদন করবে, তখন সে আক্দ যদি সকল শর্ত পূরণ করে সম্পাদন করা হয়ে থাকে, তবে তা শুদ্ধ হবে, তবে তার কার্যকারিতা ওলির অনুমতির উপর নির্ভরশীল থাকবে। সে চাইলে তা অনুমোদন করবে, নচেত বাতিল করে দেবে। হানাফিদের মতে, এ ধরনের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা একমাত্র পিতৃকূলীয় ওলির থাকবে অধীনস্থ অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকা, পাগল ও নির্বোধ ব্যক্তির উপর। কিন্তু হানাফি ব্যতিত অন্যান্য মাযহাবের ফকিহদের মতে, অপ্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে এবং পাগল ও নির্বোধের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তারা এ ব্যাপারে একমত যে, পাগল, ও নির্বোধের ওলি হওয়ার যোগ্যতা পিতা, পিতামহ, ওসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও শাসকের রয়েছে। কিন্তু অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালক ও বালিকার ওলি হওয়ার যোগ্যতা কার কার রয়েছে, সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ বলেছেন : এ যোগ্যতা শুধু পিতা ও ওসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির রয়েছে, আর কারো নেই। ইমাম শাফেয়ির মতে, এটা রয়েছে পিতা ও পিতামহের।

ওলি কারা?

ইমাম মালেক, সাওরি, লায়েস ও শাফেয়িসহ অধিকাংশ আলেমের মতে, বিয়ের ব্যাপারে পিতৃকূলীয় মুরুব্বীরাই ওলি হতে পারবে। মামা, সৎ ভাই এবং কোনো নিকটাত্মীয়ের ওলি হওয়ার যোগ্যতা নেই।

ইমাম শাফেয়ি বলেছেন : কোনো মেয়ের বিয়ে প্রথমে তার নিকটবর্তী ওলি, তা না থাকলে দূরবর্তী ওলি আর তাও না থাকলে শাসক কর্তৃক সম্পাদন করা জরুরি। নচেত বিয়ে শুদ্ধ হবেনা। [অর্থাৎ শাফেয়ির মতে, ওলির ধারাবাহিকতা নিম্নরূপ : প্রথমে পিতা, তারপর পিতামহ, তারপর আপন ভাই, তারপর সৎ ভাই, তারপর আপন ভাইপো, তারপর ভাইপো, তারপর চাচা, তারপর চাচাতো ভাই, তারপর শাসক। অন্য কথায়, এমন কেউ বিয়ে সম্পাদন করতে পারবেনা, যার চেয়ে নিকট আত্মীয় সেখানে বিদ্যমান। কেননা, এটা এমন একটা অধিকার, যা পিতৃকূলীয় আত্মীয়তার সুবাদে প্রাপ্য হয়। এদিক দিয়ে উত্তরাধিকারের সাথে এর সাদৃশ্য রয়েছে। সুতরাং কেউ যদি এই ধারাবাহিকতা লঙ্ঘন করে বিয়ে করে, তাহলে বিয়ে শুদ্ধ হবেনা।

সুতরাং কোনো মহিলা যদি ওলির অনুমতি নিয়ে বা অনুমতি ছাড়া নিজের বিয়ে নিজে করে, তবে তা বাতিল হয়ে যাবে। আবু হানিফার মতে, পিতৃকূলীয় আত্মীয় ব্যতিত অন্যান্য আত্মীয়েরও বিয়ের ওলি হবার অধিকার রয়েছে। আর রওযাতুন নাদিয়া গ্রন্থের লেখক বলেন : আমার নিকট যে মতটি নির্ভরযোগ্য মনে হয়, তা হলো : বিয়েতে কনের আত্মীয়রাই তার ওলি হবে। নিকটতম থেকে এর ধারাবাহিকতা শুরু হবে। কনের বিয়ে সম্পাদনকারী যখন নিকটতম আত্মীয় ব্যতিত অন্য কেউ হবে, তখন কুফুহীন বিয়ে হওয়ার কারণে যারা অপমানের শিকার হবে, তারাই ওলি হবার যোগ্য।" এই মাপকাঠি শুধু পিতৃস্থানীয় আত্মীয়দের জন্য নির্দিষ্ট নয়, বরং অন্যদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। যেমন : সৎ ভাই, মেয়ের ছেলে। হয়তো বা চাচাতো ভাইদের চেয়েও সৎ ভাই ও মেয়ের ছেলের অপমানবোধ অধিকতর তীব্র হতে পারে। কাজেই শুধু পিতৃকূলীয়দের মধ্যে বিয়ের অভিভাবকত্ব সীমিত করে রাখার কোনো যুক্তি নেই। অনুরূপ শুধু উত্তরাধিকারীদের মধ্যেও তা সীমিত করে রাখার যুক্তি নেই। যিনি এরূপ মনে করেন, তার এই মর্মে যুক্তি বা প্রমাণ দেখাতে হবে যে, অভিধান বা পরিভাষা অনুসারে ওলির অর্থ এটাই।

'রওযাতুন নাদিয়ার' লেখক আরো বলেন : এতে কোনো সন্দেহ নেই, কোনো কোনো আত্মীয়তা অপর আত্মীয়তার চেয়ে অগ্রগণ্য। এই অগ্রগণ্যতার ভিত্তি কোনো সম্পত্তির অংশ প্রাপ্তির যোগ্যতা বা তা ব্যবহারের যোগ্যতা নয়, যার ফলে তা উত্তরাধিকারের মতো হয়ে যাবে কিংবা অপ্রাপ্ত বয়স্কের অভিভাবকত্বের মতো হয়ে যাবে। বরং এর ভিত্তি হলো অন্য একটা জিনিস। সেটি হলো, আত্মীয় কর্তৃক তার উপর আপতিত কলঙ্ক বা অপমানবোধ। এ অপমানবোধ শুধু পিতৃকূলীয় আত্মীয়দেরই থাকে তা নয়, বরং অন্যদেরও থাকে। এ ব্যাপারে কোনো কোনো আত্মীয়তা যে অপর আত্মীয়তার চেয়ে অধিক অনুভূতি সম্পন্ন হয়ে থাকে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যেমন পিতৃস্থানীয়রা ও পুত্রস্থানীয়রা অন্যদের চেয়ে অগ্রগণ্য, অতপর আপন ভাইয়েরা, অতপর সৎ ভাইয়েরা, অতপর পৌত্ররা, অতপর দৌহিত্ররা, অতপর ভাইপোরা, অতপর ভাগ্নেরা, তারপর চাচারা, তারপর মামারা, তারপর এদের পরবর্তীরা, এভাবেই ধারাবাহিকভাবে। যিনি এদের মধ্য থেকে কাউকে বাদ দিয়ে

অপর কাউকে নির্দিষ্ট করার পক্ষপাতী, তার সেজন্য প্রমাণ দর্শানো চাই। তিনি যদি এর প্রমাণ হিসেবে নিছক অতীতের ব্যক্তিবর্গের উক্তি তুলে ধরতে চান, তাহলে আমরা তার উপর আস্থা রাখতে প্রস্তুত নই।" (আর রওযা, ২/১৪)

ওলি কর্তৃক অধীনস্থাকে বিয়ে করা বৈধ

কোনো ব্যক্তি তার অধীনস্থ মহিলাকে অন্য কোনো ওলির মুখাপেক্ষি হওয়া ছাড়াই সরাসরি বিয়ে করতে পারে, যদি উক্ত মহিলা তাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণে সম্মত হয়। কেননা উম্মে হাকিম বিনতে কারেয আব্দুর রহমান বিন আওফকে বলেছিলেন : আমাকে বিয়ে করার জন্য একাধিক ব্যক্তি প্রস্তাব দিয়েছে। আপনি তাদের মধ্য হতে যাকে ভালো মনে করেন তার সাথে আমাকে বিয়ে দিন। আব্দুর রহমান বিন আওফ বললেন : তুমি আমাকে এই ক্ষমতা দিচ্ছো? সে বললো : হ্যাঁ। তিনি বললেন : আমিই তোমাকে বিয়ে করলাম।

ইমাম মালেক বলেছেন : কোনো অকুমারী যদি তার ওলিকে বলে, আপনি যাকে ভালো মনে করেন, তার সাথে আমাকে বিয়ে দিন। এরপর ওলি যদি তাকে নিজের সাথে বা অন্য কোনো মনোনীত ব্যক্তির সাথে বিয়ে দেয়, তবে সেই বিয়ে মেনে নেয়া উক্ত মহিলার জন্য বাধ্যতামূলক হবে, চাই সে নির্দিষ্টভাবে নাই জানুক কে তার স্বামী। এটাই হানাফি মাযহাব, লায়েস, সাওরি ও আওযায়ির অভিমত। ইমাম শাফেয়ি ও দাউদ বলেন : ওলির সাথে বিয়ে সম্পাদন করতে হলে শাসক, অন্য কোনো ওলি বা তার চেয়ে দূরবর্তী কোনো ব্যক্তির তা করতে হবে। কেননা বিয়েতে একজন ওলি থাকা শর্ত। যিনি বিয়ে করবেন, তিনিই বিয়ের ওলি বা ব্যবস্থাপক হতে পারেননা। কিন্তু ইবনে হাযম শাফেয়ির উক্ত মতের বিরোধিতা করে তার সপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সা. সফিয়াকে মুক্ত করে তাকে বিয়ে করেন এবং তার মুক্তিকে তার মোহরানা গণ্য করেন। রসূল সা. তার অধীনস্থ মহিলাকে নিজেই বিয়ে করে নিলেন, এটাই সকলের জন্য অকাট্য প্রমাণ। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ط إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ط وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ○

অর্থ : তোমাদের মধ্যে যারা স্বামীহীনা এবং তোমাদের দাসদাসীদের মধ্যে যারা বিয়ের যোগ্য, তাদেরকে বিয়ে করাও। তারা যদি অভাবী হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ নিজ মহানুভবতা দ্বারা তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ তো সুপ্রশস্ত ও মহাজ্ঞানী।" (সূরা নূর : আয়াত ৩২)

এখন যে ব্যক্তি কোনো স্বামীহীনাকে তার সম্মতিক্রমে নিজেই বিয়ে করলো, সে তো আল্লাহর আদেশ অনুযায়ীই কাজ করলো। আল্লাহ তো বলেননি, কোনো স্বামীহীনাকে যে বিয়ে করায়, সে নিজেই তাকে বিয়ে করতে পারবেনা। কাজেই এটা শুদ্ধ ও কার্যকর।

ওলির অনুপস্থিতি

ওলি হওয়ার যাবতীয় শর্ত ও যোগ্যতার আধিকারী ওলি যখন উপস্থিত থাকে, তখন তার চেয়ে দূরবর্তী ব্যক্তি ওলি হওয়ার যোগ্য গণ্য হবেনা। যেমন পিতা যদি উপস্থিত থাকে তবে ভাই বা চাচা প্রভৃতি ওলি হতে পারবেনা। উক্ত ভাই বা চাচা যদি পিতার অনুমতি ছাড়া

কোনো অপ্রাপ্ত বয়স্কা বা অনুরূপ অধীনস্থ মেয়ের বিয়ে সম্পাদন করে, তবে অনুমতির উপর এ বিয়ে মওকুফ থাকবে। কিন্তু যদি নিকটতম ওলি অনুপস্থিত থাকে এবং বিয়ের সুযোগ্য ও কুফুসম্পন্ন প্রস্তাবক তার মত জানার অপেক্ষা করতে প্রস্তুত না হয়, তাহলে অভিভাবকত্ব তার পরবর্তী ব্যক্তির নিকট স্থানান্তরিত হবে, যাতে একজন মহিলার স্বার্থহানি না ঘটে। অতপর অনুপস্থিত ওলি ফিরে এসে তার পরবর্তী ওলি কর্তৃক সম্পাদিত বিয়েতে আপত্তি তোলার অধিকারী হবে না। কেননা সে তার অনুপস্থিতির কারণে অস্তিত্বহীন বিবেচিত হবে এবং তার পরবর্তী ব্যক্তিই ন্যায্য ওলি গণ্য হবে। এটা হানাফি মাযহাবের মত। কিন্তু শাফেয়ি বলেন : নিকটতম ওলি উপস্থিত থাকতে দূরবর্তী ওলি বিয়ে সম্পাদন করলে সে বিয়ে বাতিল। আর যখন নিকটতম ওলি অনুপস্থিত থাকবে, তখন পরবর্তী ব্যক্তি তার বিয়ে সম্পাদন করতে পারবেনা। তখন বিয়ে সম্পাদন করবে বিচারক।

বিদায়াতুল মুজতাহিদ গ্রন্থে বলা হয়েছে : এ বিষয়ে ইমাম মালেক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মত দিয়েছেন। এরপর বলেছেন, নিকটতম ব্যক্তির উপস্থিতিতে দূরবর্তী ব্যক্তি বিয়ে সম্পাদন করলে বিয়ে বাতিল হবে। আবার অন্য সময় বলেছেন : বিয়ে বৈধ। অন্য একবার বলেছেন : নিকটতর ওলি এ বিয়ে অনুমোদনও করতে পারবে, বাতিলও করতে পারবে। তবে এই বিভিন্নতা পিতা কর্তৃক কুমারী কন্যার ও ওসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক পালিত কন্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা এ ক্ষেত্রে তার এই বক্তব্য বহাল থাকবে যে, বিয়ে বাতিল হবে। অর্থাৎ পিতা ছাড়া আর কেউ কুমারী কন্যার বিয়ে পিতার উপস্থিতিতেই সম্পাদন করলে কিংবা ওসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপস্থিতিতে অন্য কেউ পালিত কন্যার বিয়ে সম্পাদন করলে সে বিয়ে বাতিল হবে। ইমাম মালেক আবু হানিফার এই মত সমর্থন করেন যে, নিকটতর ওলির অনুপস্থিতিতে দূরবর্তী ওলির নিকট অভিভাবকত্ব স্থানান্তরিত হবে।

নিকট আত্মীয় ওলি অনুপস্থিত থাকলে তিনি দূরের আত্মীয় ওলির মতো

আল-মুগনীতে বলা হয়েছে : যখন নিকটাত্মীয় ওলি আটক বা বন্দী থাকে যেখানে তার মতামত গ্রহণ করা সম্ভব হয়না, তখন তিনি দূরের আত্মীয় ওলির মতো গণ্য হবেন। কেননা দূরত্ব কেবল তার ব্যক্তিগত অবস্থানের কারণে বিবেচিত হয়নি, বরং তার তদারকীতে বিয় সম্পাদন অসম্ভব হওয়ার কারণে বিবেচিত হয়েছে। এখানে এই শেষোক্ত কারণই বিদ্যমান। তাই যখন জানা যাবেনা ওলি নিকটাত্মীয়, না দূরের আত্মীয়, অথবা নিকটাত্মীয় কিন্তু তার অবস্থান জানা যায়না, তখন তিনি দূরের আত্মীয় গণ্য হবেন।

দু'জন ওলির বিয়ে সম্পাদন (পৃথকভাবে)

যখন দু'জন ওলি কোনো মেয়ের বিয়ের আক্দ সম্পাদন করে, তখন দেখতে হবে উভয় আক্দ একই সময়ে সম্পন্ন হয়েছে, বা একটা আগে ও অপরটা পরে হয়েছে। উভয় আক্দ যদি একই সময়ে হয়, তবে দুটোই বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি একটা আগে ও অন্যটা পরে হয়, তবে কনে প্রথম আক্দের বরের স্ত্রী গণ্য হবে। এমনকি দ্বিতীয়জন যদি তার সাথে সহবাস করে থাকে তবুও। দ্বিতীয় আকদের বর যদি এ কথা পূর্বাহ্নে জেনেও তার সাথে সহবাস করে থাকে যে, তার সাথে আরেকজনের আক্দ ইতিপূর্বেই সম্পন্ন হয়েছে, তাহলে তার সহবাস ব্যভিচার গণ্য হবে এবং সে 'হদে'র (শরিয়ত নির্দেশিত শাস্তি) যোগ্য বিবেচিত হবে। আর যদি সে এ কথা পূর্বাহ্নে না জেনে থাকে, তাহলে তাকে প্রথম আক্দের বরের কাছেই ফিরিয়ে দেয়া হবে। তবে দ্বিতীয়জন অজ্ঞতার কারণে শাস্তি থেকে

অব্যাহতি পাবে। সামুরা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে মহিলাকে দু'জন ওলি পৃথকভাবে বিয়ে দেয়, সে প্রথম আকদের বরের স্ত্রী হবে।" (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ) এ হাদিসে যেরূপ শর্তহীনভাবে প্রথম আক্দকে কার্যকর ও দ্বিতীয় আক্দকে অকার্যকর বিবেচনা করা হয়েছে, তা দাবি করে, কনে প্রথম আক্দের বরের স্ত্রী, চাই তার সাথে দ্বিতীয় আক্দের বর সহবাস করে থাকুক বা না করে থাকুক।

যে নারীর ওলি নেই এবং আদালতে যাওয়ারও সাধ্য নেই

কুরতুবী বলেন : কোনো মহিলার অবস্থান যদি এমন জায়গায় হয়, যেখানে তার কোনো ওলি নেই এবং সেখানে কোনো শাসকও নেই, তবে তার দায়িত্ব তার কোনো বিশ্বাসযোগ্য প্রতিবেশীর হাতে ন্যস্ত করা হবে, যিনি তার বিয়ে দেবেন এবং আপাতত তিনিই তার ওলি হবেন। কারণ মানব-সমাজে বিয়ে-শাদির ব্যবস্থা তো থাকাই চাই। যতটা সম্ভব, সুষ্ঠুভাবে তা সম্পন্ন করলেই হলো। (আহকামুল কুরআন, পৃ. ৮৬, খণ্ড-৩)। এ কারণেই ইমাম মালেক দুস্থ মহিলা সম্পর্কে বলেছেন : এ ধরনের মহিলা যার নিকট তার দায়িত্ব সমর্পণ করে, সে-ই তার বিয়ে দেবে। কেননা সে শাসক থেকে দূরে অবস্থান করে। তাই সে শাসকবিহীন এলাকার মানুষের সাথে তুলনীয়। কাজেই মোটামুটিভাবে বলা যায়, মুসলিম সমাজই তার ওলি। শাফেয়ি বলেন : প্রতিবেশীদের মধ্যে যখন এমন কোনো মহিলা থাকে, যার কোনো ওলি নেই এবং সেই মহিলা কোনো পুরুষকে নিজের ওলি বা অভিভাবক বানিয়ে নেয়, তখন সেই পুরুষ তাকে বিয়ে দিলে সেটা জায়েয হবে। কারণ শালিস মনোনয়নের সাথে এর সাদৃশ্য রয়েছে। আর যে ব্যক্তি শালিস মনোনীত হয়, সে শাসকের স্থলাভিষিক্ত এবং তার সিদ্ধান্ত কার্যকর।

ওলি কর্তৃক অধীনস্থ মহিলার বিয়ে ঠেকানো

আলেমগণ একমত, কোনো ওলির জন্য এটা বৈধ নয় যে, তার অধীনস্থ নারীকে যখন তার 'কুফু'ধারী কেউ মোহরে মিছল সহকারে বিয়ে করতে চাইবে, তখন তাকে বিয়ে করতে বাধা দেবে এবং বিয়ে প্রতিহত করে তার উপর যুলুম চালাবে। এ রকম ক্ষেত্রে ওলি যখন তাকে বিয়ে করতে বাধা দেবে তখন সেই মহিলার আদালতে আবেদন করার অধিকার থাকবে, যাতে আদালত তার বিয়ে দেয়। এরূপ ক্ষেত্রে তার অভিভাবকত্ব অন্য ওলির নিকট হস্তান্তরিত হবেনা, বরং উক্ত অত্যাচারী ওলির নিকট থেকে তার অভিভাবকত্ব সরাসরি আদালতের হাতে চলে যাবে। কেননা বিয়ে ঠেকানো একটা যুলুম। আর যুলুম প্রতিহত করার দায়িত্ব আদালতের হাতে ন্যস্ত। অবশ্য যখন কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণে বিয়েতে বাধা দেয়া হয়, যেমন স্বামী 'কুফু'ধারী নয়, কিংবা ধার্যকৃত মোহর মোহরে মিছলের চেয়ে কম। অথবা তার চেয়েও অধিক 'কুফু'ধারী অন্য প্রস্তাবক বিদ্যমান, তখন অভিভাবকত্ব হস্তান্তরিত হবেনা। কেননা এ ক্ষেত্রে ওলি বাধাদানকারী বলে গণ্য হয়না।

মাকাল বিন ইয়াসার রা. বলেন : আমার একটা বোন ছিলো। আমার নিকট তার বিয়ের প্রস্তাব আসতো। এক পর্যায়ে আমার নিকট বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এলো আমার এক চাচাতো ভাই। আমি তার সাথেই বোনের বিয়ে দিলাম। তারপর সে তাকে রজয়ি (প্রত্যাহারযোগ্য) তালাক দিলো এবং তাকে রেখে চলে গেল। ইদ্দত শেষে যখন আবার আমার বোনের বিয়ের জন্য আমার নিকট প্রস্তাব আসতে লাগলো। তখন ঐ চাচাতো ভাই আবার আমার নিকট তার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এলো। তখন আমি বললাম : আল্লাহর

কসম, আমি আর কখনো তাকে বিয়ে দেবনা। তখন আমার সম্পর্কে আয়াত নাযিল হলো :"যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দাও এবং তালাকের পর তারা তাদের ইদ্দত পূর্ণ করে, তখন তোমরা তাদেরকে তাদের স্বামীর সাথে পুনরায় বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধা দিওনা।" (সূরা বাকারা : আয়াত ২৩২) মা'কাল বলেন : এরপর আমি আমার কসমের কাফফারা দিলাম এবং বোনকে তার সাথে বিয়ে দিলাম।

এতিম মেয়ের বিয়ে

এতিম মেয়েকে বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার আগে বিয়ে দেয়া বৈধ। ওলি তার বিয়ের আয়োজন করবে। তবে বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার পর তার বিয়ে বাতিল করার ক্ষমতা থাকবে। এটা আয়েশা রা. আহমদ ও আবু হানিফার মত। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : "তারা তোমার নিকট স্ত্রীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বলো : আল্লাহ তাদের সম্বন্ধে তোমাদের ব্যবস্থা দিচ্ছেন, আর যা তোমাদেরকে কিতাবে পড়ে শুনান হয়, তা ঐসব এতিম নারীদের সম্পর্কে যাদের তোমরা তাদের নির্ধারিত প্রাপ্য দাওনা, অথচ তোমরা তাদেরকে বিয়ে করতে চাও।" (সূরা নিসা : আয়াত ১২৭)

আয়েশা রা. বলেন : এ আয়াত এমন এতিম নারী সংক্রান্ত, যে তার ওলির নিকট লালিত পালিত হয়, অতপর উক্ত ওলি তাকে বিয়ে করতে আগ্রহী হয়, কিন্তু তাকে ইনসাফ সহকারে মোহরানা দেয়না। তাই ইনসাফ সহকারে মোহরানা না দিলে তাদেরকে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী ও ইবনে মাজায় রসূল সা. থেকে বর্ণিত : "এতিম নারীকে তার নিজের ব্যাপারে মতামত জিজ্ঞাসা করা হবে। সে যদি চুপ থাকে তবে সেটা তার সম্মতি, আর অসম্মতি জানালে তার বিয়ে বৈধ হবে না।" শাফেয়ি বলেছেন : এতিম মহিলাকে বিয়ে দেয়া কেবল বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার পরেই বৈধ হবে। কেননা, রসূলুল্লাহ সা. তার মতামত নিতে বলেছেন। অথচ বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত মতামত নেয়ার সুযোগ নেই। কারণ অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ের মতামত জিজ্ঞাসা করা নিরর্থক ও নিষ্ফল।

একই ওলি কর্তৃক বিয়ে সম্পাদন

যখন বর ও কনে উভয়ের ওলি একই ব্যক্তি হয়, তখন সেই ওলি অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে ও মেয়ের বিয়ে সম্পন্ন করতে পারে। যেমন দাদা যখন ওলি কিংবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকিল, তখন তিনি তার এক অপ্রাপ্ত বয়স্ক পৌত্রকে অপর অপ্রাপ্ত বয়স্ক পৌত্রীর সাথে (চাচাতো ভাই ও বোনকে) বিয়ে দিতে পারেন।

শাসক বা বিচারক যখন ওলি হয়

দুই অবস্থায় শাসক বা বিচারকের নিকট অভিভাবকত্ব চলে যায় :

১. যখন একাধিক ওলি থাকে এবং তারা ঝগড়ায় লিপ্ত হয়।

২. যখন ওলি বিদ্যমান থাকেনা, চাই ওলির অস্তিত্বই না থাকুক, অথবা ওলি অনুপস্থিত থাকুক। এমতাবস্থায় যদি কুফু'ধারী বর পাওয়া যায়। প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ে তার প্রতি সম্মত থাকে এবং ওলিদের কেউ উপস্থিত না থাকে। যেমন সে বর ও কনে উভয়ের শহরের বাইরে থাকে, তাহলে বিচারক এমতাবস্থায় বিয়ে সম্পন্ন করতে পারবে। তবে বর ও কনে যদি অনুপস্থিত ওলির অপেক্ষায় থাকতে সম্মত থাকে, চাই তাতে যতো বিলম্বই ঘটুক, তবে তার অপেক্ষায় থাকতে হবে এবং অভিভাবকত্ব বিচারকের হাতে যাবেনা। তবে এ

ধরনের সম্মতি কনের পক্ষ থেকে না জানানো হলে অপেক্ষা করা বাধ্যতামূলক থাকবেনা। কেননা বায়হাকিতে আলী রা. থেকে বর্ণিত : "তিনটে জিনিসে বিলম্ব করা যাবেনা : নামায, যখন তার সময় সমাগত হয়। লাশের সৎকার, যখন তা উপস্থিত হয় এবং স্বামীহীনা নারীর বিয়ে, যখন 'কুফু'ধারী বর পাওয়া যায়।

২০. বিয়ে সম্পাদনে উকিল (প্রতিনিধি) নিয়োগ

প্রতিনিধি নিয়োগ করা একটি বৈধ চুক্তি। কেননা জনগণ তাদের বহু কাজে এর প্রয়োজন বোধ করে। ফকীহগণের সর্বসম্মত মত, মানুষ নিজে সম্পাদন করতে সক্ষম এমন প্রত্যেক চুক্তি সম্পাদনের জন্য অন্যকে প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারে, যেমন ক্রয় বিক্রয়, ভাড়া দান, পাওনা আদায়, পাওনা আদায়ের জন্য আদালতের শরণাপন্ন হওয়া, বিয়ে দেয়া, তালাক দেয়া, ইত্যকার যে সকল চুক্তিতে প্রতিনিধিত্ব অনুমোদনযোগ্য। রসূলুল্লাহ সা. তাঁর কোনো কোনো সাহাবির বিয়ে সম্পাদনে প্রতিনিধির ভূমিকা পালন করতেন।

আবু দাউদ উকবা বিন আমের রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ্ সা. এক ব্যক্তিকে বললেন : তুমি কি রাযী আছ, আমি অমুক মহিলার সাথে তোমার বিয়ে সম্পাদন করি? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি মহিলাটিকেও বললেন : আমি যদি অমুক ব্যক্তির সাথে তোমার বিয়ে দেই, তবে তুমি কি রাযী? সেও বললো : হ্যাঁ। এরপর তিনি একজনকে অপরজনের সাথে বিয়ে দিলেন। অতপর সে তার স্ত্রীর সাথে একান্তে মিলিত হলো। অথচ এর আগে সে উক্ত মহিলার জন্য কোনো মোহরানা ধার্যও করেনি, তাকে কিছু দেয়ওনি। সে ছিলো হুদায়বিয়ায় উপস্থিত লোকদের অন্যতম। হুদায়বিয়ায় যারা উপস্থিত ছিলো, খয়বরে তাদের কিছু সম্পত্তি ছিলো। এই ব্যক্তির যখন মৃত্যু আসন্ন হলো, তখন বললো : রসূলুল্লাহ সা. আমাকে অমুক নারীর সাথে বিয়ে দিয়েছেন। অথচ আমি তার জন্য কোনো মোহরানা ধার্য করিনি এবং তাকে কিছু দেইওনি। আমি তোমাদের সবাইকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি আমার খয়বরের সম্পত্তি তাকে মোহরানাস্বরূপ দিলাম। অতপর মহিলা তার সম্পত্তি গ্রহণ করলো এবং তা এক লক্ষ মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করলো।"

এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়, যে ব্যক্তি প্রতিনিধি হবে, তার উভয় পক্ষের প্রতিনিধি হওয়া বৈধ।

উম্মে হাবিবা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। নাজ্জাশীর দেশে থাকাকালেই নাজ্জাশী রসূল সা.-এর সাথে তার বিয়ে সম্পাদন করেন।" (আবু দাউদ)। রসূলুল্লাহ সা.-এর পক্ষ থেকে যিনি প্রতিনিধি হিসেবে এই বিয়ে সম্পাদন করেন, তিনি ছিলেন আমর বিন উমাইয়া যামরি। রসূলুল্লাহ সা. তাকে এই কাজের জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন। নাজ্জাশী উম্মে হাবিবাকে মোহরানা দিয়েছিলেন। তাই বিয়ের অনুষ্ঠান তার আয়োজনেই সম্পন্ন হয়।

প্রতিনিধি নিয়োগের অধিকার কার আছে এবং কার নেই

সুস্থ মস্তিষ্ক, প্রাপ্ত বয়স্ক, স্বাধীন মানুষ মাত্রেরই প্রতিনিধি নিয়োগের অধিকার রয়েছে। কেননা সে পূর্ণ যোগ্যতাসম্পন্ন। যে ব্যক্তি যোগ্যতাসম্পন্ন, সে নিজেই নিজের বিয়ে সম্পন্ন করার অধিকারী। আর নিজের বিয়ে সম্পাদনের অধিকার যার রয়েছে, সে অন্যকে তার প্রতিনিধি নিয়োগেরও ক্ষমতা রাখে। [প্রতিনিধি নিয়োগের সময় উল্লিখিত শর্তসমূহ পূর্ণ হয়েছে কিনা, তা দেখতে হবে। হানাফি ফকীহগণ বলেন : অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক যদি ন্যায়

ও অন্যায়ের পার্থক্য বুঝে তবে সে প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারে। অনুরূপ ক্রীতদাস প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারে।]

কিন্তু যার মোটেই যোগ্যতা নেই, কিংবা পূর্ণ যোগ্যতা নেই, সে অন্যকে প্রতিনিধি নিয়োগের অধিকারী নয়। যেমন শিশু ও বালক, পাগল ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী। এদের কেউই নিজের বিয়ে নিজেই সম্পাদন করার যোগ্যতা রাখেনা। তাই তারা প্রতিনধি নিয়োগেরও অযোগ্য।

প্রাপ্ত বয়স্কা ও সুস্থ মস্তিষ্ক মহিলার প্রতিনিধি নিয়োগ শুদ্ধ কিনা, তা নিয়ে ফকীহ্‌দের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেননা তার নিজের বিয়ে নিজে সম্পাদনের যোগ্যতা নিয়েও তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আবু হানিফা বলেন : যেহেতু তার নিজের বিয়ে নিজে সম্পাদনের ক্ষমতা রয়েছে, তাই অন্যকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করার ক্ষমতাও তার রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ আলেমের বক্তব্য হলো, তার ওলির ক্ষমতা রয়েছে। প্রতিনিধি নিযুক্ত না হয়েও তার বিয়ে সম্পাদন করতে পারে। তবে মহিলার সম্মতি অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। শাফেয়িদের কেউ কেউ বাবা ও দাদার সাথে অন্যান্য ওলির পার্থক্য করেছেন। তারা বলেছেন : বাবা ও দাদাকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে প্রয়োজন রয়েছে।

নির্দিষ্ট কর্মসীমার মধ্যে ও অনির্দিষ্ট কর্মসীমার মধ্যে প্রতিনিধি নিয়োগ

উকিল বা প্রতিনিধি নিয়োগ দু'ভাবে বৈধ : নির্দিষ্ট কর্মসীমার মধ্যে এবং অনির্দিষ্ট কর্মসীমার মধ্যে। নির্দিষ্ট কর্মসীমার মধ্যে প্রতিনিধি নিয়োগের অর্থ হলো, নির্দিষ্ট মহিলার সাথে, অথবা একটি নির্দিষ্ট পরিবারের মহিলার সাথে অথবা নির্দিষ্ট পরিমাণের মোহরানার ভিত্তিতে বিয়ে করিয়ে দেয়ার জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করা। আর অনির্দিষ্ট কর্মসীমার মধ্যে প্রতিনিধি নিয়োগের অর্থ হলো, যে কোনো মহিলা বা যে কোনো পরিবারের মহিলা বা যে কোনো পরিমাণ মোহরানার ভিত্তিতে বিয়ে করিয়ে দেয়ার জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করা। অনির্দিষ্ট কর্মসীমায় প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হলে ইমাম আবু হানিফার মতে, প্রতিনিধি কেবল নিজের মেয়ে বা নিজের অভিভাবকত্বের অধীনস্থ মেয়ে বা অনুরূপ এমন কোনো মেয়ে, যার জন্য তার অভিযোগের সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা রয়েছে, এমন মেয়ে ব্যতিত অন্য যে কোনো মেয়ে, যে কোনো পরিবারের মেয়ে এবং যে কোনো পরিমাণ মোহরানার ভিত্তিতে বিয়ে করানোর ব্যাপারে স্বাধীন। সে যদি কোনো ত্রুটিযুক্ত মেয়ে, 'কুফু'বিহীন মেয়ে বা মোহরে মিছলের চেয়ে বেশি মোহরানার ভিত্তিতে বিয়ে করায়, তবে সে বিয়ে বৈধ হবে এবং তা অগ্রাহ্য করা যাবেনা। তবে প্রতিনিধি যদি নিজের মেয়ে, নিজের অভিভাবকত্বের অধীনস্থ মেয়ে বা এমন কোনো মেয়েকে বিয়ে করায়, যার জন্য তার উপর অভিযোগ আরোপিত হতে পারে, তবে তা প্রতিনিধি নিয়োগকারীর অনুমোদন সাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ বলেন : প্রতিনিধি বা উকিল যতোই অনির্দিষ্টভাবে নিযুক্ত হয়ে থাকুক, তাকে অবশ্যই ত্রুটিমুক্ত, কুফুধারী ও মোহরে মিছল সহকারে বিয়ে করাতে হবে। তবে মোহরে মিছলের চেয়ে যদি সামান্য কিছু বেশি মোহরানা ধার্য করা হয়, যা সাধারণত লোকেরা মেনে নিতে অভ্যস্ত, তবে তাতে আপত্তির কিছু নেই। আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদের যুক্তি হলো, যে ব্যক্তি কাউকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে, সে এজন্যই নিযুক্ত করে, যাতে সে তার জন্য সর্বাধিক কল্যাণকর ও উপযোগী মেয়ে বাছাই করে দেবে। নির্দিষ্ট করে না দেয়ার অর্থ এ নয় যে, সে যে কোনো একটা মহিলা এনে দিলেই চলবে। কারণ প্রতিনিধি নিযুক্ত করা দ্বারা সাধারণভাবে এটাই ধারণা করা হয়

যে, সে মোহরে মিছল সহকারেই একটা মেয়ে বাছাই করে দেবে। এই সাধারণ ধারণা অবশ্যই পূর্ণ ও কার্যকর হওয়া চাই। কারণ প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী যা উপলব্ধি করা হয়, তা আরোপিত শর্ত হিসেবেই মান্য করা জরুরি। এই মতটির উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। পক্ষান্তরে নির্দিষ্ট কর্মসীমায় প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হলে সে ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করা বৈধ হবেনা। তবে ব্যতিক্রমের ফলে যদি উৎকৃষ্টতার কিছু পাওয়া যায়, তাহলে তা বৈধ। যেমন যে মহিলাকে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল, প্রতিনধির বাছাই করা মহিলা তার চেয়ে সুন্দরী, অথবা প্রতিনিধির বাছাই করা মহিলার মোহরানা তার নির্ধারিত মোহরানার চেয়ে কম। কিন্তু ব্যতিক্রম যদি নির্দিষ্টকৃত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট না হয়, তাহলেও আক্দ শুদ্ধ হবে। কিন্তু প্রতিনিধি নিয়োগকারীর জন্য তা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক থাকবেনা। ইচ্ছা করলে সে গ্রহণ করবে, নচেত প্রত্যাখ্যান করবে।

হানাফি ফকীহগণ বলেছেন : প্রতিনিধি নিয়োগকারী যদি মহিলা হয়, তবে সে কোনো নির্দিষ্ট পুরুষের সাথে ও নির্দিষ্ট মোহরানায় বিয়ে সম্পাদনের আদেশ দিলে তার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হওয়া জরুরি। আর যদি অনির্দিষ্টভাবে যে কোনো পুরুষের সাথে বিয়ে সম্পন্ন করার আদেশ দেয় এবং প্রতিনিধি নিজের সাথে নিজের পিতা বা পুত্রের সাথে তার বিয়ে সম্পাদন করে, তবে মহিলার অনুমোদন ব্যতিরেকে আক্দ কার্যকর হবেনা। কেননা, এখানে অভিযোগ বা অপবাদের সম্ভাবনা রয়েছে। আর যদি অপর কোনো কুফুধারী পুরুষের সাথে এবং মোহরে মিছল সহকারে বিয়ে দেয়, তাহলে আক্দ কার্যকর ও তা মেনে নেয়া বাধ্যতামূলক হবে, মহিলা বা তার ওলি তা প্রত্যাখ্যান করার অধিকারী হবেনা। আর যদি পুরুষ কুফুধারী হয় কিন্তু মোহরানা মোহরে মিছলের চেয়ে অতিমাত্রায় কম হয়, তবে আক্দ তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকরী হবেনা, বরং মহিলার ও তার ওলির অনুমতি পাওয়া পর্যন্ত মওকুফ তথা স্থগিত থাকবে। কেননা এর সাথে মহিলা ও তার ওলি উভয়ের প্রাপ্য জড়িত। আর যদি স্বামী কুফুহীন হয়, তবে আক্দ বাতিল হবে, চাই মোহরানা মোহরে মিছলের সমান, বেশি বা কম হোক। এখানে অনুমতি দিলেও লাভ নেই। কেননা, যে আক্দ মওকুফ থাকে তাতে অনুমতি কার্যকর হয়। যে আক্দ বাতিল, তাতে অনুমতি কার্যকর হয়না।

বিয়েতে নিযুক্ত উকিল বা প্রতিনিধি একাধারে নিয়োগকারী দূত ও মনোবাঞ্ছা ব্যক্তকারী

অন্যান্য চুক্তির উকিলের সাথে বিয়ের উকিলের অনেক পার্থক্য রয়েছে। বিয়ের উকিল নিয়োগকর্তার দূত ও মনোবাঞ্ছা ব্যক্তকারী মাত্র। কাজেই আকদের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রাপ্যাদির সাথে তার কোনো সংশ্রব নেই। তাই সে মোহরানা আদায় করে দিতে বাধ্য নয়। [তবে যদি মোহরানা আদায় করে দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে, তাহলে আদায় করে দিতে বাধ্য। তবে এটা উকিল বা প্রতিনিধি হিসেবে তার দায়িত্ব নয়। এটা একটা স্বতন্ত্র দায়িত্ব।] সে যখন স্ত্রীর উকিল, তখন স্ত্রীকে স্বামীর অনুগত করে দেয়ার দায়িত্বও তার উপর আরোপিত হয়না। সে স্ত্রীর উকিল হলে স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীর পক্ষে মোহরানা গ্রহণ করতেও পারবেনা। তবে স্ত্রী অনুমতি দিলে একটা অতিরিক্ত কাজ হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে। এটা বিয়ের উকিল হিসেবে তার অতিরিক্ত কাজ। বিয়ের উকিল হিসেবে তার কাজ আক্দ সম্পাদন করার মধ্য দিয়েই শেষ হয়ে যায়।

২১. বিয়ের 'কুফু'

'কুফু'-এর সংজ্ঞা

কুফু হলো সমতা ও সাদৃশ্যতা। বিয়েতে কুফুর অর্থ হলো, মর্যাদা, সামাজিক অবস্থান এবং চারিত্রিক ও আর্থিক মানে স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের সমান হবে। পুরুষের মর্যাদা ও অবস্থান যখন স্ত্রীর মর্যাদা ও অবস্থানের সমান হবে, তখন তা যে দাম্পত্য জীবনের সাফল্য নিশ্চিত করতে অধিকতর সহায়ক এবং তার ব্যর্থতা রোধে অধিকতর কার্যকর হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

'কুফু' সম্পর্কে শরিয়তের বিধান

এই 'কুফু' সম্পর্কে শরিয়তের নির্দেশ কি এবং তা কতোখানি আমল দেয়া হবে? এ প্রশ্নে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইবনে হাযম বলেছেন : 'কুফু'র কোনোই গ্রহণযোগ্যতা নেই। তিনি বলেন : যে কোনো মুসলমান, যদি সে ব্যভিচারী না হয়, যে কোনো মুসলিম নারীকে যদি সে ব্যভিচারিণী না হয়, বিয়ে করতে পারে। মুসলমানরা সবাই ভাই ভাই। একজন অজ্ঞাত কূলশীলা কৃষ্ণাঙ্গ মহিলার ছেলের জন্য হাশেমি খলিফার মেয়ে বিয়ে করা নিষিদ্ধ নয়। আর চরম পাপিষ্ঠ মুসলমান, যদি সে ব্যভিচারী না হয় তবে চরম পাপিষ্ঠা মুসলিম নারীর জন্য 'কুফু'ধারী, যদি সে ব্যভিচারিণী না হয়।

এর প্রমাণ সূরা হুজুরাতের ১০নং আয়াত : إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ.. "মুমিনীরা সবাই ভাই ভাই" এবং সূরা নিসার ৩নং আয়াত : "তোমাদের যে মহিলাকে ভালো লাগে বিয়ে করো"এবং নিষিদ্ধ মহিলাদের বিবরণ দেয়ার পর সূরা নিসার ২৪নং আয়াতে আল্লাহই বলেন : "এবং ঐ সকল মহিলা ব্যতিত সবাই তোমাদের জন্য হালাল।"

রসূলুল্লাহ সা. যয়নবকে তাঁর মুক্ত গোলাম যায়দের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। আর মিকদাদের বিয়ে দিয়েছিলেন যাবায়া বিনতে যুবাইরের সাথে। ইবনে হাযম বলেন : পাপিষ্ঠ পুরুষ ও পাপিষ্ঠা মেয়ে সম্পর্কে আমি যা বলেছি, তার আলোকে ফাসেক বা পাপিষ্ঠ পুরুষের পক্ষে পাপিষ্ঠা মেয়ে ব্যতিত অন্য কাউকে বিয়ে করা অনুমোদনযোগ্য নয়। অনুরূপ, পাপিষ্ঠা মেয়েকে পাপিষ্ঠ পুরুষ ব্যতিত অন্য কারো বিয়ে করা অনুমোদনযোগ্য নয়।" অথচ একথা কেউ বলেনা। আল্লাহ বলেছেন :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ وقال سُبْحَانَهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ .

(মুমিনরা সবাই ভাই ভাই।" আল্লাহ আরো বলেছেন : "মুমিন নারী ও পুরুষ পরস্পরের বন্ধু ও ওলি।" (সূরা তওবা : আয়াত ৭১)

'কুফু' বা সমতা নির্ণিত হবে ন্যায়নিষ্ঠতা ও সচ্চরিত্র দ্বারা

অন্য একদল ওলামার মত হলো, 'কুফু' বা সমতা অবশ্যই বিবেচ্য বিষয়। তবে তা নির্ণিত হবে সততা ও সচ্চরিত্র দ্বারা। সুতরাং বংশ মর্যাদা, পেশা, ধনাঢ্যতা বা আর কোনো জিনিসের কোনো মূল্য নেই। কাজেই বংশমর্যাদাহীন একজন সৎ লোকের জন্য সম্ভ্রান্ত বংশীয়া মহিলাকে বিয়ে করা, নিচ জাতীয় পেশাজীবীর জন্য উচ্চ মর্যাদাশীলা মহিলাকে বিয়ে করা, খ্যাতিমান কোনো পুরুষের পক্ষে কোনো সুনামধারী ও মর্যাদাশালী মহিলাকে বিয়ে করা এবং দরিদ্র পুরুষের পক্ষে ধনাঢ্য মহিলাকে বিয়ে করা বৈধ যদি সে মুসলিম ও চরিত্রবান হয়। এ ব্যাপারে কোনো ওলির আপত্তি তোলার ও বিয়ে বিচ্ছেদ দাবি করার

অধিকার নেই। যদি সে বিয়ে সম্পাদনকারী ওলির মর্যাদার সাথে অসামঞ্জস্যশীল হয় এবং বিয়ে মহিলার সম্মতি অনুসারে সম্পাদিত হয়ে থাকে, তাহলেও ওলি বিচ্ছেদের দাবি করতে পারবেনা। তবে যদি পুরুষ সততার শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হয়, তবে সে একজন সৎকর্মশীলা নারীর 'কুফু' নয়। এরূপ ক্ষেত্রে সে যদি কুমারী হয় এবং তার পিতা তাকে ফাসেকের সাথে জোরপূর্বক বিয়ে দেয় তবে তার বিয়ে ভেংগে দেয়ার দাবি করার অধিকার থাকবে।

"বিদায়াতুল মুজতাহিদ" গ্রন্থে বলা হয়েছে : মালেকি মাযহাবে এ ব্যাপারে দ্বিমত নেই যে, কুমারী মেয়েকে যখন তার পিতা মদখোরের সাথে বিয়ে দেয় অথবা সার্বিকভাবে ফাসেক বা পাপিষ্ঠ, এমন কারো সাথে বিয়ে দেয়, তখন সে নিজেকে সেই বিয়ে থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারবে। এরূপ ক্ষেত্রে শাসক ব্যাপারটা দেখবে এবং উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবে। অনুরূপ, যখন হারাম সম্পদের মালিকের সাথে তাকে বিয়ে দেয় কিংবা ঘন ঘন তালাক দেয়ার জন্য কসম খায় এমন ব্যক্তির সাথে বিয়ে দেয়, তখনও সে নিজেকে বিয়ে থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারবে। এই মাযহাবের ফকীহগণের প্রমাণাদি নিম্নরূপ :

১. আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ○

"হে মানব, আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা যাতে পরস্পরে পরিচিত হতে পার, সেজন্য তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা আল্লাহভীরু, সে-ই সর্বাপেক্ষা সম্মানীত।" (সূরা হুজুরাত : আয়াত ১৩)।

এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, সৃষ্টির দিক দিয়ে এবং মানবীয় মূল্য ও মর্যাদার দিক দিয়ে সকল মানুষ সমান এবং মানুষের প্রাপ্য ও আল্লাহর প্রাপ্য পরিশোধের মাধ্যমে সর্বোচ্চ খোদাভীরুতার প্রমাণ দেয়া ব্যতিত কেউ কারো চেয়ে বেশি সম্মানিত নয়।

২. তিরমিযি আবু হাতেম মাযানী থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "যখন এমন কেউ তোমাদের নিকট (বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে যার চরিত্র ও দীনদারি তোমাদের নিকট সন্তোষজনক, তখন তার সাথে তোমরা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করো। তা যদি না করো, তবে পৃথিবী বিরাট ফেতনা ও ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়বে। লোকেরা বললো : হে রসূলুল্লাহ, যদি তার মধ্যে অন্য কোনো জিনিস থাকে। তিনি তিনবার বললেন : দীনদারি ও সততা তোমাদের কাছে সন্তোষজনক এমন কেউ যদি তোমাদের নিকট আসে, তাহলে তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করো।" এ হাদিসে ওলি বা অভিভাবকদের বলা হয়েছে যেন তাদের অধীনস্থ মেয়েদেরকে দীনদার, সৎ ও চরিত্রবান প্রার্থীদের সাথে বিয়ে দেয়। আর যদি সচ্চরিত্র লোকদের সাথে বিয়ে না দেয় এবং বংশমর্যাদা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, পদমর্যাদা ও ধনসম্পদের প্রতি প্রলুব্ধ হয়, তাহলে এত ফেতনা ও ফ্যাসাদ জড়াবে, যার কোনো শেষ নেই।

৩. রসূলুল্লাহ সা. বললেন : হে বনু বিয়াযা, তোমরা আবু হিন্দের সাথে তোমাদের মেয়ের বিয়ে দাও. বিয়ে দাও।" আবু হিন্দ ছিলো বনু বিয়াযার মুক্ত গোলাম ও একজন ক্ষৌরকার।

সে ঐ গোত্রের বংশোদ্ভূত কেউ ছিলনা। মায়ালিমুস সুনান গ্রন্থে বলা হয়েছে : ইমাম মালেক ও অন্য যারা তার মত বিশ্বাস করেন যে, একমাত্র দীনদারির দিক দিয়েই সমতা দেখতে হবে, অন্য কোনো দিক দিয়ে নয়, তাদের জন্য এ হাদিসে অকাট্য প্রমাণ রয়েছে।

৪. রসূলুল্লাহ সা. যায়দ বিন হারেসার সাথে যয়নব বিনতে জাহাশকে বিয়ে দেয়ার প্রস্তাব দেন। কিন্তু যয়নব ও তার ভাই আব্দুল্লাহ এ প্রস্তাব অস্বীকার করেন। কারণ একে তো তিনি সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশীয়, তদুপরি তিনি রসূলুল্লাহ সা.-এর ফুফাতো বোন। তার মাতা আব্দুল মুত্তালিব কন্যা উমাইমা। অপরদিকে যায়দ ছিলো ক্রীতদাস। তখন এ আয়াত নাযিল হলো :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ط وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا○

অর্থ : কোনো মুমিন নারী ও পুরুষের অধিকার নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যখন কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন তারা তাতে নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রসূলের নাফরমানী করবে, সে সুস্পষ্ট গোমরাহিতে লিপ্ত হবে।" (সূরা আহযাব : আয়াত ৩৬)

এ আয়াত নাযিল হবার পর তার ভাই আব্দুল্লাহ রসূলুল্লাহ সা. কে বললেন : আমাকে যা ইচ্ছা আদেশ করুন। অতপর তিনি যয়নবকে যায়দের সাথে বিয়ে দিলেন।

৫. আবু হুযায়ফা সালেমকে ওলিদ বিন উতবার কন্যা হিন্দের সাথে বিয়ে দেন। তিনি ছিলেন জনৈকা আনসারী মহিলার মুক্ত গোলাম।

৬. বিলাল বিন রাবাহকে আবদুর রহমান বিন আওফের বোনের সাথে বিয়ে দেয়া হয়।

৭. আলী রা.কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল 'কুফু'ধারীদের বিয়ে সম্পর্কে। তিনি বললেন : মানুষ যখন ঈমান আনে ও ইসলাম গ্রহণ করে, তখন তারা আরব হোক, অনারব হোক, কুরাইশী হোক বা হাশেমী হোক, সবাই পরস্পরের 'কুফু'ধারী। অর্থাৎ সবাই সমান ও পরস্পরের সমকক্ষ। এটা মালেকি মাযহাবের মত। শওকানি বলেছেন : উমর রা. ইবনে মাসউদ রা., মুহাম্মদ ইবনে সিরীন, উমর ইবনে আব্দুল আযীয ও ইবনুল কাইয়েম বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা.-এর ফায়সালা যে দাবি জানায়, তা হলো, দীনদারিতে পূর্ণাঙ্গ ও মৌলিক সমতা রক্ষা করা চাই। সুতরাং কোনো মুসলিম নারীর বিয়ে কাফেরের সাথে এবং কোনো সতী নারীর বিয়ে পাপাচারীর সাথে হতে পারেনা। কুরআন ও সুন্নাহ 'কুফু' বা সমতার ব্যাপারে এর বাইরে আর কোনো জিনিসকে হিসাবে ধরেনি। মুসলিম সতী নারীর জন্য নোংরা ব্যভিচারী পুরুষকে বিয়ে করা হারাম করেছে। এ ক্ষেত্রে বংশীয় কৌলিন্য, পেশা, ধনসম্পদ, ইত্যাদিকে কোনো হিসাবে ধরেনি। একজন ক্রীতদাস যদি চরিত্রবান মুসলমান হয়, তবে একজন ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত বংশীয় নারীকে বিয়ে করা তার জন্য সম্পূর্ণ বৈধ। অকুরাইশী পুরুষরা কুরাইশী মহিলাদেরকে অহাশেমী পুরুষরা হাশেমী মহিলাদেরকে এবং দরিদ্র পুরুষরা ধনী মহিলাদেরকে অবাধে বিয়ে করতে পারে।" -যাদুল মায়াদ, ৪/২২।

ইতিপূর্বে মালেকি ও অ-মালেকি যেসব ফকিহর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তারা সবাই একমাত্র সততা ও দীনদারিকেই 'কুফু'র গ্রহণযোগ্য উপাদান বলে মনে করেন। অন্যান্য ফকিহগণও সততা ও দীনদারিকে 'কুফু'র গ্রহণযোগ্য উপাদান মনে করেন এবং তারা এও

মনে করেন যে, ফাসেক পুরুষ সতী নারীর জন্য 'কুফু' বা সমকক্ষ নয়। তবে তারা শুধু এই দুটি বিষয়েই 'কুফু'কে সীমিত করার পক্ষপাতি নন। তারা মনে করেন, আরো কিছু বিষয় এমন রয়েছে, যাতে কুফু বা সমকক্ষতা রক্ষা করা আবশ্যক।

কুফুর অন্যান্য উপাদান

এক, বংশীয় কুফু : যেমন আরবরা একে অপরের 'কুফু' এবং কুরাইশ বংশীয়রা একে অপরের 'কুফু'। অনারব পুরুষ আরব মহিলার এবং অকুরাইশী আর কুরাইশী মহিলার 'কুফু' গণ্য হবেনা। এর প্রমাণ নিম্নে দেয়া গেল :

হাকেম ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "আরবরা পরস্পরের কুফু। এক গোত্র অপর গোত্রের, এক উপগোত্র অপর উপগোত্রের এবং এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির 'কুফু'। তবে তাঁতী বা ক্ষৌরকার একে অপরের 'কুফু' নয়।

মুয়ায ইবনে জাবাল থেকে বাযযায বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আরবরা পরস্পরের 'কুফু'। মুক্ত গোলামরা পরস্পরের 'কুফু'।

উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : আমি অবশ্যই অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত মহিলাদের বিয়ে 'কুফু' ব্যতিত হতে দেবনা।" -দার কুতানি।

ইবনে উমর রা. বর্ণিত উপরোক্ত হাদিস সম্পর্কে ইবনে আবি হাতেম তার পিতাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : এটা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন হাদিস। দারু কুতনি বলেন : এটা সহীহ নয়। ইবনে আব্দুল বার বলেন : এটা জাল ও মনগড়া। মুয়ায বর্ণিত হাদিসটিও বিতর্কিত। প্রকৃত ব্যাপার হলো, কুফু ও বংশীয় সমকক্ষতার গ্রহণযোগ্যতার কোনো প্রমাণ হাদিস থেকে পাওয়া যায়নি। শাফেয়ি ও হানাফি ফকিহগণ উপরোক্ত পন্থায় বংশীয় সমকক্ষতার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে দ্বিমত প্রকাশ করেননি। তবে তারা কুরাইশীদের মধ্যে ভেদাভেদ নিয়ে দ্বিমত প্রকাশ করেছেন। হানাফি ফকিহদের মতে কুরাইশীরা হাশেবমীদের কুফু বা সমকক্ষ। [নাযার বিন কিনানার বংশধররা কুরাইশী, হাশেম বিন আব্দ মানাফের বংশধর হাশেমী এবং নাযারের উপরে একজন পূর্ব পুরুষ যাদেরকে একত্রিত করেছিলেন তারা আরব নামে পরিচিত] শাফেয়িদের বিশুদ্ধমতানুসারে কুরাইশীরা হাশেমী ও মুত্তালেবিদের কুফু নয়। তাদের প্রমাণ ওয়াসেলা বিন আসকা' বর্ণিত হাদিস। রসূল সা. বলেছেন : আল্লাহ ইসমাইলের বংশধরের মধ্য থেকে কিনানাকে, কিনানার বংশধর থেকে কুরাইশকে, কুরাইশ থেকে বনু হাশেমকে এবং বনু হাশেম থেকে আমাকে বেছে নিয়েছেন। তাই আমি শ্রেষ্ঠদের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ তাদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ।" (মুসলিম)

হাফেয ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে বলেছেন : বনু হাশেম ও বনুল মুত্তালিবকে অন্যদের উপর অগ্রাধিকার দেয়াই সঠিক। এছাড়া আর সবাই পরস্পরের কুফু। কিন্তু প্রকৃত সত্য এর বিপরীত। কেননা রসূলুল্লাহ সা. তার দুই মেয়েকে উসমান রা.-এর সাথে এবং যয়নবকে আ'স বিন রবীর সাথে বিয়ে দেন। এরা দু'জনই আবদ শামস গোত্রের লোক। অপরদিকে ইল্‌ম অর্থাৎ ইসলামী জ্ঞান গরিমার মর্যাদা সকল বংশীয় ও অন্যান্য কৌলিন্যের উপরে। একজন আলেম যে কোনো মহিলার জন্য কুফু, তা সে যতো বড় সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েই হোক না কেন এবং উক্ত আলেমের বংশ পরিচয় যতোই অজ্ঞাত হোক না কেন। কেননা রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনির মতো মানুষও খনি। তাদের মধ্যে যারা জাহেলি যুগে শ্রেষ্ঠ ছিলো, ইসলামী জ্ঞান অর্জনের পর তারা ইসলামেও শ্রেষ্ঠ হবে।"

আর আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন :

.... يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ○

"আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও জ্ঞান অর্জন করেছে, তাদের মর্যাদা বহুগুণ বাড়িয়ে দেন।" (সূরা মুজাদালা : আয়াত-১১)

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

"বলো, যারা জ্ঞানী ও যারা অজ্ঞ তারা কি সমান হয়।" (সূরা যুমার : আয়াত ১০)।

এ হলো আরবদের প্রসঙ্গ। অনারবদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, "তাদের মধ্যে বংশীয় অভিজাত্যের সমকক্ষমতা গ্রহণযোগ্য নয়।"

আর শাফেয়ি ও তার অধিকাংশ শিষ্যদের মতে, আরবদের মতো তাদের মধ্যেও বংশীয় সমকক্ষতা গ্রহণযোগ্য। কেননা তাদের মধ্যে কোনো মহিলা তার চেয়ে নিম্নস্তরের বংশের পুরুষকে বিয়ে করলে লোকেরা তাকে লজ্জা দেয়। তাই একই কারণ বিদ্যমান থাকায় তাদের বিধি আরবদের বিধির মতোই।

দুই, স্বাধীনতা : একজন দাস একজন স্বাধীন মহিলার জন্য 'কুফু' বা সমকক্ষ নয়। আর মুক্ত গোলাম জন্মগতভাবে স্বাধীন মহিলার কুফু বা সমকক্ষ নয়। অনুরূপ, যার পিতৃপুরুষদের কোনো একজনও গোলাম ছিলো, সে যে মহিলাকে বা তার কোনো পিতৃপুরুষকে গোলামী স্পর্শ করেনি, তার কুফু নয়। কেননা স্বাধীন মহিলা কোনো গোলামের বা যার পূর্বপুরুষ গোলাম ছিলো তার স্ত্রী হলে সেটা তার লজ্জা ও কলঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

তিন, ইসলাম : পূর্ব পুরুষদের মুসলমান হওয়ার দিক দিয়ে কুফু হতে হবে। এটা অনারবদের জন্যে গ্রহণযোগ্য, আরবদের মধ্যে নয়। কারণ আবরা তাদের বংশীয় কৌলিন্য নিয়ে গর্ব করাকেই যথেষ্ট মনে করে। তারা তাদের পূর্ব পুরুষদের মুসলমানত্ব নিয়ে গর্ব করেনা। পক্ষান্তরে অনারবরা তাদের পূর্ব পুরুষদের মুসলমানত্ব নিয়ে গর্ববোধ করে। অনুরূপ, যখন মহিলা মুসলমান হয় এবং তার বাবা-দাদারাও মুসলমান হয়, তখন যে মুসলিম পুরুষের বাপ বা দাদা মুসলমান ছিলনা, সে তার কুফু নয়। যে মহিলার একজন পূর্ব পুরুষ মুসলমান ছিলো, একজন পূর্ব পুরুষ মুসলমান ছিলো এমন পুরুষ তার কুফু। যার শুধু বাপ ও দাদা মুসলমান ছিলো, সে বহু পূর্ব পুরুষ মুসলমান ছিলো এমন মহিলার জন্য কুফু। কেননা মহিলাদের পরিচয় তাদের বাবা ও দাদা দ্বারাই পূর্ণ হয়ে যায়। এর চেয়ে বেশি থাকলে তা ধর্তব্য নয়। আবু ইউসুফের মতে, একজন পূর্ব পুরুষ মুসলমান ছিলো এমন পুরুষ বহু পূর্ব পুরুষ মুসলমান ছিলো এমন মহিলার জন্য কুফু। কেননা তার মতে, বাবার দ্বারাই পরিচয় পূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু আবু হানিফা ও মুহাম্মদের মতে, বাবা ও দাদা ব্যতিত পরিচয় পূর্ণতা লাভ করেনা।

চার, পেশা : সম্মানজনক পেশাধারী পরিবারের মেয়ের জন্য নিম্নতর শ্রেণীর পেশাজীবী পরিবারের পুরুষ কুফু নয়। আর যদি উভয় পরিবারের পেশা কাছাকাছি ধরনের সম্মানজনক হয়, তাহলে বিদ্যমান পার্থক্য ধর্তব্য নয়। পেশার সম্মানজনক ও অসম্মানজনক হওয়ার মাপকাঠি সামাজিক রীতি প্রথা। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বা এলাকায় একটা পেশা সম্মানজনক বিবেচিত হতে পারে, আবার অন্য সময়ে বা এলাকায় তা অসম্মানজনক

বিবেচিত হতে পারে। যারা পেশাভিত্তিক 'কুফু'র প্রবক্তা, তারা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হাদিস : "আরবরা পরস্পরের কুফু, কেবল দর্জি ও ক্ষৌরকার ব্যতিত" দ্বারা প্রমাণ দর্শান। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেছেন : এ হাদিস অনুসারেই সমাজ চলে।

আল মুগনী গ্রন্থে বলা হয়েছে : "ইমাম আহমদ বুঝাতে চেয়েছেন, এটাই সমাজের প্রচলিত রীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা সম্ভ্রান্ত পেশাজীবীরা তাদের মেয়েদেরকে নিম্ন স্তরের পেশাজীবীদের, যেমন দর্জি, চামড়া প্রক্রিয়াজাতকারী, ঝাড়ুদার, পরিচ্ছন্নতাকর্মী ইত্যাদির সাথে বিয়ে দেয়াকে তাদের জন্য অসম্মানজনক মনে করে। সমাজে এ বিষয়টি প্রকাশ করার রেওয়াজও চালু রয়েছে এবং একে বংশীয় আভিজাত্যের পরিপন্থী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এটা শাফেয়ি, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদের মত এবং এক বর্ণনা অনুসারে আবু হানিফা ও আহমদেরও মত। আবু ইউসুফ থেকে বর্ণিত অপর একটি মত হলো, অত্যধিক অসম্মানজনক না হলে এটা ধর্তব্য নয়।

পাঁচ, ধনসম্পদ : এটিকে বিবেচনা করা হবে কিনা তা নিয়ে শাফেয়িদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ বলেন, বিবেচনা করা হবে। তাদের মতে, দরিদ্র ব্যক্তি ধনাঢ্য মহিলার জন্য কুফু নয়। কেননা সামুরা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : ধনসম্পদে আভিজাত্য আর খোদাভীরুতায় মহত্ত্ব"। তারা এ যুক্তিও দেন যে, দরিদ্র ব্যক্তির জীবন ধারণ ব্যয় ধনাঢ্য মানুষের জীবন ধারণ ব্যয়ের চেয়ে কম। অন্যেরা বলেন : ধনসম্পদের আভিজাত্য কুফুর ক্ষেত্রে বিবেচ্য নয়। কেননা ধনসম্পদ কোনো স্থিতিশীল জিনিস নয়। আর গুণীজন ও মহানুভব লোকেরা ধনসম্পদ নিয়ে গর্ব করেনা। কবি বলেন : "অভাব ও দারিদ্র্য নিয়েও আমরা যুগ যুগ কাল স্বাচ্ছন্দে বেঁচে রয়েছি। মহাকাল আমাদের সবাইকে দারিদ্র্য ও অভাব- উভয়ের পেয়ালা দিয়ে পান করিয়েছে। আমাদের ধনসম্পদ যেমন কোনো আত্মীয়ের উপর আমাদের ঔদ্ধত্য বাড়িয়ে দেয়নি, তেমনি দারিদ্র্য আমাদের আভিজাত্যকে কিছুমাত্র হেয় করেনি।"

হানাফিদের নিকট ধনসম্পদ কুফুতে বিবেচ্য ও ধর্তব্য। এখানে ধর্তব্য শুধু এতটা ধনসম্পদের মালিক হওয়া যাতে মোহরানা ও খোরপোষ দেয়া সম্ভব হয়। যে ব্যক্তি এই উভয়টি বা এর কোনো একটি দিতে পারেনা, সে 'কুফু' বলে গণ্য হবেনা। মোহরানা দ্বারা বুঝতে হবে সমাজে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী যে পরিমাণ তাৎক্ষণিকভাবে দিতে হয়। কেননা এর অতিরিক্ত যেটুকু, তা সাধারণত পরে দিতে হয়। আবু ইউসুফের মতে, কেবল খোরপোষ দেয়ার সামর্থ্য থাকলেই 'কুফু' গণ্য হবে, মোহরানা দেয়ার সামর্থ্য জরুরি নয়। কেননা এতে রেয়াত দেয়ার প্রচলন রয়েছে। এ ব্যাপারে স্বামীর বাবার সচ্ছলতা ও সামর্থ্যকেই স্বামীর সামর্থ্য গণ্য করা হয়।

ইমাম আহমদ থেকে বর্ণিত একটি মত অনুসারে ধনসম্পদ 'কুফু' হওয়ার ক্ষেত্রে বিবেচ্য ও প্রয়োজনীয়। কেননা ধনাঢ্য নারীর জন্য তার স্বামীর দারিদ্র্য ক্ষতিকর। কেননা তাতে তার নিজের ভরণ পোষণ ও তার সন্তানদের জীবন ধারণ ব্যাহত হবে। তাছাড়া দারিদ্র্যকে সামাজিকভাবে একটা খুঁত হিসেবে গণ্য করা হয়। বংশীয় আভিজাত্য নিয়ে যেমন লোকেরা প্রতিযোগিতা করে, সম্পদের আধিক্য নিয়েও লোকেরা প্রতিযোগিতা করে।

ছয়, দৈহিক ও মানসিক খুঁত থেকে মুক্ত হওয়া : শাফেয়ি ও মালেকি ফকিহগণ খুঁতমুক্ত হওয়াকে কুফু'র শর্ত বলে উল্লেখ করেছেন। যে পুরুষের এমন খুঁত রয়েছে, যা বিয়ে

বাতিল করার যোগ্য, তার জন্য এ ধরনের খুঁত থেকে মুক্ত মহিলা 'কুফু' নয়। আর যদি খুঁত বিয়ে বাতিল করার মতো গুরুতর না হয়, তবে ঘৃণা বা বিরক্তি সৃষ্টি করে, যেমন বন্ধ্যাত্ব, অঙ্গ কর্তিত বা বিকৃত হওয়া ইত্যাদি, তাহলে সে ক্ষেত্রে দু'রকমের মতামতই রয়েছে। তবে রুয়ানীর মতে, এ ধরনের খুঁত যুক্ত ব্যক্তি তার জীবন সাথীর জন্য 'কুফু' নয়। হানাফি ও হাম্বলিগণ এটিকে কুফুর শর্ত গণ্য করেননি।

আল মুগনিতে রয়েছে : খুঁতমুক্ত হওয়া কুফুর জন্য শর্ত নয়। কেননা খুঁত থাকলে বিয়ে বাতির হয় না- এ ব্যাপারে সবাই একমত। এটা মহিলাকে বিয়ে প্রত্যাখ্যান করার স্বাধীনতা দান করে, কিন্তু তার ওলিকে তা দান করেনা। কেননা এর ক্ষতি কেবল মহিলার সাথেই সংশ্লিষ্ট। তবে ওলি তার অধীনস্থকে পাগল, কুষ্ঠরোগী বা বিকলাঙ্গকে বিয়ে করতে বাধা দিতে পারে।

'কুফু' কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

বিয়ের কুফু স্বামীর ব্যাপারে প্রযোজ্য, স্ত্রীর ব্যাপারে নয়। অর্থাৎ স্বামীকেই স্ত্রীর কুফু বা সমকক্ষ হতে হবে। এটা বিয়ের জন্য শর্ত। স্ত্রীকে স্বামীর 'কুফু' হতে হবে এটা শর্ত নয়। [হানাফিদের মতে, স্ত্রীর দিক থেকে কুফু হওয়া দুই অবস্থায় প্রযোজ্য : (১) যখন পুরুষ কোনো ব্যক্তিকে অনির্দিষ্টভাবে যে কোনো মহিলার সাথে তার বিয়ে দেয়ার জন্য উকিল নিযুক্ত করে। এ ক্ষেত্রে উকিল বা প্রতিনিধির বিয়ে সম্পাদন তার নিয়োগ কর্তার উপর কার্যকর। (২) যখন অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ের বিয়ে সম্পাদনকারী ওলি বাবা ছাড়া অন্য কেউ হয়, এরূপ ক্ষেত্রে বিয়ে সম্পাদনের শুদ্ধতার জন্য শর্ত এই যে, স্ত্রী যেন স্বামীর কুফু হয়, যাতে স্বামীর স্বার্থ ক্ষুণ্ন না হয়।]

এর প্রমাণ, প্রথমত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যার নিকট একজন দাসী থাকে এবং সে তাকে উত্তম শিক্ষা প্রদান করে ও তার সাথে উত্তম আচরণ করে, অতপর তাকে স্বাধীন করে দিয়ে বিয়ে করে, তার জন্য দ্বিগুণ প্রতিদান নির্দিষ্ট রয়েছে। -বুখারি, মুসলিম।

দ্বিতীয়ত, রসূলুল্লাহ সা. এর মর্যাদার সমকক্ষ কেউ ছিলনা। তথাপি তিনি আরবের বিভিন্ন গোত্রের মেয়ে বিয়ে করেছেন। এমনকি তিনি সাফিয়া বিনতে হুয়াইকেও বিয়ে করে, তখন তাকেই এবং তার অভিভাবকদেরকেই সচরাচর অপমান সহ্য করতে হয়। অপরদিকে সম্ভ্রান্ত স্বামীর স্ত্রী যদি খারাপ ও তার চেয়ে নিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন হয়, তবে তাকে সাধারণত লজ্জা দেয়া হয়না।

'কুফু' পাওয়া স্ত্রী ও তার অভিভাবকদের অধিকার

অধিকাংশ ফকিহর মতে, 'কুফু' তথা সমমানের স্বামী পাওয়া স্ত্রী ও তার ওলিদের অধিকার। তাই ওলির জন্য বৈধ নয়, তার অধীনস্থ মেয়েকে তার ও অন্য সকল ওলির সম্মতি ব্যতিরেকে বিনা কুফুতে বিয়ে দেয়া। কেননা বিনা কুফুতে বিয়ে দেয়া তাদের অবমাননা ও অপমানের শামিল। তাই এটা তাদের সকলের সম্মতি ব্যতিরেকে জায়েয নয়। মহিলা ও তার ওলি সম্মতি দিলে বিয়ে বৈধ হবে। কেননা তাদের অসম্মতিই এ পথে বাধা ছিলো। যখন তারা সম্মতি দিল, তখন বাধা দূর হলো। শাফেয়ি ফকিহগণ বলেন : যে ওলি আর্থিক ব্যয়ভার বহন করে, 'কুফু'র অধিকার তারই প্রাপ্য। ইমাম আহমদ বলেন, এটা সকল ওলির অধিকার, চাই দূরের হোক বা কাছের হোক। যে ওলি সম্মতি দেবেনা, তার বিয়ে বাতিল করার ক্ষমতা থাকবে। আহমদ থেকে আরেকটি মত বর্ণিত হয়েছে।

তাতে বলা হয়েছে, 'কুফু' আল্লাহর হক। স্ত্রী ও তার ওলিরা যদি 'কুফু'বিহীন বিয়েতে রাযী হয়ও, তবু তাদের রাযী হওয়া শুদ্ধ নয়। তবে এই মতটির ভিত্তি হলো, 'কুফু' শুধু ধর্মের ব্যাপারেই বিবেচ্য অন্য কোনো ব্যাপারে নয়। একটি বর্ণনা থেকে তার এই মত জানা গেছে।

'কুফু' কখন বিবেচ্য?

'কুফু' কেবল আক্দ সম্পাদনের সময়ই বিবেচ্য। আক্দ হয়ে যাওয়ার পর যদি জানা যায়, কোনো এক দিক দিয়ে 'কুফু' রক্ষিত হয়নি। তাহলে তাতে কোনো ক্ষতি হবেনা এবং তা আক্দের উপর কোনো প্রভাব ফেলবেনা। কেননা বিয়ের শর্তাবলী আকদের সময়ই বিবেচনায় নিতে হয়। বিয়ের সময় যদি স্বামী একটা ভদ্র পেশায় প্রতিষ্ঠিত থাকে। অথবা স্ত্রীর ভরণ পোষণে সক্ষম থেকে থাকে কিংবা সৎ লোক থেকে থাকে। কিন্তু পরে পরিস্থিতি পাল্টে যায়, ফলে সে কোনো নিম্ন পর্যায়ের পেশা অবলম্বন করে, অথবা ভরণ পোষণে অক্ষম হয়ে পড়ে, অথবা বিয়ের পরে অসৎ ও ফাসেক হয়ে যায়, তবে আক্দ বহাল থাকবে। কেননা সময় পরিবর্তনশীল এবং মানুষের অবস্থা সব সময় এক রকম থাকেনা। স্ত্রীকে বাস্তবতা মানতেই হয় এবং ধৈর্য ও খোদাভীতির পথ আঁকড়ে ধরে রাখতে হয়। (কোনো মেয়েকে যদি তার ও তার ওলির সম্মতি ছাড়াই 'কুফু'বিহীন বিয়ে দেয়া হয়, তবে কারো কারো মতে, বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে। আবার কারো কারো মতে, বিয়ে শুদ্ধ হবে, কিন্তু মহিলার তা বাতিল করার অধিকার থাকবে। এটা শাফেয়ি মাযহাবের মত। হানাফিদের মত অভিভাবকত্ব সংক্রান্ত আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে।)

২২. দাম্পত্য অধিকার

যখন আক্দ বিশুদ্ধভাবে সম্পন্ন হয়, তখন তার যথাবিহিত ফল বাস্তব রূপ লাভ করে এবং তার দাবি অনুযায়ী স্বামী-স্ত্রীর অধিকারগুলো অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। এই অধিকারগুলো তিন রকমের :

১. স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার ২. স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার ৩. উভয়ের যৌথ অধিকার।

স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন দাম্পত্য জীবনের সুখ, মানসিক শান্তি ও তৃপ্তি নিশ্চিত করে। নিম্নে এসব অধিকারের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া যাচ্ছে :

স্বামী ও স্ত্রীর যৌথ অধিকারসমূহ

১. যৌন সম্ভোগ : যৌথ সম্ভোগ এবং স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের পরস্পরকে তৃপ্তি সহকারে উপভোগ করার বৈধতা। অর্থাৎ স্বামীর জন্য স্ত্রীর কাছ থেকে যে যৌন আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করা বৈধ, স্ত্রীর জন্যও স্বামীর কাছ থেকে সেই যৌন আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করা বৈধ। পরস্পরকে এভাবে ভোগ করা ও একে অপর দ্বারা দৈহিক মিলনের সুখ লাভ করা স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের অধিকার। এ অধিকার উভয়ের একত্রে অংশগ্রহণ ও পারস্পরিক সহযোগিতা ব্যতিত অর্জন করা সম্ভব নয়। কেননা যৌন মিলন একাকী হতে পারেনা।

২. দাম্পত্য সম্পর্কজনিত অবৈধতা : স্বামীর পিতা, দাদা, পুত্র, পৌত্র ও দৌহিত্রের জন্য স্ত্রী চিরতরে অবৈধ। অনুরূপ স্বামীও স্ত্রীর মা, মেয়ে, পৌত্র ও দৌহিত্রের জন্য চিরতরে হারাম।

৩. আক্দ সম্পন্ন হওয়া মাত্রই স্বামী স্ত্রী উভয়ে উভয়ের উত্তরাধিকারী হয়। বিয়ের পর সহবাস ছাড়াও যদি দু'জনের কেউ মারা যায়, তবে অপরজন তার উত্তরাধিকারী হবে।

৪. স্বামীর বিছানায় যে সন্তান জন্ম নেবে, তা ঐ স্বামীর বংশধর হিসেবে স্বীকৃত হবে।

৫. দম্পতি পরস্পরের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করবে, যাতে উভয়ের মধ্যে পূর্ণ শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বজায় থাকে। আল্লাহ্ সূরা নিসার ১৯নং আয়াতে বলেন :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ "তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করো"

স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার

স্বামীর নিকট স্ত্রীর অবশ্য প্রাপ্য অধিকারগুলো নিম্নরূপ :

১. আর্থিক অধিকার : যথা মোহর ও খোরপোষ।

২. অন্যান্য অধিকার : যথা একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মধ্যে সুবিচার এবং স্ত্রীর কোনো ক্ষতি না করা। এর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো :

২৩. মোহর

ইসলাম নারীর প্রতি যে মহানুভবতা ও সম্মান প্রদর্শন করেছে, তার একটি হলো, সে তাকে তার অধিকার আদায় ও হস্তগত করার ক্ষমতা দিয়েছে। জাহেলিয়াতের যুগে তার কোনো অধিকার ছিলনা। এমনকি তার অভিভাবক তার নিজস্ব সম্পত্তি পর্যন্ত যথেচ্ছা ভোগ দখল করতো, তাকে তার মালিকানা হস্তগত করার সুযোগও দিতোনা, তা ব্যবহারও করতে দিতনা। ইসলাম তার উপর থেকে এইসব যুলুম দূর করে এবং তার জন্য মোহর ধার্য করে। মোহরকে একান্তভাবে স্ত্রীর পাওনা গণ্য করে। তার পিতা বা কোনো ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়কেও তার সম্মতি ব্যতিত তার কাছ থেকে কিছু নেয়ার অনুমতি দেয়নি। আল্লাহ্ বলেন :

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ط فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ○

"তোমরা স্ত্রীদেরকে সন্তুষ্ট চিত্তে তাদের মোহর দিয়ে দাও। তবে তারা খুশি হয়ে মোহরের কিছু অংশ ছেড়ে দিলে তা তোমরা সানন্দে তৃপ্তির সাথে ভোগ করো।" (সূরা নিসা : ৪)

অর্থাৎ স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর তাদের প্রাপ্য জিনিস হিসেবে কোনো বিনিময় ছাড়াই দাও। তারা কোনো রূপ বল প্রয়োগ, লজ্জা, দ্বিধা ও ধোঁকা প্রতারণা ছাড়া মোহরের মালিকানা লাভ করার পর তা থেকে যদি কিছু তারা দেয়, তবে তা নির্দ্বিধায় ভোগ করতে ও গ্রহণ করতে পারো। এতে কোনো গুনাহ নেই। কিন্তু যদি স্ত্রী তার সম্পদের কোনো অংশ লজ্জায়, ভয়ে বা প্রতারণার কারণে দেয়, তবে তা গ্রহণ করা হালাল হবেনা। আল্লাহ্ বলেন :

وَإِنْ أَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ لا وَّ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ط أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَّإِثْمًا مُّبِينًا○ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَّ أَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا○

অর্থ : আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও এবং তাদের একজনকে প্রচুর অর্থও দিয়ে থাকো, তবু তা থেকে কিছুই ফেরত নিওনা। তোমরা কি তা মিথ্যা অপবাদ ও পাপাচারের মাধ্যমে গ্রহণ করবে? কিরূপে তোমরা তা গ্রহণ করবে, অথচ তোমরা একে অপরের সাথে সঙ্গম করেছ এবং সে নারীরা তোমাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছে?" (সূরা নিসা : আয়াত ২০-২১)

স্ত্রীর জন্য ধার্য করা এই মোহর একদিকে যেমন তার অর্থনৈতিক স্বত্বাধিকারের স্বীকৃতি দেয়, তেমনি তা তার মনকে পরিতুষ্ট করে এবং তার উপর স্বামীর কর্তৃত্বের অধিকার ও ক্ষমতাকে মেনে নিতে উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহ্ বলেন :

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّ بِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ

"পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল, কারণ আল্লাহ্ তাদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং পুরুষেরা নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে থাকে।" (নিসা : ৩৪)

সেই সাথে এ দ্বারা উভয়ের সম্পর্ক মজবুত হয় এবং মায়ামমতা গভীরতর হয়।

মোহরের পরিমাণ

ইসলামী শরিয়ত মোহরের কোনো সীমা নির্ধারণ করেনি। কেননা মানুষের দারিদ্র্য ও ধনাঢ্যতার মান বিভিন্ন রকমের। তাদের সচ্ছলতা ও অনটনের স্তরেরও রকমফের রয়েছে। আবার প্রত্যেক পক্ষেরই নিজস্ব কৃষ্টি আদত অভ্যাস ও ঐতিহ্য সংস্কৃতি রয়েছে। তাই সীমা নির্ধারণ না করে প্রত্যেকের নিজ নিজ সাধ্য ও ক্ষমতার উপর ছেড়ে দিয়েছে। প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থা ভেদে এবং নিজ নিজ গোত্রের রীতি প্রথার আলোকে তা স্থির করে নেবে। এ সংক্রান্ত সকল ভাষ্য এবং ইংগিতই দেয় যে, স্থায়ী মূল্য আছে এমন কিছুই মোহর হিসেবে দেয়া উচিত। চাই তা কম হোক বা বেশি হোক। একটা ধাতব আংটি, কিংবা এক ঝুড়ি খোরমা কিংবা কুরআনের কোনো শিক্ষাও মোহর হিসেবে দেয়া যেতে পারে যদি তাতে উভয় পক্ষ একমত হয়।

আমের বিন রবিয়া থেকে বর্ণিত, বনু ফাযারার জনৈক মহিলা এক জোড়া জুতাকে মোহর হিসেবে গ্রহণ করে বিয়ে করে। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন : তুমি কি এক জোড়া জুতার বিনিময়ে নিজেকে সমর্পণ করতে সম্মত হয়েছ? সে বললো : হ্যাঁ। রসূলুল্লাহ্ সা. তাকে অনুমতি দিলেন।" -আহমদ ইবনে মাজাহ, তিরমিযি।

সাইল বিন সা'দ থেকে বর্ণিত, জনৈক মহিলা রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট এলো এবং বললো : হে রসূলুল্লাহ্, আমি নিজেকে আপনার নিকট সমর্পণ করলাম। এরপর সে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে রইল। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো : হে রসূলুল্লাহ্! এই মহিলার যদি আপনার প্রয়োজন না থাকে, তবে ওকে আমার সাথে বিয়ে দিন। রসূল সা. বললেন : ওকে মোহর দেয়ার মতো কিছু তোমার কাছে আছে কি? সে বললো : আমার কাছে আমার এই লুঙ্গী ছাড়া আর কিছু নেই। রসূলুল্লাহ সা. বললেন, তুমি যদি তোমার লুঙ্গী ওকে দিয়ে দাও, তাহলে তুমি তো বিনা লুঙ্গিতেই বসে থাকবে। কাজেই অন্য কিছু যোগাড় করে নিয়ে এসো। সে বললো : আমি আর কিছু পাইনা। রসূল সা. বললেন : খুঁজে দেখো, এমনকি লোহার একটা আংটিও যদি পাও। অতপর সে খুঁজলো। কিন্তু কিছুই পেলনা। রসূল সা. বললেন : তোমার কাছে কি কুরআনের কিছু আছে? সে বললো : জ্বি, অমুক সূরা। রসূল সা. বললেন : ঠিক আছে, তোমার যেটুকু কুরআন জানা আছে, তার (সেটুকু শিক্ষা দানের) বিনিময়ে তোমাদের দু'জনের বিয়ে সম্পাদন করলাম। (বুখারি, মুসলিম)। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল সা. বিশটি আয়াত স্থির করলেন।

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, আবু তালহা উম্মে সুলাইমকে বিয়ের প্রস্তাব দিলো। উম্মে সুলাইম বললেন : আল্লাহর কসম, আপনার মতো লোককে প্রত্যাখ্যান করা যায়না। কিন্তু আপনি

কাফের আর আমি মুসলমান। আপনাকে বিয়ে করা আমার জন্য বৈধ নয়। তবে আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন, তবে সেটাই আমার মোহর। এ ছাড়া আমি আপনার কাছে আর কিছু চাইনা। অতপর ওটাই তার মোহর হলো।

এসব হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়, যে কোনো সামান্য জিনিসকেও মোহর হিসেবে ধার্য করা যায়। এমনকি কোনো সেবামূলক কাজকেও মোহর হিসেবে ধার্য করা যায়। কুরআন শিখানোও একটা সেবামূলক কাজ। হানাফি ফকিহগণ ন্যূনতম মোহর স্থির করেছেন দশ দিরহাম, আর মালেকিরা স্থির করেছন তিন দিরহাম। তবে এই ন্যূনতম মোহর ধার্যকরণের কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই। হাফেয ইবনে হাজার বলেছেন, ন্যূনতম মোহর সম্পর্কে বেশ কিছু হাদিস পাওয়া গেছে। কিন্তু তার কোনোটিই সহীহ সাব্যস্ত হয়নি। উল্লিখিত হাদিসগুলোর পর্যালোচনা করতে গিয়ে ইবনুল কাইয়েম বলেছেন : আবু তালহা ইসলাম গ্রহণ করলে তা দ্বারা যে উপকার পাওয়া যাবে, তাকেই উম্মে সুলাইম মোহর হিসেবে মেনে নিয়েছেন এবং তার বিনিময়ে তিনি নিজেকে তার নিকট সমর্পণ করতে প্রস্তুত হয়েছেন। এটা তার নিকট স্বামীর অর্থ সম্পদের চেয়েও প্রিয়। বস্তুত মোহর স্ত্রীর উপকারের জন্যই তার প্রাপ্য হিসেবে ধার্য হয়েছে। সে যখন ইসলামের জ্ঞান ও দীনদারিতেই সম্মত হয়ে গেলো এবং স্বামীর কুরআন পড়া ও ইসলাম গ্রহণেই রাযী হলো, তখন এটা হয়ে গেলো শ্রেষ্ঠ মোহর। এটা হলো সবচেয়ে উপকারী মোহর। কাজেই এখানে মোহরবিহীন আক্‌দ হয়নি। এর সাথে তিন দিরহাম বা দশ দিরহামকে মোহর ধার্য করার কোনো তুলনা হয়না।

যে মহিলা রসূল সা.-এর নিকট নিজেকে সঁপে দিয়েছিল। এটি তারও সমপর্যায়ের নয়। আর ঐ মহিলার ব্যাপারটা ছিলো একান্তভাবেই রসূল সা.-এর সাথে নির্দিষ্ট। কেননা সে নিজেকে রসূল সা.-এর নিকট সঁপে দেয়ার সময় কোনো ওলি বা মোহরেরও তোয়াক্কা করেনি। অথচ এখন আমরা যে বিয়ে শাদি করে থাকি, তাতে ওলিও থাকে। মোহরও থাকে যদিও সে মোহর এমন কোনো ধনসম্পদ নয় যার মূল্য মুদ্রার মাধ্যমে নির্ণয় করা যায়। বস্তুত এ ক্ষেত্রে মহিলা স্বামী কর্তৃক তাকে কুরআন শিখানোর কাজকে সম্পদের বিকল্প হিসেবে মেনে নিয়েছে। কেননা এ দ্বারা সে উপকৃত হবে। সে নিজেকে ঐ মহিলার ন্যায় মোহরাবিহীনভাবে সঁপে দেয়নি এবং তার কোনো দ্রব্যসামগ্রী উপহার দেয়ার মতো করে নিজেকে উপহার দেয়নি। এ হলো উপরে বর্ণিত হাদিসগুলোর সার নির্যাস। কেউ কেউ এ মতের বিরোধিতা করে বলেছেন; মোহর অবশ্যই সম্পদ হতে হবে। কোনো সেবা বা উপকার দ্বারা মোহর আদায় হবে না। স্বামীর বিদ্যা বা শিক্ষাদান আবু হানিফা ও আহমদের মতে, মোহর হিসেবে গণ্য হবে না। ইমাম আবু হানিফার মতে, দশ দিরহামের কমে এবং মালেকের মতে তিন দিরহামের কমে মোহর আদায় হবেনা। এ ব্যাপারে আরো কিছু মতামত রয়েছে, যার সপক্ষে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস এবং কোনো ইমাম বা ফকিহর উক্তি নেই। যারা উপরোক্ত হাদিসগুলো সম্পর্কে দাবি করেন যে, তা শুধু রসূল সা.-এর জন্য নির্দিষ্ট অথবা তা রহিত বা মানসূখ হয়ে গেছে, অথবা মদিনাবাসীর বাস্তব কার্যকলাপ এর বিপরীত, তাদের এসব দাবির পক্ষে কোনোই প্রমাণ নেই। তাছাড়া ফিকহের মূলনীতি এসব দাবির বিপক্ষে। মদিনাবাসীর শীর্ষ নেতা বিশিষ্ট তাবেয়ী সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব তাঁর মেয়েকে মাত্র দুই দিরহামে বিয়ে দিয়েছিলেন। অথচ কেউ এর বিরোধিতা করেনি বরং এটা তাঁর মহৎ গুণ ও মহানুভবতা বলে স্বীকৃত হয়েছে। আব্দুর

রহমান বিন আওফ পাঁচ দিরহাম মোহরের বিনিময়ে বিয়ে করেছেন এবং রসূল সা. তা বহাল রেখেছেন। বস্তুত মোহরের পরিমাণ ধার্য করা শরিয়ত প্রণেতা আল্লাহ ও রসূল সা. ব্যতিত আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। মোহরের পরিমাণ বাড়াতে চাইলে তার কোনো সীমা নির্ধারিত নেই। বর্ণিত আছে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মিম্বরে দাঁড়িয়ে চারশো দিরহামের চেয়ে বেশি মোহর ধার্য করতে নিষেধ করেছিলেন। এরপর তিনি মিম্বর থেকে নামমাত্র জনৈকা কুরাইশী মহিলা তার কাছে আসেন এবং প্রতিবাদ করে বলেন, আপনি কি কুরআনের এ আয়াত পড়েননি- "যদি তোমরা তোমাদের কোনো স্ত্রীকে বিপুল পরিমাণ সম্পদও দিয়ে থাকো, তবে তার কোনো অংশ ফেরত নিওনা" (সূরা নিসা) উমর রা. তৎক্ষণাত বললেন, "হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করো। সবাই উমরের চেয়ে বেশি ফিকহ জানে।" তারপর তিনি মসজিদে ফিরে গেলেন এবং মিম্বরে আরোহণ করে বললেন, "আমি তোমাদেরকে চারশো দিরহামের চেয়ে বেশি মোহর দিতে নিষেধ করেছিলাম। এখন বলছি, যে কোনো ব্যক্তি তার সম্পদ থেকে যতো খুশি দিতে পারে।" (সাঈদ বিন মানসুর, আবু ইয়ালী) আব্দুল্লাহ ইবনে মুসয়াব রা. থেকে বর্ণিত, উমর রা. বলেছেন, "চল্লিশ উকিয়া স্বর্ণের চেয়ে বেশি মোহর দিওনা। যে ব্যক্তি এর বেশি দেবে, তার অতিরিক্ত মোহর বাইতুল মালে জমা করা হবে।" জনৈকা মহিলা বললেন, "এটা করার অধিকার আপনার নেই।" তিনি বললেন, কেনঃ সে বললো, কারণ আল্লাহ বলেছেন : "যদি তোমরা বিপুল পরিমাণ অর্থও দিয়ে থাকো, তবে তা ফেরত নিওনা।" উমর রা. বললেন, "একজন মহিলা সঠিক কথা বলতে পারলো, আর একজন পুরুষ ভুল করে ফেললো।"

মোহরের পরিমাণ অত্যধিক বাড়ানো মাকরূহ

মোটকথা, ইসলাম যতো বেশি সংখ্যক পারা যায় নারী ও পুরুষের বিয়ের সুযোগ সৃষ্টি করতে উদগ্রীব, যাতে সবাই হালাল উপায়ে বিপরীত লিঙ্গকে সম্ভোগ করতে পারে। কিন্তু এ কাজটিকে সহজ ও সুলভ করে দেয় এমন উপায় হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত তা সম্ভব নয়। বিয়ের কাজটি এতটা সহজ হওয়া দরকার যাতে সমাজের বৃহত্তম অংশ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পক্ষে এটি সহজসাধ্য হয়। কারণ বেশি অর্থ ব্যয় করা তাদের পক্ষে খুবই কষ্টকর। তাই ইসলাম মোহরের পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত বাড়ানোকে অপছন্দ করেছে এবং জানিয়েছে, মোহর যতো কম হবে, বিয়ে ততোই কল্যাণকর ও বরকতময় হবে। আর মোহর কম হওয়া নারীর সৌভাগ্যের ব্যাপার। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "যে বিয়েতে যতো কম ব্যয় সে বিয়ে ততোই বরকতময়।" তিনি আরো বলেছেন, "নারীর সৌভাগ্য তার মোহর কম হওয়ায়, বিয়ে সহজ হওয়ায় এবং চরিত্র মাধুর্যে নিহিত। আর তার দুর্ভাগ্য তার মোহরের পরিমাণ বৃদ্ধিতে, বিয়ের জটিলতায় ও চরিত্রের কদর্যতায়।" এসব শিক্ষা অনেকেরই অজানা, অনেকেই তার বিরুদ্ধাচরণে এবং জাহেলী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত। এই জাহেলি কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়ার কারণেই তারা মোহর নিয়ে দরকষাকষি করে এবং বরপক্ষ অনেক সম্পদ না দেয়া পর্যন্ত বিয়েতে রাযী হয়না। কনে পক্ষ বরপক্ষের নিকট এত বেশি অর্থ চায় যে, তা দিতে গিয়ে তাকে হিমশিম খেতে হয়। যেন নারী একটা বাণিজ্যিক পণ্য, যা নিয়ে দরকষাকষি করা যায়। এই কু-প্রথা সামাজিক সমস্যার জন্ম দিয়েছে। নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ বিয়ে থেকে সৃষ্ট সমস্যায় নিরন্তর ভুগছে। এক কথায় বলা যায়, এর ফলে বিয়ের বাজারই মন্দা হয়ে গেছে এবং সমাজে

হালালের চেয়ে হারাম কাজ সহজ হয়ে গেছে।

নগদ মোহর ও বাকী মোহর

মোহর আকদের সময় নগদও দেয়া যায়, বিলম্বেও দেয়া যায়। অংশবিশেষ নগদ এবং অপর অংশ বিলম্বে দিতে চাইলে তাও দেয়া যায়। এটা নির্ভর করে জনগণের রীতিপ্রথা ও অভ্যাসের উপর। তবে অন্তত একাংশ তাৎক্ষণিকভাবে দেয়া মুস্তাহাব। কেননা ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেছেন, "রসূলুল্লাহ সা. ফাতেমাকে কিছু না দিয়ে তার সাথে বাসর করতে আলী রা. কে নিষেধ করেছিলেন। আলী রা. বললেন, "আমার তো কিছুই নেই। রসূল সা. বললেন, "তোমার সেই হুতামি বর্মটা কোথায়?" তখন আলী রা. সেই বর্মটি ফাতেমাকে দিলেন। -আবু দাউদ, নাসায়ী, হাকেম।

পক্ষান্তরে আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ্ আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেনে, আয়েশা রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সা) জনৈকা মহিলাকে তার স্বামীর সাথে কোনো প্রকার মোহর দেয়ার আগেই বাসর ঘরে ঢুকিয়ে দিতে আমাকে আদেশ করেছিলেন।" এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়, স্বামী মোহরের কোনো অংশ দেয়ার আগেও স্ত্রী তার বাসর ঘরে যেতে পারে। আর ইবনে আব্বাসের হাদিস প্রমাণ করে যে, মোহরের অন্তত অংশবিশেষ না দিয়ে বাসর করতে না দেয়া মুস্তাহাব।

আওযায়ি বলেছেন : মোহরের অংশবিশেষ না দিয়ে বাসর না করা উত্তম মনে করা হতো। যুহরি বলেছেন, সুন্নত থেকে আমরা জেনেছি, অন্তত কিছু খোরপোষ না দিয়ে কোনো পুরুষের নব পরিনীতা স্ত্রীর সাথে বাসর করা অনুচিত। এটা মুসলমানদের রীতি ছিলো।

তবে মোহরের অংশ তাৎক্ষণিকভাবে দেয়ার শর্ত আকদে ছিলো, সেটা যদিও সহবাসের আগেই দিতে আদালত থেকে হুকুম দেয়া হতো, কিন্তু তা তাৎক্ষণিকভাবে না দিলেও স্ত্রীর সাথে সহবাস করার অধিকার স্বামীর রয়েছে, আর স্ত্রীরও কর্তব্য স্বামীর নিকট নিজেকে সঁপে দেয়া এবং সহবাস করতে বাধা না দেয়া।

ইবনে হাযম বলেছেন, যে ব্যক্তি মোহর ধার্য করে বা ধার্য না করে বিয়ে করেছে, তার সহবাস করার অধিকার রয়েছে, চাই স্ত্রীর তা পছন্দ হোক বা না হোক। আর স্বামীকে তার ধার্য করা মোহর দেয়ার আদেশ দেয়া হবে, চাই তা তার পছন্দ হোক বা না হোক। তবে এ জন্য তাকে সহবাসে বাধা দেয়া যাবেনা। তাকে আকদের পর অবিলম্বেই সহবাস করার অনুমতি দেয়া হবে এবং তাকে স্ত্রীর জন্য মোহরও অবিলম্বেই দিতে বাধ্য করা হবে। তার কাছে যা কিছুই পাওয়া যায় তা থেকেই মোহর আদায় করা হবে। যদি পূর্বাহ্নে মোহর ধার্য না করা হয়ে থাকে, তাহলে মোহর মিছল দিতে আদেশ দেয়া হবে। তবে স্বামী স্ত্রী উভয়ে যদি তার চেয়ে কমে বা বেশিতে সম্মত হয়, তাহলে সেটাই দিতে হবে। আবু হানিফা বলেছেন, বিলম্বিত মোহরে বিয়ে করলে স্ত্রীর সাথে সহবাস করার অধিকার স্বামীর রয়েছে, চাই স্ত্রী তা পছন্দ করুক বা না করুক। কেননা স্ত্রী নিজেই মোহর বিলম্বিত করতে সম্মত হয়েছে। তাই এতে স্বামীর সহবাসের অধিকার রহিত হতে পারেনা। আর যদি সমস্ত মোহর অথবা তার একাংশ নগদ প্রদানের শর্ত থেকে থাকে তাহলে যতোটুকু ত্বরিত প্রদানের শর্ত রয়েছে, ততোটুকু না দেয়া পর্যন্ত সহবাস করা স্বামীর জন্য বৈধ হবেনা। যতোটুকু মোহর ত্বরিত প্রদানের শর্ত সর্বসম্মতভাবে আরোপ করা হয়েছে, তা না দেয়া

পর্যন্ত স্ত্রীরও সহবাস করতে না দেয়ার অধিকার রয়েছে।

ইবনুল মুনযির বলেন, যে সকল আলেমের নাম আমাদের জানা আছে, তারা সবাই একমত, প্রদেয় মোহর না দেয়া পর্যন্ত স্বামীকে সহবাস করতে না দেয়ার অধিকার স্ত্রীর রয়েছে। আল মুহাল্লা গ্রন্থের লেখক এই মতটির পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন, কোনো মুসলমানের এ ব্যাপারে দ্বিমত নেই যে, বিয়ের আক্দ সম্পন্ন হওয়ার মুহূর্ত থেকেই তারা উভয়ে স্বামী ও স্ত্রী। তাই উভয়ে উভয়ের জন্য হালাল। মোহর বা অন্য কিছু স্ত্রীকে না দেয়া পর্যন্ত সহবাস করতে যে ব্যক্তি বাধা দেয়, সে আল্লাহ ও রসূলের পক্ষ থেকে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা ছাড়াই স্বামী ও স্ত্রীর মিলনে অন্তরায় হয়।

কিন্তু আমরা যা বলেছি, সেটাই প্রকৃত সত্য কথা। তা হলো, স্ত্রীর সাথে সহবাসেও স্বামীকে বাধা দেয়া যাবেনা। স্বামীর কাছে প্রাপ্য মোহর থেকেও কেউ স্ত্রীকে বঞ্চিত করতে পারবেনা। স্ত্রী পছন্দ করুক বা না করুক, স্বামী তার সাথে সহবাস করতে পারবে এবং স্বামীর যা কিছু সম্পদ আছে, তা থেকেই স্ত্রীর মহর আদায় করা হবে, চাই তা স্বামীর পছন্দ হোক বা না হোক। রসূল সা.-এর পক্ষ থেকে এই মর্মে হাদিস বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, "প্রত্যেক হকদারকে তার হক দাও।"

যেসব অবস্থায় সম্পূর্ণ মোহর দেয়া ওয়াজিব

নিম্নে বর্ণিত অবস্থাগুলোর যে কোনোটি দেখা দিলেই সম্পূর্ণ মোহর দেয়া বাধ্যতামূলক :

১. যখন প্রকৃত অর্থে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যৌন মিলন ঘটে : কেননা আল্লাহ বলেছেন : "আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে ইচ্ছা করো এবং তাদের একজনকে প্রচুর অর্থও দিয়ে থাকো, তবুও তা থেকে কিছুই ফেরত নিওনা। তোমরা কি তা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপাচারের মাধ্যমে ফেরত নেবে? কিভাবে তোমরা তা ফেরত নেবে? অথচ তোমরা পরস্পরে সংগম করেছ এবং সে নারীরা তোমাদের কাছ থেকে কঠোর অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে? (সূরা নিসা : আয়াত ২০, ২১)

২. স্বামী স্ত্রীর কোনো একজন যদি যৌন মিলনের পূর্বেই মারা যায়। এটা সর্বসম্মত মত।

৩. আবু হানিফার মতে, স্বামী যখন তার বধূর সাথে যৌন মিলন করা যায় এমন নিভৃত সাক্ষাতে মিলিত হয়, তখনই নির্ধারিত পুরো মোহর বধূর পাপ্য হয়ে যায়। এই নিভৃত সাক্ষাতকার দ্বারা উভয়ের এমন জায়গায় সাক্ষাৎ করা বুঝায় যেখানে তাদের উপস্থিতি কেউ টের পাবে না মর্মে উভয়ে নিশ্চিত থাকে। তাদের দু'জনের কেউ এমন অবস্থার শিকার থাকেনা যা শরিয়ত অনুযায়ী যৌন মিলনের অন্তরায়। যেমন কোনো একজন ফরয রোযা রেখেছে, অথবা মাসিক ঋতুস্রাব চলছে কিংবা এমন কোনো বাধা রয়েছে যা অতিক্রম করা কার্যত অসম্ভব। যেমন এমন কোনো রোগে আক্রান্ত যার কারণে বর্তমানে যৌন মিলন সম্ভব নয়। অথবা কোনো স্বাভাবিক বাধা বিদ্যমান, যেমন তাদের দুইজনের মাঝে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির উপস্থিতি। ইমাম আবু হানিফা তার মতের সপক্ষে যে প্রমাণ তুলে ধরেছেন তা হলো : আবু উবায়দা যায়েদ ইবনে আবি আওফা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, খুলাফায়ে রাশেদীনের সিদ্ধান্ত ছিলো, যখন কক্ষের দরজা বন্ধ করা হয় এবং সতর খুলে ফেলা হয়। তখনই মোহর প্রাপ্য হয়ে যায়। ওয়াকী নাফে বিন জুবাইর থেকে বর্ণনা করেন : রসূল সা.-এর সাহাবিগণ বলতেন, যখন সতর খোলা হয় ও দরজা বন্ধ করা হয়,

তখনই মোহর পাওনা হয়ে যায়।

তাছাড়া, তিনি এ যুক্তিও প্রদর্শন করেন, যেহেতু স্ত্রীর পক্ষ থেকে নিজেকে পুরোপুরিভাবে সমর্পণ করা হয়েছে, সেহেতু এর বদলায় মোহর প্রাপ্য হবেই। ইমাম শাফেয়ী মালেক ও দাউদ এ মতের বিরোধিতা করে বলেন, সহবাস ব্যতিত পুরো মোহর প্রাপ্য হয়না।

তবে ইমাম মালেক বলেছেন, স্বামী যখন সংগমের উদ্যোগ নিয়ে স্ত্রীর উপর চড়াও হয় এবং স্ত্রী সহবাসের উপযুক্তভাবে শুয়ে পড়ে, তখন কার্যত সহবাস না করলেও মোহর প্রাপ্য হয়ে যায়।

সংগমের উপযুক্ত নিভৃত সাক্ষাতকার দ্বারা অর্ধেক মোহরের বেশি প্রাপ্য হয়না। কেননা আল্লাহ বলেছেন :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ .

"যদি তোমরা মোহর ধার্য করার পর স্ত্রীকে স্পর্শ করার আগে তালাক দাও, তবে যে মোহর তোমরা ধার্য করেছ তার অর্ধেক দিতে হবে।" (সূরা বাকারা : আয়াত ২৩৭)

অর্থাৎ স্পর্শের আগে তালাক দেয়া হলে ধার্যকৃত মোহরের অর্ধেক স্ত্রীর প্রাপ্য হবে। আর স্পর্শের অর্থ হলো প্রকৃত ও পূর্ণ যৌন মিলন। নিছক নিভৃতে সাক্ষাৎ করলেই যৌন মিলন হয়না। কাজেই সে ক্ষেত্রে পুরো মোহর প্রাপ্য হয়না।

শুরাইহ বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা কুরআনে কোনো দরজা বা সতরের উল্লেখ করেছেন বলে আমি শুনিনি। স্বামী যদি দাবি করে, সে স্ত্রীকে স্পর্শ করেছে, তবে তাকে অর্ধেক মোহর দিতে হবে। আর ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন, যখন কোনো পুরুষের নিকট তার স্ত্রী আসে, অতপর সে স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং দাবি করে, সে তাকে স্পর্শ করেনি, তখন তার উপর অর্ধেক মোহর ওয়াজিব হবে। আব্দুর রাজ্জাক ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, "স্ত্রীর সাথে সহবাস না করা পর্যন্ত পুরো মোহর স্বামীর নিকট প্রাপ্য হবেনা।"

অবৈধ বিয়েতে সহবাসের কারণে পূর্ণ মোহর পাপ্য

যখন কোনো পুরুষ বিয়ের পর স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, অতপর কোনো কারণে বিয়ে অবৈধ প্রমাণিত হয়, তখন পূর্ণ মোহর দেয়া ওয়াজিব হয়। কেননা আবু দাউদ বর্ণনা করেন: "বাসরা বিন আকসাম জনৈক কুমারী মেয়েকে বিয়ে করার পর তার সাথে সহবাস করার সময় দেখতে পায় সে গর্ভবতী। পরে সে যখন বিষয়টি রসূল সা.কে জানালো, তখন তিনি বললেন, তার সাথে তুমি সহবাস করেছ বিধায় সে মোহর পাবে।.... অতপর তিনি তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিলেন।

এ হাদিস থেকে জানা গেলো, অবৈধ বিয়েতে ও সহবাসের কারণে নির্ধারিত মোহর সম্পূর্ণই দিতে হবে। অনুরূপ এও জানা গেলো যে, বিয়ের পর ব্যভিচারজনিত গর্ভ ধরা পড়লে বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে।

মোহর নির্ধারণ ব্যতিরেকে বিয়ে :

মোহর ধার্যকরণ ছাড়া বিয়ে বৈধ বলে আলেমগণের অভিমত। কেননা আল্লাহ বলেছেন :

لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً .

"তোমাদের স্ত্রীদেরকে যদি সহবাস ছাড়াই কিংবা মোহর ধার্যকরণ ছাড়াই তালাক দাও তবে তাতে দোষ নেই।" (সূরা বাকারা : আয়াত ২৩৬)

যেহেতু বিয়ের পরে ব্যতিত তালাক হতে পারেনা, তাই আয়াত দ্বারা মোহর ধার্য ব্যতিত বিয়ের বৈধতা প্রমাণিত হলো। কিন্তু যদি কেউ মোহর ধার্য তো করলোই না তদুপরি শর্ত আরোপ করলো যে, সে মোহর দিতে বাধ্য নয়, তাহলে মালেকী মাযহাবের মতে এ বিয়ে অশুদ্ধ। ইবনে হাযম বলেন, "কেউ যদি শর্ত আরোপ করে যে, সে মোহর দিতে বাধ্য নয়, তাহলে সে বিয়ে বাতিল গণ্য হবে। কেননা রসূল সা. বলেছেন, আল্লাহর কিতাবে যে শর্তের উল্লেখ নেই তা বাতিল।" আর এ শর্ত কুরআনে নেই। বরং কুরআন এ শর্ত বাতিল করেছে এই বলে : "তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর সানন্দে দিয়ে দাও।" সুতরাং উল্লিখিত বিয়ে বাতিল ও অশুদ্ধ। কিন্তু হানাফিদের মতে, এ বিয়ে জায়েয। কেননা মোহর বিয়ের শর্তও নয়, রুকনও (অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ) নয়।

সহবাসের কারণে বা সহবাসের পূর্বে মৃত্যুর কারণে মোহরে মিছল ওয়াজিব

যখন স্বামী স্ত্রীর সাথে সহবাস করে কিংবা সহবাসের পূর্বে মারা যায় তখন স্ত্রীর মোহরে 'মিসল' ও উত্তরাধিকার প্রাপ্য হবে। কেননা আবু দাউদ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এরূপ অবস্থায় বলেছেন, "এক্ষেত্রে আমি নিজের মত ব্যক্ত করছি। যদি সঠিক হয়, তবে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। আর যদি ভুল হয়, তাহলে আমার পক্ষ থেকে। এরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রী অন্য একজন স্ত্রীর সমান মোহর পাবে। কমও নয়, বেশিও নয়। সে ইদ্দত পালন করবে এবং উত্তরাধিকারও পাবে।" তখন মা'কাল বিন ইয়াসার দাঁড়িয়ে বললেন : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, বারওয়া বিনতে ওয়াসিক সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সা. যে ফায়সালা করেছিলেন, আপনিও সেই রকম ফায়সালাই করেছেন।" এটা আবু হানিফা, আহমদ, দাউদ ও শাফেয়িরও অভিমত।

মোহরে মিছল কী?

মোহরে মিছল হচ্ছে সেই মোহর, যা কোনো স্ত্রীর বয়স, সৌন্দর্য, অর্থবিত্ত, বুদ্ধিমত্তা, ধর্ম, কুমারীত্ব, অ-কুমারীত্ব, বসবাসের স্থান এবং অন্য যেসব বৈশিষ্ট্যের কারণে মোহরের পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে, সেসব বৈশিষ্ট্যের কারণে আক্দের সময় তার সমকক্ষ মহিলাদের সমান মোহর পাওয়ার যোগ্য হয়। সন্তান থাকা ও না থাকাও এ ধরনের একটি বৈশিষ্ট্য। কেননা সাধারণত এসব বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতায় স্ত্রীর মোহরের মূল্য বিভিন্ন হয়। পৈতৃক আত্মীয়দের মধ্য থেকে যাদের সমকক্ষতা বিবেচনার যোগ্য তারা হচ্ছে স্ত্রীর বোন, ফুফু এবং চাচাতো ও ফুফাতো বোনেরা। আহমদ বলেছেন, মোহরে মিছল স্ত্রীর পিতুল ও মাতুল পক্ষের আত্মীয়দের সমান কিনা, তা দেখে বিচার করা হবে। আর যখন পিতুল পক্ষের এমন কোনো আত্মীয় মহিলা পাওয়া যাবেনা, যার সাথে ঐ মহিলার গুণবৈশিষ্ট্যের সাথে মিল রয়েছে, যার জন্য মোহরে মিছল নির্ধারণ করা হবে, তখন ঐ মহিলার পিতার পরিবারের সমকক্ষ কোনো পরিবারের অনাত্মীয় মহিলার সমান মোহরই মোহরে মিসল বিবেচিত হবে।

মোহরে মিসলের চেয়ে কম মোহরে অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ের বিয়ে

শাফেয়ি, দাউদ, ইবনে হাযম ও হানাফিদের মধ্য থেকে আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদের অভিমত হলো, মোহরে মিসলের চেয়ে কম মহরে অপ্রাপ্ত বয়স্কা কন্যাকে বিয়ে দেয়া পিতার জন্য বৈধ নয় এবং এ ক্ষেত্রে পিতার সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া বাধ্যতামূলকও নয়। তার মোহর অবশ্যই মোহরে মিসলের পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। কেননা মোহর একান্তভাবেই কন্যার অধিকার ও সম্পদ। তার সম্পদে তার পিতার সিদ্ধান্ত নেয়ার কোনো অধিকার নেই। আবু হানিফা বলেছেন, পিতা যখন তার অপ্রাপ্ত বয়স্কা কন্যার বিয়ে দেয় এবং তার মোহর কম নির্ধারণ করে, তখন তা কন্যার উপর কার্যকর ও বৈধ হবে। তবে পিতা ও দাদা ব্যতিত আর কারো জন্য এটা বৈধ হবেনা।

কখন অর্ধেক মোহর ওয়াজিব হয়?

আকদের সময় মোহরের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়ে থাকলে এবং সহবাসের আগে স্ত্রীকে তালাক দিলে স্বামীর উপর অর্ধেক মোহর ওয়াজিব হয়। কারণ আল্লাহ্ বলেছেন :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ○

অর্থ : আর যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার আগে তালাক দাও এবং এর আগেই এদের জন্য মোহর নির্ধারণ করে থাকো, তাহলে যা নির্ধারণ করেছ, তার অর্ধেক দিতে হবে। তবে (প্রাপ্ত বয়স্কা) স্ত্রীরা অথবা বিয়ের আকদ যার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, সে (স্বামী বা ওলি) ক্ষমা করে দিলে সেটা ভিন্ন কথা। তোমরা ক্ষমা করে দেবে এটাই তাকওয়ার নিকটতর। আর তোমরা নিজেদের মধ্যে মহানুভবতা দেখাতে ভুলে যেওনা। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করেন।" (সূরা বাকারা : আয়াত-২৩৭)

মাতা'র বাধ্যবাধকতা

স্বামী যখন সহবাসের আগে স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং ইতিপূর্বে কোনো মোহর নির্ধারণ না করে থাকে, তখন তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে তাকে কিছু খরচপত্র দেয়া ওয়াজিব। এটা এক ধরনের সৌজন্যপূর্ণ বিদায় দান। আল্লাহ বলেন, "অতপর হয় রীতি মোতাবেক রেখে দেবে, নচেত সৌজন্যের সাথে বিদায় করে দেবে।" (সূরা বাকারা : আয়াত ২২৯)

এ ব্যাপারে আলেমদের ঐকমত্য রয়েছে যে, যে মহিলার জন্য কোনো মোহর ধার্য হয়নি এবং তার সাথে সহবাসও সংঘটিত হয়নি, সে তালাকের পর মাতা' অর্থাৎ কিছু খরচপত্র ছাড়া কিছুই পাবেনা। এই মাতা'র ধরন ও পরিমাণ স্বামীর আর্থিক অবস্থাভেদে বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। এর কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই। আল্লাহ বলেন :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ○

"তোমরা যদি স্ত্রীদের কোনো মোহর নির্ধারণ ব্যতিরেকেই স্পর্শ করার আগে তালাক দাও, তবে তাতে দোষের কিছু নেই। এ ক্ষেত্রে তাদেরকে সমাজের প্রচলিত রীতিপ্রথা অনুযায়ী কিছু খরচপত্র দিয়ে দিও। এটা নির্ধারিত হবে সচ্ছল ব্যক্তির জন্য তার সামর্থ্য অনুযায়ী এবং অসচ্ছল ব্যক্তির জন্য তার সামর্থ্য অনুযায়ী। সৎকর্মশীলদের জন্য এটা একটা অবশ্য পালনীয় বিধান।" (সূরা বাকারা : আয়াত ২৩৬)

মোহর কখন রহিত হয়

সহবাসের পূর্বে স্ত্রীর পক্ষ থেকে বিচ্ছেদ সংঘটিত হলে স্বামীর উপর থেকে সমগ্র মোহরের দায় রহিত হয়ে যাবে এবং স্ত্রীকে এক কানাকড়িও তার দিতে হবেনা। স্ত্রীর পক্ষ থেকে বিচ্ছেদ সংঘটিত হওয়ার উদাহরণ, যেমন-সে ইসলাম ত্যাগ করলো, অথবা স্বামীর অসচ্ছলতা বা অন্য কোনো ক্রটির কারণে স্ত্রী বিয়ে ভেঙ্গে দিলো। অথবা, স্ত্রীর কোনো ক্রটির কারণে অথবা বয়োপ্রাপ্তির পর স্বাধীনতা পেয়ে স্বামী বা স্ত্রী বিয়ে ভেঙ্গে দিল ইত্যাদি। এরূপ ক্ষেত্রে কোনো খরচপত্রও প্রাপ্য হয়না। কেননা সে নিজেই এ অধিকার হাতছাড়া করেছে। তদ্রূপ সহবাসের পূর্বে স্ত্রী যদি স্বামীকে মোহরের দায় থেকে অব্যাহতি দেয় কিংবা তা তাকে দান করে দেয়, তাহলেও স্বামী মোহর থেকে অব্যাহতি পাবে। কেননা স্ত্রী নিজেই তার নিরংকুশ অধিকার ছেড়ে দিয়েছে।

আক্‌দের পর মোহরের পরিমাণ বাড়ানো

আবু হানিফা বলেছেন, স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে সহবাস করে থাকে অথবা মারা যায়, তাহলে আক্‌দের পর মোহরে যেটুকু বাড়াবে, তা কার্যকর হবে। সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে মোহরের বর্ধিত অংশ কার্যকর থাকবেনা, বরং তার উপর নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক মাত্র পাওনা থাকবে। মালেকের মতে, সহবাস করে থাকলে বর্ধিত মোহর কার্যকর হবে। আর সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে মূল মোহরের অর্ধেক সেই সাথে বর্ধিত মোহরের অর্ধেকও দিতে হবে। আর যদি সহবাসের পূর্বে ও প্রাপ্য অর্ধেক মোহর স্ত্রীর হস্তগত হওয়ার পূর্বে স্বামী মারা যায়, তাহলে সমগ্র মোহর বাতিল হবে এবং সে শুধু আকদের সময় যতোটুকু মোহর নির্ধারিত হয়েছে, ততোটুকুই পাবে। শাফেয়ির মতে, বর্ধিত মোহর একটা নবতর উপহার। তা হস্তগত করলে বৈধ, নচেত বাতিল। আহমদ বলেছেন, বর্ধিত মোহর মূল মোহরের বিধি অনুসারে বিবেচিত।

প্রকাশ্য মোহর ও গোপন মোহর

বিয়ের চুক্তি সম্পাদনকারী উভয় পক্ষ যখন গোপনে এক ধরনের মোহর এবং প্রকাশ্যে তার চেয়ে বেশি মোহর ধার্য করে, তারপর পরস্পরে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে আদালতের শরণাপন্ন হয়, তখন আদালত কিভাবে নিষ্পত্তি করবে? আবু ইউসুফ বলেছেন : তারা যে মোহর গোপনে একমত হয়ে ধার্য করেছিল সেটির পক্ষে আদালত রায় দেবে। কেননা ঐ মোহরই প্রকৃত ইচ্ছার প্রতিফলক এবং সেটাই চুক্তি সম্পাদনকারী পক্ষদ্বয়ের উদ্দেশ্য। অন্যরা বলেন, প্রকাশ্যে ধার্যকৃত মোহর কার্যকর হবে। কেননা সেটাই আকদে উল্লেখিত রয়েছে। গোপনে যা হয়েছে, তার জ্ঞান আল্লাহর নিকট। বিচার ফায়সালা কেবল প্রকাশ্য অবস্থার ভিত্তিতেই হয়। এটাই আবু হানিফা, মুহাম্মদ, আহমদ, আছুর, শা'বী, শাফেয়ি, ইবনে আবি লায়লা ও আবু উবায়েদের অভিমত।

মোহর হস্তগত করা

স্ত্রী যখন অপ্রাপ্ত বয়স্কা হয়, তখন তার মোহর হস্তগত করার অধিকার পিতার থাকে কারণ, তিনি তার সম্পত্তির অভিভাবক। তাই তিনি তার সম্পত্তি হস্তগত করতে পারেন, যেমন হস্তগত পারেন তার বিক্রি করা জিনিসের মূল্য হস্তগত করতে। আর যদি তার বাবা ও দাদা কেউ না থাকে, তবে তার সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়কের তার মোহর হস্তগত করার অধিকার থাকবে। তত্ত্বাবধায়ক উক্ত মোহর হস্তগত করার পর অভিভাবক আদালতে আমানত রাখবেন। সংশ্লিষ্ট আদালতের অনুমতি ব্যতিত তিনি তাতে হাত দিতে পারবেননা। পক্ষান্তরে বয়স্কা ও অকুমারী মেয়ে যদি পরিণত বুদ্ধিসম্পন্না হয়, তাহলে তার অনুমতি ব্যতিত তার মোহর হস্তগত করা যাবেনা। কেননা তার সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা কেবল তারই। তবে পিতা যদি তার উপস্থিতিতে মোহর হস্তগত করে এবং সে নীরব থাকে, তাহলে সেটি তার পক্ষ থেকে অনুমতি গণ্য হবে এবং স্বামী দায়মুক্ত হবে। আর কুমারী মেয়ে প্রাপ্ত বয়স্কা, সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্না ও পরিণত বুদ্ধিসম্পন্না হলে পিতা তার অনুমতি ব্যতিত তার মোহর হস্তগত করতে পারবেনা, যেমন পারে না অকুমারী মেয়ের মোহর হস্তাগত করতে। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন, পিতা তার বিনা অনুমতিতে তার মোহর হস্তগত করতে পারবে। কেননা এটাই প্রচলিত ও স্বীকৃত রীতি এবং কুমারী মেয়ে অপ্রাপ্ত বয়স্কার পর্যায়ভুক্ত।

২৪. যৌতুক

যৌতুক হচ্ছে সেসব সামগ্রী যা স্ত্রী ও তার পরিজনরা তার জন্য প্রস্তুত করে, যাতে স্বামীর বসবাসের সময় সেগুলো তার সাথে থাকে। সমাজে এটা একটা প্রচলিত ও স্বীকৃত প্রথা, স্ত্রী ও তার পরিবার যৌতুক প্রস্তুত করে ও কন্যার বাড়িকে আসবাবপত্রে দিয়ে সুসজ্জিত করে। এটা বাসর উপলক্ষে স্ত্রীর জন্য আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টির একটা পন্থা। নাসায়ী আলী রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. ফাতেমাকে এক সেট মূল্যবান পোশাক, একটা পানির মশক, সুগন্ধিযুক্ত উদ্ভিদ ইযখির দিয়ে বানানো বালিশ যৌতুক হিসেবে দিয়েছিলেন। এটা সমাজে প্রচলিত প্রথামাত্র। আইনী দিক দিয়ে বাড়িকে সুসজ্জিত করা এবং আসবাবপত্র, বিছানা, গৃহসামগ্রী ও যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস প্রস্তুত করার দায়িত্ব স্বামীর। স্ত্রীর উপর এসবের কোনো দায় দায়িত্বই নেই, চাই তার মোহর যতোই হোক না কেন। এমনকি গৃহসামগ্রী সংগ্রহের লক্ষ্যেই যদি মোহর বাড়িয়ে দেয়া হয়ে থাকে, তথাপি এটা স্ত্রীর দায়িত্ব নয়। কেননা মোহর স্ত্রীর দ্বারা যৌন কামনা চরিতার্থ করার বিনিময়স্বরূপ একচ্ছত্রভাবে তারই প্রাপ্য। দাম্পত্য জীবন যাপনের জন্য গৃহসজ্জার উপকরণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মোহর নয়। মোহর নিরংকুশভাবে স্ত্রীর হক। তার পিতার, স্বামীর এবং অন্য কারো এতে কোনো হক বা অধিকার নেই।

কিন্তু মালেকি মাযহাব মতে, মোহরে স্ত্রীর একচ্ছত্র অধিকার নেই। তাই তা থেকে নিজের জীবন যাপনের জন্য কিছু ব্যয় করা এবং তা থেকে তার ঋণ পরিশোধ করা তার জন্য জায়েয নেই। অবশ্য একান্ত প্রয়োজনে সে তা থেকে কিছু ব্যয় করতে পারে এবং মোহরের পরিমাণ বেশি হলে তা থেকে সামান্য কিছু ঋণও পরিশোধ করতে পারে।

স্ত্রীর ব্যক্তিগত ও নিরংকুশ প্রয়োজন পূরণে মোহরের অর্থ ব্যয় করা যাবেনা। কেননা প্রচলিত সামাজিক রীতি ও বিধি অনুসারে তার স্বামীর জন্য গৃহসজ্জা করা স্ত্রীর দায়িত্ব।

এই গৃহসজ্জা তাকে বাসরের পূর্বে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাপ্ত মোহরের অর্থ দিয়ে করতে হবে। তাৎক্ষণিকভাবে বাসরের পূর্বে মোহরের কোনো অংশ না পেলে এটা তার দায়িত্ব থাকবেনা। তবে শর্ত থাকলে বা প্রচলিত রীতি থাকলে বাসরের পরে পাওয়া মোহর দিয়েই গৃহসজ্জা করতে হবে।

পারিবারিক আইন প্রণেতাগণ এক্ষেত্রে ইমাম মালেকের মাযহাবকে অনুসরণ করেছেন। পারিবারিক আইনের ৬৬ নং ধারায় বলা হয়েছে : "বাসরের পূর্বে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাপ্ত মোহর দ্বারা ভারসাম্যপূর্ণভাবে নিজেকে প্রস্তুত করা ও সজ্জিত করা স্ত্রীর কর্তব্য, যতোক্ষণ অন্য কোনো বিষয়ে ঐকমত্য না হয়। কিন্তু মোহরের কোনো অংশ তাৎক্ষণিকভাবে না পেলে কোনো প্রস্তুতি ও সাজসজ্জার দায়িত্ব স্ত্রীর উপর থাকবে না। অবশ্য ঐকমত্য ও স্বীকৃত সমাজরীতি অনুযায়ী যা করা প্রয়োজন, সেটুকু করতে হবে।" -পারিবারিক আইন, ড. ইউসুফ মূসা, পৃ. ২১৪।

স্ত্রী যখন নিজের অর্থ দিয়ে গৃহসামগ্রী কিনবে, কিংবা তার পিতা তার জন্য কিনবে, তখন তা তার একচ্ছত্র ও নিরংকুশ সম্পত্তি। স্বামী বা অন্য কারো তাতে কোনো অধিকার থাকবেনা। তবে সে ইচ্ছা করলে স্বামীকে ও তার অতিথিদেরকে তা ব্যবহারের অনুমতি দিতে পারে। আবার ইচ্ছা করলে নাও দিতে পারে। না দিতে চাইলে তাকে বাধ্য করা যাবেনা। ইমাম মালেকের মতে, প্রচলিত রীতি মোতাবেক স্ত্রীর গৃহসামগ্রী ব্যবহার করা স্বামীর জন্য বৈধ।

২৫. স্ত্রীর জীবন যাপনের ব্যয় তথা ভরণপোষণ (নফকা)

জীবন যাপনের ব্যয় দ্বারা এখানে স্ত্রীর খাদ্য, বাসস্থান, সেবা ও চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহ করা বুঝানো হয়েছে। স্ত্রী নিজে ধনী হলেও স্বামীর নিকট এগুলো তার প্রাপ্য। কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা এটি অপরিহার্য তথা ওয়াজিব প্রমাণিত। কুরআন দ্বারা এটি ওয়াজিব প্রমাণিত হয় নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা :

১. মহান আল্লাহ বলেন :

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ط لَاتُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ○

"আর পিতার কর্তব্য হলো, মায়েদের যথাবিধি ভরণপোষণ করা। কাউকে তার ক্ষমতার অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করা হয়না।" (সূরা বাকারা : আয়াত ২৩৩)

এ আয়াতে 'যথাবিধি ভরণপোষণ' দ্বারা বুঝানো হয়েছে, শরিয়তের বিধি ও স্বীকৃত রীতি অনুযায়ী পর্যাপ্ত খাদ্য ও পোশাক যা প্রয়োজনের চেয়ে কমও নয়, বেশিও নয়।'

২. আল্লাহ আরো বলেন :

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ط وَاِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

অর্থ : তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেরূপ গৃহে তোমরা বাস করো, তোমারে তালাকপ্রদত্ত স্ত্রীদেরকেও সেরূপ গৃহে বাস করতে দাও। তাদেরকে বেকায়দায় ফেলার উদ্দেশ্যে উত্যক্ত করবেনা। আর যদি তারা গর্ভবতী হয়, তবে তাদের গর্ভের সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের ব্যয়ভার বহন করবে।" (সূরা তালাক : আয়াত ৬)

৩. আল্লাহ্ আরো বলেন :

لِيُنْفِقْ ذُوْسَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ط وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰهُ اللّٰهُ ط لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰهَا ○

অর্থ : বিত্তবান ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী ব্যয় করবে। আর যাকে সীমিত জীবিকা প্রদান করা হয়েছে, সে আল্লাহ্ তাকে যা দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ্ যাকে যা দিয়েছেন, তার চেয়ে বেশি বোঝা তিনি কারো উপর চাপান না।" (তালাক : আয়াত ৭)

সুন্নাহ্ বা হাদিস দ্বারা এটি ওয়াজিব প্রমাণিত হয় নিম্নোক্ত হাদিসসমূহ দ্বারা :

১. মুসলিম বর্ণনা করেন, রসূল সা. বিদায় হজ্জে বলেছেন :

فَاتَّقُوا اللّٰهَ فِى النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِكَلِمَةِ اللّٰهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللّٰهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذٰلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ، وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ○

অর্থ : নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। কেননা তোমরা তাদেরকে গ্রহণ করেছে আল্লাহর বাণী দ্বারা এবং তাদের সাথে যৌন মিলন বৈধ করেছ আল্লাহর বাণী দ্বারা। তাদের কর্তব্য, তারা যেন তোমরা পছন্দ করনা এমন কাউকে তোমাদের বিছানা মাড়াতে না দেয়। যদি মাড়াতে দেয়, তবে তাদেরকে এমন প্রহার করো, যা তাদের জন্য অনিষ্টকর হবেনা। সর্বাবস্থায় তাদের ভরণপোষণ বিধিসম্মতভাবে করা তোমাদের কর্তব্য।"

২. বুখারি ও মুসলিম আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেন : হিন্দ বিনতে উতবা বললো, হে রসূলুল্লাহ, আবু সুফিয়ান (আমার স্বামী) একজন ভীষণ কৃপণ লোক। আমি তার অজান্তে যা নেই, তাছাড়া সে আমাকে ও আমার সন্তানকে কিছুই দেয়না। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন, তোমার ও তোমার সন্তানের জন্য স্বীকৃত রীতি ও বিধি অনুযায়ী যতোটুকু যথেষ্ট ততোটুকু নিয়ে নাও।

৩. মুয়াবিয়া আল কুশাইরী রা. বলেন : আমি বললাম, হে রসূলুল্লাহ, আমাদের উপর আমাদের স্ত্রীদের কী কী অধিকার? তিনি বললেন, তুমি নিজে যখন খাবে, তখন তাকেও খাওয়াবে, নিজে যখন পোশাক পরবে, তখন তাকেও পরাবে, মুখের উপর মারবেনা, তাকে ভর্ৎসনা করতে হলে এবং সাময়িকভাবে সম্পর্ক বর্জন করতে হলে বাড়িতে রেখেই করবে।"

ইজমা দ্বারা এটি ওয়াজিব প্রমাণিত হয় এভাবে : ইবনে কুদামা বলেন, স্বামীরা যদি প্রাপ্ত বয়স্ক হয়, তবে তাদের স্ত্রীদের ভরণপোষণ করার দায়িত্ব তাদের উপর অর্পিত। এ ব্যাপারে আলেমগণ একমত। অবশ্য স্বামীর অবাধ্য স্ত্রীর ভরণপোষণ করা স্বামীর দায়িত্ব নয়। ইবনুল মুনযির প্রমুখ বলেন, এর মধ্যে এই শিক্ষাটা পাওয়া যায় যে, স্ত্রী স্বামীর কাছে অধীনস্থ। সে তাকে কাজ করা ও আয় রোজগার করা থেকে বিরত রাখে। কাজেই তার জীবন যাপনের ব্যয় নির্বাহ করা স্বামীর কর্তব্য।

ভরণপোষণ ওয়াজিব হওয়ার কারণ

শরিয়ত স্বামীর উপর স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব অর্পণ করেছে শুধু এজন্য যে, বিশুদ্ধ

বিয়ের আকদের দাবি অনুযায়ী স্ত্রী স্বামীর অধীনস্থ এবং তার দাবি ও অধিকারের নিকট আটক হয়ে থাকে, যাতে সে তাতে স্থায়ীভাবে ও সার্বক্ষণিকভাবে ভোগ করতে ও তার দ্বারা নিজের যৌন আবেগ চরিতার্থ করতে পারে। সে তার আনুগত্য করতে, তার বাড়িতে সর্বক্ষণ অবস্থান করতে, তার সংসার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করতে এবং তার সন্তানদের লালন পালন করতে বাধ্য। এর বিনিময়ে স্বামী তার সকল প্রয়োজন মেটাতে ও তার ভরণপোষণ করতে ততোক্ষণ বাধ্য, যতোক্ষণ তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক বহাল থাকে এবং কোনো অবাধ্যতা বা বিদ্রোহ এবং এমন কোনো কারণ না ঘটে, যা ভরণপোষণের অন্তরায়। এ ব্যাপারে প্রচলিত ও সর্বস্বীকৃত মূলনীতি হলো, "অন্যের অধিকার রক্ষার্থে ও সেবার্থে যাকে আটক করে রাখা হয়, তার ভরণপোষণের দায়িত্ব সেই ব্যক্তির উপর যে নিজ স্বার্থে তাকে আটক রাখে।"

ভরণপোষণের হকদার হওয়ার শর্তাবলী

ভরণপোষণের হকদার হওয়ার জন্য শর্তাবলী প্রযোজ্য :

১. বিয়ের আকদ সঠিক ও বিশুদ্ধ হওয়া চাই।

২. স্ত্রীর স্বামীর নিকট নিজেকে সমর্পণ করা চাই।

৩. স্বামীর সন্তুষ্টি অনুযায়ী স্ত্রীর স্বামীকে যৌন মিলন করতে দেয়া চাই।

৪. স্বামী যেখানে বাসস্থান স্থানান্তর করে যেতে চায়, সেখানে যেতে স্ত্রীর আপত্তি না করা চাই। (অবশ্য স্ত্রী যদি মনে করে স্বামী তার ক্ষতি সাধন করতে চায়, কিংবা স্থানান্তরে গেলে নিজের জানমালের নিরাপত্তা নিয়ে সে শংকিত হয়, তাহলে স্ত্রী অসম্মত হতে পারে।)

৫. উভয়ে যৌন মিলনে সক্ষম হওয়া চাই।

এসব শর্তের একটিও যদি অপূর্ণ থাকে তবে ভরণপোষণ দেয়া ওয়াজিব হবেনা। কেননা আকদ যদি বিশুদ্ধ না হয়, বরং অবৈধ বা অশুদ্ধ হয়, তাহলে তো স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ অনিবার্য ও ওয়াজিব হয়ে যায়, যাতে বিশৃংখলা ও বিপর্যয় রোধ করা যায়। অনুরূপ, স্ত্রী যদি স্বামীর নিকট নিজেকে সমর্পণ না করে, কিংবা নিজেকে উপভোগ করার সুযোগ স্বামীকে না দেয়, অথবা স্বামী যে জায়গায় যেতে চায় সেখানে যেতে স্ত্রী সম্মত না হয়, তাহলে এসব অবস্থায় স্ত্রীর ভরণপোষণ দিতে স্বামী বাধ্য নয়। কেননা স্ত্রীকে অবরুদ্ধ করে রাখা, যা ভরণপোষণ ওয়াজিব হওয়ার কারণ, তা এখানে অনুপস্থিত। যেমন বিক্রেতা যদি বিক্রিত পণ্য ক্রেতার নিকট হস্তান্তরে অসম্মত হয়, অথবা ক্রেতা যে জায়গায় ক্রয় করেছে, সে জায়গা বাদে অন্যত্র গিয়ে করতে চায়, তাহলে সে পণ্যের মূল্য পাওয়ার হকদার হয়না। তাছাড়া, রসূলুল্লাহ সা. আয়েশা রা.কে বিয়ে করার দু'বছর পর বাসর করেন, শুধু বাসর করার পর থেকেই তার ভরণপোষণ করেন এবং অতীত সময়ের ভরণপোষণ করা জরুরি মনে করেননি। স্ত্রী যদি এত কম বয়স্কা হয় যে, অত কম বয়স্কা মেয়ের সাথে সহবাস করা যায়না, অথচ সে স্বামীর নিকট নিজেকে সপে দিয়েছে, তাহলে মালেকী ও শাফেয়ী মাযহাব অনুসারে ভরণপোষণ করা ওয়াজিব হবেনা। কেননা যৌন মিলনের সুযোগ পুরোপুরিভাবে উপস্থিত নেই। তাই সে বিনিময়স্বরূপ ভরণপোষণের হকদান হবেনা। আর যদি স্ত্রী বয়স্কা এবং স্বামী অপ্রাপ্ত বয়স্ক হয়, তাহলে ভরণপোষণ ওয়াজিব হবে। কেননা স্ত্রী তার দিক থেকে তাকে ভোগ করার অনুমতি দিতে কসুর করেনি, কেবল স্বামীর দিক থেকে সুযোগ

গ্রহণ সম্ভব হয়নি। কাজেই ভরণপোষণ করা জরুরি। অনুরূপ, স্বামীর নিকট যদি স্ত্রী আত্মপমর্পণ করে এবং স্বামী বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রীকে ছেড়ে পালিয়ে যায়, তবে সে ক্ষেত্রেও ভরণপোষণ করা ওয়াজিব হবে। হানাফিদের নিকট যে মতটি কার্যকর তা হলো, স্বামী যদি অপ্রাপ্ত বয়স্কা স্ত্রীকে তার সাথে ঘনিষ্ঠ ও আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে নিজের বাড়িতে আটকে রাখে, তবে এই আটকাবস্থার উদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ থাকলেও এতে স্বামীর সম্মতি থাকার কারণে স্ত্রীর ভরণপোষণ করা তার উপর ওয়াজিব হবে। তবে সে যদি তাকে নিজের বাড়িতে আটকে না রাখে, তাহলে ভরণপোষণ ওয়াজিব হবেনা।

(এটা ইমাম আবু ইউসুফের মত। আবু হানিফা ও মুহাম্মদের মত শাফেয়ীর মতের অনুরূপ। কেননা স্ত্রীকে আটক রাখা ও না রাখা উভয় সমান। এখানে বিয়ের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়না বিধায় ভরণপোষণ ওয়াজিব নয়।)

আর যখন স্ত্রী নিজেকে স্বামীর নিকট সমর্পণ করে, কিন্তু সে এমন রোগে আক্রান্ত যে, স্বামীর পক্ষে তার সাথে সহবাস করা সম্ভব নয়, তখন তাকে ভরণপোষণ করা স্বামীর উপর ওয়াজিব। রোগাক্রান্ত হওয়ার কারণে স্ত্রী ভরণপোষণ থেকে বঞ্চিত হবে, এটা কোনো সুষ্ঠু দাম্পত্য আচরণ নয় এবং আল্লাহ যে সদাচরণের আদেশ দিয়েছেন, তারও দাবি নয়। যে স্ত্রীর যোনিদ্বার রুদ্ধ এবং যে স্ত্রী এত দুর্বল কিংবা এমন কোনো শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধী যে, স্বামী তার সাথে সহবাস করতে অপরাগ, সেও রোগাক্রান্ত স্ত্রীর পর্যায়ভুক্ত। অনুরূপ, স্বামী নপুংসক, পুরুষাঙ্গ কর্তিত বা স্ত্রী সহবাসের অন্তরায় এমন রোগে আক্রান্ত হলে কিংবা ঋণের দায়ে বা কৃত অপরাধের দায়ে বন্দী হলেও স্ত্রীর ভরণপোষণ করা তার উপর ওয়াজিব হবে। কেননা এক্ষেত্রে স্ত্রীর পক্ষ থেকে সহবাস করার সুযোগ দেয়াতে কোনো কসুর নেই। এখানে যা কিছু অক্ষমতা, তা কেবল স্বামীর। এ অক্ষমতার অজুহাতে সে তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে পারেনা। এটা শুধু তার নিজের অধিকার থেকেই তাকে বঞ্চিত করে। আর স্ত্রী যখন শরিয়ত সম্মত কারণ ছাড়াই স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে স্বামীর বাড়ি থেকে অন্যত্র চলে যায়, অথবা তার অনুমতি ছাড়া সফরে যায়, অথবা হজ্জের ইহরাম বাঁধে, তখন তাকে ভরণপোষণ দেয়া স্বামীর উপর ওয়াজিব নয়। স্বামীর অনুমতি নিয়ে সফর করলে, ইহরাম বাধলে কিংবা স্বামী তার সঙ্গী হলে খোরপোষ দেয়া থেকে স্বামী অব্যাহতি পাবেনা। কেননা এক্ষেত্রে স্ত্রী তার অবাধ্য হয়নি, তার নিয়ন্ত্রণের বাইরেও যায়নি। পক্ষান্তরে এমন যদি হয় যে স্ত্রী তার নিজের বাড়িতে স্বামীর সাথে বসবাসরত থাকাকালে স্বামীকে তার সাথে সহবাস করতে বাধা দিয়েছে এবং অন্য বাড়িতে স্থানান্তরিত হতে স্বামীকে বলেনি, আর স্বামীও তাতে অসম্মত হয়নি, তাহলে তাকে ভরণপোষণ করা তার ওয়াজিব হবেনা। তবে যদি স্বামীকে স্থানান্তরিত হতে বলে থাকে কিন্তু তাতে স্বামী অসম্মত হয়ে থাকে এবং স্ত্রী তাকে তার সাথে সহবাস করতে দিতে অসম্মত হয়, তাহলে ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীর উপর থেকে রহিত হবেনা।

অনুরূপ, স্ত্রী যদি কোনো অপরাধের দায়ে কারাবন্দী হয়, অথবা ঋণের কারণে অথবা অন্যায়ভাবে জেল খাটে, তাহলেও তার ভরণপোষণ করা স্বামীর উপর ওয়াজিব হবেনা। তবে যদি কখনো স্বামীই স্ত্রীকে তার পাওনা কোনো দেনার দায়ে আটক করেন, তখন স্ত্রীর ভরণপোষণ করা স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে। কেননা এক্ষেত্রে স্বামী নিজেই তার পাওনা হাতছাড়া করেছে। অনুরূপ স্ত্রীকে যদি কোনো অপহরণকারী অপহরণ করে এবং সে স্বামী

ও স্ত্রীর মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে স্ত্রী যতোক্ষণ বা যতোদিন অপহৃত অবস্থায় থাকবে, ততোদিন ভরণপোষণ পাওয়ার যোগ্য হবেনা। অনুরূপ, কোনো পেশাজীবী স্ত্রীকে যদি তার স্বামী পেশার কাজ করার জন্য বাড়ির বাইরে যেতে নিষেধ করে এবং সে নিষেধ না মানে, তাহলে সে ভরণপোষণ পাওয়ার যোগ্য হবেনা। অনুরূপ যখন স্ত্রী নফল রোযা ও নফল ইতিকাফ দ্বারা নিজেকে স্বামীর যৌন মিলন থেকে নিবৃত রাখে, তখনও সে ভরণপোষণ পাবেনা। কেননা এসবে ক্ষেত্রে স্ত্রী কোনো শরিয়তসম্মত কারণ ছাড়া স্বামীকে সহবাসের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। শরিয়তসম্মত কারণে বঞ্চিত করে থাকলে ভরণপোষণ পেতো। যেমন বাসস্থান অবৈধ হওয়ার কারণে কিংবা স্বামী তার জান ও মালের জন্য নিরাপদ না হওয়ার কারণে যদি স্বামীর অবাধ্য হয়। তাহলেও স্ত্রী ভরণপোষণ পাওয়ার হকদার থাকবে।

যখন স্বামী ছাড়া স্ত্রী একাই ইসলাম গ্রহণ করে

স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে অমুসলিম হলে এবং সহবাসের পর স্ত্রী একাই স্বামী ব্যতিত ইসলাম গ্রহণ করলে তার ভরণপোষণের অধিকার রহিত হবেনা। কেননা স্ত্রীর সাথে সহবাস অসম্ভব হয়েছে স্বামীর কারণেই। সে ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে এই কারণটি দূর করতে সক্ষম ছিলো। কাজেই এক্ষেত্রে স্ত্রীর ভরণপোষণ থেকে সে অব্যাহতি পাবেনা, একই কারণে স্ত্রীকে রেখে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া মুসলমান স্বামীও ভরণপোষণ থেকে অব্যাহতি পাবেনা।

স্বামী মুরতাদ হলে

সহবাসের পর স্বামী মুরতাদ (ইসলাম ত্যাগী) হয়ে গেলে তার উপর থেকে স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব রহিত হয়না। কেননা এখন স্বামী যে সহবাসের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তার কারণ সে নিজেই সৃষ্টি করেছে। ইসলামে ফিরে এসে সে এই কারণ দূর করতে পারতো। পক্ষান্তরে স্ত্রী যদি মুরতাদ হয়, তাহলে স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণ পাবেনা। কেননা সে নিজের পক্ষ থেকে গুনাহ করে সহবাসের পথ রুদ্ধ করেছে, যেমন স্বামীর অবাধ্য স্ত্রী করে থাকে।

ভরণপোষণ পাওয়া ও না পাওয়া বিষয়ে যাহেরি মাযহাবের মত

ভরণপোষণ ওয়াজিব হবার কারণ সম্পর্কে যাহেরি মাযহাবের স্বতন্ত্র মত রয়েছে। তাদের মতে, দাম্পত্য সম্পর্কই ভরণপোষণের কারণ। দাম্পত্য সম্পর্ক যতোক্ষণ থাকবে, ততোক্ষণ স্ত্রী ভরণপোষণ পাবে। এ মতের ভিত্তিতে তারা অপ্রাপ্ত বয়স্কা স্ত্রী ও স্বামীর অবাধ্য স্ত্রীকেও ভরণপোষণ দেয়া ওয়াজিব বলে রায় দেন। অন্যান্য ফকিহগণ এজন্য যেসব শর্ত আরোপ করেন, সেগুলো যাহেরীগণ মানেননা। ইবনে হাযম বলেন : যে মুহূর্তে বিয়ের আকদ সম্পন্ন হয়েছে, সেই মুহূর্ত থেকেই স্বামী স্ত্রীর ভরণপোষণ করতে বাধ্য, চাই তাদের সংসার পাতা হোক বা না হোক, স্ত্রী প্রাপ্ত বয়স্কা হোক বা দোলনার শিশু হোক, ধনাঢ্য হোক বা দরিদ্র হোক, পিতৃহীনা হোক বা না হোক, কুমারী হোক বা অকুমারী হোক, স্বাধীন হোক বা দাসী হোক। ভরণপোষণ সর্বাবস্থায়ই স্বামীর সামর্থ্য অনুপাতে দিতে হবে। (আল মুহাল্লা, ১০ খণ্ড)

ইবনে হাযম বলেন, আবু সুলায়মান ও তার শিষ্যগণ এবং সুফিয়ান ছাওরি বলেছেন : বিয়ের আকদ সম্পন্ন হওয়ার মুহূর্ত থেকেই অপ্রাপ্ত বয়স্কা স্ত্রীর ভরণপোষণ করা ওয়াজিব।

ক্রোধবশত স্বামীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া জনৈকা মহিলা সম্পর্কে হাকাম বিন উতাইবাকে জিজ্ঞাসা করা হলে জবাব দেন যে, তাকে ভরণপোষণ করতে হবে। স্বামীর অবাধ্য স্ত্রীকে ভরণপোষণ দেয়া লাগবেনা এমন কথা কোনো সাহাবির কাছ থেকে পাওয়া যায়নি, এটা শুধু নাখয়ী, শাবী, হাম্মাদ, হাসান ও যুহরি থেকে বর্ণিত। এর সপক্ষে নাখয়ী প্রমুখ কী প্রমাণ দর্শান, তাও জানা যায়নি। তারা শুধু বলেছেন : ভরণপোষণ হলো সহবাসের বদলা। সহবাস যখন করতে দেয়না, তখন ভরণপোষণও পাবেনা।

ভরণপোষণের পরিমাণ ও ভিত্তি

স্ত্রী যখন তার স্বামীর সাথে একত্রে বসবাস করে, স্বামী তার ভরণপোষণ চালায় এবং তার খাদ্য, পোশাক ইত্যাদি পর্যাপ্তভাবে দিতে থাকে, তখন স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণের পরিমাণ নির্ধারণের দাবি জানাতে পারবেনা। কেননা স্বামী তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। তবে স্বামী যদি এতটা কৃপণ হয় যে, স্ত্রীকে পর্যাপ্ত পরিমাণ ভরণপোষণ করেনা, অথবা তাকে অন্যায়ভাবে ভরণপোষণ ছাড়াই ফেলে রাখে, তাহলে স্ত্রীর অধিকার রয়েছে তার জন্য খাদ্য, বস্ত্র বাসস্থান ইত্যাদির নির্দিষ্ট পরিমাণ বরাদ্দের দাবি জানানোর। আদালতও তার জন্য ভরণপোষণের পক্ষে ফায়সালা করতে পারবে এবং স্ত্রীর দাবির যথার্থতা প্রমাণিত হলে আদালত স্বামীর উপর ভরণপোষণের দায়িত্ব আরোপ করতে পারবে। স্ত্রী যদি নীতিবান ও আল্লাহভীরু হয় এবং প্রয়োজনের চেয়ে বেশি গ্রহণ না করে, তাহলে সে নিজেও যুক্তিসঙ্গত পরিমাণে স্বামীর সম্পত্তি থেকে নিজের প্রয়োজনীয় ভরণপোষণ নিয়ে নিতে পারে। এটা সে স্বামীর অজান্তে নিতে পারে। কেননা স্বামী তার দায়িত্ব পালনে বিরত রয়েছে এবং তার কাছে স্ত্রীর খোরপোষ পাওনা রয়েছে। হকদার যখন নিজের পাওনা স্বহস্তে গ্রহণের সমর্থ হয়, তখন তা তার গ্রহণ করার অধিকার রয়েছে। এই অধিকারের উৎস হলো আহমদ, বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসায়ী কর্তৃক আয়েশা থেকে বর্ণিত হাদিস :

আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বললো, হে রসূলুল্লাহ, (আমার স্বামী) আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক, আমার ও আমার সন্তানকে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় খোরপোষ দেয়না। আমি তার অজান্তে যেটুকু নিয়ে নেই, তাছাড়া আর কিছু সে আমাকে দেয়না।" রসূল সা. বললেন, যুক্তিসঙ্গত ও বিধিসম্মতভাবে যতোটুকু নিলে তোমার ও তোমার সন্তানের প্রয়োজন মিটবে, ততোটুকু তুমি নিয়ে নাও।" এ হাদিস থেকে প্রমাণিত, ভরণপোষণের পরিমাণ নির্ধারিত হবে স্ত্রীর ন্যূনতম প্রয়োজনের আলোকে এবং ন্যায়সঙ্গত ও বিধিসম্মত হওয়া সাপেক্ষে। অর্থাৎ স্ত্রীর পরিবারে সর্বাধিক সমর্থনপুষ্ট মত হিসেবে যা সকল পক্ষের নিকট পরিচিত ও স্বীকৃত। আর এটা স্থান, কাল, অবস্থা ও ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। আর রওযাতুন নাদিয়া গ্রন্থের লেখকের মতে, খাদ্যের ক্ষেত্রে ন্যূনতম প্রয়োজন বলতে স্ত্রীর প্রয়োজনীয় সব কিছুই বুঝায়। তাই ফলমূলও এর আওতাধীন। বিভিন্ন উৎসবাদির সময় যে বাড়তি ব্যয় হয়ে থাকে এবং অন্য যেসব জিনিস চিরদিনই প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়ে থাকে, যা না হলে ক্ষতি হয়, অথবা মন খারাপ হয় অথবা অস্বস্তি বোধ হয় সেসবও এর আওতায় এসে যায়। ওষুধপত্রও এর আওতায় আসে। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন : "বিধিসম্মতভাবে মায়েদের জীবিকা দেয়া পিতার কর্তব্য"। বস্তুত এ আয়াত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এক প্রকারের ভরণপোষণের বিবরণ দিয়েছে। সেটি হলো, ভরণপোষণের দায়িত্ব যার, তার কর্তব্য যার ব্যয় নির্বাহ করার দায়িত্ব তার উপর রয়েছে

তার জীবিকা সরবরাহ করা। কী কী জিনিস এই জীবিকার অন্তর্ভুক্ত, তা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর তিনি কোনো কোনো ফকিহের মত উল্লেখ করেন যে, ওষুধের মূল্য ও চিকিৎসকের ফি দেয়া ওয়াজিব নয়। কেননা এর উদ্দেশ্যে শরীর সংরক্ষণ করা। তবে তিনি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চিকিৎসার ব্যয়কে ভরণপোষণের আওতাভুক্ত করার পক্ষপাতিও এবং এটা তার মতে ওয়াজিব। 'আল গাইস' এর গ্রন্থকার বলেন : ওষুধ হচ্ছে জীবন রক্ষার উপকরণ। তাই এটা ভরণপোষণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং তার অঙ্গীভূত। তিনি বলেন : এটাই সঠিক। কেননা রসূল (সা) হিন্দকে বলেছিলেন, "যতোটুকু নিলে তোমার ও তোমার সন্তানের প্রয়োজন মিটবে, ততোটুকু নিয়ে নাও।" তার এই উক্তি সর্বব্যাপী অর্থবোধক। অনুরূপ, উপরোক্ত আয়াতের "পিতার কর্তব্য মায়েদের জীবিকা দেয়া" এ উক্তিটিও সর্বব্যাপী অর্থবোধক। মোটকথা, যার উপর যার ভরণপোষণের দায়িত্ব অর্পিত, বিধিসম্মতভাবে যা কিছু ন্যূনতম প্রয়োজনীয় তা সরবরাহ করাই তার কর্তব্য। এর অর্থ ভরণপোষণের অধিকার যার প্রাপ্য তাকেই তা স্বহস্তে নিয়ে নেয়ার ক্ষমতা দেয়া নয়। কেননা তাতে ক্ষেত্র বিশেষে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। সীমা অতিক্রম ও অপব্যয়ের আশংকা যেনো না থাকে এমনভাবে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় খোরপোষ দিতে হবে এটাই তার মর্মার্থ। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের তথ্য ও অভিজ্ঞদের অভিজ্ঞতার আলোকেই ন্যূনতম প্রয়োজনের পরিমাণ নির্ধারিত হবে। এটাই রসূল (সা)-এর 'বিধিসম্মতভাবে' কথার মর্মার্থ। অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে নয় এবং অমিতব্যয়িতা বা কৃপণতার মাধ্যমেও নয়। অবশ্য যখন স্বামী তার উপর অর্পিত ভরণপোষণের দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত হয়না, তখন যার ভরণপোষণ পাওয়ার হক রয়েছে, তাকে তার ন্যূনতম ও অত্যাবশ্যকীয় পরিমাণ জীবিকা নিজেই নিয়ে নেয়ার অধিকার দেয়া হয়েছে। এই অধিকার দেয়া হয়েছে এমন মহিলাকে, যার যথেষ্ট বিবেকবুদ্ধি ও বিবেচনা ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু যার অপব্যয়ের প্রবণতা রয়েছে, তাকে নয়। অপব্যয়ী ও অমিতব্যয়ীকে যার উপর ভরণপোষণের দায়িত্ব ন্যস্ত তার সম্পত্তি থেকে নিজের বিবেচনা অনুযায়ী জীবিকা গ্রহণের ক্ষমতা দেয়া হয়নি। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : "তোমরা নির্বোধদের হাতে তোমাদের সম্পদ অর্পণ করোনা।" তবে যার উপর কারো ভরণপোষণের দায়িত্ব অর্পিত, সে যদি দায়িত্ব সচেতন না হয় ও ভরণপোষণের দিতে প্রস্তুত না হয়; অপরদিকে যার ভরণপোষণ প্রাপ্য, সেও যদি নির্বোধ হয়, তাহলে আমাদের কর্তব্য, নির্বোধের ভরণপোষণ গ্রহণের দায়িত্ব তার অভিভাবকের নিকট অথবা কোনো ন্যায়বান ব্যক্তির নিকট সোপর্দ করা। তেল, সাবান, চিরুনী এবং অন্য যেসব উপকরণ পরিচ্ছন্নতার জন্য জরুরি, তাও স্ত্রীর অত্যাবশ্যকীয় ভরণপোষণের উপকরণের আওতাভুক্ত।

শাফেয়ী মাযহাবের মতে, সুগন্ধী দ্রব্য যদি দুর্গন্ধ দূর করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, তাহলে তা অত্যাবশ্যকীয় ভরণপোষণের আওতাভুক্ত। কেননা পরিচ্ছন্নতার জন্য তার আবশ্যকতা রয়েছে। আর যদি সুগন্ধী দ্রব্যের উদ্দেশ্য হয় বিনোদন ও বিলাসিতা, তাহলে তা দেয়া স্বামীর উপর ওয়াজিব নয়। কেননা এটা তার ইচ্ছাধীন। এজন্য তাকে বাধা দেয়া বা বাধ্য করা যাবেনা।

ভরণপোষণের পরিমাণ নির্ণয়ে হানাফিদের অভিমত

হানাফিদের মত হলো, ভরণপোষণের পরিমাণ শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত হয়নি। স্বামীর উপর স্ত্রীকে ততোটুকুই ভরণপোষণ করার দায়িত্ব অর্পিত, যতোটুকু তার জন্য যথেষ্ট ও

অপরিহার্য, যথা খাদ্য, ফলমূল, তেল, এবং স্বীকৃতরীতি মোতাবেক অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় জীবনোপকরণ, যা স্থান কাল ও অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। শীত ও গ্রীষ্মের উপযুক্ত পোশাকাদিও এর আওতাভুক্ত। হানাফিদের মতে, স্বামীর সামর্থ্য অনুযায়ী স্ত্রীর ভরণপোষণ স্বামীর কর্তব্য, চাই স্ত্রীর আর্থিক অবস্থা যেমনই হোক না কেন। স্বামী ধনী হলে তার ধনসম্পদের অনুপাতে আর দরিদ্র হলে তার দারিদ্র্যের অনুপাতে ভরণপোষণ নির্ধারিত হবে। কারণ আল্লাহ্ বলেন :

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتَاهُ اللّٰهُ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا مَا اٰتَاهَا، سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا .

"সম্পাদশালী ব্যক্তি তার সম্পদ অনুপাতে ব্যয় করবে, আর সীমিত সম্পদের অধিকারী ব্যক্তি তাকে আল্লাহ যা দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যা দিয়েছেন, তদপেক্ষা বেশি বোঝা কারো উপর অর্পণ করেননা। কষ্টের পর আল্লাহ অবশ্যই স্বস্তি দেবেন।" (সূরা তালাক : আয়াত ৭)

আল্লাহ্ আরো বলেন : "তোমরা যেখানে বাস করো, তাদেরকেও সেখানে বাস করাও তোমাদের সাধ্য ও সামর্থ্য অনুপাতে।" (সূরা তালাক : আয়াত ৬)

ভরণপোষণের পরিমাণ নির্ণয়ে শাফেয়ীদের মত

শাফেয়ীগণ শুধু ন্যূনতম ও অত্যাবশ্যকীয় জীবনোপকরণের উপরই ভরণপোষণের পরিমাণ নির্ধারণ ছেড়ে দেননি; বরং তারা বলেছেন : এটা কেবল শরিয়ত দ্বারা নির্ধারিত। তারা হানাফিদের সাথে শুধু এই বিষয়ে একমত যে, দারিদ্র্য বা বিত্তশালিতায় স্বামীর অবস্থা বিবেচনা করা জরুরি। বিত্তশালী স্বামীর সংজ্ঞা এই যে, সে নিজের সম্পত্তি ও উপার্জন থেকে ভরণপোষণ চালাতে সক্ষম। আর বিত্তশালী স্বামীর দায়িত্ব হলো, প্রতিদিন দুই 'মুদ' পরিমাণ খাদ্যোপকরণ দেবে। আর দরিদ্র স্বামীর সংজ্ঞা হলো, সে নিজের সম্পত্তি দ্বারাও ভরণপোষণ চালাতে পারেনা, উপার্জন দ্বারাও নয়। তার দায়িত্ব প্রতিদিন এক মুদ খাদ্য ভরণপোষণ হিসেবে দেয়া, আর মধ্যম ব্যক্তির দায়িত্ব হলো, প্রতিদিন দেড় মুদ পরিমাণ কার্যোপকরণ প্রদান। কেননা আল্লাহ্ বলেন : "সম্পদশালী ব্যক্তি তার সম্পদ অনুযায়ী ব্যয় করবে। আর যার সম্পদ সীমিত, সে যেন আল্লাহ্ তাকে যা দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় করে।" দেখা যাচ্ছে আল্লাহ্ এখানে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য করেছেন এবং প্রত্যেকের উপর তার সামর্থ্য অনুযায়ী খোরপোষ ধার্য করেছেন। পরিমাণ স্পষ্ট করেননি। তাই ইজতিহাদ দ্বারা পরিমাণ নির্ধারণ করা জরুরি হয়ে পড়েছে। যে জিনিসটির সাথে ভরণপোষণের সাদৃশ্য সবচেয়ে বেশি তা হলো কাফফারার জন্য দেয় খাবার। কেননা এটা ক্ষুধা নিবারণের জন্য শরিয়ত নির্ধারিত খাদ্য। কাফফারা দরিদ্রদেরকে সর্বোচ্চ দুই মুদ খাদ্যদ্রব্য ফিদিয়া স্বরূপ দিতে হয়। আর সর্বনিম্ন ফিদিয়া এক মুদ এবং এটা দিতে হয় রমযানে দিনের বেলা স্ত্রী সহবাসের কাফফারা স্বরূপ।

সে যদি মধ্যম মানের বিত্তশালী হয়, তাহলে তাকে দিতে হবে দেড় মুদ। কেননা সে বিত্তশালীর চেয়ে নিম্নমানের এবং দরিদ্রের চেয়ে উচ্চমানের। তাই তাকে দেড় মুদ দিতে বলা হয়েছে। স্ত্রীদের জন্য যদি প্রয়োজন পূরণের দুয়ার খুলে দেয়া হয়, তাহলে বিতর্ক সৃষ্টি হবে এবং তার কোনো সীমাপরিসীমা থাকবেনা। তাই মারুফ অর্থাৎ প্রচলিত ও স্বীকৃত

রীতি অনুযায়ী পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে। খাবারে ঝোল, গোশত ও ফলমূলের ন্যায় অতি প্রয়োজনীয় জিনিস এর বাইরে। শাফেয়ী ফকিহ্গণ বলেছেন : "স্ত্রীকে পোশাক দেয়ার সময় স্বামী ধনী না দরিদ্র, সেটা বিবেচনা করা জরুরি। ধনী ব্যক্তির স্ত্রী শহুরে লোকেরা যে উঁচুমানের পোশাক পরে থাকে, সেই পোশাকের হকদার। আর দরিদ্র্য লোকের স্ত্রী পাবে মোটা সুতী কাপড়। আর মধ্যবিত্তের স্ত্রী পাবে এর মধ্যবর্তী মানের পোশাক। আর তাকে বাসস্থানও দিতে হবে স্বামী ধনী বা দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কিনা সেই অনুসারে। আর তার অবস্থা অনুযায়ী ঘরের আসবাবপত্রও হওয়া চাই। স্বামী যদি দরিদ্র হয়, তবে স্ত্রীকে প্রচলিত ও স্বীকৃত রীতি অনুযায়ী ন্যূনতম যে খাদ্য ও ঝোল তার জন্য যথেষ্ট তা দিতে হবে। আর গরম ও শীতে ন্যূনতম যে মানের পোশাক যথেষ্ট তা দিতে হবে। আর স্বামী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হলে তার ভরণপোষণ দারিদ্রের চেয়ে কিছুটা উঁচুমানের হওয়া চাই আর তা হতে হবে স্বীকৃত প্রচলিত রীতি অনুযায়ী। খোরপোশ প্রচলিত ও স্বীকৃত রীতি অনুযায়ী ন্যূনতম যে খাদ্য ও ঝোল তার জন্য যথেষ্ট তা দিতে হবে। আর গরম ও শীতে ন্যূনতম যে মানের পোশাক যথেষ্ট তা দিতে হবে। আর স্বামী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হলে তার ভরণপোষণ দরিদ্র্যের চেয়ে কিছুটা উঁচুমানের হওয়া চাই আর তা হতে হবে স্বীকৃত প্রচলিত রীতি অনুযায়ী। খোরপোষ প্রচলিত ও স্বীকৃত অনুযায়ী হতে হবে এজন্য যে, স্ত্রীকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করা ওয়াজিব। ক্ষতি থেকে রক্ষা করা মধ্যম পর্যায়ের খোরপোষ দেয়া দ্বারাই সম্ভব। আর এটাই বুঝানো হয়েছে 'মারূফ' তথা স্বীকৃত ও প্রচলিত রীতি অনুযায়ী দ্বারা।

ভরণপোষণ নির্ধারিত হবে মুদ্রায়, না দ্রব্যসামগ্রীতে

ভরণপোষণ হিসেবে খাদ্য ও পোশাক বরাদ্দ করার সময় নির্দিষ্ট কয়েক ধরনের খাদ্য সামগ্রী ও পোশাক সামগ্রী চিহ্নিত করাও বৈধ, আবার মুদ্রা আকারেও তা বরাদ্দ করা বৈধ, যাতে স্ত্রী তার প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী কিনে নিতে পারে। এটা বাৎসরিক, মাসিক, সাপ্তাহিক বা দৈনিক যে হারে দেয়া স্বামীর জন্য সহজ হবে, সে হারেই বরাদ্দ করা যাবে। বর্তমানে আদালতে যেটি প্রচলিত তা হলো স্ত্রীর খাদ্যের বাবদে মাসিক হারে এবং পোশাকের বাবদ ষান্মাসিক হারে মুদ্রা প্রদান। কেননা গ্রীষ্মকালে এক সেট ও শীতকালে এক সেট পোশাক তার প্রয়োজন। কোনো কোনো বিচারক তিন ধরনের ভরণপোষণের বাবদে মাসিক টাকা ধার্য করে থাকেন। এক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য হলো, ঐ টাকা যেন স্ত্রীর খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায় এবং তা স্বামীর সচ্ছল বা অসচ্ছল অবস্থার সমানুপাতিক হয়।

স্বামীর আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন বা বাজার দরের পরিবর্তন

যে সময়ে ভরণপোষণ ধার্য করা হয় সে সময়কার বাজারদর যদি পরবর্তী সময়ে পাল্টে যায়, অথবা স্বামীর আর্থিক অবস্থা পাল্টে যায়, তাহলে প্রথমে দেখতে হবে এই বাজার দরে কি ধরনের পরিবর্তন এসেছে? হ্রাস পেয়েছে, না বৃদ্ধি পেয়েছে? আর স্বামীর আর্থিক অবস্থা পাল্টে গিয়ে খারাপ হয়েছে, না ভালো হয়েছে? পরিবর্তিত এই অবস্থাগুলোর প্রত্যেকটি বিবেচনা করা জরুরি। বাজার দর যদি বরাদ্দ করার সময়ের চেয়ে বৃদ্ধি পায়, তাহলে স্ত্রী তার ভরণপোষণের পরিমাণ বৃদ্ধির দাবি করতে পারবে। আর যদি দাম কমে যায়, তাহলে স্বামী ভরণপোষণের পরিমাণ কমানোর দাবি জানাতে পারবে।

ভরণপোষণ পরিমাণ ধার্য করার পর যদি জানা যায় যে, ধার্যকৃত পরিমাণ ভুল ছিলো এবং স্বামীর অবস্থা খারাপ কিংবা ভালো যাই হোক, সে অনুপাতে স্ত্রীর জন্য তা যথেষ্ট ছিলনা, তাহলে স্ত্রী ঐ ভরণপোষণের পরিমাণ পুনর্নির্ধারণের দাবি জানাতে পারবে। তখন বিচারকের কর্তব্য হবে স্বামীর অবস্থা অনুযায়ী স্ত্রীর খাদ্য ও বস্ত্রের জন্য যথেষ্ট হয় এমন ভরণপোষণ নির্ধারণ করে দেয়া।

ভরণপোষণের দায় একটা বৈধ ঋণ এবং তার জন্য স্বামী দায়ী

যেহেতু পূর্বে বর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে স্ত্রীর ভরণপোষণ স্বামীর উপর ওয়াজিব এবং নির্দিষ্ট কারণসমূহ ও শর্তাবলীর উপস্থিতিতে স্ত্রীর ভরণপোষণ স্বামীর উপর ওয়াজিব হওয়ার পর স্বামী যদি তা না দেয়, তবে সেটি তার ঋণ গণ্য হবে। অন্যান্য ঋণের মতোই এ ঋণ হয় পরিশোধ করতে হবে, নয়তো স্ত্রীর পক্ষ থেকে দায়মুক্তি নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় এ ঋণ থেকে সে মুক্ত হবেনা। এটাই শাফেয়ী মাযহাবের মত। মিশরে ১৯২০ সালের ১৫ নং আইন জারি হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি সেটাই অনুসৃত হয়ে আসছে। ঐ আইনে বলা হয়েছে :

ধারা ১ : কোনো স্ত্রী তার স্বামীর নিকট নিজেকে সঁপে দেয়ার পর তার ভরণপোষণের ব্যয় স্বামীর ঋণ গণ্য হবে। স্বামীর উপর এই ভরণপোষণের দায় অর্পিত হওয়া সত্ত্বেও সে তা দেয়া থেকে বিরত হওয়ার সময় থেকেই এটা ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে। এ ঋণ কোনো আদালতের রায় কিংবা দু'পক্ষের সম্মতির উপর নির্ভরশীল থাকবেনা। এ ঋণ যতক্ষণ পরিশোধ না করা হবে কিংবা স্ত্রী স্বামীকে দায়মুক্ত না করবে, ততোক্ষণ বহাল থাকবে।

ধারা ২ : যে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ভরণপোষণের হকদার, তার ভরণপোষণও ঋণরূপে গণ্য হবে এবং তা তালাক প্রদানের তারিখ থেকেই, ঠিক যেরূপ পূর্বোক্ত ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে।

যে কর্তৃপক্ষ থেকে উল্লিখিত আইন জারি হয়েছে, সেখান থেকে (অর্থাৎ আইন মন্ত্রণালয় থেকে একই সাথে আরো কিছু বিধি জারি হয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপ :

১. স্ত্রী বা তালাকপ্রাপ্তরা খোরপোষ স্বামীর নিকট ঋণ হিসেবে প্রাপ্য গণ্য হওয়ার জন্য আদালতের ফায়সালা বা সংশ্লিষ্ট পক্ষের শর্ত নয়। বরং যে মুহূর্তে তা স্বামীর নিকট প্রাপ্য হবে এবং স্বামী তা দেয়া থেকে বিরত থাকবে, সেই মুহূর্ত থেকেই তা ঋণ হিসেবে গণ্য হবে।

২. খোরপোষের ঋণ সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ঋণ এবং তা পরিশোধ করা অথবা দায়মুক্ত করা ছাড়া রহিত হয়না।

এই দুটি বিধি থেকে নিম্নোক্ত উপবিধিগুলো গঠিত হয় :

১. স্ত্রী বা তালাকপ্রাপ্তা আদালতে স্বামীর কাছ থেকে নিজের ভরণপোষণ আদায়ের আবেদন জানাতে পারবে এবং আবেদন জানানোর পূর্ব থেকেই তা আমলে আসবে, চাই তা এক মাসের চেয়ে বেশি হোক না কেন। স্ত্রী যদি জানায় যে, তার স্বামী তাকে ভরণপোষণ ছাড়াই ফেলে রেখেছে, অথচ এই সময়ে তার উপর তার ভরণপোষণ দেয়ার দায়িত্ব ছিলো, তাহলে সময়টা লম্বা হোক বা খাট হোক, তার দাবি গোটা সময়ের জন্য প্রযোজ্য হবে। স্ত্রী বা তালাকপ্রাপ্তার এ দাবি যখন যে কোনো গ্রহণযোগ্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হবে, এমনকি তা যদি ১৭৮ ধারায় বিধিবদ্ধ তদন্ত সাপেক্ষের দ্বারাও প্রমাণিত হয়, তবে সে যা চেয়েছে, তা দেয়ার আদেশ দেয়া হবে।

২. ভরণপোষণের ঋণ স্বামী স্ত্রীর যে কোনো একজন মারা গেলেও রহিত হয়না। তালাক

দ্বারাও রহিত হয়না, চাই তা খুলা তালাকই হোক না কেন। তালাক যে ধরনেরই পেয়ে থাকুক না কেন, প্রাপ্য ভরণপোষণের যেটুকু দাম্পত্য সম্পর্ক বহাল থাকা অবস্থায় অনাদায়ী রয়েছে তালাকপ্রাপ্তা তা পাওয়ার হকদার, যতোক্ষণ না সেই ভরণপোষণ তালাক বা খুলার বিনিময়ে পরিণত না হয়।

৩. স্বামীর প্রতি স্ত্রীর সাময়িক অবাধ্যতা অনাদায়ী ভরণপোষণকে রহিত করেনা। স্থায়ী অবাধ্যতাই কেবল ভরণপোষণের দায় থেকে ততোক্ষণ স্বামীকে অব্যাহতি দেয়া, যতক্ষণ সে অবাধ্য থাকে, চাই তা স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন চলাকালে হোক, কিংবা ইদ্দতদালে হোক। এই আইন জারি হওয়ার পর কোনো কোনো স্ত্রী এর সুযোগ গ্রহণ করে ভরণপোষণ দাবি করা থেকে বিরত থাকে, যাতে তা থেকে সময়ের ব্যবধানে একটা মোটা দাগের অর্থ সঞ্চিত হয়। অতপর সেই অনাদায়ী ভরণপোষণের সম্পূর্ণটাই স্বামীর কাছ থেকে এক সাথে দাবি করে। এতে স্বামী কঠিন চাপের শিকার হয় এবং তার ঘাড়ে বড় রকমের বোঝা চাপে। এ কারণে স্বামীদের সমস্যা লাঘবের জন্য উপায় খোঁজা হয়। অবশেষে ১৯৩১ সালের ৭৮ নং আইনের ৯৯ ধারার ৬ নং অনুচ্ছেদে শরীয়া আদালতসমূহের ধারাবাহিক বিধিমালা জারি হয়। তাতে বলা হয় : "দাবি পেশের তারিখ থেকে তিন বছরের চেয়ে আগের কোনো দাবি গৃহীত হবেনা।" এই আইনের অধিকতর ব্যাখ্যা সম্বলিত স্মারকে এই অনুচ্ছেদ সম্পর্কে বলা হয়েছে : "অতীত সময়ের বাবদে যে ভরণপোষণ পাওনা রয়েছে। সে ব্যাপারে বিচার বিভাগীয় বিশেষ ক্ষমতা বিধির অধীন এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, খৃষ্টীয় তিন বছরের চেয়ে বেশি সময়ের ভরণপোষণের দাবি বিবেচিত হবে না এবং তার সর্বশেষ সময় হচ্ছে দাবি নিবন্ধিত হওয়ার তারিখ। যেহেতু উপস্থাপনের পূর্ববর্তী একটা নির্দিষ্ট সময় বাবদ পাওনা অনাদায়ী ভরণপোষণের দাবি জানানোর শর্তহীন ও অবাধ অনুমতি থাকার কারণে এক সাথে কয়েক বছরের ভরণপোষণের দাবি জানানোর মাধ্যমে দায়ী স্বামীর উপর অতিমাত্রায় বোঝা চাপানোর আশংকা সৃষ্টি হয়, সেহেতু ভরণপোষণের হকদারকে এক এক বছর করে এমনভাবে ভরণপোষণের দাবি জানাতে বাধ্য করা ন্যায়বিচারের স্বার্থে প্রয়োজন মনে করা হয়, যাতে তিন বছরের চেয়ে বেশি বিলম্বিত না হয়। এর অন্যথা হলে দাবি বিবেচনা করতে অস্বীকার করা হবে মর্মে বিধি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে দাবিদারকে পর্যায়ক্রমে এক এক বছরের দাবি জানাতে বাধ্য করা হয়। এতে ভরণপোষণের হকদারের কোনো ক্ষতিও নেই। কেননা তিন বছর অতিবাহিত হবার আগেই সে তার পাওনার দাবি পেশ করার সুযোগ পাচ্ছে। এ আইনের প্রয়োগ এখনো পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।

ভরণপোষণের ঋণ থেকে অব্যাহতি ও তা কেটে নেয়ার নিয়ম

যেহেতু স্ত্রীর প্রাপ্য ভরণপোষণ বা খোরপোষ স্বামীর নিকট স্ত্রীর প্রাপ্য ঋণ হিসেবে বিবেচিত এবং যে মুহূর্ত থেকে স্বামী তা দেয়া থেকে বিরত রয়েছে সেই সময় থেকেই এটা ঋণের দায় হিসেবে তার উপর বহাল রয়েছে, সেহেতু স্ত্রী ইচ্ছা করলে স্বামীকে এই ঋণ থেকে পুরোপুরি বা আংশিক অব্যাহতি বা দায়মুক্তি দিতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতে তার যে ভরণপোষণ পাওনা হবে তা থেকে আগাম দায়মুক্তি ঘোষণা করলে, সে ঘোষণা শুদ্ধ ও বৈধ হবেনা। কেননা তা এখনো ঋণে পরিণত হয়নি। আর দায়মুক্তি কেবল সেই ঋণ

থেকেই দেয়া যায়, যা কার্যত ঋণে পরিণত ও ঋণ হিসেবে প্রাপ্য হয়েছে। তবে যদি ভরণপোষণ মাসিক বা অনুরূপ কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদ বাবদ দেয়া স্থির হয়ে থাকে, তাহলে আগামী এক মাস বা এক বছরের জন্য আগাম দায়মুক্তি দেয়া যাবে।

আর যখন ভরণপোষণ বৈধ ঋণ হিসেবে গণ্য হয়, যা পরিশোধ করা বা ছেড়ে দেয়া ব্যতিত রহিত হয়না। অথচ একই সময়ে স্ত্রীর নিকট স্বামীর প্রাপ্য কোনো ঋণ থাকে এবং দুজনের যে কোনো একজন উভয় ঋণের কাটাকাটি করার দাবি জানায়, তখন এ দাবি মেনে নিয়ে উভয় ঋণকে সমপর্যায়ে আনা হবে। কাটাকাটির বিষয়ে হাম্বলীদের একটা ভিন্ন মত রয়েছে। তারা স্ত্রীর সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতায় পার্থক্য করে। স্ত্রী যদি সচ্ছল হয়, তবে স্বামী তার প্রাপ্য ভরণপোষণের বিনিময়ে নিজের পাওনা ঋণ তার কাছ থেকে আদায় করতে পারে। কেননা যার কাছে কারো কোনো হক পাওনা থাকে, সে তার যে কোনো সম্পদ থেকে সেই পাওনা পরিশোধ করতে পারে। এখানে স্ত্রীর কাছে তার পাওনা ঋণের অর্থও তার সম্পদ। আর যদি স্ত্রী অসচ্ছল হয়, তবে স্বামী তার ভরণপোষণের বিনিময়ে তার কাছ থেকে নিজের প্রাপ্য ঋণ আদায় করতে পারবেনা। কেননা ঋণ পরিশোধ শুধু জীবন বাঁচানোর জন্য যা অত্যাবশ্যকীয়, তার অতিরিক্ত সম্পদ থেকেই করা ওয়াজিব। স্বামীর যে ঋণ তার কাছে প্রাপ্য, তা তার অত্যাবশ্যকীয় সম্পদের অতিরিক্ত নয়। তাছাড়া আল্লাহ তো অসচ্ছল ব্যক্তিকে অবকাশ দানের আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন :

وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ .

"যদি সে অসচ্ছল হয়, তাহলে তার সচ্ছল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা বাঞ্ছনীয়।" (সূরা আল বাকারা : আয়াত ২৮০)

আগাম ভরণপোষণ প্রদান ও তারপর স্ত্রীর ভরণপোষণের অযোগ্য হওয়া

স্বামী যখন স্ত্রীকে অগ্রিম এক মাস বা এক বছর বা অনুরূপ কোনো মেয়াদের জন্য ভরণপোষণ দিয়ে দেয়, অতপর এমন কিছু ঘটে, যার কারণে স্ত্রী ভরণপোষণের অযোগ্য হয়ে যায়, যেমন স্বামী স্ত্রীর একজন মারা গেলো অথবা স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হলো, তাহলে স্বামী অবশিষ্ট মেয়াদের ভরণপোষণ স্ত্রীর কাছ থেকে ফেরত নিতে পারবে, যে মেয়াদের জন্য তার ভরণপোষণ প্রাপ্য হয়না। কেননা স্ত্রী ঐ ভরণপোষণ গ্রহণ করেছে স্বামীর স্বার্থে নিজেকে তার নিকট আটক রাখার বিনিময়ে। আর মৃত্যু বা অবাধ্যতার কারণে যখন সেই আটকাবস্থার অবসান ঘটেছে, তখন তাকে যে ভরণপোষণ অগ্রিম দেয়া হয়েছে, তার অবশিষ্টাংশ বাবদ প্রদত্ত ভরণপোষণ তার ফেরত দেয়া উচিত। এটাই ইমাম শাফেয়ী ও মুহাম্মদ ইবনুল হাসানের মত।

ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফের অভিমত এই যে, অগ্রিম দেয়া ভরণপোষণের কোনো অংশই স্বামী ফেরত নিতে পারবেনা। কেননা ভরণপোষণ যদিও আটকাবস্থার বদলা, তথাপি তাতে সৌজন্যমূলক দানের সাদৃশ্য রয়েছে, যা স্ত্রী হস্তগত করেছে। অথচ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে লেনদেনকৃত সৌজন্যমূলক দান কখনো ফেরত নেয়া যায়না।

ইদ্দত পালনরত স্ত্রীর ভরণপোষণ

রজয়ী তালাকোত্তর ইদ্দত ও গর্ভবতী অবস্থায় ইদ্দত পালনকারিণীর ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকার রয়েছে। কেননা আল্লাহ রজয়ী তালাকপ্রাপ্তাদের সম্পর্কে বলেন :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ .

অর্থ : তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেরূপ গৃহে তোমরা বাস করো, তোমাদের তালাক দেয়া স্ত্রীদেরকেও সেরূপ গৃহে বাস করতে দিও।" (সূরা তালাক, আয়াত ৬)

আর গর্ভবতীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন :

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ .

অর্থ : আর যদি তারা গর্ভবতী হয়, তবে তাদের সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত তাদের ভরণপোষণ দাও।" (সূরা তালাক : আয়াত ৬)

এ আয়াত প্রমাণ করে, গর্ভবতীকে ভরণপোষণ দেয়া ওয়াজিব, চাই সে রজয়ী তালাকজনিত ইদ্দতে থাকুক, বায়েন তালাক জনিত ইদ্দতে থাকুক, কিংবা মৃত্যুজনিত ইদ্দতে থাকুক। বায়েন তালাকজনিত ইদ্দত পালনকারিণী অগর্ভবতীর ব্যাপারে তিন ধরনের মতামত রয়েছে :

১. বাসস্থান দিতে হবে, কিন্তু ভরণপোষণ দিতে হবেনা। এটা ইমাম মালেক ও শাফেয়ীর অভিমত। তাদের প্রমাণ সূরা তালাকের উপরোক্ত ৬ নং আয়াত।

২. তাকে বাসস্থান ও ভরণপোষণ দুটোই দিতে হবে। এটা উমর ইবনুল খাত্তাব, উমর ইবনে আব্দুল আযীয, ছাওরী ও হানাফি মাযহাবের অভিমত। কেননা সূরা তালাকের উক্ত ৬ নং আয়াতে সকল ধরনের তালাকপ্রাপ্তাকে বাসস্থান সুবিধা দেয়া ওয়াজিব বলা হয়েছে। আর বাসস্থান সুবিধা দেয়া যেখানে ওয়াজিব, সেখানে ভরণপোষণ দেয়াও আনুষঙ্গিকভাবে ওয়াজিব। এটা রজয়ী তালাক, গর্ভবতীর তালাক ও স্বয়ং স্ত্রীর জন্যও ওয়াজিব। উমর রা. ও আয়েশা রা. উভয়ে ফাতিমা বিনতে কায়েস রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদিসকে অস্বীকার করে বলেছিলেন, "আমরা একজন মহিলার কথার জন্য আল্লাহর কিতাব ও রসূল সা.-এর সুন্নতকে ত্যাগ করবোনা। এই মহিলা রসূল সা.-এর কথা সঠিকভাবে মনে রেখেছেন না ভুলে গেছেন, তা আমরা জানিনা।" তারপর ফাতিমা যখন এই কথা জানতে পারলেন তখন বললেন : "আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব ফায়সালা করবে। আল্লাহ্ বলেন :

فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ج لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ط وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ ط وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ط لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْرًا ○

অর্থ : যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাও, তখন তাদের ইদ্দতের উদ্দেশ্যে তালাক দিও এবং ইদ্দত গণনা করো। তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহকে তোমরা ভয় করো। তোমরা তাদেরকে তাদের বাসগৃহ থেকে বের করে দিওনা এবং তারাও যেন বের না হয়, যদি তারা কোনো স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত না হয়। এগুলো আল্লাহর বিধান। যে কেউ আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করে, সে তো নিজের উপরই যুলুম করে। তুমি জাননা, হয়তো আল্লাহ্ এরপর কোনো নতুন উপায় করে দিবেন।"

প্রশ্ন হলো, তিন তালাকের পর আর কী উপায় বেরিয়ে আসবে?"

৩. আহমদ, দাউদ, আবু সাওর, ইসহাক, আলী ইবনে আব্বাস, জাবের, হাসান, আতা, শাবী, ইবনে আবি লায়লা, আওযায়ি ও ইমামিয়া শীয়া মাযহাবের মতে, সে ভরণপোষণ ও বাসস্থান কোনোটাই পারেনা। তাদের প্রমাণ বুখারি ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদিস : ফাতিমা বিনতে কায়েস বলেন বা "আমার স্বামী রসূল সা.-এর আমলে আমাকে তিন তালাক দিলো এবং সে আমাকে কোনো বাসস্থানও দিলনা, ভরণপোষণওনা।" কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে : রসূল সা. বলেছেন : "যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার সুযোগ তার স্বামীর রয়েছে, সে- বাসস্থানের সুবিধা ও ভরণপোষণ পাবে।" আর আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসায়ী বর্ণনা করেন : রসূল সা. ফাতেমা বিনতে কায়েসকে বলেছেন : "তুমি গর্ভবতী না হলে ভরণপোষণ পাবেনা।"

প্রবাসী স্ত্রীর ভরণপোষণ

মিশরীয় আইনের ১৯২০ সালের ২৫(৫) নং ধারায় রয়েছে : "স্বামী যখন অনুপস্থিত থাকে, কিন্তু নিকটেই কোথাও থাকে, তখন তার যদি প্রকাশ্য কোনো সম্পদ থেকে থাকে, তবে তার সেই সম্পদ থেকে স্ত্রীর ভরণপোষণ দেয়া হবে। আর প্রকাশ্য কোনো সম্পদ না থাকলে আদালত প্রচলিত পন্থায় তাকে কারণ দর্শানের নোটিশ দিবে ও তাকে নির্দিষ্ট সময় দেবে। কিন্তু সে যদি ঐ সময়ের মধ্যে স্ত্রীকে প্রয়োজনীয় ভরণপোষণ না দেয়, তবে সেই সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আদালত স্বামীর বিরুদ্ধে তালাক জারি করবে। কিন্তু অনুপস্থিত স্বামী যদি এত দূরে থাকে যে, তার কাছে পৌঁছা সহজ নয়, যেমন তার অবস্থানস্থল অপরিচিত অথবা সে নিরুদ্দেশ এবং প্রমাণিত হয় যে, তার এমন কোনো সম্পদ নেই, যা থেকে স্ত্রী নিজের জন্য ব্যয় করবে, তাহলে আদালত উক্ত স্বামীকে তালাক দেবে।

২৬. স্ত্রীর প্রাপ্য নৈতিক অধিকারসমূহ

আগেই বলেছি, স্বামীর নিকট স্ত্রীর যেসব অধিকার রয়েছে, তা দু'প্রকারের : ১. বস্তুগত ও ২. নৈতিক। বস্তুগত অধিকার হলো, মোহর ও ভরণপোষণ, আর নৈতিক অধিকারগুলো নিম্নে উল্লেখ করছি :

১. সদ্ব্যবহার : স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সর্বপ্রথম যে কর্তব্য তা হলো, তার সাথে ভদ্রজনোচিত আচরণ করা। সদ্ব্যবহার করা, প্রচলিত নিয়মে তার সাথে আচরণ করা, যতদূর সম্ভব এমন আচরণ করা, যা তার মনে স্বামীর প্রতি মমত্ব জন্মায় এবং তার পক্ষ থেকে বিরক্তিকর কিছু পাওয়া গেলে তার প্রতি ধৈর্যধারণ করা। আল্লাহ বলেন :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ج فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ○

অর্থ : স্ত্রীদের সাথে প্রচলিত নিয়মে ভালো ব্যবহার করো। তোমরা যদি তাদেরকে অপছন্দ করো। তাহলে মনে রেখো, তোমরা হয়তো কোনো জিনিসকে অপছন্দ করবে, অথচ আল্লাহ তার মধ্যে প্রচুর কল্যাণ রেখেছেন।" (সূরা নিসা : আয়াত ১৯)

উঁচুমানের নৈতিকতা ও ঈমানের অগ্রসরতার একটি আলামত হলো, নিজের পরিবার পরিজনের প্রতি কোমল হৃদয় ও বন্ধুভাবাপন্ন হওয়া। রসূলুল্লাহ সা. বলেন : মুমিনরে মধ্যে

সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ ঈমানের অধিকারী তিনিই, যিনি সর্বাধিক সুন্দর স্বভাব চরিত্রের অধিকারী। আর তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীদের নিকট উত্তম, তারাই তোমাদের মধ্যে উত্তম।"

আর স্ত্রীর প্রতি ভদ্রতা সৌজন্য প্রদর্শন করা পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্বের লক্ষণ। আর স্ত্রীর সাথে অপমানজনক আচরণ করা হীনতা ও ইতরামির লক্ষণ। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার কেবল মহান ব্যক্তিই করে, আর তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে কেবল নিন্দিত ব্যক্তি।"

স্ত্রীর সাথে সহৃদয় ও মনোরঞ্জনমূলক আচরণ করা, আদর সোহাগ ও রসিকতা করাও তার প্রতি ভদ্রজনোচিত ও সৌজন্যমূলক আচরণের অংশ। রসূলুল্লাহ সা. আয়েশা রা. এর সাথে সহৃদয় ও মনোরঞ্জনমূলক আচরণ করতে গিয়ে কখনো কখনো প্রতিযোগিতাও করতেন। আয়েশা রা. বলেন : "রসূলুল্লাহ সা. আমার সাথে প্রতিযোগিতা করলেন। আমি তাকে হারিয়ে দিলাম। কিছুদিন পর যখন আমার মাংসল দেহ আমাকে কষ্টে ফেলে দিলো, তখন তিনি আমার সাথে প্রতিযোগিতা করলে আমি হেরে গেলাম। তখন তিনি বললেন, এই হার আগের দিনের হারের বদলা।" -আহমদ, আবু দাউদ।

আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন, রসূল সা. বলেছেন, আদম সন্তানের সকল খেলা অন্যায়, কেবল তিনটে খেলা ব্যতীত : ধনুক দিয়ে তীর ছোঁড়া, ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেয়া এবং স্ত্রীর সাথে আমোদফূর্তি করা। এগুলো সবই ন্যায়সংগত।" স্ত্রীকে নিজের সমপর্যায়ে উন্নীত করা, তাকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা এমনকি কর্কশ কথা দিয়েও কষ্ট না দেয়া তাকে সম্মানিত করার নামান্তর। মুয়াবিয়া বিন হায়দা রা. বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে রসূলুল্লাহ আমাদের উপর আমাদের স্ত্রীদের অধিকার কী কী? তিনি বললেন, তুমি যখন খাও, তখন তাকে খাওয়াবে, তুমি যখন পোশাক পরবে, তখন তাকে পরাবে, তাকে কখনো মুখে মারবেনা, ভর্ৎসনা করবেনা এবং ঘরের ভেতরে ব্যতিত তার সঙ্গ পরিহার করবেনা।"

মনে রাখতে হবে, নারীর ভেতরে পূর্ণতা কল্পনা করা যায়না। সে যেমন আছে, তেমনভাবেই তাকে গ্রহণ করতে হবে। রাসূল সা. বলেন : "নারীদের প্রতি সদিচ্ছা পোষণ করো। কেননা নারীকে পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পাঁজরের হাড়ের উপরের অংশ সবচেয়ে বেশি বাঁকা। তুমি যদি তাকে সোজা করতে যাও, তবে ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি যেমন আছে তেমন রেখে দাও, তবে তা চিরদিনই বাঁকা থাকবে।" -বুখারি, মুসলিম।

এ হাদিসে এই মর্মে ইঙ্গিত রয়েছে যে, নারী মাত্রেরই স্বভাব চরিত্রে জন্মগত বক্রতা রয়েছে। তাকে সংশোধন করা অসম্ভব। ধনুক আকৃতি বিশিষ্ট পাঁজরের বাঁকা হাড়ের ন্যায় তার স্বভাব বাঁকা। তাকে সোজা করা সম্ভব নয়। এতদসত্ত্বেও নারীর মধ্যে যা কিছু দোষগুণ আছে তা সহকারেই তার সাথে সহাবস্থান করা এবং তার সাথে যতো ভালো সম্ভব, ততো ভালো ব্যবহার করা অপরিহার্য। তাই বলে তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া ও সঠিক পথে পরিচালিত করা যাবেনা তা নয়। যখন সে কোনো ব্যাপারে বেঁকে বসবে, তখন তাকে বিচক্ষণতার সাথে ও সুকৌশলে সঠিক পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করতে হবে। কখনো কখনো স্বামী তার স্ত্রীর উত্তম বৈশিষ্ট্য ও মন্দগুণাবলীর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেনা। পরন্তু তার স্বভাবের কেবল অপছন্দনীয় বৈশিষ্ট্যগুলোই স্বামীর চোখে বড় হয়ে ধরা দেয়। এজন্য ইসলাম নারীর দোষ

ও গুণের তুলনামূলক বিচার বিবেচনা করার উপদেশ দেয়। কেননা তার ভেতরে যদি কিছু অপছন্দনীয় জিনিস সে দেখতে পেয়ে থাকে, তবে অবশ্যই কিছু পছন্দনীয় জিনিসও দেখতে পাবে। রসূলুল্লাহ সা. বলেন, "কোনো মুমিন পুরুষের পক্ষে কোনো মুমিন নারীকে ঘৃণা করা বাঞ্ছনীয় নয়। যদি তার কোনো স্বভাব তার নিকট অপছন্দনীয় হয় তবে তার অন্য একটি স্বভাব তার কাছে পছন্দনীয় হবে।"

২. স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণ : স্ত্রীকে এমন প্রত্যেক জিনিস থেকে হেফাযত করা স্বামীর কর্তব্য, যা তার মান, সম্ভ্রম ও সুখ্যাতির উপর কালিমা লেপন করে। এ হচ্ছে আত্মশ্রদ্ধা ও আত্মসম্ভ্রমবোধ, যা আল্লাহর নিকট অত্যধিক প্রিয়। বুখারি বর্ণনা করেন :

রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, আল্লাহ আত্মসম্ভ্রমী, মুমিনও আত্মসম্ভ্রমী। আল্লাহর আত্মসম্ভ্রমবোধ হলো, বান্দাকে যা করতে নিষেধ করা হয়েছে তা যেন না করে।" ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেন, রসূল সা. বলেছেন, আল্লাহর চেয়ে অভিমানী আর কেউ নেই। তিনি অভিমানী বলেই প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীল ও লজ্জাজনক কাজকে নিষিদ্ধ করেছেন। আল্লাহর চেয়ে বেশি নিজের প্রশংসা পছন্দকারী কেউ নেই। তাই তিনি নিজের প্রশংসা নিজেই করেছেন। আর আল্লাহর চেয়ে বেশি ওজর পছন্দকারী কেউ নেই। এজন্যই তিনি মানুষের সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে নবী ও রসূল পাঠিয়েছেন (যাতে মানুষ এই ওজর বাহানা না দিতে পারে যে, আখেরাতের কথা তার জানা ছিলনা)। সাদ বিন উবাদা রা. বললেন, আমি যদি কোনো পুরুষকে আমার স্ত্রীর সাথে দেখি, তাহলে তাকে তৎক্ষণাত তরবারী দিয়ে আঘাত করবো। রসূলুল্লাহ সা. বললেন, তোমরা সাদের আত্মাভিমান দেখে অবাক হচ্ছো? আমি ওর চেয়েও বেশি আত্মাভিমানী। আর আল্লাহ আমার চেয়েও আত্মাভিমানী। আল্লাহ তার আত্মাভিমানের কারণেই গোপন ও প্রকাশ্য অশ্লীলতাকে নিষিদ্ধ করেছেন।" ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন, রসূল সা. বলেছেন, তিন ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না : পিতামাতার অবাধ্য সন্তান, দায়ুস ও পুরুষ বেশধারী নারী। -নাসায়ী, বাযযার, হাকেম। আম্মার বিন ইয়াসার থেকে বর্ণিত; রসূল সা. বলেছেন, তিন ব্যক্তি কখনো বেহেশতে যেতে পারবে না : দাইয়ুস, পুরুষ সদৃশ নারী ও মদখোর। লোকেরা বললো : হে রসূলুল্লাহ, মদখোরকে তো চিনি। দাইয়ুস কে? রসূল সা. বললেন, যে ব্যক্তি তার পরিবার পরিজনের কাছে কে আসা যাওয়া করে, তার খোঁজ খবর রাখেনা। আমরা বললাম, পুরুষ সদৃশ নারী কে? তিনি বললেন, যে নারী পুরুষের মতো বেশভূষা অবলম্বন করে। -তাবরানি।

ইমাম মুনযিরি বলেছেন, উপরোক্ত হাদিসের সনদে বিতর্কিত কোনো বর্ণনাকারী নেই। তবে মনে রাখতে হবে, স্বামীর যেমন স্ত্রীর প্রতি কঠোর আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন থাকা উচিত, তেমনি এই আত্মমর্যাদাবোধে তার মধ্যপন্থী ও ভারসাম্যপূর্ণ হওয়াও কর্তব্য। কাজেই তার বিরুদ্ধে খারাপ ধারণা পোষণে, তার প্রতিটি চলন বলন পর্যবেক্ষণ ও তদারকীতে এবং তার সকল দোষত্রুটি গণনায় বাড়াবাড়ি করা অনুচিত। কেননা এতে দাম্পত্য সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং আল্লাহ যেসব বন্ধনকে জুড়ে দেয়ার আদেশ দিয়েছেন, তা ছিন্ন হয়। জাবের বিন আব্বরা থেকে আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে হাববান বর্ণনা করেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, কিছু আত্মমর্যাদাবোধ এমন আছে যা আল্লাহ পছন্দ করেন, আর

কিছু আত্মমর্যাদাবোধ এমনও আছে যা আল্লাহ্ অপছন্দ করেন। কিছু গর্ববোধ এমন আছে, যা আল্লাহ্ পছন্দ করেন, আর কিছু গর্ববোধ এমন আছে যা আল্লাহ্ অপছন্দ করেন। যে আত্মমর্যাদাবোধ আল্লাহ্ পছন্দ করেন তা হচ্ছে সন্দেহ হলে আত্মমর্যাদাবোধ। আর যে আত্মমর্যাদাবোধ আল্লাহ্ অপছন্দ করেন তা হলো যেখানে কোনো সন্দেহ নেই সেখানে আত্মমর্যাদাবোধ। আর যে গর্ববোধ আল্লাহ্ পছন্দ করেন, তা হলো, যুদ্ধে ও বিপদে নিজের সম্পর্কে গর্ববোধ। আর যে গর্ববোধ আল্লাহ্ অপছন্দ করেন, তা হলো অন্যায় ও অবৈধ কাজে গর্ববোধ।" আলী রা. বলেছেন, তোমার স্ত্রীর উপর অতিমাত্রায় আত্মমর্যাবোধসম্পন্ন হয়োনা। তাহলে তোমার কারণে তোমাদের উভয়ের মধ্যে পাল্টাপাল্টি খারাপ ধারণা পোষণ চলতে থাকবে।" বস্তুত খারাপ ধারণা পোষণ ও সন্দেহ প্রবণতা আল্লাহ্ অপছন্দ করেন।

৩. স্ত্রীর সাথে স্বামীর যৌন মিলন : ইবনে হাযম বলেছেন, প্রতি পবিত্রতার মেয়াদে (ঋতুস্রাব মুক্ত সময়ে) অন্তত একবার সহবাস করা সামর্থ্যবান স্বামীর উপর ফরয। অন্যথায় সে গুনাহগার ও আল্লাহর অবাধ্য গণ্য হবে। এর প্রমাণ হচ্ছে সূরা বাকারার ২২২ নং আয়াতের নিম্নোক্ত অংশ : فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ○

"অতপর যখন স্ত্রীরা পবিত্র হবে তখন তোমরা আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী তাদের নিকট যেও।" অধিকাংশ আলেম ইবনে হাযমের এই মত সমর্থন করেছেন যে, স্বামীর যদি কোনো ওযর না থাকে তবে এটা তার জন্য বাধ্যতামূলক। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, এটা ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক নয়। কেননা ওটা তার অধিকার। তাই অন্যান্য অধিকারের মতোই বাধ্যতামূলক নয়। ইমাম আহমদ বলেছেন, চার মাসের মধ্যে একবার সহবাস করতে হবে। আর যখন স্ত্রীকে রেখে প্রবাসে যাবে, তখন যদি এমন কোনো ওযর না থাকে, যা তাকে দেশে প্রত্যাবর্তনে বাধা দেয়, তাহলে তার জন্য ইমাম আহমদ সর্বোচ্চ ছয় মাসের সময় বেঁধে দিয়েছেন। এর মধ্যে তাকে স্ত্রীর কাছে ফিরতে হবে। ইমাম আহমদকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, স্বামী কতো দিন স্ত্রীর কাছ থেকে অনুপস্থিত থাকতে পারে? তিনি বললেন, ছয় মাস। এরপর তাকে ফিরে আসতে বার্তা পাঠাতে হবে। যদি না আসে, তবে শাসক তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবে। এর প্রমাণ এই যে, যায়দ ইবনে আসলাম বর্ণনা করেন, উমর ইবনুল খাত্তাব মদিনার গলিগলিতে ঘুরে জনগণের অবস্থা পরিদর্শনের সময় শুনতে পেলেন, জনৈকা মহিলা নিম্নরূপ কবিতা আবৃতি করছে : "আহ, আজকের রাতটা কতো লম্বা ও কী অন্ধকার! অনেক দিন কেটে গেছে আমার বন্ধু নেই, যার সাথে আমোদ ফূর্তি করবো। আল্লাহর কসম, আমার যদি একমাত্র আল্লাহর ভয় না থাকতো, তাহলে এই খাটটির চারপাশ আন্দোলিত হতো। কেবল আমার প্রতিপালক ও লজ্জা আমাকে সংযত রাখছে। আর আমার স্বামীকে আমি ভক্তি করি। তাই কাউকে তার বিছানা মাড়াতে দেইনা।" উমর রা. উক্ত মহিলার পরিচয় অনুসন্ধান করলেন। তাকে বলা হলো, সে অমুক মহিলা। তার স্বামী বিদেশে আল্লাহর পথে জিহাদে নিয়োজিত। তারপর তার মেয়ে হাফসার নিকট গিয়ে বললেন, "হে মেয়ে, নারী, স্বামী ছাড়া কতোদিন ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারে?" হাফসা বললেন, সুবহানাল্লাহ, আপনার আমার নিকট এই প্রশ্ন করছেন? (অর্থাৎ পিতা হয়ে মেয়ের নিকট এ প্রশ্ন করা লজ্জাজনক ও বিব্রতকর) উমর রা. বললেন, আমি যদি মুসলমানদের কল্যাণ চিন্তা না করতাম তবে তোমাকে এ প্রশ্ন করতামনা। হাফসা বললেন, "পাঁচ থেকে ছয় মাস।" তখন উমর রা. জনগণের যুদ্ধ

বিগ্রহে থাকার জন্য ছয় মাস সময় নির্ধারিত করে দিলেন। এক মাস কর্মস্থালে যাওয়ার জন্য। এক মাস ফিরে আসার জন্য এবং চার মাস কর্মস্থলে অবস্থানের জন্য। শাফেয়ী মাযহাবের ইমাম গাযযালী বলেছেন, প্রত্যেক চারদিনের মধ্যে একবার স্ত্রী সহবাস করা সর্বাপেক্ষা সুবিচারসম্মত। কেননা স্ত্রী সর্বোচ্চ সংখ্যা চারজন। তাই চারদিন পর্যন্ত বিলম্ব করা বৈধ। তবে স্ত্রীর সতিত্ব রক্ষার প্রয়োজনের এই পরিমাণ কমানো বাড়ানো বাঞ্ছনীয়। কেননা তার সতিত্ব রক্ষা করা স্বামীর কর্তব্য। সংগমের দাবি জানানোর কোনো বাধ্যবাধকতার প্রমাণ নেই বটে। কেননা এ ধরনের দাবি তোলা ও তা পূরণ করা খুবই কঠিন।

মুহাম্মদ বিন মান গিফারী বলেন, জনৈকা মহিলা উমর রা.-এর নিকট এলো এবং বললো, হে আমীরুল মুমিনীন, আমার স্বামী দিনে রোযা রাখে এবং রাতে নামায পড়ে। (অর্থাৎ নফল নামায পড়ে ও রোযা রাখে) আমি তার আল্লাহর ইবাদতের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা পছন্দ করি না। উমর রা. বললেন, তোমার স্বামী তো খুবই ভালো স্বামী। এরপরও মহিলা তার কথা পুনরাবৃত্তি করলো। আর উমর রা. তার জবাবের পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন। এক পর্যায়ে কা'ব আসাদী উমর রা.কে বললো, হে আমীরুল মুমিনীন, এই মহিলা তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে যে, সে তার বিছানা থেকে মহিলাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। উমর রা. বললেন, তুমি যখন মহিলার কথা বুঝেছো, তখন বিবাদটা তুমিই মিটিয়ে দাও। কা'ব বললেন, আমার নিকট মহিলার স্বামীকে হাজির করতে হবে। তাকে হাজির করানো হলো। কা'ব তাকে বললেন, তোমার স্ত্রী তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করছে। স্বামী বললো, খাবারের ব্যাপারে নাকি? কা'ব বললেন, না। তখন মহিলা বললো, হে জ্ঞানী বিচারক, আমার বন্ধুকে তার মসজিদ আমার কাছ থেকে বেখবর করে দিয়েছে। তার ইবাদত তাকে আমার বিছানা থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। সুতরাং হে কা'ব, কোনো দ্বিধা সংকোচ না করে ফায়সালা করে দিন। তার রাত ও দিন তাকে ঘুমাতে দেয় না। বিশেষ করে মহিলাদের ব্যাপারে তার আচরণকে আমি প্রশংসা করতে পারছিনা।

তার স্বামী বললো : সূরা নাহল ও সাতটি দীর্ঘ সূরায় যা কিছু নাযিল হয়েছে তা এবং আল্লাহর কিতাবের সর্বত্র যে ভয়াবহ সতর্ক বাণী রয়েছে, সেইসব মিলে নারী ও তার ঘরের কথা আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে।

কা'ব বললেন : "হে পুরুষ, তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হক রয়েছে। চার দিনে একদিন তার ন্যায্য হিস্সা। কাজেই এই হিস্সা তাকে দিয়ে দাও। টালবাহানা বর্জন করো। এরপর কা'ব আরো বললেন, আল্লাহ তোমার জন্য দুজন, তিনজন বা চারজন স্ত্রী গ্রহণ হালাল করেছেন। এরপর তোমার হাতে তিন দিন তিন রাত অবশিষ্ট থাকছে। সেই কদিন তুমি নফল ইবাদত যত ইচ্ছা করতে পারো। উমর রা. বললেন, হে কা'ব, আমি বুঝতে পারছিনা তোমার দুটি কাজের কোনটিতে আমি বেশি মুগ্ধ। এই দম্পতির সমস্যার উপলব্ধি, না তাদের বিপদের নিষ্পত্তি? যা হোক, তুমি যাও, তোমাকে বসরার কাযী নিয়োগ করলাম। হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়েছে, স্ত্রীর সাথে স্বামীর সহবাস একটি সদকা যার জন্য আল্লাহ সওয়াব দিয়ে থাকেন। মুসলিম বর্ণনা করেন, রসূল সা. বলেছেন, তোমার স্ত্রীর সাথে তোমার যৌন মিলনেও তোমার জন্য পুরস্কার রয়েছে। লোকেরা বললো, হে রসূলুল্লাহ, আমরা আমাদের কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবো, তাতেও পুরস্কার? রসূল সা. বললেন, ভেবে দেখো তো, তোমরা যদি এ কাজটা হারাম উপায়ে করতে, তবে কি তাতে গুনাহ হতো না? তেমনি হালাল উপায়ে করার জন্য তোমরা পুরস্কৃত হবে।" স্ত্রী

যাতে পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করে সেজন্য আদর, সোহাগ, চুম্বন, আলিঙ্গন, ইত্যাদিতে সময় ক্ষেপণ করা মুস্তাহাব। আবু ইয়ালা আনাস বিন মালেক রা. থেকে বর্ণনা করেন : রসূল সা. বলেছেন, তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করো তখন যথাযথভাবে তা করো। স্ত্রীর পূর্ণ তৃপ্তি লাভের আগে যখন পুরুষ তৃপ্তি লাভ করে, তখন পুরুষ যেন তাড়াহুড়ো করে উঠে না যায়, যতোক্ষণ না স্ত্রী পূর্ণ তৃপ্তি পায়।" ইতিপূর্বে রসূল সা.-এর এ উক্তিও উদ্ধৃত করা হয়েছে, "কুমারী মেয়ে কেন বিয়ে করলে না যে তোমার সাথে আমোদ ফূর্তি করতো এবং তুমিও তার সাথে আমোদ প্রমোদ করতে?"

৪. সহবাসের সময় পুরোপুরি নগ্ন না হওয়া চাই : ইসলাম সকল অবস্থায় সতর ঢেকে রাখার আদেশ দিয়েছে একমাত্র সেই অবস্থা ব্যতিত, যখন সতর খোলার প্রয়োজন হয়। বাহয বিন হাকিমের দাদা রাসূল সা.কে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে রসূলুল্লাহ, আমাদের শরীরের গোপনীয় অংশের কতোটুকু ঢাকবো আর কতোটুকু খুলবো? তিনি বললেন, তোমার স্ত্রী বা বাদী ব্যতিত আর সবার দৃষ্টি থেকে শরীরের গোপন অংশ লুকিয়ে রাখো। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হলো, হে রসূলুল্লাহ, যখন একজন আর একজনের সাথে সংগমরত হয় তখন? রসূল সা. বললেন, যদি গুপ্ত অংগ না দেখে পারা যায় তবে যেন না দেখে। আবার জিজ্ঞাসা করা হলো, যখন আমাদের কেউ একেবারেই নির্জন স্থানে অবস্থান করে? রসূল সা. বললেন, মানুষের চেয়ে আল্লাহ থেকে বেশি লজ্জা করা উচিত।" (তিরমিযি)

সহবাসের সময় সতর খোলা জায়েয। কিন্তু তা রসূল সা. বলেছেন, সহবাসের সময় স্বামী স্ত্রীর পুরোপুরি নগ্ন হওয়া উচিত নয়। উতবা বিন আবদ সুলাইমি থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, তোমরা যখন স্ত্রীর সাথে সংগম করো তখন যথাসাধ্য সতর ঢাকো এবং গাধা গাধীর মতো উলংগ হয়ো না। (ইবনে মাজাহ)। ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন :

রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, সাবধান, নগ্ন হয়োনা। কেননা তোমাদের সাথে এমন ফেরেশতা রয়েছেন, যারা কখনো তোমাদেরকে ছেড়ে যাননা একমাত্র পেশাব পায়খানা করার সময় ব্যতিত এবং স্ত্রী সংগমের সময় ব্যতিত। সুতরাং তোমরা তাদের থেকে লজ্জা করো এবং তাদেরকে সম্মান করো (তিরমিযি)। আয়েশা রা. বলেছেন, রসূল সা. কখনো আমার দেহের গুপ্তাংশ দেখেননি, আর আমিও তার দেহের গুপ্তাংশ দেখিনি।

৫. সহবাসের সময় বিসমিল্লাহ বলা : সহবাসের সময় আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নত। বুখারি ও মুসলিম ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন :

بِسْمِ اللّٰهِ ... اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا .

রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাদের কোনো ব্যক্তি স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হওয়ার প্রাক্কালে যদি বিসমিল্লাহির রাহমানির রহীম, আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ শায়তান ওয়া জান্নিবিশ শয়তানা মা রযাকতানা" (পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে, হে আল্লাহ আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখো এবং আমাদের ভাবি সন্তান থেকে শয়তানকে দূরে রাখো) তাহলে সেই সহবাসের ফলে তাদের দু'জনের জন্য যদি কোনো সন্তান বরাদ্দ করা হয়, তাহলে শয়তান সেখানে সেই সন্তানের ক্ষতি করতে পারবেনা।

৬. সহবাস চলাকালে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সহবাস সংক্রান্ত বাক্যালাপ : সহবাসের বিষয় আলোচনা করা ও অন্যদেরকে জানানো শিষ্টাচারের পরিপন্থী এবং একেবারেই নিরর্থক ও

নিষ্প্রয়োজন। এ বিষয়ে কিছু বলার একান্ত প্রয়োজন দেখা না দিলে এটা পরিহার করাই বাঞ্ছনীয়। সহীহ হাদিসে রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, নিষ্প্রয়োজনীয় জিনিস পরিহার করা ইসলামের সৌন্দর্যের অংশ। আল্লাহ তায়ালাও বেহুদা ও নিষ্প্রয়োজন জিনিস পরিহারকারীদের প্রশংসা করেছেন وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

"(মুক্তি পাবে তারাও) যারা বেহুদা কাজ ও কথা পরিহার করে।" (সূরা মুমিনুন : ৩)

অবশ্য এ বিষয়ে কাউকে কিছু বলা অনিবার্য হয়ে পড়লে তাতে দোষ নেই। জনৈকা মহিলা রসূল সা.-এর নিকট অভিযোগ করেছিল যে, তার স্বামী তার সাথে সহবাসে অক্ষম। তখন তার স্বামী বললো, "হে রসূলুল্লাহ, আমি তাকে পাকা চামড়া যেভাবে ঝাঁকানো হয় সেভাবে ঝাঁকাই।" তবে স্বামী বা স্ত্রী যখন সহবাসের বিস্তারিত বিবরণকে অত্যাবশ্যক পর্যায়ের চেয়ে বেশি সম্প্রসারিত করে এবং উভয়ের মধ্যকার গোপন কাজের খুঁটিনাটি প্রকাশ করে, তখন তা হারাম কাজ হয়ে যায়। আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, কেয়ামতের দিন আল্লার দৃষ্টিতে খারাপ বিবেচিত হবে সেই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর সাথে গোপনে মিলিত হয় এবং স্ত্রীও তার সাথে গোপনে মিলিত হয়, অতপর সেই গোপন মিলনের কথা জনসমক্ষে প্রকাশ করে।" (আহমদ) আর আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. নামায পড়ালেন। সালাম ফেরানোর পর নামাযীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন পুরুষ কেউ আছে কি, যে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে গিয়ে দরজা বন্ধ করে ও সতর খোলে, তারপর বের হয়ে লোকজনকে বলে, আমার স্ত্রীর সাথে এরূপ এরূপ করছি" লোকেরা চুপ থাকলো। এরপর তিনি মহিলাদের দিকে মুখ ফেরালেন এবং বললেন, তোমাদের মধ্যে কোনো মহিলা এমন আছে কি যে এসব কথা প্রকাশ করে? তখন জনৈকা যুবতী হাঁটুর উপর ভর করে ঘাড় উঁচু করে মাথা তুলতে লাগলো, যাতে রসূল সা. তাকে দেখতে পান ও তার কথা শুনতে পান। সে বললো, জ্বি, আল্লাহর কসম, পুরুষরাও এসব বিষয়ে কথা বলেন, মহিলারাও বলে। রসূলুল্লাহ সা. বললেন, "তোমরা জানো, যারা এ রকম করে, তাদের উদাহরণ কী? যারা এ ধরনের কাজ করে তারা সেই শয়তান পুরুষ ও শয়তান মহিলার মতো, যাদের একটা সড়কের উপর পরস্পরের সাক্ষাৎ হয়, আর তখনই জনতার চোখের সামনেই পুরুষটি মহিলারটির সাথে নিজের লালসা চরিতার্থ করে।" (আহমদ, আবু দাউদ)

৭. অস্বাভাবিক পন্থায় যৌন লালসা চরিতার্থ করা : নারীর মলদ্বারে সহবাস করা অত্যন্ত ঘৃণ্য, স্বভাব বিরুদ্ধ ও হারাম কাজ। আল্লাহ বলেন :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ

"তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্রস্বরূপ। কাজেই তোমাদের ক্ষেতে তোমরা যেভাবে ইচ্ছা যেতে পারো।" শস্য ক্ষেত বলা হয় সেই ভূমিকে যাতে চাষ করা হয় ও বীজ বোনা হয়। (সূরা বাকারা, ২২৩)। এখানে শস্যক্ষেত দ্বারা সন্তান প্রজননের ক্ষেত্র বুঝানো হয়েছে। আর শস্যক্ষেতে যাওয়ার আদেশ দ্বারা স্পষ্টতই নারীর যৌনাঙ্গে সহবাস বুঝানো হয়েছে। কেননা একমাত্র যোনিপথ দিয়েই সন্তান প্রজনন সম্ভব। আরব কবি বলেন :

"জরায়ু আমাদের জন্য শস্যক্ষেত। সেখানে চাষ করাই আমাদের কর্তব্য। আর ফসল ফলানো আল্লাহর কাজ।" উল্লিখিত আয়াত নাযিল হওয়ার উপলক্ষ প্রসংগে বুখারি ও

মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে : "রসূলুল্লাহ সা. এর আমালে ইহুদীরা ধারণা করতো যে, স্বামী যদি স্ত্রীর পশ্চাতদিক থেকে যৌনাংগে সংগম করে, তবে সন্তান টেরাচোখা হয়। এ ব্যাপারে আনসারগণ ইহুদীদের অনুসরণ করতো। এজন্য আল্লাহ নাযিল করলেন, তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত। কাজেই তোমাদের শস্যক্ষেতে তোমরা যেভাবে ইচ্ছা যাও।" অর্থাৎ সন্তান উৎপাদনের লক্ষ্য নিয়ে যৌনাংগে সংগম করলেই হলো, তা যেভাবেই হোক।

মলদ্বারে সংগম করায় নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত একাধিক হাদিস এসেছে। আহমদ, তিরমিযি ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "নারীদের মলদ্বারে সংগম করোনা।" রসূল সা. আরো বলেছেন, মলদ্বারে সংগম লূত আ. এর জাতির কাজ।" আহমদ আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ, আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেন :

রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর মলদ্বারে সংগম করে সে অভিশপ্ত।"

ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, স্বামী যখন স্ত্রীর মলদ্বারে সংগম করে আর স্ত্রী তাতে স্বামীর আনুগত্য করে, তখন উভয়কেই শাস্তি দেয়া হবে। নচেত উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো হবে।

৮. আযল ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ : [যৌনাংগের বাইরে বীর্যপাত করা] ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, ইসলাম জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে সমর্থন করে। কেননা এটা জাতিসমূহের শক্তি ও নিরাপত্তার প্রতীক। একমাত্র জনবহুল জাতিই সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। রসূল সা.-এর নিম্নোক্ত উক্তি এটিকে শরিয়তের দৃষ্টিতেও জরুরি সাব্যস্ত করে, "তোমরা অধিক সন্তান প্রসবিনী মমতাময়ী নারীদেরকে বিয়ে করো। কেননা কেয়ামতের দিন আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্ব করবো।" তথাপি ইসলাম বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সন্তান সংখ্যা সীমিত করতে নিষেধ করে না, চাই তা গর্ভনিরোধক ওষুধ ব্যবহার দ্বারা হোক কিংবা অন্য কোনো উপায়ে হোক।

কোনো ব্যক্তি যদি এত বেশি সন্তানের অধিকারী হয় যে, তাদেরকে সঠিকভাবে লালন পালনে সক্ষম নয়, তাহলে তার জন্য জন্ম নিয়ন্ত্রণ বৈধ। অনুরূপ, যখন স্ত্রী দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারিণী হয়, কিংবা তার বিরতিহীনভাবে গর্ভধারণ করার আশংকা থাকে, অথবা স্বামী দরিদ্র হয়। এসব অবস্থায় সন্তান প্রজননকে সীমিত করা জায়েয। এমনকি কোনো কোনো আলেমের মতে, এসব অবস্থায় জন্ম নিয়ন্ত্রণ শুধু জায়েয নয় বরং মুস্তাহাব। অধিক সংখ্যক সন্তান প্রসবে স্ত্রীর সৌন্দর্যহানির আশংকা থাকলেও ইমাম গাযযালীর মতে, জন্ম নিয়ন্ত্রণ বৈধ। কিছু সংখ্যক আলেম শর্তহীনভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রণ বৈধ বলে রায় দিয়েছেন। তাদের প্রমাণ নিম্নরূপ :

১. বুখারি ও মুসলিম জাবের রা. থেকে বর্ণনা করেন : "আমরা রসূল সা. -এর আমলে কুরআন নাযিল হতে থাকা অবস্থায় আযল করতাম।

২. জাবের থেকে মুসলিম বর্ণনা করেন : "আমরা রসূল সা.-এর আমলে আযল করতাম। এটা জেনেও রসূল সা. আমাদের নিষেধ করেননি।"

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, আমরা বেশ কয়েকজন সাহাবি সম্পর্কে জেনেছি যে, তারা এর অনুমতি দিয়েছেন এবং এতে কোনো আপত্তি করেননি। বায়হাকি বলেছেন, সাদ বিন আবি

ওয়াক্কাস, আবু আইয়ুব আনসারি, যায়দ বিন ছাবেত, ইবনে আব্বাস প্রমুখ আযলকে জায়েয মনে করতেন। এটা মালেক ও শাফেয়ীর মত। উমর ও আলী রা. একমত ছিলেন যে, গর্ভস্থ ভ্রূণ সাতটি পর্যায় অতিক্রম না করলে তা নষ্ট করাকে শিশু হত্যা বলা যাবেনা। কাযী আবু ইয়ালা বর্ণনা করেছেন, উমরের নিকট আলী, যুবায়ের ও সাদসহ কতিপয় সাহাবি বসেছিলেন এবং আযল সম্পর্কে কথা বলছিলেন। তারা সবাই বলেন, এতে কোনো বাধা নেই। এক ব্যক্তি বললো, কেউ কেউ তো একে ছোট আকারের শিশু হত্যা বলে আখ্যা দিচ্ছে। আলী রা. মত দিলেন, শিশু হত্যা গণ্য হবে কেবল সাতটি স্তর অতিক্রম করার পর হত্যা করলে : প্রথমে কাদামাটি, তারপর বীর্য, তারপর মাটিরক্ত, তারপর গোশতের টুকরো, তারপর হাড়গোড়, তারপর গোশত, তারপর পূর্ণাঙ্গ অবয়ব। উমর রা. বললেন, আপনি ঠিক বলেছেন, আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন। যাহেরী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, গর্ভনিরোধ সম্পূর্ণরূপে হারাম। কেননা জুয়াসা বিনতে ওহাব বর্ণনা করেছেন : "একজন লোক রসূল সা. কে জিজ্ঞাসা করলো আযল কেমন? তিনি জবাব দিলেন, এটা গোপন শিশু হত্যা।

ইমাম গাযযালী এই প্রমাণ খণ্ডন করে বলেন, একাধিক সহীহ হাদিস থেকে আযল বৈধ প্রমাণিত হয়। উল্লিখিত হাদিসে "গোপন শিশু হত্যা" কথাটা "গোপন শিরক" এর সাথে তুলনীয়। এ দ্বারা মাকরূহ প্রমাণিত হয়, হারাম প্রমাণিত হয়না। আর মাকরূহ অর্থ হচ্ছে অপছন্দনীয়। হানাফিদের কেউ কেউ মনে করেন, স্ত্রী অনুমতি দিলে আযল জায়েয, অন্যথায় মাকরূহ।

৯. গর্ভপাতের বিধান : জরায়ুতে বীর্য স্থিতিশীল হওয়ার একশো বিশ দিন পর ভ্রূণ হত্যা জায়েয নেই। কেননা তখন এ কাজ প্রাণ হননের পদক্ষেপ গণ্য হবে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হবে। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "তোমাদের কোনো ব্যক্তি তার মায়ের পেটে চল্লিশ দিন বীর্যের আকারে সঞ্চিত থাকে, তারপর সে জমাট রক্তে পরিণত হয়, তারপর মাংসপিণ্ডে। তারপর তার ভেতরে প্রাণ সঞ্চার করা হয় এবং চারটা কথা লিখে দেয়া হয় : তার জীবিকা, তার আয়ুষ্কাল, তার কার্যকলাপ এবং সে সৌভাগ্যশালী হবে অথবা দুর্ভাগা।"

একশো বিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে গর্ভপাত বা ভ্রূণ নষ্ট করা অনিবার্য প্রয়োজনে বৈধ। কোনো বাস্তব কারণ না থাকলে, তা মাকরূহ। 'সুবুলুস সালাম' গ্রন্থের লেখক বলেন, প্রাণ সঞ্চারের পূর্বে ভ্রূণ নষ্ট করার জন্য ওষুধ প্রয়োগ জায়েয কিনা, তা আযল জায়েয হওয়ার মতোই বিতর্কিত। যিনি আযলকে জায়েয বলেন, তিনি ওষুধ প্রয়োগকেও জায়েয বলেন। আর যিনি হারাম বলেন, তিনি এটিকে হারাম বলেন। গর্ভধারণ শুরু থেকেই রোধ করে এমন ব্যবস্থা মহিলাদের গ্রহণ করার ব্যাপারে একই বিধান প্রযোজ্য।

ইমাম গাযযালী বলেন, গর্ভপাত গর্ভে বিদ্যমান বস্তুর বিরুদ্ধে একটি অপরাধ। এর একাধিক স্তর রয়েছে। জরায়ুতে বীর্যপাত হওয়া। তা নারীর বীর্যের সাথে মিশ্রিত হওয়া, তা প্রাণ সঞ্চারের যোগ্য হওয়া, এরপর এটিকে নষ্ট করা অপরাধ। তারপর যখন জমাট রক্ত ও মাংসপিণ্ডের রূপ নেয়, তখন তা ফেলে দেয়া নিকৃষ্টতর অপরাধ। তাতে প্রাণ সঞ্চারণের পর ও পূর্ণ অবয়ব সৃষ্টির পর ফেলে দেয়া আরো বড় অপরাধ।

২৭. ইলা

সংজ্ঞা

ইলার আভিধানিক অর্থ কোনো কাজ না করার কসম খাওয়া। আর শরিয়তের পরিভাষায় স্ত্রীর সাথে সহবাস না করার জন্য কসম খাওয়া। এ ব্যাপারে আল্লাহর নামে কসম খাওয়া হোক বা রোযা, সদকা, হজ্জ বা তালাকের মান্নত করা হোক, সবই সমান। জাহেলি যুগে স্বামী এক বছর, দু'বছর বা তারও বেশি সময়ের জন্য স্ত্রীকে স্পর্শ কররে না বলে কসম খেতো। এর উদ্দেশ্যে হতো, স্ত্রীকে নির্যাতন করা বা ক্ষতি করা। ফলে তাকে ঝুলন্ত রেখে দেয়া হতো। সে না থাকতো স্ত্রী, না হতো তালাকপ্রাপ্তা। আল্লাহ এই ক্ষতিকর কাজটির জন্য একটা সীমা নির্ধারণের ইচ্ছা করলেন। তাই এর জন্য চার মাস মেয়াদ নির্ধারণ করলেন। এই সময় স্বামীর মেজায নরম হবে। হয়তো বা তার সুমতি ফিরে আসবে। এই সময়ের মধ্যে বা তার শেষ ভাগে যদি সুমতি ফিরে আসে, কসম ভেঙে স্ত্রীকে স্পর্শ করে এবং কসমের কাফফারা দেয়, তাহলে তো ভালো। নচেত তালাক দেবে। আল্লাহ সূরা বাকারার ২২৭ নং আয়াতে বলেন :

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ج فَإِنْ فَاءُوْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○
وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

"যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে ইলা করে, তাদের জন্য চার মাস অপেক্ষা করা বাঞ্ছনীয়। তারপর যদি তারা ইলা থেকে ফিরে না আসে, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়। আর যদি তালাক দেয়ার সংকল্প নেয়, তাহলে আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।"

ইলার মেয়াদকাল

আলেমগণ একমত, চার মাসের চেয়ে বেশি সময়ের জন্য স্ত্রীকে স্পর্শ না করার কসম খেলেই 'ইলা' হয়ে যাবে এবং মেয়াদটা কসম খাওয়ার মুহূর্ত থেকেই শুরু হবে। চার মাসের জন্য স্পর্শ না করার কসম খেলে কি হবে, তা নিয়ে মতভেদ হয়েছে। আবু হানিফা ও তার শিষ্যদের মতে, এতেও ইলা হবে।

অন্যদের মতে ইলা হবেনা। কেননা আল্লাহ এর জন্য চার মাস মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন। এই মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার পর হয় ফিরে আসতে হবে, নচেত তালাক দিতে হবে।

ইলার বিধান

স্ত্রীর নিকটবর্তী হবেনা বলে কসম খাওয়ার পর চার মাসের মধ্যে স্ত্রীকে স্পর্শ করলে ইলার অবসান ঘটবে এবং কসমের কাফফারা দিতে হবে। আর যদি সহবাস ব্যতিতই মেয়াদ অতিবাহিত হয়ে যায় তাহলে অধিকাংশ আলেমের মতে, স্ত্রীর অধিকার থাকবে তার সাথে বসবাস করা অথবা তালাক দেয়ার দাবি জানানোর। কোনোটাই যদি না করে, তাহলে ইমাম মালেকের মতে, শাসক স্বামীর উপর তালাক কার্যকর করে স্ত্রীকে ক্ষতি থেকে মুক্তি দিতে পারে। আহমদ ও শাফেয়ীর মতে, আদালত স্বামীর উপর তালাক কার্যকর করার পরিবর্তে তাকে চাপ দেবে ও ততোক্ষণ আটক রাখবে, যতোক্ষণ সে স্ত্রীকে নিজে থেকে তালাক না দেয়।

হানাফিদের মতে, বিনা সহবাসে মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার পর আপনা থেকেই স্ত্রীর উপর এক তালাক বায়েন পড়বে। এরপর স্বামীর তালাক প্রত্যাহারের সুযোগ থাকবেনা। কেননা

সে বিনা ওযরে সহবাস থেকে বিরত থেকে নিজের অধিকারের অপব্যবহার করেছে। এভাবে সে তার স্ত্রীর অধিকার নষ্ট করেছে ও তার উপর যুলুম করেছে। ইমাম মালেকের মতে, স্বামী যদি সহবাস থেকে বিরত থেকে স্ত্রীর ক্ষতি করার ইচ্ছা করে থাকে, তাহলে স্বামীর উপর ইলা কার্যকরী হবে। চাই সে কসম না খাক। কেননা কসম খেলে স্ত্রীর যে ক্ষতি হয়, এ ক্ষেত্রেও সেই ক্ষতি হয়।

ইলা দ্বারা যে তালাক সংঘটিত হয়

ইলা দ্বারা যে তালাক সংঘটিত হয়, সেটি বায়েন তালাক। কেননা সেটি যদি রজয়ী হতো, তাহলে স্বামী স্ত্রীকে তার কাছে ফিরে আসতে বাধ্য করার সুযোগ পেতো। কারণ সেটি স্বামীর অধিকার। কিন্তু এতে স্ত্রীর স্বার্থ সংরক্ষিত হয়না এবং তার ক্ষতিও দূর হয়না। এটাই আবু হানিফার মাযহাব। পক্ষান্তরে মালেক, শাফেয়ী, সাইদ ইবনুল মুসাইয়াব ও আবু বকর বিন আব্দুর রহমানের মতে, এটি রজয়ী অর্থাৎ প্রত্যাহারযোগ্য তালাক। কারণ এটা যে বায়েন তালাক, সে ব্যাপারে কোনো প্রমাণ নেই। তাছাড়া এটা এমন স্ত্রীর তালাক, যার সাথে সহবাস করা হয়েছে এবং যাকে কোনো বিনিময় ছাড়া এবং ফিরিয়ে নেয়ার নিশ্চয়তা ছাড়া তালাক দেয়া হয়েছে।

ইলাকৃত স্ত্রীর ইদ্দত

অধিকাংশ আলেমের মতে, ইলাকৃত স্ত্রী অন্যান্য স্ত্রীর মতোই ইদ্দত পালন করবে। কেননা সে তালাকপ্রাপ্ত। জাবের ইবনে যায়দ বলেন, তার ইদ্দত পালন জরুরি নয়, যদি তার চারমাসে তিনটে রক্তস্রাব হয়ে থাকে। ইবনে রুশদ বলেছেন, এর কারণ এই যে, ইদ্দত পালন করতে হয় জরায়ু পরিষ্কার করার জন্য। অথচ ইলার ক্ষেত্রে আপনা থেকে জরায়ু পরিষ্কার হয়ে যায়।

২৮. স্ত্রীর নিকট স্বামীর অধিকার

স্ত্রীর নিকট স্বামীর অধিকার হলো : আল্লাহর নাফরমানী হয় না এমন প্রতিটি হুকুমে স্বামীর আনুগত্য করা, স্বামীর সম্পদ ও নিজের সতিত্ব রক্ষা করা। স্বামী বিরক্ত ও বিব্রতবোধ করে এমন আচরণ থেকে বিরত থাকা স্ত্রীর কর্তব্য। সুতরাং স্বামীর সামনে মুখ কখনো বিষণ্ন ও মলিন করবেনা এবং স্বামী পছন্দ করেনা এমন বেশভূষা সহকারে কখনো তার সামনে আসবেনা। এটি হচ্ছে স্বামীর সবচেয়ে বড় অধিকারগুলোর অন্যতম। হাকেম আশেয়া রা. থেকে বর্ণনা করেন : আয়েশা রা. বলেছেন : আমি রসূলুল্লাহ্ সা.কে জিজ্ঞাসা করলাম : স্ত্রীর উপর কার অধিকার সবচেয়ে বেশি? তিনি বললেন : তার স্বামীর। আয়েশা পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন : পুরুষের উপর কার অধিকার সবচেয়ে বেশি? তিনি বললেন : তার মায়ের। এই অধিকারের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে রসূলুল্লাহ সা. বলেন : “আমি যদি কাউকে কারো জন্য সিজদা করার আদেশ দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে তার স্বামীর জন্য সিজদা করার আদেশ দিতাম। স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার এতই অগ্রগণ্য।” -আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ।

সূরা নিসার ৩৪ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা পুণ্যবতী নারীদের বিবরণ দিয়ে বলেছেন :

فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ .

“পুণ্যবতী নারীগণ অনুগত এবং আল্লাহ যে সকল জিনিসকে রক্ষণীয় গণ্য করেছেন,

সেগুলোকে স্বামীদের অনুপস্থিতিতেও সংরক্ষণ করে।" তারা স্বামীর সত্তা ও সম্পদে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেনা। এ হচ্ছে নারীর সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য। এ দ্বারাই দাম্পত্য জীবন স্থায়ী ও সুখময় হয়।

রাসূল সা. বলেছেন : "সর্বোত্তম স্ত্রী হচ্ছে সে, যার দিকে তাকালেই তুমি আনন্দবোধ করবে, যাকে কোনো আদেশ দিলে সে তোমার আনুগত্য করবে এবং যখন তুমি তার কাছ থেকে দূরে কোথাও যাবে, তখন সে তোমার সম্পদ ও নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করবে।" আর স্ত্রীর এই বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণকে আল্লাহর পথে জিহাদ সমতুল্য গণ্য করা হয়েছে। ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন : জনৈকা মহিলা রসূল সা.-এর কাছে এসে বললো : হে রসূলুল্লাহ, আমি মহিলাদের প্রতিনিধি হয়ে আপনার কাছে এসেছি। জিহাদ তো আল্লাহ পুরুষদের উপর ফরয করেছেন। পুরুষরা জয়ী হলে পুরস্কৃত হয়। আর নিহত হলে শহীদ হয় এবং আল্লাহর নিকট থেকে জীবিকার সরবরাহ পেতে থাকে। আর আমরা মহিলারা তাদের সংসারের রক্ষণাবেক্ষণ করি। এই জিহাদ থেকে আমরা কী পাবো? রসূলুল্লাহ সা. বললেন : "তোমার সাথে যে সকল মহিলার দেখা হবে, তাদের সবাইকে জানিয়ে দাও। স্বামীর আনুগত্য ও তার অধিকার প্রদান করা জিহাদে অংশগ্রহণের সমান। তবে এসব অধিকার যথাযথভাবে প্রদানকারী নারীর সংখ্যা খুবই কম।" এ অধিকার এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান যে, ইসলাম স্বামীর আনুগত্যকে দীনি কর্তব্য পালন ও আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়নের পাশাপাশি উল্লেখ করেছে। আবদুর রহমান বিন আওফ থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "নারী যখন তার পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে, এক মাসের রোযা রাখবে, নিজের সতিত্ব ও শ্লীলতা রক্ষা করবে এবং নিজের স্বামীর আদেশ-নিষেধ পালন করবে, তখন তাকে বলা হবে : তুমি যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা করো, জান্নাতে প্রবেশ করো।" -আহমদ, তাবরানি।

উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "যে স্ত্রী এরূপ অবস্থায় মারা যায় যে, তার স্বামী তার উপর সন্তুষ্ট, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" যে জিনিসটি সর্বাধিক মহিলাকে দোযখে নিয়ে যায়, তা হলো- স্বামীর অবাধ্যতা এবং স্বামীর সহৃদয়তা ও মহানুভবতাকে অস্বীকার করা। ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "আমি দোযখ পরিদর্শন করলাম। দেখলাম, তার অধিকাংশ অধিবাসী নারী। কারণ তারা তাদের উপকারকারীদের প্রতি অকৃতজ্ঞ। তাদের কেউ কেউ এতই অকৃতজ্ঞ যে, যুগ যুগ কাল ধরেও তুমি যদি তার উপকার কর, তবে তোমার কাছ থেকে একটুখানি অপ্রীতিকর আচরণ পেলেই বলবে, তোমার কাছ থেকে ভালো কিছু কখনোই পাইনি।" -বুখারি।

আর আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "স্বামী যখন তার স্ত্রীকে তার বিছানার দিকে আহ্বান জানায় এবং স্ত্রী তা প্রত্যাখ্যান করে, তারপর স্বামী তার উপর রাগান্বিত অবস্থায় রাত কাটিয়ে দেয়, তখন ফেরেশতারা সেই মহিলাকে সকাল পর্যন্ত অভিশাপ দিতে থাকে।" -আহমদ, বুখারি, মুসলিম।

তবে এই আনুগত্য ন্যায়সঙ্গত হওয়া শর্ত। কেননা স্রষ্টার নাফরমানি হয় এমন কোনো কাজে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা জায়েয নেই। কাজেই স্বামী তাকে কোনো অন্যায় কাজের আদেশ দিলে তার বিরোধিতা করা তার জন্য বাধ্যতামূলক। স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে নফল রোযা না রাখাও স্বামীর আনুগত্যের অংশ। অনুরূপ স্বামীর অনুমতি

ব্যতিরেকে নফল হজ্জ না করা এবং স্বামীর বাড়ির বাইরে না যাওয়াও স্বামীর আনুগত্যের অংশ। আবু দাউদ তায়ালিসি আবদুল্লাহ ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : স্ত্রীর নিকট স্বামীর অধিকার রয়েছে যে, স্বামী উটের পিঠের সংকীর্ণ আসনেও যদি তার সাথে সহবাস করতে চায়, তথাপি তাকে বাধা দেবেনা। ফরয রোযা ব্যতীত একদিনও স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে রোযা রাখবেনা। যদি তা করে, তবে তার গুনাহ হবে এবং তা (ইবাদত হিসেবে) কবুল হবেনা। আর তার অনুমতি ব্যতিরেকে তার বাড়ি থেকে কাউকে কিছু দান করবেনা। যদি দান করে, তবে স্বামী তার জন্য সওয়াব পাবে, কিন্তু স্ত্রীর গুনাহ হবে। ....আর তার অনুমতি ব্যতিরেকে তার বাড়ি থেকে বের হবেনা। যদি বের হয়, তবে আল্লাহ ও গযবের ফেরেশতারা তার ওপর অভিশাপ দেবে, যতক্ষণ সে তওবা না করে অথবা ফিরে না আসে, এমনকি স্বামী যদি অত্যাচারী হয় তবুও।"

স্বামী পছন্দ করেনা এমন কাউকে ঘরে ঢুকতে না দেয়া বা না ঢুকানো

স্ত্রীর নিকট স্বামীর আরো একটা অধিকার এই যে, তার অনুমতি ব্যতিরেকে এমন কাউকে ঘরে ঢুকাবেনা বা ঢুকতে দেবেনা, যাকে সে পছন্দ করেনা। আমর বিন আহ্ওয়াস আল জাসমী রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বিদায় হজ্জের সময় আল্লাহর প্রশংসা ও উপদেশ প্রদানের পর বললেন :

"শুনে রাখো, তোমরা স্ত্রীদের কল্যাণকামী থাকবে। তারা তো তোমাদের নিকট বন্দিনী। তারা কোনো সুস্পষ্ট ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া ব্যতীত তাদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। যদি তারা অন্যায় করে, তাহলে তাদেরকে তাদের বিছানায় আলাদা করে রাখো এবং মৃদু প্রহার করো। এতে যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায়, তবে তাদের বিরুদ্ধে আর কোনো পথ অনুসন্ধান করোনা। শুনে রাখো, তোমাদের স্ত্রীদের নিকটও তোমাদের অধিকার রয়েছে এবং তোমাদের স্ত্রীদেরও তোমাদের নিকট অধিকার রয়েছে। তাদের নিকট তোমাদের অধিকার এই যে, তোমাদের বিছানা এমন কাউকে মাড়াতে দেবেনা, যাদেরকে তোমরা পছন্দ করোনা এবং তোমাদের ঘরে এমন কাউকে ঢুকার অনুমতি দেবেনা যাকে তোমরা পছন্দ করোনা। আর শুনে রাখো, তোমাদের নিকট তাদের অধিকার এই যে, তাদেরকে তোমরা ভালোভাবে খাদ্য ও পোশাক সরবরাহ করবে। -ইবনে মাজাহ, তিরমিযি।

স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর সেবা

স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্কের ভিত্তি হলো, অধিকার ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সাম্য। এর উৎস হচ্ছে আল্লাহর এ বাণী :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ص وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ٥

অর্থ : স্ত্রীদের উপর যেমন ন্যায় সংগত দায়িত্ব রয়েছে, তেমনি কর্তব্যও রয়েছে। আর স্ত্রীদের উপর পুরুষদের একটা মর্যাদা রয়েছে।" (সূরা বাকারা : আয়াত ২২৯

সুতরাং এ আয়াত নারীকে সে রকমের অধিকারই দিয়েছে, যে রকম অধিকার নারীর কাছে স্বামীর রয়েছে। নারীর (স্ত্রীর) কাছে যেমন দাবি করা যায়, পুরুষের (স্বামীর) কাছেও তদ্রূপ দাবি করা যায়।

যে জিনিসকে ইসলাম স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যকার লেনদেন ও পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি

নির্ধারণ করেছে, তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভিত্তি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাড়ির বাইরের যাবতীয় কাজকর্ম, শ্রম সাধনা ও আয় রোজগারে পুরুষের সামর্থ্যই অপেক্ষাকৃত বেশি। অপরদিকে সংসার ব্যবস্থাপনা, সন্তানাদির লালন পালন এবং গৃহের শান্তি ও নিরাপত্তার উপকরণাদি সহজলভ্য করণে নারী অধিকতর সক্ষম। তাই পুরুষকে সেই ভূমিকা পালনেরই দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, যা তার জন্য সমীচীন ও শোভনীয়। আর নারীর ওপর অর্পিত হয়েছে সেই দায়িত্ব, যা তার জন্য স্বাভাবিক। এভাবেই সংসার ভেতর ও বাহির থেকে সুচারুরূপে পরিচালিত হয়। স্বামী স্ত্রী দু'জনের কারোই সাংসারিক দায়দায়িত্বের নিজের অংশ নিজেই ভাগ করে নেয়ার প্রয়োজন পড়েনা। রসূলুল্লাহ সা. আলী বিন আবু তালেব ও তার স্ত্রী ফাতেমার মধ্যে সংসারের দায়িত্ব বন্টন করেছেন : ফাতেমাকে পরিবার পরিচালনা ও আলীকে আয় রোজগার ও কাজকর্ম করার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, একদিন ফাতেমা রা. রসূল সা.-এর নিকট এসে যাতা ঘুরাতে ঘুরাতে তার হাতে কড়া পড়ে গেছে বলে অনুযোগ করলেন এবং তার নিকট একজন পরিচারিকা চাইলেন। জবাবে রসূল সা. বললেন : "তোমরা যা চেয়েছ তার চেয়ে উত্তম জিনিসের সন্ধান আমি তোমাদের দেবো কি? যখন বিছানায় ঘুমাতে যাবে তখন তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদু লিল্লাহ ও চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার বলবে। এটা তোমাদের জন্য পরিচারিকার চেয়ে উত্তম।"

আবু বকর রা. এর মেয়ে আসমা বলেন : আমি (আমার স্বামী) যুবাইরের সংসারের সব কাজ নিজ হাতে করতাম। তার একটা ঘোড়া ছিলো। আমি তাকে লালন পালন, তার জন্য ঘাস কেটে আনা ও তার যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করতাম।" আসমা সেই ঘোড়াকে লতাপাতা খাওয়াতেন, পানি খাওয়াতেন, বালতিতে রশি লাগিয়ে কূয়া থেকে পানি তুলতেন, আটা পিষতেন এবং প্রায় এক ফরসখ দূরে অবস্থিত যুবাইরের জমি থেকে খেজুরের ডাল (লাকড়ি) মাথায় করে বয়ে আনতেন। এ দুটো হাদিস থেকে জানা গেলো, পরিবার ও সংসারের সেবা করা তার কর্তব্য। যেমন স্বামীর কর্তব্য তার যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা। ফাতেমা রা.- যখন সংসারের কাজ কর্মে গলদঘর্ম হয়ে রসূল সা.-এর নিকট অভিযোগ করলেন, তখন রসূল সা. আলী রা.কে বলেননি যে, সংসারের কাজকর্ম করা তার দায়িত্ব নয়। ওটা শুধু আলীর দায়িত্ব। অনুরূপ, যখন আসমাকে তার স্বামীর সেবা করতে দেখলেন, তখন বলেননি, স্বামীর সেবা তার দায়িত্ব নয়, বরং সেবাকার্যে তাকে বহাল রাখেন। সকল মহিলা সাহাবীকেও তিনি নিজ নিজ স্বামীর সেবায় বহাল রাখেন। অথচ তিনি জানতেন, এটা তাদের কেউ কেউ পছন্দ করে, আবার কেউ কেউ পছন্দ করেনা। ইবনুল কাইয়েম বলেছেন : এটা সন্দেহাতীতভাবে সত্য, ধনী ও দরিদ্র এবং অভিজাত ও সাধারণ মহিলার মধ্যে বৈষম্য করা বৈধ নয়। সারা বিশ্বের মহিলাদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে শ্রদ্ধার পাত্রী এং সম্ভ্রান্ত, তিনি তার স্বামীর সেবা করতেন। তিনি যখন রসূল সা.-এর কাছে নিজের কষ্টের কথা জানাতে এলেন, তখন তিনি তাতে কর্ণপাত করলেন না।

মুসলিম সমাজে প্রাচীন ও আধুনিক যুগে উপরোক্ত কাজগুলো প্রথাগতভাবে নারীর করণীয় হিসেবে চালু রয়েছে। এমনকি রসূল সা. ও তাঁর সাহাবীদের সহধর্মিণীগণও গম পেষা, রুটি বানানো, রান্নাবান্না, বিছানা পাতা ও খাবার তৈরি পরিবেশন ইত্যাকার যাবতীয় ঘরোয়া কাজকর্ম করতেন। এমন কোনো মহিলার কথা জানা যায়নি, যিনি এসব কাজ করতে অস্বীকার করেছেন বা বিরত থেকেছেন। বিরত থাকার অবকাশই ছিলনা। কেননা

এসব কাজে কোনো ত্রুটি হলে তারা স্ত্রীদেরকে শাসন পর্যন্ত করতেন এবং তাদেরকে সেবাকার্যে নিয়োজিত থাকতে বাধ্য করতেন। এগুলো স্ত্রীর করণীয় না হলে তারা তাদের কাছ থেকে এগুলোর দাবি করতেননা। এটাই সঠিক অভিমত। তবে মালেক, আবু হানিফা ও শাফেয়ির মতে, স্ত্রীর উপর স্বামীর ঘরকন্নার কাজ করে দেয়া ও সেবা করা ওয়াজিব নয়, ঐচ্ছিক। তারা বলেন : বিয়ের আক্‌দ কেবলমাত্র যৌন সম্ভোগের জন্য। সেবামূলক কাজ আদায় করার জন্য নয়। তাদের মতে, বর্ণিত হাদিসগুলো থেকে যা জানা যায়, তা হচ্ছে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলক ও উন্নত নৈতিকতার কাজ।

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সত্যবাদিতার ব্যতিক্রম

দাম্পত্য জীবনের একাত্মতা, সমন্বয় ও সাবলীলতা রক্ষা করা এবং পারিবারিক বন্ধনকে জোরদার করা এমন একটা লক্ষ্য, যা অর্জন করার খাতিরে কখনো কখনো সত্যবাদিতার ব্যতিক্রম করাও বৈধ। আবু উযরা দুয়ালী উমর রা.-এর খেলাফতকালে নিজের স্ত্রীদের কাছ থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতেন। এর ফলে নারী মহলে তার নামে অবাঞ্ছিত দুর্নাম রটে গেলো। আবু উযরা একথা জানার পর আবদুল্লাহ ইবনুল আরকামকে সাথে নিয়ে বাড়িতে এলেন। তারপর তার স্ত্রীকে বললেন : আল্লাহর কসম দিয়ে তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কি আমার উপর রুষ্ট? স্ত্রী বললো : আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করোনা। আবু উযরা বললেন : আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি। স্ত্রী বললো : হাঁ। আবু উযরা ইবনুল আরকামকে বললেন : শুনলে তো? অতপর তারা উভয়ে উমর রা.-এর নিকট গেলেন। আবু উযরা বললেন : আপনারা বলে থাকেন, আমি স্ত্রীদের উপর যুলুম করি এবং তাদেরকে রেখে নিরুদ্দেশ হয়ে যাই। ইবনুল আরকামকে জিজ্ঞাসা করুন তো। উমর রা. ইবনুল আরকামকে জিজ্ঞাসা করলেন। ইবনুল আরকাম তাকে প্রকৃত সত্য জানালেন। এরপর তিনি আবু উযরার স্ত্রীকে দূত মারফত ডেকে পাঠালেন। স্ত্রী ও তার ফুফু এলো। উমর আবু উযরার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমিই কি সেই মহিলা, যে তার স্বামীকে বলে, "আমি তোমার উপর রুষ্ট?" স্ত্রী বললো : আমি সর্বপ্রথম তওবাকারী এবং আল্লাহর বিধানের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। আমার স্বামী আমাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে। তাই আমি মিথ্যা বলতে কুণ্ঠিত হয়েছি। আমীরুল মুমিনীন, আমি কি মিথ্যা বলবো? উমর রা. বললেন : হাঁ, মিথ্যা বলবে? কোনো মহিলা যদি তার স্বামীকে পছন্দ না করে, তাহলে সে যেন তা তাকে না বলে। কেননা পছন্দও ভালোবাসার ভিত্তিতে খুব কম সংখ্যক পরিবার প্রতিষ্ঠিত। মানুষ ইসলাম ও বংশীয় আভিজাত্যবোধের ভিত্তিতে পারস্পরিক আচরণ করে থাকে।

বুখারি ও মুসলিম উম্মে কুলসুম রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (উম্মে কুলসুম) রসূলুল্লাহ সা.কে বলতে শুনেছেন : যে ব্যক্তি মানুষের মধ্যকার বিবাদ মিমাংসা করার জন্য ভালো কথা বানায়, সে মিথ্যুক নয়। উম্মে কুলসুম রা. আরো বলেন : রসূল সা. মানুষের কথাবার্তার মধ্যে তিনটি ক্ষেত্র ব্যতিত মিথ্যা বলার অনুমতি দেননি : যুদ্ধে, মানুষের পারস্পরিক বিবাদের মিমাংসায় এবং স্ত্রীর সাথে স্বামীর ও স্বামীর সাথে স্ত্রীর কথাবার্তায়।" সুতরাং সুসম্পর্ক স্থাপন ও কল্যাণের খাতিরে কিছু কিছু মিথ্যা বলা যে জায়েয, সে কথা এ হাদিসে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

স্বামীর গৃহে স্ত্রীকে আটকে রাখা

স্বামীর গৃহে স্ত্রীকে আটকে রাখা অর্থাৎ স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে বের হবার অনুমতি না দেয়ার অধিকার স্বামীর রয়েছে। তবে পিতামাতাকে দেখতে যাওয়া থেকে বিরত রাখা যাবেনা। স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়াই সপ্তাহে একবার অথবা সংশ্লিষ্ট এলাকায় যেরূপ রীতিপ্রথা প্রচলিত আছে, তদনুসারে পিতামাতাকে দেখতে যেতে পারবে। কেননা রক্ত সম্পর্ক রক্ষা করার জন্য এটা অপরিহার্য ও ওয়াজিব। পিতামাতা অসুস্থ হলে তাদের পরিচর্যা করার মতো অন্য কেউ থাকলে সে তাদের পরিচর্যার জন্যও স্বামীর অসম্মতি অগ্রাহ্য করেও যেতে পারবে। কেননা এটা ওয়াজিব। স্বামীর অধিকার নেই তাকে তার ওয়াজিব কাজ থেকে বাধা দেয়ার। তবে সেই বাসগৃহটা স্ত্রীর বসবাসের যোগ্য হওয়া এবং দাম্পত্য জীবনের স্থিতিশীলতা ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে এমন হওয়া শর্ত। এ ধরনের বাসগৃহই শরিয়তসম্মত বাসগৃহ নামে আখ্যায়িত। বাসগৃহ যদি স্ত্রীর বাসযোগ্য না হয় এবং যে দাম্পত্য অধিকার অর্জন বিয়ের উদ্দেশ্য, তা অর্জনে করার উপযোগী না হয়, তাহলে সেই বাড়িতে বাস করতে স্ত্রী বাধ্য নয়। কেননা সে বাড়িটি শরিয়তসম্মত বাড়ি নয়। যেমন- বাড়িতে এমন অন্যান্য লোকও বাস করে, যারা তার সাথে একত্রে বাস করলে তার পক্ষে দাম্পত্য জীবন যাপন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনা, অথবা তাদের উপস্থিতির কারণে স্ত্রীর ক্ষতি হয় অথবা তাদের কারণে তার আসবাবপত্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা থাকে, কিংবা সে বাড়িতে যদি প্রয়োজনীয় আবাসিক সুযোগ সুবিধা ও সাজসরঞ্জাম না থাকে, কিংবা তার পরিবেশ স্ত্রীর নিকট ভীতিপ্রদ ও অস্বস্তিকর মনে হয়, কিংবা যদি প্রতিবেশিরা খারাপ হয়।

স্ত্রীকে নিয়ে বাসস্থান স্থানান্তর

স্বামী তার স্ত্রীকে সাথে নিয়ে যেখানে ইচ্ছা স্থানান্তরিত হতে পারে। কেননা আল্লাহ বলেছেন : أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ .
অর্থ : তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যে ধরনের গৃহে তোমরা বাস করো, তোমাদের স্ত্রীদেরকেও সে ধরনের গৃহে বাস করতে দাও। তাদেরকে সংকটে ফেলার উদ্দেশ্যে উত্যক্ত করোনা।" (সূরা তালাক : আয়াত ৬)

স্ত্রীদেরকে সংকটে ফেলা ও উত্যক্ত-উৎপীড়ন করার বিরুদ্ধে যে নিষেধাজ্ঞা এ আয়াতে উচ্চারিত হয়েছে, তা থেকে বুঝা যায়, স্ত্রীকে অন্য বাড়িতে স্থানান্তরের উদ্দেশ্যও যেন সংকটে ফেলা ও উত্যক্ত করা না হয়। বরং এর উদ্দেশ্য হওয়া চাই একত্রে বসবাস করা এবং বিয়ের উদ্দেশ্য সফল করা। পক্ষান্তরে স্থানান্তর করতে চাওয়ার ক্ষেত্রে স্বামীর উদ্দেশ্য যদি হয় তাকে সংকটে ফেলা ও কষ্ট দেয়া, যেমন সে এ দ্বারা মহরের অংশবিশেষ স্বামীকে উপহারস্বরূপ ফেরত দিক, অথবা স্বামীর উপর স্ত্রীর যে খোরপোষ দেয়া ওয়াজিব তার খানিকটার দাবি ছেড়ে দিক, অথবা সে বাড়িটা স্ত্রীর জন্য নিরাপদ না হয়, তাহলে স্ত্রীর অধিকার রয়েছে, সেই নতুন বাড়িতে যেতে অস্বীকার করার। আদালত তাকে নতুন বাড়িতে যাওয়ার আদেশ প্রত্যাখ্যান করার অধিকার দিতে পারবে। এ অধিকার ব্যবহারের জন্য ফকীহগণ এ শর্তও আরোপ করেছেন যে, স্ত্রীকে ভিন্ন বাড়িতে স্থানান্তর করতে গিয়ে তার ক্ষতি যেন না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে, যেমন পথের বিপদসংকুল হওয়া, স্ত্রীর অসহনীয় কঠিন পরিশ্রম করতে বাধ্য হওয়া, নতুন বাড়িতে শত্রুর উৎপাতের আশংকা

থাকা ইত্যাদি। স্ত্রী যদি এসব সমস্যার কোনো একটিরও আশংকাবোধ করে, তবে সে স্থানান্তরে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে পারবে। প্রসঙ্গত একটি বিচার বিভাগীয় স্মারক থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

"যেহেতু দম্পতির বাসস্থান স্থানান্তর করা ও না করার লাভজনক হওয়ার কোনো বাঁধাধরা রূপরেখা নেই, তাই ফকীহগণ একে অনির্দিষ্টই রেখেছেন। তারা এর কোনো সম্ভাব্য রূপরেখার উল্লেখ না করে বিষয়টিকে বিচারকের প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও ন্যায়বিচারের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। কেননা এটা তো দিবালোকের মতো পরিষ্কার যে, শুধুমাত্র স্ত্রীর দিক থেকে স্বামীর নিশ্চিন্ত হওয়াই তাকে স্থানান্তরে বাধ্য করার লাভজনকতা নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং এ ব্যাপারে স্বামী ও স্ত্রীর এবং যে জায়গায় ও যে জায়গা থেকে তারা স্থানান্তরিত হচ্ছে, তার অন্যান্য অবস্থাও বিবেচনা করতে হবে। যেমন (১) এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ সুবিধা, যা স্থানান্তরিত হওয়া ছাড়া অর্জন করা যায়না, (২) স্বামী-স্ত্রীর সফরের ব্যয় নির্বাহ করার পরও তার হাতে এতটা অর্থ উদ্বৃত্ত থাকবে যে, তা দিয়ে সে ব্যবসা করলে এত লাভ করতে পারবে বলে প্রবল ধারণা হয়, যা দ্বারা স্বামীর নিজেরও গোটা পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করা যায়, কিংবা এমন কোনো কারিগরি পেশায় নিয়োজিত হতে পারে, যা তার ও গোটা পরিবারের জীবিকা উপার্জনে সহায়ক, (৩) দুই এলাকার যাতায়াতের রাস্তা জান, মাল ও সম্ভ্রমের জন্য নিরাপদ, (৪) স্ত্রী এতটা সুস্থ ও সবল যে, যেখানে সে বর্তমানে বাস করছে, সেখান থেকে নতুন জায়গায় সফর করার যাবতীয় কষ্ট সহ্য করতে সক্ষম, (৫) যে স্থানে স্থানান্তরিত হওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে, তা নানা রকমের রোগ, মহামারী উপদ্রুত না হয়, (৬) উভয় এলাকার মধ্যে ঠাণ্ডা ও গরমের মাত্রায় এত ব্যবধান না হয়, যা শরীরের পক্ষে অসহনীয়, (৭) নতুন জায়গায় স্ত্রীর মান সম্ভ্রম মূল জায়গার মতোই সুরক্ষিত ও নিরাপদ থাকবে, (৮) স্থানান্তরিত হওয়ার কারণে স্ত্রীর আর্থিক, শারীরিক ও নৈতিক ক্ষতি না হয়। এ ধরনের আরো বহু বিষয় এরূপ পরিস্থিতিতে বিবেচনা করতে হয়, যা স্থান কাল ও পাত্রভেদে বিভিন্ন হতে পারে এবং যা দক্ষ বিচারকের দৃষ্টি এড়ায়না।" এ বিষয়ে এটাকে একটা উত্তম বিবরণ বলা যেতে পারে।

স্ত্রীকে তার বাড়ি থেকে বের না করার শর্ত

যে ব্যক্তি এরূপ শর্তে কোনো মহিলাকে বিয়ে করে যে, তার বাড়ি থেকে তাকে বের করবেনা কিংবা তার শহর ব্যতীত অন্য অন্য শহরে নিয়ে যাবেনা, তার জন্য এ শর্ত পূরণ করা বাধ্যতামূলক। কেননা বুখারি ও মুসলিম উকবা ইবনে আমের রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "যে শর্ত দিয়ে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের যৌন সম্ভোগ হালাল করেছ, সে শর্ত পুরা করাই সর্বাধিক অগ্রগণ্য।" এটা ইমাম আহমদ, আওযায়ি ও ইসহাক বিন রাহওয়াইর অভিমত। অন্যান্য ফকীহদের মতে, এ শর্ত পূরণ করা জরুরি নয়। স্ত্রীকে তার মূল বাসস্থান থেকে স্থানান্তরিত করার অধিকার স্বামীর রয়েছে। তারা এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন : "সেই শর্ত পূরণ করাই জরুরি, যা মহর ও আকদের দাবি অনুযায়ী দাম্পত্য অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট। যা আকদের দাবি নয়, তা পূরণ করা জরুরি নয়। বিয়ের শর্তাবলী ও তা নিয়ে আলেমদের মতভেদ ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

স্ত্রীকে কাজ করতে না দেয়া

আলেমগণ স্ত্রীর কাজকে দুই শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন : এক ধরনের কাজ হলো, যা স্বামীর অধিকার বিনষ্ট করে বা ক্ষতিগ্রস্ত করে বা তাকে বাড়ির বাইরে যেতে বাধ্য করে।

আরেক ধরনের কাজ হলো, যাতে কোনো ক্ষতি হয়না। প্রথমটিকে স্ত্রীর জন্য অবৈধ ও দ্বিতীয়টিকে বৈধ বলে অভিহিত করেছেন। হানাফী ফকীহদের মধ্যে ইবনে আবেদীন বলেছেন : যে কাজ স্বামীর অধিকার ক্ষুণ্ন করে বা তার ক্ষতিসাধন করে বা স্ত্রীকে ঘরের বাইরে যেতে বাধ্য করে, তা থেকে স্ত্রীকে বিরত রাখা যেতে পারে। যে কাজে কোনো ক্ষতিসাধনের অবকাশ নেই, তা থেকে বাধা দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। তবে শুধু মহিলারাই করতে পারে এমন ফরযে কেফায়ার কাজ যদি কোনো মহিলা পেশা হিসেবে গ্রহণ করে যেমন ধাত্রীমাতার কাজ। তবে সে কাজের জন্য বাড়ির বাইরে যেতে স্ত্রীকে বাধা দেয়ার অধিকার স্বামীর নেই।

ইসলামের জ্ঞান অর্জনের জন্য নারীর বহির্গমন

আল্লাহ যে সকল কাজ বান্দার উপর ফরয করেছেন, সে সকল কাজের জ্ঞান অর্জন করাও ফরয। এ ধরনের জ্ঞান শিক্ষা দেয়ার সামর্থ্য স্বামীর থাকলে স্ত্রীকে তা শিক্ষা দেয়া স্বামীর উপর ফরয। স্বামীর যদি সামর্থ্য না থাকে কিংবা সে শিক্ষা না দেয়, তবে তা শিক্ষা করতে আলেমদের নিকট ও যেসব জায়গায় ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হয় স্বামীর অনুমতি না থাকলেও সেসব জায়গায় গিয়ে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করার অধিকার স্ত্রীর রয়েছে। স্বামী যদি ইসলামী জ্ঞানের অধিকারী হয় এবং স্ত্রীকে তা শেখায়, তাহলে তার অনুমতি ছাড়া ইসলামী জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে বাড়ির বাইরে যাওয়ার অধিকার স্ত্রীর নেই।

অবাধ্য স্ত্রীকে শায়েস্তা করা

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

وَاللاَّتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ج فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاً.

অর্থ : তোমরা যে সকল স্ত্রীর অবাধ্য হওয়ার আশংকা করবে, তাদেরকে সদুপদেশ দাও, তাদেরকে তাদের বিছানায় পরিত্যক্ত করে রেখে দাও এবং তাদেরকে প্রহার করো। এরপর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায়, তবে আর তাদের বিরুদ্ধে কিছু করোনা।" (সূরা আন্-নিসা : আয়াত ৩৪)

স্ত্রীর অবাধ্য হওয়া : এর অর্থ স্বামীর আদেশ নিষেধ অগ্রাহ্য ও অমান্য করা, স্বামীর বিছানায় যেতে অস্বীকার করা, অথবা স্বামীর বিনা অনুমতিতে বাড়ির বাইরে যাওয়া।

স্ত্রীকে সদুপদেশ দেয়া : এর অর্থ তাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া, আল্লাহর ভয় দেখিয়ে সতর্ক করা। স্বামীর আনুগত্য করা এবং তার উপর স্বামীর যে অধিকার রয়েছে তা পালন করা যে তার কর্তব্য, সে কথা তাকে স্মরণ করিয়ে হুশিয়ার করা। স্বামীর হুকুম অমান্য করলে যে গুনাহ হয়, তার দিকে স্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং অবাধ্য হলে সে যে খোরপোশ থেকে বঞ্চিত হবে সে কথা তাকে জানানো।

বিছানায় পরিত্যক্ত করে রাখা : কথাবার্তা বন্ধ রাখা তিনদিনের বেশি জায়েয নেই। কেননা আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত "রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : কোনো মুসলমানের পক্ষে তার ভাই এর সাথে তিন দিনের বেশি বাক্যালাপ বন্ধ রাখা হালাল নয়।"

আর প্রহারের ব্যাপারে মনে রাখতে হবে যে, প্রথমবারের অবাধ্যতার জন্য প্রহার করা যাবে না। প্রকৃতপক্ষে আয়াতটিতে কিছু কিছু কথা উহ্য রয়েছে।

অর্থাৎ : "যে সকল স্ত্রীর অবাধ্যতার আশংকা করো, তাদেরকে সদুপদেশ দাও। (তারপরও যদি অবাধ্য হয় তবে) তাদেরকে বিছানায় পরিত্যক্ত করে রেখে দাও। (তারপরও যদি তারা অবাধ্য থাকে তবে) তাদেরকে প্রহার করো।" অর্থাৎ সদুপদেশ ও বিছানায় পরিত্যক্ত করে রাখার পরও যদি সংযত না হয়, তাহলে স্ত্রীকে প্রহার করার অধিকার স্বামীর রয়েছে। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার রয়েছে যে, তোমরা পছন্দ করোনা এমন কাউকে তোমাদের বিছানা মাড়াতে দেবেনা। ....যদি মাড়াতে দেয়, তবে তাদেরকে প্রহার কর মৃদুভাবে।" প্রহারের সময় মুখ ও ঝুঁকিপূর্ণ স্থানগুলো পরিহার করতে হবে। কেননা উদ্দেশ্য হলো শিক্ষা দান, ধ্বংস করা নয়। হাকীম বিন মুয়াবিয়া আল কুশাইরীর পিতা থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেন : "আমি বললাম : হে রসূলুল্লাহ, আমাদের স্ত্রীদের উপর আমাদের অধিকার কী কী?

তিনি বললেন : তুমি যখন খাবে তাকে খাওয়াবে, তুমি যখন পোশাক পরবে তাকে পোশাক পরাবে, তাকে মুখে মারবেনা ও গালিগালাজ সহকারে তিরস্কার করবেনা এবং তাকে পরিত্যাগ করলে বাড়ির ভেতরে ছাড়া তা করবেনা।"

স্বামীর মনসন্তুষ্টির জন্য স্ত্রীর সাজসজ্জা

স্বামীর মনসন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে স্ত্রীর সুরমা, রকমারি রং ও সুগন্ধী ইত্যাদি প্রসাধনী দ্রব্য ব্যবহার করে রূপচর্চা ও সাজগোজ করা উত্তম। ইমাম আহমদ কারিমা বিনতে হুমাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আয়েশা রা. কে বললেন : হে উম্মুল মুমিনীন, মেহেদী সম্পর্কে আপনার মত কী? আয়েশা রা. বললেন : আমার প্রিয়তম (রসূল) সা. মেহেদীর রং পছন্দ করতেন, কিন্তু এর গন্ধ অপছন্দ করতেন। দুই মাসিক স্রাবের মাঝে কিংবা প্রত্যেক মাসিকের নিকটবর্তী সময়ে এটা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ নয়।"

২৯. তাবাররুজ

তাবাররুজের অর্থ

যে জিনিস গোপন করা জরুরি, তা প্রকাশ করার নাম তাবাররুজ। এর ধাতুগত ও মূল অর্থ দুর্গ থেকে বের হওয়া। পরে এটা নারীর লজ্জা সংকোচ থেকে বেরিয়ে আসা এবং তার আকর্ষণীয় বস্তু ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কুরআনে তাবাররুজ প্রসঙ্গ

পবিত্র কুরআনে দুই জায়গায় তাবাররুজ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে : প্রথমত সূরা নূরে :

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ .

অর্থ : অধিক বয়স্কা স্ত্রীলোক যারা বিয়ের আশা পোষণ করেনা, তারা যদি তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করার উদ্দেশ্য ছাড়াই তাদের অতিরিক্ত বস্ত্র খুলে রাখে, তাহলে তাতে তাদের কোনো দোষ নেই। তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য শ্রেয়।" (আয়াত : ৬০)

দ্বিতীয়ত সূরা আহযাবে তাবাররুজকে নিষিদ্ধ করা ও এর প্রতি ধিক্কার জানানো হয়েছে :

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ .

"প্রাচীন জাহেলিয়তের ন্যায় তোমরা তাবাররুজ করোনা।" (নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়িওনা)। (সূরা আহযাব : আয়াত ৩৩)

তাবাররুজ ইসলাম ও সভ্যতা উভয়ের পরিপন্থী

যেসব বৈশিষ্ট্য দ্বারা মানুষ ইতর প্রাণী থেকে পৃথক হয়, তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, পোশাক ও শোভাবর্ধক উপকরণাদি ব্যবহার। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

يَا بَنِىْ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا. وَلِبَاسُ التَّقْوٰى، ذٰلِكَ خَيْرٌ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ .

অর্থ : হে আদম সন্তানরা! আমি তোমাদের জন্য পোশাক প্রবর্তন করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থানকেও আবৃত করে এবং বেশভূষার উপকরণও হয় এবং তাকওয়ার পোশাকই উত্তম। এটা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।" (সূরা আরাফ : আয়াত ২৬)

পোশাক ও সাজসজ্জা সভ্যতা ও শালীনতার নিদর্শন। এ দুটি জিনিস না থাকা পশুত্ব স্তরের দিকে প্রত্যাবর্তনের নামান্তর। জীবন যখন তার স্বাভাবিক গতিতে বহমান থাকে, তখন তার পশ্চাদদিকে প্রত্যাবর্তন করা ততক্ষণ সম্ভব নয়, যতক্ষণ তা এমন কোনো গুরুতর অধোপতনের শিকার না হয়, যা তার মতামত ও চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন ঘটায় এবং তাকে তার সভ্যতা ও মনুষ্যত্বের অর্জিত অগ্রগতিকে ভুলে গিয়ে বা ভুলে যাওয়ার ভান করে পেছনে দিকে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য না করে।

আর পোশাক পরা যখন উন্নত মানুষের অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য, তখন নারীর জন্য তা আরো বেশি অত্যাবশ্যকীয়। কেননা এটাই সেই অপরিহার্য রক্ষাকবচ, যা তার ধর্ম, সম্ভ্রম, মর্যাদা, সতীত্ব, শালীনতা ও লজ্জাকে রক্ষা করে। এই মহৎ গুণগুলো নারীর সাথে অধিকতর সম্পর্কযুক্ত এবং পুরুষ অপেক্ষা নাররি জন্য অধিকতর প্রয়োজনীয়। আর এজন্য লজ্জা ও সংকোচ নারীর উৎকৃষ্টতম ভূষণ। বস্তুত নারীর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হলো শালীনতা, লজ্জা ও সতীত্ব। আর এ গুণাবলীর সংরক্ষণ নারীর সর্বোচ্চ স্তরের মনুষ্যত্বেরই সংরক্ষণ। নারীর লজ্জা ও শালীনতা থেকে বিচ্যুত হওয়া নারীর স্বার্থেরও অনুকূল নয়, সমাজের জন্যও কল্যাণকর নয়। বিশেষত যখন যৌন আবেগ ও আকর্ষণ সর্বকালের সবচেয়ে প্রবল আবেগ ও সবচেয়ে দুর্দমনীয় আকর্ষণ। আর নির্লজ্জতা ও অশালীনতা এই আকর্ষণকে উদ্দীপিত ও উত্তেজিত করে এবং উশৃঙ্খল ও উদ্দাম করে। এর উপর যত বেশি বাধা, বন্ধন ও শৃঙ্খল আরোপ করা হবে, ততই তার উত্তেজনা ও উশৃঙ্খলতা প্রশমিত হবে, ততই তা নিয়ন্ত্রণে আসবে এবং ততই তা মানুষ ও তার মনুষ্যত্বের উপযোগী শালীন ও সংযত হবে। এ কারণেই ইসলাম নারীর পোশাকের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে এবং খুঁটিনাটি বিধি বিধান বর্ণনা করা সাধারণভাবে কুরআনের রীতি না হওয়া সত্ত্বেও নারীর পোশাকের অত্যন্ত বিশদ বিবরণ দিয়েছে। যেমন সূরা আহযাবের ৫৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন :

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ط ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ط

"হে নবী, তোমার স্ত্রীদেরকে, মেয়েদেরকে ও মুসলিম নারীদেরকে বলে দাও তারা যেনো তাদের ওড়না তাদের উপরে ছড়িয়ে দেয়। এতে সহজেই তাদেরকে চেনা যাবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবেনা।" নবীর স্ত্রী, কন্যা ও মুসলিম নারীদেরকে সম্বোধন করা দ্বারা প্রমাণিত হয়, সকল নারীই এ নির্দেশ পালনের জন্য দায়ী। কোনো নারীই এর ব্যতিক্রম নয়, চাই তারা নবীদুহিতা ও নবী সহধর্মিণীদের পর্যায়ের পুণ্যবতীই হোক না কেন। কুরআন এ বিষয়টির প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে ও এর বিস্তারিত খুঁটিনাটি বর্ণনা করেছে। নারীর শরীরের কোন্ অংশ ঢাকতে হবে এবং কোন্ অংশ খোলা যাবে, তাও সবিস্তারে বর্ণনা করেছে :

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ

অর্থ : হে নবী মুমিন নারীদেরকে বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে, সতীত্ব রক্ষা করে এবং যা সাধারণত আপনা আপনি প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে। আর তারা যেন তাদের চাদর নিজেদের বুকের উপর ছড়িয়ে রাখে। আর তারা যেন নিজেদের সৌন্দর্য কারো কাছে প্রকাশ না করে কেবল তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীদের পুত্র, ভাই, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগ্নে, পরিবারভুক্ত মহিলা, মালিকানাধীন দাসী, যৌন কামনামুক্ত নিষ্কাম পুরুষ এবং এমন বালক যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তারা ব্যতীত। আর তারা যেন নিজেদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে জোরে জোরে না হাঁটে।" (সূরা নূর : আয়াত ৩১)

এমনকি নারী যদি এত বয়স্কাও হয় যে, তারও কোনো যৌন কামনা নেই এবং তার উপরও কারো যৌন কামনা হয়না, তবু এটাই তার জন্যে উত্তম।

ইসলাম এ বিষয়টাকে এত গুরুত্ব দিয়েছে যে, কতো বয়সে নারী পর্দা করা শুরু করবে তাও উল্লেখ করেছে। রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন : "হে আসমা, নারী বালেগা হয়ে যায়, তখন তার শুধু হাতের পাতা ও মুখমণ্ডল ব্যতীত আর কিছুই প্রকাশ করা যাবেনা।" তিনি আরো বলেছেন : "নারী যখন এগিয়ে আসে তখনও তার সাথে একটা শয়তান থাকে, আর যখন পিছিয়ে যায় তখনও তার সাথে একটা শয়তান থাকে।" বস্তুত নারী পুরুষের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক পরীক্ষার বস্তু। তাই নারীর নগ্নতা ও সৌন্দর্য প্রদর্শন তার মনুষ্যত্বের সবচেয়ে মূল্যবান উপাদান লজ্জা ও সম্ভ্রমকে বিনষ্ট করে এবং তাকে তার মনুষ্যত্বের স্তর থেকে নিচে নামিয়ে দেয়। এতে যদি তার মনুষ্যত্বে কলংক আরোপিত হয় তা জাহান্নামের আগুন ছাড়া আর কিছু দ্বারা পবিত্র হয়না। রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন : দুই শ্রেণীর দোযখবাসীকে আমি দেখিনি : একদল হলো, হাতে গরুর লেজ আকৃতির বেত্রদণ্ডধারী পুরুষ, আর পোশাকধারিণী হয়েও নগ্ন একদল নারী, যারা মানুষকে তাদের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য হেলেদুলে চলে। তারা বেহেশতে প্রবেশ তো করবেই না, এমনকি তার ঘ্রাণও পাবেনা। অথচ বহু দূর থেকে তার ঘ্রাণ পাওয়া যায়।"

নবুয়্যত যুগে রসূলুল্লাহ্ সা. তাবাররুজের (বেপর্দা চলাফেরার) কিছু কিছু আলামত

দেখতেন এবং সেগুলোর দিকে মহিলাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতেন : এ হচ্ছে আল্লাহর বিধান থেকে বিদ্রোহের শামিল। তিনি তাদেরকে ইসলামের সহজ সরল পথে ফিরে আসতে আদেশ দিতেন, স্বামী ও অভিভাবকদেরকে এই বিকৃতি ও গোমরাহীর পরিণতির জন্য দায়ী করতেন এবং তাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে সতর্ক করতেন।

১. মূসা বিন ইয়াসার রা. বলেন, তীব্র ঘ্রাণযুক্ত প্রসাধনী ব্যবহার করে জনৈকা মহিলা আবু হুরায়রার কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। আবু হুরায়রা রা. তাকে বললেন : তুমি কোথায় যাচ্ছো? সে বললো : মসজিদে। তিনি বললেন : তুমি সুগন্ধী ব্যবহার করেছ বুঝি? সে বললো, হ্যাঁ। আবু হুরায়রা রা. বললেন : বাড়ি ফিরে গিয়ে গোসল করে এসো। কেননা আমি রসূল সা.কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ এমন মহিলার নামায কবুল করেন না, যার থেকে তীব্র ঘ্রাণ বের হয়, যতক্ষণ না সে বাড়িতে ফিরে গিয়ে গোসল করে।" গোসল করার নির্দেশ দেয়ার উদ্দেশ্য শুধু এই যে, তার ঘ্রাণ যেন দূর হয়ে যায়।

২. আবু হুরায়রা রা. আরো বর্ণনা করেন, রসূল সা. বলেছেন : যে মহিলা সুগন্ধী ব্যবহার করবে সে যেন জামাতে না আসে। (আবু দাউদ, নাসায়ী)

৩. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রসূল সা. মসজিদে নববীতে বসেছিলেন। এমতাবস্থায় মুযায়না গোত্রের জনৈক মহিলা জাঁকজমকপূর্ণ সাজগোজ সহকারে সগর্বে মসজিদে প্রবেশ করলো। রসূল সা. তা দেখে বললেন : হে জনতা, তোমরা তোমাদের মহিলাদের মসজিদে সাজগুজে ও অহংকারের সাথে মসজিদে আসতে নিষেধ করো। কেননা বনী ইসরাইলের মহিলারা সেজেগুজে ও অহংকারের সাথে মসজিদে না আসা পর্যন্ত তারা অভিশপ্ত হয়নি। (ইবনে মাজাহ)

উমর রা. এই মারাত্মক ফেতনা সম্পর্কে শংকিত ছিলেন। এজন্য তিনি "চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম" এই নীতি অনুসারে উক্ত ফেতনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে তার আগাম চিকিৎসা করা পছন্দ করতেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি একদিন রাতে ঘুরে ঘুরে জনগণের অবস্থা অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছিলেন। সহসা শুনতে পেলেন, জনৈক মহিলা বলছে : 'আহা, একটু মদ খাওয়ার কি কোনো উপায় আছে? নতুবা নাসর বিন হুজ্জাজের কাছে যাওয়ার কি কোনো উপায় আছে?'

উমর রা. তৎক্ষনাত স্বগতভাবে বললেন : "উমরের আমলে এর কোনোটারই উপায় নেই।" পরদিন সকালে তিনি নাসর বিন হুজ্জাজকে দরবারে হাজির করলেন। দেখলেন, সে একজন অতি সুদর্শন পুরুষ। এরপর তিনি তার চুল কামিয়ে দেয়ার আদেশ দিলেন। এতে তাকে আরো সুদর্শন দেখাতে লাগলো। ফলে তিনি তাকে দেশ থেকে নির্বাসিত করে সিরিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন।

বিপথগামিতার কারণ

ইসলামের সহজ সরল পথ থেকে এই বিচ্যুতির কারণ ছিলো অজ্ঞতা ও অন্ধ অনুকরণ। এরপর সাম্রাজ্যবাদ এলো এবং এই বিপথগামিতাকে আস্কারা দিয়ে তার শেষসীমায় পৌঁছিয়ে দিলো। এর ফলে একজন মুসলমান পুরুষ একজন মুসলিম নারীকে নির্দ্বিধায় অশালীন, নির্লজ্জ, রূপ ও সৌন্দর্য প্রদর্শনকারিণী, সেজেগুজে প্রকাশ্যে বিচরণকারিণী এবং বুক, গলা, পিঠ, বাহু ও পায়ের থোড়া বের করে চলাচলকারিণী রূপে দেখতে পেলো। এমনকি মুসলিম নারীরা তাদের চুল ছেটে খাটো করাতেও লজ্জা ও কুণ্ঠাবোধ করলোনা।

নানা রকমের প্রসাধনী রং ও ফেস পাউডার মেখে সুগন্ধী ব্যবহার করে ও জাকজমকপূর্ণ পোশাক পরে ঘুরে বেড়ানোটাও যেন তাদের জন্য অপরিহার্য হয়ে গেলো। শুধু এখানেই শেষ নয়, মুসলিম যুবতীরা নানা রকম পাপাচার, ব্যভিচার, নাচগান, খেলাধুলা, থিয়েটার ও হোটেল রেস্তোরার আসরে আড্ডা জমানোকে গর্বের কাজ ও প্রগতির নিদর্শন মনে করতে লাগলো। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে ও সমুদ্রতীরে এই নৈতিক অধোপতন চরম আকার ধারণ করলো। এক পর্যায়ে এগুলো গা সওয়া হয়ে গেলো। তারপর আমরা সুন্দরী প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান করতে আরম্ভ করে দিলাম। এতে নারী শুধু পুরুষদের সামনেই আসতে লাগলোনা, বরং তার দেহের প্রতিটি অংগ পরীক্ষা নিরীক্ষার আওতায় আসতে লাগলো এবং প্রতি অংগ সকল ধরনের নারী পুরুষের চোখের সামনে মাপাজোপা হতে লাগলো। আর এসব নিকৃষ্ট উৎসাহ দানে সংবাদপত্র ও অন্যান্য গণমাধ্যম সুদূর প্রসারী ভূমিকা পালন করতে লাগলো। নারীকে এই পশুত্বের সস্তা পর্যায়ে পৌঁছে দিয়ে গণমাধ্যম বাহবা কুড়াতে লাগলো ও নারীকে গৌরবান্বিত করতে লাগলো। পোশাক ব্যবসায়ীরাও এই সুযোগে রমরমা ব্যবসা শুরু করে দিলো।

বিপথগামিতার পরিণাম

এই বিপথগামিতার পরিণামে পাপাচার ও ব্যভিচারের ব্যাপক প্রসার ঘটলো, পরিবারের বন্ধন ভেঙ্গে পড়লো, ধর্মীয় কর্তব্যগুলো অবহেলার শিকার হলো, শিশুদের প্রতি মনোযোগ পরিত্যক্ত হলো, দাম্পত্য জীবনে সংকট ঘনীভূত ও জটিলতর হলো এবং হালালের চেয়ে হারাম কাজ সমাজে সহজতর হলো। এক কথায়, এই বিপথগামিতায় নৈতিক অধোপতন ত্বরান্বিত হলো। এমনকি সকল ধর্মের মানুষ যেসব নৈতিক মূল্যবোধে অভ্যস্ত ছিলো তাও ধ্বংসের পথে ধাবিত হলো। এই অধোপতন ক্রমান্বয়ে এমন এক স্তরে উপনীত হলো, যা কোনো মুসলমান কখনো কল্পনাও করতে পারেনি। অধোপতনের আহ্বায়করা একে প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংস্কৃতিক রূপ দিলো, প্রসাধনী ব্যবহার ও সাজসজ্জার নানা রকম উপায় উদ্ভাবিত হলো, নানা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হলো এবং এসব পন্থা ও পদ্ধতি শিক্ষা দানের জন্য প্রতিষ্ঠানাদি গড়ে উঠলো।

কায়রোর দৈনিক "আল-আহরাম" পত্রিকায় "নারীর সাথে" শিরোনামে যে সকল সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, নমুনাস্বরূপ তার কয়েকটির শিরোনাম দেখুন : "আলেকজান্দ্রিয়ায় মহিলাদের কেশবিন্যাস শিক্ষা দেয়ার প্রথম বিদ্যালয়, এক মাস পর এই বিদ্যালয়ে পড়াতে আসবেন জনৈক জার্মান বিশেষজ্ঞ"। উক্ত শিরোনামের অধীন সংবাদটির সারসংক্ষেপ হলো : এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আলেকজান্দ্রিয়ার মহিলাদের কেশবিন্যাস সমিতির সদস্যদের চাঁদা দ্বারা। .....সমিতি এই বিদ্যালয়ের জন্য একটা ছোট ফ্লাটও ভাড়া নিয়েছে, যাতে তা ভবিষ্যতে বড় ধরনের বিদ্যালয়ের ভিত্তি হিসেবে দাঁড়াতে পারে। সমিতি তার সকল সদস্যকে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সামনে ভাষণ দেয়ার জন্য উপস্থিত হওয়ার দাওয়াত দিয়েছে। ক্লিওপেট্রায় গতকাল সকালে সমিতির জনৈক সদস্য বিদ্যালয়টির উদ্বোধন করে ভাষণ দিয়েছেন। এ বিদ্যালয়ে কেশবিন্যাস, কেশ রঞ্জন, চুলকাটা, নখকাটা, শরীর মাজন ও ডলন ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হবে।

সমিতির সভাপতি কায়রোতে ঘোষণা করেছেন : "সমিতি আগামী মাসে কেশবিন্যাস বিষয়ে মিশরের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভের জন্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করবে।" শুধুমাত্র

কায়রোতে কেশবিন্যাসের সেলুনের সংখ্যা এক হাজারে উপনীত হয়েছে। ....নারীর রূপচর্চা, সৌন্দর্য প্রদর্শনী ও নৈতিক অধোপতনের এই উদ্দাম গড্ডালিকা প্রবাহের মুখেও এ থেকে মুসলিম পরিবারগুলোর পবিত্রতা ও সম্মান রক্ষার্থে বিপরীতমুখী চিন্তাচেতনার উন্মেষ আয়োজনও থেমে নেই। ২৯/৯/১৯৬২ তারিখের দৈনিক আখবারুল ইয়াওমে নিম্নরূপ শিরোনামে একটি নিবন্ধ ছেপেছে :

"বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া তরুণী বিশ্ববিদ্যালয়কে পোশাক বিক্রির শোরুম থেকে পৃথক কিছু ভাবছে না।" উক্ত শিরোনামে নিবন্ধের লেখিকা বলেন : আজকাল প্রত্যেক বছর যখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি শুরু হয়, তখন পত্রপত্রিকাগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের পোশাক ও মেকআপ কেমন হওয়া উচিত, তা নিয়ে নিবন্ধ, ফিচার ইত্যাদি ছাপাতে আরম্ভ করে। কেউবা তাদের সবার পোশাক এক রকম অবলম্বন করার আহ্বান জানায়। আবার কেউ তাদেরকে মেকআপ থেকে বিরত রাখার দাবি জানায়। আমি এসব মতামত সমর্থন করিনা। কেননা আমি মনে করি, তরুণীদের ইচ্ছাধীন পোশাক নির্বাচন তাদের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করে এবং তার স্বতন্ত্র রুচি গড়তে সাহায্য করে। .....অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা একক পোশাক পরেনা এবং তাদেরকে মেকআপ থেকে বঞ্চিত রাখা হয়না। তবুও আমি এসব চরমপন্থী মতামত পোষণকারীদেরকে প্রায়ই ভর্ৎসনা করে থাকি। কেননা আমাদের মতে, বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া তরুণীরাই তাদেরকে এ ধরনের দাবি জানাতে উদ্বুদ্ধ করে। তারা জানেনা কিভাবে তাদের উপযুক্ত পোশাক ও মেকআপ নির্বাচন করবে। আসলে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ও পোশাকের শোরুমের মধ্যে পার্থক্যই করতে পারেনা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। তারা প্রায়শ এমন টাইট পোশাক ও হাইহিল পরে ক্যাম্পাসে যায় যে, সহজ ও সাবলীলভাবে চলাফেরাই করতে পারেনা। তারা কখনো বইপুস্তক ও লেকচার সিট সাথে নিতে ভুল করলেও করতে পারে, কিন্তু সাজসজ্জা ও প্রসাধনী উপকরণ সাথে নিতে কখনো ভোলেনা। আমার মতে, এসবের মূল কারণ হলো, আজকালকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা পাঠাভ্যাসকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়না এবং তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে তার সাজসজ্জাকে। প্রকৃতপক্ষে এর বিপরীত হওয়াই সমীচীন। কেননা এখন এমন একটা সময় চলছে যখন নারী শিক্ষার উচ্চতর মূল্যায়ন হচ্ছে। এর অর্থ এ নয় যে, আমি বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া তরুণীদের পোশাক ও সাজসজ্জাকে অবজ্ঞা করছি। আমি শুধু অধ্যয়নকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া এবং এরপরে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব দিয়ে চেহারার মেকাপ করার আহ্বান জানাচ্ছি। ক্যাম্পাসের খাতিরে না হলেও ত্বকের যত্নের খাতিরেই এটা করা দরকার। কেননা বেশি মেকাপ ত্বকের ক্ষতিসাধন করে, বিশেষতঃ এমন বয়সে, যখন কৃত্রিম মেকআপের চেয়ে চেহারার স্বাভাবিক লাবণ্য অধিকতর সুন্দর লাগে। সেই সাথে আঁটসাট পোশাকের পরিবর্তে সহজ আরামদায়ক ঢিলেঢালা পোশাক পরার আহ্বান জানাই। কেননা এই বয়সের তরুণীর জীবনের প্রথম ও শেষ লক্ষ্য উগ্র মেকাপ উৎকট সাজসজ্জা দ্বারা দৃষ্টি আকর্ষণ করা নয়। "আজ তার অগ্রাধিকার দিতে হবে নিজেকে বিদ্যাবুদ্ধিতে ক্ষুরধার করা ও সুসভ্য রুচি দ্বারা সমৃদ্ধ করাকে।" এখন ডাইরেক্টরের টেলিফোন ধরার জন্য সেক্রেটারীর আসনে বসা তার সর্বোচ্চ লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। তার সামনে এখনও মন্ত্রীত্বের আসন উন্মুক্ত রয়েছে। অপর এক বৃটিশ মহিলা সাংবাদিক কায়রো সফরের পর এক নিবন্ধে কায়রোর উগ্র আধুনিক মহিলাদের সমালোচনা করে লিখেছেন :

"বিমানবন্দরে নেমেই আমি দুঃখ পেয়েছি। আমি ভেবেছিলাম, আমি সঠিক অর্থেই প্রাচ্য ললনার সাক্ষাত পাবো। এ দ্বারা আমি বোরকা নিকাব পরা পর্দানশীল মহিলার কথা বলছিনা। আমি বলছি সেই রুচিবতী প্রাচ্য বৈশিষ্ট্যধারী কর্মোপযোগী পোশাক পরা প্রাচ্য ললনার কথা, যে প্রাচ্যের পদ্ধতিতেই চলাফেরা করে। কিন্তু আমি সে সবের কিছুই পেলাম না। যে কোনো ইউরোপীয় বিমানবন্দরে যে ধরনের মহিলার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, এখানে সে ধরনের মহিলারই সাক্ষাৎ পেলাম। একই বেশভূষা, একই ধরনের কেশবিন্যাস, একই মেকাপ, এমনকি কথা বলা ও চলা ফেরার ভাবভংগীও একই রকম। এমনকি ক্ষেত্রভেদে ভাষাও-কারো বা ইংরেজী, কারো ফরাসী। প্রাচ্য ললনার এ ধারণা আমাকে কষ্ট দিয়েছে যে, পাশ্চাত্য ললনার মতো বেশভূষা ও কৃষ্টি অবলম্বন করলেই পাশ্চাত্য নারীর অনুকরণ হয়ে যায়। তারা ভুলে গেছে যে, তারা নিজেদের নয়নাভিরাম প্রাচ্য পোশাক ও বেশভূষা নিয়েও উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জন করতে পারে।"

১৯৬২ সালের ৯ই জুন শনিবারের দৈনিক 'আস-সাবত' পত্রিকায় নিম্নোক্ত শিরোনামে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করা হয় : "মার্কিন লেখিকার অনুরোধ : যুবক যুবতীর অবাধ মেলামেশা বন্ধ করুন, নারী স্বাধীনতা সীমিত করুন।" উক্ত শিরোনামে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও খোলামেলা বক্তব্য তুলে ধরে পত্রিকাটি বলেছে : "মার্কিন মহিলা সাংবাদিক হেলসিয়ান ক্যাম্সবেরী" কয়েক সপ্তাহ অবস্থানের পর সম্প্রতি কায়রো ত্যাগ করেছেন। সফরকালে তিনি বিভিন্ন স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, যুবক অধ্যুষিত বিভিন্ন ক্যাম্প, বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান, কিশোর কেন্দ্রসমূহ, বিভিন্ন এলাকার নারী, শিশু কেন্দ্র ও বিভিন্ন পরিবার পরিদর্শন করেন। এটা ছিলো আরব্য সমাজে পরিবার ও যুব সমস্যাবলীর তত্ত্বানুসন্ধানমূলক সফর। হেলসিয়ান প্রায় ২৫০টি মার্কিন পত্রিকার সংবাদদাতা ভ্রাম্যমান সাংবাদিক। তিনি প্রতিদিন একটি নিবন্ধ পাঠান। যা লক্ষ লক্ষ লোক পড়ে এবং যা অনূর্ধ বিশজন তরুণ তরুণীর সমস্যাবলী নিয়ে লেখা হয়। তিনি বিশ বছরের বেশি সময় ব্যাপী রেডিও ও টেলিভিশনে চাকরি করছেন ও বিশ্বের সকল দেশ সফর করেছেন। বর্তমানে তার বয়স পঞ্চান্ন বছর। মিশরে এক মাস অবস্থানের পর এই মার্কিন মহিলা সাংবাদিক তার রিপোর্টে বলেন :

"আরব সমাজ একটি পূর্ণাঙ্গ ও শান্তিপ্রিয় সমাজ। এ সমাজে বসবাসকারীদের জন্য এ সমাজের রীতিনীতি ও ঐতিহ্য অনুসরণ করাই সমীচীন। সে ঐতিহ্য যুবক যুবতীদের উপর যুক্তিসংগত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। এ সমাজ ইউরোপীয় ও মার্কিন সমাজ থেকে পৃথক। এ সমাজে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এমন ঐতিহ্য রয়েছে, যা নারীর উপর বাধ্যতামূলক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে, পিতামাতার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধাকে বাধ্যতামূলক করে এবং সর্বোপরি, পাশ্চাত্যের সেই লাগামহীন বেলেল্লাপনাকে প্রত্যাখ্যান করা বাধ্যতামূলক করে যা বর্তমানে আমেরিকা ও ইউরোপের সমাজ ও পরিবারের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে। তাই আরব সমাজ অনূর্ধ বিশ বছর বয়স্কাসহ সকল কিশোরী ও তরুণীর উপর যেসব কড়াকড়ি ও বিধিনিষেধ আরোপ করে, তা তাদের জন্য উপযোগী ও কল্যাণকর। তাই আমি আরবদেরকে পরামর্শ দিচ্ছি, আপনাদের নৈতিকতা ও ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করুন, অবাধ মেলামেশা বন্ধ করুন এবং কিশোরী যুবতীদের স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রিত করুন এবং পর্দার যুগে ফিরে যান। আপনাদের জন্য এটা অবাধ ও লাগামহীন স্বাধীনতা, স্বেচ্ছাচারিতা এবং মার্কিন ও ইউরোপীয় নির্লজ্জতার চেয়ে উত্তম। বিশ বছর বয়সের নিচে তরুণ

তরুণীদের মেলামেশা বন্ধ করুন। আমরা আমেরিকা এ দ্বারা অনেক দুর্ভোগ পোহায়েছি। সব ধরনের বেলেল্লাপনা ও স্বেচ্ছাচারিতায় ভরপুর মার্কিন সমাজ পঙ্গু সমাজে পরিণত হয়েছে। বিশ বছর বয়সের নিচে বেলেল্লাপনা, স্বেচ্ছাচারিতা ও অবাধ মেলামেলার শিকার তরুণ তরুণীরা মার্কিন কারাগার, পানশালা ও গোপন গৃহসমূহে বসবাস করছে। যে স্বাধীনতা আমরা আমাদের অল্প বয়স্ক কিশোর কিশোরীদেরকে দিয়েছিলাম, তা তাদেরকে সন্ত্রাসী, মাদক সেবী ও মদ্যপায়ী বানিয়েছে। মার্কিন ও ইউরোপীয় সমাজে অবাধ মেলামেশা, স্বেচ্ছাচারিতা ও লাগামহীন স্বাধীনতা পরিবারগুলোর অস্তিত্বকে হুমকির সম্মুখীন করেছে এবং নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে সংকটাপন্ন করেছে। বিশ বছরের কম বয়স্কা কিশোরী আধুনিক সমাজে যুবকদের সাথে মেলামেশা করে, নাচে, মদপান করে, ধূমপান করে ও মাদক সেবন করে। আর এ সবই করে ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে। আমেরিকায় ও ইউরোপে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, বিশ বছরের কম বয়স্কা তরুণী তার পরিবারের চোখের সামনেই যার সাথে ইচ্ছা খেলাধুলা ও মেলামেশা করে। বরঞ্চ সত্যি বলতে কি, তার পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদেরকে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অবাধ মেলামেশার অধিকারের নামে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েই এসব করে। কয়েক মিনিটেই একজনকে বিয়ে করে এবং কয়েক ঘন্টার মধ্যে তার কাছ থেকে তালাক নিয়ে নেয়। কখনো বা পুনঃবিয়ে ও পুনঃতালাকও।"

দুঃসহ অবস্থার প্রতিকার

এই ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতির থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে একটা দৃঢ় প্রত্যয়ী পরিকল্পনা গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই, যার আওতায় নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা উচিত :

১. ধর্মীয় চেতনার প্রসার ঘটাতে হবে এবং এই প্রবল স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়া ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে জনগণকে হুঁশিয়ার করে দিতে হবে।

২. এমন আইন প্রণয়নের দাবিতে সংঘবদ্ধভাবে সোচ্চার হতে হবে, যা চরিত্র ও মূল্যবোধকে রক্ষার গ্যারান্টি দেবে এবং যারা তা অমান্য করবে, তাদের জন্যে কঠোর শাস্তির বিধান নিশ্চিত করতে হবে।

৩. সংবাদপত্র ও সকল গণমাধ্যমকে আপত্তিকর ও নগ্ন ছবি ছাপা নিষেধ এবং পোশাকের ডিজাইনকারকদের উপর তদারকী প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৪. সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা ও অশ্লীল নাচগান নিষিদ্ধ এবং যাবতীয় বেহায়াপনাকে নিরুৎসাহিত করতে হবে।

৫. শালীন পোশাকের প্রচলন বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৬. প্রত্যেকে প্রথমে নিজে এগুলোর বাস্তবায়ন করতে হবে এবং তারপর অন্যকে এদিকে আহ্বান জানাতে হবে।

৭. শালীনতা, লজ্জাশীলতা, পর্দা ও সৎ জীবন যাপনকে প্রশংসা ও উৎসাহ দান করতে হবে।

৮. অবসর মুহূর্তগুলোকে গঠনমূলক কাজের মধ্যদিয়ে কাটানোর ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে কোনো অপকর্মে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি না হয়।

৯. প্রতিকারের উদ্দেশ্যে সময়কে পরিকল্পনার আওতায় নিয়ে আসতে হবে। কেননা এ কাজ দীর্ঘ সময় দাবি করে।

একটা সন্দেহ অপনোদন

কিছু লোক প্রচলিত রীতি প্রথা ও সমাজ পদ্ধতির সাথে আপোষ করে চলতে পছন্দ করে এবং একে আধুনিকতা ও প্রগতির অনিবার্য দাবি বলে যুক্তি দেখায়। আমরা উন্নয়ন, অগ্রগতি ও প্রগতির বিরোধী নই। তবে ঐসব উন্নতি ও প্রগতির সমর্থন করিনা, যতো ধর্ম, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের উচ্ছেদ ঘটানোর আংশকা থাকে। কেননা ধর্ম, ধর্মভিত্তিক নৈতিকতা ও মূল্যবোধ, এসব সরাসরি আল্লাহর ওহি থেকে প্রাপ্ত। এগুলো আল্লাহর চিরন্তন ও শাশ্বত বিধানের অংশ। সর্বকাল ও সকল স্থানের জন্য তা প্রযোজ্য। আল্লাহর দীন ইসলাম মানুষের বিবেকবুদ্ধির সামনে গোটা বিশ্ব প্রকৃতিকে উন্মুক্ত করে রেখেছে, যাতে সে তার দিকে দৃষ্টি দেয়, তার মধ্যে যে সকল শক্তি ও কল্যাণ রয়েছে, তা দ্বারা উপকৃত হয় এবং তার জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভের জন্য জীবনকে প্রগতিমুখী করে। ইসলাম কোনভাবেই উন্নতি ও প্রগতির বিরোধী বা অন্তরায় নয়। সে শুধু প্রবৃত্তির অনুসারী ও নৈতিকতা বিরোধী উন্নতি ও প্রগতির বিরোধী।

৩০. স্ত্রীর মনতুষ্টির জন্য স্বামীর সাজসজ্জা

স্ত্রীর মনস্তুষ্টির খাতিরে স্বামীর সাজসজ্জা করা মুস্তাহাব। ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন : আমার স্ত্রী যেমন আমার জন্য সাজগোজ করে, আমিও তেমনি তার জন্য সাজগোজ করি। আমি তার কাছ থেকে সমস্ত অধিকার কড়ায় গণ্ডায় আদায় করা পছন্দ করিনা। কেননা তাহলে সেও আমার কাছ থেকে সকল অধিকার কড়ায় গণ্ডায় আদায় করতে চাইবে। আল্লাহ নিজেই তো বলেছেন : "স্ত্রীদের নিকট স্বামীর যেমন অধিকার রয়েছে, তেমনি স্বামীর নিকটও স্ত্রীদেরও ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে।"

ইবনে আব্বাসের এই উক্তি সম্পর্কে কুরতুবী বলেন, আলেমগণ বলেছেন : "পুরুষদের সাজসজ্জার কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। এটা নির্ভর করবে তারা তাদের বিচক্ষণতা ও পারিপার্শ্বিকতার সাথে সাযুজ্যকে কিভাবে বাস্তব রূপ দেবে তার উপর। কোনো বিশেষ ধরনের সাজসজ্জা চলমান সময়ের উপযোগী মনে হতে পারে, আবার কোনোটা অনুপযোগী মনে হতে পারে। কোনোটা যুবকদের উপযোগী ও বৃদ্ধদের অনুপযোগী হতে পারে। আবার কোনোটা যুবকদের অনুপযোগী ও বৃদ্ধদের উপযোগী হতে পারে। অনুরূপ, পোশাকের ব্যাপারেও। এসব কিছুতেই স্ত্রীর অধিকার ও মনোরঞ্জনকেই প্রাধান্য দিতে হবে এবং এভাবেই তার নিকট গ্রহণযোগ্যতা ও তার কামনা বাসনার সাথে সাযুজ্য অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। মূল লক্ষ্য হওয়া চাই স্ত্রীর ভালো লাগে ও তাকে আনন্দ দেয় এমন সাজসজ্জা, যাতে সে অন্য পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পায়। আর সুগন্ধী ব্যবহার, দাঁত পরিষ্কার করা, খিলাল করা, শরীর পরিষ্কার করা, অপ্রয়োজনীয় চুল ও লোম দূর করা, পাক পবিত্র থাকা, নখকাটা- এসব কিছু স্পষ্টতই সবার কাছে কাম্য। বুড়োদের জন্য পাকা চুলে মেহেদী দেয়া এবং যুবাবৃদ্ধ সবার জন্য আংটি ব্যবহার করা উত্তম সাজসজ্জা। আংটি পুরুষের বৈধ অলংকার। তাছাড়া পুরুষদের প্রতি স্ত্রীর চাহিদার প্রকৃত সময়টি জানা এবং তাকে ভিন্ন পুরুষের প্রতি আকর্ষণ থেকে মুক্ত রাখাও স্বামীর কর্তব্য। যদি কখনো স্ত্রীর যৌন চাহিদা পূরণে স্বামী নিজের ভেতরে দুর্বলতা রয়েছে বলে অনুভব করে, তবে তার যৌন ক্ষমতাবর্ধক ওষুধ সেবন করা উচিত, যাতে করে স্ত্রীকে ভিন্ন পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া থেকে বিরত রাখা যায়। তবে এ উদ্দেশ্যে কিছু লোক গাঁজা,

আফিম ইত্যাদি মাদক সেবনের ন্যায় ধ্বংসাত্মক ও ভুল পথে পা বাড়িয়েছে, যা একদিকে যৌন ক্ষমতাকে চিরতরে পঙ্গু করে দেয়া এবং নিজের উপর ও নিজের পরিবারের উপর যুলুম ও অপরাধ করার নামান্তর। আলেমগণ সর্বসম্মতভাবে রায় দিয়েছেন যে, গাঁজা, আফিম প্রভৃতি মাদক সেবন সম্পূর্ণ হারাম ও মদপানের মতো শাস্তিযোগ্য। আর যে ব্যক্তি একে হালাল মনে করবে, সে ইসলাম থেকে মুরতাদ ও কাফের হয়ে যাবে। আর স্ত্রীর সাথে তার চিরস্থায়ী বিচ্ছেদ অনিবার্য।

উম্মে যারার স্বামীর উপমা

নাসায়ীতে বর্ণিত হয়েছে, আয়েশা রা. বলেছেন : এ হাদিসের উপলক্ষ হলো, আমি জাহেলি যুগে আমার পিতার বিপুল বিত্ত বৈভব নিয়ে গর্ব করতাম। আমার পিতার হাজার হাজার উকিয়া পরিমাণ সম্পদ ছিলো। রসূলুল্লাহ সা. আমাকে বললেন : ওহে আয়েশা, থামো। আমি তোমার জন্য উম্মে যারার স্বামী আবু যারার মতো। অন্য রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে: হাদিসটির উপলক্ষ ছিলো এরকম : একবার আয়েশা ও ফাতেমার মধ্যে কিছু কথা কাটাকাটি হলো। এ সময় সহসা রসূল সা. সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন : হে হুমায়রা (আয়েশা), তুমি কি আমার মেয়ের সাথে কথা কাটাকাটি বন্ধ করবে না? তোমার সাথে আমার উদাহরণ হলো উম্মে যারার সাথে আবু যারার মতো। আয়েশা রা. বললেন : হে রসূলুল্লাহ, ঐ দু'জনের ঘটনা আমাদের বলুন। তখন রসূলুল্লাহ সা. বললেন : এক গ্রামে এগারো জন মহিলা বাস করতো। তাদের স্বামীরা অন্যত্র অবস্থান করতো। তখন মহিলারা একে অপরকে বললো : এসো, আমরা আমাদের প্রত্যেকের স্বামীর স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে যা সত্য তাই বলাবলি করি। কোনো মিথ্যাচার করবোনা। কারো কারো মতে, এ গ্রামটি ছিলো ইয়ামেনে। আবার কেউ কেউ বলেন : এই মহিলারা মক্কার অধিবাসী ছিলো। অন্যরা বলেন, তারা ছিলো জাহেলি যুগের মহিলা।

আয়েশা রা. রসূল সা. থেকে শুনা সেই কাহিনী বর্ণনা করেন : এগারো জন মহিলা একবার আড্ডা জমিয়ে বসলো। এক পর্যায়ে তারা পরস্পরে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হলো যে, তারা তাদের নিজ নিজ স্বামী সম্পর্কে সত্য তথ্য প্রকাশ করবে এবং কিছুই গোপন করবে না। প্রথম জন বললো : আমার স্বামী এত জীর্ণ শীর্ণ যে, দেখলে ঘৃণা হয়। সে অত্যন্ত অস্থিরচিত্ত ও রূঢ়ভাষী, কৃপণ ও খারাপ স্বভাবের লোক। ফলে সবাই তার কাছ থেকে হতাশ। কেউ তার কাছে ঘেষতে চায়না। দ্বিতীয় মহিলা বললো : আমার স্বামীর ভেতরে কোনো ভালো গুণ নেই। তার এত দোষ যে বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে। সংক্ষেপে এতোটুকু বলাই যথেষ্ট যে, সে খুবই রগচটা। তৃতীয়জন বললো : আমার স্বামী অসৎ চরিত্রের লোক হলেও তাকে আমি ভালোবাসি। তার কুৎসা রটাচ্ছি এটা সে জানতে পারলে আমাকে নির্ঘাত তালাক দেবে। তাই আমার চুপ থাকাই ভালো। চতুর্থজন বললো: তেহামার অধিবাসীদের কাছে রাত্রিকাল যেমন আরামের, আমার স্বামী তেমনি। সে আচার ব্যবহারে ভালো। আমি তার কাছ থেকে কোনো কষ্ট পাইনি এবং নিরাপদ আছি। তার চরিত্র খারাপ নয়। তাই তার সাথে বসবাসে কোনো অসুবিধা নেই। আমি তার কাছে পরম শান্তিতে আছি। পঞ্চমজন বললো : আমার স্বামী যতোক্ষণ বাড়িতে থাকে ততোক্ষণ হয় ঘুমায়, না হয় লম্ফঝম্প করে। আর বাইরে শত্রুর বিরুদ্ধে খড়গহস্ত। সে খুবই দানশীল ও মুক্তহস্তে দান করতে অভ্যস্ত। ষষ্ঠজন বললো : আমার স্বামী যখন কিছু খায় বা পান করে, তখন চেটেপুটে সবই সাবাড় করে। আর যখন ঘুমায়, তখন নিজের কম্বল নিয়ে

আমাকে একা রেখে ঘুমায়। আমার দিকে একটু হাত বাড়িয়েও বুঝতে চেষ্টা করেনা আমি কি চাই। সপ্তমজন বললো : আমার স্বামী বোকা। দেশে কোনো রোগের সংক্রমণ ঘটলে সেটি তাকে আক্রান্ত করবেই। স্ত্রীকে প্রহার করতে খুবই পটু। যখন প্রহার করে তখন হয় হাড় ভেঙে দেবে, নতুবা মাথা ফাটাবে অথবা দুটোই করবে। অষ্টমজন বললো : আমার স্বামী অত্যন্ত কোমল ত্বকধারী ও সুগন্ধীযুক্ত। নবমজন বললো : আমার স্বামী অত্যন্ত লম্বা, সাহসী, দানশীল ও মিশুক। দশমজন বললো : আমার স্বামী বহু উটের মালিক। তবে সেগুলো অতিথিদের জন্য এত ঘন ঘন যবাই করে যে, তারা মাঠে চরার তেমন সুযোগই পায়না। উটগুলো যখন তাদের মালিকের বাড়িতে বাদ্যের বাজনা শুনতে পায়, তখন তারা নিশ্চিত হয় যে, তাদের যবাই-এর সময় আসন্ন। একাদশ মহিলা বললো : আমার স্বামীর নাম আবু যারা। সে মহান আবু যারা? অলংকার দিয়ে আমার দু'কান ভরে দিয়েছে। এত রকমারি খাবার আমাকে খাইয়েছে যে, আমার শরীর মোটা হয়ে গেছে। আমাকে সর্বপ্রকারের আনন্দে বিভোর করে দিয়েছে এবং সম্মানিত করেছে। সে অনেক কষ্ট করে আমাকে একটা ধনাঢ্য পরিবার থেকে বিয়ে করে এনেছে। আর এখানেও আমাকে বিপুল বিত্তবৈভবে পূর্ণ করে দিয়েছে। আমি যত কিছুই তার কাছে চাই, সে কখনো দিতে অস্বীকার করেনা, এমনকি তাতে বিরক্তও হয়না। আমি সকাল থেকে দিনের প্রথমাংশ ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেই। আমাকে কেউ জাগায়না। আমি খানিক বিরতি দিয়ে দিয়ে রকমারি পানীয় পান করি। আর 'আমার শাশুড়ী, আবু যারার মার কথা কী বলবো? তিনি যখন কোথাও যান, তার ব্যাগে এত সামগ্রী ভর্তি থাকে যে, তা নিয়ে তিনি দ্রুত হাঁটতেই পারেননা। তার বিশাল সুপ্রশস্ত বাড়ি। আর আমার পুত্র আবি যারার ছেলের কথা শুনবে? সে ছোট একটা আলাদা খাটে ঘুমায়। যখন ঘরে আসে, আমাকে বেশি বিরক্ত করেনা। সামান্য কিছু খাবার পেলেই তার যথেষ্ট হয়ে যায়। আর আমার মেয়ে বিনতে আবি যারা? সে মাতাপিতার ভক্ত ও অনুগত। সৌন্দর্যে ও অংগ সৌষ্ঠবে সে অতুলনীয়। তাকে দেখে প্রতিবেশিণীরা হিংসায় জ্বলে। আর আমার দাসীর কথা শুনবে? সে আমাদের কোনো গোপন কথা ফাঁস করেনা এবং কোনো চুরি চামারি করেনা। ঘরবাড়ি পরিষ্কার ও পরিপাটি রাখে। একদিন আবু যারা অতি প্রত্যুষে বাড়ি থেকে বের হলো। জনৈকা মহিলার সাথে তার সাক্ষাৎ হলো। দুই সন্তানের জননী হলেও সে ছিলো অল্প বয়স্কা তরুণী। অমনি সে আমাকে তালাক দিয়ে তাকে বিয়ে করে ফেললো। এরপর আমি একজন সম্ভ্রান্ত লোককে বিয়ে করলাম। সে দ্রুতগতি সম্পন্ন ঘোড়ায় আরোহণ করতো। সে আমাকে বিপুল প্রাচুর্যের মধ্যে রেখেছিল এবং আমাকে প্রচুর উপহার দিত এবং বলতো : হে উম্মে যারা, তোমার পিতামাতা ভাইবোনকে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য দাও। সে আমাকে যা কিছু দিয়েছে, তার সবই যদি একত্রিত করি, তবুও তা আবু যারার ক্ষুদ্রতম যে পাত্রে সব সময় রান্না করা হতো, তার সমানও হবেনা। "এরপর আয়েশা রা. বললেন : রসূলুল্লাহ সা. বললেন : হে আয়েশা, উম্মে যারার জন্য আবু যারা যেমন ছিলো, আমি তোমার জন্য তেমনি। তবে সে তাকে তালাক দিয়েছিল, আমি তোমাকে কখনো তালাক দেবনা। আয়েশা রা. বললেন : হে রসূলুল্লাহ, আপনি বরঞ্চ আমার জন্য আবু যারার চেয়েও উত্তম।" (বুখারি, মুসলিম, নাসায়ী)

৩১. বিয়ের পূর্বে খুতবা

বিয়ের আকদ সম্পাদনকারী বা অন্য কেউ বিয়ের আগে কমের পক্ষে আল্লাহর প্রশংসা ও রসূলুল্লাহ সা.এর জন্য দরূদ সম্বলিত একটা খুতবা বা ভাষণ দেবে। এটা মুস্তাহাব।

১. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে খুতবায় তাশাহহুদ নেই, সে খুতবা কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হাতের মত। (আবু দাউদ, তিরমিযি)

২. আবু হুরায়রা রা. থেকে আরো বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ আল্লাহর প্রশংসা দ্বারা শুরু করা না হলে তা কল্যাণশূন্য। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

এখানে শুধু আল্লাহর প্রশংসাই বুঝানো হচ্ছেনা, বরং সামগ্রিকভাবে আল্লাহর মহান কীর্তি ও গুণাবলীকে বুঝানো হচ্ছে। এ ব্যাখ্যা দ্বারা এ বর্ণনার সাথে অন্যান্য বর্ণনায় সমন্বয় ঘটবে। সবচেয়ে ভালো হয় প্রয়োজন সংক্রান্ত খুতবা দেয়া :

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. যাবতীয় কল্যাণপূর্ণ বাণী ও চূড়ান্ত কল্যাণময় বাণীর প্রবক্তা ছিলেন। অন্য বর্ণনা মতে : যাবতীয় প্রারম্ভিক কল্যাণপূর্ণ বাণী ও সমাপনী কল্যাণপূর্ণ বাণীর প্রবক্তা ছিলেন। তাই তিনি আমাদেরকে নামাযের খুতবাও শিখিয়েছেন, প্রয়োজনের খুতবাও। নামাযের খুতবা হলো : (তাশাহহুদ) আত্তাহিয়াতু লিল্লাহি ওয়াস্ সালাওয়াতু ওয়াত্ তাইয়্যিবাতু, আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান্নাবিউ...... সকল অভিনন্দন, সকল প্রশংসা ও সকল পবিত্র বাণী আল্লাহর জন্য। হে নবী, আপনার উপর সালাম, আল্লাহর রহমত ও বরকত নাযিল হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর সৎ বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ সা. আল্লাহর বান্দা ও রসূল।"

আর প্রয়োজনের খুতবা (যা বিয়েতে পড়া হয়) হলো :

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا . وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ...

অর্থ : আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা, আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই কাছে সাহায্য চাই এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর আমরা আমাদের অকল্যাণ ও অন্যায় কাজ থেকে তাঁরই নিকট আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে সৎ পথে চালান, তাকে কেউ বিপথগামী করতে পারেনা; আর আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন, তাকে কেউ সৎ পথে আনতে পারেনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ সা. তাঁর বান্দা ও রসূল।"

এরপর খুতবার সাথে কুরআন থেকে নিম্নোক্ত তিনটি আয়াত জুড়ে দেবে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ○

১. হে মুমিনগণ, আল্লাহকে যথোচিতভাবে ভয় করো এবং মুসলমান অবস্থায় ব্যতীত মৃত্যুবরণ করোনা। (আল-ইমরান, আয়াত ১০২)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ج وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ○

২. হে মানব জাতি, তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে একজন মাত্র ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সেই ব্যক্তি থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই দুইজন থেকে বহু নারী ও পুরুষের বিস্তার ঘটিয়েছেন। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যার নামে একে অপরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে থাকো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক। (সূরা নিসা, আয়াত ১)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝ يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝

৩. হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। আল্লাহ তোমাদের কর্মসমূহকে সংশোধন করবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করবেন। আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, সে তো মহাসাফল্য লাভ করবে। (সূরা আহযাব, আয়াত ৭০, ৭১) ইবনে মাজাহ] খুতবা বা ভাষণ ছাড়াও বিয়ে শুদ্ধ হয়। কেননা বনু সুলাইমের এক ব্যক্তি জানান : যে মহিলাটি নিজেকে রসূলুল্লাহ সা.এর নিকট পেশ করেছিলেন যেন তিনি তাকে বিয়ে করেন, তার সম্পর্কে এই ব্যক্তি রসূল সা.-এর নিকৃষ্ট প্রস্তাব দিলেন। তখন রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তোমার কাছে কুরআনের যেটুকু মুখস্থ আছে, তার বিনিময়ে তোমাদের দু'জনকে বিয়ে দিলাম। এছাড়া আর কোনো খুতবা দেননি।

হিকমত বা যৌক্তিকতা

হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা গ্রন্থে বলা হয়েছে : জাহেলী যুগের লোকেরা নিজ গোত্রের গৌরব গাঁথার বিবরণ দিয়ে আকদের আগেই খুতবা দিত। এর দ্বারা তারা তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা করতো। এই প্রথাটার চালু থাকা কল্যাণকর ছিলো। কেননা খুতবার মূল উদ্দেশ্য হলো প্রচার এবং বিয়ের বিষয়টাকে জনসাধারণের কান ও চোখের গোচরে আনা। বিয়ের প্রচারের উদ্দেশ্য হলো, এটা যেন ব্যভিচার থেকে পৃথক হয়ে যায়। তাছাড়া খুতবা গুরুত্বপূর্ণ কাজে ছাড়া ব্যবহৃত হয়না। আর বিয়েকে গুরুত্বপূর্ণ ও আড়ম্বরপূর্ণ কাজে পরিণত করা একটা মহৎ লক্ষ্য। এজন্য রসূল সা. জাহেলী যুগের এই প্রথার মূল অস্তিত্ব বহাল রেখেছেন এবং এর বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করেছেন। বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে তিনি সংশ্লিষ্ট কাজের উল্লেখকে এর সাথে যুক্ত করেছেন এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহর মাহাত্ম্য ও নিদর্শনাবলীর বর্ণনা চালু করেছেন, যাতে আল্লাহর সত্য দ্বীনের প্রচার ও প্রসার ঘটতে থাকে এবং এর নিদর্শনাবলী প্রকাশ পায়। এজন্য তিনি খুতবায় বিভিন্ন ধরনের যিকর, যথা আল্লাহর প্রশংসা, আল্লাহর সাহায্য কামনা, আল্লাহর নিকট গুনাহ মাফ চাওয়া, তাঁর নিকট শয়তান থেকে আশ্রয় চাওয়া, তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করা, তাশাহহুদ পড়া ও কুরআনের বিভিন্ন আয়াত পাঠের রীতি চালু করেছেন। খুতবার এই স্বার্থকতার দিকে ইংগিত করেই তিনি বলেছেন : "যে খুতবায় তাশাহহুদ নেই, তা কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হাতের মতো।" আরো বলেছেন : "যে কথা আল্লাহর প্রশংসা দিয়ে শুরু করা হয়না, তা কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত।" আরো বলেছেন : "হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্য হলো বিয়েতে হৈচৈ হওয়া ও ঢোল বাজানো।"

আকদের পর দোয়া

আকদ বা বিবাহ বন্ধন সম্পন্ন হবার পর স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের জন্য রসূলুল্লাহ সা. থেকে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেভাবে দোয়া করা মুস্তাহাব।

১. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, যখন কেউ বিয়ে করতো, তখন রসূলুল্লাহ সা.বলতেন :

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِىْ خَيْرٍ .

"আল্লাহ তোমার জন্য (এ বিয়েতে) বরকত দিন, তোমার উপর বরকত বর্ষণ করুন এবং তোমাদের দু'জনকেই ভালোভাবে একত্রিত রাখুন।"

২. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সা. যখন আমাকে বিয়ে করলেন, তখন আমার মা আমার কাছে এলেন এবং আমাকে বাড়িতে প্রবেশ করালেন। দেখলাম, আনসারদের একদল মহিলা গৃহে সমবেত রয়েছে। তারা বললো : "কল্যাণের উপর থাকুন, বরকতের উপর থাকুন। উড়ে আসতে থাকা কল্যাণের উপর থাকুন।" -বুখারি, আবু দাউদ।

৩. হাসান রা. থেকে বর্ণিত : আবু তালেবের ছেলে আকীল যখন বনু জুসাম গোত্রের এক মহিলাকে বিয়ে করলেন, তখন তারা বললো : "কল্যাণ ও সন্তান সন্ততি সহকারে থেকো।" আকীল রা. বললেন : রসূলুল্লাহ সা.-এর মতো বলো : তোমাদের সংসারে বরকত হোক, তোমাদের উপর বরকত বর্ষিত হোক।" -নাসায়ী।

৩২. বিয়ের প্রচার

শরিয়তের দৃষ্টিতে বিয়ের প্রচার হওয়া উত্তম, যাতে তা নিষিদ্ধ গোপন বিয়ে থেকে পৃথক হয়। তাছাড়া আল্লাহর হালালকৃত পবিত্র কাজে আনন্দ প্রকাশের উদ্দেশ্যেও এটা হওয়া দরকার। বস্তুত এটা প্রচার করার যোগ্য একটা কাজ, যাতে সর্বশ্রেণীর মানুষ, আপন পর, সবাই বিষয়টা জানতে পারে। বিয়ের প্রচারের আরেকটা উদ্দেশ্য হলো, সমাজে যদি কেউ এমন থেকে থাকে যে বিয়ে না করে একাকী থাকাকে অগ্রাধিকার দেয়, তবে তারা যেন বিয়ে করতে উৎসাহিত হয়। এভাবে সমাজে বিয়ের প্রচলন বৃদ্ধি পায়।

বিয়ের প্রচার সমাজে যেভাবে প্রচলিত আছে এবং যেভাবে প্রত্যেক শ্রেণী ও গোত্র তা করে থাকে, একমাত্র শরিয়ত নিষিদ্ধ কার্যকলাপ যথা মদ পান ও নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা ইত্যাদি তার সাথে যুক্ত না থাকলে, সেইভাবেই করা যায়।

১. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "তোমরা বিয়ের প্রচার কর, মসজিদে বিয়ে অনুষ্ঠিত করো এবং এজন্য ঢোল বাজাও।" -আহমদ, তিরমিযি।

একথা নিঃসন্দেহে সত্য, মসজিদে বিয়ের অনুষ্ঠান করা তার প্রচারের জন্য সবচেয়ে কার্যকর। কারণ মসজিদ হলো, জনগণের মিলনের স্থান। বিশেষত, প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের জন্য মসজিদ ছিলো ক্লাব বা কমিউনিটি সেন্টারের মতো।

২. ইয়াহিয়া বিন সালেম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি মুহাম্মদ বিন হাতেবকে বললাম : আমি দু'জন মহিলাকে বিয়ে করেছি, তার কোনো একটিতেও ঢোল শহরতের ব্যবস্থা ছিলনা। মুহাম্মদ রা. বললেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "হালাল ও হারামের মধ্যে (অর্থাৎ বিয়ে ও ব্যভিচারের মধ্যে) পার্থক্য হলো ঢোল শহরত করা।

বিয়েতে সংগীত

নির্দোষ আমোদ প্রমোদে উৎসাহ দান ও আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইসলাম বিয়ের অনুষ্ঠানে সংগীতকে বৈধ করেছে ও তাকে পছন্দনীয় ঘোষণা করেছে। তবে এই সংগীত ভাঁড়ামি, নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা থেকে মুক্ত হওয়া চাই।

১. আমর বিন সা'দ রা. বলেন : আমি একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে কারযা বিন কা'ব ও আবু মাসউদ আনসারীর কাছে গিয়ে দেখলাম, কতিপয় দাসী গান গাইছে। আমি বললাম : আপনারা উভয়ে তো রসূলুল্লাহ সা.-এর সাহাবী এবং বদরযোদ্ধা। আপনাদের উপস্থিতিতে এসব চলছে? তারা উভয়ে বললেন : "ইচ্ছা হলে আমাদের সাথে বসে শোনো, নচেত চলে যাও। বিয়ের অনুষ্ঠানে আমাদেরকে আমোদ প্রমোদের অনুমতি দেয়া হয়েছে।" -নাসায়ী, হাকেম।

২. আয়েশা রা. ফারেয়া বিনতে আসয়াদকে বাসর ঘরে প্রবেশ করান এবং তার সাথে বাসর রাতে তার স্বামী নাবীত বিন জাবের আনসারীর বাড়ি পর্যন্ত গমন করেন। পরে রসূল রা. জিজ্ঞাসা করলেন : 'হে আয়েশা, তোমাদের সাথে কোনো সংগীতের ব্যবস্থা ছিলনা? আনসাররা সংগীত খুবই ভালোবাসে।" (বুখারি, আহমদ) এই হাদিসের অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে : "তোমরা কি ঐ মেয়েটির সাথে ঢোল বাজাতে ও গান গাইতে পারে এমন কোনো দাসীকে পাঠিয়েছ? আয়েশা রা. বললেন : হে রসূলুল্লাহ্, সে কী বলে গান গাইবে? রসূলুল্লাহ সা. বললেন, বলবে : "আমরা তোমাদের কাছে এসেছি, আমরা তোমাদের কাছে এসেছি, তোমরা আমাদের অভিনন্দন জানাও, আমরা তোমাদের অভিনন্দন জানাবো। লাল স্বর্ণ যদি না থাকতো, তাহলে এই মেয়ে তোমাদের জনপদে আসতোনা। বাদামি রং-এর গম যদি না জন্মাতো, তাহলে তোমাদের কুমারী মেয়েরা হৃষ্টপুষ্ট হতোনা।"

রুবাঈ বিনতে মুওয়াওযায় বলেন, আমার যখন বিয়ে হয়, তখন রসূলুল্লাহ সা. আমার কাছে এলেন এবং আমার বিছানায় বসলেন। তখন আমাদের কিছু ছোট ছোট দাসী ঢোল বাজিয়ে বদরযুদ্ধে নিহত আমার পূর্ব পুরুষদের গুণাবলী বর্ণনাসহ বিলাপ করতে লাগলো। (রুবাঈর পিতা মুওয়াওযায় ও তার দুই চাচা আওফ ও মুয়ায বদর যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন) সহসা জনৈকা দাসী বললো : ......"এখন আমাদের মধ্যে একজন নবী রয়েছেন, যিনি আগামীকাল কী ঘটবে জানেন।" এ সময় রসূলুল্লাহ সা.বললেন : এই শেষোক্ত কথাটা বাদ দিয়ে আর যা যা বলছিলে তাই বলো। (রসূলুল্লাহ সা. একথাটা বলতে নিষেধ করলেন এজন্য যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ গায়েব জানেনা। অন্য হাদিসে বলা হয়েছে : রসূলুল্লাহ সা. বললেন : আগামীকাল কী ঘটবে, তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেনা) -বুখারি। আবুদ দাউদ, তিরমিযি।

৩৩. বিয়ের সময় বধূকে সদুপদেশ দান

স্ত্রীকে সদুপদেশ দেয়া মুস্তাহাব

আনাস রা. বলেছেন : সাহাবীগণ যখন কোনো মহিলাকে তার স্বামী গৃহে পাঠাতেন, তখন তাকে স্বামীর সেবা ও তার অধিকার আদায়ের উপদেশ দিতেন।

বিয়ের সময় কন্যাকে পিতার উপদেশ দান

আবদুল্লাহ বিন জাফর বিন আবু তালেব তার মেয়েকে নিম্নরূপ উপদেশ দিলেন : "মান অভিমান ও তিরস্কার এড়িয়ে চলবে। এটা ঘৃণা ও শত্রুতার জন্ম দেয়। চোখে সুর্মা মেখো। এটা সবচেয়ে ভালো সাজসজ্জা। আর পানি সবচেয়ে উত্তম সুগন্ধী।"

স্ত্রীকে স্বামীর উপদেশ দান

আবুদ দারদা রা. স্ত্রীকে বলেছিলেন : "তুমি যখন দেখবে আমি রেগে গিয়েছি, তখন

আমার রাগ প্রশমন করবে। আর যখন আমি তোমাকে রাগান্বিত দেখবো, তখন তোমাকে খুশী করবো। নচেত তোমার কাছে থাকবোনা।" জনৈক স্বামী তার স্ত্রীকে বলেন : "তুমি আমার সাথে ক্ষমার নীতি অবলম্বন করো, তাহলে আমার চিরস্থায়ী ভালোবাসা পাবে, আর আমি যখন ক্রুদ্ধ হই তখন ক্রোধের তীব্রতার সময় আমার সাথে কথা বলোনা। আর ঢোলকে যেভাবে টোকা দেয়া হয়, সেভাবে আমাকে কখনো টোকা দিওনা। কেননা তুমি জাননা, স্ত্রী থেকে অনুপস্থিত স্বামীর কিভাবে দিন কাটে। খুব বেশি অভিযোগ করোনা। তাতে কেবল শক্তি ক্ষয় হবে। যদি কখনো আমার মন তোমাকে অস্বীকার করে তবে মনও তো পরিবর্তনশীল। আমি দেখেছি, কারো মনে যদি ভালোবাসা ও মনোকষ্ট একত্রিত হয়, তবে ভালোবাসা টেকসই হয়না, দূর হয়ে যায়।"

বিয়ে সম্পর্কে মেয়েকে মায়ের উপদেশ

কান্দার রাজা আমর বিন হাজর উম্মে ইয়াস নাম্মী মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন এবং বিয়ে করেন। যখন বাসরের সময় ঘনিয়ে এলো, তখন উম্মে ইয়াসের মাতা উমামা তার সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে মেয়েকে এমন কয়েকটি উপদেশ দিলেন, যা দ্বারা সুখী দাম্পত্য জীবনের ভিত্তি ও স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কী কী করণীয় তা জানা যায়। উমামা বললেন : হে আমার কন্যা, উপদেশ যদি বাড়তি মহত্ত্বের নিদর্শনস্বরূপ দেয়া হতো, তবে আমি তোমার জন্য রেখে দিতাম। কিন্তু এটা আসলে অচেতন মানুষকে সচেতন করা ও বুদ্ধিমানকে সাহায্য করার সরঞ্জাম। কোনো মেয়ে যদি তার পিতামাতা ধনী হওয়ার কারণে ও মেয়ের প্রতি পিতামাতার তীব্র মুখাপেক্ষিতার কারণে স্বামীর অমুখাপেক্ষী হতো, তাহলে আমিই হতাম স্বামীর সবচেয়ে অমুখাপেক্ষী। কিন্তু নারীদেরকে পুরুষদের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পুরুষদেরকেও নারীদের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। হে আমার কন্যা, যে পরিবেশ থেকে তুমি আবির্ভূত হয়েছে, তা ত্যাগ করে চলে গিয়েছ, যে বাসস্থানে তুমি লালিত পালিত হয়েছ, তা ছেড়ে তুমি এক অজানা বাসস্থানে চলে গিয়েছ এবং একজন অচেনা সাথীর সঙ্গিণী হয়েছ। সে এখন তোমার তত্ত্বাবধায়ক ও কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েছে। সুতরাং এখন তুমি যদি তাকে তোমার কৃতজ্ঞ গোলাম বানাতে চাও, তবে তার বাদী হয়ে যাও। আর তার ব্যাপারে দশটি উপদেশ মনে রাখো, যা তোমার জন্য মূল্যবান সম্পদে পরিণত হবে।

১ম ও ২য় : অল্পে তুষ্টি দ্বারা তার প্রতি একাগ্রতা ও আন্তরিকতা দেখাবে এবং তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে ও আনুগত্য করবে।

৩য় ও চতুর্থ : তার চোখ ও নাক সম্পর্কে সতর্ক থাকবে। তার চোখ যেন তোমার মধ্যে খারাপ কিছু না দেখে এবং তার নাক যেন তোমার মধ্যে কোনো দুর্গন্ধ না পায়।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ : তার ঘুম ও খাবার সময়ের উপর নজর রাখবে। ক্রমাগত ক্ষুধার্ত থাকা ক্রোধ উস্কে দেয় এবং ঘুমের ব্যাঘাত বিরক্তি সৃষ্টি করে।

৭ম ও ৮ম : তার ধন সম্পত্তি রক্ষা করবে এবং তার পরিবার পরিজনের তদারকী করবে। মনে রাখবে, ধনসম্পত্তির ব্যাপারে ভাগ্যই মূল কথা আর পরিবার লালন পালনে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাই মূল কথা।

৯ম ও ১০ম : স্বামীর কোনো হুকুম অমান্য করোনা, তার কোনো গোপনীয়তা ফাঁস করোনা। তার হুকুম অমান্য করলে তার বুকে বিদ্বেষের আগুন জ্বলবে। আর তার

গোপনীয়তা ফাঁস করলে তার প্রতিশোধ থেকে নিরাপদ থাকতে পারবেনা। আর সে যখন দুশ্চিন্তায় থাকে তখন তার সামনে উৎফুল্লতা প্রকাশ করবেনা। আর সে যখন আনন্দিত থাকে তখন তার সামনে বিষণ্নভাব প্রদর্শন করবেনা।

৩৪. ওলিমা বা বৌভাত

১. সংজ্ঞা : ওলিমা শব্দের আভিধানিক অর্থ একত্রিত হওয়া। এখানে স্বামী ও স্ত্রী একটি ভোজনে মিলিত হয় বলে এই নামকরণ হয়েছে। বিয়ে সংক্রান্ত যে কোনো ভোজন বা অন্য যে কোনো নিমন্ত্রণে আয়োজিত ভোজনকেও অভিধানে লিমা বলা হয়।

অধিকাংশ আলেমের মতে ওলিমা সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ।

১. রসূলুল্লাহ সা. আবদুর রহমান বিন আওফকে বলেছেন : "একটা ছাগল দিয়ে হলেও ওলিমা করো।"

২. আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. তার আর কোনো স্ত্রীর জন্য এমন ওলিমা করেননি, যেমন করেছেন যয়নবের জন্য। যয়নবের জন্য তিনি একটি ছাগল দিয়ে ওলিমা করেছেন। (বুখারি, মুসলিম)

৩. বুরাইদা রা. বলেছেন : আলী রা. যখন ফাতেমা রা.-এর জন্য বিয়ের প্রস্তাব দেন, তখন রসূলুল্লাহ সা. বললেন : বিয়ের জন্য ওলিমা জরুরি। (আহমদ)

৪. আনাস রা. বলেছেন : "রসূলুল্লাহ সা. তাঁর স্ত্রীদের কারো জন্য এমন ওলিমা করেননি, যেমন যয়নবের জন্য করেছেন। লোকদের দাওয়াত করার জন্য আমাকে পাঠাতে লাগলেন এবং তাদেরকে রুটি ও গোশত খাইয়ে তৃপ্ত করলেন।

৫. বুখারি বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. তার কোনো একজন স্ত্রীর জন্য দুই মুদ যব দ্বারা ওলিমা করেছেন।

এই ব্যবধানের কারণ এক স্ত্রীকে অন্য স্ত্রীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া নয়। এ ব্যবধানের কারণ হলো, এক সময় অভাব অনটন ছিলো, আর অন্য সময় ছিলো স্বচ্ছলতা।

৩. ওলিমার সময় : ওলিমার সময় হলো, আকদের অব্যবহিত আগে বা পরে, কিংবা বাসরের অব্যবহিত পূর্বে বা পরে। এতে প্রচলিত রীতিপ্রথা অনুসারে প্রশস্ততার অবকাশ রয়েছে। বুখারির মতে, রসূলুল্লাহ সা. যয়নবের সাথে বাসর যাপনের পরে জনগণকে দাওয়াত করেছেন।

৪. দাওয়াত কবুল করা : বিয়ের ওলিমায় দাওয়াত দেয়া হলে যাকে দাওয়াত দেয়া হয়েছে, তার উপর দাওয়াত কবুল করা ওয়াজিব। কেননা এ দ্বারা আহুত ব্যক্তির প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়, তার জন্য আনন্দ প্রকাশ করা হয় এবং তার মনকে খুশি করা হয়।

১. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাদের কাউকে যখন কোনো ওলিমায় দাওয়াত দেয়া হয়, তখন তার ওলিমায় উপস্থিত হওয়া কর্তব্য।

২. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলো, সে আল্লাহ ও তার রসূলের নাফরমানী করলো।

৩. আবু হুরায়রা রা. থেকে আরো বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আমাকে যদি এক ক্রোশ দূরে যাওয়ার দাওয়াত দেয়া হয়, তবু আমি যাবো, আর যদি এক গজ দূরে যাওয়ার দাওয়াত দেয়া হয়, তবুও আমি সেখানে যাবো। (সব ক'টি হাদিস বুখারি কর্তৃক বর্ণিত)

তবে দাওয়াত যদি সাধারণভাবে দেয়া হয় এবং কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা দলকে না দেয়া হয়, তাহলে তা কবুল করা ওয়াজিবও নয়, মুস্তাহাবও নয়। যেমন দূত বললো : হে জনগণ, (কোনো নির্দিষ্টকরণ ব্যতীত) ওলিমায় আসুন। অথবা দূতকে বলা হলো, যাকে পাও, দাওয়াত দাও। যেমন একবার রসূলুল্লাহ্ সা. করেছিলেন : আনাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বিয়ে করলেন, অতপর তার স্ত্রীর সাথে বাসর যাপন করলেন। তখন আমার মাতা উম্মে সুলাইম হাইস (খেজুর, ঘি ও ছাতু মিশানো খাবার) তৈরি করলেন, তারপর সেই খাবার একটি পাত্রে ঢাললেন। তারপর বললেন : এটা রসূলুল্লাহ্ সা.-এর নিকট নিয়ে যাও। আমি নিয়ে গেলাম। তিনি বললেন : এখানে রাখো। তারপর বললেন : অমুককে অমুককে এবং যাকে যাকে পাও দাওয়াত করো। তিনি যার যার নাম উল্লেখ করেছিলেন এবং যাকে যাকে পেয়েছিলাম, তাকে তাকে দাওয়াত করলাম।" -মুসলিম।

কারো কারো মতে, দাওয়াত কবুল করা ফরযে কিফায়া। কারো মতে, মুস্তাহাব। তবে প্রথমোক্ত মতটিই অধিকতর যুক্তিসংগত। এ হলো বধূর পক্ষ থেকে আয়োজিত বিবাহোৎসবের ভোজন সংক্রান্ত দাওয়াতের বিধি। বরের পক্ষ থেকে আয়োজিত বিবাহোৎসবের ভোজনের দাওয়াতে অংশগ্রহণ করা অধিকাংশ আলেমের মতানুসারে ওয়াজিব। শাফেয়ী মাযহাবের কেউ কেউ বলেন : সকল দাওয়াত কবুল করা ওয়াজিব। ইবনে হাযমের মতে, এই শেষোক্ত মতটি অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীর। কেননা হাদিস থেকে সকল ধরনের দাওয়াত কবুল করা ওয়াজিব বলে জানা যায়, চাই তা বিয়ের উৎসবের দাওয়াত হোক বা অন্য কিছু হোক।

দাওয়াত কবুল করা ওয়াজিব হওয়ার শর্ত

হাফেয ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে বলেছেন : দাওয়াত কবুল করা ওয়াজিব হওয়ার জন্য ৮টি শর্ত রয়েছে :

১. দাওয়াতকারী যেন স্বনির্ভর, পরিণত বয়সের ও বুদ্ধিমান হয়।
২. দাওয়াত যেন দরিদ্রদেরকে বাদ দিয়ে শুধু ধনীদেরকে না দেয়া হয়।
৩. দাওয়াতের উদ্দেশ্য যেন কোনো ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ বা ব্যক্তি বিশেষের প্রতি ভীতি দূর করা না হয়।
৪. দাওয়াতকারীর মুসলমান হওয়া।
৫. প্রথম দিনের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া।
৬. যার দাওয়াত প্রথম পাওয়া যাবে তার দাওয়াত কবুল করা জরুরি।
৭. দাওয়াতের স্থানে এমন কোনো গর্হিত কাজ না হওয়া, যার উপস্থিতিতে তাতে অংশগ্রহণ করা কষ্টকর হয়।
৮. নিমন্ত্রিত ব্যক্তির কোনো ওযর না থাকা।

বগবি বলেছেন, ওযর থাকলে ও পথ দীর্ঘ হলে অনুপস্থিত থাকায় আপত্তি নেই।

দরিদ্রদের বাদ দিয়ে শুধু ধনীদের দাওয়াত করা মাকরূহ :

ওলিমায় ধনীদের দাওয়াত দেয়া ও দরিদ্রদের বাদ দেয়া মাকরূহ। কেননা আবু হুরায়রা রা. থকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : "যে ওলিমায় যোগদানে ইচ্ছুকদের আসতে বাধা দেয়া হয় এবং আসতে অনিচ্ছুকদের দাওয়াত দেয়া হয়, সেটাই নিকৃষ্টতম ওলিমা।" -মুসলিম।

আর আবু হুরায়রা রা. থেকে বুখারী বর্ণনা করেছেন : "সেই ওলিমা নিকৃষ্টতম যাতে দরিদ্রদের বাদ দিয়ে শুধু ধনীদের দাওয়াত দেয়া হয়।"

৩৫. অমুসলিমদের বিয়ে

অমুসলিমদের বিয়ের ব্যাপারে সাধারণ মূলনীতি : তারা ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের কৃত কাজের শরিয়ত অনুমোদিত অংশ বহাল রাখা হবে।

কাফেরদের বিয়ে শাদী কিভাবে সম্পাদিত হলো, ইসলামের শর্তাবলী অনুযায়ী না হওয়ায় তা বাতিল গণ্য হবে কিনা, এসব নিয়ে রসূলুল্লাহ সা. কখনো মাথা ঘামাননি। কেবল স্বামীর ইসলাম গ্রহণকালীন অবস্থাটা বিবেচনা করতেন। যদি তার স্ত্রীর সাথে থাকা বৈধ হতো, তবে বিয়ে বহাল রাখতেন, চাই তা জাহেলিয়াত যুগেই সম্পাদিত হয়ে থাকনা কেন এবং ইসলামের শর্তাবলী অনুসারে অভিভাবক ও সাক্ষী ইত্যাদির মাধ্যমে হয়ে থাক না কেন। আর যদি বিয়ে এমন হতো যে, তা বহাল রাখা বৈধ নয়, তাহলে বহাল রাখতেননা। যেমন যদি দেখা যেত, ইসলাম গ্রহণকালে তার স্ত্রী কোনো মাহ্রাম অথবা সহোদর দুই বোন বা ততোধিক বোন। এ হলো রসূল সা.-এর অনুসৃত মূলনীতি। যা কিছু এর সাথে সাংঘর্ষিক হতো, তা বহাল রাখতেননা। -আল্লামা ইবনুল কাইয়েম।

ইসলাম গ্রহণ করার সময় কারো নিকট দুই সহোদর বোন এক সাথে স্ত্রী হিসেবে থাকলে একজনকে বাদ দিয়ে অপরজনকে রাখার অনুমতি দেয়া হবে : যাহ্হাক বিন ফিরোয তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করি, তখন আমার স্ত্রী হিসেবে ছিলো এমন দু'জন মহিলা, যারা পরস্পরে সহোদর বোন। রসূলুল্লাহ সা. আমাকে এদের একজনকে তালাক দিতে আদেশ দিলেন। -আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, শাফেয়ি, দার কুতনি, বায়হাকি।

ইসলাম গ্রহণের সময় কারো চারের অধিক স্ত্রী থাকলে চারজনকে বেছে নিতে হবে : ইবনে উমর রা. বলেন : গীলান সাকাফি যখন ইসলাম গ্রহণ করলো, তখন তার কাছে জাহেলি যুগের দশজন স্ত্রী ছিল। তারা সবাই তার সাথে ইসলাম গ্রহণ করলো। তখন রসূলুল্লাহ সা. তাকে তাদের মধ্য থেকে চারজনকে বেছে নিয়ে বহাল রাখার আদেশ দিলেন। -আহমদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ, শাফেয়ি, ইবনে হাব্বান ও হাকেম।

স্বামী স্ত্রীর একজনের ইসলাম গ্রহণ : অমুসলিম অবস্থায় বিয়ে সম্পাদিত হওয়ার পর স্বামী স্ত্রী উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করলে আগেই বলা হয়েছে যে, ইসলামে অনুমোদনযোগ্য হলে উভয়কে স্বামী স্ত্রী হিসেবে বহাল নচেত বিচ্ছিন্ন করা হবে। আর যদি একজন ইসলাম গ্রহণ করে এবং অপরজন না করে, তাহলে দেখতে হবে ইসলাম গ্রহণকারী স্বামী না স্ত্রী। স্ত্রী হলে বিয়ে বাতিল এবং স্ত্রীর জন্য ইদ্দত পালন অপরিহার্য হবে। আর যদি স্বামী ইসলাম গ্রহণ করে এবং স্ত্রী তার ইদ্দতের অধীন থাকে, তবে সে ঐ স্ত্রীর জন্য অধিকতর উপযোগী। কেননা হাদিস থেকে জানা যায়, ওলীদ বিন মুগিরার মেয়ে আতেকা যখন তার স্বামী সাফওয়ানের একমাস আগে ইসলাম গ্রহণ করলো, তারপর স্বামী ইসলাম গ্রহণ করলো, তখন রসূলুল্লাহ্ সা. তার বিয়ে বহাল রাখবেন। ইবনে শিহাব বলেন : যখনই কোনো মহিলা হিজরত করে রসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে আসতো এবং তার স্বামী কাফের অবস্থায় বহাল ও কাফের এলাকায় বসবাসরত থাকতো, তখনই তার হিজরতের কারণে

তার ও তার স্বামীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে যেতো। অবশ্য তার ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে তার স্বামী হিজরত করে আসলে বিয়ে বহাল থাকতো। অনুরূপ ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার পর স্বামী যদি ইসলাম গ্রহণ করে এবং উভয়ে বিয়ে বহাল রাখার ব্যাপারে একমত হয়, তবে স্ত্রী অন্যত্র বিয়ে না করা পর্যন্ত তাদের আগের বিয়ে বহাল থাকবে, চাই এ সময়টা যতই দীর্ঘ হোক। রসূলুল্লাহ সা. নিজের মেয়ে যয়নবকে দু'বছর পর প্রথম বিয়ে বহাল রেখেই স্বামী আবুল আসের নিকট ফেরত পাঠান। তখন নতুন করে আকদও করাননি, মোহরও ধার্য করেননি। -আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি।

ইবনুল কাইয়েম বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. ইসলাম গ্রহণকারী স্বামীর সাথে তার স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ না করলে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতেননা। বরং যখন অপরজন ইসলাম গ্রহণ করতো, তখন স্ত্রী অন্যত্র বিয়ে না করে থাকলে বিয়ে বহাল থাকতো। এটাই তাঁর সুবিদিত সুন্নত। ইমাম শাফেয়ি বলেন : আবু সুফিয়ান বিন হারব মাররুয যাহরানে মক্কা বিজয়ের পূর্বে মুসলিম আবাস ভূমিতে ইসলাম গ্রহণ করে। মাররুয যাহরান ছিলো খাযায়া গোত্রের বাসস্থান। এই গোত্রে বহু মুসলমান ছিলো। আবু সুফিয়ান অতঃপর মক্কা ফিরে গেল। তার স্ত্রী হিন্দ বিন উতবা তখনো অমুসলিম। সে আবু সুফিয়ানের দাড়ি ধরে বললো, তোমরা এই বিপথগামী বুড়োকে হত্যা করো। পরে হিন্দ আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণের অনেক পরে ইসলাম গ্রহণ করে। সে কাফের ও অমুসলিম বাসভূমিতে অবস্থান করছিল আর আবু সুফিয়ান ছিলো মুসলমান। ইদ্দত পার হওয়ার পর হিন্দ ইসলাম গ্রহণ করলো এবং তাদের বিয়ে বহাল রইল। অবশ্য হিন্দের ইদ্দত তার ইসলাম গ্রহণ করা পর্যন্ত শেষ হয়নি। হাকিম বিন হিযামের ইসলাম গ্রহণও ছিলো তথৈবচ। আবু জাহলের ছেলে ইকরামার স্ত্রী মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করলো এবং মক্কা ইসলামী দেশে রূপান্তরিত হলো। মক্কায় রসূল সা.-এর শাসন চলতে দেখে ইকরামা ইয়ামানে পালিয়ে গেল। ইয়ামান তখনো দারুল হারব তথা অমুসলিম দেশ। সাফওয়ান দারুল হারব ইয়ামানে যাওয়ার ইচ্ছা করেও দারুল ইসলাম মক্কায় ফিরে গেল। সে কাফের অবস্থায় হুনাইন যুদ্ধেও যোগ দেয়। তারপর ইসলাম গ্রহণ করলো এবং তার স্ত্রীর সাথে তার বিয়ে অটুট থাকলো। কেননা তার ইদ্দত শেষ হয়নি। রসূল সা.-এর আমলের যুদ্ধ বিগ্রহের ইতিহাস সংগ্রহকারী বিদ্বানগণ উল্লেখ করেছেন, আনসারদের জনৈক মহিলা মক্কাবাসী এক ব্যক্তির স্ত্রী ছিলো। সে ইসলাম গ্রহণ করলো ও মক্কায় হিজরত করলো। সে ইদ্দতে থাকাকালেই কিছুদিন পর তার স্বামী মক্কায় এলো এবং তাদের বিয়ে বহাল থাকলো।

রওযাতুন নাদিয়া গ্রন্থের লেখক বলেছেন : স্বামী কুফরির উপর বহাল রয়েছে, এমতাবস্থায় স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণ তালাকের পর্যায়ভুক্ত নয়। কেননা তা যদি হতো, তাহলে ইদ্দতের পর তাদের পুনর্মিলন স্ত্রীর সম্মতি ও আকদের নবায়ন ব্যতীত সম্ভব হতো না। মোটকথা, কোনো বালিগা মুসলিম নারী ইসলাম গ্রহণের পর সে যাকে ইচ্ছা বিয়ে করতে পারে। বিয়ে করার পর পূর্ব স্বামী ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে পুনরায় গ্রহণ করতে পারবেনা। আর যদি সে বিয়ে না করে, তবে সে প্রথম স্বামীর আকদের অধীন থাকে চাই আকদের নবায়ন ও সম্মতি দান করুক বা না করুক। এ হচ্ছে দলীলভিত্তিক বিধান, যদিও তা আলেমদের মতামতের সাথে সংগতিশীল হোক বা নাহোক। স্বামী স্ত্রীর একজন মুরতাদ হওয়ার বেলায়ও এই বিধি প্রযোজ্য। মুরতাদ যদি পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তার বিধান হবে সেই ব্যক্তির মতো যে, কাফের ছিলো এবং পরে ইসলাম গ্রহণ করেছে।

তালাক

সংজ্ঞা

তালাক শব্দটির মূল ইতলাক। ইতলাক অর্থ ছেড়ে দেয়া, মুক্ত করা ও নিক্ষেপ করা। কয়েদীকে মুক্ত করা ও ছেড়া দেয়ার অর্থে ইতলাক ব্যবহার করা হয়। শরিয়তের পরিভাষায় দাম্পত্য সম্পর্কের অবসানকে বলা হয় তালাক।

তালাক অপছন্দনীয়

যে লক্ষ্যসমূহ অর্জনে ইসলাম অত্যন্ত যত্নবান ও আগ্রহী, তার একটি হলো দাম্পত্য বন্ধনকে টেকসই, স্থিতিশীল ও অটুট রাখা। বৈবাহিক বন্ধন সারা জীবনব্যাপী স্থায়ী হওয়ার জন্যই সম্পাদিত হয়ে থাকে, যাতে স্বামী-স্ত্রী তাদের গৃহকে তাদের জন্য একটা আশ্রয়স্থল হিসেবে গড়ে তুলতে পারে, যার ছায়ায় নিজেরা দু'জনে শান্তিতে বসবাস করবে এবং তাদের সন্তানদেরকে সুযোগ্যভাবে তৈরি করবে। এ কারণেই স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক সর্বাপেক্ষা পবিত্র ও অটুট সম্পর্কসমূহের অন্যতম। মহান আল্লাহ কর্তৃক স্বামী স্ত্রীর চুক্তিকে 'মজবুত অঙ্গীকার' বলে আখ্যায়িত করাই এ সম্পর্কের পবিত্রতার সবচেয়ে অকাট্য প্রমাণ। আল্লাহ সূরা নিসার ২১তম আয়াতে বলেন : وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا .

"(তোমাদের স্ত্রীরা) তোমাদের নিকট থেকে মজবুত অঙ্গীকার আদায় করেছে।"

যেহেতু স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক এভাবে মজবুত ও অটুটরূপে আখ্যায়িত হয়েছে, তাই এতে কোনো ধরনের ব্যাঘাত ঘটা এবং এর মর্যাদা হানি হওয়া উচিত নয়। যে জিনিস এ সম্পর্ককে দুর্বল ও এর মর্যাদা খাটো করে, তা ইসলামের দৃষ্টিতে ঘৃণিত। কেননা এর ফলে বিয়ের সার্থকতা ও স্বামী-স্ত্রীর স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়। ইবনে উমর রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : বৈধ জিনিসগুলোর মধ্যে তালাকই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত। -আবু দাউদ হাকেম।

রসূলুল্লাহ সা. আরো বলেছেন : "যে ব্যক্তি কোনো মহিলাকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে, সে আমার দলভুক্ত নয়।" -আবু দাউদ, নাসায়ী।

এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, স্বামী স্ত্রীর বন্ধন ইসলামের দৃষ্টিতে এতই পবিত্র যে, যে ব্যক্তি এ বন্ধন নষ্ট করার চেষ্টা করে, সে ইসলামের দৃষ্টিতে এতটা মর্যাদাহীন যে, নিজেকে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত বলে দাবি করার যোগ্যই নয়। কিছু কিছু মহিলাকে দেখা যায়, অন্যের স্বামীর সাথে ভাব জমানোর চেষ্টা করে এবং নিজেকে তার স্ত্রীর স্থানে অভিষিক্ত করতে উদ্যোগী হয়। ইসলাম এটা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "কোনো মহিলার জন্য এটা বৈধ নয় যে, তার বোনের তালাক চাইবে, যাতে তার সতিত্বের রক্ষাকবচ বৈবাহিক বন্ধনের অবসান ঘটে এবং নিজে তার স্ত্রী হয়ে যায়। তার ভাগ্যে যে স্বামী বরাদ্দ আছে, সে তো তার জন্য নির্দিষ্টই রয়েছে।" অর্থাৎ সে অন্য যে কোনো ব্যক্তিকে বিয়ে করতে পারে। অনর্থক অন্য মহিলাকে স্বামীহারা করা তার জন্য বৈধ নয়। আর যে মহিলা বিনা কারণে স্বামীর নিকট তালাক চাইবে, তার জন্য বেহেশতের ঘ্রাণ পাওয়াও হারাম। ছাওবান রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ

সা. বলেছেন : "যে নারী বিনা কারণে স্বামীর কাছে তালাক চায়, তার উপর বেহেশতের ঘ্রাণও হারাম।" -আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ।

শরিয়তে তালাকের বিধান

তালাকের বিধির ব্যাপারে ফকীহদের নানা মত পরিলক্ষিত হয়। তবে সবচেয়ে নির্ভুল মত হলো, হানাফি ও হাম্বলিদের মত : "প্রয়োজন ব্যতীত এটি অবৈধ।" তাদের নিকট এ বক্তব্যের প্রমাণ রসূলুল্লাহ সা.-এর হাদিস : "বারবার তালাক দানকারী বা তালাক গ্রহণকারী এবং ঘন ঘন বৈবাহিক রুচি পরিবর্তনকারীর উপর অভিসম্পাত।" তাছাড়া, যেহেতু তালাক দেয়ার অর্থই হলো, আল্লাহর একটি নিয়ামতের নাশুকরি করা। বিবাহ আল্লাহর নিয়ামত। আর আল্লাহর নিয়ামতের নাশুকরি করা হারাম। সুতরাং অনিবার্য প্রয়োজন ব্যতীত তালাক বৈধ নয়। যে কটি জিনিস এই অনিবার্য প্রয়োজনের আওতাভুক্ত, যার ভিত্তিতে তালাক বৈধ হয়, তা হচ্ছে : স্ত্রীর চরিত্র নিয়ে স্বামীর মনে সন্দেহের সৃষ্টি হওয়া এবং স্বামীর মনে স্ত্রীর প্রতি বা স্ত্রীর মনে স্বামীর প্রতি অনুরাগ ও আকর্ষণের বিলুপ্তি। কারণ মানুষের মনের পরিবর্তন সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ। তালাকের যদি আদৌ কোনো প্রয়োজন দেখা না দেয়, তাহলে তা হবে নিছক আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা এবং অপর জীবন সংগীর প্রতি অনৈতিক আচরণ। তাই এটা অবাঞ্ছিত ও নিষিদ্ধ কাজে পর্যবসিত হবে।

হাম্বলি মাযহাবে তালাকের একটা চমৎকার বিধি রয়েছে। তার সংক্ষিপ্ত সার এরূপ : তালাক কখনো ওয়াজিব, কখনো হারাম, কখনো মবাহ, কখনো মুস্তাহাব।

ওয়াজিব তালাক : যখন দু'পক্ষের শালিশ স্বামী স্ত্রীর বিরোধ মীমাংসা করতে ব্যর্থ হয়ে তালাকের পক্ষে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে এবং মনে করে যে, তালাকই বিরোধ মীমাংসার একমাত্র উপায়, সে অবস্থায় তালাক দেয়া ওয়াজিব। অনুরূপ, ইলাকারী চার মাস অপেক্ষা করার পর যখন তালাক ছাড়া গত্যান্তর না পেয়ে তালাক দেয়। কেননা আল্লাহ বলেছেন :

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ج فَاِنْ فَاءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

অর্থ : যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে ইলা করে, তারা চার মাস অপেক্ষা করবে। এরপর যদি তারা (স্বাভাবিক অবস্থায়) ফিরে যায়, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আর যদি তালাক দেয়ার সংকল্প করে, তাহলে আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (আল বাকারা : ১২৫-১২৬)

হারাম তালাক : বিনা প্রয়োজনে যে তালাক দেয়া হয়, সেটাই হারাম তালাক। এটা হারাম হওয়ার কারণ হলো, এ দ্বারা স্বামী স্ত্রী উভয়েরই ক্ষতি হয় এবং বিনা কারণে উভয়ের স্বার্থ বিনষ্ট হয়। তাই এটা হারাম, যেমন কোনো সম্পদ বিনষ্ট করা হারাম। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া যাবেনা, অন্যকেও ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবেনা।" অন্য বর্ণনা মতে, এ ধরনের তালাক মাকরূহ। কারণ রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : বৈধ জিনিসগুলোর মধ্যে যেটি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত, তা হলো তালাক।" (আবু দাউদ) এটি ঘৃণিত এজন্য যে, এর কোনো প্রয়োজন নেই, যদিও রসূলুল্লাহ সা. একে হালাল আখ্যায়িত করেছেন। তাছাড়া, যেহেতু এ দ্বারা বহু উপকারিতার উৎস বিয়ের অবসান ঘটে, তাই এটি মাকরূহ।

মোবাহ তালাক হলো সেই তালাক, যখন যথার্থ প্রয়োজনের ভিত্তিতে এবং স্ত্রীর খারাপ

আচার ব্যবহার, ক্ষতিকর চালচলন ও ঈপ্সিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়ার কারণে তালাক দেয়া হয়।

মুস্তাহাব তালাক হলো সেই তালাক, যখন স্ত্রী আল্লাহর হুকুম যথা নামায ইত্যাদি আদায়ে শৈথিল্য প্রদর্শন করে, অথচ তার উপর সেজন্য বল প্রয়োগ করা সম্ভব হয়না, অথবা যখন সে অসতী হয়। ইমাম আহমদ বলেছেন : অসতী স্ত্রীকে রাখা উচিত নয়। কেননা এতে স্বামীর ধর্মীয় ক্ষতি সাধিত হয়। তাছাড়া, এমন নিশ্চয়তা নেই যে, সে অন্যের সন্তান পেটে ধারণ করে তা স্বামীর সাথে সম্পর্কযুক্ত করবেনা এবং ভিন্ন পুরুষের সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে স্বামীর সংসারে কলংক লেপন করবেনা। এরূপ ক্ষেত্রে সে যাতে তার মোহরের দাবি ছেড়ে দিয়ে চলে যায় সেজন্য তার উপর চাপ সৃষ্টি করলেও ক্ষতি নেই। কেননা আল্লাহ বলেছেন :

وَ لَاتَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۔

অর্থ : স্ত্রীদেরকে তোমরা যা কিছু দিয়েছ, তার অংশবিশেষ যাতে তোমরা নিতে পারো সেজন্য তাদেরকে বল প্রয়োগ করোনা। তবে তারা যদি সুস্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত হয় তাহলে ভিন্ন কথা।" (আননিসা : আয়াত ১৯)

ইবনে কুদামা বলেছেন, : এই দুটি ক্ষেত্রে তালাক ওয়াজিব গণ্য হতে পারে। তিনি আরো বলেছেন : পারস্পরিক অবনিবনার ক্ষেত্রে এবং যখন স্ত্রী নিজের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য খুলা করতে প্রস্তুত হয়ে যায়, তখন তালাক মুস্তাহাব।

তালাকের যৌক্তিকতা

ইবনে সিনা তার 'কিতাবুশ্ শিফা'তে বলেছেন : স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ছাড়াছাড়ি হওয়ার একটা না একটা উপায় থাকাই উচিত এবং সর্বদিক থেকে এর পথ রুদ্ধ করা অনুচিত। কেননা বিয়ে বিচ্ছেদের সকল পথ সর্বতোভাবে বন্ধ করে দেয়া ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক হতে পারে একাধিক কারণে : প্রথমত, জন্মগতভাবে কিছু মানুষের স্বভাব প্রকৃতি এমন হয়ে থাকে, যা অন্যান্যদের স্বভাব প্রকৃতির সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে এবং নিজেকে সহনশীল ও অনুরক্ত করতে সমর্থ হয়না। এ ধরনের দুই জনকে জোরপূর্বক একত্রিত করে রাখতে যতোই চেষ্টা করা হবে, ততোই বিরোধ, তিক্ততা ও অমঙ্গল বৃদ্ধি পাবে। দ্বিতীয়ত, ঘটনাক্রমে এমন স্বামী বা স্ত্রী কারো কারো ভাগ্যে জুটে যেতে পারে, যে তার সমকক্ষ নয়, কিংবা মেলামেশার ক্ষেত্রে প্রীতিকর নয়, অথবা এমন বিরক্তিজনক স্বভাবের যে, অপরজন তাকে মেনেই নিতে পারেনা। এ ধরনের অসম দাম্পত্য বন্ধনের ফলে মানুষ পরকীয়া প্রেম বা বিবাহ বহির্ভূত অবৈধ সম্পর্কের দিকে ঝুঁকে পড়ে। কেননা যৌন আবেগ ও তাড়না একটা স্বাভাবিক ব্যাপার, যা নানা ধরনের অন্যায় ও অপরাধের দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে। আর না হোক, এ ধরনের দম্পতি সন্তান প্রজননে পরস্পরকে সহযোগিতা না করতে পারে। অথচ জীবন সঙ্গী বা সংগিনী পরিবর্তনের সুযোগ পেলে এ ব্যাপারে পরস্পরকে সহযোগিতা করতে পারতো। সুতরাং অনিবার্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বিচ্ছেদের একটা সুযোগ থাকা অপরিহার্য। তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে এ বিষয়ে কঠোর হওয়া চাই।

ইহুদী সমাজে তালাক

ইহুদী শরিয়তে তালাকের যে পদ্ধতি বিধিবদ্ধ ও কার্যকর রয়েছে, তা হলো, কোনো ওযর ছাড়াও তালাক বৈধ। যেমন কোনো পুরুষ অধিকতর সুন্দরী মহিলাকে বিয়ে করার জন্য

স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে। তবে ওযর ছাড়া তালাক পছন্দনীয় নয়। এই ওযর তাদের সমাজে দু'রকমের : ১. শারীরিক ক্রটি : যথা- অন্ধত্ব, বধিরত্ব, বাকশক্তিহীনতা, খঞ্জত্ব, বন্ধ্যাত্ব ইত্যাদি। ২. স্বভাব চরিত্রের ক্রটি : যথা- ঔদ্ধত্য ও বেআদবী, বাচালতা, অপরিচ্ছন্নতা, অবাধ্যতা, হঠকারিতা, জেদ, অপচয় ও অপব্যয়, পেটুকতা, লোভ, খাদ্যবিলাস ও অহংকার। তাদের নিকট সবচেয়ে বড় ওযর হলো ব্যভিচার। এমনকি ব্যভিচারের গুজব ছড়িয়ে পড়াও এজন্য যথেষ্ট, চাই তা প্রমাণিত হোক বা না হোক। অবশ্য হযরত ঈসা আ. ব্যভিচার ব্যতীত উল্লিখিত ওযরসমূহের আর কোনোটির স্বীকৃতি দেননি। তবে স্ত্রীর জন্য কোনো অবস্থায়ই স্বামীর কাছে তালাক চাওয়া বৈধ নয়। এমনকি তার ব্যভিচার যদি প্রমাণিত হয় তবুও নয়।

খৃস্টধর্মে তালাক

পাশ্চাত্যের খৃস্টান জাতিগুলো যে খৃস্টধর্ম অনুসরণ করে, তা তিনটে উপদলে বিভক্ত : ১. ক্যাথলিক, ২. অর্থোডকস, ৩. প্রোটেস্ট্যান্ট।

তন্মধ্যে ক্যাথলিকদের নিকট তালাক সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। যত বড় কারণই ঘটুক, বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন করা কোনো অবস্থায়ই বৈধ নয়। এমনকি দাম্পত্য সম্পর্কের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলেও তা তালাকের জন্য গ্রহণযোগ্য ওযর বিবেচিত হয়না। বিশ্বাসঘাতকতার ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর মতে একমাত্র দৈহিক বিচ্ছেদই তালাককে বৈধতা দিতে পারে। অথচ এই দৈহিক বিচ্ছেদের পরও তাদের মতে দাম্পত্য সম্পর্ক অব্যাহত থাকে। তাই স্বামী ও স্ত্রী এ দু'জনের কেউ এই বিচ্ছেদকালে অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারেনা। কেননা এটা একাধিক বিয়ে গণ্য হবে, যা খৃস্টধর্মে কোনো অবস্থায়ই অনুমোদিত নয়।

ক্যাথলিকগণ এ ব্যাপারে মার্কস বাইবেলে হযরত ঈসার উক্তি হিসেবে যা উদ্ধৃত আছে, তার উপর নির্ভর করে থাকে। তিনি বলেন : "স্বামী স্ত্রী একই দেহে পরিণত হয়। তাই বিয়ের পর তারা আর দু'জন থাকেনা, বরং একই দেহে পরিণত হয়। কেননা আল্লাহ যাকে একত্রিত করেন, তাকে কেউ বিচ্ছিন্ন করতে পারেনা।" আর খৃস্ট ধর্মের অন্য দুটি উপদল, অর্থোডক্স ও প্রোটেস্ট্যান্ট কয়েকটি বিশেষ অবস্থায় তালাকের অনুমতি দেয়। তন্মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা হলো, দাম্পত্য বন্ধনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা (অর্থাৎ পরকীয়া সম্পর্ক)। তবে এই উভয় উপদল স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের জন্য এরপর আর কোনো বিয়ে করাকে নিষিদ্ধ করে। দাম্পত্য সম্পর্কের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার কারণে তালাকের অনুমতির প্রমাণ হিসেবে তারা মতি বাইবেলে উদ্ধৃত হযরত ঈসা আ.-এর এই উক্তিকে তুলে ধরে : "ব্যভিচার ছাড়া যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, সে তাকে ব্যভিচার করতে বাধ্য করে।" আর সকল খৃস্টান উপদল তালাকপ্রাপ্ত স্বামী ও স্ত্রীর উপর বিয়ে নিষিদ্ধ করে মার্কস বাইবেলে বর্ণিত হযরত ঈসার এই উক্তির ভিত্তিতে : "যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং অন্য মহিলাকে বিয়ে করে, সে তার সাথে ব্যভিচার করে। আর কোনো মহিলা যদি তার স্বামীকে তালাক দেয় এবং অন্য পুরুষকে বিয়ে করে, তবে সে তার সাথে ব্যভিচার করে।"

জাহেলী যুগে তালাক

আয়েশা রা. বলেছেন : (তালাকের বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে) একজন স্বামী তার স্ত্রীকে যতবার ইচ্ছা, তালাক দিত। তারপর ইদ্দতের মধ্যেই তালাক প্রত্যাহার করে তাকে

আবার স্ত্রী হিসেবে বহাল করতো। এমনকি একশো বা তার চেয়ে অধিকবার তালাক দিয়েও এরূপ করতো। একবার জনৈক স্বামী তার স্ত্রীকে বললো : আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে কখনো এমন তালাক দেবনা যে, তুমি আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তোমাকে কখনো গৃহে থাকতে দেবনা। স্ত্রী বললো : সেটা কিভাবে হবে? সে বললো : তোমাকে তালাক দেবো। তারপর যখনই ইদ্দত শেষ হওয়ার উপক্রম হবে, তখনই তালাক প্রত্যাহার করবো। স্ত্রী একথা শোনার পর আয়েশা রা.-এর কাছে গেলো এবং তার স্বামী যা বলেছে তা জানালো। আয়েশা রা. নীরব রইলেন এবং রসূলুল্লাহ সা. এলে তাকে জানালেন। রসূল সা. চুপ রইলেন। এরপর এ আয়াত নাযিল হলো :

اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ٠

অর্থ : তালাক মাত্র দু'বার। এরপর হয় যথোচিতভাবে সম্পর্ক বহাল রাখতে হবে, নচেত সহৃদয়তার সাথে মুক্ত করে দিতে হবে।" (আল বাকারা : আয়াত ২২৯)

আয়েশা রা. বলেন : এরপর মানুষ ভবিষ্যতের জন্য নতুনভাবে তালাক দেয়া শুরু করলো, চাই ইতিপূর্বে তালাক দিয়ে থাক্ বা না থাক। -তিরমিযি।

তালাক পুরুষের একক অধিকার

ইসলাম তালাককে শুধু পুরুষের অধিকারের আওতাধীন করেছে। কেননা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য নিজের সম্পদ ব্যয় করার কারণে সম্পর্ক বহাল রাখার ব্যাপারে আগ্রহ তারই বেশি থাকা স্বাভাবিক। তাছাড়া সে শুধু এই বিয়েতেই অর্থ ব্যয় করেনি, বরং তালাক দিয়ে পুনরায় বিয়ে করলে তাকে যে অনুরূপ বা ততোধিক অর্থ ব্যয় করতে হবে তা তার জানা রয়েছে। তাই প্রথম বিয়ে বহাল রাখা যে অধিকতর অর্থ সাশ্রয়ী, তা স্বামীর চেয়ে বেশি কেউ উপলব্ধি করেনা। সে একথাও জানে যে, তালাক দেয়া স্ত্রীকে তার বাদ বাকি মোহর, তালাক উপলক্ষে কিছু উপঢৌকনাদি এবং ইদ্দতকালীন খোরপোষ দিতে হবে। স্বামীর হাতে তালাকের একচেটিয়া অধিকার দেয়ার আরো কারণ হলো, তার বুদ্ধিমত্তা ও ভারসাম্যপূর্ণতা হেতু সে স্ত্রীর কাছ থেকে অনেক অনাকাঙ্খিত ব্যবহার পেয়েও অধিকতর ধৈর্যশীল। সুতরাং এক মুহূর্তের ক্রোধের বশবর্তী হয়ে বা স্ত্রীর একটি অসদাচরণ বা অন্যায়ে অসহিষ্ণু ও অধীর হয়ে সে দ্রুত তালাকের দিকে ধাবিত হয়না। পক্ষান্তরে স্ত্রী স্বামীর চেয়ে দ্রুত গতিতে রেগে বেশামাল হয়ে যায় এবং তার চেয়ে কম সহিষ্ণু হয়ে থাকে। তাছাড়া তালাকের যে পরিণাম ও আর্থিক বোঝা স্বামীকে বহন করতে হয়, স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা দেয়া হলে তাকে তা বহন করতে হয়না। তাই নগণ্যতম কারণে বা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত কারণে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে স্ত্রীই অধিকতর ক্ষিপ্রতা দেখাতে সক্ষম। এই সর্বশেষ যুক্তির যথার্থতার প্রমাণ এই যে, ইংরেজ জাতি যখন তালাক দাবি করাকে স্বামী ও স্ত্রীর সমানাধিকারে পরিণত করলো। তখন তাদের সমাজে তালাকের সংখ্যা এত বেড়ে গেলো যে, মুসলমানদের তুলনায় তা বহুগুণ বৃদ্ধি পেলো।

কার তালাক কার্যকর হয়?

আলেমগণ একমত, স্বামী যদি সুস্থ মস্তিষ্ক, প্রাপ্ত বয়স্ক ও স্বাধীনচেতা হয়, তবে তার জন্য তালাক দেয়া বৈধ এবং তার তালাক কার্যকর হয়। আর যদি পাগল, অপ্রাপ্তবয়স্ক ও অন্যের বলপ্রয়োগে পরিচালিত হয়, তাহলে তার দেয়া তালাক কার্যকর হবেনা। কেননা তালাক এমন একটা কাজ, যার ফলাফল স্বামী স্ত্রীর জীবনে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। তাই

তালাকদাতার যাবতীয় কাজ যাতে শুদ্ধ ও বিধিসম্মত হয়, সেজন্য তার পূর্ণ যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া জরুরি। আর এই পূর্ণ যোগ্যতা কেবল মস্তিষ্কের সুস্থতা, প্রাপ্ত বয়স্কতা ও স্বাধীনচেতা হওয়ার উপর নির্ভরশীল। এ বিষয়ে আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ্ আলী রা. থেকে বর্ণনা করেন, "রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : তিন ব্যক্তিকে দায়িত্ব ও জবাবদিহি থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ না জাগ্রত হয়, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক, যতক্ষণ না প্রাপ্তাবয়স্ক হয় এবং পাগল, যতক্ষণ না সুস্থ মস্তিষ্ক হয়।" আর বুখারি ও তিরমিযি আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : যার মস্তিষ্ক স্বাভাবিক নেই, সে ব্যতীত সকলের তালাক বৈধ। পরবর্তী বিধিসমূহ সম্পর্কে আলেমদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে, যা আমি সংক্ষেপে তুলে ধরছি : ১. কারো বলপ্রয়োগে দেয়া তালাক, ২. মাতালের দেয়া তালাক, ৩. ঠাট্টা ছছলে দেয়া তালাক, ৪. ক্রোধে দিশাহারা অবস্থায় দেয়া তালাক, ৫ উদাসীন ব্যক্তির দেয়া তালাক, ৬. বেহুশ ব্যক্তির দেয়া তালাক।

বলপ্রয়োগজনিত তালাক

যার উপর বলপ্রয়োগ করা হয়, তার স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণেরও ক্ষমতা থাকেনা, স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতাও থাকেনা। এই দুটো জিনিসই যখন বিলুপ্ত হয়, তখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আর কোনো ব্যাপারে দায়ী থাকেনা এবং বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তিকে তার কার্যকলাপের জন্য দায়ী গণ্য করা হয়না। কেননা তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিই তো কেড়ে নেয়া হয়েছে। সে প্রকৃতপক্ষে বলপ্রয়োগকারীর ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তকেই কার্যকরী করে। কাজেই যাকে কোনো কুফরিসূচক কথা বলতে বাধ্য করা হয়, সে ঐ কুফরিসূচক কথা বলার কারণে কাফের হবেনা। কেননা আল্লাহ্ সূরা আন নাহলের ১০৬ নং আয়াতে বলেন :

إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ۔

"কিন্তু যাকে কুফরিসূচক কথা বলতে বাধ্য করা হয়, অথচ তার মন ঈমানের উপর অবিচল রয়েছে, সে কাফের হবেনা।" ঠিক তেমনি যাকে মুসলমান হতে বাধ্য করা হয়, সে মুসলমান হয়না। আর যাকে তালাক দিতে বাধ্য করা হয়, তার তালাক কার্যকর হয়না। ইবনে মাজাহ, ইবনে হাব্বান, দার কুতনি, তাবরানি ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : "আমার উম্মতকে যাবতীয় ভুল ত্রুটি (ভুলক্রমে পরিত্যক্ত ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও কৃত কাজগুলো) এবং যেসব কাজে তাদেরকে বাধ্য করা হয়, তা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।" ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ, দাউদ উমর ইবনুল খাত্তাব, আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর, আলি ইবনে আবু তালেব ও ইবনে আব্বাসও অনুরূপ মত পোষণ করেন। ইমাম আবু হানিফা ও তার শিষ্যগণ বলেন, বাধ্য হয়ে তালাক দিলেও তা কার্যকর হবে। তাদের এই মতের পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। উপরন্তু অধিকাংশ সাহাবী তাদের এ মতের বিপক্ষে।

মাতালের তালাক

অধিকাংশ ফকিহ্র মতে, মাতালের তালাক কার্যকর হবে। কারণ তার বিবেক যে কারণে বিকল হয়েছে, তা তার ইচ্ছা কৃত। আর একদল ফকিহ্ বলেন, তার তালাক অর্থহীন এবং তার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। কেননা সে ও পাগল একই পর্যায়ের। উভয়ে বিবেক বুদ্ধিহীন। অথচ বিবেক বুদ্ধিই হচ্ছে শরিয়তের দায়দায়িত্ব আরোপের ভিত্তি। তাছাড়া আল্লাহ তায়ালা নিসার ৪৩ নং আয়াতে বলেন :

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ ۔

অর্থ : হে মুমিনগণ, তোমরা মাতাল অবস্থায় নামাযের ধারে কাছে যেওনা, যতক্ষণ বুঝতে না পারো তোমরা কী বলছো।"

এ আয়াতে আল্লাহ মাতালের কথাবার্তাকে অর্থহীন আখ্যায়িত করেছেন। কেননা সে কী বলছে, তা সে নিজেই জানে না। উসমান রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি মাতালের তালাককে হিসাবে গণ্য করতেননা এবং কোনো সাহাবিই এ ব্যাপারে তার বিরোধিতা করতেননা বলে কেউ কেউ জানান। ইয়াহিয়া বিন সাঈদ, হুমাইদ বিন আব্দুর রহমান, রবিয়া, লাইস, আব্দুল্লাহ ইবনুল হুসাইন, ইসহাক বিন রাহওয়াই, আবু সাওর, শাফেয়ী, মাযানি, আহমদ, যাহেরি মাযহাব, তাহাবি ও কারখির অভিমতও তদ্রূপ। শওকানি বলেছেন, মাতাল যেহেতু অবুঝ, তাই তার তালাক অকার্যকর, কেননা যে জিনিসের ভিত্তিতে কোনো বিধি কার্যকর হয় তা অর্থাৎ বিবেকবুদ্ধি এখানে অনুপস্থিত ও নিষ্ক্রিয়। তবে যেহেতু শরিয়ত তাকে শাস্তি দিয়েছে, তাই আমাদের অধিকার নেই তাকে নিজেদের মত অনুযায়ী অব্যাহতি দেয়ার। আমরা বলবো, শাস্তি হিসেবে তার তালাক কার্যকর হবে। এভাবে তার উপর দুটো শাস্তি বলবত হবে। (একটা মদ খাওয়ার শাস্তি, আর একটা এ অবস্থায় দেয়া তালাক কার্যকর হওয়া।)

ক্রুদ্ধ ব্যক্তির তালাক

যে ব্যক্তি ক্রোধে এত দিশেহারা হয়ে গেছে যে, সে যা বলে ভেবে বলেনা এবং তার মুখ দিয়ে কী নির্গত হচ্ছে তা সে জানেনা, তার তালাক কার্যকর হবেনা। কেননা সে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি থেকে বঞ্চিত। আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও হাকেম আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "হতবুদ্ধি অবস্থায় তালাক দিলেও তালাক হবেনা, দাস মুক্ত করলেও মুক্ত হবেনা।" এই হতবুদ্ধি অবস্থাকে ক্রোধ, বলপ্রয়োগের শিকার হওয়া, এবং পাগল হওয়া বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইবনে তাইমিয়া যাদুল মায়াদে এ বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে বলেছেন, হতবুদ্ধি অবস্থাটা হলো এ রকম যে, মানুষ যা বলে, তার পেছনে তার কোনো উদ্দেশ্যে থাকেনা এবং তা সে জানেওনা। যেন তার উদ্দেশ্য, বুঝ ও ইচ্ছা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। তিনি আরো বলেন, বলপ্রয়োগের শিকার ও পাগলের তালাকও এর আওতামুক্ত। আর যার বিবেকবুদ্ধি মাতলামি বা ক্রোধের কারণে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় এবং তার ইচ্ছার কোনো কর্তৃত্ব থাকেনা এবং নিজে কি বলছে, তা সে জানেইনা, এমন অবস্থায় যে কথা বলে, তার তালাকও তদ্রূপ অচল ও অকার্যকর। ক্রোধ তিন প্রকার :

১. যা বিবেকবুদ্ধিকে বিকল ও নিষ্ক্রিয় করে দেয়, ফলে মানুষ এতটা দিশেহারা হয়ে যায় যে, সে কি বলছে, তা সে নিজেই জানেনা। এ ধরনের ব্যক্তির তালাক সর্বসম্মতভাবে অকার্যকর।

২. যে ক্রোধ প্রাথমিক অবস্থায় থাকে এবং মানুষের ভেবেচিন্তে কথা বলার ক্ষমতা কেড়ে নেয়না, এ ধরনের ব্যক্তির তালাক কার্যকর হবে।

৩. ক্রোধ অধিকতর উত্তেজিত অবস্থায় উপনীত হয়। তবে বিবেকবুদ্ধিকে পুরোপুরি বিকল করে দেয়না। তবে তার উদ্দেশ্য ও সংকল্পকে ব্যাহত করে। ফলে এ অবস্থায় সে যা করে, তার উপর পরে অনুতপ্ত হয়। এ অবস্থাটা বিবেচনা সাপেক্ষ। এ অবস্থায় তালাক কার্যকর না হওয়ার মত প্রবল।

হাসি-ঠাট্টাচ্ছলে দেয়া তালাক

অধিকাংশ আলেমের মতে, ঠাট্টা পরিহাসছছলে তালাক দেয়া হলে কার্যকর হবে। যেমন এ অবস্থায় সম্পাদিত বিয়েও কার্যকর হয়। কেননা আহমদ আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযি ও হাকেম আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "তিনটে জিনিস এমন রয়েছে, যা গম্ভীরভাবে হলেও গম্ভীর, পরিহাসের সাথে হলেও গম্ভীর : বিয়ে, তালাক ও তালাক প্রত্যাহার।"

কোনো কোনো আলেমের মতে পরিহাসের সাথে দেয়া তালাক কার্যকর হয়না। ইমাম বাকের, সাদেক ও নাসের এই দলভুক্ত। আহমদ ও মালেকের একটি মতও এ রকম। কেননা এসব আলেম তালাক কার্যকর হওয়ার জন্য কথা দ্বারা সম্মতি জ্ঞাপনকে কিংবা ইচ্ছা জ্ঞাপনকে শর্তরূপে ধার্য করেছেন। সুতরাং নিয়ত ও উদ্দেশ্য যেখানে বিলুপ্ত, সেখানে শপথ ও সংকল্প নিরর্থক গণ্য হয়। আল্লাহ বলেন :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

" যদি তারা তালাকের সংকল্প করে, তাহলে আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (বাকারা : ২৭)

কোনো কাজ করার দৃঢ় ইচ্ছা করাকেই সংকল্প বলা হয়। কোনো কাজ করা বা না করার অনমনীয় ইচ্ছার মধ্য দিয়েই এটা প্রতিফলিত হয়। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, নিয়তের উপরই কাজ নির্ভরশীল। বস্তুত তালাক এমন একটি কাজ, যা নিয়ত বা ইচ্ছা ও সংকল্পের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু যে ব্যক্তি ঠাট্টা পরিহাস করে, তার কোনো নিয়ত ও সংকল্প থাকেনা। বুখারি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন : "তালাকের পেছনে কোনো উদ্দেশ্য থাকতেই হবে।" অর্থাৎ তালাকদাতার তালাক দেয়ার উদ্দেশ্য থাকলেই তা কার্যকর হবে। ইবনে হাজরের মতে, একমাত্র আনুগত্যহীন স্ত্রী ব্যতীত তালাক দেয়া অনুচিত। অসতর্কভাবে তথা অনিচ্ছাকৃতভাবে তালাক দিলে অর্থাৎ তালাক দিতে ইচ্ছা করেনি কিন্তু মুখ ফসকে তালাক উচ্চারণ করে ফেলেছে, এরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে হানাফি ফকিহদের মত এই যে, আইনত তালাক কার্যকর হবে। কিন্তু ধর্মীয়ভাবে তার ও আল্লাহর মধ্যে তালাক কার্যকর হবেনা। তার স্ত্রী তার জন্য হালাল থাকবে।

উদাসীনভাবে ও ভুলক্রমে প্রদত্ত তালাক

পরিহাসছছলে ও অনিচ্ছাকৃতভাবে দেয়া তালাকের মতই উদাসীনভাবে ও ভুলক্রমে দেয়া তালাকের পরিণতি। তবে পরিহাসছছলে দেয়া তালাক ও ভুলক্রমে দেয়া তালাকের পার্থক্য এই যে, পরিহাসছছলে দেয়া তালাক আইনত ও ধর্মীয় উভয়ভাবেই কার্যকর হবে, আর ভুলক্রমে দেয়া তালাক শুধু আইনত কার্যকর হবে। কেননা তালাক কোনো হাসিঠাট্টা ও ছিনিমিনি খেলার বিষয় নয়।

বেহুশ ব্যক্তির তালাক

কোনো ব্যক্তি যখন এমন আঘাতপ্রাপ্ত হয় যে, যা তার বুদ্ধি হরণ করে, চিন্তাশক্তি বিলুপ্ত করে এবং সে কী বলছে তা সে নিজেই জানে না, তখন তার তালাক কার্যকর হবেনা, যেমন কার্যকর হয়না পাগল, নির্বোধ বা আকস্মিক দুর্ঘটনা রোগ বা বার্ধক্য হেতু বুদ্ধি বিগড়ে যাওয়া মানুষের তালাক।

যার উপর তালাক কার্যকর হয়

স্ত্রী তালাকের যোগ্য না হলে তালাক কার্যকর হয়না। স্ত্রী তালাকের যোগ্য হয় তখন, যখন :

১. তার ও তার স্বামীর মধ্যে যথার্থভাবে দাম্পত্য সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে,

২. যখন স্ত্রী প্রত্যাহারযোগ্য তালাকপ্রাপ্ত হয়ে উদ্দত অতিবাহিত করতে থাকে, অথবা ক্ষুদ্র বায়েন তালাকের পর ইদ্দতের মধ্যে থাকে। কেননা ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই দুই ক্ষেত্রে বৈবাহিক সম্পর্ক আইনত বহাল থাকে।

৩. যে বিচ্ছেদ তালাক বলে গণ্য হয়, সেই বিচ্ছেদের পরে ইদ্দত পালনকালে স্ত্রী তালাকের যোগ্য থাকে। এ ধরনের বিচ্ছেদের একটি উদাহরণ হলো, স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণ সত্ত্বেও স্বামীর ইসলাম গ্রহণ না করা অথবা ইলার মেয়াদ অতিবাহিত হওয়া। এ দুই অবস্থায় যে বিচ্ছেদ ঘটে, তা হানাফিদের নিকট তালাক গণ্য হয়ে থাকে।

৪. যখন স্ত্রী এমন বিচ্ছেদজনিত ইদ্দত পালন করতে থাকে, যাকে বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়া নামে আখ্যায়িত করা হয়। যা মূলত আকদকে ভঙ্গ করেনা, যেমন স্ত্রীর মুরতাদ অর্থাৎ কাফের হওয়ার কারণে সংঘটিত বিচ্ছেদ। কেননা এ ক্ষেত্রে বিয়ে বিশুদ্ধভাবে সম্মত হওয়ার পর উদ্ভূত কারণে বিয়ে ভেঙ্গে যায়।

যার উপর তালাক কার্যকর হয়না

আমরা বলেছি, স্ত্রী তালাকের যোগ্য না হলে তার উপর তালাক কার্যকর হয়না। সুতরাং সে যখন তালাকের যোগ্য থাকেনা, তখন তার উপর তালাক কার্যকর হয়না। যেমন সমকক্ষতা না থাকা, মোহরে মিছিলের চেয়ে কম মহর নির্ধারণ, প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার কারণে বিয়ে প্রত্যাখ্যান অথবা বিয়ের বিশুদ্ধতার শর্তাবলীর কোনো শর্ত পূরণ না হওয়ার দরুন আকদ শুদ্ধ হয়নি প্রমাণিত হওয়ার কারণে বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ার ইদ্দত পালনরতা স্ত্রীর উপর তালাক কার্যকর হয়না। কেননা এসব ক্ষেত্রে আকদ মূল থেকেই ভেঙ্গে গেছে। তাই ইদ্দতকালে তার কোনো অস্তিত্বই নেই। এমতাবস্থায় কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে তালাক দিলাম। তবে তা একটা অর্থহীন বাক্যে পরিণত হবে এবং তার কোনো ফলাফল দেখা যাবেনা। অনুরূপ সহবাস বা নিখুঁতভাবে নির্জনবাস ব্যতীতই যে স্ত্রীকে তালাক দেয়া হয়েছে, তাকে আর তালাক দেয়া যাবেনা। কেননা তাদের মধ্যকার দাম্পত্য সম্পর্কের অবসান হয়েছে এবং ঐ স্ত্রী তালাক পাওয়া মাত্রই সম্পূর্ণ বেগানা স্ত্রীতে পরিণত হয়েছে। কাজেই এরপর সে তালাকের যোগ্য থাকেনা। কেননা সে তার স্ত্রীও নয়, ইদ্দত পালনরতাও নয়। সুতরাং কেউ যদি তার এমন স্ত্রীকে তিনবার তালাক দেয়, যার সাথে সে সহবাস করেনি, তবে তার উপরে শুধু এক তালাক বায়েন কার্যকর হবে। কেননা দাম্পত্য সম্পর্ক তখনো রয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাক নিরর্থক ও নিষ্ফল। কেননা ঐ দুটো তালাক যখন দেয়া হয়েছে, তখন সে তার স্ত্রীও ছিলনা, ইদ্দত পালনরতাও ছিলনা। যার সাথে সহবাস হয়নি, তার কোনো ইদ্দত নেই (এটা হানাফি ও শাফেয়ীদের মত)। অনুরূপ, যার সাথে কখনো বৈবাহিক সম্পর্ক হয়নি এবং যার ইদ্দত শেষ হয়েছে, তার উপরও তালাক কার্যকর হবেনা। কেননা ইদ্দত শেষ হওয়া মাত্রই সে বেগানা মহিলায় পরিণত হয়। তিন তালাক স্ত্রীও ইদ্দত পালনকালে তালাকের যোগ্য থাকেনা। কারণ সে বৃহৎ বায়েন তালাকপ্রাপ্ত। তার উপর তালাক সম্পূর্ণ নিষ্ফল।

বিয়ের পূর্বে তালাক

কোনো অচেনা নারীর সাথে বিয়ে হলে তার উপর তালাক কার্যকর হবে না, এ ধরনের তালাক দিলেও তা কার্যকর হবেনা। যেমন কেউ যদি বলে, অমুক মহিলাকে যদি বিয়ে করি, তবে তার উপর তালাক পড়বে। তিরমিযি বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : "আদম সন্তান যে জিনিসের মালিক নয়, তাতে তার কোনো মান্নত চলেনা, যে গোলামের সে মালিক নয়, তাকে সে মুক্ত করতে পারেনা, যে স্ত্রীর সে স্বামী নয় তাকে সে তালাক দিতে পারেনা।" এটা ইমাম শাফেয়ীর মত। ইমাম আবু হানিফা শর্তাধীন তালাক সম্পর্কে বলেছেন, শর্ত পাওয়া গেলে তালাক কার্যকর হবে, চাই অনির্দিষ্টভাবে যে কোনো মহিলাকে উদ্দেশ্য করে বলুক বা কোনো নির্দিষ্ট মহিলাকে উদ্দেশ্য করে বলুক। ইমাম মালেক ও তার শিষ্যরা বললেন, অনির্দিষ্টভাবে সকল মহিলাকে উদ্দেশ্য করে বললে তালাক কার্যকর হবেনা, নির্দিষ্ট করে বললে তালাক কার্যকর হবে। অনির্দিষ্টভাবে বলার উদাহরণ : "আমি যে কোনো মহিলাকে বিয়ে করলেই তার উপর তালাক।" আর নির্দিষ্টভাবে বলার উদাহরণ : অমুক মহিলাকে বিয়ে করলে তার উপর তালাক।

কিসের দ্বারা তালাক কার্যকর হয়

দাম্পত্য সম্পর্কের অবসান ঘটানো বুঝায় এমন যে কোনো পন্থায় তালাক কার্যকর হয়, চাই তা কথা দ্বারা হোক, স্ত্রীর নিকট চিঠি লেখা দ্বারা হোক, বোবা কর্তৃক ইশারা দ্বারা হোক, কিংবা দূত পাঠানোর মাধ্যমে হোক।

কথা দ্বারা তালাক : কথা স্পষ্ট হতে পারে বা ইঙ্গিতমূলকও হতে পারে। সুষ্ঠ কথা তাকেই বলা যাবে, যা বলা মাত্রই তার অর্থ বুঝা যায়। যেমন, তোমাকে তালাক দিলাম বা তুমি তালাকপ্রাপ্ত। শাফেয়ী বলেছেন, তালাকের স্পষ্ট ভাষা তিনটি : তালাক, বিচ্ছেদ, বিদায়। এ তিনটেই কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে। যাহেরী মাযহাবের অনুসারী কেউ কেউ বলেছেন, এই তিনটে শব্দ দ্বারা ব্যতীত তালাক কার্যকর হয়না। কেননা শরিয়তে এই তিনটেরই উল্লেখ রয়েছে। তালাক একটা ইবাদত এবং তার শর্ত হচ্ছে উপযুক্ত শব্দ প্রয়োগ। কাজেই শরিয়তে যে শব্দ নির্ধারিত হয়েছে, তার মধ্যেই সীমিত থাকা জরুরি। (বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ২য় খণ্ড, পৃ-৭০)

অস্পষ্ট বা ইঙ্গিতমূলক কথা : যে কথা দ্বারা তালাকও বুঝায়, আবার অন্য ধরনের বিচ্ছেদও বুঝায়। যেমন যদি বলা হয়, তুমি বায়েন অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন তাহলে এ দ্বারা বিয়ের থেকে বিচ্ছিন্নও বুঝা যেতে পারে, আবার মন্দ থেকে বিচ্ছিন্নও বুঝা যেতে পারে। অনুরূপ, যদি বলা হয়, তোমার ভাগ্য তোমার হাতে। তবে এর অর্থ এও হতে পারে যে, তুমি তোমার সতীত্ব রক্ষার দায়িত্ব নিতে পারো। অনুরূপ কেউ যদি বলে, তুমি আমার জন্য হারাম। তবে এর দু'রকম অর্থ হতে পারে : এক. তোমার সাথে সহবাস করা আমার জন্য হারাম। দুই. তোমাকে কষ্ট দেয়া আমার জন্য হারাম।

এ ধরনের অস্পষ্ট ও ইঙ্গিতমূলক শব্দ দ্বারা তালাক কার্যকর হওয়ার জন্য তালাকদাতার নিয়ত জানা জরুরি। সে যদি বলে, আমি এ দ্বারা তালাক বুঝাইনি, তবে তালাক হবেনা।

স্পষ্ট কথা : স্পষ্ট কথা দ্বারা নিয়ত ব্যক্ত করা ছাড়াই তালাক কার্যকর হবে। কেননা এর অর্থ ব্যাখ্যা সাপেক্ষ নয়। তবে এ ধরনের সুস্পষ্ট শব্দ দ্বারা তালাক কার্যকর হওয়ার জন্যও

শর্ত রয়েছে যে, কথাটা স্ত্রীকে জড়িত করে বা সম্বোধন করে বলতে হবে : যেমন, আমার স্ত্রীকে তালাক দিলাম, বা তোমাকে তালাক দিলাম।

স্পষ্ট শব্দ দ্বারা তালাক উচ্চারণ করার পরও যদি বক্তা বলে, আমি তালাক বুঝাইনি এবং তালাক দেয়া আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি অন্য অর্থ বুঝিয়েছি, তবে আইনত তার কথা মানা হবেনা এবং তার তালাক কার্যকর হবে। কিন্তু অস্পষ্ট ও ইঙ্গিতমূলক শব্দ উচ্চারণকারী যদি বলে, আমি তালাক বুঝাইনি, বরং আমার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন জিনিস, তাহলে তার বক্তব্য আইনত মানা হবে এবং তার তালাক কার্যকর হবেনা। কেননা তার উচ্চারিত শব্দের অর্থ তালাক বা অন্য কিছুও হতে পারে। তার নিয়ত দ্বারাই তার উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট হবে। এটা মালেক ও শাফেয়ী মাযহাবের মত। বুখারি আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেন :

জাওনের মেয়েকে যখন রসূলুল্লাহ্ সা.-এর বাসরঘরে ঢুকানো হলো এবং রসূল সা. তার নিকটবর্তী হলেন, তখন সে বলে উঠলো, "আমি আপনার (স্পর্শ) থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই।" রসূলুল্লাহ্ সা. তৎক্ষণাত তাকে বললেন, "তুমি এক মহান সত্তার আশ্রয় নিয়েছ। তুমি তোমার বাপের বাড়ী চলে যাও।"

বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, তবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণে বিরত কা'ব বিন মালেককে যখন বলা হলো, রসূলুল্লাহ্ সা. তোমার স্ত্রী থেকে আলাদা হওয়ার আদেশ দিয়েছেন, তখন কা'ব বললেন, আমি কি ওকে তালাক দেবো, না কী করবো? তখন বলা হলো, শুধু তার থেকে আলাদা থাকো। তার কাছে যেয়োনা। অতপর কা'ব তার স্ত্রীকে বললেন, তুমি বাপের বাড়ি চলে যাও।

এ দুটো হাদিস থেকে বুঝা গেলো, এ শব্দটি (স্ত্রী থেকে আলাদা হওয়া) দ্বারা তালাক সংঘটিত হবে তখনি, যখন এ দ্বারা তালাক বুঝানো হবে। অন্যথায় তালাক সংঘটিত হবেনা। বর্তমানেও এই নিয়মই অনুসৃত হচ্ছে। মিশরের ১৯২৯ সালের ২৫ নং আইনের ৪ নং ধারায় বলা হয়েছে, "তালাকের ইঙ্গিতবহ শব্দাবলী : এ দ্বারা সেসব শব্দকে বুঝানো হচ্ছে, যা দ্বারা তালাক বা অন্য কিছুও বুঝায়। এগুলো দ্বারা নিয়ত ব্যতীত তালাক সংঘটিত হবেনা।"

তবে হানাফী মাযহাব অনুসারে তালাকের ইঙ্গিতবহ শব্দাবলী দ্বারা নিয়তের ভিত্তিতেও তালাক হয়, আবার পরিস্থিতির ভিত্তিতেও তালাক হয়। কিন্তু হানাফী মাযহাবের এই মত আইনের নিকট গৃহীত হয়নি এবং কেবলমাত্র পরিস্থিতির আলোকে তালাক আইনের চোখে অচল। বরং তালাকদাতা যখন ইঙ্গিতবহ ও দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করবে, তখন তা দ্বারা সে তালাক বুঝিয়েছে এরূপ নিয়ত করা তালাকের জন্য শর্ত।

স্ত্রীকে নিজের জন্য নিষিদ্ধ করলে তালাক হবে কি?

স্বামী যখন তার স্ত্রীকে নিজের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করে, তখন দেখতে হবে, সে সত্য সত্যই তাকে নিষিদ্ধ করা বুঝাচ্ছে, না এ দ্বারা শব্দের আসল অর্থ না বুঝিয়ে স্ত্রীকে বিদায় দেয়া তথা তালাক বুঝাচ্ছে। যদি যথার্থই নিষিদ্ধ বুঝিয়ে থাকে, তাহলে তালাক হবেনা। কেননা তিরমিযি আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেন : রসূলুল্লাহ্ সা. তার স্ত্রীদের সাথে ইলা করলেন, হালালকে হারাম করলেন এবং কসমের কাফফারা দিলেন।

সহীহ মুসলিমে ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, "স্বামী যখন তার স্ত্রীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে, তখন তা একটি কসমে পর্যবসিত হয় এবং ভঙ্গ করলে কাফফারা দিতে হয়।

তারপর তিনি (ইবনে আব্বাস) বললেন : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।" নাসায়ীতে ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তার কাছে এসে বললো, আমি আমার স্ত্রীকে আমার জন্য নিষিদ্ধ করেছি। ইবনে আব্বাস বললেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। সে তোমার জন্য নিষিদ্ধ নয়। অতপর এ আয়াতটি (সূরা আত তাহরীমের ১ নং আয়াত) পাঠ করলেন :

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ○

অর্থ : হে নবী আল্লাহ যে জিনিস তোমার জন্য হালাল করেছেন, তা তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টির জন্য হারাম করো কেন? আল্লাহ তো পরম দয়ালু ও ক্ষমাশীল। আল্লাহ তোমাদের উপর ফরয করেছেন তোমাদের শপথগুলোকে হালাল করা।"

(এ আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, স্ত্রীকে হারাম বা নিষিদ্ধ করা একটা শপথ, যা ভঙ্গ করলে কাফফারা দিতে হয়) তারপর ইবনে আব্বাস তাকে বললেন : তোমার উপর সবচেয়ে কঠিন কাফফারা, দাস মুক্ত করা ধার্য করা হলো।"

আর যদি তালাক বুঝায়, তাহলে তালাক সংঘটিত হবে। কেননা অন্য সব ইঙ্গিতবহ শব্দের ন্যায় নিষিদ্ধ করা শব্দটাও ইঙ্গিতবহ।

লিখিতভাবে তালাক দেয়া

লিখিতভাবে তালাক দিলেও তালাক সংঘটিত হবে, যদিও তালাকদাতা বাকশক্তি সম্পন্ন হয়। স্বামী স্ত্রীকে মৌখিকভাবেও তালাক দিতে পারে, তার কাছে লিখিতভাবে ও তালাকনামা পাঠাতে পারে। তবে ফকিহগণ শর্ত আরোপ করেছেন যে, লেখা যেন স্পষ্ট হয়, স্ত্রীকে সম্বোধন করে তার ঠিকানায় পৌঁছনো হয়। অর্থাৎ তাকে এভাবে লিখতে হবে : "হে অমুক, তুমি তালাকপ্রাপ্ত।" একটা কাগজে একথা লিখে তার ঠিকানায় না পাঠালে নিয়ত ব্যতিরেকে তালাক সংঘটিত হবেনা।

বোবার ইশারা

বোবার জন্য ইশারা হলো মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম। এজন্য তার ইশারা যখন এমন হবে যে, দাম্পত্য সম্পর্কের অবসান বুঝায়, তখন তা তালাক সংঘটিত করার ব্যাপারে কথার স্থলভিষিক্ত হবে। ফকিহগণ এজন্য শর্ত আরোপ করেছেন যে, বোবার ইশারা দ্বারা তালাক সংঘটিত করার জন্য তার লিখতে সক্ষম না হওয়া চাই, লিখতে পারলে ইশারা যথেষ্ট হবেনা। কেননা লিখিত বক্তব্য মনের ভাবকে অধিকতর স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে। তাই লিখতে অক্ষম হওয়া ব্যতীত ইশারা গ্রহণযোগ্য নয়।

দূত পাঠানো

অনুপস্থিত স্ত্রীকে তালাক দেয়া হয়েছে জানানোর জন্য দূত মারফত তালাক পাঠানো বৈধ। এরূপ পরিস্থিতিতে দূত তালাকদাতার প্রতিনিধি হবে এবং তার তালাক কার্যকর করবে।

তালাকের সাক্ষী রাখা

প্রাচীন ও সাম্প্রতিককালের অধিকাংশ ফকিহর মতে, তালাক সাক্ষী না রাখলেও কার্যকর হয়। কেননা তালাক স্বামীর অধিকার। এ অধিকার ভোগ করার জন্য তার কোনো সাক্ষীর

প্রয়োজন নেই। বস্তুত সাক্ষীর প্রয়োজনীয়তা সাব্যস্ত করে এমন কোনো প্রমাণ রসূল সা. বা সাহাবীগণ থেকে পাওয়া যায়না। তালাক যে স্বামীর একচ্ছত্র অধিকার এবং এতে অন্য কারো কোনো অংশীদারি নেই, তার প্রমাণ নিম্নোক্ত দুটি আয়াত :

يَاأَيها الذين امنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن .

إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف .

"হে মুমিনগণ, তোমরা যখন মুমিন নারীদেরকে বিয়ে করবে, তারপর তালাক দেবে।" এবং "যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দেবে এবং তারা তাদের ইদ্দুত সমাপ্ত করবে, তখন হয় তাদেরকে ন্যায় সঙ্গতভাবে বহাল রাখো, অথবা ভালোয় ভালোয় বিদায় করে দাও।" ইবনুল কাইয়েম বলেছেন, এ থেকে প্রমাণিত যে, আল্লাহ তালাকের ক্ষমতা স্বামীকেই দিয়েছেন। কেননা বহাল রাখার ক্ষমতাও তারই। ইবনে আব্বাস বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট এলো এবং বললো : হে রসূলুল্লাহ, আমার মনিব আমাকে তার দাসীর সাথে বিয়ে দিয়েছেন, এখন তিনি আমার ও আমার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে চান। এ কথা শুনা মাত্রই রসূলুল্লাহ সা. মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং বললেন : "হে জনমণ্ডলি, তোমাদের কারো কারো এ কী দুর্মতি যে, নিজের দাসের সাথে দাসীকে বিয়ে দেয়, তারপর তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে চায়। তালাক তো তারই নিরংকুশ অধিকার, যে বিয়ে করেছে।" -ইবনে মাজাহ।

তবে ইমামিয়া শীয়াগণ এ ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তারা বলেছেন, তালাক শুদ্ধ হওয়ার জন্য সাক্ষী থাকা শর্ত। তারা প্রমাণ দেন সূরা তালাকের এ আয়াত থেকে :

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ .

"দুইজন ন্যায়পরায়ন লোককে সাক্ষী বানাও এবং আল্লাহর জন্য সাক্ষ্য উপস্থিত করো।"

তালাকে সাক্ষী রাখাকে যারা জরুরি মনে করেন

তালাকে সাক্ষী রাখাকে যারা অত্যাবশ্যক বা ওয়াজিব মনে করেন এবং তালাক শুদ্ধ হওয়ার শর্ত হিসেবে অভিহিত করেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন আমিরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবু তালেব, ইমরান বিন হুসাইন, ইমাম বাকের, ইমাম জাফর সাদেক এবং শেষোক্ত এই উভয় ইমামের সন্তান আহলে বাইতের ইমামগণ। এছাড়া আতা, ইবনে জুরাইজ ও ইবনে সিরীন রহ.। জাওয়াহেরুল কালাম গ্রন্থে আলী রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তাকে তালাক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন, দু'জন ন্যায়পরায়ন ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখেছো কি? সে বললো, না। তখন আলী রা. বললেন : যাও, তোমার তালাক নয়। আবু দাউদ ইমরান বিন হুসাইন রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে যখন তখন তালাক দেয়, আবার তার সাথে সহবাস করে, সে তালাকের উপরও কাউকে সাক্ষী রাখেনা, তালাক প্রত্যাহারের উপরও সাক্ষী রাখেনা, তখন তিনি ঐ ব্যক্তিকে বললেন, তুমি তালাকও দিয়েছো রসূল সা.-এর সুন্নাতের বিপরীত পন্থায়, আবার তালাক প্রত্যাহারও করেছ সুন্নতের বিপরীত পন্থায়। তালাক ও তালাক প্রত্যাহারে সাক্ষী রাখো। আর এ যাবত যা করেছ, তা আর করোনা।"

উসূলে ফিকহ শাস্ত্রে এ মূলনীতি উল্লেখিত হয়েছে যে, সাহাবি যখন বলেন, এটা সুন্নত, তখন বুঝতে হবে, তিনি যা বলেছেন, বিশুদ্ধভাবে রসূল সা. থেকে সরাসরি শুনেই

বলেছেন। কেননা সাহাবির উক্তি মাত্রই স্পষ্টত রসূল সা.-এর অপরিহার্যভাবে অনুসরণীয় সুন্নতের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাছাড়া সাহাবির উদ্দেশ্য হয়ে থাকে শরিয়তের বিধান বর্ণনা করা, ভাষা বা রীতিপ্রথা ও আদত অভ্যাস বর্ণনা করা নয়। হাফেয সয়ূতী তার তাফসীর গ্রন্থ দুররে মানছুরে নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে :

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْفَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ .

"অতপর যখন স্ত্রীরা ইদ্দত পূর্ণ করবে, তখন হয় তাদেরকে ন্যায়সঙ্গতকভাবে বহাল রাখো, নচেত ন্যায়সঙ্গতভাবে বিদায় করে দাও এবং তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ন ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখো" ইবনে সিরীন থেকে বর্ণনা করেন : এক ব্যক্তি ইমরান বিন হুসাইনকে জানালো যে, এক লোক কোনো সাক্ষী না রেখে তালাক দিয়েছে। তখন তিনি বললেন, সে খুব খারাপ কাজ করেছে। তার তালাক বিদয়াত এবং তার তালাক প্রত্যাহার সুন্নত বিরোধী। সে যেন তালাকে ও তালাক প্রত্যাহারে সাক্ষী রাখে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়।" সুতরাং ইমরান বিন হুসাইন রা. কর্তৃক সাক্ষী না রেখে তালাক দেয়া ও তালাক প্রত্যাহার করাকে অপছন্দ করা। এ কাজ থেকে সতর্ক করা ও এ কাজকে গুনাহ আখ্যায়িত করে এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার আদেশ দেয়ার একমাত্র কারণ স্পষ্টত এটাই যে, তিনি সাক্ষী রাখাকে অপরিহার্য মনে করতেন। "আল ওয়াসায়েল" নামক গ্রন্থে রয়েছে, ইমাম বাকের বলেছেন, যে তালাকের বিষয়ে আল্লাহ তার কিতাবে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন এবং যার পদ্ধতি রসূল সা. শিখিয়েছেন, তা হচ্ছে, স্ত্রী যখন ঋতুবতী হবে এবং ঋতু থেকে পবিত্র হবে, তখন স্বামী তার সঙ্গ ত্যাগ করবে। অতপর সে যখন পবিত্র থাকবে এবং কোনো সহবাসের কারণে অপবিত্র থাকবেনা, তখন দুজন ন্যায়পরায়ন লোককে সাক্ষী রেখে তালাক দিবে। আর এই তালাকের পর তিনবার ঋতু ও ঋতু থেকে পবিত্রতা অর্জন পর্যন্ত তালাক প্রত্যাহারে স্বামীরই অগ্রাধিকার রয়েছে।

এরূপ নিয়ম অনুসরণ ব্যতীত যে তালাক দেয়া হবে, তা বাতিল, তালাক নয়।

জাফর সাদেক বলেছেন, সাক্ষী ব্যতীত যে তালাক দেয়া হয়, তা কোনো তালাকই নয়। সাইয়েদ মুর্তজা 'আল-ইনতিসার' নামক গ্রন্থে বলেন, ইমামীয়া শিয়ারা যে বলেন, দুজন ন্যায়পরায়ন ব্যক্তির সাক্ষী থাকা তালাকের জন্য শর্ত এবং এ শর্ত অপূর্ণ থাকলে তালাক হবেনা, এর প্রমাণ আল্লাহর এই উক্তি : "এবং তোমরা দু'জন ন্যায়পরায়ন ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখো।" স্পষ্টতই এটা সাক্ষী রাখার জন্য আল্লাহর আদেশ। আর শরিয়তের রীতি অনুসারে সুস্পষ্ট আদেশ দ্বারা অপরিহার্য কর্তব্যই বুঝানো হয়। এখন সুস্পষ্ট আদেশ দ্বারা অপরিহার্য কর্তব্য প্রমাণিত হওয়ার পরও তাকে মুস্তাহাব গণ্য করা বিনা প্রমাণে শরিয়তের সুপরিচিত রীতি লঙ্ঘনের নামান্তর। দুররে মানসূরে সয়ূতী আতা থেকে উদ্ধৃত করেছেন, "বিয়েতে সাক্ষী, তালাকে সাক্ষী এবং তালাক প্রত্যাহারেও সাক্ষী অপরিহার্য।"

তবে ইবনে কাসীর তার তাফসীরে আতার উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, ওযর ব্যতীত বিনা সাক্ষীতে বিয়ে, তালাক ও তালাক প্রত্যাহার জায়েয নেই। আমাদের উল্লিখিত উদ্ধৃতি সমূহ থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সাক্ষী রাখা অপরিহার্য, এ মতটি শুধু শিয়াদের নয়, বরং আতা, ইবনে জুরাইয ও ইবনে সিরীন সুন্নী ইমামদেরও।

তালাকের শ্রেণীভেদ

যে শব্দ বা ভাষা প্রয়োগ করে তালাক দেয়া হয়, তার আলোকে তালাক তিন শ্রেণীতে বিভক্ত : তাৎক্ষণিক তালাক, শর্ত সাপেক্ষ তালাক, ভবিষ্যতের নিষ্পন্নযোগ্য তালাক। তাৎক্ষণিক তালাক হলো সেই তালাক, যা কোনো শর্ত বা ভবিষ্যতের কোনো সময়ের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং তালাক দাতা তাৎক্ষণিকভাবেই তালাক দিতে ইচ্ছুক। যেমন স্ত্রীকে বলা হলো, তুমি তালাকপ্রাপ্তা বা তোমাকে তালাক দিলাম। এ তালাকের বিধান হলো, তালাকদাতার কাছ থেকে ঘোষিত হওয়া মাত্রই সংঘটিত হবে। শর্ত সাপেক্ষ তালাক হলো, স্বামী থাকে নির্ভরশীল ঘোষণা করে। যেমন স্ত্রীকে বলে, তুমি অমুক জায়গায় গেলে তোমার উপর তালাক সংঘটিত হবে। শর্ত সাপেক্ষ তালাক কার্যকর হওয়া জন্য তিনটে শর্ত পূরণ জরুরি :

১. তালাক এমন জিনিসের উপর নির্ভরশীল হওয়া চাই বর্তমানে যার অস্তিত্ব নেই এবং পরবর্তী সময়ে অস্তিত্ব লাভ করার সম্ভাবনা রয়েছে। পক্ষান্তরে তালাক দেয়ার সময় বিদ্যমান কোনো জিনিসের উপর নির্ভরশীল হলে তা হবে তাৎক্ষণিক তালাক যদিও তা শর্ত সাপেক্ষ তালাকের ভঙ্গিতে দেয়া হয়েছে। যেমন : সূর্য উদিত হয়েছে এরূপ অবস্থায় বলা : "সূর্য উঠলে তোমার উপর তালাক কার্যকর হবে।" আর যদি কোনো অসম্ভব জিনিসের শর্তাধীন করে তালাক দেয়া হয় : যথা সূর্যের ছিদ্রের মধ্যে উট প্রবেশ করলে তোমার উপর তালাক সংঘটিত হবে। তাহলে তালাক সম্বলিত উক্তি সম্পূর্ণ বৃথা হবে।

২. তালাকের ঘোষণা হওয়ার সময় স্ত্রী তালাকের যোগ্য হওয়া অর্থাৎ তার বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকা চাই।

৩. শর্তাধীন তালাকের শর্ত পূরণের সময়ও স্ত্রীর অনুরূপ তালাকের যোগ্য থাকা চাই।

শর্তাধীন তালাক দুই প্রকার : ১. যার উদ্দেশ্য হয় স্ত্রীকে কোনো কাজ করতে বা ত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করা। যেমন তাকে বলা : তুমি যদি বাড়ির বাইরে যাও তাহলে তোমার উপর তালাক পড়বে। এখানে তালাক কার্যকর করার জন্য স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বের হতে নিষেধ করা হয়েছে। এটা তালাকের ব্যাপারে কসম খাওয়ার পর্যায়ভুক্ত।

২. শর্ত পূরণ হয়ে গেলে তালাক কার্যকর হওয়া যার উদ্দেশ্য। যেমন স্বামী স্ত্রীকে বলা : "তুমি যদি আমাকে তোমার প্রাপ্য অবশিষ্ট মোহর থেকে অব্যাহতি দাও, তাহলে তোমার উপর তালাক কার্যকর হবে।"

অধিকাংশ আলেমের নিকট এই উভয় প্রকারের তালাক কার্যকর হয়। কিন্তু ইবনে হাযমের মতে, তালাক কার্যকর হয়না। ইবনে কাইয়েম ও ইবনে তাইমিয়া বলেছেন : শর্তাধীন তালাক যদি এমন হয় যে, তাতে কসমের অর্থ পাওয়া যায়, তাহলে সে তালাক কার্যকর হবেনা। এতে যে জিনিসের উপর কসম খাওয়া হয়, তা পূরণ হলে কসমের কাফফারা দেয়া ওয়াজিব হবে। কাফফারা হলো, দশজন মিসকিনকে খাদ্য বা বস্ত্র দান অথবা তিন দিন রোযা রাখা। কসমের অর্থ যুক্ত না হয়ে শুদ্ধ শর্তযুক্ত হলে শর্ত পূরণ হওয়া মাত্র তালাক কার্যকর হবে।

ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, লোকেরা সাধারণত তালাক দিতে যে সফল শব্দ ব্যবহার করে থাকে তা তিন ধরনের : ১. তাৎক্ষণিক ও শপথবিহীন, যথা :"তোমাকে তালাক দিলাম।" এ দ্বারা তালাক সংঘটিত হয়ে যাবে। এতে কোনো শপথও নেই, তাই সর্বসম্মতভাবে এতে

কাফফারা নেই। ২. শপথবোধক শব্দ : যেমন তালাক দিতে আমি বাধ্য, এটা আমি দেবোই।" ৩. শর্তযুক্ত শব্দ যথা : আমার স্ত্রী যদি অমুক কাজ করে, তাহলে তার উপর তালাক কার্যকর হবে। এদ্বারা স্বামী যদি শপথ বুঝায় এবং সে তালাক দেয়া অপছন্দ করে, তাহলে এটা একটা শপথ এবং শপথযুক্ত তালাকের মতোই। এ ব্যাপারে সকল ফকিহ্ একমত। আর যদি শর্ত বুঝায় তবে শর্ত পূরণ হলে তালাক সংঘটিত হবে। যেমন : "তুমি যদি আমাকে এক হাজার টাকা দাও, তবে তোমার উপর তালাক কার্যকর হবে।" অথবা "তুমি যখন ব্যভিচার করবে, তখন তোমার উপর তালাক পড়বে।" আর একথা দ্বারা ব্যভিচার সংঘটিত হওয়া মাত্রই তালাক সংঘটিত হোক এটা কামনা করে, শুধু শপথ করার ইচ্ছা পোষণ করেনা, তাহলে এটা শপথ নয় এবং এতে কোনো কাফফারাও দিতে হবেনা। তবে এতে শর্ত পূরণ হওয়া মাত্র তালাক কার্যকর হবে। যে সকল শব্দ দ্বারা বক্তা কোনো কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করতে চায়, অথবা বিরত রাখতে চায়, অথবা সমর্থন করতে চায় কিংবা অস্বীকার করতে চায়, তা শপথ সম্বলিত শব্দ হোক বা শুধু শর্তযুক্ত শব্দ হোক, সর্বসম্মতভাবে শপথ গণ্য হবে। আর যদি শপথযুক্ত শব্দ হয়, তবে সেই শপথ প্রযোজ্য হলে কাফফারা দিতে হবে। আর প্রযোজ্য না হলে, যেমন কোনো সৃষ্টির নামে শপথ করা হলে, কাফফারা দিতে হবেনা। আর যদি শপথ প্রযোজ্য হয় কিন্তু কেবল শ্রদ্ধাবোধক হয়, যার কাফফারা হয়না, তবে কুরআনে বা হাদিসে কোথাও তার কোনো বিধান নেই এবং তার স্বপক্ষে কোনো প্রমাণও নেই।

শর্তযুক্ত বা শপথযুক্ত তালাক সম্পর্কে বর্তমানে মিশরে যে বিধি কার্যকর রয়েছে, তা ১৯২৯ সালের ২৫ নং আইনের ২ নং ধারায় নিম্নরূপ বর্ণিত রয়েছে : "যখন কোনো শর্তযুক্ত বা শপথযুক্ত তালাক দ্বারা কোনো কাজ করতে বা ত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করাই কাঙ্ক্ষিত হয়, তখন তা দ্বারা তালাক সংঘটিত হবেনা।" এ সংক্রান্ত ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে:

"কতিপয় হানাফি, মালেকি ও শাফেয়ী আলেমের মতানুসারে শপথযুক্ত তালাককে বাতিল গণ্য করে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে এবং আলী রা. কাযি শুরাইহ ও দাউদ যাহেরি প্রমুখের মতানুসারে শপথের অর্থবোধক শর্তযুক্ত তালাককে বাতিল গণ্য করে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।"

ভবিষ্যতকালের সাথে যুক্ত শব্দ প্রয়োগে তালাক

যে শব্দকে ভবিষ্যতের কোনো সময়ে তালাক কার্যকর করার জন্য ব্যবহার করা হয়, যেমন : তোমার উপর আগামি কাল বা আগামি বছরের শুরুতে তালাক পড়বে। এক্ষেত্রে যে সময়ের সাথে তালাককে সংযুক্ত করা হয়েছে, সে সময়ে স্ত্রীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক থাকলে আগামি কাল বা বছরের শুরুতে তালাক কার্যকর হবে। আর যদি স্ত্রীকে স্বামী বলে : "বছরের শেষ নাগাদ তোমার উপর তালাক পড়বে।" তাহলে আবু হানিফা ও মালেকের মতে, বলা মাত্রই তালাক পড়বে। শাফেয়ী ও আহমদের মতে, বছর অতিক্রান্ত না হওয়া মাত্রই তালাক পড়বেনা। ইবনে হাযম বলেছেন, ভবিষ্যতের যে সময়ই নির্ধারণ করে তালাক দেয়া হোক, তালাক হবেনা, তখনও না, নির্ধারিত সময় এলেওনা। এর প্রমাণ এই যে, এভাবে তালাক কার্যকর হওয়ার পক্ষে কুরআন ও সুন্নাহর কোথাও কিছু উল্লেখ নেই। আল্লাহ আমাদেরকে শুধু দু'রকমের তালাকের কথাই শিখিয়েছেন, সহবাসকৃত স্ত্রীকে ও অসহবাসকৃত স্ত্রীকে তালাক দেয়া। কিন্তু আলোচ্য তালাক সম্পর্কে আমাদের জানামতে কোনো তথ্য নেই। আল্লাহ বলেছেন : "যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমালঙ্ঘন করে, সে নিজের

উপর যুলুম করে।" তাছাড়া তাৎক্ষণিকভাবে দেয়া সব তালাক যখন কার্যকর হয়না, যখন ভবিষ্যতের যে সময়ে তালাক দেয়া হয়নি, তখন তো তালাক কার্যকর হতেই পারেনা।

সুন্নতি তালাক ও বেদয়াতি তালাক

সুন্নাহ অনুসরণ করা বা না করার ভিত্তিতে তালাক দু'রকম : সুন্নতি তালাক ও বেদয়াতি তালাক।

সুন্নতি তালাক

সুন্নতি তালাক হলো সেই তালাক, যা শরিয়তের নির্দেশিত পন্থায় দেয়া হয়। সহবাসকৃত স্ত্রীকে ঋতু পরবর্তী পবিত্রাবস্থায় সহবাস না করে তালাক দেয়াকে সুন্নতি তালাক বলা হয়।

আল্লাহ বলেছেন : الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ .

"তালাক দু'বার। এরপর হয় স্ত্রীকে ন্যায়সংগতভাবে বহাল রাখা, নচেত সদাচারের সাথে বিদায় করা।" অর্থাৎ শরিয়তবিহিত তালাক প্রথমে একবার দেয়া হবে, যার পর তা প্রত্যাহার করার অবকাশ থাকবে। তারপর দ্বিতীয়বার দেয়া হবে যার পর আবারো প্রত্যাহার করার অবকাশ থাকবে। এরপর তালাকদাতার স্বাধীনতা থাকবে হয় ন্যায়সংগতভাবে বহাল রাখবে, নতুবা সদাচারের সাথে বিদায় করা হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন : يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ .

"হে নবী, যখন স্ত্রীকে তালাক দাও, তখন ইদ্দতের জন্যে তালাক দাও।" অর্থাৎ তালাক দিতে চাইলে এমন সময়ে দাও, যখন সে ইদ্দতের সম্মুখীন হবে। আর তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী ইদ্দতের সম্মুখীন হবে তখনই, যখন সে মাসিক ঋতুস্রাব (হায়েজ) বা প্রসবোত্তর স্রাব (নেফাস) থেকে পবিত্র থাকবে এবং সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া হবে।। এর যুক্তি এই যে, ঋতুবতী অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেয়া হলে এ সময়ে সে ইদ্দতের অবশিষ্ট সময় ইদ্দতের মধ্যে গণ্য হয় না। ফলে তার ক্ষতি করা হয়। আর যদি পবিত্রাবস্থায় সহবাস করে তালাক দেয়া হয়, তাহলে স্ত্রী বুঝতে পারে না সে গর্ভবতী হয়েছে কিনা। ফলে সে ইদ্দত কিভাবে গণবে, পবিত্রাবস্থা দ্বারা না সন্তান প্রসব দ্বারা, বুঝতে পারেনা।

নাফে বর্ণনা করেন যে, উমর রা.-এর ছেলে আব্দুল্লাহ রসূলুল্লাহ সা. এর আমলে তার স্ত্রীকে ঋতুবতী অবস্থায় তালাক দিলো। উমর রা. এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : "আব্দুল্লাহকে তালাক প্রত্যাহার করতে আদেশ দাও। তারপর পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তাকে যেন বহাল রাখে, তারপর সে ঋতুবতী হবে ও পবিত্র হবে। তারপর ইচ্ছা করলে তাকে বহাল রাখবে, নচেত সহবাস করার আগে তালাক দিবে। এটাই হলো সেই ইদ্দত, যা সামনে রেখে স্ত্রীকে তালাক দিতে আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন।" অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে রসূলুল্লাহ সা. বললেন, তাকে আদেশ দাও, তালাক প্রত্যাহার করুক। তারপর স্ত্রী পবিত্র হলে কিংবা গর্ভবতী হলে তালাক দিক।" -নাসায়ী, মুসলিম, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ।

এ তালাক থেকে স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় যে ঋতু পরবর্তী পবিত্রাবস্থায় যে তালাক সহবাসের পূর্বে দেয়া হয়, সেটাই সুন্নতি তালাক। এটাই আবু হানিফার মাযহাব এবং এক বর্ণনা অনুযায়ী আহমদ ও শাফেয়ীরও মত। তারা হাদিসের স্পষ্টোক্তি দ্বারাই এর প্রমাণ দিয়েছেন। তাছাড়া যেহেতু ঋতুর কারণেই তালাক দিতে নিষেধ করা হয়েছিল, তাই পবিত্র হওয়ার পর আর নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ রইলনা। কাজেই সেই পবিত্রাবস্থায় তালাক দেয়া জায়েয।

বেদয়াতি তালাক

বেদয়াতি তালাক হলো শরিয়ত বিরোধী তালাক। যেমন : একবারে তিন তালাক দেয়া। কিংবা একই বৈঠকে তিনবারে তিন তালাক দেয়া যেমন এভাবে বলা, তোমাকে তালাক দিলাম, তোমাকে তালাক দিলাম, তোমাকে তালাক দিলাম। কিংবা হায়েজ বা নেফাস থাকা অবস্থায় বা পবিত্রাবস্থায় সহবাস করার পর তালাক দেয়া। আলেমগণ সর্বসম্মতভাবে বলেছেন, বেদয়াতি তালাক হারাম এবং কবীরা গুনাহ। অধিকাংশ আলেমের মতে, বেদয়াতি তালাক হারাম হলেও তা কার্যকর হবে। এর প্রমাণ :

১. বেদয়াতি তালাক তালাক সংক্রান্ত সাধারণ আয়াতসমূহের আওতাভুক্ত।

২. ইবনে উমর রা. ঋতুবতী অবস্থায় স্ত্রীকে যে তালাক দিয়েছেন এবং রসূলুল্লাহ সা. যা প্রত্যাহারের জন্য তাকে আদেশ দিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে ইবনে উমর রা. সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, ঐ তালাক তালাক হিসেবে গণ্য হয়েছে। তবে ইবনে আলিয়া, ইবনে তাইমিয়া, ইবনে হাযম, ইবনে কাইয়েমসহ কিছু সংখ্যক আলেম মনে করেন, বেদয়াতি তালাক কার্যকর হয়না এবং একে সাধারণ তালাকের ব্যতিক্রম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কেননা আল্লাহ যে তালাকের অনুমতি দিয়েছেন, এটা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং যে তালাক নিষিদ্ধ করেছেন তার অন্তর্ভুক্ত। আর রসূলুল্লাহ সা. উমর রা. কে বলেছেন, ওকে তালাক প্রত্যাহার করার আদেশ দাও। তাছাড়া একথা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত যে, এ খবর জেনে রসূলুল্লাহ সা. রাগান্বিত হয়েছিলেন। অথচ আল্লাহ যে কাজকে হালাল করেছেন, তা করলে তিনি রাগান্বিত হতে পারেননা। ইবনে উমর রা. যদিও বলেছেন, ঐ তালাক তালাক হিসেবে গণ্য হয়েছে কিন্তু কে গণ্য করেছে, তা তিনি বলেননি।

সারকথা এই যে, সুন্নতি তালাকের পরিপন্থী তালাকই বেদয়াতি তালাক এবং এ ব্যাপারে সকলেই একমত। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, প্রত্যেক বেদয়াতই গোমরাহি। এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, আল্লাহ তাঁর কিতাবে তালাকের যে বিধান দিয়েছেন এবং রসূলুল্লাহ সা. ইবনে উমর রা. বর্ণিত হাদিসে যে পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন, এ তালাক তার পরিপন্থী। বস্তুত আল্লাহ ও তাঁর রসূল প্রদত্ত বিধানের পরিপন্থী সবকিছুই প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "যে কাজ আমাদের নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে করা হয়না তা প্রত্যাখ্যাত।" এটা বুখারি ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদিস। সুতরাং যে ব্যক্তি দাবি করে যে, এই বেদয়াতি তালাকের কার্যকারিতা অপরিহার্য এবং রসূলুল্লাহ সা.-এর বিধান অনুসারে না হওয়া এই কাজ কার্যকর হবে, তার এ উক্তি বিনা প্রমাণে কার্যকর হবেনা।

যাদের মতে বেদয়াতি তালাক কার্যকর হয়না :

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা., সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব এবং ইবনে আব্বাসের শিষ্যদের মধ্য থেকে তাউস, খাল্লাস বিন উমর, আবু কুলাবা, হাম্বলি ইমাম ইবনে আকীল, আহলে বাইয়াতের ইমামগণ, যাহেরি মাযহাব, ইমাম আহমদের মাযহাবের একটি অংশ ও ইবনে তাইমিয়ার মত হলো, বেদয়াতি তালাক কার্যকর হয়না।

গর্ভবতীর তালাক :

গর্ভবতীকে যখন ইচ্ছা তালাক দেয়া বৈধ। কেননা মুসলিম, নাসায়ী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজায় বর্ণিত, ইবনে উমর রা. তার জনৈকা স্ত্রীকে ঋতুবতী অবস্থায় তালাক দিলেন। বিষয়টি উমর রা. রসূল সা.কে জানালে তিনি বললেন, তাকে তালাক প্রত্যাহার করতে

আদেশ দাও। পরে সে যখন পবিত্র হবে কিংবা গর্ভবতী হবে, তখন তালাক দেবে। হানাফি আলেমগণ ব্যতীত অন্য সকল আলেমের মত এটাই। ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ বলেন, দুই তালাক দেয়ার মাঝখানে এক মাসের ব্যবধান রাখা জরুরি, যাতে তিন তালাক পূর্ণ হয়। মুহাম্মদ ও যুফার বলেন, গর্ভবতীর উপর একটার বেশি তালাক দেয়া যাবেনা। এক তালাক দিয়ে তাকে সন্তান প্রসব পর্যন্ত অবকাশ দিতে হবে। তারপর বাদ বাকি তালাক দিতে হবে।

যে স্ত্রীর আর ঋতুস্রাবের আশা নেই, যার ঋতু বন্ধ হয়ে গেছে এবং যে অপ্রাপ্ত বয়স্কা, তাদের তালাক : এদের সকলের সুন্নতি তালাক তখনই হবে, যখন মাত্র একটা তালাক দেয়া হবে। এজন্য এছাড়া আর কোনো শর্ত আরোপিত হয়না।

তালাকের সংখ্যা

যে স্ত্রীর সাথে স্বামী সহবাস করেছে তার উপর স্বামী তিন বার তালাক দেয়ার ক্ষমতা লাভ করে। আলেমগণ সর্বসম্মত রায়ে বলেছেন, এক বাক্যে তিন তালাক দেয়া কিংবা পরপর ভিন্ন ভিন্ন বাক্যে একই পবিত্রতার মেয়াদের তিন তালাক দেয়া স্বামীর উপর হারাম। তারা এর কারণ বর্ণনা করেন এই যে, একবারে তিন তালাক দিয়ে ফেললে পরে অনুতপ্ত হলে প্রতিকারের পথ বন্ধ হয়ে যায়। শরিয়ত পর্যায়ক্রমে ও বিরতি সহকারে একাধিক তালাকের ব্যবস্থা করেছে, যাতে অনুতাপ ও অনুশোচনার ক্ষেত্রে প্রতিকার করতে পারে। তাছাড়া এ দ্বারা স্ত্রীর অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়। কেননা এ দ্বারা স্বামীর সাথে তার সম্পর্ক চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

নাসায়ী মাহমুদ বিন লাবিদ থেকে বর্ণনা করেন : আমরা রসূলুল্লাহ্ সা.কে জানালাম, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক সাথে তিন তালাক দিয়েছে। একথা শোনামাত্রই রসূলুল্লাহ্ সা. রাগান্বিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, আমি তোমাদের মধ্যে জীবিত থাকা অবস্থায়ই সে আল্লাহর কিতাব নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে? এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে রসূলুল্লাহ্ সা. তবে কি তাকে হত্যা করবো?' ইবনুল কাইয়িম বলেন, এ হাদিস থেকে বুঝা যায়, রসূলুল্লাহ্ সা. তাকে আল্লাহর কিতাবের সাথে ছিনিমিনি খেলার দায়ে অভিযুক্ত করেছেন। কেননা সে তালাকের পদ্ধতি লংঘন করেছে এবং আল্লাহ্ যা চেয়েছেন, তার সে বিরোধিতা করেছে। আল্লাহ্ চেয়েছেন, সে যদি তালাক দিতেই চায় তবে এমন তালাক দিক, যার পরে সে ইচ্ছা করলে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে পারে। অথচ সে তিন তালাক দিয়ে এই ইচ্ছাই ব্যক্ত করলো যে, সে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা হাতে রাখতে চায়না। তাছাড়া এক সাথে তিন তালাক দেয়া আল্লাহর এই উক্তির সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক : 'তালাক দু'বার'। আরবি ভাষাতেই হোক অথবা পৃথিবীর আর যে কোনো ভাষাতেই হোক, যদি বলা হয়, দুইবার বা বহুবার, তাহলে স্পষ্টতই একবারের পর আরেকবার বুঝা যায়, এক সাথে একাধিকবার কখনো বুঝায়না। কাজেই কেউ যখন এক সাথে দুটো বা ততোধিক তালাক দেয়, তখন সে আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমালংঘন করে, যা আল্লাহর কিতাব থেকে প্রমাণিত। তবে ইমামগণ এক সাথে একাধিক তালাক দানকে সর্বসম্মতভাবে হারাম মনে করলেও তিন তালাকের কার্যকারিতা নিয়ে মতভেদে লিপ্ত। যদি কার্যকর হয়, তবে কি একটা হবে, না কি তিন তালাক কার্যকর হবে?

কতক আলেম বলেন, তিন তালাক কার্যকর হবে। অন্যরা বলেন, এক তালাক হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, তালাক প্রাপ্তার সাথে সহবাস সম্পন্ন হয়ে থাকলে তিন তালাক হবে, নচেত এক তালাক হবে।

তিন তালাকের প্রবক্তাদের প্রমাণ হলো :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ○

১. আল্লাহ বলেন, যদি সে স্ত্রীকে তালাক দেয়, তবে অতপর সেই স্ত্রী তার জন্য আর হালাল হবেনা, যতক্ষণ অন্য স্বামীকে বিয়ে না করে।'

২. আল্লাহ বলেন : وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ ...... ○

"আর যদি তোমরা সহবাসের পূর্বে তালাক দাও"

৩. আল্লাহ বলেন : لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ .

"তোমরা যদি স্ত্রীদেরকে তালাক দাও, তবে তাতে কোনো দোষ নেই।" এসব আয়াতের বক্তব্য থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়, এক, দুই বা তিন তালাক যাই দেয়া হোক, তা কার্যকর হবে। কেননা এখানে তালাকের সংখ্যায় কোনো পার্থক্য করা হয়নি।

৪. আর আল্লাহ বলেন :.... اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ص فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ

"তালাক দুবার। এরপর হয়, ন্যায়সংগতভাবে বহাল রাখতে হবে, নচেত সদাচারের সাথে বিদায় দিতে হবে।" এ আয়াত থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়। তিন, বা দুই তালাক এক সাথে বা আলাদা আলাদাভাবে, যেভাবেই দেয়া হোক, বৈধ হবে ও কার্যকর হবে।

৫. ইমাম আহমদ সাহল বিন সাদ থেকে বর্ণনা করেন, বনু আজলানের এক সদস্য যখন তার স্ত্রীর সাথে লিয়ান করলো, তখন বললো, হে রসূল, তাকে বহাল রাখলে তার উপর যুলুম করা হবে। তাকে তালাক দিলাম, তালাক দিলাম, তালাক দিলাম।"

৬. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর জানিয়েছেন, তিনি তার স্ত্রীকে এক তালাক দিলেন। তখন সে ঋতুবতী। অতপর তার পরবর্তী দুই পবিত্রতার মেয়াদে আরো দুই তালাক দিতে ইচ্ছুক ছিলেন। একথা জানতে পেরে রসূল সা. বললেন, হে ইবনে উমর, আল্লাহ তোমাকে এরকম আদেশ দেননি। তুমি সুন্নতের নিয়ম অনুসরণে ভুল করেছ। সুন্নত হলো, স্ত্রী যখন পবিত্রাবস্থার সম্মুখীন হবে, তখন প্রত্যেক পবিত্রাবস্থায় তালাক দিবে। অতপর রসূল সা.-এর আদেশক্রমে আমি তালাক প্রত্যাহার করলাম। তারপর তিনি বললেন, যখন স্ত্রী পবিত্র হবে, তখন হয় তালাক দাও, নচেত বহাল রাখো। আমি বললাম, হে রসূলুল্লাহ সা., আমি যদি তাকে তিন তালাক দিতাম তাহলে কেমন হতো? তালাক প্রত্যাহার করা কি আমার জন্য বৈধ হতো? তিনি বললেন, না, তার সাথে তোমার চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটে যেত এবং তা হতো গুনাহর কাজ।

৭. আব্দুর রাজ্জাক উবাদা ইবনে সামেত থেকে বর্ণনা করেছেন : "আমার দাদা তার এক স্ত্রীকে এক হাজার তালাক দিলেন। তারপর উবাদা রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট গেলেন এবং ঘটনা জানালেন। রসূলুল্লাহ সা. বললেন, তোমার দাদা তাকওয়ার উপযোগী কাজ করেনি। এক হাজার তালাকের মধ্যে তিনটে তার। আর বাকি নয়শো সাতানব্বইটি অন্যায় ও যুলুম। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করতে চাইলে করবেন, আর আযাব দিতে চাইলে দেবেন।"

অন্য বর্ণনা মতে, তোমার দাদা আল্লাহকে ভয় করেনি এবং নিজের জন্য উদ্ধারের পথ রাখেনি। তিন তালাকের মাধ্যমে স্ত্রী তার কাছ থেকে সুন্নত বিরোধী পন্থায় আলাদা হয়ে গেছে। আর নয়শো সাতানব্বইটি তালাকই তার ঘাড়ে পাপ হয়ে ঝুলে রয়েছে।

৮. রুকানার হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সা. তার কাছ থেকে এই মর্মে শপথ গ্রহণ করেন যে, সে এক তালাকের বেশি দিতে চায়নি। এ থেকে প্রমাণিত হয়, সে তিন তালাক দিতে চাইলে তা কার্যকর হয়ে যেতো। এটা অধিকাংশ তাবেয়ি, বিপুল সংখ্যক সাহাবি ও চার মাযহাবের ইমামদের অভিমত।

পক্ষান্তরে যারা বলেন, এক সাথে একাধিক তালাক দিলেও এক তালাকই কার্যকর হবে, তাদের প্রমাণগুলো নিম্নরূপ :

প্রথমত মুসলিম বর্ণিত হাদিস, আবু সোহাবা ইবনে আব্বাস রা.কে বললেন, আপনি কি জানেন, রসূলুল্লাহ সা. ও আবু বকরের আমলে এবং উমরের আমলের প্রথম ভাগে তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা হতো? ইবনে আব্বাস বললেন, হ্যাঁ, জানি।

মুসলিম থেকে আরো বার্ণিত, রসূলুল্লাহ সা.-এর আমলে আবু বকরের আমলে এবং উমরের খিলাফতের দু'বছর ব্যাপী তিন তালাক এক তালাক গণ্য হতো। উমর রা. বললেন, লোকেরা এমন একটা ব্যাপার নিয়ে তাড়াহুড়ো করছে, যাতে তাদের (তালাক প্রত্যাহারের) অবকাশ ছিলো। এখন আমরা যদি তা চালু করি, তবে কেমন হবে? অতপর তিনি সেটা চালু করলেন। অর্থাৎ আগে লোকেরা এক তালাক দিতো। আর আজকাল এক সাথে তিন তালাক দেয়।

দ্বিতীয়ত, ইকরামা ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন : "রুকানা তার স্ত্রীকে একই বৈঠকে তিন তালাক দিয়ে দিলো। অতপর সে তার জন্য খুব উতলা হয়ে পড়লো। রসূলুল্লাহ সা. তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিভাবে তালাক দিয়েছিলে? সে বললো, তিন তালাক। রসূলুল্লাহ সা. বললেন, একই বৈঠকে? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, ওটা এক তালাক ব্যতীত অন্য কিছু নয়। তুমি ইচ্ছা করলে তোমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে পারো। অতপর সে ফিরিয়ে আনলো। -আহমদ, আবু দাউদ।

ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, (ফাতওয়া, ৩য় খণ্ড, ২২ পৃ:) : "শরিয়তের উৎসসমূহে, তথা কুরআনে, সুন্নতে, ইজমায় ও কিয়াসে, এমন কিছু নেই, যা দ্বারা তার জন্য তিন তালাক অবধারিত হয়ে পড়ে। তার বিয়ে নিশ্চিতভাবে বহাল রয়েছে। নিশ্চিতভাবে তার স্ত্রী অন্য পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ। যদি তিন তালাক অবধারিত হতো, তাহলে তার স্ত্রী তার জন্য হারাম ও অন্যদের জন্য হালাল হয়ে যেত। তাছাড়া আল্লাহ ও তার রসূল যে হিল্লা বিয়ে হারাম করেছেন, তার জন্য ওজুহাত খোঁজার পথ খুলে যেত। রসূলুল্লাহ সা. ও তার খলিফাদের আমলে হিল্লা বিয়ে বা তাহলীল বিয়ের উদ্ভব ঘটেনি। এমন কোনো ঘটনা বর্ণিত হয়নি যে, তাদের আমলে কোনো স্ত্রীকে তিন তালাকের পর তাহলীলের মাধ্যমে তার স্বামীর নিকট ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে। বরং রসূলুল্লাহ সা. যে ব্যক্তি তাহলীল বিয়ে করে এবং যার জন্য করে, উভয়কে অভিসম্পাত করেছেন। মোটকথা, রসূলুল্লাহ সা. এটিকে তার উম্মতের জন্য এমন কোনো শরয়ী বিধানে পরিণত করেননি, যার কোনো পরিবর্তন সম্ভব নয়। কারণ রসূলুল্লাহ সা.-এর পরে কোনো বিধান রহিত করা সম্ভব নয়। রসূলুল্লাহ সা. থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত, তাছাড়া আবু বকরের আমলে ও উমরের খেলাফতের প্রথমভাগে তিন তালাক এক তালাক গণ্য হতো। পরবর্তীকালে বড়জোর যেটুকু প্রতীয়মান

হয় তা হলো, সাহাবিগণ এই বিধানই অনুসরণ করে চলতেন, কিন্তু তিনি জানতেননা। এটা যদিও অসম্ভবের মত মনে হয়, তবে এ থেকে প্রমাণিত হয়, তারা তাঁর আমলে ও আবু বকরের আমলে এই বিধি অনুসারেই ফতোয়া দিতেন। রসূলুল্লাহ সা.ও ইতিপূর্বে এভাবেই ফতোয়া দিয়েছেন। তাঁর ফতোয়া এটাই। তাঁর সাহাবিগণ এই ফতোয়া এমনভাবে কার্যকর করেছেন যেন হাতে হাতেই নিয়েছেন এবং কেউ তার বিরোধিতাও করেননি।

উমর রা. এক পর্যায়ে জনগণকে শাস্তি হিসেবে তিন তালাক কার্যকর করা পছন্দ করেছিলেন, যাতে তারা আর কখনো এক সাথে তিন তালাক না দেয়। এটা ছিলো উমর রা.-এর ইজতিহাদ। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো একটা জনহিতকর ব্যবস্থা চালু করা। তাই বলে উমারের এই ইজতিহাদের কারণে রসূলুল্লাহ সা.-এর ফতোয়াকে ত্যাগ করা বৈধ নয়। কেননা তাঁর সাহাবিগণ তাঁর আমলে ও তাঁর খলিফাদের আমলে এই ফতোয়াই অনুসরণ করতেন। সত্য যখন প্রকাশিত হলো, তখন যার যা ইচ্ছা বলুক।

ইমাম শওকানি বলেছেন, আবু মূসা, আলী, ইবনে আব্বাস, তাউস, আতা, জাবের, ইবনে যায়দ, হাদি, কাসেম, বাকের, আহমদ ইবনে ঈসা, আব্দুল্লাহ ইবনে মূসা, যায়দ বিন আলি, ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়েম, ইবনে দিনার, ইবনে মাসউদ, আব্দুর রহমান বিন আওযা ও যুবাইরের অভিমতও এরূপ। আর এই অভিমত সাম্প্রতিককালে আদালতেও চালু হয়েছে।

পক্ষান্তরে যারা বলেন, এক সাথে তিন তালাক দিলে আদৌ তালাকই হয়না। তাদের যুক্তি হলো, এটা বেদয়াতি তালাক, যা সম্পূর্ণ নিরর্থক। কিছু সংখ্যক তাবেয়ি, যথা ইবনে আলিয়া, হিশাম, আবু উবায়দা, যাহেরি মাযহাবের কতক ইমাম, বাকের, সাদেক, নাসের প্রমুখ এই মতের প্রবক্তা। তাদের বক্তব্য হলো, বেদয়াতি তালাক কার্যকর হয়না। আর যারা সহবাসের আগে ও পরে তালাক দেয়ায় পার্থক্য করেন, তারা ইবনে আব্বাস ও ইসহাক বিন রাহওয়ারই এর একদল শিষ্য।

বিচ্ছেদের তালাক

ইমাম তিরমিযি বলেছেন, বিচ্ছেদের তালাক সম্পর্কে সাহাবি ও তাদের পরবর্তী আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বিচ্ছেদের তালাক এক তালাক বলে অভিমত দিয়েছেন, আর আলি রা. একে তিন তালাকে রূপান্তরিত করেছেন। কেউ কেউ বলেন, এতে স্বামীর নিয়ত বিচার্য। সে যদি এক তালাকের নিয়ত করে থাকে তবে তা এক তালাক। আর যদি তিন তালাক নিয়ত করে তবে তিন তালাক। আর দুই তালাক নিয়ত করলে এক তালাক হবে। এটা ইমাম ছাওরি ও কুফাবাসি আলেমদের মত। মালেক ইবনে আনাস বলেন, যে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হয়েছে, তার ক্ষেত্রে বিচ্ছেদ অর্থ তিন তালাক। শাফেয়ি বলেন, এক তালাকের নিয়ত করে থাকলে এক তালাক হবে এবং স্বামী তা প্রত্যাহার করতে পারবে। আর দুই তালাক নিয়ত করলে দুই এবং তিন তালাক নিয়ত করলে তিন তালাক পড়বে।

রজয়ি ও বায়েন তালাক

তালাক রজয়ি (অর্থাৎ প্রত্যাহারযোগ্য) অথবা বায়েন (বিচ্ছেদকারী বা অপ্রত্যাহারযোগ্য)

এই দু'রকমের হয়ে থাকে। আর বায়েনও হয়ে থাকে দুই প্রকারের ছোট বায়েন ও বড় বায়েন। উভয় প্রকারের তালাকের সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে।

যে স্ত্রীর সাথে স্বামী সহবাস করেছে, তাকে যদি সে এমন তালাক দেয়, যা কোনো অর্থের বিনিময়েও নয় এবং যার পূর্বে একটা তালাক দেয়া হয়েছে অথবা মোটেই দেয়া হয়নি, সেই তালাককে রজয়ি অর্থাৎ প্রত্যাহারযোগ্য তালাক বলা হয়। এই তালাক স্পষ্টভাষায় দেয়া হোক বা ইংগিতপূর্ণ ভাষায় দেয়া হোক তাতে কিছু যায় আসেনা। আর যদি বিয়ের পর তার সাথে সহবাস না করে থাকে, কিংবা কোনো অর্থের বিনিময়ে তালাক দিয়ে থাকে অথবা ইতিপূর্বে দুই তালাক দেয়ার পর তৃতীয়বার তালাক দেয়, তাহলে সেই তালাক হবে বায়েন তালাক। মিশরি আইনের ১৯২৯ সালের ২৫ (৫) নং ধারায় বলা হয়েছে :

"তিন তালাক পূর্ণকারী তালাক (অর্থাৎ তৃতীয় তালাক), সহবাসের পূর্বে দেয়া তালাক, অর্থের বিনিময়ে দেয়া তালাক এবং এই আইনে ও ১৯২০ সালের আইনে যাকে বায়েন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, সেই তালাক ব্যতীত সকল তালাকই রজয়ি তালাক। এই দুটি আইনে যে তালাককে বায়েন আখ্যায়িত করা হয়েছে, তা হচ্ছে স্বামীর কোনো ত্রুটি। তার নিখোঁজ থাকা, তার বন্দী থাকা কিংবা কোনো ক্ষতির কারণে দেয়া তালাক। এ সম্পর্কে আল্লাহর নিম্নোক্ত উক্তিতে মূলনীতি ঘোষিত হয়েছে :

"তালাক দু'বার। এরপর হয় ন্যায়সংগতভাবে বহাল রাখা হবে, নচেত সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে বিদায় করা হবে।" (আল বাকারা, আয়াত ২২৯)

অর্থাৎ আল্লাহ্ যে তালাক শরিয়তসিদ্ধ করেছেন, তা একবারের পর আর একবার হতে পারে। স্বামীর জন্য প্রথম তালাকের পরও ন্যায়সংগতভাবে বহাল রাখার অর্থ তালাক প্রত্যাহার করা, স্ত্রীকে বৈবাহিক বন্ধনে পুনর্বহাল করা এবং তার সাথে উত্তম আচরণ করা। তালাক রজয়ি না হলে স্বামীর পক্ষে এসব করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্ বলেন :

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ؕ

অর্থ : আর তালাকপ্রাপ্তা নারী তিন হায়েয পর্যন্ত নিজেকে প্রতীক্ষারত রাখবে। তার জরায়ুতে আল্লাহ্ যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন রাখা তাদের পক্ষে বৈধ নয়, যদি তারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী হয়। আর যদি তারা আপোস করতে চায় তবে ঐ সময়ে তাদের ফিরিয়ে নিতে তাদের স্বামীদের অগ্রাধিকার রয়েছে। (আল বাকারা : আয়াত ২২৭)

অবশ্য তিন তালাকের সাথে রজয়ি তালাকের যে পার্থক্য, তা পবিত্র কুরআন দ্বারাই প্রমাণিত। নিম্নে তা তুলে ধরা হচ্ছে :

তৃতীয় তালাক স্ত্রীকে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বামীর জন্য তাকে হারাম করে দেয়। তৃতীয় তালাকের পর স্ত্রীর সাথে অন্য পুরুষের বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত এবং স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সেই স্বামী থেকে বিচ্ছেদ প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রথম স্বামীর পক্ষে তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনা বৈধ নয়। এমনকি প্রথম স্বামীর জন্য তাকে হালাল করার উদ্দেশ্যে বিয়ে হলে সেই বিয়ে দ্বারাও উক্ত স্ত্রী প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হয়না। আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন :

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَاتَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ط

"এরপর (দুই তালাকের পর) যদি স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাহলে সেই স্ত্রী যতক্ষণ অন্য স্বামীকে বিয়ে না করবে, ততক্ষণ তার জন্য হালাল হবেনা"। অর্থাৎ যতক্ষণ বিশুদ্ধভাবে তথা শর্তহীনভাবে বিয়ে না করবে। আর বিয়ের পর সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে তাতেও স্ত্রী স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কেননা এক্ষেত্রে তালাকপ্রাপ্তাকে কোনো ইদ্দত পালন করতে হয়না। আর তালাক প্রত্যাহারের সুযোগ তো শুধু ইদ্দতকালেই সীমাবদ্ধ। ইদ্দত যখন নেই, তখন প্রত্যাহারের সুযোগও নেই। আল্লাহ বলেন :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ج فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا○

"হে মুমিনগণ, তোমরা যখন মুমিন নারীদের বিয়ে করবে অতপর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দেবে, তখন আর তাদেরকে কোনো ইদ্দত পালন করতে হবেনা। অতএব তাদেরকে কিছু ব্যবহার্য সামগ্রী উপহার দিও এবং সুন্দরভাবে বিদায় দিও।" (আহযাব : ৪৯)

তবে সহবাসের পূর্বে তালাক প্রাপ্তা ও নির্জনবাসের পর তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী বিচ্ছিন্ন তথা বায়েন তালাকপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। কিন্তু সতর্কতার খাতিরে তার ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব, তালাক প্রত্যাহারের জন্য নয়। আর যখন কোনো স্ত্রী স্বামীকে কিছু অর্থ দিয়ে তার বিনিময়ে তালাক গ্রহণ করে তখন সে বায়েন তালাকপ্রাপ্ত হয়। কেননা সে তার কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যেই তাকে অর্থ প্রদান করেছে। এ তালাক যদি বায়েন না হতো, তাহলে এই মুক্তি অর্জিত হতোনা। আল্লাহ বলেন :

فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ لا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ط

"আর যদি তোমরা আশংকা করো যে, স্বামী স্ত্রী আল্লাহর সীমা রক্ষা করবেনা, তাহলে স্ত্রী মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত হতে চাইলে তাতে দোষের কিছু নেই।" (আল বাকারা : ২২৯)

রজয়ি তালাকের বিধান :

রজয়ি তালাক স্ত্রীর সাথে যৌন সংগমে বাধা দেয়না। কেননা ওটা বিয়ের বন্ধনকে ছিন্ন করেনা। স্ত্রীর ওপর স্বামীর দাম্পত্য অধিকার ক্ষুণ্ন করেনা এবং তার বৈধতাকে ব্যাহত করেনা। এটা যদিও বিচ্ছেদের একটা কারণ, কিন্তু তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর ইদ্দতকালে এর কোনো কার্যকারিতা থাকেনা। তালাক প্রত্যাহার না করলে ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পরই তা কার্যকর হয়। যতক্ষণ ইদ্দত অব্যাহত থাকবে, স্ত্রীর খোরপোষ দিতে স্বামী বাধ্য থাকবে, সে তালাক দিলে তা কার্যকর হবে। একইভাবে কার্যকর হবে যেহার ও ইলা এবং এই সময়ে দুজনের কোনো একজন মারা গেলে অপরজন তার উত্তরাধিকারী হবে। আর মৃত্যু ও তালাক এই দুটোর যে কোনো একটি পর্যন্ত যে মহরেরর মেয়াদ নির্দিষ্ট রয়েছে, সেই মোহর রজয়ি তালাক দ্বারা প্রাপ্য হয়না। কেবল ইদ্দত শেষ হওয়ার পর অবশিষ্ট মোহর প্রাপ্য হয়। তালাক প্রত্যাহারের অধিকার সমগ্র ইদ্দতব্যাপী একচ্ছত্রভাবে স্বামীর। এ অধিকার শরিয়ত স্বয়ং তাকে দিয়েছে। সে নিজে এ অধিকার রহিত করলে রহিত হবেনা। সে যদি বলেও আমি তালাক প্রত্যাহারের অধিকার রহিত করলাম। তবুও তার এ বক্তব্য প্রত্যাহার ও স্ত্রীর তালাক প্রত্যাহারের অধিকার থাকবে। কেননা আল্লাহ বলেছেন,

তাদের স্বামীরা তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার সবচেয়ে বেশি অধিকার রাখে। আর তালাক প্রত্যাহার করা যখন স্বামীর অধিকার, তখন এতে স্ত্রীর সম্মতি ও অবগতি শর্ত নয়। এজন্য কোনো অভিভাবক ও সাক্ষী রাখারও প্রয়োজন নেই। অবশ্য সাক্ষী রাখা মুস্তাহাব। কেননা পরবর্তীকালে স্বামীর তালাক প্রত্যাহারের কথা অস্বীকার করার আশংকা থাকে। আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা দু'জন ন্যায়পরায়ন লোককে সাক্ষী রাখো।" তালাক প্রত্যাহার কথা দ্বারাও বৈধ, যেমন 'আমি তোমাকে দেয়া তালাক প্রত্যাহার করলাম' বলা। আবার কাজ দ্বারাও প্রত্যাহার করা বৈধ, যেমন সহবাস, বা তার ভূমিকাসমূহ যথা চুম্বন ও কামাবেগ সহকারে আলিঙ্গন ইত্যাদি। ইমাম শাফেয়ির মতে, শুধুমাত্র সুস্পষ্ট কথা দ্বারাই তালাক প্রত্যাহার করা বৈধ। সহবাস বা প্রাগ-সহবাস, চুম্বন ও আলিঙ্গন ইত্যাকার কার্যকলাপ দ্বারা নয়। তারমতে তালাক মাত্রই বিয়ের অবসান ঘটায়।

ইবনে হাযম রহ. বলেছেন, স্বামী যদি সহবাস করে, তবে তা দ্বারা সে তালাক প্রত্যাহারকারী হবেনা, যতক্ষণ না দুজন সাক্ষীর সামনে প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয় এবং স্ত্রীকে তার ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে না জানায়। সাক্ষীর সামনে প্রত্যাহারের ঘোষণা না দিলে প্রত্যাহারকারী হবেনা। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ○

"তারপর যখন স্ত্রীরা ইদ্দত সমাপ্ত করবে, তখন তাদেরকে হয় সুন্দরভাবে বহাল রাখো, নতুবা সদয়ভাবে বিদায় করো এবং তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ন ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখো।" দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ্ তালাক দেয়া, তালাক প্রত্যাহার করা ও সাক্ষী রাখার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। কাজেই এর একটিকে অপরটি থেকে আলাদা করা বৈধ হবেনা। তাই যে ব্যক্তি দু'জন ন্যায়পরায়নব্যক্তিকে সাক্ষী না রেখে তালাক দেবে, অথবা দুজন ন্যায়পরায়ন ব্যক্তিকে সাক্ষী না রেখে তালাক প্রত্যাহার করবে, সে আল্লাহ্‌র বিধান লংঘনকারী হবে। রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে, যা আমাদের বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তা প্রত্যাখ্যাত। আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্, বায়হাকি ও তাবরানি ইমরান বিন হুসাইন থেকে বর্ণনা করেছেন :

"তাকে (ইমরান বিন হুসাইন রা.কে) সেই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, তারপর তার সাথে সহবাস করে, অথচ তালাক ও তালাক প্রত্যাহারের উপর কাউকেও সাক্ষী রাখেনা। তিনি বললেন, তালাকও হয়েছে সুন্নতের পরিপন্থি। তালাক প্রত্যাহারও হয়েছে সুন্নতের পরিপন্থি। স্ত্রীর তালাকে ও তালাক প্রত্যাহারে সাক্ষী রাখো এবং এমন কাজ পুনরায় করোনা।"

শওকানি বলেছেন, প্রথম যুগের মনীষীগণ যা বলেছেন, সেটাই সঠিক, কেননা ইদ্দত হলো, সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার সময়। আর এই পুনর্বিবেচনা কথা ও কাজ উভয়ভাবেই করা যায়। তাছাড়া আল্লাহ্ যে বলেছেন, "তাদের স্বামীদের স্ত্রীদের ফিরিয়ে আনার অগ্রাধিকার রয়েছে" এবং রসূলুল্লাহ্ সা. কর্তৃক উমর রা.কে বলা, 'তাকে আদেশ দাও তালাক প্রত্যাহার করুক' দ্বারা স্পষ্টতই বুঝা যায়, কাজ দ্বারাও তালাক প্রত্যাহার করা বৈধ। কেননা রসূল সা. কথা বা কাজকে নির্দিষ্ট করেননি। যিনি নির্দিষ্ট করার দাবি করবেন, তাকে প্রমাণ দর্শাতে হবে। (নাইলুল আওতার, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২১৪ পৃ.)

রজয়ি তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর সাথে স্বামীর সম্পর্ক :

আবু হানিফা বলেছেন, রজয়ি তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর জন্য সাজসজ্জা করা, সুগন্ধী লাগানো, তাকে উঁকি দিয়ে দেখা, অলংকার পরা, তার সামনে আঙ্গুল প্রকাশ করা ও চোখে সুর্মা লাগিয়ে তা প্রকাশ করা জায়েয। তবে কাশি দিয়ে বা জুতোর শব্দ করে বা অন্য কোনো কথা বা আচরণ দ্বারা স্ত্রীকে অবহিত না করে তার কাছে যাওয়া স্বামীর জন্য বৈধ নয়। ইমাম শাফেয়ির মতে, রজয়ি তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী তালাকদাতার জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম। ইমাম মালেক বলেন, ঐ স্ত্রীর সাথে নিভৃতে সাক্ষাৎ ও তার কাছে যাওয়া তার অনুমতি ছাড়া জায়েয নেই। তার চুলের দিকেও তাকানো জায়েয নেই। তবে স্ত্রীর সাথে অন্য কেউ থাকলে তার সাথে একত্রে পানাহার জায়েয। কিন্তু পরবর্তীকালে ইমাম মালেক এক সাথে খাওয়া দাওয়াকে অবৈধ বলে আখ্যায়িত করেন।

রজয়ি তালাক তালাকের সংখ্যা কমায় :

স্বামী তার স্ত্রীকে যতগুলো তালাক দেয়ার ক্ষমতা রাখে, রজয়ি তালাক তার সংখ্যা কমিয়ে দেয়। এটা যদি প্রথম তালাক হয়, তবে তার জন্য আর দুটো তালাকের সুযোগ অবশিষ্ট থাকবে। আর যদি এটা দ্বিতীয় তালাক হয়, তবে একটা তালাক অবশিষ্ট থাকবে । এরপর সে যদি স্ত্রীকে দেয়া তালাক প্রত্যাহার করে, তাহলেও এর প্রভাব বিলুপ্ত হবেনা। বরঞ্চ তাকে যদি ঐ অবস্থায় রেখে দেয়া হয়, প্রত্যাহার ব্যতীতই ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে যায়, অতপর সে অন্য স্বামীকে বিয়ে করে এবং তারপর প্রথম স্বামীর নিকট ফিরে যায়, তবে সে অবশিষ্ট তালাকগুলো ফিরে পাবে। দ্বিতীয় স্বামী তার উপর পতিত কোনো তালাক নষ্ট করতে পারেনা। কেননা এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে দুই তালাক দিয়েছিল। তারপর ইদ্দত অতিবাহিত হলো এবং সে মহিলা অন্য স্বামীকে বিয়ে করে তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তারপর আবার প্রথম স্বামীকে বিয়ে করলো। এ ঘটনা উমর রা.কে জানানো হলে তিনি বললেন, সে প্রথম স্বামীর নিকট অবশিষ্ট তালাকসহই গিয়েছে। আলি, মুয়ায, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব ও হাসান বসরীর অভিমতও তদ্রূপ।

বায়েন তালাক

আমরা পূর্বেই তিন তালাকের শেষ তালাক সহবাসের পূর্বে দেয়া তালাক এবং অর্থের বিনিময়ে দেয়া তালাক বায়েন তালাক। ইবনে রুশদ বিদায়াতুল মুজতাহিদ নামক গ্রন্থে বলেছেন :

"বায়েন তালাক সম্পর্কে ফকিহগণ একমত যে, তালাক বায়েন হয় তিন অবস্থায় সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে, তালাকের সংখ্যা অনুপাতে এবং খুলা তালাকে বিনিময় দিলে। তবে খুলা কি তালাক, না বিয়ে বাতিলকরণ সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ফকিহগণ এ বিষয়ে একমত যে, স্বাধীন নারীর তালাককে যে সংখ্যা বায়েন তালাকে পরিণত করে, তা হচ্ছে তিন তালাক, যদি তা আলাদা আলাদাভাবে দেয়া হয়। কেননা আল্লাহ বলেছেন, তালাক দু'বার ----

ইবনে হাযমের মতে, বায়েন তালাক হচ্ছে শুধু তিন তালাকের শেষেরটি। অথবা সহবাসের পূর্বে দেয়া তালাক। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর দীনে আল্লাহর পক্ষ থেকে বা রসূল সা.-এর পক্ষ থেকে অপ্রত্যাহারযোগ্য বায়েন তালাক পাই শুধু এক সাথে বা আলাদাভাবে দেয়া তিন তালাক, কিংবা যে তালাকের পূর্বে সহবাস করা হয়নি। এছাড়া আর যা কিছু আছে, তার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই।" (আল মুহাল্লা, ১০ম খণ্ড, ২১৬, ২৪০ পৃ.) এছাড়া

পারিবারিক আইনে স্বামীর খুতের কারণে, তার নিরুদ্দেশ থাকার কারণে, তার বন্দী থাকার কারণে বা ক্ষতির কারণে যে তালাক দেয়া হয়, তাকেও বায়েন তালাক বলে অভিহিত করা হয়েছে।

বায়েন তালাকের প্রকারভেদ :

বায়েন তালাক দুই প্রকার : ছোট বায়েন তালাক। এটা হচ্ছে তিন তালাকের কম। আর বড় বায়েন তালাক। এটা হচ্ছে তিন তালাকের শেষ তালাক।

ছোট বায়েন তালাকের বিধান :

ছোট বায়েন তালাক ঘোষিত হওয়া মাত্রই তা দাম্পত্য বন্ধনকে ছিন্ন করে দেয়। আর দাম্পত্য বন্ধন ছিন্ন হওয়ার কারণে তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী তার স্বামীর কাছে একজন বেগানা নারী বা পরনারী হিসেবে গণ্য হয়। তাই স্বামীর জন্য ঐ স্ত্রীর সাথে সহবাস করা বৈধ থাকেনা। আর ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার আগে বা পরে দু'জনের একজন মারা গেলে অপরজন তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেনা। বায়েন তালাক দেয়া মাত্রই মৃত্যু বা তালাক, যেটি পরে সংঘটিত হয়, সেটি পর্যন্ত বিলম্বিত অবশিষ্ট মোহর পরিশোধ করার সময় সমাগত হয়।

ছোট বায়েন তালাক দেয়া স্ত্রীকে নতুন মোহরসহ নতুন আকদ করে ঘরে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার স্বামীর রয়েছে। এক্ষেত্রে স্ত্রীর অন্য স্বামীর সাথে বিয়ে হওয়ার প্রয়োজন নেই। আর যখন স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবে, তখন সে অবশিষ্ট তালাকগুলো সহই স্বামীর নিকট ফিরে যাবে। স্বামী যদি ইতিপূর্বে তাকে এক তালাক দিয়ে থাকে, তাহলে ঘরে ফেরার পর স্ত্রীকে আরো দুই তালাক দেয়ার অধিকার স্বামীর থাকবে। আর যদি দুই তালাক দিয়ে থাকে, তাহলে স্বামীর আর মাত্র একটি তালাক দেয়ার অধিকার থাকবে অর্থাৎ যদি কখনো তালাক দিতে চায় তবে।

বড় বায়েন তালাকের বিধান :

ছোট বায়েন তালাকের মতো বড় বায়েন তালাকও দাম্পত্য বন্ধন ছিন্ন করে। অন্য সমস্ত বিধান একই রকম। পার্থক্য শুধু এই যে, বড় বায়েন তালাক দেয়ার পর স্ত্রীর অন্য স্বামীর সাথে বিশুদ্ধভাবে বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীকে ঘরে ফিরিয়ে নেয়া স্বামীর জন্য বৈধ নয়। অন্য স্বামীর সাথে তাহলীলের ইচ্ছা ছাড়াই বিয়ে হওয়া চাই এবং তার সাথে সহবাস সম্পন্ন হওয়া চাই। কেননা আল্লাহ বলেছেন :

"এরপর যদি স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাহলে সে আর স্বামীর জন্য বৈধ হবে না যতক্ষণ অন্য স্বামীর সাথে তার বিয়ে না হয়।" অর্থাৎ দুই তালাকের পর যদি স্বামী তাকে তৃতীয় তালাক দেয়, তাহলে তিন তালাক বায়েন সম্পন্ন হওয়ার পর ঐ স্ত্রী আর তার জন্য বৈধ হবেনা, যতক্ষণ অন্য স্বামীর সাথে তার বিশুদ্ধভাবে বিয়ে সম্পন্ন না হয়। রসূলুল্লাহ সা. রিফায়ার স্ত্রীকে বলেছিলেন : "তুমি তোমার প্রথম স্বামীর নিকট ততক্ষণ ফিরে যেতে পারবেনা যতক্ষণ দ্বিতীয় স্বামী তোমাকে পূর্ণ তৃপ্তিসহকারে উপভোগ না করবে এবং তুমিও তাকে পূর্ণ তৃপ্তিসহকারে উপভোগ না করবে।" অর্থাৎ স্বাভাবিক নিয়মে সহবাস না করবে। -বুখারি, মুসলিমঐ

দ্বিতীয় স্বামী কি প্রথম স্বামীর তালাকের সুযোগ নষ্ট করে দেয়?

এটা সর্বসম্মত মত যে, বড় বায়েন তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী যখন অন্য স্বামীকে বিয়ে করে, তারপর তালাকপ্রাপ্ত হয় এবং ইদ্দতের পর প্রথম স্বামীর নিকট ফিরে আসে, তখন সে সম্পূর্ণ নতুন

বৈবাহিক বন্ধনসহকারে ফিরে আসে এবং প্রথম স্বামী তার উপর তিনটে তালাক দেয়ার অধিকার লাভ করে। কেননা দ্বিতীয় স্বামী প্রথম বৈবাহিক বন্ধনের অবসান ঘটিয়েছে। এরপর সে যখন নতুন আকদের মাধ্যমে প্রথম স্বামীর নিকট ফিরে এসেছে তখন এই আকদ একটা নতুন বৈবাহিক বন্ধন ও একটা নতুন দাম্পত্য সৃষ্টি করেছে।

পক্ষান্তরে ছোট বায়েন তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী যখন ইদ্দত শেষে অন্য পুরুষকে বিয়ে করে তারপর সেখান থেকে তালাকপ্রাপ্ত হয় এবং প্রথম স্বামীর নিকট ফিরে আসে, তখন সে বড় বায়েন তালাকপ্রাপ্ত নারীর মতো হয়ে যায়। তার কাছে নতুন দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং তার উপর তার স্বামী নতুনভাবে তিন তালাকের অধিকারী হয়। এটা আবু হানিফা ও আবু ইউসুফের অভিমত। তবে ইমাম মুহাম্মদ বলেছেন, যে কটি তালাক বাকি আছে, সে কটির অধিকারী হয়। ফলে সে হয়ে যায় রজয়ি তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর মতো অথবা ছোট বায়েন তালাক পাওয়ার পর নতুনভাবে বৈবাহিক বন্ধনে আবব্ধ স্ত্রীর মতো। অবশ্য ইমাম মুহাম্মদের এই অভিমত হানাফি মাযহাবে প্রায় প্রত্যাখ্যাত।

মৃত্যুশয্যা থেকে দেয়া তালাক

কুরআন ও সুন্নাহ থেকে এ বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, মৃত্যুশয্যা থেকে তালাক দেয়া হলে তার ফল কি হবে? তবে সাহাবিগণ থেকে জানা যায় যে, আব্দুর রহমান বিন আওফ রা. যে রোগে মারা গিয়েছিলেন সেই রোগশয্যা থেকে তার স্ত্রী 'তামাযার'কে তালাক দিয়েছিলেন। সে তালাক ছিলো তৃতীয় তালাক। উসমান রা. তার সেই স্ত্রীকে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে উত্তরাধিকার প্রদান করেছিলেন। উসমান রা. বললেন, "আমি আব্দুর রহমানকে অভিযুক্ত করছিনা যে, সে তার স্ত্রীকে নিজের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চেয়েছে। আমি শুধু সুন্নত অনুসরণ করতে চেয়েছি।" শোনা যায়, ইবনে আওফ নিজেও বলেছিলেন, আমি তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা বা বঞ্চিত করার জন্য তালাক দেইনি। অর্থাৎ স্ত্রীর উত্তরাধিকার পাওয়ার অধিকার তিনি অস্বীকার করেননি। স্বয়ং উসমান রা.-এর জীবনেও এরূপ ঘটনা ঘটেছে যে, তিনি যখন বিদ্রোহীদের দ্বারা নিজ বাড়িতে ঘেরাও হয়ে পড়েন, তখন তার স্ত্রী উম্মুল বানীনকে তালাক দেন। পরে যখন উসমান ঐ অবস্থায় শহীদ হলেন, তখন উম্মুল বানীন আলীর নিকট গেলেন এবং সব খবর অবহিত করলেন। আলী রা. তাকে তার উত্তরাধিকার প্রদান করলেন এবং বললেন, উসমান তার স্ত্রীকে পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখেছিলেন। তারপর যখন মৃতুর নিকটবর্তী হলেন, তখন তার সাথে সম্পর্ক ছেদ করলেন। এ কারণে ফকিহগণ যে রোগে কারো মৃত্যু হয় সেই রোগে আক্রান্ত থাকাকালে তালাক দিলে কি হবে সে সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের মতামত দিয়েছেন। হানাফিগণ বলেছেন, কোনো রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে বায়েন তালাক দেয়, অতপর সেই রোগে সে মারা যায়, তবে সে মহিলা তার উত্তরাধিকার পাবে। যদি ইদ্দত শেষ হওয়ার পর মারা যায় তাহলে স্ত্রী উত্তরাধিকার পাবেনা। একই বিধান কার্যকর হবে, যে কারো সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, অথবা কিসাস বা রজমের দায়ে যাকে হত্যার জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় নেয়া হয়েছে, সে যদি ঐ কারণে মারা যায় বা নিহত হয়। আর যদি স্ত্রীর অনুরোধেই তাকে তিন তালাক দেয়, কিংবা তাকে বলে, তুমি যা ইচ্ছা করতে পারো। এরপর স্ত্রী নিজেকে বিবাহের বন্ধন থেকে মুক্ত করে বা খুলা তালাক নেয়, তারপর স্ত্রী ইদ্দতে থাকাকালে স্বামী মারা যায়, তাহলে স্ত্রী স্বামীর উত্তরাধিকার পাবেনা। উল্লিখিত দুটি অবস্থার মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথম অবস্থায় রোগীর পক্ষ থেকেই তালাক দেয়া

হয়েছে, এবং সে সময় রোগী সচেতন যে, সে তাকে তার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যেই তালাক দিয়েছে। তাই সে নিজের ইচ্ছার পরিপন্থি কাজ করে এবং স্ত্রীর জন্য তার উত্তরাধিকার নিশ্চিত করে। বস্তুত এ কারণেই এ তালাককে বঞ্চনার তালাক বলা হয়। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় অবস্থায় যে তালাক দেয়া হয় তাতে কোনো বঞ্চনার সুযোগ নেই। কেননা স্ত্রী নিজেই এজন্য অনুরোধ করেছে এবং স্বাধীনভাবে গ্রহণ করেছে। অনুরূপ, যে ব্যক্তি আটক বা অবরুদ্ধ থাকে, কিংবা সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত থাকে এবং সেই অবস্থায় নিজ স্ত্রীকে বায়েন তালাক দেয়, তার বিধানও তদ্রূপ। আহমদ ও ইবনে আবি লায়লা বলেন, ইদ্দতের পর অন্য কোনো স্বামীকে বিয়ে না করা পর্যন্ত সে উত্তরাধিকার পাবে। মালেক ও লায়েস বলেন, ইদ্দতে থাক বা না থাক এবং অন্য পতিকে বিয়ে করুক বা না করুক, সে উত্তরাধিকার পাবে। শাফেয়ি বলেন, উত্তরাধিকার পাবেনা।

'বিদায়াতুল মুজাতাহিদ' গ্রন্থে বলা হয়েছে, স্ত্রীর ক্ষতি সাধনের পথ বন্ধ করা ওয়াজিব কিনা, এ ব্যাপারে মতভেদের কারণেই মতের এই বিভিন্নতা। কেননা যখন রোগীকে অভিযুক্ত করা হয় যে সে নিজের রোগাবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দিচ্ছেই তাকে তার উত্তরাধিকারের অংশ থেকে বঞ্চিত করার জন্য, তখন যারা স্ত্রীর ক্ষতি সাধনের পথ বন্ধ করা ওয়াজিব মনে করেন, তাদের মতে স্ত্রী উত্তরাধিকার পাবে। আর যারা মনে করেন, ক্ষতি সাধনের পথ বন্ধ করা ওয়াজিব নয়, তারা স্ত্রীর জন্য উত্তরাধিকার প্রাপ্য মনে করেননা। কেননা এই গোষ্ঠীটির মত হলো :

তালাক যদি সংঘটিত হয়েই থাকে, তাহলে তা তার সকল বিধিবিধান সহকারেই সংঘটিত হবে। কেননা তারা বলেন, স্ত্রী মারা গেলে স্বামী তার উত্তরাধিকারী হয়না। আর যদি তালাক সংঘটিত না হয়ে থাকে, তাহলে তো দাম্পত্য বন্ধন তার যাবতীয় বিধি-বিধানসহ অক্ষুণ্নই রয়েছে।

তাদের প্রতিপক্ষকে দুইটি উত্তরের যে কোনো একটি বেছে নিতে হবে। কেননা এমন কথা বলা অত্যন্ত কঠিন যে, শরিয়তে এমন তালাকেরও সুযোগ রয়েছে, যাতে তালাকের কিছু বিধান এবং দাম্পত্য সম্পর্কের কিছু বিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর চেয়েও কঠিন হলো, শুদ্ধ ও অশুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য আছে একথা বলা। কেননা এটা এমন তালাক হবে যার বিধান ততক্ষণ পর্যন্ত জানাই যাবেনা যতক্ষণ তা শুদ্ধ না অশুদ্ধ, তা স্পষ্ট হবে।

শরীয়তে এ ধরনের কোনো বক্তব্যই দেয়ার অবকাশ নেই। অবশ্য যারা বলেন, ইদ্দতকালে স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রী তার উত্তরাধিকার পাবে। তারা একথা বলেন, এজন্য যে, ইদ্দত তাদের নিকট দাম্পত্য জীবনের অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে এটিকে তারা রজয়ি তালাকের মতো মনে করেন এবং উমর রা. ও আয়েশা রা.-এর অভিমতও এরূপ বলে বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা স্ত্রীকে উত্তরাধিকার দেয়ার জন্য ইদ্দতের পর অন্য স্বামীকে বিয়ে না করার শর্ত আরোপ করেছেন, তাদের এরূপ শর্ত আরোপের কারণ হলো, একজন মহিলার দুজন স্বামীর উত্তরাধিকারী হওয়া বৈধ নয় এ ব্যাপারে মুসলমানদের ইজমা রয়েছে। এর আরো একটা কারণ হলো, যারা উত্তরাধিকারের পক্ষে মত দিয়েছেন, তারা অভিযোগকেই এর কারণ বলে আখ্যায়িত করেছেন, কিন্তু স্ত্রী স্বয়ং যখন তালাকের দাবি জানায় অথবা স্বামী তাকে নিজের উপর তালাক কার্যকর করার ক্ষমতা প্রদান করে এবং তদানুযায়ী সে নিজের উপর তালাক কার্যকর করে, তখন ফকিহদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। আবু হানিফা বলেন, স্ত্রী এক্ষেত্রে আদৌ কোনো উত্তরাধিকার পাবেনা। আওযায়ী তালাক দেয়া ও তালাকের

ক্ষমতা অর্জনে পার্থক্য করেছেন। তার মতে, ক্ষমতা প্রদানের ক্ষেত্রে স্ত্রী উত্তরাধিকার পাবেনা, কিন্তু তালাকের ক্ষেত্রে পাবে। ইমাম মালেকের নিকট তালাক ও তালাকের ক্ষমতা প্রদান উভয় ক্ষেত্রে একই বিধান। তবে তিনি বলেন, স্ত্রী মারা গেলে স্বামী তার উত্তরাধিকার পাবেনা, কিন্তু স্বামী মারা গেলে স্ত্রী তার উত্তরাধিকার পাবে। কিন্তু এটা শরিয়তের মূলনীতির পরিপন্থি। (বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ২/৮৬-৮৭)

ইবনে হাযম বলেন, "রোগী কর্তৃক তালাক প্রদান সুস্থ লোকের তালাক প্রদানের মতোই, চাই সেই রোগে তার মৃত্যু হোক বা না হোক। রোগীর দেয়া তালাক যদি তিন তালাক হয় কিংবা তিন তালাকের শেষ তালাক হয়, কিংবা সহবাসের পূর্বে দেয়া তালাক হয়, অতপর ইদ্দত শেষ হওয়ার পরে বা আগে দু'জনের একজন মারা যায়, অথবা যদি রজয়ি তালাক হয় এবং তা আর প্রত্যাহৃত না হয়, শেষ পর্যন্ত দু'জনের একজন ইদ্দত শেষে মারা যায়, তাহলে এসব ক্ষেত্রে স্ত্রীও স্বামীর কোনো উত্তরাধিকার পাবেনা, স্বামীও স্ত্রীর উত্তরাধিকার পাবেনা। সুস্থ স্বামী কর্তৃক রুগ্ন স্ত্রীকে এবং রুগ্ন স্বামী কর্তৃক রুগ্ন স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ক্ষেত্রে একই বিধান। দুটিতে কোনোই পার্থক্য নেই। অনুরূপ যাকে হত্যার জন্য আটকে রাখা হয়েছে তার দেয়া তালাক এবং গর্ভবতীকে দেয়া তালাকও একই পর্যায়ের। তবে এক্ষেত্রে ফকিহদের যথেষ্ট মতভেদ হয়েছে। (আল মুহাল্লা, ১০/২২৩)

স্ত্রীকে বা অন্য কাউকে তালাকের ক্ষমতা প্রদান

তালাক স্বামীর একটা অধিকার। সে ইচ্ছে করলে নিজেও স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে, স্ত্রীকেও নিজের উপর তালাক কার্যকর করার ক্ষমতা দিতে পারে। তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকেও তালাক দেয়ার জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে পারে। এই দুটি কাজের যেটিই সে করুক, স্ত্রীকে বা অন্য কাউকে তালাকের ক্ষমতা প্রদান করুক, তা তার নিজের ক্ষমতাকে কিছুমাত্র খর্ব করে না এবং যখন ইচ্ছা তা প্রয়োগে বাধা দেয়না। যাহেরি মাযহাব এ মতের বিরোধী। তাদের মতে, স্ত্রীকে বা অন্য কাউকে তালাকের ক্ষমতা দেয়া স্বামীর জন্য বৈধ নয়। ইবনে হাযম বলেছেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নিজের উপর তালাক কার্যকর করার ক্ষমতা অর্পণ করে, ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি তার ক্ষমতা প্রয়োগ করলে তা বাধ্যতামূলকভাবে প্রযোজ্য হবেনা এবং স্ত্রীর উপর তালাক কার্যকর হবেনা, চাই সে নিজেকে তালাক দিক বা না দিক। কেননা আল্লাহ তালাক দেয়ার ক্ষমতা দিয়েছেন পুরুষদের স্ত্রীদেরকে নয়।

স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা দানের ভাষা :

স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বাক্যসমূহ ব্যবহৃত হয়ে থাকে :

১. "তোমার পথ তুমি দেখো", বা "তোমার ভবিষ্যৎ তুমি বেছে নাও" বা "তুমি নিজেকে স্বাধীন মনে করো"।

২. "তোমার কর্তৃত্ব তোমার হাতে।"

৩. "ইচ্ছা করলে তুমি নিজেকে তালাক দাও।"

এই তিন রকমের ভাষার প্রত্যেকটি প্রয়োগের ব্যাপারে ফকিহদের বিভিন্ন রকমের মতামত রয়েছে। এই মতগুলো সংক্ষেপে নিম্নে তুলে ধরছি :

১. তোমার পথ তুমি দেখো বা তোমার ভবিষ্যৎ তুমি বেছে নাও : এ বাক্য প্রয়োগ দ্বারা তালাক কার্যকর হয় বলে ফকিহগণ মত দিয়েছেন। কেননা শরিয়ত যে সকল বাক্যকে তালাকের বাক্য বলে চিহ্নিত করেছে, এটি তার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বলেন :

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ۝ وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

অর্থ : হে নবী, তোমার স্ত্রীদের বলো : তোমরা যদি ইহকালীন জীবন ও তার সৌন্দর্য চাও, তাহলে এসো, আমি তোমাদের ভোগের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেই এবং তোমাদেরকে ভালোভাবে বিদায় করে দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আখেরাতকে চাও, তাহলে আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যারা সৎ কর্মশীল, তাদের জন্য বিপুল প্রতিদান নির্ধারণ করে রেখেছেন। (আল আহযাব : আয়াত ২৮-২৯)

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসূল (সা) আয়েশার নিকট গেলেন এবং বললেন, "আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তার রসূলের মুখ দিয়ে তোমার নিকট একটি বিষয় উল্লেখ করছি। কাজেই তুমি এ ব্যাপারে তোমার পিতামাতার অনুমতি না নিয়ে তাড়াহুড়ো করোনা।" আয়েশা (রা) বললেন, হে রসূলুল্লাহ! সে বিষয়টি কি? তখন রসূলুল্লাহ সা. আয়াত দুটি পড়ে শুনালেন। আয়েশা রা. বললেন : হে রসূলুল্লাহ, আপনার সম্পর্কে আমি আমার পিতামাতার অনুমতি নেব? বরঞ্চ আমি আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আখেরাতকে চাই। আর আমার অনুরোধ, আপনি আমাকে যা বললেন, তা আপনার আর কোনো স্ত্রীকে বলবেন না।" রসূলুল্লাহ সা. বললেন, "তুমি আমাকে এ অনুরোধ করোনা। আমি তাদের প্রত্যেককে এটা জানাবোই।" এরপর রসূল সা.-এর সকল স্ত্রী আয়েশার মতোই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন। তাদের প্রত্যেকেই আল্লাহ তার রসূল ও পরকালকে প্রাধান্য দিলেন।"

বুখারি মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেন, আয়েশা রা. বলেছেন, "রসূলুল্লাহ সা. আমাদেরকে স্বাধীন ক্ষমতা দিয়েছিলেন, তারপর আমরা তাকেই গ্রহণ করেছিলাম। তাই তিনি এতে কিছু মনে করেননি। মুসলিমের বর্ণনা হলো, রসূলুল্লাহ সা. তার স্ত্রীদেরকে স্বাধীন ক্ষমতা দিয়েছিলেন। এতে তালাক হয়নি।" এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তারা যদি নিজেদেরকে স্বাধীন বলে গ্রহণ করতেন, তাহলে সেটা তালাকে পর্যবসিত হতো এবং এ শব্দটা তালাক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

যাহেরি মাযহাবের অভিমত হলো, রসূলের স্ত্রীগণ যদি নিজেদেরকে স্বাধীন বলে গ্রহণ করতেন, তাহলে রসূল সা. তাদেরকে তালাক দিয়ে দিতেন। নিছক তাদের নিজেদেরকে স্বাধীন বলে গ্রহণ করাতেই তালাক হয়ে যেত না।

যাহেরি ফকিহগণ ব্যতিত অন্য কোনো ফকিহ এ ব্যাপারে দ্বিমত প্রকাশ করেননি। এখন স্ত্রী যদি স্বাধীন ক্ষমতা পাওয়ার পর নিজেকে স্বাধীন বলে গ্রহণ করে তাহলে কী হবে, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, একটা রজয়ি তালাক হবে। উমর, ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস, উমর বিন আব্দুল আযীয, ইবনে আবি লায়লা, সুফিয়ান, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাকের মতও অনুরূপ। আর আলী রা. ও হানাফি মাযহাবের মতানুসারে একটা বায়েন তালাক সংঘটিত হবে। আর মালেক বিন আনাসের মতে, স্ত্রী যদি নিজেকে স্বাধীন বলে গ্রহণ করে তাহলে তিন তালাক, আর স্বামীকে গ্রহণ করলে এক তালাক সংঘটিত হবে। হানাফিগণ অবশ্য শর্ত আরোপ করেন যে, যদি তাকে বলা হয়, "তুমি নিজেকে স্বাধীন মনে করো", তবে এর জবাবে তাকে নিজের কথা উল্লেখ করে বলতে হবে যে,

নিজেকে স্বাধীন হিসেবে গ্রহণ করলাম বা নিজের ভবিষ্যৎ নিজে বেছে নিলাম বা নিজের পথ নিজেই গ্রহণ করলাম বলতে হবে। শুধু যদি বলে, স্বাধীন মনে করলাম, বা বেছে নিলাম তবে তাতে কিছুই কার্যকর হবেনা। কথাটা সম্পূর্ণ বাতিল ও নিরর্থক হয়ে যাবে।

২. তোমার কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা তোমার হাতে : অর্থাৎ তোমাকে তালাক দেয়া বা না দেয়ার যে ক্ষমতা আমার হাতে রয়েছে, তা তোমাকে দিলাম। স্বামী একথা বলার পর যদি স্ত্রী নিজেকে তালাক দেয়, তবে উমর রা. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, সুফিয়ান, শাফেয়ি ও আহমদের মতানুসারে এক তালাক পড়বে। বর্ণিত আছে, ইবনে মাসউদের নিকট এক ব্যক্তি এসে বললো, আমার ও আমার স্ত্রীর মাঝে এমন কিছু অপ্রীতিকর ব্যাপার হয়েছে, যেমন অনেকের মধ্যেই হয়ে থাকে। তখন সে বললো, আমার ব্যাপারে যে ক্ষমতা তোমার হাতে রয়েছে (অর্থাৎ তালাক সংক্রান্ত) তা যদি আমার হতে থাকতো, তাহলে তা কিভাবে কাজে লাগাতে হয়, আমার জানা আছে। সে বললো, তোমার ব্যাপারে যে ক্ষমতা আমার হাতে রয়েছে, তা তোমাকে অর্পণ করলাম। তৎক্ষণাত সে বললো, তাহলে তোমার উপর তিন তালাক। ইবনে মাসউদ রা. তাকে বললেন, আমার তো মনে হয় এক তালাক হয়েছে। তবে সে যতোক্ষণ ইদ্দতের মধ্যে রয়েছে, ততোক্ষণ তার উপর তোমার অগ্রাধিকার রয়েছে। আমি শীঘ্র আমীরুল মুমিনীন উমর রা.-এর সাথে সাক্ষাৎ করবো।

অতপর তিনি উমর রা.-এর সাথে সাক্ষাৎ করে পুরো ঘটনা জানালেন। উমর রা. বললেন, আল্লাহ পুরুষদের ক্ষমতা প্রদান করেছেন। তিনি তাদের হাতে যে ক্ষমতা দিয়েছেন, তা তারা স্ত্রীদের হাতে হস্তান্তর করে। তুমি এ ব্যাপারে কি বলেছ? আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বললেন, আমার মনে হয়, একটা তালাক হয়েছে এবং স্বামীর এখনো তার স্ত্রীর উপর অগ্রাধিকার রয়েছে। উমর রা. বললেন, আমিও তদ্রূপ মনে করি। তুমি যদি অন্য কিছু বলতে, তাহলে আমি বুঝতাম, তুমি সঠিক বলনি। হানাফিদের মতে, এক্ষেত্রে একটি বায়েন তালাক পড়বে। কেননা স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর নিকট ক্ষমতা অর্পণের দাবি হলো, স্ত্রীর উপর থেকে তার ক্ষমতার অবসান। আর স্ত্রী যখন স্বাধীন ক্ষমতা বলে এই ক্ষমতা গ্রহণ করেছে, তখন তার উপর থেকে এই ক্ষমতার অবসান ঘটা অনিবার্য। আর রজয়ি তালাক হলে তা সম্ভব হয়না।

স্বামীর নিয়ত বিবেচ্য, না স্ত্রীর নিয়ত?

ইমাম শাফেয়ির মতে, স্বামীর নিয়ত বিবেচ্য, সে যদি এক তালাক নিয়ত করে, তাহলে এক তালাক পড়বে, আর তিন তালাক নিয়ত করলে তিন তালাক পড়বে। এমনকি স্বামী স্ত্রীকে তালাকের ব্যাপারে বা তালাকের সংখ্যার ব্যাপারে আপত্তি জানাতে পারে, ক্ষমতা অর্পণের ক্ষেত্রে। অন্যেরা বলেন, স্ত্রী এক তালাকের চেয়ে বেশি নিয়ত করলে যা নিয়ত করবে, তা পড়বে। কেননা সে সুস্পষ্ট ঘোষণা বলে তিন তালাকের অধিকারী। তাই স্বামীর মতোই ইঙ্গিত দ্বারাও সে তিন তালাকের অধিকারী হবে। এরপর স্ত্রী যদি নিজেকে তিন তালাক দেয়, আর স্বামী বলে যে, আমি ওকে এক তালাকের বেশির ক্ষমতা দেইনি, তবে স্বামীর কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হবেনা। স্ত্রী যা বলবে, সেই অনুসারেই বিচার ফায়সালা হবে। এটা উসমান, ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাসের অভিমত। উমর রা. ও ইবনে মাসউদ রা. বলেন, এক তালাক পড়বে।

স্ত্রীর হাতে তালাকের ক্ষমতা অর্পণের কার্যকারিতা তাৎক্ষণিক কিনা?

ইবনে কুদামা আল মুগনিতে বলেন, স্ত্রীকে যখন তালাকের ক্ষমতা দেয়া হয়, তখন তা তার হাতে স্থায়ীভাবে থাকবে, তাৎক্ষণিকভাবে নয়। এটা আলী, আবু ছাওর, ইবনুল মুনযির ও আল হাকামের মত। মালেক, শাফেয়ি ও আসহাব উর রায়' বলেন, এটা তাৎক্ষণিক এবং যে মজলিসে বসে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে, সেই মজলিসের মধ্যেই সীমিত। স্বামী থেকে পৃথক হওয়ার পর সে নিজেকে তালাক দিতে পারবেনা। কেননা তাকে 'তুমি নিজেকে স্বাধীন বিবেচনা করো' এই কথা বলার মাধ্যমে তাকে তালাক গ্রহণের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। সুতরাং যে মজলিসে এই ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে, সেই মজলিসেই এর কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ থাকবে।

কিন্তু প্রথমোক্ত উক্তি অগ্রগণ্য। কেননা এক ব্যক্তি যখন তার স্ত্রীকে এই ক্ষমতা অর্পণ করলো, তখন আলী রা. বললেন, স্ত্রী যতোক্ষণ এ ক্ষমতা বর্জন না করবে, ততোক্ষণ তা তার হাতে থাকবে। কোনো সাহাবি এই মতের বিপক্ষে বলে জানা যায় না। তাই ধরে নেয়া যায় এটা একটা সর্বসম্মত মত। তাছাড়া যেহেতু এটা এক ধরনের প্রতিনিধি নিয়োগ, তাই এটা স্থায়ীভাবে চালু থাকারই কথা। যেমন কোনো অজানা অচেনা লোককে এ ক্ষমতা দিলে তাও স্থায়ী হয়ে থাকে, তাৎক্ষণিক নয়।

স্বামীর তালাকের ক্ষমতা অর্পণ প্রত্যাহার

স্ত্রীকে যে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে, স্বামী যদি তা প্রত্যাহার করে, অথবা যদি বলে, তোমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছিলাম তা বাতিল করলাম। তাহলে বাতিল হয়ে যাবে। আতা, মুজাহিদ, শাবি, নাখয়ি, আওযায়ি ও ইসহাকের মত এটাই। কিন্তু যুহরি, সাওরি, মালেক ও আসহাবুর রায় বলেন, প্রত্যাহারের বা বাতিল করার ক্ষমতা স্বামীর নেই। কেননা সে তাকে এর মালিক বানিয়ে দিয়েছে। কাজেই তার প্রত্যাহারের ক্ষমতা ও সুযোগ নেই। আর যদি স্বামী তার সাথে সহবাস করে, তাহলে সেটা প্রত্যাহারের শামিল হবে। কেননা এটা এক ধরনের প্রতিনিধি নিয়োগ। প্রতিনিধি নিয়োগকারী যদি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে, তাহলে প্রতিনিধিত্ব বাতিল হবে। আর যদি তার নিকট অর্পিত ক্ষমতা ফেরত দেয়, তাহলে অর্পিত ক্ষমতা বাতিল হবে, যেমন প্রতিনিধি নিয়োগের চুক্তি বাতিল করলে তা বাতিল হয়।

৩. **"তুমি চাও তো নিজেকে তালাক দাও"** : হানাফিগণ বলেন, যে ব্যক্তি কোনো নিয়ত ছাড়া অথবা এক তালাকের নিয়ত সহকারে তার স্ত্রীকে বলে, তুমি নিজেকে তালাক দাও। আর তৎক্ষণাত স্ত্রী বলে, আমি নিজেকে তালাক দিলাম, তাহলে একটা রজয়ি তালাক হবে। আর যদি সে নিজেকে তিন তালাক দেয় এবং স্বামীও তদ্রূপ নিয়ত করে থাকে, তাহলে তিন তালাকই হবে। আর যদি স্বামী তাকে বলেন, তুমি নিজেকে তালাক দাও। আর জবাবে স্ত্রী বলে, আমি নিজেকে বায়েন তালাক দিয়েছি, তাহলে তার উপর তালাক কার্যকর হবে। আর যদি বলেন, আমি নিজেকে স্বাধীন করলাম, তাহলে তালাক কার্যকর হবেনা। আর যদি স্বামী তাকে বলেন, যখন ইচ্ছা নিজেকে তালাক দাও, তাহলে স্ত্রী নিজেকে তাৎক্ষণিকভাবেও তালাক দিতে পারবে, পরবর্তী যে কোনো সময়েও দিতে পারবে। আর যদি স্বামী কোনো ব্যক্তিকে বলে, তুমি আমার স্ত্রীকে তালাক দাও। তাহলে সেই ব্যক্তি তাকে তাৎক্ষণিকভাবেও তালাক দিতে পারবে, পরেও দিতে পারবে। আর যদি

কোনো ব্যক্তিকে বলে, তোমার ইচ্ছা হলে আমার স্ত্রীকে তালাক দাও, তাহলে সে শুধুমাত্র তাৎক্ষণিকভাবেই তালাক দিতে পারবে, পরে নয়।

প্রতিনিধি নিয়োগের মাধ্যমে তালাক দেয়া :

অন্য কাউকে নিজের স্ত্রীর উপর তালাক কার্যকারণ করার দায়িত্ব দেয়া বৈধ। এটা নিজের তালাক দেয়ার মতোই। দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাৎক্ষণিকভাবে তালাক দিতে পারবে, পরেও দিতে পারবে। ইমাম শাফেয়ি এ তালাককে বৈধ বলে রায় দিয়েছেন এবং বলেছেন তাৎক্ষণিকভাবেও দেয়া যাবে, পরেও দেয়া যাবে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার শিষ্যগণ বলেছেন, শুধুমাত্র তাৎক্ষণিকভাবেই তালাক দিতে পারবে, পরে নয়। আল মুগনির লেখক বলেন, শর্তহীন ভাষায় প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হলে যে কোনো সময় তালাক দেয়া শুদ্ধ হবে। কেবল শর্ত এই যে, নিয়োগ বাতিল হওয়া বা সহবাস করার আগে তালাক দিতে হবে। প্রতিনিধি এক তালাকও দিতে পারবে, তিন তালাকও দিতে পারবে, যেমন স্ত্রীকে ক্ষমতা দেয়া হলে সেও এক বা তিন তালাক দিতে পারে।

তবে প্রতিনিধি নিয়োগে শর্ত হলো, প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্য হওয়া চাই অর্থাৎ সুস্থ বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া চাই। শিশু ও পাগলকে প্রতিনিধি নিয়োগ করা জায়েয নয়। যদি সেরকম কাউকেও করা হয় এবং সেই প্রতিনিধি তালাক দেয়, তাহলে তালাক কার্যকর হয়না। আসহাবুর রায় বলেন, শিশু ও পাগলকে প্রতিনিধি নিয়োগ করা বৈধ।

তালাকের ক্ষমতা অর্পনে শর্তহীন ও শর্তযুক্ত ভাষা ব্যবহার :

এ সকল ভাষা কখনো শর্তহীন হয়। যেমন স্ত্রীকে বাড়তি কোনো কিছু উল্লেখ না করেই শুধু তালাকের ক্ষমতা দেয়া অথবা স্ত্রীর নিজেকে স্বাধীন ক্ষমতাসম্পন্না বলে গ্রহণ করা। এরূপ পরিস্থিতিতে স্ত্রী শুধু তাৎক্ষণিকভাবে ও ক্ষমতা অর্পণের বৈঠকেই নিজেকে তালাক দিতে পারবেন, যদি সে সেখানে উপস্থিত থাকে। আর যদি উপস্থিত না থাকে, তবে যে বৈঠকে বসে জানতে পারবে যে তাকে তালাকের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, শুধু সেই বৈঠকেই তালাক দিতে পারবে। ক্ষমতা অর্পণের বৈঠক অথবা ক্ষমতা অর্পণের কথা জানতে পারার বৈঠক যদি তালাক প্রয়োগ ছাড়াই শেষ হয়ে যায় বা পরিবর্তিত হয়ে যায়, তাহলে এরপর আর তার এই অধিকার থাকবেনা। কেননা ক্ষমতা অর্পণের ভাষাটা ছিলো শর্তহীন, তাই তা সংশ্লিষ্ট বৈঠককে ঘিরেই আবর্তিত হবে। বৈঠক না থাকলে ক্ষমতা থাকবেনা। এই বিধি সেই অবস্থায় প্রযোজ্য, যখন ক্ষমতা অর্পণের ভাষা শর্তহীন ছিলো একথা জানার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিয়ের আকদ সম্পন্ন হওয়ার সময় যদি ক্ষমতা অর্পিত হয়ে থাকে, তাহলে এরূপ হবে। কেননা ক্ষমতা অর্পণকারী বিয়েরে মজলিসেই স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা দেবে, এটা বোধগম্য নয়। কাজেই এক্ষেত্রে কোনো শাব্দিক প্রমাণ দ্বারা নয়, বরং পরিবেশগত প্রমাণ দ্বারাই বুঝা যায় যে, ক্ষমতা অর্পণের ভাষাটা ছিলো শর্তহীন।

কোনো কোনো মিশরীয় নিম্ন আদালত থেকে এই মর্মে রায় দেয়া হয়েছে যে, বিয়ের আকদ সম্পন্ন হওয়ার সময়ই যদি শর্তহীনভাবে তালাকের ক্ষমতা দেয়া হয়, তবে তা বৈঠকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবেনা। স্ত্রী যখন খুশি নিজেকে তালাক দিতে পারবে। নচেত ক্ষমতা অর্পণের কোনো সার্থকতা থাকবেনা। আপিল দ্বারাও এ রায় সমর্থিত হয়েছে। এই

ভাষা কখনো কখনো শর্তহীন হয়ে থাকে। যেমন স্বামী স্ত্রীকে বলবে, "তুমি যখন খুশি নিজেকে স্বাধীন বলে গ্রহণ করতে পারো" অথবা "তুমি যখন চাও তালাক দেয়ার ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে নিতে পারো।" এরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রী যখন চাইবে, নিজেকে তালাক দিতে পারবে। কেননা সে স্ত্রীকে শর্তহীনভাবে তালাকের ক্ষমতা দিয়েছে। তাই সে এ ক্ষমতা যে কোনো সময় ব্যবহার করে নিজেকে তালাক দিতে পারবে। আবার কখনো তালাকের ক্ষমতা অর্পণের ভাষা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমিত হতে পারে। যেমন স্ত্রীকে এক বছরের মধ্যে নিজেকে তালাক দেয়ার ক্ষমতা দেয় হলো। এরূপ ক্ষেত্রে শুধু নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যেই সে নিজেকে তালাক দিতে পারবে। এই মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার পর স্ত্রীর নিজেকে তালাক দেয়ার কোনো ক্ষমতা থাকবেনা।

আকদের সময় ও তার পরে তালাকের ক্ষমতা অর্পন :

বিয়ের আকদ সম্পন্ন হওয়ার সময়ও স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা দেয়া যায় পরেও দেয়া যায়। তবে হানাফি মাযহাব অনুযায়ী আকদের সময়ে ক্ষমতা অর্পনের শর্ত হলো, স্ত্রীকেই এর উদ্যোক্তা হতে হবে। যেমন স্ত্রী স্বামীকে বলবে, আমি তোমাকে বিয়ে করেছি এই শর্তে যে, আমার হাতে ক্ষমতা থাকবে, যখন চাইবে তালাক নিয়ে নেব। আর এর জবাবে স্বামী বলবে, আমি মেনে নিলাম। এই মেনে নেয়া দ্বারাই বিয়ের আকদ সম্পন্ন হবে, তালাক শুদ্ধ হবে এবং স্ত্রীর অধিকার থাকবে যখনই চাইবে তালাক নিতে পারবে। কেননা স্বামীর সম্মতি দান দ্বারা বিয়ে সম্পন্ন এবং বিয়ে সম্পন্ন হওয়া দ্বারা স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু যখন বিয়ের আকদ সম্পন্ন হওয়ার সময়েই তালাকের ক্ষমতা অর্পনের উদ্যোক্তা হবে স্বামী, যেমন সে তার স্ত্রীকে বলবে, তোমাকে এই শর্তে বিয়ে করলাম যে, তোমার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তোমার হাতে থাকবে, তুমি যখনই চাইবে নিজেকে তালাক দিতে পারবে। আর এর জবাবে স্ত্রী বলবে, আমি কবুল করলাম। তখন এ দ্বারা বিয়ে সম্পন্ন হবে, কিন্তু তালাকের ক্ষমতা অর্পণ শুদ্ধ হবেনা এবং স্ত্রী নিজেকে তালাক দিতে পারবেনা। উক্ত দুই অবস্থার পার্থক্য হলো, প্রথম অবস্থায় স্বামী আকদ সম্পন্ন হওয়ার পর তালাকের ক্ষমতা অর্পণে সম্মতি দিয়েছে। এর অর্থ দাঁড়ালো, বিয়ের আকদ সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমে স্বামী তালাকের অধিকারী হয়েছে, অতপর সেই অধিকার স্ত্রীকে দিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় স্বামী নিজে তালাকের ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার আগে তা স্ত্রীকে অর্পন করেছে। কেননা সে বিয়ের আকদ সম্পন্ন হওয়ার আগে উক্ত অধিকার অর্পন করেছে। কারণ তখন পর্যন্ত কেবল ইজাব সম্পন্ন হয়েছে, কবুল সম্পন্ন হয়নি।

যে সকল পরিস্থিতিতে আদালত তালাক দিতে পারে :

১৯২০ ও ১৯২৯ সালের মিশরীয় আইনে সেসব পরিস্থিতির উল্লেখ রয়েছে, যে সকল পরিস্থিতিতে আদালত তালাক দিতে পারে। এগুলো কেবল ফকিহদের ইজতিহাদের আলোকে গৃহীত হয়েছে। কেননা কুরআন বা হাদিসে এ সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই। এতে জনগণের সুবিধা ও তাদেরকে জটিলতা থেকে পরিত্রাণ দানের বিষয়টি লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং ইসলামের উদার নীতির সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয়েছে।

১৯২০ সালের ২৫ নং আইনে স্বামী কর্তৃক খোরপোষ না দেয়া ও স্বামীর গুরুতর খুঁতের জন্য তালাক দেয়ার বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়া ক্ষতির জন্য, বিনা ওজরে স্বামীর

অনির্দিষ্টকাল অনুপস্থিতির জন্য এবং তার বন্দীদশার জন্য তালাকের বিধান রাখা হয়েছে ১৯২৯ সালের ২৫ নং আইনে। নিম্নে এ আইনের কয়েকটি জরুরি বিধি উল্লেখ করা যাচ্ছে :

খোরপোষ না দেয়ার কারণে তালাক দেয়া :

স্বামী যখন স্ত্রীকে ভরণপোষণ দেয় না এবং তার কোনো জ্ঞাত সম্পত্তিও নেই, তখন স্ত্রী দাবি জানালে আদালতের রায়ের মাধ্যমে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো জায়েয বলে মত দিয়েছেন মালেক, শাফেয়ি ও আহমদ। [ভরণপোষণ দ্বারা অত্যাবশ্যকীয় ও ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজনীয় সামগ্রী বুঝায়, যেমন খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান। ভরণপোষণ না দেয়ার অর্থ বর্তমান ও ভবিষ্যতের ভরণপোষণ। অতীত কালে ভরণপোষণ না দেয়া হয়ে থাকলে সেজন্য বিচ্ছেদ দাবি করা যায়না এবং এজন্য স্ত্রীর দাবি মানা যাবেনা। তবে অতীতের না দেয়া ভরণপোষণ স্বামীর ঘাড়ে ঋণ হিসেবে থাকবে এবং সে অভাবী হলে তাকে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত সময় দিতে হবে। আর স্বামীর কোনো সম্পত্তি থাকলে স্বামী স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিবর্তে ঐ সম্পত্তি থেকে ভরণপোষণ আদায় করা হবে]

মালেক, শাফেয়ি ও আহমদের মতের স্বপক্ষে প্রমাণ নিম্নরূপ :

স্বামীকে শরিয়ত আদেশ দিয়েছে যেন স্ত্রীকে হয় ন্যায়সংগতভাবে বহাল রাখবে, নচেত সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে বিদায় করবে। কেননা আল্লাহ বলেছেন, হয় ন্যায়সংগতভাবে বহাল রাখতে হবে, নচেত সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে বিদায় করে দিতে হবে। খোরপোষ না দেয়া যে ন্যায়সংগতভাবে বহাল রাখার পরিপন্থি, তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। আল্লাহ বলেছেন : وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ۚ

"তাদের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে তাদের রেখে দিওনা যাতে তাদের উপর বাড়াবাড়ি করতে পারো।" আর রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "কারো ক্ষতিও করা চলবেনা, নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া চলবেনা।" একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, স্ত্রীকে খোরপোষ না দেয়ার চেয়েও বড় যুলুম ও ক্ষতি সাধন আর কিছু হতে পারেনা। এই ক্ষতি ও যুলুম দূর করা আদালতের কর্তব্য।

এটা যখন সর্ববাদী সম্মত, স্বামীর মধ্যে কোনো গুরুতর খুঁত থাকলে সেজন্য স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কচ্ছেদ করা আদালতের দায়িত্ব, তখন স্ত্রীকে খোরপোষ না দেয়া স্বামীর অন্য যে কোনো দোষত্রুটির চেয়ে খোরপোষ না দেয়ার কারণে বিচ্ছেদ ঘটানো অধিকতর ন্যায়সংগত।

হানাফিদের মতে, খোপোষ না দেয়ার কারণে স্বামী স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটানো জায়েয নয়, চাই শুধু না দেয়াটাই এর কারণ হোক অথবা অভাব ও অক্ষমতা। তাদের প্রমাণ

لِيُنْفِقْ ذُوْسَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ط وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰهُ اللّٰهُ ط لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰهَا ط سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ○

অর্থ : সচ্ছল ব্যক্তির কর্তব্য তার সচ্ছলতা অনুপাতের খোরপোষ দেয়া। আর যে ব্যক্তি জীবিকার অনটনে রয়েছে, তার আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন, তা থেকেই খোরপোষ দেয়া উচিত। আল্লাহ কাউকে এমন কোনো দায়িত্ব অর্পণ করেননা, যার সামর্থ্য আল্লাহ তাকে দেননি। আল্লাহ অচিরেই কষ্টের পর সুখ দেবেন। (সূরা তালাক : আয়াত ৭)

স্ত্রীকে খোরপোষ দিতে অক্ষম এক ব্যক্তি সম্পর্কে ইমাম যুহরিকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, তাদের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে কি? তিনি বলেছেন, স্বামীর ব্যাপারে ধীরে চলার নীতি

অবলম্বন করা হবে, সম্পর্ক ছিন্ন করা হবেনা। অতপর উপরোক্ত আয়াত পাঠ করলেন।

২. সাহাবিদের মধ্যে অভাবী ও সচ্ছল উভয় প্রকারের লোক ছিলেন। অভাবের দরুন খোরপোষ না দিতে পারার কারণে রসূল সা. তাদের কারো দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন বলে জানা যায়না।

৩. রসূল সা.-এর স্ত্রীগণ তার কাছে এমন জিনিস চেয়েছিলেন, যা তার কাছে ছিলনা। এজন্য তিনি একমাস তাদের কাছ থেকে দূরে থেকে তাদেরকে শাস্তি দেন। স্বামীর কাছে যা নেই বা যা দেয়ার ক্ষমতা নেই, তা চাওয়া যখন শাস্তিযোগ্য, তখন অভাবের কারণে বিচ্ছেদ দাবি করা অবশ্যই যুলুম বিবেচিত হবে এবং এ দাবির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করারই প্রয়োজন নেই।

তারা আরো বলেছেন : খোরপোষ দেয়ার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও না দেয়া যখন যুলুম, তখন এই যুলুমের প্রতিকারের উপায় হলো, খোরপোষ আদায় করার জন্য তার সম্পত্তি বিক্রি করা অথবা খোরপোষ দিতে বাধ্য করার জন্য তাকে বন্দী করা। অন্যান্য উপায় থাকা সত্ত্বেও সম্পর্কচ্ছেদ ঘটানোকে একমাত্র উপায় হিসেবে গ্রহণ করার কোনো বৈধতা নেই। সুতরাং আদালত এ কারণে তাদের বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন করবেনা। কেননা দাম্পত্য বন্ধন ছিন্ন করা হালাল হলেও স্বামীর চাইতে স্বয়ং আল্লাহর নিকট অধিকতর অপ্রিয় বস্তু। এমতাবস্থায় এটাই যখন যুলুম প্রতিকারের একমাত্র উপায় নয়, তখন আদালত কিভাবে এর আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে? এ অবস্থা তখন প্রযোজ্য। যখন স্বামী খোরপোষ দেয়ার সামর্থ্য রাখে। কিন্তু এ সামর্থ্য যার নেই, তার পক্ষ হতে কোনো যুলুম হয়নি। কারণ আল্লাহ কোনো মানুষের উপর শুধু সেই দায়িত্বই অর্পণ করেন, যা বহনের সামর্থ্য তাকে তিনি দিয়েছেন। অপরদিকে ১৯২০ সালের আইনের ৪নং ধারায় বলা হয়েছে : "স্বামী যখন স্ত্রীর খোরপোষ দেয়া থেকে বিরত থাকে, তখন তার কোনো জ্ঞাত সম্পত্তি থাকলে তা থেকে খোরপোষ দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে। জ্ঞাত সম্পত্তি না থাকলে এবং সে সচ্ছল না অসচ্ছল তাও ব্যক্ত না করে কেবল খোরপোশ না দেয়ার ব্যাপারে অনড় থাকলে আদালত তাৎক্ষণিকভাবে স্বামীর উপর তালাক কার্যকর করবে। আর যদি সে নিজের অসামর্থ্য দাবি করে এবং তা প্রমাণ করতে না পারে, তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে স্বামীর উপর তালাক কার্যকর করবে। আর যদি প্রমাণ করতে পারে তবে তাকে সর্বোচ্চ একমাস সময় দেবে। এক মাসের মধ্যেও খোরপোষ না দিলে তারপরে তালাক কার্যকর করবে।"

ধারা ৫ : "স্বামী যখন নিকটেই কোথাও প্রবাসী হয়, তখন তার কোনো জ্ঞাত সম্পত্তি থেকে থাকলে আদালত তা থেকে খোরপোষ আদায়ের আদেশ জারি ও কার্যকর করবে। আর যদি জ্ঞাত কোনো সম্পত্তি না থাকে, তবে আদালত ন্যায়সংগতভাবে তার ওযর আপত্তি বিবেচনা করবে এবং তাকে একটা মেয়াদ বেঁধে দেবে। এই মেয়াদের মধ্যে যদি সে স্ত্রীর খোরপোষ না পাঠায়, অথবা খোরপোষের ব্যবস্থা করতে নিজে উপস্থিত না হয়, তাহলে আদালত নির্ধারিত মেয়াদ শেষে তার উপর তালাক কার্যকর করবে। আর যদি সে এমন সুদূরের প্রবাসী হয়, যেখানে তার নাগাল পাওয়া দুষ্কর, অথবা তার থাকার জায়গা অজ্ঞাত অথবা সে একেবারেই নিরুদ্দেশ হয়, এবং প্রমাণিত হয় যে, তার এমন কোনো সম্পত্তি নেই, যা থেকে স্ত্রী নিজের খোরপোষ গ্রহণ করতে পারে, তাহলে আদালত তার

উপর তালাক কার্যকর করবে। খোরপোষ দিতে অসমর্থ কারাবন্দীর উপরও এই ধারা প্রযোজ্য হবে।

ধারা ৬ : খোরপোষ না দেয়ার কারণে আদালত কর্তৃক যে তালাক দেয়া হয় তা রজয়ি তালাক। ইদ্দতের মধ্যে যদি সে সচ্ছল হয়েছে প্রমাণিত হয় এবং খোরপোষ দিতে প্রস্তুত হয়, তাহলে সে তালাক প্রত্যাহার করতে পারবে। সচ্ছলতা প্রমাণিত নাহলে ও খোরপোষ দিতে প্রস্তুত না হলে তালাক প্রত্যাহার বৈধ হবেনা।

ক্ষতি ও নির্যাতনের কারণে তালাক :

ইমাম মালেক ও আহমদের মতে, স্ত্রী যদি অভিযোগ করে যে স্বামী তার উপর এমন নির্যাতন চালাচ্ছে, যার বর্তমানে তাদের উভয়ের দাম্পত্য সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। যেমন মারপিট, গালিগালাজ কিংবা অন্য কোনো পন্থায় কোনো অসহনীয় নিপীড়ন কিংবা তাকে অন্যায় ও অনৈতিক কাজ করতে বা কথা বলতে বাধ্য করা, তাহলে এই অভিযোগের প্রতিকারের জন্য স্ত্রী বিচ্ছেদ প্রার্থনা করতে পারে। এই অভিযোগ যখন স্ত্রীর সাক্ষ্য প্রমাণ বা স্বামীর স্বীকারোক্তি দ্বারা সত্য প্রমাণিত হয় এবং নিপীড়ন এই পর্যায়ের হয় যে, তার বর্তমানে দাম্পত্য সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা অসম্ভব এবং আদালত তাদের উভয়ের মধ্যে আপোষ মিমাংসা করতে অক্ষম হয়, তাহলে স্ত্রীর উপর একটা বায়েন তালাত কার্যকর করবে। আর যদি স্ত্রী প্রমাণ উপস্থাপনে অক্ষম হয় কিংবা স্বামী স্বীকারোক্তি না দেয়, তাহলে আদালত তার অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করবে। কিন্তু যদি স্ত্রী বারবার অভিযোগ আনতে থাকে, বিচ্ছেদ প্রার্থনা করে এবং তার অভিযোগের সত্যতা আদালতের নিকট প্রমাণিত না হয়, তাহলে আদালত এমন দু'জন ন্যায়পরায়ন পুরুষকে সালিশ নিয়োগ করবে, যাদের ঐ দম্পতি সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং তাদেরকে শুধরানোর ক্ষমতাও রয়েছে। সালিশদ্বয়কে যদি দম্পতির পরিবারের মধ্য থেকে যোগাড় করা সম্ভব হয, তাহলে ভালো হয়। নচেত যেখান থেকেই পাওয়া যায় নিতে হবে। এই দুই সালিশের কর্তব্য হলো, দম্পতির মতবিরোধের কারণ সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং সাধ্যমত তাদেরকে শুধরে দেয়া। তারা দু'জন যদি দম্পতিকে শুধরাতে অক্ষম হয়, আর সম্পর্কের অবনতির জন্য যদি স্বামী স্ত্রী উভয়ে অথবা স্বামী দায়ী হয়। অথবা কে দায়ী তা স্পষ্ট না হয়, তখন সালিশদ্বয় একটা বায়েন তালাকের মাধ্যমে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর সিদ্ধান্ত নেবে। আর যদি স্ত্রী দায়ী হয়, তাহলে তালাকের মাধ্যমে নয় বরং 'খুলা'র মাধ্যমে বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে।

আবু হানিফা, আহমদ ও শাফেয়ির মতে, স্বামী তালাকের ক্ষমতা অর্পণ না করলে সালিশদ্বয়ের তালাক দেয়ার অধিকার নেই। শাফেয়ি ও মালেকের মতে কোনো বিনিময় দ্বারা বা বিনিময় ছাড়া যদি বিবাদ মেটানো তারা উভয়ে সমীচীন মনে করে, তবে তা করতে পারবে। আর 'খুলা' করানো সমীচীন মনে করলে তা করাতে পারবে। আর স্বামীর পক্ষ থেকে আগত সালিশ যদি তালাক সমীচীন মনে করে, তবে তালাক দেবে। এ ব্যাপারে স্বামীর অনুমতি নিতে তারা বাধ্য নয়। কেননা তারা সালিশ, উকিল নয়। উকিল হলে এ ক্ষমতা তাদের থাকবেনা।

আর যদি সালিশদ্বয় কোনো বিষয়ে একমত না হয়, তবে আদালত তাদের দু'জনকে নতুন করে তদন্ত ও অনুসন্ধান চালানোর আদেশ দেবে। তারপরও যদি তারা একমত হতে ব্যর্থ হয়, তবে আদালত তাদেরকে অপসারণ করে নতুন করে দু'জন সালিশ নিয়োগ করবে। সালিশদ্বয়ের কর্তব্য নিজ নিজ অভিমত আদালতের নিকট উপস্থাপন করা। আর তাদের রায় কার্যকর করা আদালতের কর্তব্য। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ج إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ط

"যদি তোমরা তাদের সম্পর্কচ্ছেদের আশংকা করো, তাহলে স্বামীর পরিবার থেকে একজন ও স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ পাঠাও। স্বামী ও স্ত্রী যদি সংশোধন চায় তবে আল্লাহ্ তাদের মধ্যে আপোষ করিয়ে দেবেন।" (আননিসা, ৩৫)

আল্লাহ্ আরো বলেছেন : فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ .

"হয় সংগতভাবে পুনর্বহাল করতে হবে, নচেত সৌহার্দপূর্ণভাবে বিদায় করতে হবে।" যেহেতু পুনর্বহালের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে, তাই সৌহার্দপূর্ণভাবে বিদায় করার পথটাই খোলা রয়েছে। রসূল সা. বলেছেন : لَاضَرَرَ وَلَاضِرَارَ "কেউ নিজেও ক্ষতির শিকার হবেনা, অন্যের ক্ষতিসাধনও করবেনা।"

১৯২৯ সালের ২৫ নং আইনে বলা হয়েছে

ধারা ৬ : স্ত্রী যখন অভিযোগ করে যে, স্বামী তার ওপর এত নির্যাতন চালায়, যার কারণে উভয়ের সহাবস্থান সম্ভব নয়, তখন সে আদালতের কাছ থেকে বিয়ে বিচ্ছেদ প্রার্থনা করতে পারে। নির্যাতন প্রমাণিত হলে ও আপোষ করতে ব্যর্থ হলে আদালত স্ত্রীকে একটা বায়েন তালাক দেবে। আদালত যদি স্ত্রীর প্রার্থনা অগ্রাহ্য করে, তারপর অভিযোগ পুনঃ পুনঃ আসতে থাকে এবং নির্যাতন প্রমাণিত না হয়, তবে আদালত দু'জন সালিশ পাঠাবে এবং ৭, ৮, ৯, ১০ ও ১১ ধারা অনুযায়ী নিষ্পত্তি করবে।

ধারা ৭ : সালিশ নিয়োগে শর্ত এই যে, তারা উভয়ে দু'জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ হবে, সম্ভব হলে দুই পরিবার থেকে দুইজন হবে, নচেত পরিবারের বাইরে থেকে হবে এবং ঐ দম্পতি সম্পর্কে আগে থেকে জ্ঞাত ও তাদের শুধরাতে সক্ষম হতে হবে।

ধারা ৮ : সালিশদ্বয়ের দায়িত্ব হলো, স্বামী স্ত্রীর বিরোধের কারণ অবহিত হবে এবং তা নিষ্পত্তিকরণে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবে। কোনো নির্দিষ্ট পন্থায় সম্ভব হলে নিষ্পত্তি করবে।

ধারা ৯ : উভয় সালিশ বিরোধ নিষ্পত্তিতে ব্যর্থ হলে এবং স্বামী বা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এজন্য দায়ী হলে অথবা প্রকৃত অবস্থা অজানা থেকে গেলে তারা একটা বায়েন তালাক দ্বারা বিচ্ছেদ ঘটাবে।

ধারা ১০ : সালিশদ্বয়ের মধ্যে যখন মতভেদ সৃষ্টি হবে, তখন আদালত তাদেরকে পুনরায় তদন্ত চালানোর আদেশ দেবে। এরপরও যদি মতভেদ অব্যাহত থাকে, তবে তাদের বাদ দিয়ে অন্য দু'জনকে সালিশ নিয়োগ করবে।

ধারা ১১ : সালিশদ্বয় যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তা হুবহু আদালতে উপস্থাপন করবে এবং আদালত তদনুযায়ী রায় দেবে।

স্বামীর অনুপস্থিতির কারণে তালাক :

ইমাম মালেক ও আহমদের মতে স্ত্রীর ক্ষতির প্রতিকারের উদ্দেশ্যে স্বামীর দীর্ঘ অনুপস্থিতির জন্য তালাক কার্যকর করা যাবে। স্বামীর যদি এমন কোনো সম্পত্তিও স্ত্রীর নাগালে থাকে যা থেকে সে খোরপোষ নিতে পারে, তথাপি নিম্নোক্ত শর্তাবলী সাপেক্ষে স্ত্রী স্বামীর দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণে বিচ্ছেদের দাবি জানাতে পারবে। বিচ্ছেদ সংঘটিত হলে মালেকের মতে, তা হবে একটি বায়েন তালাক। আহমদের মতে, তা হবে বিয়ে বিচ্ছেদ।

শর্তাবলী :

১. স্বামীর অনুপস্থিতির যদি কোনো গ্রহণযোগ্য কারণ না থাকে।
২. তার অনুপস্থিতির দরুন যদি স্ত্রীর ক্ষতি হয়।
৩. যে শহরে স্ত্রী বাস করে, স্বামী যদি তা থেকে ভিন্ন শহরে অবস্থান করে।
৪. স্বামীর অনুপস্থিতি যদি এক চন্দ্রবর্ষ প্রলম্বিত হয়, যাতে স্ত্রীর ক্ষতি প্রমাণিত হয়।

যদি গ্রহণযোগ্য কারণে স্বামী অনুপস্থিত থাকে, যথা বিদ্যা অর্জনের উদ্দেশ্যে অনুপস্থিত থাকা, অথবা বাণিজ্য উপলক্ষে অথবা চাকুরি উপলক্ষে, তাহলে এক্ষেত্রে বিচ্ছেদ দাবি করা বৈধ হবেনা। অনুরূপ, স্ত্রী যে শহরে বাস করে, স্বামীও যদি সেই শহরেই থাকে, তবে সে ক্ষেত্রেও বিচ্ছেদ দাবি করা জায়েয হবেনা। পক্ষান্তরে স্বামীর দীর্ঘ অনুপস্থিতি ছাড়াও স্ত্রীর কাছ থেকে নাতিদীর্ঘ সময় দূরে অবস্থানের কারণেও যদি স্ত্রীর ক্ষতি হয়, তবে সে ক্ষেত্রেও স্ত্রীর বিচ্ছেদ দাবি করার অধিকার থাকবে। অনুপস্থিতির মেয়াদ এক চন্দ্রবর্ষ পরিমাণ দীর্ঘ হওয়া জরুরি, যাতে স্ত্রীর ক্ষতি অনিবার্য হয়ে ওঠে, সে ভীতিপ্রদ নির্জনতা ও নিঃসঙ্গতা অনুভব করে এবং আল্লাহ যেসব জিনিস নিষিদ্ধ ও হারাম করেছেন, তার কোনোটায় পতিত হবার আশংকা বোধ করে। এক চন্দ্রবর্ষকে অনুপস্থিতির মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন ইমাম মালেক। অন্যদের মতে, তিন মাস। আহমদের মতে, বিচ্ছেদ দাবি করার উপযুক্ত ন্যূনতম মেয়াদ ছয় মাস। কেননা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে এবং উমরের অনুসন্ধান ও উম্মুল মুমিনীন হাফসার ফতোয়া থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রীর ধৈর্য ধারণের সামর্থ্যের সর্বোচ্চ মেয়াদ হলো ছয় মাস।

স্বামীর বন্দী থাকার কারণে তালাক নেয়া :

ইমাম মালেক ও আহমদের মতে, স্বামীর গ্রেফতার ও বন্দী থাকার কারণে স্ত্রীর তালাক প্রার্থনার অধিকার রয়েছে। কেননা তার কাছ থেকে স্বামীর দূরে থাকার ফলে তার ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে। তিন বছর বা তার চেয়ে বেশি দিনের জন্য কারাদণ্ড চূড়ান্তভাবে ঘোষিত হলে, তা স্বামীর উপর কার্যকর হলে এবং কার্যকর হওয়ার দিন থেকে এক বছর অতিবাহিত হলে স্ত্রীর তালাক প্রার্থনা করে আদালতে আবেদন করার অধিকার থাকবে। কেননা সে স্বামীর কাছ থেকে দূরে থাকার কারণে ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। এটা প্রমাণিত হবার পর আদালত স্ত্রীকে একটি তালাক দেবে। এটি ইমাম মালেকের নিকট বায়েন তালাক এবং আহমদের নিকট বিচ্ছেদ। ইবনে তাইমিয়া বলেছেন : বন্দী বা অনুরূপ এমন কোনো ব্যক্তির স্ত্রী, যার স্বামীর কাছ থেকে উপকৃত হবার কোনোই সুযোগ নেই এবং নিরুদ্দেশ ব্যক্তির স্ত্রীর বিধান সর্বসম্মতভাবে একই রকম। আইনের ১২ নং ধারায় বলা হয়েছে : "স্বামী যখন গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়াই এক বছর বা তার চেয়ে বেশি

অনুপস্থিত থাকে, এবং স্ত্রী তার কাছ থেকে দূরে থাকার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন স্বামীর সম্পত্তি থেকে খোরপোষ গ্রহণের সুযোগ স্ত্রীর যতোই থাকুক, তার আদালতে একটি বায়েন তালাক প্রার্থনা করার অধিকার থাকবে।

ধারা ১৩ : নিরুদ্দেশ স্বামীর কাছে চিঠি পৌঁছার সম্ভাবনা থাকলে আদালত তাকে একটা সময় বেঁধে দিয়ে নোটিশ দেবে যে, উক্ত সময়ের মধ্যে স্বামী স্ত্রীর সাথে থাকার জন্য উপস্থিত না হলে বা তাকে নিজের কাছে নিয়ে না গেলে বা তালাক না দিলে আদালত স্বয়ং তার স্ত্রীর উপর তালাক কার্যকর করবে। বেঁধে দেয়া মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও স্বামী এর কোনো একটি কাজও না করলে এবং সেজন্য কোনো গ্রহণযোগ্য কারণ না দর্শালে আদালত একটি বায়েন তালাক কার্যকর করে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবে। আর নিরুদ্দেশ স্বামীর কাছে চিঠি পৌঁছানো সম্ভব না হলে আদালত কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের অবকাশ প্রদান ও নোটিশ প্রদান ছাড়াই স্ত্রীকে তালাক দেবে।

ধারা ১৪ : চূড়ান্তভাবে তিন বছর বা তার বেশি সময়ের কারাদণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তির স্ত্রী স্বামীর কারাভোগ শুরু হওয়া থেকে এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর নিজের ক্ষতির প্রতিকারার্থে আদালতের নিকট বায়েন তালাক প্রার্থনাপূর্বক আবেদন পেশ করতে পারবে। চাই স্বামীর সম্পত্তি থেকে খোরপোষ গ্রহণের সুযোগ তার থাক বা না থাক। স্বামীর মধ্যে অন্য কোনো দোষ বা খুঁত থাকলে সে সম্পর্কে শরিয়তের বিধান ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

খুলা

দাম্পত্য বন্ধন শান্তি, সম্প্রীতি, মায়া, মমতা, সদাচরণ এবং পরস্পরের অধিকার প্রদানের ভিত্তিতেই টিকে থাকে। কখনো কখনো এমনও ঘটে থাকে যে, স্বামী স্ত্রীকে অপসন্দ করে অথবা স্ত্রী স্বামীকে অপসন্দ করে। এরূপ ক্ষেত্রে ইসলাম ধৈর্য ও সহনশীলতা অবলম্বনের তাকিদ দেয় এবং অপসন্দ হওয়ার সম্ভাব্য কারণগুলোর প্রতিকার বা চিকিৎসার উপদেশ দেয়। আল্লাহ্ বলেন :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

অর্থ : তাদের (স্ত্রীদের) সাথে ন্যায়সঙ্গত পন্থায় মেলামেশা করো। যদি তাদেরকে তোমাদের অপসন্দ হয়, তবে বিচিত্র নয় যে, তোমরা কোনো জিনিসকে অপছন্দ করবে, অথচ আল্লাহ সেই জিনিসে প্রচুর কল্যাণ নিহিত রাখবেন। (সূরা নিসা : আয়াত ১৯)

সহীহ হাদিসে রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "কোনো মুমিন পুরুষের কোনো মুমিন নারীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা কাম্য নয়। তার কোনো একটা স্বভাব যদি তার অপছন্দ হয়, তবে তার অন্য একটা স্বভাব তার পছন্দও হতে পারে।"

অবশ্য কখনো কখনো বিদ্বেষ বেড়ে যেতে পারে, বিরোধ তীব্রতর হতে পারে। চিকিৎসা ও প্রতিকার দুরূহ হয়ে পড়তে পারে, ধৈর্যের বাঁধন টুটে যেতে পারে এবং সুখ শান্তি, মায়া মমতা, দয়া সহানুভূতি, পারস্পরিক অধিকার প্রদান, ইত্যাকার দাম্পত্য সম্পর্কের ভিত্তিগুলো একে একে ধ্বসে যেতে পারে। ফলে দাম্পত্য জীবন সংস্কার ও সংশোধনের অযোগ্য হয়ে যেতে পারে। একমাত্র এহেন চরম পরিস্থিতিতেই ইসলাম সেই সর্বশেষ চিকিৎসার অনুমতি দেয়, যা ব্যতীত আর কোনো উপায়ান্তর থাকেনা।

অসহনীয় মাত্রার এই বিরক্তি ও বিতৃষ্ণা যদি পুরুষের দিক থেকে উদ্ভূত হয়, তবে তো তার হাতে তালাকের ক্ষমতা রয়েছেই। সেটা তার একটা অন্যতম অধিকারও বটে। আল্লাহর অনুমোদিত সীমার মধ্যে সে এই অধিকার প্রয়োগও করতে পারে। আর যদি বিরক্তি স্ত্রীর মধ্যে সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে ইসলাম তাকেও খুলা'র পদ্ধতিতে দাম্পত্য বন্ধন থেকে অব্যাহতি লাভের অনুমতি দিয়েছে। সেই পদ্ধতিটা হলো, স্ত্রী হওয়ার সুবাদে স্বামীর কাছ থেকে যা কিছু গ্রহণ করেছে, তার সাথে স্বামীর সম্পর্কের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে তা স্বামীকে ফিরিয়ে দেয়া। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন :

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ

অর্থ : তোমরা স্ত্রীদেরকে যা যা দিয়েছ, তা ফেরত নেয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়। তবে স্বামী স্ত্রী উভয়ে যদি আশংকাবোধ করে যে, তারা আল্লাহর সীমা রক্ষা করতে পারবেনা তাহলে সেটা স্বতন্ত্র ব্যাপার। সুতরাং তোমরা যদি আশংকা করো যে, স্বামী স্ত্রী আল্লাহর

সীমা রক্ষা করতে পারবেনা, তাহলে স্ত্রী মুক্তিপণ হিসেবে যা প্রদান করে, তাতে তাদের উভয়ের কোনো গুনাহ নেই। (সূরা আল বাকারা : আয়াত ২২৯)

স্বামী কর্তৃক এই মুক্তিপণ গ্রহণে ন্যায়বিচার ও ইনসাফ প্রতিফলিত হয়। কেননা সেই তো স্ত্রীকে মোহর দিয়েছে, বিয়ে ও বাসরের যাবতীয় ব্যয় বহন করেছে এবং স্ত্রীর উপর প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছে। আর স্ত্রী এর বিনিময়ে তার সকল অবদান অস্বীকার করেছে এবং বিচ্ছেদ চেয়েছে। সুতরাং যা নিয়েছে তা স্বামীকে ফিরিয়ে দেয়াতে ইনসাফের কোনো ব্যত্যয় হয়নি।

আর যদি একই সাথে উভয়ে পরস্পরকে অপসন্দ করে, তবে সে ক্ষেত্রে স্বামী প্রথমে বিচ্ছেদ চাইলে তার হাতে তালাকের ক্ষমতা রয়েছে। আর সেই ক্ষমতা প্রয়োগের সকল ফলাফল তাকেই ভোগ করতে হবে। আর যদি স্ত্রী বিচ্ছেদ চায়, তবে তার হাতে রয়েছে খুলা এবং খুলার যাবতীয় ফলাফলও তাকেই ভোগ করতে হবে। জানা যায়, জাহেলি যুগে খুলা সংঘটিত হয়েছিল। আমের বিন যারাব নিজের মেয়েকে নিজের ভাতিজার সাথে বিয়ে দিয়েছিল। মেয়ে যখন স্বামী আমের বিন হারেসের বাসর ঘরে গেলো, তখন স্বামীর প্রতি তাঁর প্রচণ্ড ঘৃণার সৃষ্টি হলো। ভাতিজা তখন স্ত্রীর পিতার নিকট অভিযোগ পেশ করলো। তখন স্ত্রীর পিতা তার ভাতিজাকে বললো : আমি তোমাকে স্ত্রী ও সম্পদ দুটোই হারাতে দেবনা। আমার মেয়েকে তুমি যা দিয়েছ, তা ফেরত দিয়ে আমি তোমার কাছ থেকে মেয়েকে ফিরিয়ে নিলাম।"

খুলা কী?

ইসলাম যে খুলা'র অনুমতি দিয়েছে, তা خَلَعَ 'খালায়া' শব্দ থেকে গৃহীত, যা দেহ থেকে পোশাক খুলে নেয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেহেতু কুরআনের বক্তব্য অনুসারে নারী পুরুষের পোশাক এবং পুরুষ নারীর পোশাক, যেমন আল্লাহ বলেন :

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

"তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক।" (বাকারা : ১৮৭)

তাই বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন করাকে খুলা নাম দেয়া হয়েছে। এর আরেক নাম মুক্তিপণ। কেননা স্ত্রী তার স্বামীকে কিছু সামগ্রী দিয়ে তার কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করে। ফকিহগণ এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে : "খুলা হচ্ছে পুরুষ কর্তৃক কোনো জিনিস পাওয়ার বিনিময়ে নিজের স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া।" এর ভিত্তি হলো, বুখারি ও নাসায়ীতে ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত এ হাদিস : "ছাবিত বিন কায়েসের স্ত্রী রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট এসে বললো : হে রসূলুল্লাহ! আমি আমার স্বামীর ধর্ম ও চরিত্রকে অপসন্দ করিনা। কিন্তু ইসলামের মধ্যে আমি আত্মীয়-স্বজনের প্রতি অসদাচরণকে ঘৃণা করি।

(অর্থাৎ সে স্বামীর দ্বীনদারী ও চারিত্রিক ত্রুটির জন্য তাকে ত্যাগ করতে চায়নি। সে স্বামীকে তার (স্ত্রীর) আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদ্ব্যবহার না করার জন্য ত্যাগ করতে চেয়েছে। যেহেতু স্বামীর এই আচরণ তার অপসন্দ, তাই এই অপসন্দের কারণে সে স্বামীর অধিকার দিতে অসমর্থ হতে পারে। এই আশংকা থেকেই বিচ্ছেদ চায়।)

রসূল সা. বললেন : তুমি কি তাকে তার দেয়া বাগানটি ফেরত দেবে? সে বললো : হাঁ। তখন রসূল সা. তার স্বামীকে বললেন : তুমি বাগানটি গ্রহণ করো আর ওকে তালাক দাও।

খুলা'য় ব্যবহৃত শব্দাবলী :

ফকিহদের মতে, খুলা' অবশ্যই খুলা' শব্দ বা এ দ্বারা গঠিত শব্দ দ্বারা কার্যকর হতে হবে। খুলা'র সমার্থক অন্য কোনো শব্দও ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন মুক্তিপণ কিংবা অব্যাহতি লাভ ইত্যাদি। খুলা' বা খুলা'র সমার্থক শব্দের পরিবর্তে অন্য কোনো শব্দ যদি ব্যবহার করা হয়, যথা স্বামী বললো, "এত টাকার বিনিময়ে তোমাকে তালাক দিলাম" এবং স্ত্রী তা গ্রহণ করলো তাহলে এটা হবে অর্থের বিনিময়ে তালাক, খুলা' হবেনা।

তবে ইবনুল কাইয়েম বলেছেন : "চুক্তির বাস্তবতা ও উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি দিলে যে শব্দ দ্বারাই বলা হোক, খুলা' দ্বারা বৈবাহিক সম্পর্কের অবসান বুঝাবে, চাই তা তালাক শব্দ দ্বারাই বলা হোক না কেন।" ইমাম আহমদের শিষ্যগণ, ইবনে তাইমিয়া ও ইবনে আব্বাসের মতও অনুরূপ। এরপর ইবনে তাইমিয়া পুনরায় বলেন : "যারা চুক্তির কার্যকারিতার ব্যাপারে শব্দকে গুরুত্ব দেয়, তারা তালাক শব্দ দ্বারা দেয়া খুলা'কে তালাকে রূপান্তরিত করেন।" ইবনে কাইয়েম এই মতটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে বলেন : "ফিকহ ও তার মূলনীতি অধ্যয়ন করলে জানা যায়, চুক্তির ক্ষেত্রে তার বাস্তব রূপটাই বিবেচ্য, তার শব্দ ও বাহ্যিক রূপ নয়। এর একটা প্রমাণ হলো, রসূলুল্লাহ সা. সাবেত বিন কায়েসকে আদেশ দিলেন যেন তার স্ত্রীকে খুলা'র জন্য তালাক দেয়। এতদসত্ত্বেও তার স্ত্রীকে এক হায়েয অবধি ইদ্দত পালন করতে বললেন। এ দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, খুলা তালাক শব্দ দ্বারা সংঘটিত হলেও তা আসলে বৈবাহিক বন্ধনের অবসান। তাছাড়া আল্লাহ তায়ালা এর উপর মুক্তিপণের বিধান নির্ভরশীল করেছেন এজন্যই যে, এটা মুক্তিপণ। আর মুক্তিপণ যে বিশেষ কোনো শব্দের সাথে নির্দিষ্ট নয় এবং আল্লাহ এর জন্য বিশেষ কোনো শব্দ নির্দিষ্ট করেননি। আর মুক্তিপণের বিনিময়ে অর্জিত তালাক শর্তযুক্ত তালাক, শর্তহীন তালাক নয়। অনুরূপ, তালাকের প্রত্যাহারযোগ্যতা এবং পবিত্রতার তিন মেয়াদ অবধি ইদ্দত পালন বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়। (যাদুল মায়াদ, ৪/২৭)

খুলা'র বিনিময় :

আগেই বলা হয়েছে, খুলা হলো, অর্থের বিনিময়ে বৈবাহিক সম্পর্কের অবসান ঘটানো। সুতরাং খুলা শব্দ দ্বারা যে চুক্তি বুঝায়, বিনিময় তার একটা মৌলিক ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং যেখানে কোনো বিনিময় নেই, সেখানে কোনো খুলাও নেই। স্বামী যদি স্ত্রীকে শুধু "তোমার সাথে খুলা' করলাম" বলেই চুপ থাকে এবং বিনিময়ের উল্লেখ না করে, তাহলে সেটা খুলা' হবেনা। আর যদি সে তালাকের নিয়ত করে, তবে সেটা রজয়ি তালাক হবে। আর আদৌ কোনো নিয়ত না থাকলে কিছুই হবেনা। কেন না এটা ইংগিতবাচক শব্দ, যার জন্য নিয়ত অপরিহার্য।

যা দ্বারা মোহর জায়েয, তা দ্বারা খুলার বিনিময় জায়েয :

শাফেয়ি মাযহাব মতে, সমগ্র মোহর, বা তার অংশ বিশেষ বা অন্য কোনো সম্পদের বিনিময়ে খুলা জায়েয, চাই তা মোহরের চেয়ে কম হোক বা বেশি হোক, অথবা বস্তু হোক, ঋণ হোক কিংবা সুযোগ সুবিধা হোক। এর বিধি হলো, "যা দ্বারাই মোহর দেয়া জায়েয হবে, তা দ্বারাই খুলার বিনিময় দেয়া জায়েয।" কেননা আল্লাহ অনির্দিষ্টভাবেই বলেছেন :

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ.

"স্ত্রী মুক্তিপণ হিসেবে যা কিছুই দিক, তাতে তাদের দু'জনের কোনো দোষ হবেনা।" আর যেহেতু খুলা একটি ভোগ্য দ্রব্য ভিত্তিক চুক্তি, তাই বিয়ের সাথে তার সাদৃশ্য রয়েছে। তাই খুলার বিনিময়ের সাথেও মোহরের সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক। খুলার বিনিময় এমন জিনিস হওয়া শর্ত, যা সম্পদ ও জ্ঞাত। সেই সাথে অন্য সকল বিনিময়ে যেসব শর্ত থাকে, এতেও সেসব শর্ত থাকা চাই, যেমন হস্তান্তরের সামর্থ্য থাকা এবং মালিকানার স্থিতি ইত্যাদি। কেননা খুলা একটা বিনিময় চুক্তি। তাই ওটা ক্রয় বিক্রয় ও মোহরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। বিশুদ্ধ খুলাতে এগুলোও বিশুদ্ধভাবে বিদ্যমান। পক্ষান্তরে অশুদ্ধ খুলাতে বিনিময় জ্ঞাত হওয়া শর্ত নয়। সুতরাং কোনো স্বামী যদি কোনো অজ্ঞাত জিনিসের বিনিময়ে স্ত্রীর সাথে খুলা করে। যেমন অনির্দিষ্ট কোনো বস্ত্র, অথবা "এই জন্তুর পিঠে যে মাল রয়েছে", অথবা কোনো অবৈধ শর্তে খুলা করে, তবে বায়েন তালাক হবে এবং স্ত্রী মোহরে মিসল পাবে। অবৈধ শর্তের উদাহরণ : স্ত্রী গর্ভবতী থাকাকালে তার ভরণ পোষণ করা হবে না, কিংবা বাসস্থান দেয়া হবেনা, অথবা মেয়াদের জন্য এক হাজার টাকা দেয়ার বিনিময়ে খুলা করা ইত্যাদি।

খুলা দ্বারা দম্পতির মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হওয়ার কারণ হলো, খুলা বিয়ে ভঙ্গ অথবা তালাক ছাড়া তৃতীয় কিছু নয়। যদি তা বিয়ে ভঙ্গ হয়, তবে যেহেতু বিনিময় (অর্থাৎ মোহর) অশুদ্ধ হলে বিয়ে অশুদ্ধ হয়না, তাই বিয়ে ভঙ্গ হওয়াও অশুদ্ধ হবেনা। আর যদি তালাক হয়, তবে তালাক কোনো বিনিময় ছাড়াও সংঘটিত হয়। আর যে জিনিস বিনিময় ছাড়াও অর্জিত হয়, তা বিনিময় অশুদ্ধ হলেও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। যেমন বিয়ে। বরঞ্চ বিয়ে আরো উত্তমভাবে সম্পন্ন হয়। তালাক বিনিময় ছাড়াই সংঘটিত হয় এজন্য যে, তালাক অত্যন্ত শক্তিশালী। তা আপনা থেকেই কার্যকরী হয় এবং তাৎক্ষণিকভাবেই হয়। মোহর মিসল দেয়ার বাধ্যবাধকতার কারণ হলো, এক বিনিময় বাতিল হলে অন্য বিনিময় ফিরে পাওয়া যায়। কিন্তু বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার পর স্ত্রী আর ফিরে পাওয়া যায়না। কাজেই তার পরিবর্তে অন্য কিছু ফেরত দেয়া অনিবার্য। আর আমরা যার উল্লেখ করেছি, তার সাথে এমন জিনিসকে কিয়াস কর যায়, যা তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা যে জিনিস কোনো জিনিসের অংশ নয়, তা অজ্ঞাত থাকলে কোনো ক্ষতি নেই। মোহর তেমনি একটি জিনিস। এর একটি উদাহরণ হলো, কেউ তার স্ত্রীকে তার (স্ত্রীর) মুঠোয় যা আছে, তার বিনিময়ে খুলা করার প্রস্তাব দিলো, অথচ স্বামী ঐ জিনিসটি কি জানেনা। এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর ওপর মোহরে মিসলের বিনিময়ে বায়েন তালাক কার্যকর হবে। আর যদি তার মুঠোয় কিছুই না থেকে থাকে, তাহলে কারো মতে, রজয়ি তালাক হবে, আবার কেউ বলেন, মোহরে মিসলের বিনিময়ে বায়েন তালাক হবে। মালেকীদের মতে, অনিশ্চিত বস্তুর বিনিময়ে খুলা জায়েয, যেমন অমুক গাভীর পেটে যে বাছুর আছে তার বিনিময়ে। পরে পেটের বাছুর মারা গেলে স্বামী কিছুই পাবেনা। স্ত্রীর উপর বায়েন তালাক কার্যকর হবে। অনুরূপ অনির্দিষ্ট কোনো জিনিসের বিনিময়ে, যে ফল বা ফসল এখনো কাটার যোগ্য হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়নি তার বিনিময়ে এবং সন্তানের প্রতিপালনের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দানের বিনিময়েও খুলা করা জায়েয। এক্ষেত্রে প্রতিপালনের অধিকার স্বামীর উপর অর্পিত হবে। আর কেউ কোনো হারাম জিনিস, যথা মদ বা জ্ঞাত চোরাই মালের বিনিময়ে খুলা করলে স্বামী কিছুই পাবেনা। এক্ষেত্রে স্ত্রীর উপর বায়েন তালাক পড়বে, মদ ফেলে দিতে হবে এবং চোরাই মাল তার মালিকের নিকট ফেরত পাঠাতে হবে। এর বিনিময়ে অন্য কিছু দিতে স্ত্রী বাধ্য থাকবেনা। বিনিময়ের জিনিসটি যে হারাম, তা স্বামীর

জানা থাকাই যথেষ্ট। স্ত্রী জানুক বা না জানুক, কিছুই এসে যায়না। তবে জিনিসটি যে হারাম তা যদি স্ত্রী জানে কিন্তু স্বামী জানেনা, তাহলে স্বামী খুলা গ্রহণ করতে বাধ্য নয়।

স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া জিনিসের চেয়ে অতিরিক্ত কিছু দিয়ে খুলা করা :

অধিকাংশ ফকিহর মতে, খুলার বিনিময়ে স্বামী স্ত্রীর কাছ থেকে ইতিপূর্বে স্ত্রীকে যা কিছু দিয়েছিল তার চেয়ে বেশি জিনিস আদায় করতে পারবে। কেননা আল্লাহ বলেছেন : فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ "স্ত্রী মুক্তিপণ হিসেবে যা কিছুই দেয়, তার ভিত্তিতে খুলা করা দম্পতির জন্য বৈধ।" (আল বাকারা, ২২৯) এখানে 'যা কিছু' শব্দ ব্যাপক অর্থবোধক। কম বা বেশি যাই হোক এর আওতাভুক্ত। বায়হাকি আবু সাঈদ খুদরি থেকে বর্ণনা করেন : "আমার বোন জনৈকা আনসারীর স্ত্রী ছিলো। একদিন উভয়ে রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে এলো। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তোমার স্বামীর দেয়া বাগানটা কি তাকে ফেরত দেবে? সে বললো : জ্বি। আরো কিছু বেশি দেবো। অতপর সে তার বাগান ও অতিরিক্ত কিছু দিলো। (হাদিস বিশারদগণ এ হাদিসকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন)

কিছু সংখ্যক আলেমের মতে, স্বামী স্ত্রীকে যা কিছু দিয়েছিল তার চেয়ে বেশি আদায় করা তার জন্য বৈধ নয়। কেননা দার কুতনিতে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে : "আবুয যুবাইর বললেন : আমি ওকে (স্ত্রীকে) একটা বাগান মোহর হিসেবে দিয়েছিলাম। রসূলুল্লাহ সা. তার স্ত্রীকে বললেন : তোমাকে যে বাগানটি সে দিয়েছিল তা কি তুমি তাকে ফেরত দেবে? সে বললো : হ্যাঁ, আরো বেশি দেবো। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : বেশি দিতে হবেনা। তবে ওর বাগানটা দিয়ে দাও। মহিলা বললো : ঠিক আছে। এই বিধিতে মতভেদের মূল কারণ হলো, একজন বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদিস দ্বারা কুরআনের ব্যাপক অর্থবোধক শব্দকে নির্দিষ্ট বা সীমিত অর্থবোধক করা যাবে কিনা তা নিয়ে মতবিরোধ। যিনি মনে করেন যাবে, তিনি এই হাদিসের আলোকে বলেন, বেশি নেয়া যাবেনা। আর যিনি মনে করেন যাবেনা, তার মতে, বেশি নেয়া জায়েয। "বিদায়াতুল মুজতাহিদ" গ্রন্থে বলা হয়েছে :

"যিনি খুলার বিনিময়কে অন্য সমস্ত লেনদেনের বিনিময়ের মতোই মনে করেন, তিনি মনে করেন, বিনিময়ের পরিমাণটা দু'পক্ষের সম্মতিক্রমেই স্থির হবে। আর যিনি হাদিসটিকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করেন, তার মতে একটুও বেশি নেয়া বৈধ নয়। তার দৃষ্টিতে এটা হবে অবৈধভাবে অন্যের মাল গ্রহণ।

বিনা কারণে খুলা :

খুলা শুধু তখনই জায়েয, যখন কোনো সংগত কারণে তার দাবি জানাবে। যেমন স্বামীর মধ্যে কোনো দৈহিক খুঁত থাকা, চারিত্রিক দোষ থাকা, স্ত্রীকে তার হক বা অধিকার না দেয়া, স্ত্রীর মনে এমন আশংকার সৃষ্টি হওয়া যে, সে হয়তো আল্লাহর সীমা রক্ষা করতে তথা আল্লাহর বিধান অনুসারে দাম্পত্য জীবন যাপন করতে পারবেনা, যেমন স্বামীর সাথে যে ধরনের সদাচারের সাথে বসবাস করা তার কর্তব্য, তা পারবেনা, যেমনটি আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে। এ ধরনের কোনো কারণ না থাকলে খুলা নিষিদ্ধ। কেননা আহমদ ও নাসায়ী আবু হুরায়রা থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন : "কৃত্রিমভাবে খুলা গ্রহণকারী মহিলারা মুনাফিক।" আলেমগণ বিনা কারণে খুলা গ্রহণ করাকে মাকরূহ বলেছেন।

স্বামী স্ত্রীর সম্মতিক্রমে খুলা :

স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের সম্মতিতেই খুলা হওয়া উচিত। কিন্তু স্বামী সম্মত না হলে আদালত তাকে বাধ্য করতে পারবে। কেননা সাবেত ও তার স্ত্রী যখন রসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে তাদের বিরোধ মিমাংসার জন্য গিয়েছিলেন, তখন রসূল সা. সাবেতকে বাগান গ্রহণপূর্বক তালাক দিতে বাধ্য করেছিলেন।

খুলাতে স্ত্রীর বিক্ষুব্ধ হওয়াই যথেষ্ট :

শওকানি বলেছেন : খুলা সম্পর্কে যে সকল হাদিস রয়েছে, তা থেকে সামগ্রিকভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, শুধুমাত্র স্ত্রীর বিক্ষোভ ও অসন্তোষ খুলার জন্য যথেষ্ট। ইবনুল মুনযিরের মতে, উভয়ের ক্ষোভ ও অসন্তোষ ছাড়া খুলা জায়েয হবেনা। তিনি আয়াতের প্রকাশ্য ও আক্ষরিক অর্থই গ্রহণ করেছেন। তাউস, শাবি ও তাবেয়িদের একটি দল এই মতের সমর্থক। তাবারী প্রমুখসহ তাবেয়িদের আরেকটি দল এর জবাবে বলেন : আয়াতের তাৎপর্য হলো, স্ত্রী যখন স্বামীর অধিকার দেয়না, তখন সেটা তার প্রতি স্বামীর বিক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই এ কারণে বিক্ষোভটিকে স্ত্রীর বিক্ষোভ বলে উল্লেখ করা হয়। সাবেতের স্ত্রী যখন স্বামীর প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করলো, তখন স্ত্রীর প্রতি সাবেতের কোনো ক্ষোভ আছে কিনা, এ কথা রসূল সা.-এর জিজ্ঞাসা না করা থেকে প্রতীয়মান হয়, স্বামীর ক্ষোভ এ ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় নয়।

খুলা নিতে বাধ্য করার জন্য স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহার করা হারাম :

স্ত্রীর কিছু কিছু অধিকার দিতে অস্বীকার করে তাকে কষ্ট দেয়া ও নির্যাতন করা, যাতে সে উত্যক্ত ও দিশেহারা হয়ে খুলা করতে বাধ্য হয়, স্বামীর উপর হারাম। এমন কাজ করলে খুলা বাতিল হবে এবং প্রদত্ত বিনিময় ফেরত দিতে হবে। এমন কি আদালত কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে দিয়ে থাকলেও ফেরত দিতে হবে। এটা হারাম করা হয়েছে এজন্য, যেন স্ত্রীর উপর একই সাথে স্বামীহারা হওয়া ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া- এই দ্বিবিধ বিপদ একত্রিত না হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ

অর্থ : হে মুমিনগণ, জবরদস্তিমূলকভাবে নারীদেরকে উত্তরাধিকার গণ্য করা তোমাদের জন্য হালাল নয়। আর তাদেরকে তোমরা যা কিছু ইতিপূর্বে দিয়েছ, তা ফেরত নেয়ার উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটকে রেখোনা ও নিপীড়ন করোনা।" (সূরা নিসা : আয়াত ১১)

وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَـٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ○

অর্থ : আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও এবং তাদের একজনকে প্রচুর অর্থও দিয়ে থাকো, তবুও তা থেকে কিছুই গ্রহণ করোনা। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য অন্যায়ের মাধ্যমে তা গ্রহণ করবে?"

কতক আলেমের মতে, আটক রাখা ও নির্যাতন করা হারাম হলেও খুলা এ ক্ষেত্রে কার্যকর

হবে। তবে ইমাম মালেকের মতে খুলা কার্যকর হবে তালাক হিসেবে। আর স্ত্রীর কাছ থেকে গৃহীত বিনিময় ফেরত দেয়া স্বামীর জন্য বাধ্যতামূলক।

পবিত্রাবস্থায় ও হায়েয চলাকালে খুলা জায়েয :

পবিত্রাবস্থা ও হায়েয উভয় অবস্থায় খুলা জায়েয। এর জন্য কোনো ধরা বাঁধা সময় নির্দিষ্ট নেই। কেননা আল্লাহ এর জন্য কোনো সময় নির্দিষ্ট করেননি। তিনি বলেছেন : "স্ত্রী যা কিছু মুক্তিপণ দেয়, তার বিনিময়ে খুলা করা দম্পতির জন্য বৈধ।" তাছাড়া, রসূলুল্লাহ সা. সাবেতের স্ত্রীর জন্য যখন খুলার ফায়সালা দিলেন, তখন স্ত্রীর অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ খবর নেননি। অথচ মহিলাদের যে কোনো সময় হায়েয থাকা কোনো বিরল ব্যাপার নয়।

ইমাম শাফেয়ি বলেছেন : "পরিস্থিতির বিভিন্নতার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তা যাচাই বাছাই এর কোনো উদ্যোগ না নেয়া থেকে বুঝা যায় যে, খুলা সকল অবস্থায়ই হতে পারে। রসূল সা. জানতে চাননি মহিলা হায়েয অবস্থায় রয়েছে কিনা। বস্তুত হায়েয অবস্থায় যা নিষিদ্ধ তা হলো তালাক, যাতে স্ত্রীর ইদ্দতকাল প্রলম্বিত না হয়। অথচ খুলা ঠিক তার বিপরীত ব্যাপার। এখানে স্ত্রীই বিচ্ছেদ প্রার্থনা করে, খুলা চায় এবং স্বেচ্ছায় দীর্ঘ বিচ্ছেদে সম্মত হয়।

স্বামী ও তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যে খুলা :

তৃতীয় কোনো ব্যক্তি যদি স্বামীর সাথে এই মর্মে একমত হয় যে, সে তার স্ত্রীর সাথে খুলা করবে এবং এই তৃতীয় ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি দেয় যে, সে স্বামীকে খুলার বিনিময় প্রদান করবে। তাহলে বিচ্ছেদ কার্যকর হবে এবং উক্ত তৃতীয় ব্যক্তি স্বামীকে প্রতিশ্রুত বিনিময় দিতে বাধ্য থাকবে। এক্ষেত্রে খুলা স্ত্রীর সম্মতির উপর নির্ভরশীল থাকবেনা। কেননা স্বামী তার স্ত্রীর সম্মতি ব্যতিরেকে স্বউদ্যোগে তালাক দেয়ার অধিকারী। বিনিময় দেয়াটা সেই ব্যক্তির জন্য বাধ্যতামূলক, যে তা দেয়ার দায়িত্ব নিয়েছে। আবু সাওরের মতে, এটা বৈধ নয়। কেননা এটা একটা শঠতা। তৃতীয় ব্যক্তিটি এমন স্থানে বিনিময় দিচ্ছে, যার বদলায় সে কোনো মুনাফা পাবেনা। মালেকীদের কোনো কোনো ফকিহ এক্ষেত্রে শর্ত আরোপ করেছেন যে, কোনো সদুদ্দেশ্য সাধন কিংবা কোনো অকল্যাণ প্রতিরোধ এর উদ্দেশ্য হওয়া চাই। যদি স্ত্রীর ক্ষতিসাধন এর উদ্দেশ্য হয়, তবে বৈধ হবেনা। 'মাওয়াহিবুল জলিল' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে : "তৃতীয় ব্যক্তি কর্তৃক স্বামীকে বিনিময় দানের পশ্চাতে উক্ত তৃতীয় ব্যক্তির এমন কোনো উপকার বা কল্যাণ লাভ ও ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্য থাকা চাই, যা দ্বারা স্ত্রীর ক্ষতিসাধন কাম্য না হয়।"

খুলা নারীর কর্তৃত্ব নিজের হাতে এনে দেয় :

অধিকাংশ আলেম, বিশেষত চার ইমামের অভিমত হলো, পুরুষ যখন তার স্ত্রীর সাথে খুলা করে, তখন স্ত্রীর নিজের উপর কর্তৃত্ব লাভ করে। এরপর পুরুষ আর তা প্রত্যাহার করতে পারেনা। কেননা স্ত্রী দাম্পত্য বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যই অর্থ ব্যয় করেছে। স্বামীর যদি এটা প্রত্যাহার করার ক্ষমতা থাকতো তবে তার অর্থ ব্যয় করে স্বামীর কাছ থেকে মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত হওয়ার কোনো সার্থকতা থাকতোনা। এমনকি স্বামী যদি স্ত্রীর কাছ থেকে নেয়া মুক্তিপণ ফিরিয়েও দেয় এবং স্ত্রী তা গ্রহণ করে, তথাপি স্বামী ইদ্দতের মধ্যে খুলা প্রত্যাহার করতে পারবেনা। কেননা খুলার মাধ্যমে তার উপর বায়েন তালাক পড়ে গেছে এবং সে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তবে ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীর কাছ থেকে নেয়া অর্থ বা দ্রব্য ফেরত দিতে হবে এবং প্রত্যাহারের উপর সাক্ষী রাখতে হবে। তবে

এক্ষেত্রে স্ত্রী সম্মত থাকলে তার ইদ্দতকালে তাকে নতুন আকদের মাধ্যমে বিয়ে করা স্বামীর জন্য জায়েয।

বুদ্ধিমতী বালিকার খুলা :

হানাফিদের মতে, স্ত্রী যদি অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকা হয়, কিন্তু ভালোমন্দ বাছবিচারের ক্ষমতাসম্পন্না হয় তখন স্বামী তার সাথে খুলা করলে তার উপর রজয়ি তালাক পড়বে এবং স্ত্রী কোনো অর্থ দিতে বাধ্য থাকবেনা। তালাক পড়ার কারণ হলো, স্বামী তালাক সম্বলিত যে উক্তি করে, তার অর্থ স্ত্রী গ্রহণ করার উপর তালাক নির্ভরশীল। তালাক যিনি দিয়েছেন, তিনি তালাক দেয়ার যোগ্য। তাই তালাককে নির্ভরশীল করা বৈধ। আর যার উপর নির্ভরশীল, তা হলো, তা গ্রহণ করার যোগ্যতা রাখে এমন ব্যক্তি কর্তৃক তা গ্রহণ করা এবং তা এখানে বিদ্যমান। কারণ গ্রহণ করার যোগ্যতা সৃষ্ট হয় ভালোমন্দ বাছবিচারের ক্ষমতা থেকে। স্ত্রী যেহেতু অপ্রাপ্তবয়স্কা হলেও ভালোমন্দ্র বাছবিচারের ক্ষমতাসম্পন্না, তাই তার গ্রহণযোগ্যতা বিদ্যমান। আর এটা বিদ্যমান বলেই এর উপর নির্ভরশীল তালাক কার্যকর হবে। স্ত্রীর উপর অর্থদানের বাধ্যবাধকতা না থাকার কারণ হলো, সে অপ্রাপ্তবয়স্কা বিধায় দান করার যোগ্য নয়। কেননা দান করার যোগ্যতার জন্য প্রাপ্তবয়স্কতা বুদ্ধিমত্তা এবং রোগ বা নিবুর্দ্ধিতাজনিত লেনদেনের অধিকার রহিত না হওয়া শর্ত। তালাকটা রজয়ি হওয়ার কারণ হলো, অর্থ দেয়ার বাধ্যবাধকতা প্রমাণিত না হওয়ায় তালাক আর্থিক বিনিময় ছাড়াই সংঘটিত হয়েছে। আর এ ধরনের তালাক রজয়িই হয়ে থাকে।

বাছবিচারের ক্ষমতাহীন অপ্রাপ্তবয়স্কার খুলা :

বাছবিচারের ক্ষমতাহীন অপ্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীর খুলা আদৌ তালাক হিসেবে কার্যকর হয়না। কেননা তালাক গ্রহণের যোগ্যতা রাখে এমন ব্যক্তি একে গ্রহণ করেনি। অথচ এই গ্রহণ করার উপর তালাক নির্ভরশীল।

লেনদেনের অধিকার রহিত স্ত্রীর খুলা :

ফকিহগণ বলেছেন, যখন নির্বুদ্ধিতার কারণে স্ত্রীর লেনদেনের অধিকার রহিত হয়, তখন যদি তার স্বামী অর্থের বিনিময়ে তার সাথে খুলা করে এবং স্ত্রী তা গ্রহণ করে, তাহলে ঐ অর্থ দিতে স্ত্রী বাধ্য থাকবেনা এবং তার উপর রজয়ি তালাক কার্যকর হবে। কেননা অর্থ দানের যোগ্যতা না থাকার দিক দিয়ে সে ভালোমন্দ বাছবিচারের ক্ষমতাসম্পন্না অপ্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীর মতো। তবে সে গ্রহণ করার যোগ্য।

অপ্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীর অভিভাবক ও তার স্বামীর মধ্যে খুলা :

অপ্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীর স্বামী ও অভিভাবকের মধ্যে যখন খুলা হবে, তখন তার উপর তালাক পড়ে যাবে, তবে অর্থ দান তার জন্যও বাধ্যতামূলক নয়, তার অভিভাবকের জন্যও নয়। এর উদাহরণ এ রকম : অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়ের পিতাকে তার স্বামী বললো, আপনার মেয়ের সাথে তার মোহরের বিনিময়ে কিংবা স্ত্রীর সম্মতি থেকে একশ' পাউন্ডের বিনিময়ে খুলা করছি। এক্ষেত্রে পিতা বিনিময় দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ না করেই বলেছে, গ্রহণ করলাম।

এখানে তালাক কার্যকর হবে এজন্য যে, শতর্যুক্ত তালাক শর্তপূরণ হলেই কার্যকর হয়। পিতা বা অভিভাবকের পক্ষ থেকে গ্রহণ করাটাই ছিলো এখানে শর্ত, যা পূর্ণ হয়েছে। পক্ষান্তরে অর্থ প্রদানে স্ত্রী বাধ্য না হওয়ার কারণ হলো, সে অর্থ দান করার যোগ্য নয়। পিতার বাধ্য না হওয়ার কারণ হলো, তিনি এই বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করেনি। গ্রহণ করা ছাড়া এ বাধ্যতবাধকতা আরোপিত হয়না। তবে তিনি গ্রহণ করলে ও নিশ্চয়তা দিলে

দিতে বাধ্য হবেন। কেউ কেউ বলেন, এক্ষেত্রে তালাক পড়বেনা। কেননা এর জন্য শর্ত হলো, বিনিময় গ্রহণ করা, যা বাস্তবে ঘটেনি। এ উক্তি বাহ্যত সঠিক। কিন্তু প্রথমোক্ত মতই অনুসৃত হয়ে আসছে।

রোগিণীর খুলা :

মৃত্যুমুখি রোগিণীর খুলা যে বৈধ, সে ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। সে সুস্থের মতই স্বামীর সাথে খুলা করতে পারে। তবে কী পরিমাণ বিনিময় স্বামীকে দিতে পারবে, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কারণ স্বামীর মন রক্ষা করতে গিয়ে উত্তরাধিকারীদের ক্ষতিসাধন করা থেকে তাকে বিরতে থাকতে হবে। ইমাম মালেক বলেছেন, এই বিনিময়টা স্ত্রীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে স্বামীর প্রাপ্য উত্তরাধিকারের চেয়ে বেশি হতে পারবেনা। বেশি হলে তা ফেরত দিতে হবে এবং তালাক কার্যকর হবে। আর স্বামী সুস্থ থাকা অবস্থায় উভয়ের মধ্যে কোনো উত্তরাধিকার লেনদেন হবেনা। হাম্বলীদের মত মালেকীদের মতোই। উত্তরাধিকারের চেয়ে বেশি বিনিময় দিলে তা বাতিল হবে। শাফেয়ি বলেছেন, মহরে মিসলের সমপরিমাণ বিনিময় দিয়ে খুলা করলে জায়েয হবে। তার চেয়ে বেশি দিলে উত্তরাধিকারের এক তৃতীয়াংশ থেকে দিতে হবে এবং তা ঐচ্ছিক দান গণ্য হবে। হানাফিগণ স্ত্রীর মালিকানাধীন সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের বেশি বিনিময় না দেয়ার শর্তে খুলা জায়েয বলেছেন। তাদের মতে, এটা ঐচ্ছিক দান গণ্য হবে। মৃত্যুমুখি ব্যক্তির রোগশয্যা থেকে দান ওসিয়ত গণ্য হয়ে থাকে। আর ওসিয়ত কোনো তৃতীয় ব্যক্তির জন্য করলে তা এক তৃতীয়াংশ থেকেই করতে হবে। নচেত কার্যকর হবেনা। খুলার কারণে স্বামী তৃতীয় ব্যক্তিতে পরিণত হয়। তারা বলেন, ইদ্দতকালে খুলাকারী রোগিণী যদি মারা যায়, তবে নিম্নোক্ত জিনিসগুলোর মধ্যে যেটি ন্যূনতম, তা তার স্বামীর প্রাপ্য হয় : খুলার বদলা বা বিনিময়, স্ত্রীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ এবং স্ত্রীর কাছ থেকে প্রাপ্য স্বামীর মোট উত্তরাধিকার। কেননা স্ত্রীর মৃত্যুমুখি অসুস্থতার সময়ে স্বামীর প্রতি প্রায়ই অনুরক্ত হয়ে যায় এবং তার জন্য মোটা অংকের অর্থ খুলার বিনিময় হিসেবে দিতে রাজি হয়, যা তার পাওনা উত্তরাধিকারের চেয়ে বেশি। কাজেই স্ত্রীর উত্তরাধিকারীদের পাওনা রক্ষার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বনের খাতিরে এবং স্বামীর মন রক্ষার উদ্দেশ্যে আমরা বলেছি যে, স্ত্রী যদি ইদ্দতের মধ্যে মারা যায় তাহলে স্বামী উক্ত তিনটির মধ্যে যেটি সর্বনিম্নে, তা পাবে। আর যদি ঐ রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করে এবং মারা না যায়, তাহলে নির্ধারিত বিনিময়ের পুরোটাই স্বামী পাবে। কেননা তার ঐ কাজটা যে মরণব্যাধির সময়ে হয়নি, তা স্পষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু সে যদি ইদ্দত শেষ হবার পর মারা যায়, তাহলে স্বামী উভয়ের সম্মতিতে নির্ধারিত খুলার বিনিময় পাবে। কিন্তু শর্ত এই যে, তা যেন তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের বেশি না হয়। কেননা এটা ওসিয়তের সমপর্যায়ের।

বর্তমানে মিশরে ১৯৪৬ সালের আইন চালু হওয়ার পর আদালতে যে ব্যবস্থা চলছে, তা হলো, স্বামী খুলার বিনিময় ও স্ত্রীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ এই দুটির যেটি ন্যূনতম, সেটি পায়, চাই স্ত্রী ইদ্দতের মধ্যে মারা যাক বা ইদ্দতের পরে মারা যাক। কেননা এই আইন উত্তরাধিকারী ও অনুত্তরাধিকারী উভয়ের জন্য ওসিয়ত বৈধ করেছে। এ আইনে অনূর্ধ এক তৃতীয়াংশের মধ্য থেকে ওসিয়ত কার্যকর হবে এবং তা কারো অনুমতি সাপেক্ষ হবেনা। এ কারণে স্বামীর প্রাপ্য বিনিময়ের চেয়ে বেশি দিয়ে স্বামীর প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করতে স্ত্রীকে বাধা দেয়ার ও বিরত রাখার প্রয়োজন পড়েনা।

খুলা কি তালাক না বিচ্ছেদ ?

অধিকাংশ আলেমের মতে, খুলা বায়েন তালাক। কেননা ইতিপূর্বে আমরা একটা হাদিস উল্লেখ করেছি, যাতে রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "বাগানটা নিয়ে নাও এবং ওকে তালাক দাও।" আর যেহেতু বিচ্ছেদে স্বামী আর কোনো নিয়ন্ত্রণ ফিরে পায়না, অথচ খুলাতে নিয়ন্ত্রণ ফিরে পায়, তাই এটা বিচ্ছেদ নয়।

আবার আহমদ, দাউদ, ইবনে আব্বাস, উসমান ও ইবনে উমর রা. প্রমুখের মতে, এটা বিচ্ছেদ, তালাক নয়। কেননা আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, তালাক দু'বার। তারপর খুলার বিবরণ দিয়ে বলেছেন : "এরপর যদি সে স্ত্রীকে পুনরায় তালাক দেয়, তাহলে ঐ স্ত্রীর অতপর অন্য স্বামীর সাথে বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য হালাল হবেনা।" (বাকারা : ২৩০)

সুতরাং খুলা যদি তালাক হতো, তাহলে যে তালাকের পর অন্য স্বামীকে বিয়ে না করলে স্ত্রী হালাল হয়না, তা চতুর্থ তালাক হতো।

এ সকল ফকিহ বলেন, দু'পক্ষের সম্মতিক্রমে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয় যেমন, 'ইকালা'র মাধ্যমে ক্রয় বিক্রয় বাতিল করা যায়।

ইবনুল কাইয়েম বলেন, খুলা যে তালাক নয় তার প্রমাণ হলো, আল্লাহ তায়ালা সহবাসের পর দেয়া তিনের কম তালাকের জন্য তিনটে বিধি নির্ধারণ করেছেন, যার প্রত্যেকটাই খুলার পরিপন্থী :

প্রথমত: স্বামী তা প্রত্যাহার করার ক্ষমতা রাখে।

দ্বিতীয়ত: তা তিন তালাকের একটি বলে পরিগণিত হয়। কাজেই তিনটে সম্পূর্ণ হবার পর অন্য স্বামীর সাথে সহবাস না করা পর্যন্ত সে আর হালাল হয়না।

তৃতীয়ত: এতে তিন হায়েযকে ইদ্দত গণ্য করা হয়।

কুরআন সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত যে, খুলা প্রত্যাহারের কোনো অবকাশ নেই। আর সুন্নাহ ও সাহাবিগণের বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, এর ইদ্দত মাত্র এক হায়েয। তালাক হলে ইদ্দত হতো তিন হায়েয। কুরআন হাদিস থেকে এও জানা গেছে যে, দুই তালাকের পর এবং তারপর তৃতীয় তালাক হওয়ার পরও খুলা জায়েয। এ থেকে স্পষ্ট যে, খুলা তালাক নয়। এই মতভেদের ফলাফল তালাকের ইদ্দত দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায়। যারা খুলাকে তালাক মনে করে, তারা একে একটা বায়েন তালাক গণ্য করে। আর যারা একে শুধুই বিচ্ছেদ মনে করেন তারা একে বায়েন তালাক গণ্য করেন। যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে দুই তালাক দেয়, তারপর খুলা করে, তারপর তাকে বিয়ে করতে চায়, তার জন্য এটা জায়েয। এজন্য অন্য স্বামীকে বিয়ে করার প্রয়োজন সেই। কেননা এখানে তালাক মাত্র দুটো হয়েছে। আর খুলা তো তালাক নয়। যারা খুলাকে তালাক গণ্য করে, তাদের মতে, অন্য স্বামীর ঘর না করা পর্যন্ত তাকে আর বিয়ে করা জায়েয নয়। সেখানে সে খুলা দ্বারা তিন তালাক পূর্ণ করেছে।

খুলাকারিণীকে কি তালাক দেয়া যায়?

খুলাকারিণীকে অতপর আর কোনো তালাক দেয়া যাবেনা, চাই তালাককে আমরা তালাক বা বিচ্ছেদ, যাই গণ্য করি। উভয়টি স্ত্রীকে তার স্বামীর নিকট পরস্ত্রী বানিয়ে দেয়। আর পরস্ত্রীর উপর তো তালাক পড়তে পারেনা। কিন্তু আবু হানিফা বলেন, খুলাকারিণীর উপরও তালাক পড়তে পারে। এ কারণে তার মতে, খুলা দ্বারা বিচ্ছেদ হওয়ার পরও ঐ স্ত্রীর বোনকে বিয়ে করা জায়েয নয়।

খুলা কারিনীর ইদ্দত :

সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত, খুলার ইদ্দত এক হায়েয। সাবেতের ঘটনায় রসূল সা. তাকে বললেন : "তোমার কাছে তোমার স্ত্রীর যা প্রাপ্য, তা তুমি নিয়ে নাও এবং ওকে মুক্ত করে দাও।" সাবেত বললেন, ঠিক আছে। অতপর রসূল সা. তার স্ত্রীকে এক হায়েয ইদ্দত পালনের পর বাপের বাড়ি চলে যাওয়ার আদেশ দিলেন। (নাসায়ী)

এটা উসমান, ইবনে আব্বাস, আহমদ, ইসহাক বিন রাহওয়াই ও ইবনে তাইমিয়ার মত। ইবনে তাইমিয়া বলেন : "যে ব্যক্তি এ বক্তব্য নিয়ে চিন্তা করবে, সে দেখতে পাবে, এটাই শরিয়ত সম্মত। কেননা ইদ্দত করা হয়েছে তিন হায়েয, যাতে প্রত্যাহারের জন্য দীর্ঘ সময় পাওয়া যায়। স্বামী চিন্তাভাবনা করে ইদ্দতের মধ্যে প্রত্যাহার করতে পারবে। যদি প্রত্যাহার না হয়, তবে এর উদ্দেশ্য জরায়ুকে ভ্রূণ থেকে মুক্ত করা। সে ক্ষেত্রে একটা হায়েযই ইদ্দত হিসেবে যথেষ্ট।"

ইবনুল কাইয়েম বলেছেন : এটা আমীরুল মুমিনীন উসমান, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, রুবাঈ বিনতে মুয়াওয়ায ও তার চাচা, যিনি একজন বিশিষ্ট সাহাবি, এদের সকলের মত। এই চারজন সাহাবির সাথে কেউ ভিন্নমত পোষণ করেছেন বলে জানা যায়না। যেমন নাফে থেকে বর্ণিত, তিনি শুনেছেন রুবাঈ বিন মুওয়ায আব্দুল্লাহ ইবনে উমরকে জানিয়েছেন, তিনি অর্থাৎ রুবাঈ উসমান বিন আফফানের আমলে স্বামীর কাছ থেকে খুলা করেছিলেন। এরপর তার চাচা উসমান রা.-এর নিকট এলেন। তাকে বললেন : মুওয়াবেযের মেয়ে আজ তার স্বামীর কাছ থেকে খুলা করেছে। সে কি স্বামীর বাড়ি থেকে চলে আসবে? উসমান (রা) বললেন : অবশ্যই চলে আসবে। উপরন্তু তাদের কেউ কারো উত্তরাধিকারী হবেনা এবং স্ত্রীর ইদ্দতও পালন করতে হবেনা। তবে একটা হায়েয অতিবাহিত না করে সে বিয়ে করতে পারবেনা। কেননা তার গর্ভে সন্তান থাকতে পারে। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. এরপর বললেন : উসমান রা. আমাদের সবার চেয়ে উত্তম ও সবার চেয়ে জ্ঞানী। "আন নাসেখ ওয়াল মানসূখ" নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, এটা সাহাবিদের সর্বসম্মত মত। কিন্তু অধিকাংশ আলেমের মতে, খুলাকারিণী যদি হায়েযের বয়সী হয় তবে তার ইদ্দত তিন হায়েয।

স্বামীর রূঢ় আচরণ

স্ত্রী যখন নিজের রোগব্যাধি, বার্ধক্য কিংবা কুৎসিত চেহারার কারণে স্বামীর অসদাচরণ বা উপেক্ষার আশংকা করে, তাহলে তারা উভয়ে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে একটা আপোস করে নিলে কোনো দোষ নেই। এ ধরনের আপোসে যদি স্ত্রীকে নিজের কিছু অধিকার ছেড়ে দিতে হয়, তবে তাও দেয়া যেতে পারে। কেননা আল্লাহ বলেন :

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ م بَعْلِهَا نُشُوزًا طاَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ط وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ط

অর্থ : যদি কোনো মহিলা তার স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ বা উপেক্ষার আশংকা করে, তবে তারা উভয়ে নিজেদের মধ্যে একটা আপোস করে নিলে তাতে কোনো পাপ নেই। বরঞ্চ আপোসই ভালো।" (সূরা নিসা : আয়াত ১২৮)

বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে, আয়েশা রা. এ আয়াত সম্পর্কে বলেন : "এ হচ্ছে সেই মহিলা,

যে স্বামীর নিকট অবস্থান করে, স্বামী তার কাছে বেশি সঙ্গ আশা করেনা, অতপর তালাক দিতে চায় এবং তার বর্তমানে অন্য বিয়ে করতে চায়, তখন স্ত্রী বলে, আমাকে বহাল রাখো, তালাক দিওনা, আমার বর্তমানে আরেকজনকে বিয়ে করো। আমার খোরপোষ ও আমার কাছে থাকার পালা তুমি যেভাবে চাও বন্টন করো।" আবু দাউদ আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেন : উম্মুল মুমিনীন সওদা বিনতে যাময়া যখন বুড়ি হয়ে গেলেন এবং আশংকা করলেন যে, রসূল (সা) তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারেন, তখন বললেন : "হে রসূলুল্লাহ, আমার দিনটি আয়েশার জন্য।" এ প্রস্তাব রসূলুল্লাহ সা. গ্রহণ করলেন। আয়েশা রা. বলেন, এ ঘটনা প্রসঙ্গেই আল্লাহ্ নাযিল করলেন, "যদি কোনো মহিলা তার স্বামীর পক্ষ থেকে উপেক্ষার আশংকা করে--"

আল মুগনিতে বলা হয়েছে : স্ত্রী যখন নিজের খোরপোষ বা পালার কোনো অংশ বা পুরোপুরি ত্যাগ করে স্বামীর সাথে আপোষে করে, তখন তা জায়েয। পরে সে যদি একে প্রত্যাহার করে, তবে তাও সে করতে পারে।

স্ত্রীর কাছ থেকে দূরে অবস্থান করে এমন স্বামী সম্পর্কে আহমদ বলেন, স্বামী যদি তাকে বলে, তুমি যদি আমার এই অনুপস্থিতি মেনে নাও, তবে ভালো। নচেত তুমি কী করবে, তা তুমিই ভালো জানো।" তখন স্ত্রী যদি বলে, আমি এটা মেনে নিলাম, তবে এটা জায়েয। এরপর স্ত্রী যদি তার এই সম্মতি প্রত্যাহার করে, তবে তাও করতে পারে।

স্বামী স্ত্রীর অবনিবনা :

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যখন অবনিবনা হয়, বৈরিতা প্রবল হয়। বিচ্ছেদ ঘটানোর আশংকা দেখা দেয় এবং দাম্পত্য জীবন ভাঙ্গনের সম্মুখীন হয়, তখন সংশ্লিষ্ট শাসক তাদের অবস্থা পরিদর্শন করতে দু'জন সালিশ পাঠাবেন। তাদের দাম্পত্য জীবন বহাল রাখা মঙ্গলজনক হলে তারা তাই করবে। আর বিচ্ছেদ ঘটানো মঙ্গলজনক হলে তাই করবে। আল্লাহ বলেন :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ج

"তোমরা যদি তাদের মধ্যে অবনবিনার আশংকা করো, তাহলে স্বামীর পরিবার থেকে একজন সালিশ এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ পাঠাও।" সালিশ দু'জনের সুস্থ মস্তিষ্ক, প্রাপ্তবয়স্ক, ন্যায়পরায়ণ ও মুসলমান হওয়া শর্ত। তবে তাদের উভয়ের পরিবারের সদস্য হওয়া জরুরি নয়। দুই পরিবারের বাহির থেকে হলেও তা বৈধ হবে। আয়াতে আদেশের ভংগীতে যা বলা হয়েছে তা আসলে মুস্তাহাব বুঝানোর জন্য বলা হয়েছে। কারণ পরিবারের সদস্য চলমান ঘটনাবলী সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞাত ও সংশ্লিষ্ট দম্পতির প্রতি অধিকতর সহানুভূতিশীল হয়ে থাকে। দাম্পত্য সম্পর্ক বহাল রাখা অথবা ভেঙ্গে দেয়া এ দুটির মধ্যে সালিশদ্বয় যেটি কল্যাণকর বিবেচনা করবেন, দম্পতির সম্মতি বা ক্ষমতাদানের অপেক্ষা না করেই তা করতে পারবেন। এ মত আলি, ইবনে আব্বাস, আবু সালমা, শা'বি, নাখয়ি, সাঈদ বিন জুবাইর, মালেক, আওযায়ি, ইসহাক ও ইবনুল মুনযিরের। (স্ত্রীর অসদাচরণ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।)

❖❖❖

যিহার

সংজ্ঞা

যিহার শব্দটা 'যাহরুন' (পিঠ) থেকে এসেছে। যিহার হলো : স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে একথা বলা : "আনতি আলাইয়া কাযাহরি উম্মী" (তুমি আমার কাছে আমার মায়ের পিঠের মতো) ফাতহুল বারীতে বলা হয়েছে : শরীরের অন্যান্য অংগ বাদ দিয়ে কেবল পিঠের উল্লেখ করার কারণ এই যে, প্রধানত পিঠের উপরই মানুষ আরোহণ করে। আর নারীর উপরই পুরুষ আরোহণ করে থাকে। তাই স্ত্রীকে পিঠের সাথে তুলনা করা হয়েছে। জাহেলি যুগে কেউ যিহার করলে তাকে তালাক গণ্য করা হতো। ইসলাম এই প্রথা বাতিল করে দিয়েছে। তবে স্বামী কাফফারা না দেয়া পর্যন্ত স্ত্রী স্বামীর জন্য যিহারের কারণে নিষিদ্ধ থাকবে। স্বামী যদি তালাকের নিয়তে যিহার করে, তবুও তা যিহারই হবে। আর যিহারের নিয়তে তালাক দিলে তা তালাকই হবে। কেউ যদি স্ত্রীকে বলে : "তুমি আমার নিকট আমার মায়ের পিঠের মতো" এবং এ দ্বারা তালাক বুঝায়, তবে তা তালাক হবে না। সেটা যিহারই হবে, যা দ্বারা স্ত্রী তালাক হয়না।

ইবনুল কাইয়েম বলেছেন : "এর কারণ হলো। জাহেলি যুগে যিহার তালাকেরই সমার্থক ছিলো। তাই তা রহিত করা হয়েছে। কাজেই যে জিনিস বাতিল হয়েছে, তা আর পুনর্বহাল হবেনা। সাহাবি আওস বিন সামেত যিহার করে তালাকের নিয়ত করলেও তার উপর যিহারের বিধিই কার্যকর হয়েছিল, তালাকের নয়। তাছাড়া যিহারের বিধান খুবই স্পষ্ট। কাজেই আল্লাহ তার বিধান দ্বারা যে প্রথা বাতিল করলেন, তার জন্য যিহারকে ইংগিতরূপে গ্রহণ করার প্রশ্নই উঠেনা। আল্লাহর বিধানই অগ্রগণ্য এবং আল্লাহর আদেশই শিরোধার্য।"

আলেমগণ ঐকমত্য সহকারের যিহারকে হারাম গণ্য করেছেন। তাই যিহার জায়েয নয়। কেননা আল্লাহ বলেন :

اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ؕ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓـئِىْ وَلَدْنَهُمْ ؕ وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ○

অর্থ : তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীকে মায়ের সদৃশ বলে, ঐ স্ত্রীরা তাদের মা নয়। তাদের মা তো তারাই, যারা তাদেরকে প্রসব করেছে। তারা একটা অন্যায় ও মিথ্যা কথা বলে। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও উদার। (সূরা মুজাদালা : আয়াত ২)

এর শানে নুযূল হলো, আওফ বিন সামেত সংক্রান্ত হাদিস। তিনি তার স্ত্রী খাওলা বিনতে মালেকের সাথে যিহার করলেন। ইনি সেই মহিলা, যিনি এই যিহারের বিষয়ে রসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে তর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেছিলেন। আর আল্লাহ সাত আসমানের উপর থেকে তার অভিযোগ শুনছিলেন। খাওলা বললেন : হে রসূলুল্লাহ, আওফ বিন সামেত আমাকে বিয়ে করে। তখন আমি যুবতী ও আকর্ষণীয় ছিলাম। পরে যখন আমার বয়স বেশি হলো এবং আমার পেট মোটা হলো, তখন সে

আমাকে তার মায়ের মতো বানিয়েছে। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : "তোমার ব্যাপারে আ: কাছে কোনো নির্দেশ নেই।" খাওলা বললো : "হে আল্লাহ, আমি তোমার নিক অভিযোগ পেশ করছি।" কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, খাওলা বললো : আমার কতকগুলো ছোট ছোট ছেলেমেয়ে রয়েছে। তাদেরকে যদি আওস নিয়ে নেয়, তবে ওরা ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি আমি নিয়ে নেই, তবে তারা ক্ষুধায় জর্জরিত হবে।" এর অনতিবিলম্বে এ প্রসঙ্গে সূরা মুজাদালার প্রথম অংশ নাযিল হয়। আয়েশা রা. বলেছেন : আল্লাহর প্রশংসা, যিনি সকল আওয়ায শুনবার মতো সর্বব্যাপী শ্রবণশক্তির অধিকারী। রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট অভিযোগ নিয়ে খাওলা এসেছিল। আমি ঘরের ভেতরে ছিলাম। তার কথার কিছু কিছু অংশ আমি শুনতে পাইনি। পরক্ষণে আল্লাহ নাযিল করলেন :

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىْٓ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ط اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ○

অর্থ : আল্লাহ সেই মহিলার কথা শুনেছেন, যে তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার সাথে বিতর্ক করছিল এবং আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাচ্ছিল। আল্লাহ তোমাদের দু'জনের বাক্যালাপ শুনছিলেন। আল্লাহ তো সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সূরা মুজাদালা : আয়াত ১)

রসূলুল্লাহ সা. খাওলাকে বললেন : আওফ একটা দাস মুক্ত করুক। খাওলা বললেন : তার সে সামর্থ্য নেই। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তাহলে দু'মাস একটানা রোযা রাখুক। খাওলা বললো : 'হে রসূলুল্লাহ, সে তো অত্যধিক বুড়ো। তার রোযা রাখার সাধ্য নেই।" রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তাহলে ষাটজন দরিদ্রকে আহার করাক। খাওলা বললো : তার কাছ সদকা করার মতো কিছুই নেই। তিনি বললেন : তাকে আমি এক ঝুড়ি খেজুর দিয়ে সাহায্য করবো। খাওলা বললো : আমি আরেক ঝুড়ি দিয়ে তাকে সাহায্য করবো। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : বেশ তো। তবে তার পক্ষ হতে তুমিই ষাটজন মিসকিনকে খাইয়ে দাও এবং তোমার চাচাতো ভাইর (স্বামী) কাছে ফিরে যাও।"

হাদিস গ্রন্থাবলীতে রয়েছে, সালামা বিন সাখর বিয়াযী রমযান মাসে তার স্ত্রীর সাথে যিহার করলো। তারপর রমযান শেষ হওয়ার আগের রাতে তার সাথে সহবাস করলো। রসূলুল্লাহ সা. সালামাকে বললেন : হে সালামা, তুমিই এ অন্যায় কাজটির জন্য দায়ী। সালামা বললো : হে রসূলুল্লাহ, আমি দায়ী? (দু'বার) বেশ, আমি আল্লাহর আদেশ মানতে প্রস্তুত। সুতরাং আল্লাহ আপনাকে যেমন বলেন, আমাকে আদেশ দিন।"

রসূলুল্লাহ সা. বললেন : একজন গোলামকে স্বাধীন করে দাও। সালামা বললো : আল্লাহর কসম, ঐ স্ত্রী ছাড়া আমার অধীনে এমন আর কেউ নেই, যাকে স্বাধীন করা যায়। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তাহলে একনাগাড়ে ও বিরতিহীনভাবে দু'মাস রোযা রাখো। সালামা বললো : আমি যে অপরাধটা করেছি, তাতো রোযা অবস্থায়ই করেছি। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তাহলে ষাটজন মিসকিনকে এক ওয়াসাক করে খোরমা দাও। সালামা বললো : আল্লাহর কসম, আমরা একেবারেই কপর্দকহীন। আমাদের নিকট কোনো খাবার নেই। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তাহলে বনু যিররীক গোত্রের কাছে যাও। তারা তাদের যাকাত তোমাকে দেবে। তা থেকে ষাটজন মিসকিনকে এক ওয়াসাক করে খেজুর দাও। তারপর যা অবশিষ্ট থাকে, তা তুমি ও তোমার পরিবার খাও। সালামা বলেন : এরপর

আমি আমার গোত্রের কাছে গেলাম। তাদেরকে বললাম : তোমাদের কাছে আমি শুধুই সংকীর্ণতা ও খারাপ মতামত পেয়েছি। আর রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট পেয়েছি উদারতা ও ভালো সিদ্ধান্ত। তিনি আমাকে তোমাদের যাকাত দেয়ার আদেশ দিয়েছেন।

যিহার কি শুধু মায়ের সাথে নির্দিষ্ট?

অধিকাংশ আলেমের মত হলো, যিহার শুধু মায়ের সাথেই নির্দিষ্ট। কুরআন ও হাদিস থেকেও এটাই জানা যায়। কাজেই কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে : "তুমি আমার নিকট আমার মায়ের পিঠের মতো" (অর্থাৎ মায়ের মতো পবিত্র) তাহলে সেটা যিহার হবে। কিন্তু যদি বলে, "তুমি আমার নিকট আমার বোনের পিঠের মতো", তাহলে যিহার হবেনা। হানাফিগণ, আওযায়ি, সাওরি, শাফেয়ি ও যায়দ বিন আলির মতে, মায়ের উপর কিয়াস করে সকল মাহারাম মহিলাকে যিহারের আওতাভুক্ত গণ্য করা হবে। কেননা তাদের নিকট যিহার হচ্ছে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে এমন মহিলাদের সদৃশ বা সমকক্ষ গণ্য করা, যারা তার উপর চিরস্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ, চাই রক্ত সম্পর্কের কারণে হোক, বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে হোক অথবা দুধপানজনিত সম্পর্কের কারণে হোক। কারণ মূল কারণটি হলো, চিরস্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ হওয়া। অবশ্য কেউ যদি নিছক সম্মান বা শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ভংগীতে স্ত্রীকে বলে : "সে আমার মা বা বোন", তাহলে যিহার হবেনা।

যিহারের শর্ত :

স্বামীর মুসলমান হওয়া, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া ও সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়া এবং স্ত্রীর বিশুদ্ধ বিয়ের মাধ্যমে স্ত্রীর মর্যাদা লাভ করা যিহারের অপরিহার্য শর্ত।

সাময়িক যিহার :

স্ত্রীর সাথে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যিহার করলে তা সাময়িক যিহার। এর উদাহরণ হলো, স্ত্রীকে বলা : "রাত পর্যন্ত তুমি আমার নিকট আমার মায়ের পিঠের মতো।" তারপর এই সময় শেষ হবার আগে সহবাস করলে যিহার হবে এবং কাফফারা দিতে হবে। মালেক ও ইবনে আবি লায়লার মতে, সহবাস না করলেও কাফফারা দিতে হবে। কিন্তু অধিকাংশ আলেমের মতে, সহবাস না করলে কাফফারা দেয়ার প্রয়োজন নেই। শাফেয়ি থেকে বর্ণিত দু'টি মতের একটিতে সাময়িক যিহার, যিহার নয়।

যিহারের ফলাফল :

স্বামী যখন বিধিসম্মতভাবে স্ত্রীর সাথে যিহার করে, তখন তার দু'টো ফল দেখা দেয়। প্রথমত: যিহারের কাফফারা না দেয়া পর্যন্ত স্ত্রী সহবাস হারাম। কেননা আল্লাহ বলেছেন : "উভয়ের মিলন হওয়ার পূর্বেই কাফফারা দিতে হবে।" আর যেহেতু সহবাস নিষিদ্ধ, তাই যেসব কাজ সহবাসে উদ্বুদ্ধ করে, যেমন চুম্বন, আলিঙ্গন ইত্যাদি, তাও নিষিদ্ধ। এটা অধিকাংশ আলেমের অভিমত। সাওরি ও শাফেয়ির মতে, কেবল সহবাস নিষিদ্ধ।

দ্বিতীয়ত: যিহার প্রত্যাহার করতে হলে কাফফারা ওয়াজিব হবে। এই প্রত্যাহারের ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কাতাদাহ, সাঈদ বিন জুবাইর, আবু হানিফা ও তার শিষ্যগণ বলেন: যিহার দ্বারা নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়া স্ত্রীর সাথে সহবাসের ইচ্ছা করাই যিহার প্রত্যাহার। কেননা সে এই ইচ্ছা করা মাত্রই তার যিহারের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে এবং সহবাস করতে চেয়েছে। চাই তা কার্যতঃ করুক বা না করুক।

শাফেয়ি বলেন : যিহারের পর স্ত্রীকে এতটা সময় বহাল রাখা, যে সময়ে তালাক দেয়া যায়। অথচ তালাক না দেয়া- এটাই প্রত্যাহার। কেননা স্ত্রীকে মায়ের সদৃশ বলার দাবিই হলো, তাকে চির বিদায় করা। তাকে বহাল রাখা যিহারের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাই তাকে যখন বহাল রেখেছে, তখন সে যা বলেছে, তা থেকে ফিরে এসেছে ধরে নেয়া যায়। কেননা কোনো কথা প্রত্যাহার করার অর্থই হলো, তার বিরোধিতা করা। ইমাম মালেক ও আহমদ বলেন : এই প্রত্যাহারের অর্থ সহবাস করার ইচ্ছা করা। চাই করুক বা না করুক।

দাউদ, শু'বা ও যাহেরি মাযহাবের ইমামগণ বলেছেন : প্রথমবার যিহারে কাফফারা দিতে হয়না। দ্বিতীয়বার যিহার করলেই কাফফারা দিতে হবে।

কাফফারা দেয়ার আগে স্ত্রী সহবাস :

কাফফারা দেয়ার আগে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হারাম। কাফফারা কখনো রহিতও হয়না, বৃদ্ধিও পায়না। বরং একটা কাফফারা হিসেবেই তা বহাল থাকে। সাল্‌ত বিন দিনার বলেছেন : আমি দশজন ফকিহ্‌কে জিজ্ঞাসা করেছি যিহারকারী কাফফারা দেয়ার আগে সহবাস করলে কী হবে। তারা বলেছেন : একটা কাফফারাই দিতে হবে।

যিহারের কাফফারা :

যিহারের কাফফারা হলো, একজন গোলামকে স্বাধীন করা, অন্যথায় বিরতিহীনভাবে দু'মাস রোযা রাখা, নচেত ষাটজন মিসকিনকে খাওয়ানো। কেননা আল্লাহ বলেছেন :

وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ط ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ط فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ط

অর্থ : যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে, তারপর তা থেকে ফিরে আসতে চায়, তারা যেন সহবাসের পূর্বে একজন গোলাম মুক্ত করে। এটা তোমাদের জন্য সদুপদেশ। আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত রয়েছেন। যে ব্যক্তি এটা করতে অক্ষম, সে যেন সহবাসের পূর্বে বিরতিহীনভাবে দু'মাস রোযা রাখে। যে ব্যক্তি এটাও পারেনা, সে যেন ষাটজন দরিদ্রকে আহার করায়। (সূরা মুজাদালাহ, ৩-৪)

যিহারের কাফফারায় কঠোর ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য দাম্পত্য সম্পর্কের হেফাজত এবং স্ত্রীর উভয় যুলুম প্রতিরোধ। কারণ স্বামী যখন দেখবে যে, কাফফারা দেয়া তার জন্য কঠিন, তখন দাম্পত্য সম্পর্ককে সম্মান দেখাবে ও স্ত্রীর উপর যুলুম করবেনা।

তেরতম অধ্যায়

বিয়ে বাতিল সংক্রান্ত

বিয়ের চুক্তি বাতিল হওয়ার অর্থ হলো, তার অবসান হওয়া ও দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া। বিয়ের আকদ বা চুক্তিতে গুরুতর কোনো ত্রুটি থাকলে বা তা টিকে থাকা অসম্ভব করে দেয় এমন কোনো কারণ ঘটলেও বিয়ে বাতিল হয়ে যেতে পারে।

আকদে ত্রুটি থাকার কারণে বিয়ে বাতিল হওয়ার কয়েকটি উদাহরণ, যেমন :

১. আকদ সম্পন্ন হওয়ার পর প্রমাণিত হলো যে, যে স্ত্রীর সাথে তার বিয়ে হয়েছে, সে তার দুধবোন।

২. পিতা বা দাদা ব্যতীত অন্য কোনো অভিভাবক অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক বা বালিকার বিয়ে দিয়েছে, অতপর সেই বালক বা বালিকা প্রাপ্তবয়স্ক হলো। এক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেকের ঐ বিয়ে বহাল রাখা বা বাতিল করার ক্ষমতা থাকে। সে যদি বিয়ে বাতিল করার পথ বেছে নেয়, তাহলে বিয়ে বাতিল হবে।

আকস্মিক ঘটনাক্রমে বিয়ে বাতিল হওয়ার উদাহরণ :

১. স্বামী ও স্ত্রীর যে কোনো একজন ইসলাম ত্যাগ করলে এবং ইসলামের দিকে ফিরে না এলে আকস্মিক মুরতাদ হওয়া জনিত কারণে বিয়ে বাতিল হবে।

২. স্বামী ইসলাম গ্রহণ করলে এবং তার মুশরিক স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ না করলে বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে। তবে স্ত্রী যদি ইহুদী বা খৃস্টান হয় তাহলে সে মুসলমান না হলেও বিয়ে বহাল থাকবে। কেননা ইহুদী বা খৃস্টান মহিলার সাথে মুসলিম পুরুষের বিয়ে মূলতই বিধিসম্মত।

বিয়ে বাতিল হওয়ার কারণে স্বামী স্ত্রীতে যে বিচ্ছেদ হয়, তা তালাকজনিত বিচ্ছেদ থেকে ভিন্ন। কেননা তালাক দু'রকম : রজয়ি ও বায়েন। রজয়ি তাৎক্ষণিকভাবে দাম্পত্য জীবনের বিলুপ্তি বা অবসান ঘটায়না। কিন্তু বায়েন তাৎক্ষণিকভাবে দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটায়। পক্ষান্তরে বিয়ে বাতিল হওয়ার কারণে তাৎক্ষণিকভাবে দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটায়, চাই তা বিয়ের পর কোনো আকস্মিক ঘটনার কারণে হোক অথবা বিয়েতে কোনো ত্রুটি থাকার কারণে হোক। অপরদিকে তালাকজনিত বিচ্ছেদ তালাকের সংখ্যা হ্রাস করে। উদাহরণস্বরূপ, স্বামী যদি স্ত্রীকে রজয়ি তালাক দেয়, তারপর তার ইদ্দত পালনকালে তালাক প্রত্যাহার তথা সম্পর্ক পুনর্বহাল করে, অথবা ইদ্দত শেষ হওয়ার পর তাকে নতুন আকদের মাধ্যমে বিয়ে করে, তাহলে তার সেই তালাক তালাক হিসেবে গণ্য থাকবে এবং এরপর সে স্ত্রীকে আর মাত্র দু'টো তালাক দিতে পারবে। কিন্তু বিয়ে বাতিল হওয়াজনিত বিচ্ছেদে তালাকের সংখ্যা হ্রাস পায়না। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর যদি কেউ নিজের বিয়ে বাতিল করে, অতপর উভয়ে পুনরায় বিয়ে করে, তাহলে স্বামী এরপর তিনটে তালাক দেয়ার অধিকারী হবে। তালাকজনিত ও বিয়ে বাতিল হওয়াজনিত এই দু'ধরনের বিচ্ছেদে পার্থক্য করার জন্য ফকিহগণ একটা মূলনীতি উদ্ভাবন করেছেন। তারা বলেছেন : যে

বিচ্ছেদ স্বামীর পক্ষ থেকে সংঘটিত হয় এবং স্ত্রীর পক্ষ থেকে হওয়া সম্ভব নয়, সেটা তালাক। আর যে বিচ্ছেদ স্ত্রীর পক্ষ থেকে সংঘটিত হয়, কিন্তু তাতে স্বামীর কোনো হাত থাকেনা অথবা স্বামীর পক্ষ থেকে সংঘটিত হয়। কিন্তু স্ত্রীর দ্বারাও তা সংঘটিত হওয়া সম্ভব, সেটা বিয়ে বাতিল হওয়াজনিত বিচ্ছেদ।

আদালত দ্বারা বিয়ে বাতিলকরণ :

কিছু কিছু ক্ষেত্র এমন আছে, যেখানে বিয়ে বাতিল হওয়ার কারণ এত স্পষ্ট হয়ে থাকে যে, আদালতের ফায়সালার প্রয়োজন হয়না। যখন স্বামী স্ত্রী জানতে পারে যে, তারা পরস্পরের দুধ-ভাইবোন, তখন তাদের উভয়ের জন্যই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিয়ে বাতিল করা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে।

তবে ক্ষেত্র বিশেষে বিয়ে বাতিল হওয়ার কারণ অজ্ঞাত বা অস্পষ্ট থাকে। সেক্ষেত্রে আদালতের ফায়সালা প্রয়োজন হয় এবং আদালতের ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত বিষয়টি মওকুফ থাকে। যেমন স্বামী ইসলাম গ্রহণ করলে এবং মুশরিক স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ না করলে বিয়ে বাতিল হওয়া মওকুফ থাকবে। স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করলে বাতিল হবেনা।

লি'আন

সংজ্ঞা :

লি'আন লা'ন বা লা'নত শব্দ থেকে উদগত। কেননা লি'আনকারী পঞ্চমবারে এভাবে শপথ করে : "সে (স্বামী) যদি মিথ্যা বলে থাকে, তবে তার উপর আল্লাহর লা'নত।" কারো কারো মতে, লি'আন শব্দের অর্থ হলো দূর করে দেয়া বা বিতাড়িত করা। পরস্পরকে অভিসম্পাতকারী স্বামী ও স্ত্রীকে 'লি'আনকারী' বা 'বিতাড়নকারী' নামে আখ্যায়িত করার প্রথম কারণ এই যে, লি'আনের ফলে উভয়ের পরস্পর থেকে দূরে সরে যাওয়া বা বিতাড়িত হওয়া অনিবার্য হয়ে যায়। আর দ্বিতীয় কারণ এই যে, তাদের দু'জনের একজন যে মিথ্যাবাদী, তা অবধারিত সত্য। আর মিথ্যাবাদী মাত্রই অভিশপ্ত বা লা'নতপ্রাপ্ত। কেউ কেউ বলেন : এর আরো একটা কারণ এই যে, তারা উভয়ে উভয়কে চিরদিনের জন্য নিজেদের উপর নিষিদ্ধ করে দেয়ার মাধ্যমে পরস্পর থেকে বিতাড়িত হয় ও বিতাড়িত করে।

লি'আনের স্বরূপ :

স্বামী যখন স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ তুলবে, তখন সে প্রথমে চারবার শপথ করে বলবে, সে সত্য বলছে। আর পঞ্চমবার বলবে : সে যদি মিথ্যা অভিযোগ করে থাকে তবে তার উপর আল্লাহর লা'নত বা অভিশাপ।' এরপর স্ত্রী তার অভিযোগ অস্বীকার করতে চাইলে প্রথমে চারবার বলবে : "আল্লাহর কসম, সে (তার স্বামী) মিথ্যাবাদী। আর পঞ্চমবারে বলবে, "সে (স্বামী) যে অভিযোগ করেছে, তা যদি সত্য হয় তবে তার (স্ত্রীর) উপর আল্লাহর গযব হোক।"

লি'আন সম্পর্কে শরিয়তের বিধান :

স্বামী যদি স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আরোপ করে এবং স্ত্রী তা স্বীকার না করে, আর স্বামী অভিযোগে অনঢ় থাকে, তাহলে আল্লাহ ঐ দম্পতির জন্য লি'আনের বিধান করেছেন। (নবম হিজরীর শাবান মাসে, মতান্তরে যে বছর রসূলুল্লাহ সা. ইন্তিকাল করেন, সেই বছর এই বিধান নাযিল হয়।)

বুখারি ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন : (ইসলামে সর্বপ্রথম লি'আনকারী) হিলাল বিন উমাইয়া রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট অভিযোগ করেন যে, তার স্ত্রী শুরাইক বিন সাহমার সাথে ব্যাভিচার করেছে। রসূলুল্লাহ সা. তৎক্ষণাত বললেন : হয় তোমাকে সাক্ষী পেশ করতে হবে, নচেত তোমার পিঠে (মিথ্যা অপবাদের জন্য ৮০ ঘা বেত্রাঘাত শাস্তি কার্যকর হবে। হিলাল বললেন : হে রসূলুল্লাহ, আমাদের কেউ যখন স্বচোক্ষে তার স্ত্রীর দেহের উপর অন্য পুরুষকে দেখতে পায়, তখনও কি সে সাক্ষী খুঁজতে ঘুরে বেড়াবে? রসূলুল্লাহ সা. জবাবে একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন : "হয় সাক্ষী আনো, নচেত তোমার পিঠে শাস্তি কার্যকর হবে।"

হিলাল বললেন : "যে আল্লাহ আপনাকে সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম, আমি সত্য বলছি। আমি নিশ্চিত, আল্লাহ ওহি নাযিল করে আমার পিঠকে শাস্তি থেকে বাঁচাবেনই।" পরক্ষণেই জিবরীল নাযিল হলেন এবং আল্লাহর বাণী রসূলুল্লাহ সা.-এর উপর নাযিল করলেন :

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاۤءُ اِلَّاۤ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ لا اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ○ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ○ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ لا اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ○ وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَاۤ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ○

অর্থ : যারা তাদের স্ত্রীদের নামে ব্যভিচারের অভিযোগ তোলে এবং তাদের কাছে তারা নিজেরা ছাড়া আর কোনো সাক্ষী থাকেনা, তাদের একজনই এ বলে চারটি সাক্ষ্য দেবে : আল্লাহর কসম, সে সত্য বলছে। আর পঞ্চমবারে বলবে : সে মিথ্যা বলে থাকলে তার উপর আল্লাহর লা'নত হোক। স্ত্রী শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাবে যদি চারবার এই বলে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহর কসম সে (স্বামী) মিথ্যাবাদী। আর পঞ্চমবারে বলে যে, সে (স্বামী) সত্য বলে থাকলে তার (স্ত্রীর) উপর আল্লাহর গযব হোক।" (সূরা নূর : আয়াত ৬-৯)

অতপর রসূলুল্লাহ সা. মহিলার দিকে ফিরলেন। তখন হিলাল এসে সাক্ষ্য দিলো। রসূলুল্লাহ সা. তখনো বলছিলেন : "তোমাদের একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। কেউ কি তওবা করতে চাও?" তখন মহিলা সাক্ষ্য দিলো। পঞ্চম সাক্ষ্যের সময় হলে লোকেরা তাকে থামালো এবং বললো : এবার কিন্তু ফায়সালা অনিবার্য হয়ে যাবে। ইবনে আব্বাস রা. বলেন : এ সময় মহিলাটি ইতস্তত করলো ও পিছু হটলো। তা দেখে আমরা মনে করলাম, সে বোধ হয় কসম খাওয়া থেকে বিরত থাকতে চাইছে। কিন্তু পরক্ষণেই সে বললো : আমি আমার গোত্রের মুখে কলংক লেপন করবোনা। অতপর সে কসম খেয়ে যথারীতি সাক্ষ্য দিলো। (অর্থাৎ শুধু ইতস্তত করলেই তা দ্বারা কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া যাবেনা।)

রসূলুল্লাহ সা. বললেন : "তোমরা এই মহিলার দিকে নজর রেখো। সে যদি এমন সন্তানের জন্ম দেয়, যার চোখের পলক সুরমার মতো কালো রং এর, নিতম্ব মোটাসোটা এবং পায়ের ঘোড়ালি মাংসল হয়, তাহলে বুঝতে হবে ঐ সন্তান সুরাইকের।" যখন সে সন্তান প্রসব করলো, তখন সে রকমই হলো। (যে রকম রসূলুল্লাহ সা. বলেছিলেন অর্থাৎ বুঝা গেলো, মহিলা গর্ভবতী ছিলো।)

তখন রসূলুল্লাহ সা. বললেন : আল্লাহর কিতাবে যদি বিধান না দেয়া হতো, তবে আমার ও এই মহিলার একটা বিশেষ অবস্থা হতো।" (অর্থাৎ লি'আন যে ব্যভিচারের শাস্তি রহিত করে, কুরআনে এই বিধান দেয়া না হলে রসূলুল্লাহ সা. তার উপর ব্যভিচারের শাস্তি কার্যকর করতেন)।

"বিদায়াতুল মুজতাহিদ" এর গ্রন্থকার বলেন : স্বাভাবিক অবস্থায় বংশ পরিচয় নির্ধারণের মানদণ্ড হিসেবে বিছানাই স্থির রয়েছে। কিন্তু যখন কোনো বিকৃতি নিশ্চিত হয়, তখন বংশ

পরিচয় নির্ধারণের জন্য বিছানাকে মানদণ্ড হিসেবে অগ্রাহ্য করার একটা উপায় খুঁজে পাওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। সেই উপায়টাই লি'আন। বস্তুত কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস- সব কিছুর আলোকেই লি'আন একটা প্রতিষ্ঠিত ও প্রামাণ্য ব্যবস্থা। সার্বিকভাবে এ নিয়ে মতভেদ নেই।

লি'আন কখন করতে হয়?

দুই অবস্থায় লি'আন জরুরি হয়ে থাকে :

১. যখন স্বামী স্ত্রীকে ব্যভিচারের দায়ে অভিযুক্ত করবে এবং তার অভিযোগের পক্ষে স্বামী নিজে ছাড়া প্রয়োজনীয় চারজন সাক্ষী না থাকবে।

২. যখন স্বামী স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানকে নিজের ঔরসজাত বলে স্বীকার করবেনা।

প্রথম অবস্থায় লি'আন তখনই বিধিসম্মত হবে যখন স্বামী স্ত্রী ব্যভিচার করেছে মর্মে নিশ্চিত হবে। যেমন, তাকে ব্যভিচার করতে দেখেছে, অথবা স্ত্রী ব্যভিচার করেছে বলে স্বীকার করেছে এবং স্বামীর মনে এর সত্যতা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে। এরূপ ক্ষেত্রে লি'আন না করে শুধু তালাক দেয়াই উত্তম। কিন্তু ব্যভিচারের ব্যাপারে নিশ্চিত না হলে স্ত্রীকে ব্যভিচারের দায়ে অভিযুক্ত করা জায়েয নয়। গর্ভ অস্বীকার করলে লি'আন জায়েয হবে তখনই, যখন স্বামী দাবি করবে যে, বিয়ের পর সে একবারও স্ত্রীসঙ্গম করেনি, অথবা এই মর্মে দাবি করবে যে, স্ত্রী সংগমের পর ছয় মাসের পূর্বে কিংবা এক বছরের চেয়ে বেশি সময় পরে সন্তান প্রসব করেছে।

সরকারি বা স্বীকৃত বিচারকই লি'আনের সিদ্ধান্ত দেবে :

লি'আনে শাসকের প্রতিনিধির উপস্থিতি অত্যাবশ্যক। তার আগে স্ত্রীকে কিছু সদুপদেশ দেয়া তার কর্তব্য। প্রতিনিধির উপদেশ হওয়া চাই আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজায় বর্ণিত এ হাদিসটির মতো : "যে মহিলা কোনো পরিবারে এমন সন্তান এনে ঢুকাবে, যে সন্তান ঐ পরিবারের বংশধর নয়। তার সাথে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক থাকবেনা এবং আল্লাহ কখনো তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেননা। আর যে পুরুষ তার সন্তানকে অস্বীকার করবে অথচ সে নিশ্চিত যে, সে তারই ঔরসজাত সন্তান, (কেয়ামতের দিন) আল্লাহ তার কাছ থেকে আড়ালে থাকবেন এবং তাকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের সামনে অপমানিত করবেন।"

লি'আনের শর্ত :

লি'আনে শাসকের বা তার প্রতিনিধির উপস্থিতির ন্যায় স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়া এবং প্রাপ্তবয়স্ক হওয়াও শর্ত। এটি ফকিহদের সর্বসম্মত মত।

সাক্ষী পাওয়ার পর লি'আন চলবে কিনা :

স্বামী যদি ব্যভিচারের উপর সাক্ষী হাজির করে, তাহলে আবু হানিফা ও দাউদের মত লি'আন জায়েয হবেনা। কেননা লি'আন সাক্ষীর বিকল্প। কারণ আল্লাহ বলেছেন : "যারা তাদের স্ত্রীদের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আনে, অথচ তারা ছাড়া আর কোনো সাক্ষী থাকে না....।" ইমাম মালেক ও শাফেয়ির মতে লি'আন চলবে। কেননা বিছানা দ্বারা সন্তানের বংশ পরিচয়ের স্বতঃসিদ্ধতার উপর সাক্ষীর কোনো প্রভাব পড়েনা।

লি'আন কি সাক্ষ্য, না শপথ?

ইমাম মালেক, শাফেয়ি ও অধিকাংশ আলেমের মতানুসারে লি'আন হচ্ছে শপথ, যদিও শাহাদাত বা সাক্ষ্য নামে আখ্যায়িত হয়। কেননা নিজের পক্ষে কেউ সাক্ষ্য দেয়না। ইবনে আব্বাসের যে হাদিস ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, রসূল সা. বলেছেন : "মহিলা যদি কসম না খেতো, তবে আমার ও তার অবস্থা অন্য রকম হতো।"

আবু হানিফা ও তার শিষ্যদের মতে, এটা সাক্ষ্য। তারা প্রমাণ দর্শান কুরআনের এ উক্তি থেকে : "তাহলে আল্লাহর নামে চারবার সাক্ষ্যই তাদের একজনের সাক্ষ্য।" আর ইবনে আব্বাসের হাদিসেও রয়েছে : "এরপর হিলাল এসে সাক্ষ্য দিলো, তারপর মহিলাও দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিলো।" যারা বলেন এটা শপথ, তাদের মতে, যে কোনো স্বামী স্ত্রীর মধ্যে লি'আন বৈধ, চাই তারা স্বাধীন হোক বা দাসদাসী হোক, অথবা তাদের একজন স্বাধীন অথবা দাস বা দাসী হোক এবং তারা উভয়ে সৎ কিংবা অসৎ হোক অথবা যে কোনো একজন সৎ বা অসৎ হোক। আর যারা বলেন যে, এটা সাক্ষ্য, তাদের মতে, উভয়ে সাক্ষ্য দেয়ার যোগ্য তথা স্বাধীন মুসলিম না হলে লি'আন বৈধ হবেনা। দাসদাসী স্বামী স্ত্রী কিংবা যারা ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দেয়ার শাস্তি পেয়েছে, তাদের লি'আন বৈধ নয়। একজন সাক্ষ্য দেয়ার যোগ্য এবং অপরজন অযোগ্য হলেও তাদের লি'আন বৈধ নয়।

ইবনুল কাইয়েম বলেছেন : প্রকৃত ব্যাপার হলো, লি'আন একাধারে সাক্ষ্য ও শপথ দুটোই। শপথ দ্বারা ও বারবার উচ্চারণ দ্বারা সাক্ষ্যকে যেমন জোরদার করা হয়েছে, তেমনি পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ ও সাক্ষ্যের শব্দ ব্যবহার দ্বারা শপথকে শক্তিশালী করা হয়েছে। কারণ পরিস্থিতিই এখানে জিনিসটিকে শক্তিশালী করার দাবি জানায়। এ কারণে এতে দশ ধরনের শক্তি বৃদ্ধিকারী উপাদান বিদ্যমান :

১. 'সাক্ষ্য দান' শব্দের উল্লেখ।

২. আল্লাহর নামে কসম খাওয়া।

৩. إِنَّ ও لم ব্যবহার এবং "সত্য বলেছে" বা "মিথ্যা বলেছে" (صدق وكذب) এই ক্রিয়াবাচক পদ ব্যবহারের পরিবর্তে صادق وكاذب 'সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী' এই বিশেষণ ব্যবহার দ্বারা কসমের পরবর্তী বাক্যকে জোরদার করা হয়েছে।

৪. চারবার শপথের পুনরাবৃত্তি।

৫. পঞ্চমবারে স্বামীর নিজের উপর এই বলে বদদোয়া করা যে, সে মিথ্যুক হলে তার উপর অভিশাপ হোক।

৬. পঞ্চমবারে স্বামী কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যে, এটা আল্লাহর আযাবকে অনিবার্য করে তোলে এবং দুনিয়ার আযাব আখেরাতের আযাবের চেয়ে অনেক কম কষ্টকর।

৭. স্বামীর লি'আন স্ত্রীর শাস্তি অথবা বন্দিদশা অনিবার্য করে তোলে এবং স্ত্রীর লি'আন তার (স্ত্রীর) শাস্তি রহিত করে, এ কথা উভয়কে অবহিত করা।

৮. লি'আন স্বামী স্ত্রীর যে কোনো একজনের শাস্তি অবধারিত করে, চাই তা ইহকালে হোক কিংবা পরকালে হোক।

৯. লি'আনকারী স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে এবং তাদের সংসার ধ্বংস হয়ে যায়।

১০. এই বিচ্ছেদ আজীবন স্থায়ী হয় এবং উভয়ে পরস্পরের জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

লি'আনের এই শোচনীয় পরিণতির কারণেই শপথকে সাক্ষ্যের সাথে এবং সাক্ষ্যকে শপথের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। আর লি'আনকারী স্বামীকে একজন সাক্ষীতে পর্যবসিত করা হয়েছে। এরপর স্ত্রী যদি লি'আন থেকে পিছু হটে, তাহলে স্বামীর সাক্ষ্য কার্যকর হবে, স্ত্রীর উপর ব্যভিচারের নির্দিষ্ট শাস্তি কার্যকর হবে এবং স্বামীর সাক্ষ্য ফলপ্রসূ হবে। আর স্বামীর শপথের অনিবার্য ফল হলো, স্বামীর উপর থেকে শাস্তি রহিত হওয়া এবং স্ত্রীর উপর তা আরোপিত হওয়া। আর যদি স্ত্রী লি'আন করে এবং স্বামীর লি'আনের বিরুদ্ধে নিজের পক্ষ থেকে পাল্টা লি'আন করে, তাহলে স্বামীর লি'আন তার নিজের উপর থেকে শাস্তি রহিত করে কিন্তু স্ত্রীর উপর শাস্তি আরোপ করেনা। এক্ষেত্রে স্বামীর লি'আন তার জন্য একাধারে সাক্ষ্য ও শপথ দুইই, স্ত্রীর জন্য নয়। কেননা লি'আন যদি কেবলমাত্র শপথ হয়, তাহলে কেবল স্বামীর শপথে স্ত্রীকে শাস্তি দেয়া যায়না। আর যদি তা সাক্ষ্য হয়, তবে একা স্বামীর সাক্ষ্যে স্ত্রীকে শাস্তি দেয়া যায়না। সুতরাং এই সাথে যদি স্ত্রীর পিছু হটা যুক্ত হয়, তাহলে স্বামীর জোরদার অভিযোগ ও স্ত্রীর পিছু হটার কারণে স্বামীর সাক্ষ্য ও শপথ জোরদার হয়। এতে করে স্বামীর সত্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই স্বামীর উপর থেকে শাস্তি রহিত করা হয় এবং স্ত্রীর উপর তা অবধারিত হয়। এটা উৎকৃষ্টতম ফায়সালা। এজন্যই আল্লাহ্ বলেছেন :

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ○

"আল্লাহর চেয়ে উৎকৃষ্ট ফায়সালাদাতা আর কে আছে বিশ্বাসীদের জন্য?" (মায়েদা : ৫০)

এ থেকে এটাও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, লি'আন শপথ বটে। তবে সাক্ষ্যের অর্থবহ এবং সাক্ষ্যও বটে, তবে শপথের অর্থবহ।

অন্ধ ও বোবার লি'আন :

অন্ধের লি'আন সর্বসম্মতভাবে বৈধ। কিন্তু বোবার লি'আন নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালেক ও শাফেয়ির মতে, বোবার পক্ষ থেকে বুঝিয়ে দেয়া হলে বোবার লি'আন বৈধ। আবু হানিফা বলেন : বৈধ নয়। কেননা বোবা সাক্ষ্য দানের যোগ্য নয়।

লি'আন কে প্রথমে করবে?

আলেমদের সর্বসম্মত মত হলো, লি'আনে স্ত্রীর আগে পুরুষের সাক্ষ্য দেয়া সুন্নত। কিন্তু এটা ওয়াজিব কিনা তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। শাফেয়ি প্রমুখের মতে, এটা ওয়াজিব। স্বামীর আগে স্ত্রী লি'আন করলে তা গৃহিত হবেনা। তার যুক্তি এই যে, শরিয়তে লি'আনের প্রচলন হয়েছেই পুরুষের উপর থেকে শাস্তি রহিত করার জন্য। স্ত্রীকে দিয়ে এটা শুরু হলে যা রহিত হয়, তা রহিত হবার স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। আবু হানিফা ও মালেকের মতে, স্ত্রীকে দিয়ে শুরু করা হলে তা শুদ্ধ ও গৃহিত হবে। তাদের যুক্তি এই যে, আল্লাহ কুরআনে স্বামী ও স্ত্রীর লি'আনকে واو (এবং) দ্বারা যুক্ত করেছেন, যা ধারাবাহিকতার দাবি করেনা, বরং দু'জনেরই লি'আন করতে হবে এটাই শুধু বুঝায়।

লি'আন থেকে নিবৃত থাকা বা পিছু হটা :

লি'আন থেকে স্বামী অথবা স্ত্রী যে কোনো একজন পিছু হটতে পারে। স্বামী যদি পিছু হটে, তবে তার উপর "ইদ্দুল কাযাফ" তথা অপবাদের শাস্তি আরোপিত হবে। কেননা আল্লাহ বলেছেন : "যারা তাদের স্ত্রীদের উপর ব্যভিচারের অভিযোগ আরোপ করে, অথচ তারা নিজেরা ছাড়া আর কোনো সাক্ষী নেই, তাহলে তাদের একজনের সাক্ষ্যই হবে আল্লাহর নামে শপথপূর্বক চারবার এই বলে সাক্ষ্য দেয়া যে, সে যা বলছে সত্য বলছে।" (সূরা নূর, আয়াত ৬) এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, সে যখন শপথপূর্বক চারবার অনুরূপ সাক্ষ্য দিলনা, তখন সে অপবাদ দেয়ার ব্যাপারে একজন তৃতীয় ব্যক্তির মতো। ইতিপূর্বে রসূল সা.-এর এ হাদিস উদ্ধৃত করা হয়েছে : হয় সাক্ষী আনো, নয়তো তোমার পিঠে শাস্তি পড়বে। (অর্থাৎ অপবাদের শাস্তি ৮০ ঘা বেত) এ হচ্ছে তিন ইমামের মাযহাব। কিন্তু আবু হানিফা বলেন : স্বামীকে অপবাদের শাস্তি দেয়া হবেনা, তবে যতোক্ষণ সে লি'আন না করে অথবা নিজেকে মিথ্যুক না বলে, ততোক্ষণ তাকে আটক রাখা হবে। নিজেকে মিথ্যুক বলে স্বীকার করলে তাকে অপবাদের শাস্তি দেয়া হবে। আর স্ত্রী যখন লি'আন থেকে পিছু হটে, তখন মালেক ও শাফেয়ির মতানুসারে তার ওপর ব্যভিচারের শাস্তি কার্যকর করা হবে। আবু হানিফা বলেন : শুধু পিছু হটলেই ব্যভিচারের শাস্তি দেয়া যাবেনা, বরং তাকে বন্দী করা হবে, যতোক্ষণ লি'আন কিংবা স্বামীর অভিযোগ সত্য বলে স্বীকার- এই দুটোর একটা না করবে। যদি স্বীকার করে, তবে ব্যাভিচারের শাস্তি দেয়া হবে।

আবু হানিফার প্রমাণ হলো, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : তিনটি অপরাধের যে কোনো একটা করা ব্যতীত কোনো মুসলমানের রক্তপাত হালাল নয় : "বিয়ের পর ব্যভিচার, ঈমানের পর কুফরী, হত্যার দায়ে দোষী হওয়া ব্যতিত কাউকে হত্যা করা।" তাছাড়া নিছক কসম খেতে অস্বীকার করার কারণে রক্তপাত করা শরিয়তে অনুমোদন করেনা। যেহেতু বহু সংখ্যক ফকিহ্ শপথ করতে অস্বীকার করার কারণে কাউকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা জরুরি মনে করেননা। তাই ঐ কারণে রক্তপাতের তো প্রশ্নই উঠেনা।

ইবনে রুশদ বলেন : মোটকথা, শরিয়তে রক্তপাতের মূলনীতির ভিত্তি হলো, অকাট্য প্রমাণ অথবা স্বীকারোক্তি ব্যতিত কারো রক্তপাত বৈধ নয়। কাজেই এই বিধিতে আবু হানিফাই সঠিক মত দিয়েছেন এবং আল বুরহান গ্রন্থে এই বিধিতে আবু হানিফার মতের শক্তিমত্তার প্রতি ইমাম শাফেয়িও স্বীকৃতি দিয়েছেন।

লি'আনকারী স্বামী স্ত্রীর বিচ্ছেদ :

স্বামী স্ত্রী উভয়ে যখন লি'আন করে, তখন তাদের মাঝে চিরস্থায়ী বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়। কোনো অবস্থায়ই তাদের এই বিচ্ছেদের অবসান ঘটেনা। ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : লি'আনকারী স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হওয়ার পর তারা আর কখনো একত্রিত হতে পারবেনা। আলী ও ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন : লি'আনকারী স্বামী স্ত্রী আর কখনো একত্রিত হবেনা- এ সুন্নতই প্রচলিত হয়ে আসছে। -দার কুতনি।

তাছাড়া যেহেতু তাদের মধ্যে এমন ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে গেছে, যা তাদের উভয়ের মধ্যে চিরস্থায়ী বিচ্ছেদ অনিবার্য করে তুলেছে এবং পারস্পরিক মমত্ব, ভালোবাসা ও শান্তি,

যা দাম্পত্য জীবনের ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত, তা ধ্বংস হয়ে গেছে, তাই শরিয়ত তাদের উভয়কে চিরবিচ্ছেদের শাস্তি দিয়েছে। স্বামী যদি পরবর্তীতে নিজেকে মিত্যাবাদী বলে স্বীকারোক্তি দেয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে ফকিহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশের মতে, তাদের মধ্যে আর কখনো মিলন হতে পারবেনা। ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হাদিসগুলোও এর সমর্থক। আবু হানিফা বলেন : সে যদি মিথ্যা বলেছে বলে স্বীকার করে, তাহলে তাকে অপবাদের শাস্তি হিসেবে বেত্রদণ্ড দেয়া হবে। তবে নতুন করে ঐ স্ত্রীকে বিয়ে করতে পারবে। আবু হানিফার যুক্তি হলো, সে যখন নিজেকে মিথ্যুক বলে স্বীকার করেছে, তখন লি'আন বাতিল হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় সে সন্তানের পিতা হিসেবেও স্বীকৃত হবে এবং স্ত্রীকেও তার নিকট ফেরত দেয়া হবে। কেননা নিষিদ্ধ হওয়ার মূল কারণ ছিলো দু'জনের একজন সত্যবাদী ও অপরজন মিথ্যাবাদী বলে নিশ্চিত হওয়ার মাধ্যমে একটা অজ্ঞতার সৃষ্টি হওয়া। কিন্তু যখন প্রকৃত ব্যাপার জানা গেলো, তখন আর কেউ কারো জন্য নিষিদ্ধ রইলনা।

বিচ্ছেদ কখন সৃষ্টি হবে?

ইমাম মালেকের মতে, স্বামী স্ত্রী যে মুহূর্তে পরস্পরের প্রতি লি'আন সম্পন্ন করবে, সেই মুহূর্তেই বিচ্ছেদ ঘটে যাবে। শাফেয়ির মতে, স্বামী লি'আন সম্পন্ন করা মাত্রই বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। কিন্তু আবু হানিফা আহমদ ও সাওরির মতে, যখন শাসক বিচ্ছেদের ফায়সালা করবেন তখনই বিচ্ছেদ ঘটবে, তার আগে নয়।

লি'আনজনিত বিচ্ছেদ তালাক না বিয়ের বিলুপ্তি?

অধিকাংশ আলেমের মতে, লি'আন দ্বারা সংঘটিত বিচ্ছেদ তালাক নয়, বরং বিয়ের বিলুপ্তি। আবু হানিফার মতে, ওটা বায়েন তালাক। কেননা এর উৎপত্তি পুরুষের দিক থেকে হয়েছে। এটা স্ত্রীর দিক থেকে হওয়া অকল্পনীয়। এ ধরনের যে কোনো বিচ্ছেদ তালাকই হয়ে থাকে, বিয়ের বিলুপ্তি নয়। এখানে যে বিচ্ছেদ হয়, তা নপুংসকের বিচ্ছেদের মতো। যখন তা শাসকের সিদ্ধান্তক্রমে হয়।

পক্ষান্তরে যারা প্রথমোক্ত মত অবলম্বন করেছেন, তাদের প্রমাণ হলো, চিরস্থায়ীভাবে পরস্পরের জন্য নিষিদ্ধ হওয়া। এর ফলে স্ত্রীকে সেসব মহিলার সমকক্ষ গণ্য করা হয়েছে, যারা চিরস্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ। তারা মনে করেন, লি'আন দ্বারা যে বিয়ে বিলুপ্তি ঘটে, তা স্ত্রীকে ইদ্দতকালে স্বামীর কাছ থেকে বাসস্থান ও খোরপোষ লাভের অধিকার দেয়না। কেননা এ দুটো অধিকার পাওয়া যায় তালাকের ইদ্দতকালে, বিয়ে বিলুপ্তির ইদ্দতকালে নয়। এর সমর্থনে রয়েছে ইবনে আব্বাসের বর্ণিত হাদিস : রসূলুল্লাহ সা. একটি লি'আনের ঘটনায় ঘোষণা করলেন, স্ত্রী কোনো খোরপোষ ও আবাসিক সুবিধা পাবেনা। কেননা তালাক বা মৃত্যুজনিত কারণ ছাড়াই তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটছে। (আহমদ, আবু দাউদ)

সন্তানকে মায়ের নিকট অর্পণ ও মায়ের সাথে যুক্তকরণ :

স্বামী যখন তার সন্তানকে অস্বীকার করে এবং তাকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়েই লি'আন সংঘটিত হয়, তখন সেই সন্তানের বংশ পরিচিতি পিতার সাথে সংযুক্ত হয়না। তার কাছ থেকে সন্তানের খোরপোষও প্রাপ্য হয়না। উভয়ের মধ্যে উত্তরাধিকারের লেনদেনও রহিত

হয় এবং ঐ সন্তানকে মায়ের নিকট অর্পণ ও তার সাথে যুক্ত করা হয়। মা এই সন্তানের এবং সন্তান মায়ের উত্তরাধিকারী হয়। কেননা আমর বিন শুয়াইব তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, লি'আনকারী দম্পতির সন্তান সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সা. ফায়সালা করেছেন যে, সে তার মায়ের উত্তরাধিকারী হবে এবং মা তার উত্তরাধিকারী হবে। আর যে ব্যক্তি ঐ সন্তানের জন্য তার মাকে ব্যভিচারের অপবাদ দেবে, তাকে আশি বেত্রাঘাত করা হবে। -আহমদ। এ হাদিসের সমর্থনে রয়েছে সেসব প্রমাণ, যাতে বলা হয় যে, বিছানা যার, সন্তান তার। কিন্তু স্বামী কর্তৃক সন্তানকে অস্বীকার করার কারণে এখানে বিছানার জোর খাটছেনা। তবে যে ব্যক্তি স্ত্রীকে ব্যভিচারের দায়ে অভিযুক্ত করবে, সে অপবাদকারী গণ্য হবে এবং আশী ঘা বেত্রাঘাত তার প্রাপ্য হবে। কেননা লি'আন বিবাহিত মহিলাদের আওতাভুক্ত। এখানে মহিলার বিরুদ্ধে ব্যভিচারের কোনো প্রমাণ নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি তার সন্তানের কারণে তাকে ব্যভিচারের দায়ে অভিযুক্ত করবে, সে অবশ্যই "হদ্দুল কাযাফ" বা অপবাদের শাস্তি পাবে। যে ব্যক্তি স্ত্রীকে আর যে ব্যক্তি সন্তানকে অভিযুক্ত করবে, তারা উভয়ে সমান। এ হচ্ছে স্বামীর সাথে সম্পৃক্ত বিধান। কিন্তু আল্লাহ সকল মানুষ সম্পর্কে যে সাধারণ বিধান দিয়েছেন, তদনুসারে সন্তানকে সতর্কতাবশতঃ ঐ স্বামীর সন্তান হিসেবে গণ্য করা হবে। তাই সে তাকে যাকাত দিতে পারবেনা, আর সে তাকে হত্যা করলে তার উপর কিসাস বলবত হবে না। তার সাথে তার সন্তানদের বিয়ে নিষিদ্ধ থাকবে। তাদের উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সাক্ষ্য প্রদান বৈধ হবেনা। সন্তানকে বংশ পরিচয়বিহীন গণ্য করা হবেনা এবং অন্য কেউ তার পিতৃত্ব দাবি করতে পারবেনা। আর স্বামী যদি স্বীকার করে সে মিথ্যা বলেছে, তাহলে সন্তানের পিতৃত্ব তার পক্ষে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সন্তানের উপর লি'আনের কোনো প্রভাবই পড়বেনা।

ইদ্দত

১. ইদ্দতের সংজ্ঞা :

ইদ্দত শব্দটি আদদ অর্থাৎ সংখ্যা ও গণনা থেকে এসেছে। নারী যে সকল দিন ও হায়েয গণনা করে তাই ইদ্দত। ইদ্দত সেই সময়ের নাম, যার অতিবাহিত হওয়ার জন্য স্ত্রী অপেক্ষায় থাকে এবং তার স্বামীর মৃত্যু বা স্বামীর সাথে বিচ্ছেদ হওয়ার পর যে সময়ে অন্য স্বামীকে বিয়ে করা থেকে সে বিরত থাকে। এই ইদ্দত শুরু হয় তালাক বা স্বামীর মৃত্যুর সময় থেকে। ইদ্দত জাহেলি যুগেও প্রচলিত ছিলো। তারা প্রায় সকলেই এটা মেনে চলতো। ইসলাম এসে এটিকে বহাল রাখে। কারণ এতে অনেক কল্যাণ ও উপকারিতা রয়েছে। আলেমগণ নিম্নোক্ত আয়াতের আলোকে এটিকে ওয়াজিব বলে আখ্যায়িত করেছেন :

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ○

"তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীগণ তিন হায়েয পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।" (আল বাকারা, ২২৮)

তাছাড়া রসূলুল্লাহ সা. তালাকপ্রাপ্ত ফাতেমা বিনতে কায়েসকে বলেছিলেন : "তুমি উম্মে মাকতুমের বাড়িতে ইদ্দত পালন করো।"

২. শরিয়তে ইদ্দতের যৌক্তিকতা :

ক. জরায়ু ভ্রূণমুক্ত কিনা তা জ্ঞাত হওয়া, যাতে করে সন্তানের বংশ পরিচয় নিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়তে না যায়।

খ. স্বামী স্ত্রী যদি নিজেদের বৃহত্তর কল্যাণের খাতিরে দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহাল করতে চায়, তবে সেজন্য তাদেরক সুযোগ দেয়া।

গ. এরূপ ধারণা দেয়া যে, বিয়ে একটা মর্যাদাসম্পন্ন বিষয়, যা সংঘটিত করাও কঠিন এবং ভাংতেও দীর্ঘ সময় লাগে। এ রকম না হলে এটা একটা ছেলে খেলায় পর্যবসিত হতো, যা মুহূর্তেই জোড়া লাগে, আবার মুহূর্তেই বিচ্ছিন্ন হয়।

ঘ. স্বামী স্ত্রী উভয়ে এ আকদকে স্থায়ী করতে দৃঢ় সংকল্প না হলে বিয়ের সার্থকতা থাকেনা। তবে এমন কিছু যদি ঘটেই যায়, যা দাম্পত্য জীবনে বিচ্ছেদ অনিবার্য করে তোলে, তাহলেও মোটামুটিভাবে সম্পর্কটা টিকিয়ে রাখার জন্য অপেক্ষমান থাকার একটা মেয়াদ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সেই সময়টা স্ত্রীর জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করে অপেক্ষমান থাকতে হয়। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা)

৩. ইদ্দতের শ্রেণী বিভাগ :

ইদ্দত কয়েক প্রকারের :

১. হায়েযধারী মহিলার ইদ্দত এবং এটা তিন হায়েয পর্যন্ত।

২. হায়েযের বয়স পেরিয়ে যাওয়া মহিলার ইদ্দত এবং এটা তিন মাস।

৩. স্বামী মারা যাওয়া মহিলার ইদ্দত। এটা চার মাস দশ দিন, যদি গর্ভবতী না হয়।

৪. গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত। এটা সন্তান প্রসব পর্যন্ত।

এ হলো ইদ্দতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এবার বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছি : সহবাস করা হয়েছে, অথবা করা হয়নি, স্ত্রীর এই দুই ধরনের অবস্থা হতে পারে।

যে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হয়নি, তার ইদ্দত : যে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হয়নি, তাকে তালাক দেয়া হলে তার কোনো ইদ্দত পালন করতে হবেনা। আল্লাহ বলেছেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا

অর্থ : হে মুমিনগণ, যখন তোমরা মুমিন নারীদের বিয়ে করবে, অতঃপর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দেবে, তখন তাদেরকে তোমাদের জন্যে কোনো ইদ্দত পালন করতে হবেনা।" (সূরা আহযাব : আয়াত ৪৯)

আর যদি সহবাস করা হয়নি এমন স্ত্রীর স্বামী মারা যায়, তাহলে তাকে সহবাস করা হয়েছে এমন স্ত্রীর মতোই ইদ্দত পালন করতে হবে। কেননা আল্লাহ বলেছেন :

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ٠

"যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তাদের স্ত্রীর চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করতে হবে।" স্বামীর সহবাস ব্যতীত তার উপর ইদ্দত পালন বাধ্যতামূলক হওয়ার উদ্দেশ্য হলো মৃত স্বামীর প্রতি আনুগত্য ও মমত্ব প্রদর্শন এবং তার হক আদায় করা। (চার মাস দশ দিন ইদ্দত নির্ধারণের আরো কারণ হলো, এই সময়ে সন্তানের সৃষ্টি পূর্ণতা লাভ করে এবং ১২০ দিন পর তার ভেতরে রূহ সঞ্চালিত হয়। দশ দিন বাড়নোর কারণ হলো, চাঁদ মাস কমও হয়ে থাকে। তাই সাবধানতাবশত এই দশ দিন বাড়িয়ে রাখা হয়, যাতে কমতি পূর্ণ হয়।)

সহবাস করা হয়েছে এমন স্ত্রীর ইদ্দত : হানাফি, হাম্বলী ও খুলাফায়ে রাশেদীনের মতে, নিভৃতে স্বামীর সাথে একত্রিত হয়েছে এমন স্ত্রীকেও সহবাসকৃত স্ত্রী গণ্য করা হবে এবং তার উপর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হবে। কিন্তু শাফেয়ির নতুন মত অনুসারে তার উপর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হবেনা। সহবাস করা হয়েছে এমন স্ত্রী আবার দুই প্রকারের : হায়েযধারী, অ-হায়েযধারী।

হায়েযধারীর ইদ্দত : হায়েযধারীর ইদ্দত তিন হায়েয পর্যন্ত। কেননা আল্লাহ বলেছেন : "তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীরা তিন হায়েয পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।" আয়াতে যে قروء 'কুরূ' শব্দটি রয়েছে। তা قرء 'কুরউন'-এর বহুবচন, অর্থাৎ হায়েয। (যদিও এর অর্থ নিয়ে মতভেদ রয়েছে) কিন্তু ইবনুল কাইয়েমের মতে, এর অর্থ হায়েযই অগ্রগণ্য। কুরআন ও হাদিসের কোথাও এটি পবিত্রতা অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। তাই এর যে অর্থটি সুপরিচিত, সেটা গ্রহণ করাই উত্তম বরং অপরিহার্য। কেননা রসূলুল্লাহ সা. ইস্তিহাজা রোগিণীকে বলেছিলেন : "তোমার হায়েযের দিনগুলোতে নামায পড়োনা।" রসূলুল্লাহ সা. আল্লাহর ভাষাই ব্যবহার করতেন এবং তার জাতির ভাষায়ই কুরআন নাযিল হয়েছে। কাজেই তিনি যখন তার হাদিসের কোনো এক জায়গায় কোনো দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করে তার দুই অর্থের একটি বুঝান, তখন তার অন্যান্য হাদিসেও সেই শব্দ দ্বারা ঐ অর্থটাই গ্রহণ করতে হবে। যতোক্ষণ তার কোনো হাদিসেই অন্য কোনো অর্থ বুঝিয়েছেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায়না, এরূপ ক্ষেত্রে ঐ শব্দটি কুরআনের ভাষায় পরিণত হবে যদিও কুরআন ব্যতিত অন্য কোনো

ভাষায় ঐ শব্দের অন্য কোনো অর্থ থেকেও থাকে। যখন প্রমাণিত হলো যে, শরিয়তের ভাষায় قرء 'কুরউন' শব্দের অর্থ হায়েয, তখন জানা গেলো যে, এটাই শরিয়তের ভাষা। কাজেই শরিয়তের সর্বত্র এই শব্দের ঐ অর্থই গ্রহণ করা হবে। আয়াতের পরবর্তী বাক্যে আল্লাহর উক্তি : وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِىْ أَرْحَامِهِنَّ

"স্ত্রীদের জন্য বৈধ নয় যে, তাদের জরায়ুতে আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তা তারা গোপন করবে।" অধিকাংশ মুফাসসিরের নিকট এ জিনিসটা হলো হায়েয ও ভ্রূণ। বস্তুত জরায়ুতে যে ভ্রূণ সৃষ্ট হয় তা হচ্ছে আকৃতি বিশিষ্ট হায়েয। প্রাচীন ও সাম্প্রতিককালের মনিষীগণ এ কথাই বলেছেন। কেউ বলেননি যে, এটা 'তুহ্র' বা পবিত্রাবস্থা। তাছাড়া মহান আল্লাহ সূরা তালাকের ৪নং আয়াতে বলেছেন :

وَالّٰئِىْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَّالّٰئِىْ لَمْ يَحِضْنَ ط وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ط وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا○

অর্থ : তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের হায়েয হওয়ারর আর সম্ভাবনা নেই, তাদের ব্যাপারে তোমাদের সন্দেহ থাকলে তাদের ইদ্দত তিন মাস। আর এখনো যাদের হায়েয হয়নি, তাদেরও ইদ্দত তিন মাস। আর গর্ভবতীদের ইদ্দত সন্তান প্রসব পর্যন্ত।" (তালাক : ৪)

কাজেই দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ এক এক হায়েযের বাবদ এক এক মাস নির্ধারণ করেছেন এবং হায়েয না হওয়ার উপর বিধি ঝুলন্ত রেখেছেন, হায়েয ও পবিত্রাবস্থা উভয়টি না হওয়ার উপর নয়। অন্যত্র বলেছেন : فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

"তাদের ইদ্দতের জন্য তাদেরকে তালাক দাও।" অর্থাৎ তাদের ইদ্দতকে সামনে রেখে, ইদ্দতের মধ্যে নয়। বস্তুত যে ইদ্দতের জন্য স্ত্রীদেরকে তালাক দেয়া হয়, তা যখন তালাকের পরে তাদের সামনে আসে, তখন তালাকের পর যেটা আসে, সেটা হায়েয ছাড়া অন্য কিছু নয়। একজন পবিত্র নারী পবিত্রাবস্থার মুখোমুখি হয়না। বরং পবিত্রাবস্থার মধ্যেই থাকে। সে যে পবিত্রাবস্থায় রয়েছে, সেটার পরই সে হায়েযের মুখোমুখি হয়।

'কুরু' তথা হায়েয ও পবিত্রাবস্থা উভয়টি দ্বারা ইদ্দত পালনের নূন্যতম সময় : শাফেয়ি মাযহাবের মতে, একজন স্বাধীন মহিলা হায়েয ও পবিত্রাবস্থা উভয়ের সম্মিলনে ন্যূনতম যে মেয়াদ ইদ্দত পালন করতে পারে, তা হচ্ছে বত্রিশ দিন এক ঘণ্টা। সেটি এভাবে যে, স্বামী পবিত্রাবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেবে এবং তালাকের পর পবিত্রাবস্থার এক ঘণ্টা সময় অবশিষ্ট থাকবে। সেই এক ঘণ্টা হবে পবিত্রবস্থা। তারপর একদিন হায়েয হবে, তারপর পনেরো দিন পবিত্র থাকবে। এটা তার দ্বিতীয় পবিত্রাবস্থা। তারপর পুনরায় একদিন হায়েয হবে। অতপর পনেরো দিন পবিত্র থাকবে। এটা তার তৃতীয় পবিত্রাবস্থা। এরপর যখন সে তৃতীয় হায়েযে প্রবেশ করবে, তখন তার ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে আবু হানিফার মতে, ন্যূনতম মেয়াদ ষাট দিন। আর তাঁর দুই শিষ্যের নিকট উনচল্লিশ দিন। ইমাম আবু হানিফার মতানুসারে সে দশ দিনব্যাপী হায়েয দিয়ে ইদ্দত পালন শুরু করবে, যা হায়েযের সর্বাধিক মেয়াদ। তারপর পনেরো দিনের পবিত্রতা,

পুনরায় দশ দিনের হায়েয, অতপর পুনরায় পনেরো দিনের পবিত্রতা। অতপর তৃতীয় হায়েয, যার মেয়াদ দশ দিন। এভাবে মোট ইদ্দত দাঁড়ালো ষাট দিন। এই মেয়াদ যখন শেষ হলো এবং স্ত্রী দাবি করলো যে, তার ইদ্দত শেষ হয়েছে, তখন সে অন্য স্বামীর জন্য হালাল হবে।

পক্ষান্তরে আবু হানিফার শিষ্যদ্বয় প্রত্যেক হায়েয বাবদ তিন দিন গণনা করেন, যা তার ন্যূনতম মেয়াদ, আর তিন হায়েযের মধ্যবর্তী দুটি পবিত্রাবস্থার প্রত্যেকটির জন্য পনেরো দিন গণনা করেন। এভাবে মোট ইদ্দত দাঁড়ায় ৩৯ দিন।

অঋতুবতীর (যার হায়েয এখনো হয়নি) ইদ্দত : স্ত্রী যদি অঋতুবতী হয় তবে তার ইদ্দত তিন মাস। এটা অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকা এবং মাসিক স্রাবের বয়স পেরিয়ে যাওয়া বৃদ্ধা উভয়ের বেলায় প্রযোজ্য, চাই তার আদৌ মাসিক স্রাব না হয়ে থাকুক, অথবা মাসিক স্রাব হওয়ার পর বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকুক। এর প্রমাণ ইতিপূর্বে উল্লিখিত সূরা তালাকের ৪ নং আয়াত দ্রষ্টব্য।

ইবনে আবি হাশেম তার তাফসীরে উল্লেখ করেছেন যে, উবাই বিন কা'ব বলেন : আমি বললাম : হে রসূলুল্লাহ, কুরআনে আল্লাহ অপ্রাপ্তবয়স্কা, বৃদ্ধা ও গর্ভবতী মহিলাদের ইদ্দত সম্পর্কে কিছু না বলায় মদিনার কিছু লোক নানা কথা বলে। তখন আল্লাহ সূরা তালাকের ৪নং আয়াত নাযিল করলেন। ঐ আয়াতে বলা হয়েছে, গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত তার সন্তান প্রসব পর্যন্ত। যখন প্রসব করবে, তখন তার ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে।

জারিরের বর্ণনার ভাষা এরকম : "আমি বললাম : হে রসূলুল্লাহ, মহিলাদের ইদ্দত সম্পর্কে সূরা বাকারার আয়াত নাযিল হওয়ার পর মদিনার কিছু লোক বললো : কুরআনে কিছু সংখ্যক মহিলার ইদ্দত উল্লেখ করা হয়নি। তারা হচ্ছে অপ্রাপ্তবয়স্কা, হায়েযের বয়স পেরিয়ে যাওয়া বৃদ্ধা এবং গর্ভবতী নারীগণ। তখন আল্লাহ সূরা তালাকের ৪নং আয়াত নাযিল করলেন।

ঋতুবতী মহিলার যখন ঋতু হয়না তখন কী করবে? : পবিত্রাবস্থায় বিরাজমান মহিলা যখন তালাকপ্রাপ্ত হয় অথচ সে যথানিয়মে হায়েয দেখতে পায় না এবং তার কারণও তার জানা নেই। তখন সে এক বছর ইদ্দত পালন করবে। প্রথমে নয় মাস অপেক্ষা করবে, যাতে তার জরায়ু ভ্রূণমুক্ত আছে কিনা জানতে পারে। কেননা এটাই প্রধানতঃ গর্ভের মেয়াদ। এর মধ্যে যখন গর্ভ প্রকাশ পেলনা, তখন তার জরায়ু ভ্রূণমুক্ত আছে এটা স্পষ্ট হয়ে গেলো। এরপর সে মাসিক স্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া বৃদ্ধা মহিলাদের ইদ্দত তিন মাস পালন করবে। এটা ছিলো উমর রা.-এর ফায়সালা। ইমাম শাফেয়ি বলেছেন : এটা ছিলো মুহাজির ও আনসারদের মাঝে উমর রা.-এর ফায়সালা। কেউ এটা অস্বীকার করেছে বলে আমাদের জানা নেই।

বার্ধক্যহেতু হায়েয বন্ধ হওয়ার বয়স : এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন : বার্ধক্যহেতু হায়েয বন্ধ হওয়ার বয়স হচ্ছে পঞ্চাশ বছর। কেউ বলেন : ষাট বছর। তবে প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এটা বিভিন্ন মহিলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন : "ঋতু বন্ধ হওয়ার বয়স এক এক মহিলার এক এক রকম। সকল মহিলা একমত হবে, কোনো বয়সসীমা এর জন্য নির্দিষ্ট নেই। সূরা তালাকের ৪নং আয়াতের মর্মার্থ হলো, প্রত্যেক মহিলা নিজেই বুঝতে পারে তার মাসিক

স্রাব বন্ধ হয়েছে কিনা। কোনো মহিলা যখন মনে করে, তার মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে এবং আর হবেনা, তখন তাকে 'বার্ধক্যজনিত হায়েয বন্ধ' মহিলাদের শ্রেণীভুক্ত করা যাবে, চাই তার বয়স চল্লিশ হোক বা তার কাছাকাছি হোক। কিন্তু অনেকে পঞ্চাশ বছর হলেও বন্ধ হয়ে গেছে এবং আর হবেনা, এমন মনে করেনা।

গর্ভবতীর ইদ্দত : গর্ভবতীর ইদ্দত সন্তান প্রসবের সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায়, চাই সে তালাকপ্রাপ্ত হোক কিংবা বিধবা হোক। কেননা আল্লাহ্ বলেন :

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ط

"গর্ভবতীদের ইদ্দত তাদের সন্তান প্রসব পর্যন্ত।" (তালাক, আয়াত ৪)

'যাদুল মায়াদ' গ্রন্থে বলা হয়েছে : সূরা তালাকের ৪নং আয়াতের উপরোক্ত অংশ থেকে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রী যখন গর্ভে যমজ সন্তান ধারণ করে, তখন উভয় সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত তার ইদ্দত শেষ হবেনা। তাছাড়া সন্তান জীবিত বা মৃত, অসম্পূর্ণ বা সম্পূর্ণ, প্রাণ সঞ্চালিত বা অসঞ্চালিত, যে রকমই হোক না কেন, সর্বাবস্থায় সন্তান প্রসব মাত্রই ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে।

সুরাইয়া আসলামিয়া রা. বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সা'দ বিন খাওয়ালার স্ত্রী ছিলেন। অতপর তিনি গর্ভবতী থাকা অবস্থায় বিদায় হজ্জের সময় সা'দ মারা গেলেন। তার মৃত্যুর কিছু দিন পর সুবাইয়া সন্তান প্রসব করলেন। তারপর প্রসবোত্তর স্রাব 'নিফাস' থেকে পবিত্র হওয়ার পর তিনি বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার উদ্দেশ্যে সাজগোজ করতে আরম্ভ করলেন। এ সময়ে বনু আবদুদ দারের আবুস সানাবিল নামক এক ব্যক্তি তার কাছে গেলো। সে বললো : কী ব্যাপার? আপনাকে সাজগোজ করতে দেখছি যে। আপনি বোধ হয় বিয়ের আশা করেন? আল্লাহর কসম, আপনি চার মাস দশ দিন অতিবাহিত না করে বিয়ে করতে পারবেননা। সুরাইয়া বলেন : একথা শুনে আমি রসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে গেলাম এবং এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : সন্তান প্রসব করা মাত্রই আমি হালাল হয়ে গিয়েছি এবং আমি ইচ্ছে করলে বিয়ে করার জন্য তিনি আমাকে আদেশ দিলেন।" ইবনে শিহাব বলেন : সন্তান প্রসবের সাথে সাথেই স্ত্রীর বিয়ে করায় কোনো বাধা দেখিনা, এমনকি প্রসবোত্তর স্রাবের ভেতরেও নয়। তবে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত স্বামী তার কাছে যেতে পারবে না। -বুখারি, মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ।

সূরা বাকারার ২৩৪ নং আয়াতে যে ইদ্দতের (চার মাস দশ দিন) উল্লেখ রয়েছে, আলেমগণ তাকে অগর্ভবতী বিধবার জন্য এবং সূরা তালাকের ৪নং আয়াতের ইদ্দতকে (সন্তান প্রসব পর্যন্ত যার মেয়াদ) গর্ভবতীদের ইদ্দত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং দ্বিতীয় আয়াত প্রথম আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

বিধবার ইদ্দত : যে মহিলার স্বামী মারা গেছে, তার ইদ্দত চার মাস দশদিন, যদি সে গর্ভবতী না হয়। কেননা সূরা বাকারার ২৩৪ নং আয়াতে সুস্পষ্টভাবে একথা বলা হয়েছে। স্বামী যদি তাকে রজয়ি তালাক দিয়ে ইদ্দতের মধ্যে মারা গিয়ে থাকে, তবে সে বিধবার ইদ্দত পালন করবে। কেননা স্বামী যখন মারা গেছে, তখন ঐ মহিলা তার স্ত্রী ছিলো।

ইস্তিহাযা রোগিণীর ইদ্দত : যে মহিলার ইস্তিহাযা রোগ রয়েছে, সে হায়েয অনুযায়ী ইদ্দত পালন করবে। তার যদি কোনো নিয়ম বা অভ্যাস থেকে থাকে, তবে স্রাব ও পবিত্রতা উভয় ব্যাপারে তার নিয়ম পালন করা জরুরি। এভাবে তিন হায়েয অতিবাহিত হওয়ার পর

তার ইদ্দত শেষ হবে। আর যদি বার্ধক্যজনিত কারণে হায়েয বন্ধ থাকে, তবে তার ইদ্দত তিন মাস।

বিয়ে শুদ্ধ না হলেও ইদ্দত পালন জরুরি :

যে ব্যক্তি সন্দেহের বশে কোনো মহিলার সাথে সহবাস করেছে, সেই মহিলারও ইদ্দত পালন করতে হবে। কেননা সন্তানের বংশ পরিচয়ের ব্যাপারে সন্দেহপূর্ণ সহবাস ও বিয়েজনিত সহবাস একই পর্যায়ের। ইদ্দত পালনও উভয় ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক। অবৈধ বিয়েতেও সহবাস সংঘটিত হলে ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব। তবে যদি কেউ কোনো মহিলার সাথে ব্যভিচার করে, সে মহিলার উপর ইদ্দত পালন বাধ্যতামূলক নয়। কেননা ইদ্দত বংশ পরিচয় সংরক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট। অথচ ব্যভিচার দ্বারা বংশ পরিচয় সংরক্ষিত হয়না। এটা হানাফি, শাফেয়ি ও সাওরির মত। এটা আবু বকর এবং উমরেরও মত। ইমাম মালেক ও আহমদ বলেন, তার উপরও ইদ্দত পালন ওয়াজিব। তবে তার ইদ্দত তিন হায়েয, না জরায়ু অবমুক্ত হয় এমন এক হায়েয? ইমাম আহমদ থেকে বর্ণিত দুটি মতের একটিতে তিন হায়েয এবং অপরটিতে এক হায়েয বলা হয়েছে।

হায়েযের হিসাবে ইদ্দত পালন কখন মাস হিসেবে ইদ্দত পালনে রূপান্তরিত হবে :

হায়েয চালু রয়েছে এমন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে ইদ্দতের মধ্যে স্বামী মারা গেলে তালাক রজয়ি কিনা দেখতে হবে। যদি রজয়ি হয়, তাহলে তাকে বিধবার ইদ্দত চার মাস দশ দিন পালন করতে হবে। কেননা সে তখনো তার স্ত্রী এবং রজয়ি তালাক দাম্পত্য সম্পর্ককে নষ্ট করেনা। এজন্য ইদ্দতের মধ্যে দু'জনের মধ্যে যে জনই মারা যাক, উভয়ের মধ্যে পরস্পরের উত্তরাধিকার বণ্টিত হবে।

আর যদি বায়েন তালাক হয়, তবে স্ত্রী হায়েযের হিসাবে তালাকের ইদ্দত পালন করবে। এক্ষেত্রে ইদ্দত বিধবার ইদ্দতে রূপান্তরিত হবেনা। কেননা তালাকের সময় থেকেই দম্পতির দাম্পত্য বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে। বায়েন তালাক দাম্পত্য সম্পর্কের অবসান ঘটায়। তাই স্বামীর যখন মৃত্যু হয়েছে, তখন সে স্বামী ছিলোনা। তাই দু'জনের একজন ইদ্দতের মধ্যে মারা গেলে একজন অপরজনের উত্তরাধিকারী হবেনা। তবে স্বামী যদি পলাতক গণ্য হয়, তাহলে ব্যাপারটা অন্য রকম হবে।

পলাতকের তালাক :

পলায়নকারীর তালাক বলা হয় সেই বায়েন তালাককে, যা কোনো ব্যক্তি নিজের মৃত্যুশয্যা থেকে স্ত্রীকে তার সন্তুষ্টি ছাড়া দেয়, অতপর সে ইদ্দতে থাকা অবস্থায় স্বামী মারা যায়। এ অবস্থায় উক্ত স্বামীকে পলায়নকারী বলা হয়। কেননা সে তার উত্তাধিকার থেকে পলায়ন করে। এজন্য ইমাম মালেক বলেছেন : স্বামী যদি স্ত্রীর ইদ্দতের পরে এবং অন্য স্বামীকে বিয়ে করার পরও মারা যায়, তবুও এ স্ত্রী তার উত্তরাধিকারী হবে। কেননা সে স্ত্রীকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চেয়েছিল এবং তার এই অন্যায় ইচ্ছার পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবেই স্ত্রীকে উত্তরাধিকার দেয়া হবে।

আবু হানিফা ও মুহাম্মদের মতে এক্ষেত্রে ইদ্দতের বিধি পাল্টে যাবে। তার ইদ্দত হবে তালাকের ইদ্দত ও বৈধব্যের ইদ্দতের মধ্যে যেটি দীর্ঘতর সেটি, যাতে স্ত্রী স্বামীর সেই উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়, যা স্বামী তালাক দেয়ার মাধ্যমে না দিয়ে পালাতে চেয়েছিল। আবু ইউসুফের মতে, স্ত্রী এক্ষেত্রে তালাকের ইদ্দত পালন করবে। শাফেয়ির

মতে, স্ত্রী উত্তরাধিকার পাবেনা যেমন সুস্থাবস্থায় বায়েন তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী পায়না। তার যুক্তি হলো, মৃত্যুর পূর্বে তালাক দেয়ার মাধ্যমে দাম্পত্য বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে। কাজেই উত্তরাধিকার লাভের কারণ দূর হয়ে গেছে। পালাতে চেয়েছিল এই ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা শরিয়তের বিধিসমূহ প্রকাশ্য কার্যকারণের সাথে সংশ্লিষ্ট, গোপন নিয়তের সাথে নয়। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, স্বামী যদি তার রুগ্নাবস্থায় স্ত্রীকে বায়েন তালাক দেয়। অতপর স্ত্রী মারা যায়, তাহলে স্বামী মৃত স্ত্রীর উত্তরাধিকার পাবেনা।

অনুরূপ, হায়েযের হিসাবে পরিগণিত ইদ্দত মাসের হিসাবে পরিগণিত ইদ্দতে রূপান্তরিত হবে সেই মহিলার ক্ষেত্রে, একটা বা দু'টো হায়েয হওয়ার পর যার হায়েয বার্ধক্যের কারণে বন্ধ হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে মহিলার তিন মাসের ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হবে। কেননা হায়েযের হিসাবে ইদ্দত পূর্ণ করা অসম্ভব। কারণ হায়েয বন্ধ হয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে একমাত্র মাসের হিসাবে পুনবর্ণনা করলেই ইদ্দত পূর্ণ করা সম্ভব। তখন মাসগুলো হবে হায়েযের বিকল্প।

মাস থেকে হায়েযের হিসাব ইদ্দতের রূপান্তর

স্ত্রী যখন অপ্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার কারণে কিংবা বার্ধক্যজনিত হায়েয বন্ধ হওয়ার বয়সে উপনীত হওয়ার কারণে মাস হিসাবে ইদ্দত গণনা শুরু করে, অতপর মাসিক স্রাব শুরু হয়ে যায়, তখন তার জন্য হায়েযের হিসাবে ইদ্দতের রূপান্তর অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কেননা মাসগুলো হায়েযের বিকল্প। মূল হায়েয যখন বন্ধ হয়নি, তখন বিকল্প দিয়ে ইদ্দত পালন জায়েয হবেনা। আর যদি মাসের হিসাবে ইদ্দত শেষ হয়ে যায়, তারপর হায়েয শুরু হয়। তাহলে পুনরায় হায়েয ও পবিত্রতার সমন্বয়ে ইদ্দত গণনা করা জরুরি হবেনা। কেননা এটা সংঘটিত হয়েছে ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর হয়েছে। আর যদি মাস কিংবা হায়েয ও পবিত্রতাবস্থার সমন্বয়ে ইদ্দত গণনা শুরু করে, তারপর সে টের পায় যে, স্বামী দ্বারা সে গর্ভবতী, তাহলে ইদ্দত সন্তান প্রসব পর্যন্ত মেয়াদে রূপান্তরিত হবে। কেননা সন্তান প্রসবই হলো নিশ্চিতভাবে জরায়ু অবমুক্ত হওয়ার অকাট্য প্রমাণ।

ইদ্দতের সমাপ্তি

স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয়, তাহলে তার ইদ্দত সন্তান প্রসবের মধ্যদিয়েই সমাপ্ত হবে। আর যদি ইদ্দত মাসভিত্তিক হয়, তাহলে তা হিসাব করা হবে বিচ্ছেদ বা স্বামীর মৃত্যুর সময় থেকে, যাতে হয় তিন মাস, নয়তো চার মাস দশ দিন পূর্ণ হয়। আর যদি ইদ্দত জায়েয ভিত্তিক হয় তবে তা তিন হায়েযে সমাপ্ত হবে এবং তা স্ত্রী নিজেই নির্ধারণ করবে।

ইমাম মালেক ও শাফেয়ির মতে, তালাক যদি মাসের মাঝখানে সংঘটিত হয়, তবে সেই মাসের বাকি অংশ ও পরবর্তী দু'মাস চন্দ্র মাস হিসাবে ইদ্দত পালন করতে হবে। তারপর এক মাস পুরো ত্রিশ দিন পালন করতে হবে। আবু হানিফার মতে, প্রথম মাসের অবশিষ্টাংশ ও চতুর্থ মাস প্রথম থেকে যা ছুটে গেছে, সে হিসাবে পালন করবে, চাই সম্পূর্ণভাবে হোক বা অসম্পূর্ণভাবে হোক।

স্বামীর বাড়িতে থেকেই ইদ্দত পালন করতে হবে

ইদ্দত পালনকারীর জন্য ইদ্দত শেষ হওয়া অবধি স্বামীর বাড়িতে অবস্থান করা জরুরি। সেখান থেকে বের হওয়া তার জন্য হালাল নয়। স্বামীর জন্যও তাকে বের করে দেয়া বৈধ নয়। স্বামীর বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও অবস্থান করার সময় যদি তাকে তালাক দেয়া হয়

অথবা বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়, তাহলে এ সংবাদ জানামাত্রই তার স্বামীর বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করা ওয়াজিব। কেননা আল্লাহ্ বলেন :

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَاتُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَايَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ○

অর্থ : হে নবী, (আপনি উম্মতকে বলুন), তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিতে চাও, তখন তাদের ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক দিও এবং ইদ্দত গণনা করো। তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা তাদেরকে তাদের বাসগৃহ থেকে বের করে দিওনা এবং তারাও যেন বের না হয়। অবশ্য তারা যদি কোনো স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত হয় তাহলে ভিন্ন কথা। এ হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। যে কেউ আল্লাহর বিধান লংঘন করে, সে তো নিজের উপরই অত্যাচার করে। (সূরা তালাক : আয়াত ১)

ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, স্পষ্ট অশ্লীলতার অর্থ হচ্ছে স্বামীর পরিবার জানতে পারে এমন অশ্লীলতা। পরিবার যখন এটা জানতে পারে তখন তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়া জায়েয হবে।

আবু সাঈদ খুদরির বোন ফুরাইয়া থেকে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে এলেন এবং বনু খুদরা গোত্রে তার নিজ পরিবারে (বাপের বাড়িতে) ফিরে যাবেন কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। কেননা তার স্বামী তার কয়েকজন পলাতক গোলামকে খুঁজতে বেরিয়ে ছিলেন। তারা যখন (মদিনা থেকে ছয় মাইল দূরবর্তী) কাদুমের উপকণ্ঠে পৌঁছলো, তখন তিনি (স্বামী) তাদের নাগাল পেলেন। কিন্তু তারা তাকে হত্যা করে ফেললো। ফুরাইয়া রসূলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞাসা করলো, আমি কি আমার বাপের বাড়ি ফিরে যাবো? কেননা আমার স্বামী আমাকে তার মালিকানাধীন কোনো বাড়িতে রেখে যাননি, আর আমার জন্য কোনো খোরপোষ রেখে যাননি। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন, হ্যাঁ। ফুরাইয়া বলেন, আমি তৎক্ষণাত রওনা হলাম। কিন্তু হুজরা বা মসজিদের মধ্যে থাকতেই তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি উপস্থিত হলাম। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন, তুমি কি যেন বলছিলে? তখন আমি আমার স্বামীর ঘটনা তার সামনে খুলে বললাম। তিনি বললেন, ইদ্দত পূরণ না হওয়া পর্যন্ত নিজের স্বামীর রেখে যাওয়া বাড়িতেই অবস্থান করতে থাকো। অতপর আমি সেখানে চার মাস দশ দিন ইদ্দতকাল কাটালাম। যখন উসমান রা. খলিফা হলেন, তখন আমার কাছে দূত পাঠিয়ে সেই ঘটনা জানতে চাইলেন। আমি তাকে পুরো ঘটনা জানালাম। তিনি উক্ত ফায়সালা অনুসরণ করলেন ও বহাল রাখলেন।" (আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, তিরমিযি। তিরমিযি বলেন, উমর রা. বিধবা মহিলাদের মরু অঞ্চল থেকে ফেরত পাঠিয়ে দিতেন এবং হজ্জ করতে দিতেননা।) তবে বেদুঈন বিধবা মহিলার পরিবারের লোকেরা যদি যাযাবর হয়, তবে সে তার পরিবারের লোকদের সাথে স্বামীর বাড়ি ছেড়ে যেতে পারবে।

আয়েশা, ইবনে আব্বাস, জাবের, হাসান, আতা ও আলীর মতে, স্বামীর বাড়িতে ইদ্দত কাটানো জরুরি নয়। আয়েশা রা. ইদ্দতকালে বিধবাকে স্বামীর বাড়ি থেকে বেরুবার পক্ষে ফতোয়া দিতেন। তিনি নিজেও তার বোন উম্মে কুলসুমের স্বামী তালহা বিন উবাইদুল্লাহ

নিহত হওয়ার পর তার সাথে মক্কায় ওমরা করতে গিয়েছিলেন। ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ তো বলেছেন, বিধবাকে চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতে হবে। তার স্বামীর বাড়িতে বসেই ইদ্দত পালন করতে হবে তাতো বলেননি। সে যেখানে ইচ্ছে ইদ্দত পালন করতে পারবে। আবু দাউদ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, এ আয়াত বিধবাকে স্বামীর পরিবারের সাথে থাকার বিধান রহিত করেছে। স্ত্রীর ওসিয়ত সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করেছে। সে ইচ্ছে করলে স্বামীর বাড়ি থেকে বেরুতে পারবে। কেননা আল্লাহ বলেছেন : فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْ أَنْفُسِهِنَّ ○

"তারা (বিধবা স্ত্রীরা) যদি বের হয়, তবে তারা নিজেদের ব্যাপারে যা করেছে, তাতে তাদের কোনো গুনাহ নেই।" (সূরা বাকারা : আয়াত ২৪)

আতা বলেন, এরপর উত্তরাধিকারের বিধান এলো এবং স্বামীর বাড়িতে বসবাসের বিধান রহিত করলো। সে যেখানে ইচ্ছা ইদ্দত পালন করতে পারবে।

ইদ্দতকালে মহিলার বের হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ :

ফকিহগণ ইদ্দতকালে মহিলাদের স্বামীর বাড়ি থেকে বের হওয়া সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। হানাফিদের মত হলো, তালাকপ্রাপ্ত মহিলা, চাই রজয়ি হোক বা বায়েন হোক, নিজ বাড়ি থেকে রাতে বা দিনে কখনো বের হতে পারবেনা। তবে বিধবা দিনে ও রাতের কিছু অংশে বের হতে পারবে। তবে নিজের বাড়িতে ছাড়া আর কোথাও রাত্র যাপন করতে পারবেনা। দু'জনের মধ্যে পার্থক্য হলো, তালাকপ্রাপ্ত মহিলার খোরপোষ তার স্বামীর সম্পত্তি থেকেই আসে। কাজেই স্ত্রী থাকা অবস্থার মতোই সে বাড়ি থেকে বের হতে পারবেনা। পক্ষান্তরে বিধবার খোরপোষ নেই। কাজেই সে নিজের অবস্থা ভালো করার জন্য দিনের বেলা বের হতে পারবে। আর বিচ্ছেদ ঘটার সময় তাকে যে ঘরে থাকতে দেয়া হয়, সেই ঘরেই তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে। আর যদি মৃত ব্যক্তির বাড়ি থেকে স্ত্রীর প্রাপ্ত অংশ তার বসবাসের জন্য যথেষ্ট না হয়, কিংবা উত্তরাধিকারীরা তাকে তাদের অংশ থেকে বের করে দেয়, তাহলে সে অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে পারবে। কেননা এটা একটা ওযর। নিজের বাড়িতে অবস্থান করা একটা ইবাদত। কিন্তু ওজর থাকলে ইবাদত রহিত হয়ে যায়। আর যদি ভাড়া বাড়িতে থাকে এবং ভাড়া অধিক হওয়ায় সেখানে থাকতে অসমর্থ হয়, তাহলে সে অপেক্ষাকৃত কম ভাড়ার বাড়িতে স্থানান্তরিত হতে পারবে।

ফকিহদের এ কথা থেকে প্রমাণিত হয়, বাসস্থানের ভাড়া বহন করার দায়িত্ব ইদ্দত পালনকারী স্ত্রীর। যদি সে তা বহন করতে অক্ষম হয়, তবেই তা থেকে সে অব্যাহতি পাবে। এজন্যই তারা বলেছেন, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত স্ত্রীর অংশ যদি তার বসবাসের জন্য যথেষ্ট হয়, তবেই সে সেখানে বসবাস করবে। কেননা তাদের মতে, বিধবা গর্ভবতী হোক বা না হোক, তার কোনো বাসস্থান প্রাপ্য নেই। সে যে বাড়িতে থাকা অবস্থায় স্বামী মারা গেছে, সেই বাড়িতেই দিনরাত অবস্থান করা তার কর্তব্য। হাম্বলিদের মতে, গর্ভবতী না হলে সে বাসস্থান পায়না। গর্ভবতী হলে এক বর্ণনা অনুযায়ী পায়, অন্য বর্ণনা অনুযায়ী পায়না। শাফেয়ি থেকেও দু'রকমের মতামত পাওয়া যায়। মালেকী মাযহাব অনুসারে সর্বাবস্থায় বাসস্থান তার অবশ্য প্রাপ্য। উত্তরাধিকারীরা যদি তার জন্য বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা করে তাহলে তো ভালো। নচেত বাসা ভাড়া করতে হলে ভাড়া তাকেই বহন করতে

হবে। হাম্বলিদের মতে, ইদ্দত পালনকারিণী তালাকপ্রাপ্ত হোক বা বিধবা হোক, দিনের বেলা বের হতে পারবে।

ইবনে কুদামা বলেছেন, ইদ্দত পালনকরিণী তালাকপ্রাপ্ত হোক বা বিধবা হোক, দিনের বেলা প্রয়োজনে বের হতে পারবে। জাবের রা. বলেছেন : "আমার খালাকে তিন তালাক দেয়া হয়েছিল। তিনি তার খেজুর গাছ থেকে ফল কাটতে বের হলেন। এক ব্যক্তি তাকে দেখে বের হতে নিষেধ করলো। তিনি বিষয়টি রসূলুল্লাহ সা. কে জানালেন। রসূলুল্লাহ সা. তাকে বললেন, বের হও, খেজুর কাটো। হয়তো তুমি তা থেকে সদকা করবে বা অন্য কোনো ভালো কাজ করবে।" -নাসায়ী, আবু দাউদ।

মুজাহিদ বর্ণনা করেছেন, উহুদের দিন বহু লোক শহীদ হলো। তাদের স্ত্রীরা রসূল সা.-এর কাছে এলো এবং বললো : "হে রসূল, রাতে আমাদের নিঃসঙ্গতা অনুভূত হয়। আমরা কি একজন অপরজনের কাছে রাত কাটাবো? ভোর হওয়া মাত্রই আবার নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যাবো।" রসূলুল্লাহ সা. বললেন : একজন অপরজনের কাছে গিয়ে কথাবার্তা বলতে থাকো। তারপর যখন ঘুম আসবে, তখন প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যেয়ো।"

বস্তুত নিজের বাড়িতে ছাড়া অন্যত্র রাত্র যাপন করা স্ত্রীর জন্য জায়েয নেই। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া রাতের বের হওয়াও জায়েয নেই। কেননা রাত যাবতীয় অনাচারের সময়। দিন তেমন নয়। দিন প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করা এবং জীবিকা উপার্জন করার সময়।

ইদ্দত পালনকারিণীর শোক

ইদ্দতকালে মৃত স্বামীর জন্য শোক পালন করা বিধবা মহিলার জন্য ওয়াজিব। এ ব্যাপারে ফকিহদের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। বায়েন তালাকপ্রাপ্ত মহিলা সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। হানাফিদের মতে, তারও শোক পালন করা ওয়াজিব। অন্যরা বলেন, তার কোনো শোক পালন করার প্রয়োজন নেই। শোকের তাৎপর্য পরবর্তীতে বর্ণনা করা হয়েছে।

ইদ্দত পালনকারিণীর খোরপোষ

ফকিহগণ সর্বসম্মতভাবে বলেছেন যে, রজয়ি তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী খোরপোষ ও বাসস্থানের হকদার। বায়েন তালাকপ্রাপ্ত সম্পর্কে তাদের মতভেদ রয়েছে বটে। আবু হানিফা বলেছেন, রজয়ি তালাকপ্রাপ্তের ন্যায় সেও খোরপোষ ও বাসস্থানের হকদার। কেননা স্বামীর বাড়িতে ইদ্দতকাল কাটানো তার উপর ওয়াজিব। কাজেই এই অধিকার আদায় করার সে হকদার। তাই খোরপোষ তার অবশ্য প্রাপ্য। তালাক দেয়ার সময় থেকেই খোরপোষ তার ন্যায্য প্রাপ্য ঋণ হিসেবে গণ্য হবে। এটা কোনো পারস্পরিক সম্মতির উপরও নির্ভরশীল থাকবেনা। আদালতের ফায়সালার উপরও নয়। এই ঋণ শুধু দুই উপায়ে রহিত হবে, পরিশোধ করা অথবা পাওনাদার কর্তৃক মাফ করে দেয়া। ইমাম আহমদ বলেছেন, সে কোনো খোরপোষ পাবেনা, বাসস্থানও পাবেনা। কেননা ফাতেমা বিনতে কায়েসকে যখন তার স্বামী বায়েন তালাক দিলো, তখন রসূলুল্লাহ সা. ফাতেমাকে বললেন, স্বামীর কাছে তুমি কোনো খোরপোষ পাবেনা।" ইমাম শাফেয়ি ও মালেক বলেছেন, সর্বাবস্থায় স্ত্রী বাসস্থান পাওয়ার হকদার। তবে গর্ভবতী না হলে সে বাসস্থান পাবেনা। কেননা আয়েশা ও ইবনুল মুসাইয়াব ফাতেমা বিনতে কায়সের হাদিস গ্রহণ করেনি। ইমাম মালেক বলেছেন, ইবনে শিহাবকে আমি বলতে শুনেছি, বায়েন তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী ইদ্দত না ফুরানো পর্যন্ত নিজের বাসস্থান থেকে বের হতে পারবেনা এবং গর্ভবতী না হলে খোরপোষও পাবেনা। সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত তাকে খোরপোষ দিতে হবে। ইমাম মালেক বলেছেন, এটা আমাদের মত।

শিশু সন্তান পালন সংক্রান্ত

শব্দার্থ ও সংজ্ঞা :

আরবী মূল শব্দটি হলো 'হুযানাহ' যার আভিধানিক অর্থ কোলে নেয়া বা দু'হাতে জাপটে ধরা। 'হাযানাত তায়িরু বায়যাহু' অর্থ পাখিটি তার ডিম দুই বাহুর নিচে সংরক্ষণ করলো। অনুরূপ, কোনো মহিলা কর্তৃক সন্তানকে বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরাকে 'হাযানা' বলা হয়।

ফকিহগণ এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এমন : অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু বা এমন অবুঝ ব্যক্তির লালন পালন যে ভালো বা মন্দ বাছবিচার করতে অক্ষম, আত্মনির্ভরশীল নয়, নিজের যাতে কল্যাণ হয় তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব নিতে অক্ষম, ক্ষতিকর ও কষ্টকর জিনিস থেকে আত্মরক্ষা করার অযোগ্য, নিজের শারীরিক মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশিক্ষণের দায়িত্ব বহনে অপারগ এবং নিজের জীবনের উন্নতি ও অগ্রগতি সাধনের দায়িত্ব গ্রহণে অক্ষম। অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, তাকে পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ওয়াজিব। কেননা এ ব্যাপারে অবহেলা তার ধ্বংসের কারণ হতে বাধ্য।

সন্তান পালন একটা যৌথ অধিকার :

অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু যেহেতু এমন একজন অভিভাবকের মুখাপেক্ষী যে তাদের লালন পালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্বশীল হবে, তাই লালিত পালিত হওয়া তার একটা অধিকার। (প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান পিতা বা মাতার যে কোনো একজনের নিকট থাকতে পারে। ছেলে হলে ইচ্ছা করলে একাও থাকতে পারবে। তবে পিতা বা মাতার সাথে থাকা এবং একাকী না থাকা মুস্তাহাব। যুবতী মেয়ে হলে একাকী থাকতে পারবেনা। পিতা এবং পিতা না থাকলে অভিভাবক বা আত্মীয় স্বজন তাকে একাকী থাকতে বাধা দিতে পারবে। কেননা একাকী থাকা তার ও তার পরিবারের মানসম্ভ্রমের জন্য নিরাপদ নয়।) লালন পালনের অধিকার মায়েরও রয়েছে। কেননা রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "তুমি (মা) সন্তান পালনে অগ্রাধিকারী।"

লালিত পালিত হওয়া যখন অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের অধিকার, তখন মা ছাড়া আর কেউ যদি পালন করার উপযুক্ত না থাকে, তবে মাকে এই দায়িত্ব নিতে বাধ্য করা হবে, যাতে জ্ঞান ও শিষ্টাচার অর্জনের অধিকার থেকে শিশু বঞ্চিত না হয়। তবে বিকল্প কেউ যদি থাকে, যেমন যদি দাদী থাকে, সে তাকে রাখতেও চায় এবং মা রাখতে অনিচ্ছুক হয়, তাহলে মা লালন পালনের অধিকার ছেড়ে দেয়ার কারণে তা তার উপর থেকে রহিত হবে। কেননা লালন পালনের অধিকার মূলত মায়েরই। কিছু শরয়ী আদালত থেকে এর সমর্থক রায় জারি হতে দেখা গেছে। জার্জার আদালতের রায়ে ১৩/৭/১৯৩৩ তারিখে বলা হয় :

"পালিত ও পালনকারিণী উভয়ের অধিকার রয়েছে লালন পালনে। তবে পালনকারিণীর অধিকারের চেয়ে পালিতের অধিকার প্রবলতর। পালনকারিণী একতরফাভাবে পালনের অধিকার ত্যাগ করলেই শিশুর লালিত পালিত হওয়ার অধিকার পরিত্যক্ত হয়না।"

আল ইয়াতের আদালত ১৯২৮ সালের ৭ই অক্টোবর এক রায়ে বলেন : "মা ছাড়া অন্য কেউ যদি দুগ্ধপোষ্য শিশুর লালন পালনের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে, তথাপি এই দুগ্ধপোষ্য শিশুর লালন পালনে মায়ের অধিকার রহিত হবেনা, বরঞ্চ ওটা তার হাতে বহাল

থাকবে। যতদিন শিশু দুধের উপর নির্ভরশীল থাকবে, ততদিন মায়ের এ অধিকার কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবেনা। কেননা শিশুকে তার মার লালন পালন থেকে বঞ্চিত করে ক্ষতিগ্রস্ত করার কোনো অবকাশ নেই। কারণ মা অন্য সবার চেয়ে তার প্রতি স্নেহশীলা এবং তার সেবায় অধিকতর সহনশীলা।" -ড. ইউসুফ মূসা : মুসলিম পারিবারিক আইন।

সন্তানের প্রতি বাপের চেয়ে মায়ের অধিকার বেশি

সন্তান মা বাবার কোলে লালিত পালিত হয়ে যে শিক্ষা পায় সেটাই হলো শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। কেননা মা বাবার লালন পালনের ফলে সন্তানের একাধারে দৈহিক গঠন, বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ এবং মানসিক ও আত্মিক পরিশুদ্ধি এমন নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হয় যে, তা তার গোটা জীবনের ভিত্তি বিনির্মাণে কার্যকর অবদান রাখে। এ কারণেই যখন এমন কিছু ঘটে, যার ফলে মা বাবার মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি হয়ে যায়, অথচ তাদের সন্তান রয়েছে, তখন সেই সন্তানের লালন পালনে বাবার চেয়ে মায়ের অধিকার বেশি। এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম ঘটবে কেবল তখনই, যখন এই অগ্রাধিকার লাভে মা কোনো বাধার সম্মুখিন হবে। (যেমন সন্তান পালনের অপরিহার্য শর্তাবলীর অনুপস্থিতি) অথবা সন্তানের মধ্যে এমন কোনো বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব, যা তাকে বাবা ও মায়ের যে কোনো একজনকে বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দেয়। (যথা কোনো মহিলার সেবার মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া।) মায়ের অগ্রাধিকারের কারণ হলো, সন্তান পালন ও দুধ পান করানোর ব্যাপারে মাকেই অভিভাবকত্ব অর্পণ করা হয়েছে। কারণ সন্তানের পালন ও প্রশিক্ষণে মা সর্বাধিক দক্ষতা ও ক্ষমতার অধিকারিণী। আর এ কাজে যে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন তা মায়ের মধ্যে যতো বেশি থাকে, পুরুষের মধ্যে ততোটা থাকেনা। তাছাড়া এর জন্য তার হাতে যতো সময় থাকে, পুরুষের হাতে ততোটা থাকেনা। এসব কারণে শিশুর কল্যাণের স্বার্থেই মাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত :

জনৈকা মহিলা বললো, হে রসূলুল্লাহ সা., আমার এই ছেলের জন্য আমার পেট ছিলো বাসস্থান, আমার কোল ছিলো দুর্গ আর আমার স্তন ছিলো খাদ্য ও পানীয়ের ভাণ্ডার। অথচ তার বাবা তাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চায়। রসূলুল্লাহ সা. বললেন, তুমি যদি বিয়ে না করো, তবে তুমিই তাকে রাখার বেশি হকদার।" -আহমদ, আবু দাউদ, বায়হাকি, হাকেম।

ইমাম মালেক মুয়াত্তায় বর্ণনা করেন, উমর ইবনুল খাত্তাবের একজন আনসারী স্ত্রী ছিলো। তার পেট থেকে তার ছেলে আসেম জন্মগ্রহণ করেন। পরে উমরের সাথে ঐ স্ত্রীর ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। এই সময় একদিন উমর রা. কুবাতে এলেন। দেখলেন, তার ছেলে আসেম মসজিদের চত্বরে খেলছে। অমনি তার বাহু ধরে তুলে নিজের জন্তুর পিঠের ওপর বসালেন। এ সময় ছেলের নানী দেখে উমর রা.-এর সাথে ঝগড়া শুরু করে দিলো এবং উভয়ে আবু বকরের নিকট নালিশ নিয়ে গেলেন। উমর রা. বললেন, আমার ছেলে। আর মহিলা বললো, আমার ছেলে। আবু বকর রা. ফায়সালা দিলেন, ওকে ওর নানীর সাথে যেতে দাও। এরপর উমর রা. আর নিজের দাবির পুনরাবৃত্তি করলেননা। কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায়, আবু বকর রা. বললেন, মা হচ্ছে সবচেয়ে স্নেহশীলা, মমতাময়ী, সহানুভূতিশীলা, ভালো মন্দ উপলব্ধিকারিণী। তাই সে যতোদিন বিয়ে না করবে ততোদিন সেই সন্তান পালনে অগ্রগণ্য। আবু বকরের এই বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট, মায়ের অধিকতর

স্নেহময়ী ও মমতাময়ী হওয়াই তার অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান পালনের অগ্রগণ্যতার মূল কারণ। (প্রথমে উমর রা. আবু বকরের এই মতের বিরোধী থাকলেও পরে এই মত মেনে নিয়েছেন এমনকি নিজের খেলাফতকালেও তদনুয়ায়ী ফতোয়া ও বিচারিক রায় দিয়েছেন। অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর ব্যাপারে তাদের দু'জনের এই মতে সাহাবীরাও একমত।)

সন্তান পালনের অধিকার অগ্রগণ্যতার ধারাবাহিকতা :

যেহেতু সন্তান পালনের অধিকার প্রাথমিকভাবে মায়ের জন্যই নির্ধারিত, সেহেতু মায়ের পক্ষীয় আত্মীয়রা পিতৃপক্ষের আত্মীয়দের চেয়ে এ ব্যাপারে অগ্রগণ্য। সন্তান পালনের অধিকার যারা পর্যায়ক্রমে পাবে, তাদের ধারাক্রম নিম্নরূপ : প্রথমে মা, মা যদি কোনো কারণ (যথা শর্তের অবর্তমানে) অপারগ হয়, তাহলে নানী, নানীর মা ইত্যাদি যত উর্ধ্বে যাক। তাতেও বাধা দেখা দিলে বাপের মার নিকট অধিকার হস্তান্তরিত হবে। তারপর হস্তান্তরিত হবে আপন বোনের নিকট, তারপর মা শরিক সৎ বোনের নিকট, তারপর পিতা শরিক সৎ বোনের নিকট, তারপর আপন বোনের মেয়ের নিকট, তারপর মা শরিক সৎ বোনের মেয়ের নিকট, তারপর আপন খালার নিকট, তারপর মা শরিক সৎ খালার নিকট, তারপর পিতা শরিক সৎ খালার নিকট, তারপর পিতা শরিক সৎ বোনের মেয়ের নিকট, তারপর আপন ভাই এর মেয়ের নিকট, তারপর মা শরিক সৎ ভায়ের মেয়ের নিকট, তারপর পিতা শরিক সৎ ভাই এর মেয়ের নিকট, তারপর আপন ফুফুর নিকট, তারপর মা শরিক সৎ ফুফুর নিকট, তারপর পিতা শরিক সৎ ফুফুর নিকট, তারপর মা শরিক সৎ খালার নিকট, তারপর পিতা শরিক সৎ খালার নিকট, তারপর মায়ের ফুফুর নিকট, তারপর পিতার ফুফুর নিকট হস্তান্তরিত হবে। তবে সর্বক্ষেত্রে আপন ফুফু ও আপন খালা ইত্যাদি অগ্রগণ্য হবে।

অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের যখন এসব মাহরাম আত্মীয়দের কেউ ভাগ্যে জুটবেনা, কিংবা জুটলেও তারা কেউ সন্তান পালনের যোগ্য প্রমাণিত হবেনা, তখন লালন পালনের অধিকারটা হস্তান্তরিত হবে পিতৃপক্ষীয় মাহরাম পুরুষ আত্মীয়দের নিকট উত্তরাধিকার আইনের অগ্রাধিকার ধারাবাহিকতা অনুসারে। লালন পালনের অধিকার প্রথমে হস্তান্তরিত হবে পিতার নিকট, তারপর পিতার পিতার নিকট, যত উর্ধ্বেই যাক না কেন। তারপর আপন ভাই-এর নিকট, তারপর পিতা শরিক সৎ ভাই-এর নিকট, তারপর আপন ভাই-এর ছেলের নিকট, তারপর পিতা শরিক সৎ ভাই-এর ছেলের নিকট, তারপর আপন চাচার নিকট, তারপর পিতার শরিক সৎ চাচার নিকট, তারপর পিতার আপন চাচার নিকট, তারপর পিতা শরিক সৎ চাচার, তারপর পিতার আপন চাচার নিকট, তারপর পিতার পিতা শরিক সৎ বাবার নিকট। পৈতৃক পুরুষ মাহরাম আত্মীয়দের মধ্য থেকে যদি কাউকে না পাওয়া যায়, অথবা পাওয়া যায় কিন্তু সন্তান পালনের যোগ্য না পাওয়া যায়, তাহলে পৈতৃক আত্মীয় ব্যতীত অন্য যে কোনো মাহরাম পুরুষের নিকট হস্তান্তরিত হবে। ফলে এ অধিকার এক পর্যায়ে মাতা শরীক সৎ দাদা, তারপর মাতা শরীক সৎ ভাই, তারপর মাতা শরীক সৎ ভাই এর ছেলে, তারপর মাতা শরিক সৎ চাচা, তারপর আপন মামা, তারপর পিতা শরিক মামার নিকট হস্তান্তরিত হবে। যদি দেখা যায়, শিশুর কোনো আত্মীয়ই অবশিষ্ট নেই। তবে আদালত তার লালন পালনের দায়িত্ব পালনে সক্ষম একজন পালনকারী মহিলা নিযুক্ত করবে। সন্তান পালনের ধারাবাহিকতা এভাবে নির্ধারণ করার কারণ হলো, সন্তান পালন একটা অতি জরুরি কাজ। এ কাজে সন্তানের আত্মীয়রাই

অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। তন্মধ্যে কতক আত্মীয়ের চেয়ে কতক আত্মীয় অধিকতর অগ্রগণ্য। এক্ষেত্রে অভিভাবকদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। কেননা শিশুর স্বার্থেই তাদের নিয়োগই অগ্রগণ্য। তাদেরকে না পাওয়া গেলে অথবা লালন পালনের শর্ত তাদের মধ্যে অনুপস্থিত থাকলে এ দায়িত্ব পর্যায়ক্রমে ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়দের উপর অর্পিত হবে। আর যদি আদৌ কোনো আত্মীয় না থাকে, তাহলে উপযুক্ত পালনকারী নিযুক্ত করার দায়িত্ব অর্পিত হবে বিচারকের উপর।

শিশু সন্তান পালনের শর্তাবলী :

শিশু সন্তানের পালনকারিণীর মধ্যে পালনের যোগ্যতা ও ক্ষমতা থাকা অত্যাবশ্যক। আর এই যোগ্যতা ও ক্ষমতা নিশ্চিত হয় কয়েকটি নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করতে পারলে। এই শর্তগুলো পূরণ করতে অসমর্থ হলে সন্তান পালনের দায়িত্ব রহিত হবে। এই শর্তগুলো হলো :

১. সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়া : এ কারণে পাগল ও অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তি শিশুর লালন পালনের দায়িত্ব পাবে না। কেননা এই দু'ব্যক্তি নিজের ব্যবস্থাপনাই সুষ্ঠুভাবে করতে পারেনা। তাই তাদের উপর অন্যের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ করা যেতে পারেনা। যে ব্যক্তি নিজে যে জিনিস অর্জন করতে পারেনি, সে জিনিস সে অন্যকে কিভাবে দেবে?

২. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া : কেননা অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু যদি ভালো মন্দ বাছবিচারের ক্ষমতা অর্জন করেও থাকে, তথাপি সে একজন অভিবাবক, পালক ও তত্ত্বাবধায়কের মুখাপেক্ষী, কাজেই সে অন্যের তত্ত্বাবধায়ক বা অভিভাবক হতে পারে না।

৩. লালন পালনের যোগ্যতা ও ক্ষমতা : এ শর্তের কারণে কোনো অন্ধ, দুর্বল দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন, সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত, অথবা এমন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি যা তাকে তার দায়িত্ব পালনে অক্ষম করে দেয়, কিংবা এত অধিক বয়স্ক ব্যক্তি যে নিজের জন্যই অন্যের তত্ত্বাবধানের মুখাপেক্ষী, সন্তান পালনের দায়িত্ব পাবেনা। অনুরূপ, এমন মহিলাকেও এ দায়িত্ব অর্পণ করা যাবেনা, যে নিজের সাংসারিক কর্মকাণ্ডের প্রতি উদাসীন এবং প্রায়ই বাড়ির বাইরে অবস্থান করে, আর এই উদাসিনতার কারণে শিশুর ক্ষতি হওয়া অথবা তার অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আশংকা থাকে। এমন কোনো মহিলাকেও এ দায়িত্বে নিয়োগ করা যায়না, যে কোনো সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে বসবাস করে, কিংবা শিশুকে ঘৃণা করে এমন ব্যক্তির সাথে বসবাস করে। এ ধরনের ব্যক্তি শিশুর আত্মীয় হলেও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এ ধরনের ব্যক্তির উপস্থিতিতে শিশু পর্যাপ্ত তত্ত্বাবধান ও তদারকী এবং সুস্থ পরিবেশ থেকে বঞ্চিত হতে বাধ্য।

৪. সৎ চরিত্র ও বিশ্বস্ততা : কেননা একজন পাপিষ্ঠ মহিলা শিশুর জন্য বিপজ্জনক। শিশুর লালন পালনের দায়িত্ব পালনে তাকে বিশ্বাস করা যায়না। এমনও হতে পারে যে, শিশু তার পালনকারিণীর নিয়মেই গড়ে উঠবে এবং তার মতোই কুচরিত্রের অধিকারী হবে। ইবনুল কাইয়ে এই শর্তের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন : "শাফেয়ী ও আহমদের শিষ্যগণ শিশুর পালনকারিণীর জন্য সততা ও ন্যায়পরায়ণতার শর্ত আরোপ করা সত্ত্বেও বিশুদ্ধ মতানুসারে এটা আদৌ শর্ত নয়। শর্ত হলেও সর্বশেষ পন্থা হিসেবেই হতে পারে। সাধারণভাবে যদি এই শর্ত আরোপ করা হতো, তাহলে বিশ্বের প্রায় সমস্ত শিশু পালনকারিণীর অভাবে মারা যেতো, জনগণ তাদেরকে নিয়ে হিমশিম খেতো, তাদের দুঃখ দুর্দশা মারাত্মক আকার ধারণ করতো এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে শুরু করে কেয়ামত পর্যন্ত পাপিষ্ঠ

লোকদের শিশু সন্তানদের তদারকী করতে কেউ এগিয়ে আসতোনা। অথচ তারা সংখ্যায় বিপুল। বস্তুত ইসলামে পিতামাতার কোনো একজনের পাপাচারের দরুন তার সন্তানকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া খুবই জটিল ও দুর্বিহ কাজ এবং সকল মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে ও সকল যুগে এর বিপরীত রীতি চালু রয়েছে। শিশু পালনে সততার এই শর্ত আরোপ বিয়ের অভিভাবকত্বে সততার শর্ত আরোপের মতোই। এই অভিভাবকত্ব শহরে ও গ্রামে সর্বত্র সর্বযুগে চালু রয়েছে। অথচ অনেক অভিভাবকই অসৎ ও পাপিষ্ঠ। আর মানব সমাজে পাপাচার তো রয়েছেই। রসূলুল্লাহ সা. কিংবা কোনো সাহাবী কোনো পাপাচারী বা ফাসেককে তার সন্তান পালন থেকে বিংবা তার অভিভাবকত্বাধীন মেয়ে বিয়ে দেয়া থেকে বিরত রাখেননি। সমাজে প্রচলিত রীতিপ্রথাও সাক্ষ্য দেয় যে, কোনো মানুষ ফাসেক হলেও সে তার মেয়ের ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকে এবং সাধারণত তাকে বিপথগামী হতে দেয়না। বরঞ্চ তার যাতে কল্যাণ হয় সেজন্যই উদগ্রীব ও সচেষ্ট থাকে। এর বিপরীত কিছু ঘটলেও কদাচিত ঘটে থাকে। শরিয়ত এক্ষেত্রে মানুষের স্বভাবগত চেতনা ও প্রেরণার উপরই নির্ভর করে। ফাসেককে যদি শরিয়ত সন্তান পালন ও বিয়ের অভিভাবকত্ব থেকে বঞ্চিত করতো, তাহলে এ বিষয়টার উল্লেখ ও তদনুযায়ী কাজ করাকে শরিয়ত সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতো। নিজের পাপাচার যদি সন্তান পালনের পরিপন্থী হতো, তাহলে ব্যভিচারী মদখোর ও কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে তার সন্তানদের থেকে বিচ্ছিন্ন করতো এবং তাদের লালন পালনের জন্য অন্য কাউকে নিয়োগ করতো।”

৫. মুসলমান হওয়া : এ শর্তের ফলে অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর লালন পালনকারিণী কাছের হলেও তার লালন পালন বৈধ হবেনা। কেননা সন্তান পালনও এক ধরনের অভিভাবকত্ব। আল্লাহ কোনো কাফেরকে কোনো মুমিনের অভিভাবক করেননি। সূরা নিসার ১৪১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন : وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ○

“আল্লাহ কখনো কাফেরদেরকে মুমিনদের উপর কর্তৃত্ব দেবেনা।”

অভিভাবকত্ব সম্পত্তির অভিভাবকত্ব ও বিয়ের অভিভাবকত্বের মতোই। তাছাড়া শিশুর ধর্মীয় পরিচিতি পালনকারিণীর ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আশংকাও উড়িয়ে দেয়া যায়না। কেননা সে যে তাকে নিজের ধর্মে দীক্ষিত করতে উদগ্রীব হবে, এটাই স্বাভাবিক। আর একবার তার ধর্মে দীক্ষিত করে ফেললে পরবর্তী সময়ে শিশুর পক্ষে ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন করা দুষ্কর হয়ে পড়বে। শিশুর জন্য এর চেয়ে ক্ষতিকর আর কিছু হতে পারেনা। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, “প্রত্যেক শিশুই ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে। পরবর্তীতে তার পিতামাতা তাকে ইহুদী, খৃস্টান কিংবা অগ্নিউপাসকে পরিণত করে।”

পক্ষান্তরে হানাফি, মালেকিদের মধ্য থেকে ইবনুল কাসেম ও আবু সাওরের মত হলো, শিশু মুসলমান হলেও কাফের মহিলা তার পালনকারিণী হতে পারে। কেননা শিশুর পালন তাকে দুধ খাওয়ানো ও সেবা যত্ন করার চেয়ে বেশি কিছু নয়। এ দুটোই যে কোনো কাফের মহিলা কর্তৃক সম্পাদন বৈধ।

আবু দাউদ ও নাসায়ীতে বর্ণিত আছে : “রাফে বিন সিনান যখন ইসলাম গ্রহণ করলো, তখন তার স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করলো। অতপর সে রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট এলো এবং তার দুধ ছাড়ানো শিশুকে দেখিয়ে বললো : এ হচ্ছে আমার মেয়ে।

রাফে বললো : এটা আমার মেয়ে। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন : হে আল্লাহ, মেয়েটিকে তুমি হেদায়েত করো।" তৎক্ষণাত মেয়েটি তার পিতার দিকে ঝুঁকে পড়লো। হানাফিরা কাফের মহিলার পালনকারিণী হওয়া জায়েয বলে রায় দিলেও শর্ত আরোপ করেছেন যেন ইসলাম থেকে ধর্মান্তরিত তথা মুরতাদ না হয়। কেননা তাদের মতে মুরতাদ অবিলম্বে গ্রেফতার হওয়ার উপযুক্ত এবং তওবা করা অথবা মৃত্যুবরণ করার পূর্ব পর্যন্ত তাকে কারাগারেই থাকতে হয়। কাজেই শিশুর লালন পালনের সুযোগ পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। আর যদি তওবা করে ও ফিরে আসে, তাহলে সে লালন পালনের অধিকার ফিরে পাবে।

৬. অবিবাহিতা হওয়া :

বিবাহিত মহিলার শিশু পালনের অধিকার থাকেনা। কেননা আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বর্ণিত হাদিসে (যা ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে) বলা হয়েছে যে, জনৈকা মহিলা বললো : হে রসূলুল্লাহ, আমার ছেলের জন্য তো আমার উদরই ছিলো বাসস্থান, আমার কোলই ছিলো নিরাপদ আশ্রয়স্থল এবং আমার স্তনই ছিলো খাদ্য ও পানীয়ের ভাণ্ডার। অথচ তার বাবা তাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে বলে আস্ফালন করছে।" রসূলুল্লাহ সা. বললেন, যতদিন তুমি বিয়ে না করবে, ততদিন ঐ সন্তানের ওপর তোমারই অগ্রাধিকার থাকবে।" -আহমদ, আবু দাউদ, বায়হাকি, হাকেম।

তবে এ বিধি প্রযোজ্য হবে শুধু সেই মহিলার উপর যে, কোনো আত্মীয় বা দূরাত্মীয় ব্যক্তিকে বিয়ে করে। যদি মহিলা এমন পুরুষকে বিয়ে করে যে শিশুর জন্য মাহরাম, যেমন তার আপন চাচা, তাহলে তার জন্য ঐ শিশুকে পালনের অধিকার বহাল থাকবে। কেননা চাচারও শিশুকে পালন করার অধিকার রয়েছে। তদুপরি শিশুর সাথে তার এমন সম্পর্ক ও নৈকট্য বিরাজমান যা তাকে শিশুর প্রতি স্নেহমমতায় সিক্ত ও তার প্রতি যত্নশীল হতে উজ্জীবিত করে। কাজেই শিশুর অভিভাবকত্ব ও তত্ত্বাবধানে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হবে। কিন্তু যদি কোনো অনাত্মীয় বা দূরাত্মীয়ের সাথে বিয়ে হতো, তাহলে সেই স্বামী নিজেও ঐ শিশুর প্রতি স্নেহশীল ও সহানুভূতিশীল হতো না এবং স্ত্রীকেও তার যথোপযুক্ত আদর যত্ন করতে দিতনা। ফলে শিশুটি এমন সুস্থ, স্বাভাবিক ও মমতাময় পরিবেশ পেতনা, যা তার যোগ্যতা ও প্রতিভার বিকাশের সহায়ক।

হাসান ও ইবনে হাযমের মতে, যে মহিলার লালন পালনের বৈধ অধিকার রয়েছে, সে বিয়ে করলেও তার সে অধিকার ক্ষুণ্ন হবেনা।

৭. স্বাধীনতা :

যে ব্যক্তি পরাধীন, তাকে তার মনিবের কাজ কর্মেই সব সময় এতটা ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয় যে, শিশুর লালন পালনের সুযোগ ও সময় পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। ইবনুল কাইয়েম বলেছেন : স্বাধীনতার শর্ত আরোপের পক্ষে তেমন কোনো চিত্তাকর্ষক যুক্তি প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায়না। তবুও তিনজন ইমাম এ শর্ত আরোপ করেছেন। ইমাম মালেক বলেছেন : কোনো স্বাধীন ব্যক্তির যদি দাসীর উদরজাত সন্তান থাকে, তাহলে ঐ দাসী যতোদিন অন্য কোথাও বিক্রি হয়ে স্থানান্তরিত না হয়, ততোদিন সন্তানের লালন পালনে তারই অগ্রাধিকার থাকবে। কিন্তু যখন হস্তান্তরিত হয়ে অন্যত্র চলে যাবে, তখন ঐ অগ্রাধিকার বাবার নিকট হস্তান্তরিত হবে।

সন্তান পালনের মজুরি

সন্তান পালনের মজুরির বিধি দুধ খাওয়ানোর মজুরির বিধির মতোই। মা যতক্ষণ স্ত্রী কিংবা ইদ্দত পালনরত থাকে, ততদিন এজন্য মজুরির হকদার হয়না। কেননা তখন তো সে দাম্পত্য জীবনের অথবা ইদ্দতকালীন খোরপোষ পায়। আল্লাহ্ বলেছেন :

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ط وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ط

অর্থ : মায়েরা পুরো দুই বছর দুধ পান করাবে তাদের সন্তানদেরকে, যদি পূর্ণ মেয়াদ দুধ পান করাতে চায়। আর পিতার কর্তব্য হলো মায়েদের যথারীতি ভরণ পোষণ করা। (সূরা আল বাকারা : আয়াত ২৩৩)

এ আয়াত থেকেই প্রমাণিত হয়, স্বামীর সাথে স্ত্রীরূপে বহাল থাকাকালে ও ইদ্দতকালে সন্তান পালনের জন্য মজুরি প্রাপ্য হয়না। তবে ইদ্দতের পরে মজুরি প্রাপ্য হয়, যেমন প্রাপ্য হয় দুধ পান করানোর জন্য। আল্লাহ্ বলেছেন :

فَأَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ج فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ ج وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ ج وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗ أُخْرٰى ○

অর্থ : যতোদিন তারা সন্তান প্রসব না করে, ততোদিন তাদের খোরপোষ দাও। তারপর তারা যদি তোমাদের অনুকূলে সন্তানকে দুধ পান করায় তবে তাদেরকে তাদের মজুরি দাও। এ ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে যথোচিতভাবে পরামর্শ করবে। তবে এতে যদি তোমরা কষ্ট বোধ করো, তাহলে অন্য কোনো নারী দুধ পান করাবে। (সূরা তালাক : আয়াত ৬)

মা ব্যতিত অন্য যে কোনো মহিলা সন্তান পালনে মজুরি পাওয়ার হকদার, যেমন শিশুকে দুধ পান করানোর জন্য ভাড়াকৃত ধাত্রী মজুরির হকদার হয়ে থাকে। মায়ের যদি নিজস্ব মালিকানাভুক্ত কোনো বাসস্থান না থাকে, যেখানে সে সন্তানের লালন পালন করবে, তাহলে সন্তান পালনের মজুরি ও দুধপান করানোর মজুরির মতো বাসস্থানের ব্যবস্থা করা বা ভাড়ার অর্থ প্রদান করাও পিতার দায়িত্ব। একইভাবে মার যদি কোনো ভৃত্যের প্রয়োজন হয় এবং পিতা সচ্ছল হয়, তবে ভৃত্যের মজুরি দেয়া বা ভৃত্য সরবরাহ করাও পিতার কর্তব্য। শিশুর জন্য বিশেষভাবে যে অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্র যথা খাদ্য, বস্ত্র, বিছানা, ওষুধপত্র ইত্যাদি যা না হলে চলেইনা, সেগুলোর কথা স্বতন্ত্র। কেননা সেগুলো সর্বাবস্থায় পিতার সরবরাহ করা কর্তব্য। আর লালন পালনের মজুরি লালন পালনের কাজ যখন শুরু হবে, তখন থেকেই পিতার কাছে প্রাপ্য হবে। পরিশোধ করা বা পাওনাদার কর্তৃক অব্যাহতি দেয়া ব্যতিত এটা কখনো রহিত হবেনা।

বিনা মজুরিতে সন্তান পালন :

সন্তানের আপনজনদের মধ্যে এমন কেউ যদি থাকে, যে সন্তান পালনের হকদারও, তদুপরি সে বিনা মজুরিতে তাকে লালন পালনে আগ্রহীও, অথচ তার মা মজুরি ছাড়া লালন পালনে অপারগতা জ্ঞাপন করে, তাহলে দেখতে হবে পিতা সচ্ছল না অসচ্ছল। যদি সচ্ছল হয়, তবে তাকে বাধ্য করা হবে যেন সন্তানের মাকে মজুরি দিয়ে তার লালন পালনের কাজে

নিযুক্ত করে এবং শিশুকে বিনা মজুরিতে পালনে আগ্রহী মহিলার নিকট সমর্পণ না করে, বরঞ্চ শিশুকে তার মায়ের কাছেই রাখবে। কেননা পিতা যখন মজুরি দিতে সক্ষম তখন মায়ের লালন পালনই শিশুর জন্য অধিকতর উপযোগী ও উপকারী। পক্ষান্তরে পিতা যদি অস্বচ্ছল হয়। তাহলে সে নিজের অস্বচ্ছলতার কারণে বিনা-মজুরীতে লালন পালনে ইচ্ছুক মহিলার কাছেই শিশুকে সমর্পণ করবে। কেননা সেই মহিলা শিশুর লালন পালনের অধিকার সম্পন্ন নিকটাত্মীয়দেরই একজন।

এই বিধি তখন প্রযোজ্য, যখন পিতার উপর শিশুর খোরপোষ দেয়া ওয়াজিব। কিন্তু যখন শিশুর নিজস্ব কোনো সম্পত্তি থাকে, যা থেকে তার পেছনে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা যায়, তখন শিশুকে বিনা মজুরিতে পালনে ইচ্ছুক মহিলার কাছেই সমর্পণ করা হবে। কেননা এতে তার সম্পত্তির সুরক্ষার ব্যবস্থা হবে। আর পিতা যখন স্বচ্ছল, শিশুর কোনো সম্পত্তিও নেই, তার মা বিনা মজুরিতে তার লালন পালনে অনিচ্ছুক এবং শিশুর মাহরাম আত্মীয়দের মধ্যে বিনা মজুরিতে লালন পালনে ইচ্ছুক কেউ নেই, তখন তার মাকে লালন পালনের দায়িত্ব নিতে বাধ্য করা হবে এবং এই মজুরি পিতার উপর ঋণ হিসেবে থাকবে, যা পরিশোধ অথবা অব্যাহতি প্রদান ব্যতিত রহিত হবেনা।

সন্তান পালনের মেয়াদ পূর্তি

সন্তান লালনের মেয়াদ পূর্ণ হবে তখনই, যখন শিশু মহিলাদের সেবা যত্নের মুখাপেক্ষী থাকবেনা, তার মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের চেতনা ও ভালো মন্দ বাছবিচারের ক্ষমতা তৈরি হবে এবং শিশু একা একাই নিজের অত্যাবশ্যকীয় কাজ সমাধা করতে পারবে, যেমন একা একা খাওয়া, একা একা কাপড় পরা এবং একা একাই নিজেকে পরিষ্কার করা ইত্যাদি। এসব কাজের ক্ষমতা কখন তৈরি হবে, তা নির্দিষ্ট করে বলা যায়না। তাই সন্তান পালনের মেয়াদও কখন পূর্ণ হবে বলা যায়না। প্রকৃতপক্ষে শিশুর ভালো মন্দ বাছবিছারের ক্ষমতা হওয়া ও মহিলাদের সেবা যত্নের অবসান ঘটাই এই মেয়াদপূর্তির সীমা নির্ধারক। শিশু যখন ভালো মন্দ বাছবিচারে সক্ষম হবে, নারীর সেবা যত্নের মুখাপেক্ষী থাকবেনা এবং একা একা নিজের মৌলিক প্রয়োজনগুলো পূরণ করতে পারবে, তখনই তার লালন পালনের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। হানাফি মাযহাবের ফতোয়া হলো, বালকের বয়স যখন সাত বছর এবং বালিকার বয়স নয় বছর পূর্ণ হবে তখনই তার লালন পালনের মেয়াদ সমাপ্ত হবে। বালিকার ক্ষেত্রে তারা দু'বছর বাড়ানো সমীচীন মনে করেছেন এজন্য যেন সে তার পালনকারিণীর কাছ থেকে নারীসুলভ জীবন যাপনের নিয়মাবলী রপ্ত করে নেয়ার সুযোগ পায়। ১৯২৯ সালের মিশরীরা আইনের২৫ নং আইনের ২০ নং ধারায় সন্তান পালনের বয়স নির্ধারণ নিম্নোক্ত ভাবে করা হয়েছে :

"মহিলাদের দ্বারা অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে শিশু পালনের মেয়াদ আদালত সাত থেকে নয় বছর বয়স পর্যন্ত এবং মেয়ে শিশুর মেয়াদ নয় থেকে এগারো পর্যন্ত নির্ধারণ করতে পারে যদি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এটাই শিশুর স্বার্থের দাবি।" কাজেই শিশুর কিসে ভালো হবে, তা নির্ধারণের ভার আদালতের উপরই ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এই আইনের এই ধারাটির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে : "এখন পর্যন্ত যে কার্যধারা চালু রয়েছে, তা হলো সন্তান পালনের অধিকার ছেলে শিশুর বেলায় সাত বছর বয়সে এবং মেয়ে শিশুর বেলায় নয় বছর বয়সে শেষ হয়।" আসলে এটাই সেই বয়স, যার সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ

বয়স পর্যন্ত ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশু কোনো না কোনো পালনকারিণীর মুখাপেক্ষী থাকে। এ বয়স পর্যন্ত মহিলা পালনকারিণীর পরিবর্তে কোনো পুরুষ পালনকারীর নিকট ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশু সোপর্দ করা উভয়ের জন্য বিপজ্জনক হয়ে থাকে, বিশেষত যখন তাদের বাবা তাদের মা ব্যতিত অন্য কোনা মহিলাকে বিয়ে করে। তাই এ সময়ে সন্তানদেরকে কেড়ে নেয়ার বিরুদ্ধে মহিলাদেরকে অত্যধিক অভিযোগ করতে দেয়া যায়। হানাফি মযহাবের নীতি নির্ধারণী কথা হলো, ছেলে শিশু যখন মহিলা পালনকারিণীর সেবার মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে এবং মেয়ে শিশু যখন যৌবনে উপনীত হবে তখনই তাদেরকে তাদের পিতার হাতে সমর্পণ করা হবে। কিন্তু শিশু কত বছর বয়সে। এই মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত হবে তা নির্ধারণে ফকিহগণ নানাবিধ মত অবলম্বন করেছেন। কারো মতে, মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত হয় সাত বছর বয়সে, কারো মতে নয় বছর বয়সে আবার কেউ বলেন, যৌবনে উপনীত হয় নয় বছর বয়সে, কেউ বলেন, এগারো বছর বয়সে। পক্ষান্তরে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মতে, সাত বছর বয়সের পর ছেলে শিশুর এবং নয় বছর বয়সের পর মেয়ে শিশুর স্বার্থ কিভাবে রক্ষিত হবে, সেটা বিবেচনা করার এখতিয়ার আদালতের নিকট অর্পণ করা মঙ্গলজনক। আদালত যদি মনে করে, এ বয়সের পরও তাদের মহিলা পালনকারিণীর অধীন থাকা কল্যাণকর, তাহলে ছেলে শিশুকে আরো দু'বছর বাড়িয়ে নয় বছর পর্যন্ত এবং মেয়ে শিশুকে আরো দু'বছরে বাড়িয়ে এগারো বছর পর্যন্ত মহিলা পালনকারিণীর নিকট রাখার ফায়সালা দিতে পারে। আর যদি আদালত তাদের জন্য অন্য কোনো ব্যবস্থা কল্যাণকর মনে করে, তবে উভয়কে কোনো পুরুষ অভিভাবকের নিকট সোপর্দ করতে পারে।" মুসলিম পরিবার আইনের ১৭৫ নং ধারায় রয়েছে যে, পালনকারিণী নারী হলে আদালতও সেক্ষেত্রে অনুরূপ দু'বছর করে সম্প্রসারিত করতে পারে। আদালত ছেলে ও মেয়ে উভয়কে মা বা নানীর কাছে পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত থাকার অনুমতিও দিতে পারে। তবে আমাদের মতে, ২৯ সালের ২৫ নং আইনের ২০ নং ধারা অনুসরণ করাই কল্যাণকর, যা এখনো বলবৎ রয়েছে। -ড. মুহাম্মদ ইউসুফ মূসা।

সুদানের আইন :

ড. মুহাম্মদ ইউসুফ মূসা উল্লেখ করেছেন যে, ১৯৩২ সালের ৩৪ নং আইন জারি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সুদানের ইসলামী আদালতে এই বিধি চালু ছিলো যে, ছেলে শিশুর লালন পালনের সর্বশেষ বয়স সাত বছর এবং মেয়ে শিশুর বয়স নয় বছর। পরে ১৯৩২ সালের আইনের প্রথম ধারায় বলা হলো : "আদালত ছেলে শিশুকে সাত বছর থেকে যৌবন পর্যন্ত এবং মেয়ে শিশুকে নয় বছর থেকে স্বামীর বাসর হওয়া পর্যন্ত মহিলা পালনকারিণীর কাছে লালিত পালিত হওয়ার অনুমতি দিতে পারে, যদি জানা যায় যে, তাতেই তার মঙ্গল নিশ্চিত। তবে পালনকারিণীর নিকট পালিত হওয়ার সময়ে পিতা ও অন্য সকল গুরুজন তাকে বিদ্যা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে পারে।" তারপর দ্বিতীয় ধারায় বলা হয়েছে : "ছেলে শিশুর সাত বছর ও মেয়ে শিশুর নয় বছর বয়সের পর লালন পালনের জন্য কোনো মজুরি দিতে হবেনো।" তৃতীয় ধারায় রয়েছে : "পিতা যদি মেয়েকে লালন পালনের দায়িত্ব থেকে পালনকারিণীকে অব্যাহতি দেয়ার উদ্দেশ্যে বিয়ে দেয়, তবে স্বামীর বাসরে যাওয়া মাত্রই লালন পালনের দায়িত্ব রহিত হবেনা, যতোক্ষণ পালনকারিণী লালন পালনে সক্ষম থাকবে।"

১৯৪২ সালে খারতুম থেকে প্রকাশিত বিধিমালায় যা পাওয়া যায়, তার সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে :

১. ৩৪ নং শরয়ী বিধি বালকের লালন পালনের বয়স যৌবন প্রাপ্তি পর্যন্ত এবং বালিকার লালন পালনের বয়স বাসরে যাওয়া পর্যন্ত বাড়িয়েছে। এটা আবু হানিফার মতের পরিপন্থী। এটা মালেকি মাযহাবের মতো।

এটা একটা ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি ব্লে প্রতীয়মান হচ্ছে, যা অতিক্রম করতে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাবলী নেয়া আবশ্যক :

১. আদালত কেবল তখনই লালন পালনের মেয়াদ সম্প্রসারিত করবে, যখন পালনকারিণী আদালতের নিকট পালিত শিশুকে তার নিকট রাখার অনুমতি প্রার্থনা করবে। অনুমতি প্রার্থনার সাথে এটাও উল্লেখ করবে যে, এতেই শিশুর কল্যাণ নিহিত রয়েছে সেই সাথে প্রত্যাশিত কল্যাণের বিবরণও দেবে। অথবা একই কারণে সে যে শিশুকে পালন করছে, তাকে তার পিতৃপক্ষীয় আত্মীয়ের নিকট সোপর্দ করতে অস্বীকার করবে। পিতৃপক্ষীয় আত্মীয় যখন পালিত শিশুকে তার পালনকারিণীর নিকট রাখতে সম্মত হবেনা, তখন পালনকারিণীকে তার প্রমাণাদি উপস্থাপন করতে বলা হবে, অথবা আদালত স্বয়ং উক্ত বালক বা বালিকার স্বার্থ ও কল্যাণ কিসে নিহিত, তা তদন্ত করবে। পালনকারিণী যদি প্রমাণাদি উপস্থাপন না করে, অথবা উপস্থাপন করে কিন্তু তা সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য যথেষ্ট হয়না, আর আদালতের নিকটও স্পষ্ট হয়না যে, শিশুকে তার পালনকারিণীর কাছে রাখা কল্যাণকর, তাহলে পালনকারিণী দাবি জানালে আদালত পিতৃপক্ষীয় আত্মীয়ের কাছ থেকে এই মর্মে শপথ নেবে যে, শিশুকে পালনকারিণীর কাছে রেখে দিলে তার কল্যাণ নিশ্চিত হবেনা সে যদি এভাবে শপথ করে, তাহলে আদালত শিশুকে তার নিকট সমর্পণের ফায়সালা করবে। আর যদি শপথ করতে অস্বীকার করে, তাহলে তার আবেদন অগ্রাহ্য করবে।

২. যদি পালনকারিণী শিশুকে তার পিতৃপক্ষীয় আত্মীয়ের নিকট সমর্পণের বিরোধিতা না করে, অথবা আদৌ আদালতে হাজির না হয়, তাহলে ইমাম আবু হানিফার মাযহাবের বিধি অনুসরণ করা আদালতের কর্তব্য। এই বিধি অনুযায়ী লালন পালনের বয়স সীমা অতিক্রান্ত শিশুকে উপযুক্ত বিবেচিত পিতৃপক্ষীয় আত্মীয়ের নিকট সমর্পণ করা হবে এবং এটা শিশুর স্বার্থের চাহিদা হিসেবেই করা উচিত একথা প্রমাণ করার প্রয়োজন হবেনা।

৩. পালনকারিণী যদি শিশুকে পিতৃপক্ষীয় আত্মীয়ের নিকট হস্তান্তরের সময় অনুপস্থিত থাকে, তাহলে সে আদালতের রায়ের বিরোধিতা করতে পারবে এবং শিশুকে তার নিকট রাখার দাবি জানাতে পারবে। সেরূপ ক্ষেত্রে যে পালনকারিণী উপস্থিত থাকে, তার সাথে আদালত যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করে, অবিকল সেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৪. আদালত যদি শিশুর কল্যাণের খাতিরে তাকে মহিলাদের মধ্যে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়, অতপর কোনো কারণে কল্যাণের পথ পরিবর্ধিত হয়ে যায় এবং কিসে তার কল্যাণ হবে, তা নিয়ে পুনরায় বিতর্ক দেখা দেয়, তাহলে পালনকারিণীর কাছে থাকায় শিশুর কোনো কল্যাণ নেই এই মর্মে নিশ্চিত হওয়ার পর আদালত শিশুকে তার কাছ থেকে নিয়ে পিতৃপক্ষীয় আত্মীয়ের নিকট হস্তান্তর করার অনুমতি দেবে। (ড. মুহাম্মদ ইউসুফ মূসা : মুসলিম পারিবারিক আইন পৃ. ৫১৬)

লালন পালনের মেয়াদ সমাপ্তিতে বালক বালিকার স্বাধীনতা

শিশুর যখন সাত বছর বয়স হবে কিংবা ভালোমন্দ বুঝবার বয়স হবে এবং অন্যের কাছে

লালিত পালিত হওয়ার মেয়াদ অতিক্রান্ত হবে। তখন তার বাবা ও পালনকারিণী যদি একমত হয় যে, তাদের যে কোনো একজনের কাছে তার থাকা উচিত, তাহলে এই ঐকমত্য অনুসারে কাজ করা হবে। আর যদি তারা দ্বিমত পোষণ করে ও বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাহলে তাদের যে কোনো একজনকে গ্রহণে শিশুকে স্বাধীনতা দেয়া হবে। সে তাদের দু'জনের মধ্য থেকে যাকে কাছাই করবে সেই তার জন্য অগ্রগণ্য হবে। (শিশুকে স্বাধীনতা দেয়ার জন্য দু'টো শর্ত রয়েছে : ১ বিতর্ককারীরা সবাই লালন পালনের অধিকারী হবে। ২ শিশুটি যেন অসুস্থ মস্তিষ্ক বা বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী না হয়। যদি অসুস্থ মস্তিষ্ক হয়, তাহলে মাই তার তত্ত্বাবধায়ক হবার ব্যাপারে অগ্রগণ্য হবে, চাই শিশু তখন প্রাপ্তবয়স্কই হয়ে থাক না কেন। কেননা এমতাবস্থায় প্রাপ্তবয়স্ক হলেও সে শিশুর মাতা। আর শিশুর প্রতি মাই অধিকতর স্নেহময়ী।)

আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেছেন : জনৈক মহিলা রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট এলো এবং বললো : হে রসূলুল্লাহ, আমার স্বামী আমার ছেলেকে নিয়ে যেতে চায়। অথচ এই ছেলে আমাকে মদিনা থেকে এক মাইল দূরে অবস্থিত আবু আনাবার কুয়া থেকে পানি এনে পান করিয়েছে এবং আরো অনেক উপকার করেছে। রসূলুল্লাহ সা. ছেলেটিকে বললেন : "এই যে তোমার বাবা, আর এই যে তোমার মা। যাকে চাও তার হাত ধরো।" ছেলেটি তার মায়ের হাত ধরলো। অতপর মহিলা ছেলেকে নিয়ে চলে গেলো।" -আবু দাউদ।

উমর রা. আলী রা. ও শুরাইহ এই বিধি অনুসারেই ফায়সালা করেছেন। এটাই শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাবের মত। ছেলে যদি উভয়কে নির্বাচন করে কিংবা কাউকেই নির্বাচন না করে, তাহলে তাদের একজনকে লটারির মাধ্যমে নির্বাচন করা হবে। আবু হানিফা বলেছেন : পিতার অধিকার অগ্রগণ্য। ছেলেকে স্বাধীনতা দেয়া জায়েয নেই। কেননা তার কোনো মতামত নেই এবং সে নিজের ভালোমন্দ বোঝেনা। এমনও হতে পারে যে, সে যার কাছে অবাধে খেলা করতে পারবে, যে তাকে শিষ্টাচার শেখাবেনা এবং যেমন খুশি তেমন চলতে দেবে, তাকেই নির্বাচন করবে। এর ফলে সে বখাটে হয়ে যাবে। তাছাড়া যেহেতু সে বয়োপ্রাপ্ত নয়, তাই তাকে স্বাধীনতা দেয়া যায়না। যেমন সাত বছরের কম বয়স্ক শিশুকে স্বাধীনতা দেয়া হয়নি। ইমাম মালেকের মতে, শিশুর দাঁত পড়া পর্যন্ত তার উপর মায়ের অধিকার বেশি। এ বিধি ছেলে শিশুর বেলায় প্রযোজ্য। মেয়ে শিশু সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ির মত হলো, ছেলে শিশুর মতোই তাকে স্বাধীনতা দেয়া হবে। আবু হানিফা বলেছেন, মেয়ে শিশুর যৌবন লাভ করা বা বিয়ে হওয়া পর্যন্ত তার উপর মায়ের হক বেশি। ইমাম মালেক বলেন, বিয়ে হওয়া ও স্বামীর বাসর ঘরে যাওয়া পর্যন্ত তার উপর মায়ের অধিকার বেশি। হাম্বলিদের মতে মেয়ে শিশুর বয়স নয় বছর হওয়া পর্যন্ত তার উপর বাবার অধিকার বেশি এবং তাকে কোনো স্বাধীনতা দেয়া হবেনা। মা ও বাবার কোনো একজনের অগ্রগণ্যতা বা দু'জনের একজনকে নির্বাচনে শিশুর স্বাধীনতার ব্যাপারে শরিয়তে আদৌ কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই। আলেমগণও একমত যে, দু'জনের কোনো একজনকে শরিয়তে শর্তহীনভাবে নির্ধারিত করা হয়নি। বরঞ্চ দু'জনের মধ্যে যেজন অত্যাধিক কড়া কিংবা উদাসীন, তাকে সৎ ন্যায়পরায়ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ জনের উপর অগ্রাধিকার দেয়া হবেনা। শিশু রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকিতে সক্ষম হওয়াটাই এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়। বাবা যদি সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণে উদাসীন ও অবহেলা প্রবণ অথবা অসমর্থ হয়, কিংবা তার সামর্থ্য সন্তোষজনক না হয় এবং মা তার বিপরীত হয়, তাহলে মাই

সন্তান পালনে অগ্রগণ্য হবে বলে ইবনুল কাইয়েম মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, দু'জনের মধ্যে যাকেই আমরা অগ্রাধিকার দেই, চাই সন্তানকে স্বাধীনতা দেয়ার মাধ্যমে হোক বা লটারির মাধ্যমে হোক, বা আর কোনোভাবে হোক, সেটা সন্তানের স্বার্থ ও কল্যাণ নিশ্চিত হয় এমনভাবেই দিতে হবে। মা যদি বাবার চেয়ে ভালো রক্ষক ও ভালো তত্ত্বাবধায়ক হয়, তাহলে তাকে বাবার উপর অগ্রাধিকার দেয়া হবে। এ রকম ক্ষেত্রে লটারি বা শিশুকে নির্বাচনের স্বাধীনতা দেয়ার প্রতি ভ্রুক্ষেপই করা হবেনা। কেননা শিশুর বুদ্ধি দুর্বল ও অসম্পূর্ণ এবং সে খেলাধুলা করা অথবা নিষ্ক্রিয় থাকাকেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। আর এ ব্যাপারে তাকে যে সাহায্য করে, স্বভাবতই সে তাকেই নির্বাচন করবে। তাই শিশু কাকে নির্বাচন করলো বা করলোনা সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করা যাবেনা। মা বাবার মধ্যে যেজন তার জন্য অধিকতর কল্যাণজনক ও উপকারী, তার কাছেই তার থাকা প্রয়োজন। শরিয়ত এ ছাড়া অন্য কিছু বরদাশত করতে পারেনা। কেননা রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, ছেলেমেয়েকে সাত বছর বয়সেই নামাযের আদেশ দাও এবং দশ বছর বয়সে নামায না পড়লে প্রহার করো এবং তাদের বিছানা আলাদা করে দাও।" আর অপরদিকে আল্লাহ বলেছেন :

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ○

অর্থ : হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও পরিবার পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো, যার কাষ্ঠ হবে মানুষ ও পাথর। (সূরা আত তাহরীম : আয়াত ৬)

ইমাম হাসান বসরি বলেছেন, তোমরা ছেলেমেদেরকে জ্ঞান শিক্ষা দাও, শিষ্টাচার শিক্ষা দাও এবং ইসলামী বিধান শিক্ষা দাও।"

সুতরাং যে মা শিশুকে মক্তবে পাঠায় ও কুরআন শেখায়, সে মা এমন বাবার চেয়ে অগ্রগণ্য, যে শিশুকে অধিকাংশ সময় খেলাধুলা ও সমবয়সীদের সাথে মেলামেশায় সাহায্য করে। এ ব্যাপারে কোনো লটারি বা শিশুকে নির্বাচনের ক্ষমতা দেয়ার প্রশ্নই ওঠেনা। মায়ের পরিবর্তে বাবা যদি এ রকম হয়, তাহলে তার বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। পিতামাতার মধ্য থেকে যেজন সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহ ও তার রসূলের হুকুম অমান্য করবে, তার ওপর সেই জন অগ্রাধিকার পাবে, যে আল্লাহ ও তার রসূলের হুকুম মান্য করে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন : একবার কোনো পিতামাতা তাদের সন্তানের ব্যাপারে শাসকের নিকট পাল্টাপাল্টি দাবি জানালো। শাসক সন্তানকে স্বাধীনতা দিলেন। সে তার বাপকে নির্বাচন করলো। তখন তার মা শাসককে বললেন, আপনি ওকে জিজ্ঞাসা করুন, কী কারণে বাবাকে নির্বাচন করেছে। শাসক জিজ্ঞাসা করলেন। জবাবে সন্তান বললো, আমার মা আমাকে প্রতিদিন মক্তবে পাঠায়, সেখানে শিক্ষক আমাকে প্রহার করে। আর আমার বাবা আমাকে ছেলেদের সাথে খেলতে দেন। একথা শুনে শাসক মায়ের পক্ষে রায় দিলেন এবং বললেন, তোমারই সন্তানের প্রতি অগ্রাধিকার রয়েছে। ইবনে তাইমিয়া আরো বলেছেন, পিতামাতার মধ্য থেকে যেজন সন্তানকে ইসলামী শিক্ষা দেয়া পরিত্যাগ করবে, সে পাপী এবং সে সন্তানের অভিভাবক হওয়ার কোনো অধিকার তার নেই। শুধু বাবা মা নয়, সকল দায়িত্বশীলের বেলাই একথা প্রযোজ্য। তাকে অভিভাবকত্ব ত্যাগ করে এমন কাউকে অভিভাবক নিয়োগ করতে হবে, যে ইসলামী আদর্শ নীতিমালা অনুযায়ী তার

সন্তানদেরকে পরিচালনা করবে। কেননা সাধ্যমত আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য করাই সকলের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।

শিশু কখন পিতামাতা উভয়ের কাছে পালাক্রমে থাকবে

শাফেয়ি আলেমগণ বলেছেন, সন্তান যদি ছেলে হয় এবং সে মাকে নির্বাচন করে, তবে সে রাতের বেলা মার কাছে থাকবে এবং বাবা তাকে দিনের বেলায় বিদ্যালয়ে কিংবা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাবে। কেননা মূল লক্ষ্য হলো সন্তানের ভাগ্য উন্নয়ন আর যদি বাবাকে নির্বাচন করে, তাহলে সে দিনরাত সব সময় বাবার কাছে থাকবে। তবে তাকে তার মার কাছে বেড়াতে যেতে বা সাক্ষাত করতে যেতে বাধা দেয়া চলবেনা। কেননা বাধা দেয়ার অর্থ হবে মায়ের অবাধ্য হতে ও রক্তের বন্ধন ছিন্ন করতে প্ররোচনা দান। ছেলে যদি অসুস্থ হয় তবে তর পরিচর্যায় মায়ের অধিকারই বেশি। কেননা রোগের কারণে সে সম্পূর্ণ শিশুর মতো একজন তত্ত্বাবধায়কের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। আর এ ধরনের পরিস্থিতিতে তার পরিচর্যায় মায়েরই অগ্রাধিকার। আর সন্তান যদি মেয়ে হয় এবং সে দু'জনের একজনকে নির্বাচন করে, তবে সে যাকে নির্বাচন করেছে তার কাছে দিনরাত থাকবে। তবে অপরজনকে তার সাথে দেখা করতে বাধা দেয়া যাবেনা। তবে সেই সাক্ষাতকার বেশি দীর্ঘস্থায়ী না হওয়া চাই। কেননা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটলে তাদের দুজনের একজন অপরজনের কাছে দীর্ঘ সময় কাটাবেনা। আর যদি মেয়ে অসুস্থ হয়, তবে মা তার নিজ বাড়িতে নিয়ে তার পরিচর্যা করতে অগ্রাধিকার পাবে। আর যদি পিতামাতার কোনো একজন অসুস্থ হয় এবং সন্তান অন্যের কাছে থাকে, তাহলে তাকে তার পরিচর্যা ও মৃত্যুর সময় তার কাছে থাকতে বাধা দেয়া যাবেনা। আর যদি শিশু পিতামাতার একজনকে নির্বাচন করে এবং তাকে তার নিকট অর্পণ করা হয়, অতপর সে অন্যজনকে বাছাই করে, তাহলে শিশুকে তার নিকট স্থানান্তরিত করতে হবে। আর তার নিকট হস্তান্তরের পর সে যদি পুনরায় প্রথমজনকে নির্বাচন করে, তবে তাকে তার কাছেই ফেরত পাঠাতে হবে। কেননা নির্বাচনটা তার স্বাধীন মতানুসারেই হতে হবে। আবার মা বাবার কোনো একজনের নিকট অবস্থানকারী শিশু এক এক সময়ে এক একজনের নিকট থাকা পছন্দ করতে পারে। এমতাবস্থায় তার খাদ্যপানীয় সরবরাহ করার সময় যেমন তার ইচ্ছাকে অনুসরণ করা হয়, তেমনি তার এ ইচ্ছারও অনুসরণ করা হবে।

শিশুকে স্থানান্তর করা

পিতামাতার কোনো একজন যখন কোনো প্রয়োজনে সফরে যায় এবং অপরজন বাড়িতে থাকে, তখন যিনি বাড়িতে আছেন তারই সন্তানকে নিজের কাছে রাখার অগ্রাধিকার। কেননা শিশু সন্তানকে নিয়ে সফরে যাওয়া তার জন্য ক্ষতিকর, বিশেষত সে যদি দুগ্ধপোষ্য হয়। এভাবে শর্তহীনভাবেই এটির উল্লেখ করতে হয়েছে। হজ্জের সফরকে এ থেকে বাদ দেয়া হয়নি। আর যদি তাদের একজন এক শহর থেকে অন্য শহরে বসবাসের জন্য স্থানান্তরিত হয় এবং সেই শহর ও সেখানে যাওয়ার পথ অথবা এর কোনো একটি বিপদসংকুল হয়, তাহলে যেজন স্থিতিশীল রয়েছে, সে ঐ শিশু পালনের অগ্রাধিকারী। আর যদি সেই শহর ও সেখানে যাতায়াতের পথ নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ হয়, তাহলে আহমদ থেকে বর্ণিত দু'টি মতের একটি হলো, পালনের অধিকার বাবার, যাতে সে শিশুকে শিক্ষাদীক্ষা দিতে পারে। এটা মালেক ও শাফেয়িদেরও মত এবং শুরাইহ এই মতেই ফায়সালা করেছেন। অপর মতটি হলো, মায়ের অধিকার অগ্রগণ্য। এখানে তৃতীয় আরো

একটি মতও রয়েছে। সেটি হলো, স্থানান্তরিত হওয়া ব্যক্তি যদি বাবা হয়, তাহলে মায়ের অধিকার অগ্রগণ্য। আর যদি মা হয় তবে দেখতে হবে যে শহরে সে স্থানান্তরিত হচ্ছে, মূল বিয়ে সেখানেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল কিনা। যদি হয়, তবে মায়ের অধিকার অগ্রগণ্য। অন্যথায় বাবার অধিকার অগ্রগণ্য। আর আবু হানিফার মত এটাই। আবু হানিফার আরো একটা মত বর্ণিত হয়েছে। সেটি এই যে, মা যদি শহর থেকে গ্রামে স্থানান্তরিত হয়, তবে বাবার অগ্রাধিকার। আর যদি এক শহর থেকে অন্য শহরে হয়, তবে মায়ের অগ্রাধিকার। আর এই সমস্ত মতামতের কোনোটির পক্ষেই তেমন কোনো সন্তোষজনক প্রমাণ নেই। কাজেই যা করলে শিশুর কল্যাণ অধিকতর নিশ্চিত হবে, সেটা করাই সঠিক এবং সতর্কতামূলক। দেখতে হবে, স্থানান্তরিত হওয়া ও না হওয়ার মধ্যে কোন্‌টি বেশি উপকারী। যেটি শিশুর জন্য বেশি উপকারী ও নিরাপত্তামূলক হবে, সেটাই করা হবে। আর এসব ব্যবস্থা তখনই প্রযোজ্য, যখন মা ও বাবার একজন স্থানান্তরিত হওয়ার মাধ্যমে অন্যের ক্ষতি করতে ও সন্তানকে তার কাছ থেকে কেড়ে নিতে ইচ্ছুক হয়না। যে ব্যক্তি এরূপ করতে ইচ্ছুক হবে তার কাছে শিশুকে অর্পণ করা হবেনা।

আদালতের রায়সমূহ

শিশুর লালন পালনের সাথে সংশ্লিষ্ট মামলায় ইসলামী আদালতের বহু রায় রয়েছে যা গণনা করা দুঃসাধ্য। এসব রায়ের মধ্যে বহু সংখ্যক রায় এমন রয়েছে, যা থেকে বিভিন্ন বিধি ও মূলনীতি বেরিয়ে এসেছে। এ ধরনের কিছু রায় এখানে তুলে ধরছি :

প্রথম রায় : কারমুয রাজ্যের নিম্ন আদালত থেকে ১৯৩২ সালে ঘোষিত এ রায় ১৯৩৩ সালে আলেকজান্দ্রিয়ার নিম্ন আদালত থেকে ঘোষিত রায় দ্বারা সমর্থিত হয়। এ রায় মায়ের অনুপস্থিতির অজুহাতে বাবা কর্তৃক তার শিশু মেয়েকে নিজে লালন পালনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়। এই শিশু মেয়ের বাবা ও মা যে শহরে বাস করতো এবং যে শহরে তাদের বিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল, সেই শহর থেকে স্ত্রী অনেক দূরে অবস্থিত একটি শহরে বাস করা আরম্ভ করে। মায়ের এত দূরে অবস্থান যেহেতু তার সন্তান পালনের অধিকার রহিত করে, তাই পিতা শিশু মেয়েটির লালন পালনের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে। আদালত তার রায়ে ফিকহ শাস্ত্রের এই বিধির বরাত দেয় যে, স্বামী-স্ত্রীতে বিচ্ছেদ ঘটার আগে ও পরে সন্তান পালনে মায়ের অগ্রাধিকার রয়েছে। এমনকি স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীর অবাধ্যতাও তার সন্তান পালনের অধিকার রহিত করেনা। স্বামী-স্ত্রীর বৈবাহিক বন্ধন যতক্ষণ বহাল থাকে, ততক্ষণ বাবা সন্তান পালনের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করতে চাইলে প্রথমে তার পক্ষ থেকে অবাধ্য স্ত্রীকে তার আনুগত্যে ফিরে আসার নোটিশ দিতে হবে। নোটিশ দিয়েই একতরফাভাবে শিশু সন্তানের পালনের আবেদন জানালে সে অত্যাচারী সাব্যস্ত হবে এবং তার আবেদন গ্রহণ করা হবেনা। কেননা এতে মা সন্তান পালন ও তত্ত্বাবধানের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এই রায় থেকে মূলনীতি জানা গেলো : শিশুর মা যখন শিশু সন্তানকে নিয়ে দূরবর্তী স্থানে স্থানান্তরিত হয়ে যায়, তখন বৈবাহিক সম্পর্ক বহাল থাকা পর্যন্ত বাবার তার কাছ থেকে সন্তানকে ছিনিয়ে নেয়ার অধিকার নেই। কেননা বাবার তখনো মায়ের উপর বৈবাহিক কর্তৃত্ব এবং তাকে আনুগত্যে ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা রয়েছে। সেই ক্ষমতাবলে সে স্ত্রীকে নিজের কর্তৃত্বে ফিরিয়ে এনে সন্তানকে নিজের তত্ত্বাবধানে রাখতে পারে। ইদ্দত পালনরতা স্ত্রীর বেলায়ও একথা প্রযোজ্য। কেননা তাকে ইদ্দতকালে স্বামীগৃহে থাকার ব্যবস্থা করা স্বামীর দায়িত্ব।"

দ্বিতীয় রায় : প্রথমে ১৯৩১ সালের মে মাসে বেবা রাজ্যের নিম্ন আদালত থেকে জারিকৃত ও পরে ১৯৩১ সালের জুলাইতে বনু সুয়াইদের উচ্চতর আদালত থেকে আপিলক্রমে সমর্থিত এই রায় থেকে যে মূলনীতিটি প্রতিষ্ঠিত হয় তা হলো : "যতক্ষণ পযন্ত সন্তানের মা তার নিজ শহরে বাস করে এবং সেই শহর ও তার কাছ থেকে দূরে অবস্থানকারী বাবার শহরের মাঝে এত বেশি ব্যবধান থাকেনা যে, বাবা সন্তানকে দেখতে যেতে ও দেখে রাতের আগে নিজ শহরে ফিরে আসতে পারেনা, ততক্ষণ বাবার এ অজুহাত গ্রহণ করা হবেনা যে, সে সন্তানের মা ও পালনকারিণীর শহরে গিয়ে সন্তানকে দেখে রাতের আগে নিজের শহরে ফিরে আসতে পারেনা এবং তাকে ঐ অজুহাতের ভিত্তিতে সন্তান পালনের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করার অনুমতি দেয়া হবেনা, চাই বাবার ঐ শহর থেকে দূরে অবস্থান করা ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত হোক।" কেননা এ ক্ষেত্রে কোনো অবস্থায়ই মায়ের কোনো দোষ নেই।

এই মামলার ঘটনাবলীর বিবরণ এই যে, বাদি বিবাদিনীকে বিবাদিনীর নিজ শহর বনু মাজারে বিয়ে করে, অতপর বৈবাহিক বন্ধন বহাল থাকা অবস্থায় তাদের একটি কন্যা সন্তান জন্মে। ঐ শহরেই স্ত্রীকে তালাক দেয়া হয় এবং সন্তান প্রসবের মাধ্যমে ইদ্দত সমাপ্ত হয়। এরপর বিবাদিনী বেবা নগরের আদালত থেকে ১৯৩০ সালের ২৯ অক্টোবর এই মর্মে ডিগ্রি লাভ করে যে, কন্যা সন্তানটিকে সে-ই লালন-পালন করবে। এ সময়ে বাদি বনু মাজার শহরে বসবাস করতো। পরে বাদি আসিয়ুত নগরীতে বদলি হওয়ায় উক্ত ডিগ্রির অবসান ঘটে এবং সেখানে সে আদালতে কন্যাকে নিজে লালন পালনের অনুমতি প্রার্থনা করে। এ সময় কন্যার বয়স দু'বছর আট মাসের বেশি ছিলনা।

তৃতীয় রায় : দামিনপুরের আদালত থেকে ১৯২৭ সালের ২৫ অক্টোবর এ রায় ঘোষিত হয় এবং এর বিরুদ্ধে কোনো আপিল করা হয়নি। এ রায়ে ঘোষণা করা হয় যে, শরিয়তের বিধান মতে, মা ব্যতীত অন্য কোনো পালনকারিণীর জন্য সন্তানের বাবার শহর থেকে অন্য শহরে সন্তানকে স্থানান্তরিত করা বাবার অনুমতি ব্যতিরেকে বৈধ নয়। তবে কোনো কোনো ফকিহের মতে, এ দ্বারা এত দূরে অবস্থিত স্থানে স্থানান্তর করা বুঝানো হয়েছে, যেখানে সন্তানকে দেখতে গিয়ে রাতের আগে নিজ বাড়িতে ফেরা বাবার পক্ষে সম্ভব নয়। এর চেয়ে নিকটবর্তী স্থানে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে মা ও মা ব্যতীত অন্য মহিলার পার্থক্য নেই।

বস্তুত আদালতের যেসব রায়কে ফিক্হী ভাষ্যসমূহের বাস্তব প্রতিফলন গণ্য করা হয়, সেগুলো সম্পর্কে অবহিত হওয়া সকলের কর্তব্য। কেননা এগুলোতে বাস্তব জীবনে অনেক সমস্যার সমাধান নিহিত রয়েছে। জীবনের বাস্তবতার আলোকেই আদালত এসব ফিক্হী ভাষ্যের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে থাকে।

হুদুদ (ইসলামী ফৌজদারী দণ্ডবিধি)

আরবী ভাষায় 'হুদুদ' শব্দটি 'হদ্' এর বহুবচন। 'হদ্' হলো দুটি জিনিসের মধ্যবর্তী শেষ সীমা। কেউ কেউ বলেন : একটি জিনিসকে অন্য একটি জিনিস থেকে পৃথককারী বস্তুকেই হদ বলা হয়।

বাড়ির সীমা ও জমির সীমাকেও হদ্ বা হুদুদ বলা হয়। আভিধানিক অর্থে হদ্ অর্থ বাধা দেয়া বা বিরত রাখা। পাপ বা অপরাধের শাস্তিকে 'হুদুদ' বলা হয় এজন্য যে, এগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অপরাধীকে যে অপরাধের জন্য সে শাস্তি ভোগ করেছে, তার দিকে ফিরে যাওয়া থেকে বিরত রাখে। কখনো কখনো খোদ্ অপরাধের উপরও হদ্ বা হুদুদ শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন : تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَاتَقْرَبُوْهَا ○

"এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। সুতরাং এগুলোর নিকটবর্তী হয়োনা।" (বাকারা : ১৮৭)

শরিয়তের পরিভাষায় 'হদ্' হলো, আল্লাহর অধিকার লঙ্ঘনের জন্য নির্ধারিত শাস্তি। অর্থাৎ সমাজ ও সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এসব শাস্তি নির্ধারিত। কেননা আল্লাহর দীনের মূল লক্ষ্য এটাই। আর এটা যখন আল্লাহর অধিকার, তখন কোনো ব্যক্তি বা সমাজ তা রহিত করতে বা তার দায় থেকে কাউকে অব্যাহতি দিতে পারে না। তাযির (ইসলামী আদালত কর্তৃক প্রদত্ত লঘুদণ্ড) 'হদ্' থেকে পৃথক। কেননা এটা আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি নয়, বরং বিচারকের বিবেচনা প্রসূত শাস্তি। 'কিসাস' হদ থেকে পৃথক। কারণ ওটা আল্লাহর নয়, মানুষের অধিকার।

দণ্ডনীয় অপরাধসমূহ

কুরআন ও সুন্নাহ কতিপয় নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য কিছু শাস্তি নির্ধারণ করেছে। এগুলোকে 'হদযোগ্য অপরাধ' তথা দণ্ডনীয় অপরাধ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই অপরাধগুলো হলো : ব্যভিচার, ব্যভিচারের সাক্ষীবিহীন অপবাদ, চুরি, মদপান, দাঙ্গা-হাঙ্গামা করা, ইসলাম ত্যাগ করা, রাষ্ট্রদ্রোহিতা করা। এসব অপরাধের যে কোনো একটি যে ব্যক্তি করবে, তার জন্য শরিয়ত শাস্তি নির্ধারিণ করে রেখেছে।

ব্যভিচারের শাস্তি হলো, অবিবাহিতের জন্য বেত্রাঘাত এবং বিবাহিতের জন্য প্রস্তরাঘাতে হত্যা। আল্লাহ বলেন :

وَالّٰتِىْ يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ج فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا○

অর্থ : তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হতে চারজন সাক্ষী তলব করবে। যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোনো ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত তাদের গৃহে অবরুদ্ধ করবে। (সূরা আন্‌নিসা : আয়াত ১৫)

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ○

"ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারীর প্রত্যেককে একশত কষাঘাত করবে। আল্লাহর বিধান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদের প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহর ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হও। মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।" (সূরা আন্নূর : আয়াত ২)

আর রসূলুল্লাহ সা. বলেন, "তোমরা আমার কাছ থেকে নাও, আমার কাছ থেকে নাও। আল্লাহ তাদের জন্য (ব্যভিচারিণীদের জন্য) অন্য ব্যবস্থা করেছেন। অবিবাহিতের সাথে অবিবাহিতের (ব্যভিচার করলে) একশো কষাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তর। আর বিবাহিতের সাথে বিবাহিত (ব্যভিচার করলে) একশো কষাঘাত ও প্রস্তরাঘাতে হত্যা।" আর ব্যভিচারের অপবাদের শাস্তি আশি কষাঘাত। আল্লাহ বলেন :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ○

"যারা সতী সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনা, তাদেরকে আশিটি কষাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবেনা। তারাই তো সত্যপরিত্যাগকারী।" (সূরা আন্নূর : আয়াত ৪)

আর চুরির শাস্তি হাত কাটা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً ۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○

"পুরুষ কিংবা নারী চুরি করলে তাদের হস্তচ্ছেদন করো। এটা তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর নির্ধারিত আদর্শ দণ্ড। আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।" (মায়েদা : আয়াত ৩৮)

আর দেশে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও অরাজকতা ছড়ানোর শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড, শূলে চড়ানো, কিংবা দেশান্তরিত করা, অথবা হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা। আল্লাহ বলেন :

إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○

"যারা আল্লাহ ও তার রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং জমিনে ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায় তাদের শাস্তি হলো তাদেরকে হত্যা করা হবে, অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে, অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় এটাই তাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।" (সূরা আল মায়েদা : আয়াত ৩৩)

মদ মাদক সেবনের শাস্তি আশি অথবা চল্লিশ কষাঘাত, যার বিশদ বিবরণ পরে আসছে। ইসলাম ত্যাগ করার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। কেননা, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "যে ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করে, তাকে তোমরা মৃত্যুদণ্ড করো।"

আর রাষ্ট্রদ্রোহিতার শাস্তি হত্যা। কেননা আল্লাহ্ বলেন :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ج فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ج فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ط إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ○

"মুমিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিও। এরপর তাদের একদল অপর দলকে আক্রমণ করলে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে, তবে তাদের মধ্যে ন্যায়সংগতভাবে ফায়সালা করবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালবাসেন।" (সূরা আল হুজুরাত : আয়াত ৯)

তাছাড়া রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : "আমার পরে অনেক দুর্বলতা আসবে। মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ রয়েছে এমতাবস্থায় তাদেরকে যে ব্যক্তি বিভক্ত করতে চায়, তাকে তোমরা তরবারী দিয়ে আঘাত করো, চাই সে যে-ই হোক না কেন।"

এই শাস্তিগুলোর যৌক্তিকতা

এই শাস্তিগুলো একদিকে যেমন জনস্বার্থকে সংরক্ষণ করে, অন্যদিকে তেমনি জননিরাপত্তাও নিশ্চিত করে। তাই এগুলো অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত শাস্তি।

প্রথমে ব্যভিচারের কথা ধরা যাক। ব্যভিচার সর্বাপেক্ষা অশ্লীল ও জঘন্যতম অপরাধগুলোর অন্যতম। এটা নৈতিকতা, মহত্ত্ব ও সম্ভ্রমের উপর একটা আগ্রাসন। পরিবার ব্যবস্থাকে ধ্বংসকারী এবং এমন বহু অন্যায় ও অপকর্মের প্রচলনকারী, যা ব্যক্তি ও সমাজের মহৎ উপাদানগুলোকে বিনষ্ট করে। এতদসত্ত্বেও ইসলাম এ অপরাধের সত্যতা প্রমাণে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করেছে। এজন্য এমন সব শর্ত আরোপ করেছে যে, তা পূরণ করা প্রায় অসম্ভব।

ব্যভিচারের শাস্তি দ্বারা প্রধানত ভীতির সৃষ্টি করা, সাবধান করা ও প্রতিহত করাই লক্ষ্য।

সতী সাধ্বী ও বিবাহিত নারী ও পুরুষের প্রতি ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপ এমন একটি মারাত্মক অপরাধ, যা পরিবারের বন্ধন ছিন্ন করে, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ ও বিচ্ছেদ ঘটায় এবং পরিবারের স্তম্ভগুলো ধ্বসিয়ে দেয়। অথচ পরিবার হলো সমাজের ভিত্তি। এটি সুস্থ থাকলে সমাজ সুস্থ থাকবে, আর এটি বিনষ্ট ও বিকৃত হলে সমাজও বিনষ্ট হতে বাধ্য। এ অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তিকে আশিটি কষাঘাতের শাস্তি তখনই দেয়া হয়, যখন সে তার আরোপিত অভিযোগের পক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে ব্যর্থ হয়। সুতরাং এটি সর্বোচ্চ মাত্রার প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার পরিচায়ক এবং সমাজের সার্বিক স্বার্থ ও কল্যাণের রক্ষক। এ শাস্তি মানুষের সম্মান ও মর্যাদাকে কলুষিত হওয়া থেকে রক্ষা করে এবং তার সুনাম ও সুখ্যাতি অক্ষুণ্ন রাখে।

আর চুরি হলো, মানুষের ধনসম্পদের উপর পরিচালিত আগ্রাসন এবং তা নিয়ে ছিনিমিনি খেলার নামান্তর। অথচ ধনসম্পদ মানুষের কাছে সবচেয়ে প্রিয় জিনিস। কাজেই এ অপরাধের সাথে জড়িত ব্যক্তির হাত কাটার উদ্দেশ্য হলো, অন্যদেরকে চুরি থেকে বিরত রাখা। এভাবে সবাই নিজ নিজ ধনসম্পদ সম্পর্কে নিশ্চিত থাকতে পারবে। যেসব দেশে এ আইনকে কেবল সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা এবং শরিয়ত ও আইন অমান্যকারীদের

হাত থেকে ধনসম্পদকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে বলবৎ রয়েছে, সেসব দেশ এর সুফল প্রকাশ পেয়েছে। করাদণ্ড চুরির মতো অপরাধের মাত্রা কমাতে কোনো অবদান না রাখার পরিপ্রেক্ষিতে (অধুনালুপ্ত) সোভিয়েট ইউনিয়নে চুরির শাস্তি কঠোরতর করা হয়েছে। সেখানে চোরকে গুলি করে হত্যা করার মাধ্যমে চোরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। আর যারা দেশে সহিংসতা, সন্ত্রাস, নাশকতা ও অরাজকতা ছড়ায়, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধায়, শান্তি ও শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে এবং প্রতিষ্ঠিত সরকারকে বলপ্রয়োগে উৎখাতের চেষ্টা চালায়, তাদের ন্যূনতম শাস্তি হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা অথবা দেশ থেকে বিতাড়িত করা। মদ ও মাদক সেবন সেবনকারীর মস্তিষ্কে সুস্থ বুদ্ধির স্বাভাবিকতা বিনষ্ট করে। আর এটা বিনষ্ট হওয়া মাত্রই মানুষ যাবতীয় অশ্লীল ও নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ কাজ করতে আরম্ভ করে দেয়। তাই শরিয়তের শাস্তি কষাঘাত একদিকে যেমন তাকে এই অপরাধের পুনরাবৃত্তি থেকে রক্ষা করবে, অপরদিকে তেমনি তা অন্যদের এ ধরনের অপরাধ থেকে দূরে থাকতে উৎসাহী করে।

হুদুদ কার্যকর করা ওয়াজিব

শরিয়ত নির্ধারিত হুদুদ বা শাস্তি কার্যকরকরণে মানুষের প্রভূত কল্যাণ নিহিত রয়েছে। কেননা হুদুদ অপরাধ প্রতিহত করে, দুষ্ট লোকদের দমন করে, লোকদেরকে হারাম ও নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখে। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের, সম্মানের, সম্পদের, সুনামের, স্বাধীনতার ও মর্যাদার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "পৃথিবীতে একটি হদ আল্লাহ রির্ধারিত দণ্ড কার্যকর হওয়া পৃথিবীবাসীর উপর চল্লিশ দিন ব্যাপী বৃষ্টিপাত হওয়ার চেয়ে কল্যাণকর।" আর হুদুদের বাস্তবায়ন বন্ধ রাখে এমন যে কোনো কর্মকাণ্ড আল্লাহর বিধানকে নিষ্ক্রিয় করে রাখার সমার্থক এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শামিল। কেননা এর অর্থ দাঁড়ায় অন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করা ও দুর্বৃত্তপনার প্রসার ঘটানো।

আহমদ, আবু দাউদ ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "যার সুপারিশ আল্লাহর নির্ধারিত কোনো শাস্তির বাস্তবায়নে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, সে আল্লাহর কর্তৃত্বের প্রতিরোধকারী।" অনেক সময় এমন হয় যে, মানুষ দুর্বৃত্ত কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে এবং তার উপর কার্যকর হওয়া শাস্তিটাই শুধু দেখতে পায়। সেটা দেখে সে মর্মাহত হয় এবং তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ে। এ সম্পর্কেই কুরআন বলে যে, এটা ঈমানের পরিপন্থী কাজ। কারণ অপরাধমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং ব্যক্তি ও সমাজকে উচ্চতর কৃষ্টি ও সুদৃঢ় নৈতিক মানে উন্নীত করা ঈমানের দাবি। আল্লাহ বলেন :

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ج وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ○

"ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারীর প্রত্যেককে একশত কষাঘাত করবে। আল্লাহর বিধান কার্যকর করণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদের প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও। মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।" (আন-নূর : ২)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সমাজের প্রতি দয়া ব্যক্তির প্রতি দয়ার চাইতে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

হুদুদের ব্যাপারে সুপারিশ করা

কোনো হদ্ কার্যকরিকরণের বিপক্ষে সুপারিশ করা বা কোনো হদকে অকার্যকর করার জন্য কোনো কাজ করা হারাম। কেননা এতে এমন একটা উপকারিতাকে বিনষ্ট করা হবে, যা সুনির্দিষ্ট বলে প্রমাণিত ও পরীক্ষিত। অপরাধ করতে আসকারা দেয়া হবে এবং অপরাধীকে তার অপরাধের পরিণতি ভোগ করা থেকে রেহাই দেয়ার প্রতি সম্মতি জানানো হবে। সুপারিশের এই অবৈধতা কার্যকর হবে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট শাসকের দরবারে পৌঁছে যাওয়ার পর। কেননা সুপারিশ তখন শাসককে তার প্রদান কর্তব্য থেকে বিরত রাখবে এবং শাস্তিকে অকার্যকর করার পথ খুলে দেবে। (উল্লেখ, শাসকের নিকট অভিযোগ পৌঁছে যাওযার পর হদ কার্যকর করা তার উপর ওয়াজিব হয়ে যায় মর্মে আলেমদের ও মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত (এজমা) রয়েছে বলে ইবনে আব্দুল বার দাবি করেছেন।) পক্ষান্তরে শাসকের নিকট (বা আদালতে) অভিযোগ দায়ের হওয়ার আগে অপরাধীকে আড়াল করা এবং শাসকের নিকট সুপারিশ করা দূষণীয় নয়।

আবু দাউদ, নাসায়ী ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "অপরাধগুলোকে তোমরা নিজেদের মধ্যে ক্ষমা করে দাও। কেননা আমার নিকট যেটা পৌঁছে যাবে, তার শাস্তি অবধারিত।" আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও হাকেম বর্ণনা করেছেন : যে লোকটি সাফওয়ান বিন উমা ইয়ার চাদর চুরি করেছিল, রসূলুল্লাহ সা. যখন তার হাত কাটার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং সাফওয়ান তার পক্ষে সুপারিশ করলো, তখন রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তুমি ওকে আমার কাছে ধরে আনার আগে কেন এই সুপারিশটা করলেনা?

আয়েশা রা. থেকে আহমদ, মুসলিম ও নাসায়ী বর্ণনা করেছেন : বনু মাখজুম গোত্রের জনৈক মহিলা মানুষের কাছ থেকে বিভিন্ন জিনিস ধার নিয়ে অস্বীকার করতো। রসূলুল্লাহ সা. তার হাত কাটার আদেশ দিলেন। তার পরিবারের লোকেরা উসামা বিন যায়দের কাছে এলো এবং তার সাথে কথা বললো। তদনুযায়ী উসামা রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট ঐ মহিলার পক্ষে সুপারিশ করলো। রসূলুল্লাহ সা. তাকে বললেন : হে উসামা আমি দেখতে চাইনা যে, তুমি আল্লাহর নির্ধারিত কোনো শাস্তির ব্যাপারে সুপারিশ করো।" এরপর রসূলুল্লাহ সা. দাঁড়িয়ে ভাষণ দিয়ে বললেন : তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়েছে শুধু এজন্য যে, তাদের মধ্যে কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অপরাধ করলে তাকে ছেড়ে দিত, আর কোনো দুর্বল ব্যক্তি অপরাধ করলে তাকে শাস্তি দিত। আল্লাহর কসম, মুহাম্মদের মেয়ে ফাতেমাও যদি চুরি করতো, তবে আমি তার হাত কেটে দিতাম।" অতপর বনু মাখদুম গোত্রের মহিলাটির হাত কেটে দেয়া হলো।

সন্দেহ দেখা দিলে হদ রহিত হবে

হদ এমন একটা শাস্তি, যা অপরাধীর শরীর ও সুনামের ক্ষতিসাধন করে। কারো সম্মান ও মর্যাদার ক্ষতি করা বা তাকে কষ্ট দেয়া কেবলমাত্র সঙ্গত কারণে ব্যতীত জায়েয নয়। সংশয়বিহীন ও অকাট্য প্রমাণ দ্বারা অপরাধ প্রমাণিত না হলে সঙ্গত কারণে শাস্তি হয়েছে বলা যায়না। কাজেই সন্দেহ সংশয় দেখা দিলে শাস্তি কার্যকর করার জন্য যে সুনিশ্চিত সন্দেহাতীত ভিত্তি প্রয়োজন, তা আর বিদ্যমান থাকেনা। এ কারণেই অপবাদ ও সন্দেহ-সংশয় ধর্তব্য নয় এবং বিবেচনায়ও আসবেনা। কেননা এটা বিভ্রান্তিকর। ইবনে

মাজাহ আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমরা যতক্ষণ অপরাধগুলো দমন করতে পারো, ততক্ষণ করতে থাকো।" আর তিরমিযি আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : মুসলমানদের উপর থেকে শাস্তি যতটা পারো রহিত করো। তাকে অব্যাহতি দেয়ার সুযোগ থাকলে অব্যাহতি দাও। কেননা শাসকের জন্য ভুলক্রমে শাস্তি দেয়ার চেয়ে ভুলক্রমে মাফ করা উত্তম।"

সন্দেহ কত প্রকার ও কি কি?

হানাফি ও শাফেয়িগণ সন্দেহ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। এ ব্যাপারে তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র মতামত রয়েছে। এই মতামতের সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ :

শাফেয়িদের মতানুসারে সন্দেহ তিন প্রকারের :

১. সঙ্গমের স্থান নিয়ে সন্দেহ : যথা স্বামী কর্তৃক ঋতুবতী বা রোযাদার স্ত্রীর সাথে সহবাস করা বা স্ত্রীর মলদ্বারে সহবাস করা। এখানে সহবাসের নিষিদ্ধ স্থান নিয়ে সন্দেহ বিদ্যমান। কেননা স্ত্রী স্বামীর কর্তৃত্বাধীন এবং তার সাথে সহবাস করার অধিকার তার রয়েছে। যদিও ঋতুবতী ও রোযাদার স্ত্রীর সাথে ও স্ত্রীর মলদ্বারে সহবাস বৈধ নয়। তথাপি স্ত্রীর উপর তার অধিকার ও কর্তৃত্ব এক ধরনের সন্দেহের সৃষ্টি করে। এই সন্দেহই হদ রহিত করার দাবি জানায়; চাই সহবাসকারী কাজটিকে হালাল বা হারাম, যা-ই বিশ্বাস করুক না কেন। কেননা এই ধারণা ও বিশ্বাস সন্দেহের কারণ নয়। সন্দেহের কারণ হলো, সঙ্গমের স্থান এবং তার উপর সঙ্গমকারীর আইনী কর্তৃত্ব।

২. সঙ্গমকারীর ধারণা ভিত্তিক সন্দেহ : যেমন এক ব্যক্তি বাসর ঘরে পাওয়া মহিলাকে স্ত্রী ভেবে সঙ্গম করলো এবং পরে প্রমাণিত হলো যে, সে তার স্ত্রী নয়। এখানে সন্দেহের ভিত্তি সঙ্গমকারীর এরূপ ধারণা ও বিশ্বাস যে, সে কোনো হারাম কাজ করছেনা। এই সন্দেহ হদ রহিত করে। কিন্তু সঙ্গমকারী যদি মহিলাকে নিজের জন্য নিষিদ্ধ জেনেও সঙ্গম করে, তাহলে এটা সন্দেহ হিসেবে গণ্য হবেনা।

৩. ফকিহদের মতভেদজনিত সন্দেহ : সঙ্গমটি বৈধ না অবৈধ এ ব্যাপারে সন্দেহ। আর এ সন্দেহের ভিত্তি ফকিহদের মতভেদ। ফকিহরা যেসব বিষয়ের জায়েয ও নাজায়েয হওয়া নিয়ে মতভেদ পোষণ করেন, সেসব মতভেদ ঐসব বিষয়ে সন্দেহের সৃষ্টি করে, যা হদকে রহিত করে। যেমন আবু হানিফা ওলি ব্যতীত বিয়ে এবং মালেক সাক্ষী ব্যতীত বিয়ে জায়েয মনে করেন। অথচ অধিকাংশ আলেমগণ তা জায়েয মনে করেননা। এ ধরনের বিয়ের বিশুদ্ধতা নিয়ে মতভেদ থাকায় এ ধরনের বিয়ের পর সঙ্গম করলে তাতে হদ কার্যকর হবেনা। কেননা মতভেদ যে সন্দেহ সৃষ্টি করে, তা হদকে রহিত করে। এমনকি সঙ্গমকারী সঙ্গমকে অবৈধ মনে করলেও হদ কার্যকর হবেনা। কেননা যতক্ষণ ফকিহগণ এটা নিয়ে মতভেদে লিপ্ত থাকবেন, ততক্ষণ সঙ্গমকারীর ধারণা বিশ্বাসের কোনো কার্যকারিতা থাকবেনা।

হানাফিদের মতে সন্দেহ দু'প্রকারের :

১. সহবাস নিয়ে সন্দেহ : সহবাস নিয়ে যার সন্দেহ রয়েছে, এটা শুধু তারই জন্য সন্দেহ বিবেচিত হবে। যার সহবাস নিয়ে সন্দেহ নেই, তার কাছে সন্দেহ বিবেচিত হবেনা। যে ব্যক্তি সহবাস হালাল না হারাম- উভয় ব্যাপারেই সন্দেহ পোষণ করে, অথচ সেখানে এমন কোনো শ্রবণযোগ্য প্রমাণ নেই, যা হালাল সাব্যস্ত করে। তার জন্য এই সন্দেহ

সন্দেহরূপেই বিবেচিত হবে। যেমন অর্থের বিনিময়ে স্ত্রীকে তিন তালাক বা বায়েন তালাক দেয়ার পর ইদ্দতের মধ্যে তার সাথে সহবাস করা। এখানে সহবাসের হালাল বা হারাম হওয়া নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টির কারণ হলো, তালাকের কারণে বিয়ে অবসান ঘটলেও এই দিক দিয়ে বিয়ে বহাল রয়েছে যে, তালাকপ্রাপ্তার গর্ভে সন্তান থাকলে তা ঐ স্বামীর সন্তান হিসেবেই গণ্য হবে। এ ধরনের সহবাস হারাম এবং হদযোগ্য ব্যভিচার। তবে সহবাসকারী যদি দাবি করে যে, তার সন্দেহ ছিলো এবং সে কাজটাকে হালাল মনে করেছিল, তাহলে এটা ব্যভিচার গণ্য হবেনা। কেননা সে তার ধারণাকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এটা যদিও প্রকৃতপক্ষে প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হবার যোগ্য নয়, তথাপি সে যখন একে প্রমাণ মনে করেছে, তখন তার জন্য এ সন্দেহ 'হদ' মওকুফকারী সাব্যস্ত হবে এমন অপরাধের জন্য, যা সন্দেহ দ্বারা মওকুফ হয়। সহবাস নিয়ে সন্দেহ গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত হলো, কাজটি হারাম বলে আদৌ কোনো প্রমাণ যেন না থাকে এবং সহবাসকারী যেন কাজটাকে হালাল বলে বিশ্বাস করে। হারাম হওয়ার পক্ষে কোনো প্রমাণ থেকে থাকলে বা সহবাসকারী সহবাসকে বৈধ বলে বিশ্বাস না করলে আদৌ কোনো সন্দেহ থাকবেনা। আর যখন প্রমাণিত হবে যে, সহবাসকারী সহবাসের হারাম হওয়া সম্পর্কে অবহিত ছিলো, তাহলে তার উপর হদ কার্যকরি করা অপরিহার্য হয়ে পড়বে।

২. যার সাথে সহবাস করা হয়েছে তাকে নিয়ে সন্দেহ : এ সন্দেহের ভিত্তি হচ্ছে, যে নারীর সাথে সহবাস করা হয়েছে, তার সম্পর্কে শরিয়তের বিধান নিয়ে সন্দেহ। সুতরাং এ সন্দেহের গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত হলো, শরিয়তের কোনো বিধান থেকেই এ সন্দেহের সূত্রপাত হওয়া। যখন এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যাবে যা উক্ত নারীর নিষিদ্ধ হওয়াকে বাতিল সাব্যস্ত করে, তখন এ সন্দেহ বাস্তবতায় পরিণত হবে। (অর্থাৎ হদ কার্যকর হবেনা।) এখানে সহবাসকারীর ধারণার কোনো মূল নেই। সে এ কাজ হারাম বা হালাল যা-ই ধারণা করুক, তাতে কোনোই পার্থক্য হয়না। কেননা শরয়ী প্রমাণ দ্বারাই সন্দেহ সত্য প্রমাণিত হয়েছে, তার জানা বা না জানার দ্বারা নয়।

হদ কার্যকরি করার ক্ষমতা ও দায়িত্ব কার?

ফকিহগণ একমত যে, শাসক বা তার প্রতিনিধিই হদ কার্যকরি করার ক্ষমতা ও অধিকার রাখে। নাগরিকগণ নিজ নিজ ব্যক্তিগত উদ্যোগে এ কাজ করার অধিকার ও ক্ষমতা রাখেনা।

তাহাবি মুসলিম বিন ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেছেন : জনৈক সাহাবী বলতেন : "যাকাত, হুদুদ, কর খাজনা ও জুমার নামায শাসকের হাতে ন্যস্ত।" তাহাবি বলেন : কোনো সাহাবী তার এই উক্তির বিরোধিতা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। বায়হাকি বর্ণনা করেন, মদিনাবাসী বলতেন : "শাসক ব্যতীত অন্য কারো হুদুদ কার্যকর করার অধিকার নেই। তবে দাসদাসীর উপর ব্যভিচারের হদ কার্যকর করার ক্ষমতা মনিবের রয়েছে।" শাফেয়িসহ প্রাচীন মনীষীদের একটি দলের মত হলো, মনিব তার দাসদাসীর উপর হদ কার্যকর করবে। তাদের প্রমাণ এই যে, আলী রা. বলেন : রসূলুল্লাহ সা.-এর জনৈক গৃহ পরিচারিকা একটি সন্তান প্রসব করলো। রসূলুল্লাহ সা. আমাকে তার উপর হদ কার্যকর করার আদেশ দিলেন। আমি তার নিকট গেলাম। দেখলাম, তার রক্তস্রাব বন্ধ হয়নি। অতপর আমি রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট ফিরে গিয়ে ব্যাপারটা অবহিত করলাম। তিনি

বললেন : তার রক্তস্রাব যখন বন্ধ হবে, তখন তার উপর হদ কার্যকর করো। তোমরা তোমাদের দাসদাসীদের উপর হুদুদ কার্যকর করো।" (আহমদ, আবু দাউদ, মুসলিম, বায়হাকি ও হাকেম)

কিন্তু ইমাম আবু হানিফার মতে, মনিব নিজে কার্যকরি করবেনা। বরং শাসকের নিকট অভিযোগ পৌছাবে।

হুদুদের ক্ষেত্রে অপরাধীকে আড়াল করার বৈধতা

অপরাধ ও পাপাচারে লিপ্তদের অপরাধমূলক কার্যকলাপ গোপন করা কখনো কখনো তাদের জন্য খুবই উপকারী চিকিৎসা সাব্যস্ত হয়ে থাকে। গোপন করার ফলে কখনো কখনো তারা অপরাধ করার পরও স্বউদ্যোগে খালেস তওবা করে এবং নতুন করে পরিপূর্ণ জীবন যাপন শুরু করে। এ কারণে ইসলাম অপরাধীদের আড়াল করা ও তাদের অপরাধের কথা ফাঁস করে দেয়ার জন্য তাড়াহুড়া না করার নির্দেশ দিয়েছে।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব বলেন, আমি শুনেছি, বনু আসলাম গোত্রের হাযযাল নামক এক ব্যক্তি, সূরা নূরের ব্যভিচারের শাস্তি ২নং আয়াত নাযিল হওয়ার আগে রসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে এসে জনৈক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ দায়ের করলো। রসূলুল্লাহ সা. তাকে বললো, ওহে হাযযাল, তোমার চাদরের নিচে যদি তাকে লুকিয়ে রাখতে, তাহলে তোমার জন্য ভালো হতো। হাযযালের পৌত্র ইয়াযীদ পরবর্তীকালে তার দাদার এই উক্তি সত্য বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের দোষ ঢেকে রাখবে, আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার দোষ ঢেকে রাখবেন। আর যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের দোষ ফাঁস করবে, আল্লাহ তার দোষ ফাঁস করে দেবেন, এমনকি তাকে তার পরিবারের সামনেই অপমানিত করবেন।" বস্তুতঃ দোষ আড়াল করে রাখা যখন মুস্তাহাব, তখন সেই দোষ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়াটাও বাঞ্ছনীয় হওয়ার কথা নয়। এটা মাকরূহ তানযিহী। অবশ্য এই আড়াল করাটা সেই ব্যক্তির বেলায় প্রযোজ্য, যে ব্যভিচারে অভ্যস্ত নয় এবং নিজে তা প্রকাশ করেনা। কিন্তু পরিস্থিতি যখন এতদূর গড়ায় যে, সে নিজেই তার গোপনীয়তা রক্ষায় সচেষ্ট নয়, বরং তা প্রকাশ ও ফাঁস করে, তখন তার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়া না দেয়ার চেয়ে ভালো। কেননা শরিয়তের অভিপ্রায় হলো পৃথিবীকে পাপাচার ও অশ্লীলতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র করা। অপরাধী ও পাপাচারীরা যখন তা থেকে তওবা করে এবং তার জন্য তাদেরকে তিরস্কার ও শাস্তি দেয়া হয়, তখন পাপাচার থেকে পৃথিবীকে পবিত্রকরণের প্রক্রিয়া চালু ও কার্যকর হয়ে যায়। কিন্তু যখন ব্যভিচারীর এতটা ধৃষ্টতা প্রকাশ পায় যে, ব্যভিচার করেও তা গোপন করার পরোয়া করেনা, বরং তা প্রকাশিত হওয়াতেও কুণ্ঠিত হয়না, তখন পৃথিবীকে তওবার মাধ্যমে পাপাচারমুক্ত করার আর কোনো নিশ্চয়তা থাকেনা। কাজেই এ ধরনের ধৃষ্টতা ও বেপরোয়াভাব যার মধ্যে দেখা যাবে, তার পাপাচার দূর করার জন্য দ্বিতীয় উপায় অবলম্বন করার আর কোনো বিকল্প থাকবেনা। এই দ্বিতীয় উপায়টি হলো হুদুদ বা শাস্তি। পক্ষান্তরে যে বক্তি অতি সংগোপনে ও অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে ব্যভিচার করে এবং প্রতিবার করার পর অনুতপ্ত হয় সে এক বা একাধিকবার করলেও তা প্রত্যক্ষকারী কর্তৃক লুকিয়ে রাখা মুস্তাহাব।

মুসলমানের নিজের দোষ নিজে লুকানো

বরং প্রত্যেক মুসলমানের নিজের দোষ লুকিয়ে রাখা এবং তা শাসকের নিকট স্বীকারোক্তির মাধ্যমে প্রকাশ করে শাস্তি ভোগ করা ও অপমানিত হওয়া থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। ইমাম মালেক মুয়াত্তার বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : হে মানব সকল, এখন সময় এসেছে যেন তোমরা আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বিরত থাকো। যে কেউ এই নিকৃষ্ট অপরাধের কোনোটিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে, সে যেন আল্লাহর গোপনীয়তার সুযোগ গ্রহণ করে, নিজেকে লুকিয়ে রাখে। তবে যার অপরাধ আমাদের সামনে প্রকাশিত হবে, আমরা তার উপর আল্লাহর কিতাবকে কার্যকরি করবো।"

হুদুদকৃত গুনাহের কাফফারা

অধিকাংশ আলেমের মতে, যখন অপরাধীর উপর হুদুদ কার্যকর করা হবে, তখন তা তার কৃত গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে এবং আখেরাতে তাকে আর শাস্তি দেয়া হবেনা। কেননা উবাদা ইবনে সামেত থেকে বুখারি বর্ণনা করেন : আমরা একটা বৈঠকে রসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে ছিলাম। তখন রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তোমরা আমার সাথে প্রতীজ্ঞাবদ্ধ হবে যে, আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবেনা, ব্যভিচার করবেনা, চুরি করবেনা এবং ন্যাসঙ্গতভাবে ব্যতীত আল্লাহর নিষিদ্ধকৃত প্রাণ বধ করবেনা। যে ব্যক্তি এ প্রতীজ্ঞা পালন করবে, তার প্রতিদান সে আল্লাহর কাছে পাবে। আর যে ব্যক্তি এসব গুনাহের কোনো একটিতে লিপ্ত হবে এবং তার শাস্তি ভোগ করবে, সেটা তার জন্য কাফফারা (গুনাহ মোচনকারী) হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি এসব গুনাহের কোনো একটিতে লিপ্ত হবে এবং আল্লাহ তা আড়াল করে রাখবেন (অর্থাৎ বিচার ও শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন) তার বিষয়টা আল্লাহর বিবেচনাধীন। তিনি চাইলে তাকে মাফ করবেন, নচেত শাস্তি দেবেন।"

হদ কার্যকরকরণ একদিকে গুনাহর কাফফারা অপরদিকে একই সাথে তা অন্যদের জন্য হুঁশিয়ারিও। এটা একাধারে পাপ মোচনকারীও, পাপ থেকে সতর্ককারীও।

দারুল হারবে হদ বাস্তাবায়ন

আলেমদের একটি গোষ্ঠীর মতে, হুদুদ যেমন দারুল ইসলামে (ইসলামী রাষ্ট্রে) বাস্তবায়ন করা যায়, তেমনি তা দারুল হারবেও (অমুসলিম শাসিত রাষ্ট্রেও) করা যাবে। কেননা হুদুদ বাস্তবায়নের নির্দেশ সর্বব্যাপী ও সর্বাত্মক, কোনো দেশ বিশেষের জন্য নির্দিষ্ট নয়। ইমাম মালেক ও লাইস বিন সা'দ এই মতের প্রবক্তা। পক্ষান্তরে আবু হানিফা প্রমুখ বলেন: "কোনো সেনাপতি যখন কোনো দারুল হারবে (অমুসলিম দেশে) আক্রমণ পরিচালনা করে, তখন তার সেনাবাহিনীর কোনো সদস্যের উপর 'হদ' প্রয়োগ করবেনা। তবে সে মিশর, সিরিয়া, ইরাক ও অনুরূপ দেশের (মুসলিম) সেনাপতি হলে তার সেনাবাহিনীতে হুদুদ কার্যকর করবে।" ইমাম আবু হানিফার যুক্তি হলো, দারুল হারবে হুদুদ কার্যকর করা হলে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি কুফরির পথ অবলম্বনে প্ররোচিত হতে পার। এই মতটিই অগ্রগণ্য। কেননা আল্লাহর শাস্তি যুদ্ধ বিগ্রহের সময় কার্যকর করতে আল্লাহ নিজেই নিষেধ করেছেন। কেননা এর ফলে অধিকতর খারাপ ঘটনা ঘটতে পারে। আহমদ, ইসহাক ও আওযায়ি প্রমুখ ইমাম বলেছেন, শত্রুর ভূমিতে হুদদ কার্যকর করা হবেনা। এর উপর সাহাবীগণ একমত ছিলেন।

এ প্রসঙ্গে আবু মাহজান সাকাফীর ঘটনা উল্লেখযোগ্য। তিনি মদপানে এত বেশি অভ্যস্ত ছিলেন যে, মদপান না করে বেশিক্ষণ থাকতেই পারতেননা। কাদেসিয়ার যুদ্ধে তিনি

মদপান করে বসলেন। ফলে সেনাপতি সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস তাকে গ্রেফতার করলেন এবং তার হাত পা রশি দিয়ে বেঁধে রাখার আদেশ দিলেন। যখন উভয়পক্ষ মুখোমুখি হলো, তখন আবু মাহজান বিলাপ করে বলতে লাগলেন : "ঘোড়াগুলো বর্শাসহ দাবড়ানো হবে, আর আমি রশি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকবো, এর চেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার আর কি থাকতে পারে?" অতপর সা'দের স্ত্রীকে বললেন : আমাকে ছেড়ে দিন। আপনাকে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আল্লাহ যদি আমাকে যুদ্ধের ময়দান থেকে সহিসালামাতে ফিরিয়ে আনেন, তবে এখানেই ফিরে আসবো এবং পুনরায় রশির বাঁধনে পা ঢুকাবো। আর যদি নিহত হই, তবে তো আপনারা আমার কবল থেকে মুক্ত হয়েই গেলেন।" সা'দের স্ত্রী তাঁর বাঁধন খুলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আবু মাহজান সা'দের 'বালকা' একটা ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে পড়লো, একটা বর্শা নিলেন এবং যুদ্ধের ময়দানে ছুটে গেলেন। ময়দানে তিনি এমন শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিলেন, যা দেখে শুধু সা'দ নয়, গোটা মুসলিম বাহিনী হতবাক হয়ে গেলো। তারা ভাবলেন, এ হয়তো কোনো ফেরেশতা যিনি তাদের সাহায্য করতে এসেছেন। শত্রুকে পুরোপুরি পর্যুদস্ত করে তিনি পুনরায় সা'দের তাঁবুতে ফিরে গেলেন এবং নিজে পা দু'খানা পুনরায় বাঁধনে ঢুকালেন। সা'দের স্ত্রী সা'দকে আবু মাহজানের খবর জানালেন। সা'দ তৎক্ষণাত তাকে মুক্ত করে দিলেন। লড়াইতে তার অভাবনীয় কৃতিত্ব যেভাবে মুসলিম বাহিনীকে শক্তি যুগিয়েছে, তার প্রেক্ষাপটে সা'দ কসম খেলেন যে, আবু মাহজানের উপর মদপানের শাস্তি কার্যকর করবেননা। এরপর আবু মাহজান আর মদপান করবেননা বলে তওবা করলেন। এখানে মদপানের হদ্ স্থগিত বা রহিত যেটাই করা হোক, তা একটা বৃহত্তর কল্যাণের খাতিরেই করা হয়েছিল। সেটা ছিলো সমগ্র মুসলিম জাতির জন্য কল্যাণকর। অথচ তার উপর হদ কার্যকর করার ক্ষমতা সাদের ছিলো।

মসজিদে হদ কার্যকর করা নিষিদ্ধ, যাতে তা নোংরা না হয় :

আবু দাউদ হাকীম বিন হিযাম রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : "রসূলুল্লাহ সা. মসজিদে কিসাস কার্যকর করতে, কবিতা আবৃত্তি করতে এবং হদ কার্যকর করতে নিষেধ করেছেন"

বিচারক কি নিজের জানা তথ্য অনুযায়ী রায় দিতে পারে?

যাহেরি মাযহাব মনে করে, হুদুদ, কিসাস, রক্তপাত ব্যভিচার ও অর্থসংক্রান্ত বিরোধের ব্যাপারে নিজের জানা তথ্য অনুসারে বিচার করা বিচারকের উপর ফরয। চাই বিচারক হিসেবে নিযুক্তির আগে জানুক বা পরে জানুক। বরঞ্চ তাদের মতে, বিচারক নিজের জানা তথ্য অনুসারে যে রায় দেবে, সেটাই সবচেয়ে শক্তিশালী রায়। কেননা ওটা তার জন্য সুনির্দিষ্ট সত্য তথ্য। এরপর অপরাধীর স্বীকারোক্তি এবং তারপর সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় দেবে। কেননা আল্লাহ বলেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ ○

"হে মুমিনগণ, তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে।" (আন নিসা : আয়াত ১৩৫)

আর রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : 'তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ কোনো অন্যায় কাজ দেখবে, সে যেন হাত দিয়ে তা প্রতিহত করে, তা যদি না পারে তবে যেন মুখ দিয়ে করে ...." কাজেই বিচারকের দায়িত্ব হলো ইনসাফ করা। কোনো যুলুমকারীকে তার যুলমের উপর বহাল রাখা ও শুধরে না দেয়া ইনসাফ নয়। আর বিচারক যে অন্যায়ের কথা জানে,

তা নিজ হাতে শুধরে দেয়া তার উপর ফরয। প্রত্যেক হকদারকে তার হক প্রদান করা তার দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন না করলে বিচারক যালেমে পরিণত হবে।

কিন্তু অধিকাংশ ফকিহের মতে, নিজের জানা তথ্য অনুসারে বিচার করা বিচারকের জন্য বৈধ নয়। আবু বকর রা. বলেছেন : আমি যদি কোনো ব্যক্তিকে কোনো শাস্তিযোগ্য অপরাধ করতে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করি, তবু আমার নিকট সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত আমি তার উপর হদ কার্যকর করবোনা। যুক্তির বিচারেও একথা সত্য যে, বিচারক অন্য যে কোনো মানুষের ন্যায় একজন সাধারণ মানুষ। তার নিকট পূর্ণ সাক্ষ্য প্রমাণ হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত সে নিজে যা কিছুই দেখুক, তদনুযায়ী কিছু বলার অধিকার তার নেই। এমনকি বিচারক যদি কাউকে ব্যভিচার করতে দেখে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আরোপ করে, অথচ তার বিরুদ্ধে পূর্ণ সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে অসমর্থ হয়, তবে সে মিথ্যা অপবাদ আরোপকারী সাব্যস্ত হবে এবং মিথ্যা অপবাদের শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য হবে। বিচারকের নিজের জানা তথ্য অনুসারে কথা বলা যখন নিষেধ, তখন তদনুসারে কাজ করাও তার উপর নিষিদ্ধ হবে। এই মতের ভিত্তি হলো আল্লাহর এই মহান বাণী :

فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَاءِ فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ○

অর্থ : যেহেতু সাক্ষীদেরকে উপস্থিত করেনি, সে কারণে তারা আল্লাহর বিধানে মিথ্যাবাদী।" (সূরা আন্নূর, আয়াত-১৩)

১. মদপান

মদ নিষিদ্ধকরণে পর্যায়ক্রমিক পদক্ষেপ

রসূলুল্লাহ সা. মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার পূর্বে লোকেরা ব্যাপকভাবে মদপান করতো। হিজরতের পর মদ ও জুয়া উভয়টি সম্পর্কে মুসলমানদের জিজ্ঞাসা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেলো। কেননা তারা এই দুটি জিনিসের অনেক কুফল প্রত্যক্ষ করতো। তখন আল্লাহ তা'য়ালা নাযিল করলেন :

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ط قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ز وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا

অর্থ : তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বলো : এ দু'টি জিনিসে বিরাট পাপও রয়েছে, অনেক উপকারিতাও রয়েছে। তবে এ দু'টি জিনিসের পাপ তাদের উপকারিতার চেয়ে অধিক।" (সূরা আল বাকারা, ২১৯)

অর্থাৎ মদ ও জুয়ার গুনাহ অনেক বড়। কেননা উভয়ের দ্বারা বিপুল ধর্মীয় ও বস্তুগত ক্ষতি সাধিত হয়। এ দু'টিতে মানুষের কিছু উপকারও সাধিত হয়। এই উপকারিতা বস্তুগত এবং তা হচ্ছে : মদের ব্যবসায়ে বিপুল মুনাফা, আর জুয়ায় বিনা পরিশ্রমে অর্থ উপার্জনের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু এ দু'টিতে যে গুনাহ হয়, তা তাদের উপকারিতার চেয়ে বড়। এভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ দু'টি জিনিসের নিষিদ্ধ হওয়ার দিকটি অধিকতর প্রবল। তবে সুস্পষ্টভাবে হারাম ঘোষিত হয়নি। এর কিছুদিন পর নামাযের মধ্যে মদপান হারাম ঘোষণা করে আয়াত নাযিল হয়। মদের প্রতি জনগণের তীব্র আসক্তি থাকায় ও

তারা একে তাদের জীবনের অংশ বানিয়ে ফেলায় মদকে এভাবে ধাপে ধাপে নিষিদ্ধ করতে হয়েছে। আল্লাহ বলেন :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ .....

অর্থ : হে মুমিনগণ, তোমরা যখন মাতাল থাকো, তখন নামাযের নিকটবর্তী হয়োনা যতক্ষণ না বুঝতে পারো তোমরা কি বলছো।" (আন নিসা : আয়াত ৪৩)

এ আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ হলো, এক ব্যক্তি মদ খেয়ে মাতাল থাকা অবস্থায় নামায পড়ছিল এবং সে সূরা কাফিরূন বিকৃতভাবে এভাবে পড়েছিল :

"বলো হে কাফেরগণ তোমরা যার পূজা করো, আমিও তার পূজা করি।" আসলে সূরায় রয়েছে "তোমরা যার পূজা করো, আমি তার পূজা করিনা।"

এটা ছিলো মদ নিষিদ্ধকরণের চূড়ান্ত প্রস্তুতি। এরা কিছুদিন পর চূড়ান্তভাবে মদকে হারাম ঘোষণা করে নাযিল হলো :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۗءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ج فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ..... ○

অর্থ : হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, আস্তানা ও ভাগ্যনির্ধারক শরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কাজ ছাড়া আর কিছু নয়। অতএব, তোমারা এগুলো বর্জন করো, যাতে তোমরা কল্যাণ লাভ করো। শয়তান মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে কেবল শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে ও নামায থেকে বিরত রাখতে চায়। অতএব তোমরা কি এখনো (মদ ও জুয়া) বর্জন করবে?" (মায়েদা : ৯০-৯১)

এখানে সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ তায়ালা জুয়া, প্রতিমা ও ভাগ্যনির্ধারক শরগুলোকে মদের সাথে আত্‌ফ বা সংযোজন করেছেন এবং সবকটি জিনিস সম্পর্কে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন যে, যেহেতুএগুলো :

১. নোংরা ও অপবিত্র কাজ,

২. শয়তানের কাজ, তার প্ররোচণা ও ষড়যন্ত্র,

৩. উল্লিখিত কারণে মুমিনদের জন্য এগুলো বর্জন করা অবশ্য কর্তব্য, যাতে মানুষ কল্যাণ ও সফলতা অর্জন করতে পারে।

৪. মদপান ও জুয়া খেলায় প্ররোচনা দেয়ার পেছনে শয়তানের উদ্দেশ্য হলো, মুমিনদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করা এবং এটা হলো এর পার্থিব ক্ষতি।

৫. এর পেছনে শয়তানের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো মুমিনদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখা ও নামায থেকে উদাসীন করা। আর এটা হচ্ছে এর পরকালীন ক্ষতি।

৬. এসবের দাবি হলো, এ জিনিসগুলো সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা। বস্তুত মদ সংক্রান্ত বিধির ব্যাপারে এটি সর্বশেষ নাযিল হওয়া আয়াত এবং এ আয়াত মদকে চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ করেছে।

আব্‌দ বিন হুমাইদ আতা থেকে বর্ণনা করেছেন : মদ নিষিদ্ধ করলে প্রথম নাযিল হয় সূরা

বাকারার ২১৯ নং আয়াত; "তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বলো : এ দুটি জিনিসে বিরাট পাপও রয়েছে। অনেক উপকারও রয়েছে। তবে এ দুটি জিনিসের পাপ তাদের উপকারের চেয়ে অধিক।" এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর কতক লোক বললো :

"মদে কিছু উপকার যখন আছে, তখন সেজন্যই আমরা মদপান করবো।" অন্যেরা বললো : "ওতে কোনো উপকার নেই। ওতে কেবল পাপ রয়েছে।" তারপর নাযিল হলো সূরা নিসার ৪৩ নং আয়াত : "হে মুমিনগণ! মদ মাতাল অবস্থায় তোমরা নামাযের নিকটবর্তী হয়োনা যতক্ষণ না তোমরা যা বলো তা বুঝতে পারো।" এবার কতক লোক বললো, "আমরা মদপান করে বাড়িতে বসে থাকবো।" অন্যরা বললো : "যে জিনিস আমাদেরকে মুসলমানদের সাথে জামাতে নামায পড়তে দেয়না তাতে কোনো কল্যাণ নেই।" এবার সূরা মায়েদার ৯০-৯১ নং আয়াত নাযিল হলো : "হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, আস্তানা ও ভাগ্যনির্ধারক শরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কাজ ... অতএব তোমরা কি এখনো এগুলো বর্জন করবেনা?" এ আয়াতের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে এগুলো নিষেধ করা হলো। ফলে মুসলমানগণ মদ পান সম্পূর্ণরূপে বর্জন করলো। এই চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা নাযিল হয় আহযাব যুদ্ধের পর। যখন উক্ত আয়াতের শেষাংশ "অতএব তোমরা কি এখনো এগুলো বর্জন করবেনা" উমর রা. শুনলেন, তখন তিনি বুঝলেন এটা "তোমরা বর্জনকরো" বলার চেয়ে অনেক বেশি কঠোর হুমকিসূচক। তাই তিনি তৎক্ষণাত বললেন : "আমরা বর্জন করলাম।" আর রসূলুল্লাহ সা. একজন ঘোষক পাঠিয়ে মদিনার ওলিগলিতে ঘোষণা করিয়ে দিলেন যে, "শুনে নাও, মদ হারাম হয়ে গেছে।" তৎক্ষণাত মদের মটকাগুলো ভেঙ্গে ফেলা হলো এবং মদিনার ওলিগলিতে মদের সয়লাব বয়ে গেলো।

কাতাদাহ বলেন : আল্লাহ সূরা মায়েদায় মদ হারাম করেছেন আহযাব যুদ্ধের পর। এই যুদ্ধ চতুর্থ বা পঞ্চম হিজরীতে সংঘটিত হয়। ইবনে ইসহাক বলেন : চতুর্থ হিজরীতে বনু নযীর অভিযানের সময় মদ নিষিদ্ধ হয়। দিময়াতী বলেন : ৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদাইবিয়ার বছর মদ নিষিদ্ধ হয়।

মদ নিষিদ্ধকরণে ইসলামের কঠোরতা

মদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা ইসলামের নীতি ও আদর্শের সাথে সর্বোতভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা ইসলামের সকল নীতি ও আদর্শের লক্ষ্য হচ্ছে দেহ, মন ও বুদ্ধির দিক দিয়ে দৃঢ় ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা। অথচ মদ যে ব্যক্তিত্বকে দুর্বল করে দেয় এবং বুদ্ধিমত্তাকে বিনষ্ট করে দেয়, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। জনৈক কবি বলেন : "আমি মদপান করলাম। এর ফলে আমার বুদ্ধি বিভ্রম ঘটলো। মদ এভাবেই বুদ্ধিতে বিকল ও বিভ্রান্ত করে দেয়।" আর যখন বুদ্ধি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, তখন মানুষ একটা নিকৃষ্ট পশুতে পরিণত হয় এবং তার দ্বারা অগণিত অপকর্ম সংঘটিত হয়। হত্যা, যুদ্ধ, ব্যভিচার, গোপন তথ্য ফাঁস ও দেশের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি মদ পানের কয়েকটি কুফল। মদপানের এ কুফল মানুষের নিজ ব্যক্তি সত্তার উপর এবং তার বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশিদের উপর সমভাবে প্রভাব বিস্তার করে। আলী রা. থেকে বর্ণিত : একদিন তিনি তার চাচা হামযার সাথে ছিলেন। আলির দু'টো বৃদ্ধ উটনী ছিলো। তার ইচ্ছা ছিলো, সুগন্ধীযুক্ত উদ্ভিদ ইযখির সংগ্রহ করে উটনীদের উপর বহন করে জনৈক ইহুদী স্বর্ণকারকে সাথে নিয়ে অন্যান্য স্বর্ণকারদের নিকট নিয়ে বিক্রি করবেন। যাতে এর বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে তিনি

ফাতেমার ওয়ালিমা সম্পাদন করতে পারেন। এ সময় তার চাচা হামযা কতিপয় আনসারের সাথে মদপান করছিলেন। তার সাথে জনৈক গায়িকা গান গাইছিল। (পর্দা ও মদ সংক্রান্ত বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে)। ঐ গায়িকা এমন একটা গান গাইল, যা দ্বারা সে হামযাকে উটনী দু'টি যবাই করে উভয় উটনীর দেহের মজাদার অংশগুলো খেতে উদ্বুদ্ধ করলো। গানটি শোনামাত্র হামযা ঝাপিয়ে পড়লো, উটনী দুটি যবাই করে তাদের চুট কেটে নিলেন ও কলিজা বের করে নিলেন। আলী যখন এ কাণ্ড দেখলেন, তখন এত মর্মাহত হলেন যে, চোখের পানি সংবরণ করতে পারলেননা এবং রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট হামযার নামে অভিযোগ দায়ের করলেন। রসূলুল্লাহ সা. হামযার কাছে এলেন। তাঁর সাথে ছিলো আলী ও যায়দ বিন হারেসা। তিনি তার উপর রাগান্বিত হলেন এবং তাকে তিরস্কার করতে লাগলেন। হামযা তখন মাতাল ছিলেন। তার চোখ লাল বর্ণ ধারণ করেছিল। তিনি রসূলূল্লাহ সা. ও তার সাথিদের দিকে তাকিয়ে বললেন : "তোমরা তো আমার পিতার দাস ছাড়া কিছু নও।" রসূলূল্লাহ সা. বুঝতে পারলেন যে, হামযা মাতাল, তখন পেছন ফিরে সাথিদের নিয়ে চলে গেলেন। মদ এভাবেই পানকারীর মাথা নিয়ে ছিনিমিনি খেলে এবং বোধশক্তি ছিনিয়ে নেয়। এজন্য ইসলাম একে "উম্মুল খাবায়েস" অর্থাৎ সকল নোংরামির জননী নামে আখ্যায়িত করেছে। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বর্ণনা করেন, রসূলূল্লাহ সা. বলেছেন, মদ হলো সমস্ত নোংরা কাজের জননী।" আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বলেন : "মদ হচ্ছে সকল অশ্লীলতার জননী এবং মদ পান নিকৃষ্টতম কবীরা গুনাহ। যে ব্যক্তি মদপান করে সে নামায ত্যাগ করে এবং নিজের মা, খালা ও ফুফুকে পর্যন্ত ধর্ষণ করে।"

মদকে সকল নোংরামীর জননী আখ্যায়িত করার পর ইসলাম তার প্রতি নিষেধাজ্ঞাকেও কঠোরতর করেছে। মদ পানকারীকে ও এর সাথে সম্পর্ক রাখে এমন প্রত্যেককে অভিসম্পাত দিয়েছে এবং তাকে ঈমান বহির্ভূত ঘোষণা করেছে। আনাস রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. মদের সাথে সংশ্লিষ্ট দশ ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন : মদ প্রস্তুতকারী, গ্রহণকারী, পানকারী, বহনকারী, যার নিকট বহন করে নেয়া হয়, যে পান করায়, যে বিক্রি করে, যে এর বিক্রয়লব্ধ অর্থ ভোগ করে, যার জন্য মদ ক্রয় করা হয় এবং যে ক্রয় করে।" (ইবনে মাজাহ, তিরমিযি) আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত : রসূলূল্লাহ সা. বলেন : "ব্যভিচারকারী মুমিন অবস্থায় ব্যভিচার করেনা, মদখোর মুমিন অবস্থায় মদ পান করেনা, চোর মুমিন অবস্থায় চুরি করেনা।" -আহমদ, বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ি।

(এ হাদিসের ব্যাখ্যা এই যে, মদ পানকারী, ব্যভিচারকারী ও চোর এসব অপকর্ম যখন করে, তখন তার মধ্যে যথার্থ ঈমান থাকেনা। কেননা ঈমান এসব কাজকে হারাম ও নিষিদ্ধ এবং এগুলোকে আল্লাহর আযাব ও ক্রোধের কারণ বলে বিশ্বাস করার নাম। এসব কাজকে আল্লাহর আযাব ও ক্রোধের কারণ বলে বিশ্বাস করলে তা তাকে এগুলো থেকে দূরে থাকতে বাধ্য করতো। কেউ কেউ বলেন, ঈমান এ ধরনের কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির কাছ থেকে চলে যায় এবং যতক্ষণ ঐ গুনাহে লিপ্ত থাকে ততক্ষণ তার কাছ থেকে দূরে থাকে। পরে তওবা করলে ফিরে আসে। কেউ কেউ বলেন : এ দ্বারা পূর্ণাঙ্গ ঈমান বুঝানো হয়েছে। তবে প্রথম মতটাই অধিকতর বিশুদ্ধ বলে ইমাম গাজ্জালী অভিমত ব্যক্ত করেছেন।)

দুনিয়ায় মদ পানকারীর জন্য এই শাস্তিও নির্ধারিত হয়েছে যে, সে আখেরোতের পবিত্র মদ পান করতে পারবে না। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি দুনিয়ায় মদপান করে এবং তওবা করে না, সে আখেরাতে মদপান করতে পারবেনা। এমনকি বেহেশতে গেলেওনা।

খৃস্টধর্মে মদের নিষেধাজ্ঞা

মদ যেমন ইসলামে হারাম, তেমনি খৃস্টধর্মেও তা হারাম। ১৯২২ সালে মিশরের খৃস্টধর্মের পাদ্রীগণ সর্বসম্মতভাবে যে ফতোয়া দেন, তা সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ :

"সকল আসমানী কিতাব মানবজাতিকে নেশা জাতীয় দ্রব্য থেকে দূরে থাকার আদেশ দিয়েছে।" সিরিয়ার খৃস্টান পাদ্রীগণও পবিত্র গ্রন্থের বরাত দিয়ে সকল নেশাকর দ্রব্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বলেছেন : "মোটকথা, সার্বিকভাবে যাবতীয় নেশাকর মাদক সকল আসমানী গ্রন্থে নিষিদ্ধ, চাই তা আংগুর, জব, খোরমা, মধু, আপেল বা অন্য কিছু দিয়ে তৈরি করা হোক।" আফসুমবালীকে পল বলেছিলেন : "মদপান করে মাতাল হয়োনা। ... কেননা মাতালরা আকাশের রাজত্বের উত্তরাধিকারী হয়না।"

মদের ক্ষতি

ড. আব্দুল ওহাব খলীল লিখিত 'আততামাদ্দুনুল ইসলামী' নামক গ্রন্থে মদের শারীরিক, মানসিক ও চারিত্রিক ক্ষতিগুলোর বিবরণ দেয়া হয়েছে। সেই সাথে এসব ক্ষতি থেকে ব্যক্তি ও সমাজের জীবনে যে সকল খারাপ প্রভাব পড়ে তারও বিবরণ দিয়েছেন। বলা হয়েছে, আমরা যদি ধর্মীয় নেতা, চিকিৎসা বিজ্ঞানী, নৈতিক বিশেষজ্ঞ, সমাজ বিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদদের নেশাকার ও মাদকদ্রব্য সেবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি, তবে তাদের সবাই একই জবাব দেবে : এগুলো সেবন করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কেননা এতে মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়।

ধর্মীয় নেতারা বলেন : এটা হারাম। কারণ এটা সকল নোংরামির জননী। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলেন : এটা মানব জাতির বিরুদ্ধে সবচেয়ে মারাত্মক হুমকি। শুধু এজন্য নয় যে, এর বিষাক্ত প্রভাব সরাসরি দেহের ক্ষতি সাধিত করে, বরং এ জন্যও যে, এর সুদূরপ্রসারী পরিণাম হচ্ছে যক্ষা। তাছাড়া মদ মানব দেহকে দুর্বল করে এবং বহু সংখ্যক রোগের বিরুদ্ধে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। শরীরের সকল অভ্যন্তরীণ অংগ প্রতংগ বিশেষতঃ পাকস্থলীর ক্ষতি সাধিত করে। আর স্নায়ুমণ্ডলীরও মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে। এজন্য এটা যদি অধিকাংশ স্নায়বিক রোগের কারণ হয়ে দেখা দেয় এবং উন্মাদ ও অবসাদ জাতীয় রোগের প্রধান কারণ হয়ে দেখা দেয় এতে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। আর তাও শুধু মদ পানকারীর জন্য নয়। বরং তার উত্তর পুরুষদের জন্যও।

বস্তুত মদ ও মাদক দ্রব্য নিঃসন্দেহে মানবজাতির জন্য এক ভয়াবহ অভিশাপ, যাবতীয় দুঃখ, দৈন্য ও দুর্ভাগ্যের কারণ এবং দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনার জীবাণু। এই নিকৃষ্ট বস্তু যে জাতির উপর আপতিত হবে, সে জাতিকে তা ধ্বংস করে ছাড়বে। শারীরিক, আত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সর্বদিক দিয়েই তাকে সর্বশান্ত করে ছাড়বে।

নীতিবীদরা তারা বলেন : যেহেতু সততা, শ্লীলতা, ভদ্রতা, শিষ্টতা, মহত্ত্ব ও মহানুভবতাকে সংরক্ষণ করা মানুষের দায়িত্ব, তাই এই মহৎ গুণগুলোকে বিনষ্ট করে এমন কোনো জিনিস মোটেই সেবন করা তার পক্ষে উচিত নয়। সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন : সমাজের শান্তি ও শৃংখলা ব্যাহত করে এমন কোনো তৎপরতা দ্বারা সমাজকে কলুষিত করা উচিত নয়, যাতে সমাজে সর্বোচ্চ মাত্রার শান্তি ও শৃংখলা বজায় থাকে। সামাজিক শান্তি ও শৃংখলা যখনই ব্যাহত হয়, তখনই দেখা দেয় নৈরাজ্য। অপরদিকে একথাও সত্য যে, নৈরাজ্য কলহ কোন্দল ও বিভেদ সৃষ্টি করে। আর বিভেদ শত্রুদের উপকার সাধন করে।

অর্থনীতিবিদগণ বলেন : মানুষ একটি টাকাও যদি সমাজের উপকারার্থে ব্যয় করে, তবে তা সমাজের ও দেশের শক্তি বৃদ্ধি করে। আর একটি টাকাও যদি সমাজের ক্ষতিকর কাজে ব্যয় হয়, তবে তা সমাজ ও দেশের সর্বনাশ ডেকে আনে। সুতরাং রকমারি মদ ও মাদক সেবনে যে কোটি কোটি টাকা অকারণে ব্যয় হয়, তা দেশের ক্ষতি সাধন করে বিরাট আকারে। তা আমাদের অর্থনীতিতে ধস নামায় এবং আমাদের মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্বের বিপর্যয় ঘটায়।

এসব কারণে আমরা মনে করি, আমাদের বিবেক আমাদেরকে মদ পান থেকে বিরত থাকতে আদেশ দেয়। আর সরকার যদি এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে ইচ্ছুক হয়, তবে সেটা যাতে বিনা পরিশ্রমে ও বিনা অর্থ ব্যয়ে পেতে পারে, সে জন্য আমরা উল্লেখ করেছি যে, সকল বৈজ্ঞানিকরা বিভাগের এর ক্ষতিকর হওয়া সম্পর্কে একমত। আর যেহেতু সরকার জনগণেরই অংশ, তাই জনগণ তাদের সরকারের নিকট স্বভাবতই প্রত্যাশা করে যে, তাদের জন্য যা কিছু অনিষ্টকর ও কষ্টদায়ক, তা দূর করবে। কেননা শাসকগণ শাসিতদের জন্য দায়ী।

মাদক সেবন থেকে জনগণকে বিরত রাখলে তারা সুস্থ, সবল, দৃঢ়চেতা ও পরিপক্ক বুদ্ধির অধিকারী হয়ে গড়ে উঠবে। দেশের স্বাস্থ্যের মান উন্নয়নে এটা একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অনুরূপ, এটা নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের প্রধান অবলম্বন। কেননা মাদকসেবীদের সংখ্যা যত কমবে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিশেষতঃ আইন মন্ত্রণালয়ের ঝক্কি ঝামেলা ততই কমবে। আদালতের আসামী ও কারাগারের কয়েদীর সংখ্যা কমতে কমতে একদিন হয়তো শূন্যের কোটায় নেমে যাবে এবং কারাগার হয়তো কয়েদী শূন্য হয়ে বিভিন্ন সামাজিক সংস্কারের কেন্দ্রে রূপান্তরিত হবে। এই হচ্ছে সভ্যতা ও কৃষ্টি। এই হচ্ছে উন্নতি ও অগ্রগতির রহস্য। আর এই হচ্ছে জাতিসমূহের উন্নতির মাপকাঠি। আর এভাবেই আমরা আমাদের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পরস্পরকে সহযোগিতা করতে পারি। এই সহযোগিতার জন্য ফলদায়ক কাজ করার সুযোগ অবারিত ও ময়দান সুপ্রশস্ত। আল্লাহ বলেন : وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ط

অর্থ : তুমি বলো, তোমরা কাজ করে যাও। তোমাদের কাজ আল্লাহ, তার রসূল ও মুমিনগণ প্রত্যক্ষ করবেন।" (সূরা তওবা : আয়াত ১০৫)

মদ ও মাদক দ্রব্যের এসব ক্ষতি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তাই শুভবুদ্ধি সম্পন্ন কিছু দেশ মদ জাতীয় যাবতীয় নেশাকর দ্রব্য সেবন প্রতিহত করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। মদ-মাদক সেবন প্রতিরোধে সচেষ্ট দেশগুলোর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। "তানকীহাত" (ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব) নামক গ্রন্থে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী লিখেছেন, "মার্কিন সরকার মদ নিষিদ্ধ করেছে এবং সে দেশ থেকে তা উচ্ছেদ করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছে। আধুনিক যাবতীয় প্রচার মাধ্যম যথা পত্রপত্রিকা, সাময়িকী, ছবি, ছায়াছবি, সভা সমাবেশ ইত্যাদির সাহায্যে এর ক্ষয়ক্ষতি প্রচার করা ও এটি পান করার প্রতি ধিক্কার দেয়ার ব্যাপক অভিযান চালিয়েছে। মদ বিরোধী প্রচারণায় যুক্তরাষ্ট্র ষাট মিলিয়ন ডলারেরও বেশি ব্যয় করেছে। আর যেসব বই পুস্তক ও প্রচারপত্র প্রচার করেছে, তার পরিমাণ দশ বিলিয়ন পৃষ্ঠা। তারা মদ নিষিদ্ধকরণ আইন বাস্তবায়নে চৌদ্দ বছরে যে অর্থ ব্যয় করেছে, তা ২৫০ মিলিয়ন পাউণ্ডের কম নয়। এজন্য ৩০০ ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড, ৫৩২৩৩৫ জনকে কারাদণ্ড, ১৬ মিলিয়ন পাউণ্ড জরিমানা

এবং ৪০৪ মিলিয়ন পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। কিন্তু এসব কিছু মার্কিনীদের মদের আসক্তি ও জিদ আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। এমনকি শেষ পর্যন্ত ১৯৩৩ সালে সরকার এই আইন প্রত্যাহার করতে ও সারাদেশে অবাধে মদ পান বৈধ করতে বাধ্য হয়েছে।"

বিপুল চেষ্টা সাধনা চালিয়েও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মদ নিষিদ্ধ করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু ইসলাম যেহেতু জনগণকে ধর্মীয় প্রেরণার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। তাদের হৃদয়ে সত্য ও ন্যায়ের প্রতি ঈমানের বীজ বপন করেছে এবং তাদের বিবেককে সর্বোত্তম আদর্শ ও সৎ কর্মের শিক্ষা দ্বারা উজ্জীবিত করেছে, তাই তাকে এত কিছু করতে হয়নি, এত চেষ্টা সাধনা চালাতে হয়নি। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে কেবল একটি বাক্য উচ্চারিত হয়েছে এবং উচ্চারিত হওয়া মাত্রই সবার মন তা নির্বিবাদে মেনে নিয়েছে। বুখারি ও মুসলিম আনাস বিন মালেক থেকে বর্ণনা করেছেন : তোমরা যাকে আঙ্গুর বা খেজুরের নির্যাস নামে আখ্যায়িত করো, তা ছাড়া আমাদের অন্য কোনো মদ ছিলোনা। এটাই আমি আবু তালহা, আবু আইয়ূব ও রসূলুল্লাহ সা.-এর অন্য কয়েকজন সাহাবীকে আমাদের বাড়িতে পরিবেশন করছিলাম। সহসা এক ব্যক্তি এসে বললো : "তোমরা খবর শুনেছ কি?" আমরা বললাম : না। সে বললো : "মদ হারাম করা হয়েছে।" তৎক্ষণাত একজন বললো : "হে আনাস, এসব মটকা ঢেলে ফেলো।" আনাস বলেন : "এরপর আর কেউ এ নিয়ে একটি প্রশ্নও করলোনা। আর লোকটি খবর পৌঁছানোর পর কেউ তা নিয়ে অনুসন্ধানও চালালোনা।"

ঈমান মুমিনদেরকে এভাবেই গড়ে তোলে।

মদ কাকে বলে?

মদ হচ্ছে সেসব সুপরিচিত তরল পানীয়, যা এমনভাবে তৈরি করা হয় যে, কোনো কোনো ফল বা শস্যকে মাদকে পরিণত করে এবং তাতে নেশা বা মাতলামির এমন উপাদান সৃষ্টি করে, যার দরুন বুদ্ধি লোপ পায়। আর এই রূপান্তর ঘটে এমন কিছু জীবন্ত প্রাণীর মাধ্যমে, মাদকতা সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় উপাদান সৃষ্টিতে যেগুলোর উপস্থিতি জরুরি গণ্য হয়ে থাকে। একে 'খাম্‌র' বা মদ বলা হয় এজন্য যে, এটা বিবেকবুদ্ধিকে ঢেকে দেয়। ('খাম্‌র' শব্দের আভিধানিক অর্থ ঢেকে দেয়া।) অর্থাৎ মদ তার বুদ্ধি ও উপলব্ধি ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। এটা হচ্ছে চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে মদের সংজ্ঞা।

মাদকতা, মাতলামি বা নেশা সৃষ্টি করে এমন প্রত্যেক জিনিসই মদ হিসেবে পরিগণিত। কোন্ বস্তু থেকে তা তৈরি হয়েছে, সেটা বিবেচ্য বিষয় নয়। যা কিছুই নেশা জন্মায়, তা শরিয়তের দৃষ্টিতে মদ এবং মদের হুকুম বা বিধির আওতাধীন, চাই তা আঙ্গুর, খেজুর, মধু, গম, জব বা অন্য কোনো জিনিস দ্বারা করা হোক। কেননা এসবই নিষিদ্ধ মদ। এর ক্ষতিকর প্রভাব সর্বব্যাপী। আর এটি আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে বিরত রাখে এবং মানুষে মানুষে শত্রুতা ও হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি করে।

সমান বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বস্তুগুলোতে শরিয়ত কোনো পার্থক্য করেনা। মাদকতা বা মাতলামি আনয়নকারী দুটি পানীয়ের একটিকে হালাল ও অপরটিকে হারাম যেমন করেনা, তেমনি এ ধরনের দু'টি পানীয়ের একটির স্বল্প পরিমাণকে বৈধ ও অপরটিরও স্বল্প পরিমাণকে নিষিদ্ধ করেনা। এ বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর বাণী সুস্পষ্ট ও অকাট্য। কোনো ধরনের সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ রাখেনা। নিম্নে কয়েকটি বাণীর উদ্ধৃতি দেয়া গেলো :

১. ইবনে উমর থেকে আহমদ ও আবু দাউদ বর্ণনা করেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : প্রত্যেক নেশাকর দ্রব্য মদ এবং প্রত্যেক মদ হারাম।

২. বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রসূলুল্লাহ সা.-এর মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেছেন : "হে জনতা, শুনে নাও, মদ হারাম হওয়ার বিধি অবতীর্ণ হয়েছে। আর এই মদ পাঁচটি জিনিস থেকে তৈরি হয়ে থাকে : আঙ্গুর, খেজুর, মধু, গম ও যব। আর যা বুদ্ধিকে অকার্যকর করে দেয়, সেটাই মদ।"

আমীরুল মুমিনীন উমর রা.-এর ঘোষণা শাশ্বত ও চূড়ান্ত। কেননা তিনি শরিয়ত ও ভাষা উভয়টির ব্যাপারেই অধিকতর বিজ্ঞ। তিনি যে মত পোষণ করতেন, কোনো সাহাবী সে বিষয়ে তার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন এমন কথা শোনা যায়নি।

৩. জাবের রা. থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন : ইয়ামান থেকে এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সা.কে জিজ্ঞাসা করলো তাদের দেশে এক ধরনের পানীয় পান করা হয়, তা হারাম না হালাল? রসূলুল্লাহ সা. তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : পানীয় বস্তুটি মাতাল করে কি? সে বললো : "হাঁ"। তখন রসূলুল্লাহ সা. বললেন : "প্রত্যেক নেশাকর জিনিসই হারাম।" "....নেশাকর জিনিস পানকারীকে দোযখবাসীর পুজ পান করাতে আল্লাহ বদ্ধপরিকর।"

৪. নুমান বিন বশীর থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "আঙ্গুর থেকেও মদ তৈরি হয়, খেজুর থেকেও মদ তৈরি হয়, মধু থেকেও মদ তৈরি হয়, যব থেকেও মদ তৈরি হয়, গম থেকেও মদ তৈরি হয়।" (আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)

৫. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত : "প্রত্যেক নেশাকর জিনিস হারাম। যে পানীয়ের ষোল রতল মাতাল করে, তার হাতের তালু পরিমাণও হারাম।"

৬. আহমদ, বুখারি ও মুসলিম আবু মূসা আশয়ারি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বললেন : হে রসূলুল্লাহ, আমরা ইয়ামানে দুটো পানীয় তৈরি করতাম। এর একটি হলো, মধুকে জ্বাল দিয়ে ঘন করে তৈরি করা নেশাকর বিতা এবং অপরটি গোশত ও যব একত্রে জ্বাল দিয়ে ঘন করে তৈরি করা নেশাকর দ্রব্য মিযার। এ দুটো সম্পর্কে আমাদেরকে ফতোয়া দিন। আবু মূসা আশয়ারি বলেন : রসূলুল্লাহ সা. সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক কথা বলার ব্যাপারে আল্লাহ প্রদত্ত অসাধারণ দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। তিনি সংক্ষিপ্তভাবে শুধু বললেন : "সকল নেশাকর জিনিস হারাম।"

৭. আলী রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. যবের নির্যাস পান করতে নিষেধ করেছেন। -আবু দাউদ ও নাসায়ী।

এটি সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও অধিকাংশ ফকিহের অভিমত। কিন্তু ইতিপূর্বে যেসব দলিল প্রমাণ উদ্ধৃত করেছি, এটা তার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আঞ্চলিক ফকিহগণ, আহলে হাদিস এবং ইমাম আবু হানিফার শিষ্য ইমাম মুহাম্মদের মতেরও বিপরীত। তবে এ মত অনুসারেই ফতোয়া দেয়া হয়। ইরাকের ফকিহগণ, ইবরাহিম নাখয়ি, সুফিয়ান ছাওরি, ইবনে আবি লায়লা, শুরাইক, ইবনে শাবরুমা, কুফার অবশিষ্ট সকল ফকিহ, বসরার ফকিহদের অধিকাংশ ও আবু হানিফা বলেন : আঙ্গুরের নির্যাস থেকে তৈরি মদ কম হোক বেশি হোক হারাম। আঙ্গুর ব্যতীত অন্য যে কোনো ফল বা শস্যের নির্যাস যদি বেশি খেলে মাদকতা আনে, তবে বেশি পরিমাণ খাওয়া হারাম। আর কম খেলে যদি মাদকতা না আনে, তবে কম খাওয়া হালাল। ইবনে রুশদ তাঁর গ্রন্থ "বিদায়াতুল মুজতাহিদে" বলেন :

"হেজাযের অধিকাংশ ফকিহ এবং অধিকাংশ মুহাদ্দিস বলেন : নেশা বা মাদকতা আনে এমন যে কোনো নির্যাস, কম হোক বেশি হোক, হারাম। আর ইবরাহিম নাখয়ি, সুফিয়ান ছাওরি, ইবনে আবিলায়লা, শুরাইক, ইবনে শাবরুমা, আবু হানিফা, কুফার অন্য সকল ফকিহ এবং বসরার অধিকাংশ আলেম বলেছেন : মাতালকারী যত নির্যাস আছে, তার ভেতরের শুধু মাতালকারী উপাদানটাই হারাম, নির্যাস নয়। তাদের এ মতভেদ হাদিস ও যুক্তির বিপরীত।

হেজাযী ফকিহগণ তাদের মত দুই উপায়ে সঠিক প্রমাণ করেন : এ সংক্রান্ত হাদিস উদ্ধৃত করে এবং সকল নির্যাসকে মদ নামকরণ করে। হেজাযীগণ যে প্রসিদ্ধতম হাদিসের বরাত দেন, তা হলো, মালেক বর্ণিত আয়েশা রা.-এর এ হাদিস : রসূলুল্লাহ সা.কে মধুর নির্যাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : "যে পানীয় মাদকতা সৃষ্টি করে তা হারাম।" (বুখারি) ইয়াহিয়া ইবনে মাঈন বলেছেন : নেশাকর দ্রব্য নিষিদ্ধ ঘোষণায় যতগুলো হাদিস বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে এটাই বিশুদ্ধতম হাদিস। মুসলিম ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "প্রত্যেক নেশাকর দ্রব্য মদ এবং প্রত্যেক মদ হারাম।"

বুখারি ও মুসলিম বর্ণিত উল্লিখিত হাদিস দুটি সহীহ। প্রথমোক্তটির উপর সবাই একমত। কিন্তু দ্বিতীয়টিকে শুধু মুসলিম সহীহ বলে রায় দিয়েছেন। আর তিরমিযি, আবু দাউদ ও নাসায়ী জাবের বিন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "যে জিনিস বেশি খেলে মানুষ মাতাল হয়, তা কম খাওয়াও হারাম।" এ হাদিসের বক্তব্য নিয়ে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে।

তাদের দ্বিতীয় যে যুক্তি তা হলো, যাবতীয় নির্যাসই মদ নামে আখ্যায়িত হয়। এ যুক্তির যথার্থতা প্রমাণে দু'টি পন্থা অবলম্বন করা হয়। একটি হলো, নামকে তার ধাতুগত রূপান্তরের আলোকে সঠিক প্রতিপন্ন করা। আর অন্যটি জনশ্রুতির আলোকে সঠিক প্রতিপন্ন করা। ধাতুগত রূপান্তরের পন্থাটি হলো, অভিধানবিদদের নিকট আরবীতে "খাম্‌র" (মদ)কে "খাম্‌র" নামে আখ্যায়িত করার একমাত্র কারণ এই যে, তা বিবেকবুদ্ধিকে 'খাম্‌র', করে অর্থাৎ ঢেকে ফেলে বা আবৃত করে। এই ব্যাখ্যা অনুসারে এমন প্রত্যেক বস্তুকে 'খাম্‌র' বা মদ বলা যাবে, যা বিবেক বুদ্ধিকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। 'খাম্‌র' নামকরণের এই পদ্ধতি সম্পর্কে উসুলে ফিকহ (ফিকহ শাস্ত্রের মূলনীতি) শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞদের মতভেদ রয়েছে। দ্বিতীয় পন্থাটি, যা জনশ্রুতির আলোকে গৃহিত হয়, সে ব্যাপারে বলা হয়েছে : যদিও আভিধানিক অর্থের বিবেচনায় নির্যাসকে 'খাম্‌র' বা মদ বলা যায় না, তবে শরয়ি পরিভাষা হিসেবে নির্যাসকে 'খাম্‌র' বা মদ বলা যায়। ইতিপূর্বে ইবনে উমারের যে হাদিস উদ্ধৃত করা হয়েছে তা দ্বারা এবং আবু হুরায়রার বর্ণিত এ হাদিস দ্বারা এ ব্যাপারে প্রমাণ দর্শানো হয়েছে । আবু হুরায়রা বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "মদ তৈরি হয় দু'টি গাছ থেকে : আঙ্গুর ও খেজুরের গাছ।" আর হেজাযের ফকিহদের সমস্ত নির্যাস হারাম হওয়া সম্পর্কে সর্বোত্তম প্রমাণ হিসেবে ইবনে উমরের এই হাদিসও উদ্ধৃত করা হয় : "আঙ্গুর থেকে মদ হয়, মধু থেকেও মদ হয়, কিশমিস থেকেও মদ হয়, গম থেকেও মদ হয়। যে জিনিস খেলে নেশা হয়, তা খেতে আমি তোমাদের নিষেধ করছি।"

পক্ষান্তরে কুফার ফকিহগণ সূরা নাহলের ৬৭ নং আয়াতের আক্ষরিক মর্ম থেকেই প্রমাণ দর্শান। আয়াতটি হলো :

وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا ط اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ○

"খেজুর ও আঙ্গুর ফলকে তোমরা নেশা ও উত্তম জীবিকার উৎস হিসেবে গ্রহণ করছো।" এছাড়া এই মর্মে বর্ণিত আরো কিছু হাদিস দ্বারা ও কেয়াস দ্বারাও তারা অনুরূপ যুক্তি প্রদর্শন করেন। আয়াত দ্বারা যুক্তি প্রদর্শন করেন এভাবে যে, মূলতঃ নেশাই হারাম। বস্তু যদি হারাম হতো, তাহলে আল্লাহ তাকে 'উত্তম জীবিকা' আখ্যায়িত করতেন না। ওদিকে যে সকল হাদিস দ্বারা এ ব্যাপারে প্রমাণ দর্শানো হয়, সেগুলোর মধ্য হতে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হাদিস হলো : ইবনে আব্বাস বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "মদ নিষিদ্ধ হয়েছে তার মূল উপাদানের কারণে, আর মাতলামী নিষিদ্ধ হয়েছে অন্য কারণে।" বস্তুতঃ এ হাদিসের বক্তব্য সুস্পষ্ট। এর ভিন্ন কোনো ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়। তবে হেজাযবাসী এ হাদিসকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। আবু বুরদা বিন নাযার থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "আমি তোমাদেরকে মদ পান করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন পান করতে পারো, তবে সাবধান মাতাল হয়োনা।" -তাহাবি।

ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন : "প্রথমে যখন নির্যাসকে হারাম করা হয়, তখন তোমাদের মতো আমিও তা প্রত্যক্ষ করেছি। পরে যখন তা আবার হালাল করা হয়, তখন তাও প্রত্যক্ষ করেছি এবং মনে রেখেছি। কিন্তু শেষেরটা তোমরা ভুলে গিয়েছ।" আবু মূসা আশয়ারী বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. আমাকে ও মুয়াযকে যখন ইয়ামানে পাঠালেন, তখন আমরা বললাম : হে রসূলুল্লাহ, ইয়ামানে দু'ধরনের পানীয় আছে, একটি গম দিয়ে ও অপরটি যব দিয়ে তৈরি করা হয়। আমরা কোন্‌টা পান করবো : রসূলুল্লাহ সা. বললেন : পান করো, মাতাল হয়োনা। -তাহাবি।

কিন্তু যুক্তির নিরীখে যে প্রমাণ দর্শানো হয়, তা হলো : কুরআন স্পষ্টভাবে মদ হারামকরণের যে কারণ উল্লেখ করেছে, তা হলো আল্লাহর স্মরণ থেকে ফিরিয়ে রাখা এবং শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করা। যেমন আল্লাহ বলেন :

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِی الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ج

অর্থ : শয়তান তো মদ ও জুয়ার ভেতর দিয়ে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষই সৃষ্টি করতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখতে চায়।" (সূরা মায়েদা : প্রাগুক্ত)

এই কারণটা কেবল যতটুকু পান করলে নেশার সৃষ্টি হয়, ততটুকুতে বিদ্যমান, তার কমে নয়। সুতরাং যে পরিমাণ পান করলে মানুষ মাতাল হয়, ততটুকু পান করাই হারাম। তবে যে মদ সম্পর্কে ইজমা হয়েছে যে, কম বা বেশি যাই পান করা হোক, তা হারাম, সেটি এ বিধির ব্যতিক্রম। বস্তুতঃ এ জাতীয় কেয়াসকে কুরআন ও সুন্নাহর বাণীর আওতাভুক্ত গণ্য করা হয়। কেননা এ কেয়াসের কারণটা শরিয়ত নিজেই জানিয়ে দিয়েছে।

কাযী বলেছেন : আমার নিকট প্রতীয়মান হচ্ছে, অবশ্য প্রকৃত সত্য আল্লাহই জানেন, যদিও রসূলুল্লাহ সা.-এর উক্তি "প্রত্যেক নেশাকর দ্রব্য হারাম" দ্বারা নেশাকর দ্রব্য মাত্রই হারাম

না বুঝিয়ে যে পরিমাণ সেবন করলে মাতলামি বা মাদকতার সৃষ্টি হয়, তা বুঝানোর অবকাশ রয়েছে, কিন্তু বাহ্যতঃ এ ধারণাই প্রবলতর যে, এ দ্বারা নেশাকর বা মাদক দ্রব্য মাত্রকেই হারাম করা হয়েছে, মাতলামি সৃষ্টি করে এমন পরিমাণকে নয়। কারণ অধিক পরিমাণেই সুনিশ্চিত ক্ষতি নিহিত থাকা সত্ত্বেও এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ ও তার রসূল মাতাল হওয়ার উপায় ও পন্থাকে রোধ করার ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করার লক্ষ্যে মাতলামি সৃষ্টিকারী বস্তুর কম বা বেশি উভয় পরিমাণকে নিষিদ্ধ করে থাকতে পারেন। তাছাড়া শরিয়তের বিধান থেকে তো সর্বসম্মতভাবে প্রমাণিত যে, শরিয়ত মদকে পুরোপুরিভাবেই নিষেধ করেছে, বেশি পরিমাণকে নয়। তাই মদের কারণটি অর্থাৎ মাতলামি বা মাদকতা বা নেশা যে জিনিসেই পাওয়া যাবে, তা মদ বলেই গণ্য হবে। যারা এ ক্ষেত্রে পরিমাণ কম বা বেশি হওয়াতে পার্থক্য আছে বলে মনে করেন, পার্থক্যের স্বপক্ষে প্রমাণ উপস্থিত করার দায়িত্ব তাদের উপরই বর্তায়। এমনকি যারা এ হাদিসকে সহীহ্ বলে স্বীকার করেননা, "যে জিনিস বেশি সেবন করলে মানুষ মাতাল হয়, তার কম পরিমাণও হারাম" তাদের এ অস্বীকৃতি সত্ত্বেও উপরোক্ত বক্তব্য অপরিবর্তনীয় থাকবে। কারণ এটি বিতর্কিত হলেও ওহির বাণী হিসেবেই উপস্থাপিত, আর ওহির বাণীকে কেবল মানবীয় কেয়াস বা যুক্তিতর্কের ভিত্তিতে বিতর্কিত মনে করাও অগ্রাহ্য করা বৈধ নয়। তাছাড়া শরিয়ত স্বয়ং সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, মদে ক্ষতি ও উপকারিতা উভয়ই রয়েছে। আল্লাহ্ বলেছেন : "তুমি বলো, মদে ও জুয়ায় বিরাট গুনাহ রয়েছে, আবার মানুষের জন্য উপকারিতাও রয়েছে।" যুক্তি ও কেয়াসের দাবি ছিলো উপকারিতা লাভের জন্য ক্ষতিকে দূরীভূত করা কাম্য হলে মদের স্বল্প পরিমাণকে বৈধ ও বেশি পরিমাণকে অবৈধ করা যেতে পারে। কিন্তু শরিয়ত যখন মদের উপকারিতার বিধানের চেয়ে ক্ষতির বিধানকে অগ্রগণ্য করেছে এবং তার পরিমাণ কম হোক বা বেশি হোক, নিষিদ্ধ করেছে, তখন মদ হারামকরণের এই কারণ যে বস্তুতেই পাওয়া যাবে, তাতেই এই বিধি বলবত হবে। অর্থাৎ কম বেশি নির্বিশেষে হারাম হবে। তবে যখন শরিয়তসম্মত কোনো পার্থক্য প্রমাণিত হবে, তখন এই বিধির ব্যতিক্রম ঘটবে।

ফকিহগণ এ ব্যাপারেও একমত হয়েছেন যে, নির্যাস সেবন করা ততক্ষণ হালাল, যতক্ষণ তাতে মদের ন্যায় তীব্র মাদকতা না জন্মে। কেননা রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : "তোমরা নির্যাস পান করো। তবে জেনে রাখো, প্রত্যেক নেশাকর জিনিস হারাম।" তা ছাড়া জানা গেছে, রসূলুল্লাহ্ সা. নির্যাস পান করতেন, কিন্তু দ্বিতীয় দিন বা তৃতীয় দিন তা ঢেলে ফেলতেন। এ থেকে দু'টো বিষয়ে ফকিহদের মতভেদ হয়েছে : প্রথমতঃ কোন্ কোন্ পাত্রে নির্যাস সংরক্ষণ করা যাবে, সে সম্পর্কে, দ্বিতীয়তঃ পাকা ও কাঁচা খেজুরের নির্যাস এবং খোরমা ও কিসমিসের নির্যাস সম্পর্কে।

মদের কয়েকটি প্রসিদ্ধ শ্রেণী

বাজারে বিভিন্ন নামের মদ পাওয়া যায়। এলকোহলের মাত্রা কম বা বেশি হওয়া সাপেক্ষে এগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যেমন ব্রান্ডি, হুইসকি, রোম, লিকের ইত্যাদি। এগুলোতে এলকোহলের মাত্রা শতকরা ৪০ থেকে ৭০ ভাগ পর্যন্ত হয়ে থাকে। অপরদিকে জিন, হল্যান্ডি, জেনেভা প্রভৃতিতে এলকোহলের মাত্রা থাকে শতকরা ৩৩ ভাগ থেকে ৪০ ভাগ পর্যন্ত। পোর্ট, শেরি, ম্যাডেরা প্রভৃতিতে ১৫ থেকে ২৫ ভাগ পর্যন্ত এলকোহল থাকে। আর ততোধিক হালকা মদ ক্লার্ট, হুক, শ্যাম্পেল, বার্গেন্ডী প্রভৃতিতে

থাকে ১০ থেকে ১৫ ভাগ। আরো হাল্কা বেয়ার যথা এইল, বোর্টার, এষ্টুট, মিডনিখ প্রভৃতিতে ২ থেকে ৯ ভাগ পর্যন্ত এলকোহল থাকে। শেষোক্ত ধরনের স্বল্প মাত্রার মদ হিসেবে বূযা, কাসাব প্রভৃতির নামও উল্লেখযোগ্য।

রস ও সংরক্ষিত নির্যাস পান

ঝাঁজ ও ফেনাযুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ফলের রস বা নির্যাস পান করা জায়েয। কেননা আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজায় আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : "আমি জানতে পারলাম রসূলুল্লাহ্ সা. রোযা রেখেছেন। তাই আমি লাউয়ের ডুগায় সংরক্ষিত ফলের রস নিয়ে তার ইফতারির জন্য অপেক্ষায় থাকলাম। তারপর তা নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম। তখন দেখলাম, তাতে ফেনা এসে গেছে। তা দেখে রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন : ওটা এই দেয়ালের উপর ছুড়ে ফেলো। কেননা এটা যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করেনা, তার পানীয়।" আহমদ বর্ণনা করেছেন, ইবনে উমর নির্যাস সম্পর্কে বললেন : এ জিনিসটাকে যতদিন তার শয়তান আক্রান্ত না করে ততদিন পান করো। জিজ্ঞাসা করা হলো : কতদিনে তাকে শয়তান আক্রান্ত করে? তিনি বললেন : তিন দিনে।

মুসলিম প্রমুখ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (ইবনে আব্বাস) রসূলুল্লাহ সা.-এর জন্য কিসমিস পানিতে ভিজাতেন। তিনি সেই পানি ঐদিন, পরের দিন ও তারপরের দিনের বিকাল পর্যন্ত পান করতেন। তারপর তা পরিচারককে পান করাতেন কিংবা ফেলে দিতেন। আবু দাউদ বলেন : পরিচারককে পান করানো অর্থ হলো, তাতে বিকৃতির লক্ষণ পরিদৃষ্ট হতো। আর এ অবস্থার সৃষ্টি হতো তিন দিনের পর। মুসলিম বর্ণনা করেন : আয়েশা রা. রসূলুল্লাহ্ সা.-এর জন্য সকালে ফলের নির্যাস করে রাখতেন। রাতের খাবারের পর তা পান করাতেন। যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকতো তবে তা ঢেলে ফেলতেন অথবা পাত্রটা খালি করতেন। তারপর রাতে পুনরায় নির্যাস তৈরি করতেন। সকাল বেলায় সকালের খাবারের পর তা পান করতেন। আর সকালে ও বিকালে মশক ধোয়া হতো। এ হাদিস ইবনে আব্বাসের হাদিসের বিরোধী নয় যে, তিনি তৃতীয় দিন বিকাল পর্যন্ত নির্যাস পান করতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রসূলুল্লাহর জীবনী থেকে এ কথা সুবিদিত যে, তিনি কখনো মদ পান করেননি। নবুয়্যতের আগেও নয়, পরেও নয়। তিনি কেবল এমন নির্যাস পান করতেন, যা তখনো মদে পরিণত হয়নি।

মদ যখন সির্কায় পরিণত হয়

আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, মদ যখন আপনা থেকে সির্কায় রূপান্তরিত হয়, তখন তা পান করা জায়েয। আর যখন তাকে সির্কায় রূপান্তরের ইচ্ছা করা হয়, তখন ফকিহদের তিন রকমের অভিমত পাওয়া গেছে : ১. হারাম ২. মাকরূহ ৩. মুবাহ (বৈধ)। শেষোক্ত মতটি উমর ইবনুল খাত্তাব, শাফেয়ি, আহমদ, সুফিয়ান সাওরি, ইবনুল মুবারক, আতা ইবনে আবি রাবাহ, উমর ইবনে আবদুল আযীয ও আবু হানিফার। হাদিসের সাথে কেয়াসের অর্থাৎ যুক্তির বিরোধ ও হাদিসের ব্যাখ্যা নিয়ে মতবিরোধই এই মতভেদের কারণ। কেননা আবু দাউদ, মুসলিম ও তিরমিযি আনাস বিন মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন : "আবু তালহা রসূলুল্লাহ সা.কে জিজ্ঞাসা করলেন : কতিপয় ইয়াতিম উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু মদের মালিকানা লাভ করেছে। এমতাবস্থায় ঐ মদ কী করা হবে? রসূলুল্লাহ সা. বললেন : ওটা ফেলে দাও। আবু তালহা বললেন : আমি কি মদটাকে সির্কায় পরিণত করতে পারিনা? রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন : না।"

এখন যে ব্যক্তি বুঝেছেন যে, এ হাদিসে হারামের পথ বন্ধ করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। তিনি এ হাদিস থেকে সির্কায় পরিণত করার ইচ্ছা করাকে মাকরূহ সাব্যস্ত করেছেন। আর যিনি দেখতে পেয়েছেন যে, কোনো কারণের উল্লেখ ব্যতিরেকেই এতে মদকে সির্কায় পরিণত করতে নিষেধ করা হয়েছে। তিনি এ দ্বারা উক্ত কাজকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। একইভাবে এ হাদিস থেকে এ সিদ্ধান্তেও আসা যায় যে, যারা কোনো নিষিদ্ধ বস্তু নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তার নিষেধাজ্ঞা ফিরে আসেনা বলে মনে করেন, তারা সির্কায় রূপান্তরিত মদকে হারাম মনে করোনা। খাত্তাবি বলেছেন : এ হাদিসে দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মদকে সির্কায় রূপান্তরের চেষ্টা করা অবৈধ। তা যদি বৈধ হতো, তবে ইয়াতিমের সম্পত্তিকে এভাবে হালাল বস্তুতে রূপান্তরিত করে সংরক্ষণ করা ও বিনিয়োগের মাধ্যমে বাড়ানোর চেষ্টা অধিকতর মহৎ কাজে পরিগণিত হতো। কেননা ইয়াতিমের সম্পত্তি সংরক্ষণ করা ওয়াজিব। তাছাড়া রসূলুল্লাহ সা. যে কোনো সম্পত্তি বিনষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। মদকে ফেলে দেয়া যে তা নষ্ট করারই শামিল, তা বলাই বাহুল্য। কাজেই বুঝা গেলো, মদকে কোনো রূপান্তর প্রক্রিয়ায় পবিত্র করা ও সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত করা সম্ভব নয়।

সির্কাকে হারাম প্রতিপন্নকরণের বিরুদ্ধে যে কেয়াস বা যুক্তি প্রদর্শন করা হয় তা হলো, শরিয়তের এ মূলনীতি সুবিদিত যে, শরিয়তের বিভিন্ন বিধান বিভিন্ন জিনিসের উপর প্রযোজ্য। মদ ও সির্কা দুটো ভিন্ন ভিন্ন জিনিস। মদ সর্বসম্মতভাবে হারাম, আর সির্কা সর্বসম্মতভাবে হালাল। আর মদ যখন সির্কায় রূপান্তরিত হয়েছে, তখন তা অবশ্যই হালাল হয়েছে, চাই তা যে উপায়েই রূপান্তরিত হয়ে থাকনা কেন।

মাদক দ্রব্যসমূহ

এ পর্যন্ত যা কিছু উল্লেখ করা হলো, তা ছিলো খাম্‌র বা মদ নামক পানীয় সম্পর্কে আল্লাহর বিধান। কিন্তু যে সকল বস্তু পানীয় নয়, অথচ মদের মতোই বুদ্ধির বিলুপ্তি ঘটায়, যেমন ভাং, গাঁজা, আফিম ইত্যাদি, সে সকল বস্তুও সম্পূর্ণরূপে হারাম। কেননা তা নেশাকর ও মাতালকারী। ইতিপূর্বে আমরা মুসলিম থেকে বর্ণিত হাদিস উদ্ধৃত করেছি যে, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "সকল মাদকদ্রব্য মদ এবং সকল মদ হারাম।"

মিশরের মুফতি শেখ আবদুল মজীদ সালিমকে (রহ.) মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত শরিয়তের বিধান জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। প্রশ্নগুলো ছিলো নিম্নরূপ :

১. মাদকদ্রব্য সেবন করা জায়েয কিনা?

২. মাদক দ্রব্যের ব্যবসা করা ও তাকে বাণিজ্যিক মুনাফা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা জায়েয কিনা?

৩. ভাং ও আফিম বিক্রি করা ও তা থেকে মাদকদ্রব্য তৈরি করা, তার চাষ করা, সেবন করা ও ব্যবসা করা জায়েয কিনা?

৪. মাদকদ্রব্য বিক্রয় থেকে অর্জিত মুনাফা হালাল না হারাম? এর জবাবে তিনি বলেন :

মাদক সেবন :

১. এসব মাদকদ্রব্য সেবন সন্দেহাতীতভাবে হারাম। কেননা এগুলো সেবনে শরীরের ক্ষতি হয় ও বিবেকবুদ্ধি বিকৃত হয়। কাজেই শরিয়ত যেখানে এর চেয়ে কম ক্ষতিকর জিনিস মদকে হারাম করেছে, সেখানে এগুলোকে সে হালাল করবে, এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এজন্য

কোনো কোনো হানাফি আলেম বলেছেন : "ভাং ও আফিমকে যে হালাল বলে বিশ্বাস করে, সে কাফের ও বেদাতী।" এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এর হারাম হওয়ার বিষয়টা তাদের নিকট সুস্পষ্ট ও অকাট্য। তাছাড়া যেহেতু এ জাতীয় মাদকগুলোর বেশির ভাগ বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন ও নিষ্ক্রিয় করে দেয় এবং যারা এগুলো সেবন করে তারা এতে এত আনন্দ ও মজা পায় যে, আজীবন এর নেশায় মত্ত ও এর প্রতি আসক্ত থাকে, তাই এগুলোও মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে ও রসূলুল্লাহ সা. হাদিসে যে মদ ও নেশাকর দ্রব্য হারাম ঘোষণা করেছেন, তার আওতায় পড়ে। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া তাঁর "আস্‌সিয়াসাতুল্ শরইয়াহ" (ইসলামের রাজনীতি) নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে যা বলেছেন, তার সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ :

'হাশিশ' (গাঁজা, ভাং ইত্যাদি) হারাম। মদখোরের ন্যায় এগুলোর সেবনকারীর উপরও শরয়ি শাস্তি কার্যকর করতে হবে। এগুলো মদের চেয়েও নিকৃষ্ট ও জঘন্য। কারণ এর প্রভাবে বিবেকবুদ্ধি ও স্বভাব চরিত্র বিকৃত ও বিনষ্ট হয়ে যায়। এমনকি তা মানুষকে হিজড়া ও কাপুরুষে পরিণত করে। তাছাড়া এগুলোও মানুষকে আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ ও রসূল যে মদ ও নেশাকর বস্তু হারাম করেছেন, এগুলো তার অন্তর্ভুক্ত। আবু মূসা আশয়ারি রা. বলেছিলেন : হে রসূলুল্লাহ, আমরা ইয়ামানে অবস্থানকালে দু'রকমের পানীয় তৈরি করতাম। একটির নাম 'বিত্‌য়ু', যা মধুকে নিভৃত স্থানে রেখে দিয়ে গাঢ় ও জমাট করে তৈরি করা হয়। আর অপরটি 'মিযার', যা যব ও গম থেকে নির্যাস বের করে নিভৃত স্থানে রেখে দিয়ে গাঢ় ও জমাট করে তৈরি করা হয়। রসূলুল্লাহ সা. অল্প শব্দে ব্যাপক অর্থবোধক কথা বলার অসাধারণ যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। তিনি আমার প্রশ্নের জবাবে শুধু সংক্ষেপে বললেন : "প্রত্যেক নেশাকর জিনিস হারাম।" -বুখারি ও মুসলিম।

নু'মান ইবনে বশীর রা. বলেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "গম থেকেও মদ তৈরি হয়, যব থেকেও মদ তৈরি হয়, কিশমিশ থেকেও মদ তৈরি হয়, খোরমা থেকেও মদ তৈরি হয় এবং মধু থেকেও মদ তৈরি হয়। যা কিছুই মানুষকে মাতাল করে, তা পান করতে আমি নিষেধ করি।" -আবু দাউদ।

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "প্রত্যেক নেশাকর জিনিসই মদ এবং প্রত্যেক মদই হারাম।" -মুসলিম।

আয়েশা রা. বলেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "প্রত্যেক নেশাকর বস্তু হারাম। যে জিনিস বেশি পরিমাণে সেবন করলে মানুষ মাতাল হয়, সে জিনিসের স্বল্প পরিমাণও হারাম।" (তিরমিযি)

জাবের রা. থেকে বর্ণিত : এক ব্যক্তি রসূল সা.কে জিজ্ঞাসা করলো, তাদের অঞ্চলে 'মিযার' নামক এক ধরনের পানীয় আছে, যা ভুট্টা থেকে তৈরি হয়। ওটা পান করা যাবে কিনা? রসূলুল্লাহ সা. বললেন : ওটা কি নেশাকর? লোকটি বললো : হাঁ। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : নেশাকর জিনিস মাত্রই হারাম। যে ব্যক্তি নেশাকর জিনিস পান করে, আল্লাহ তাকে "তায়নাতুল খাবাল" (বিষাক্ত পানীয়) পান করাতে বদ্ধপরিকর। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো : হে রসূলুল্লাহ, এই বিষাক্ত পানীয় কী? তিনি বললেন : "দোযখবাসীর ঘাম।" (মুসলিম)

ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "বিবেকবুদ্ধিকে নিষ্ক্রিয় ও মানুষকে মাতাল করে এমন প্রত্যেক জিনিস হারাম।" -আবু দাউদ।

এ বিষয়ে বহু হাদিস রয়েছে। রসূলুল্লাহ্ সা. তাঁর স্বভাবসুলভ সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক বাণী দ্বারা যাবতীয় নেশাকর ও বুদ্ধি লোপকারী বস্তুকে হারাম হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছেন এবং এগুলোর মধ্যে কোনো শ্রেণীভেদ করেননি, চাই তা খাদ্য বস্তু হোক বা পানীয় হোক। তাছাড়া মদ কখনো শক্ত খাবারের সাথে মিশিয়ে খাওয়া হয়, আবার গাঁজা, আফিম ইত্যাদিকেও তরল করে পান করা হয়। এভাবে মদ খাদ্য ও পানীয় উভয়ের রূপ ধারণ করতে পারে এবং আফিম, গাঁজাও খাদ্য ও পানীয়ে রূপান্তরিত হতে পারে। এগুলোর আকৃতি যে রকমই হোক, সর্বাবস্থায় তা হারাম। রসূল সা. ও ইমামদের যুগের পরে এগুলো তৈরি হয়েছে বলে নেশাকর বস্তু সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সা. সাধারণভাবে যেসব উক্তি করেছেন, তার আওতার বাইরে যেতে পারেনা। রসূলুল্লাহ সা.-এর পরে বহু নেশাকর বস্তু ও পানীয় তৈরি হয়েছে এবং সেগুলোর সবই কুরআন ও সুন্নাহতে বিদ্যমান নেশাকর বস্তু সংক্রান্ত বক্তব্যের আওতাধীন।"

ইমাম ইবনে তাইমিয়া তার ফতোয়া সংকলনেও একাধিকবার এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন, যার সংক্ষিপ্ত সার নিম্নরূপ : "এই অভিশপ্ত ভাং-এর সেবনকারীরা ও একে হালাল সাব্যস্তকারীরা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর বান্দাদের ক্রোধের উদ্রেককারী এবং আল্লাহর আযাব তাদের জন্য অবধারিত। এটি মানুষের ধর্ম, চরিত্র, বিবেকবুদ্ধি ও স্বভাব প্রকৃতিকে বিকৃত ও ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং মেজাযকে এত খারাপ ও খিটখিটে করে দেয় যে, অনেকেই বদ্ধ পাগলে পর্যন্ত পরিণত হয়। এসব মাদকদ্রব্য সেবনকারীরা ইতরামি ও পাশবিকতার এত নিম্ন স্তরে নেমে যায় যে, মদখোররাও তাদের কাছে হার মানে। কাজেই এগুলো মদের চেয়েও বিপজ্জনক। তাই এগুলোকে হারাম করা অধিকতর যৌক্তিক ও সমীচীন। এসব মাদক সেবন যে হারাম, সে ব্যাপারে মুসলমানদের ইজমা হয়েছে। যে ব্যক্তি একে হালাল বলে বিশ্বাস করবে, তাকে তওবা করার আদেশ দেয়া হবে। তওবা করলে অব্যাহতি পাবে, নচেত মুরতাদ ঘোষণা করা হবে। তার জানাযাও পড়া হবেনা এবং মুসলমানদের কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবেনা। আর একথাও মনে রাখতে হবে যে, মদ সংক্রান্ত বিধি অনুযায়ী এসব মাদকের স্বল্প পরিমাণও হারাম।"

তাঁর শিষ্য বিশিষ্ট ইমাম ইবনুল কাইয়েমও তাঁর পদাংক অনুসরণ করে নিজ গ্রন্থ 'যাদুল মায়াদে' বলেন : "প্রত্যেক নেশাকর জিনিসই খাম্‌র বা মদের আওতাধীন। চাই তা তরল হোক বা কঠিন হোক, নির্যাস হোক বা রান্না করা হোক। হাশিশ তথা ভাং, গাঁজা ইদ্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা রসূলুল্লাহ সা.-এর সুস্পষ্ট ও অকাট্য উক্তির আলোকে এগুলোর সবই মদ। কেননা তিনি বলেছেন : "প্রত্যেক মাতালকারী বস্তু হারাম।" আর রসূলুল্লাহ্ সা.-এর কথার তাৎপর্য ও মর্ম যারা সবচেয়ে ভালোভাবে উপলব্ধি করেছেন, সেই সাহাবীগণও এ ব্যাপারে একমত যে, মদ তাকেই বলে, যা নেশা জন্মায় ও বিবেকবুদ্ধি লোপ করে। তাছাড়া, রসূলুল্লাহ্ সা.-এর উক্তি দ্বারা যদি যাবতীয় নেশাকর দ্রব্য নাও বুঝাতো, তথাপি স্বচ্ছ যুক্তির বিচারেই সকল প্রকারের ও সকল শ্রেণীর নেশাকর দ্রব্যের বিধান একই হতো। সর্বদিক দিয়ে সমান ও সমকক্ষ কয়েকটি জিনিসের মধ্যে বিনা কারণে ও বিনা যুক্তিতে পার্থক্য ও বৈষম্য সৃষ্টি করার কোনোই অবকাশ নেই।"

বুলুগুল মুরাম গ্রন্থের টীকা "সুবুলুস্ সালাম"-এর লেখক বলেন : "যে জিনিস নেশা ও মাতলামির সৃষ্টি করে, তা পানীয় না হলেও হারাম।" হাফেয ইবনে হাজার বলেছেন : "যে ব্যক্তি বলে যে, ভাং বা আফিম তো মাতাল করেনা বরং অসাড় করে, সে একজন হঠকারী

ব্যক্তি। কেননা মদ দ্বারা যে ধরনের নেশা ও মাতলামির সৃষ্টি হয়, এগুলো দ্বারাও তাই সৃষ্টি হয়।" বিশিষ্ট চিকিৎসক ইবনুল বইতার বলেছেন : মিশরে যে ভাং পাওয়া যায় তা অত্যধিক নেশাকর। মানুষ এর এক দিরহাম বা দুই দিরহাম পরিমাণ সেবন করলেই মাতাল হয়ে যায়। ভাং এর অপকারিতা অনেক। কোনো কোনো আলেম-এর একশো বিশটা ধর্মীয় ও বৈষয়িক অপকারিতা গণনা করে তুলে ধরেছেন। এর সব ক'টি অপকারিতা আফিমেও রয়েছে। তবে আফিমের অপকারিতা আরো বেশি।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ও তার সুযোগ্য শিষ্য ইবনুল কাইয়েম যা কিছু বলেছেন তা একদিকে যেমন যৌক্তিক, অন্যদিকে তেমনি সন্তোষজনক। আর এ আলোচনা থেকে এটাও স্পষ্ট হয়েছে যে, কুরআন ও সুন্নাহর বাণী মদের সাথে সাথে ভাংকেও যেমন যুক্ত করে, তেমনি অধিকতর ক্ষতিকর আফিমও তার অন্তর্ভুক্ত করে। এক কথায়, এমন যাবতীয় নেশাকর দ্রব্য এর আওতাভুক্ত, যার উদ্ভব ইদানিং হয়েছে, অথচ আগে কেউ চিনতোনা। এগুলোও বুদ্ধি লোপকারী ও মাদকতা আনয়নকারী হিসেবে আঙ্গুর থেকে তৈরি মদের মতোই। এগুলোতে মদের অপকারিতা তো রয়েছেই, উপরন্তু এর চেয়েও ভয়াবহ অপকারিতাও রয়েছে, যা আমরা স্বচোক্ষেই দেখে থাকি। এসব বুদ্ধি বিনাশী মাদক দ্রব্যকে ইসলাম বৈধ করবে, এটা আদৌ সম্ভব নয়। যারা এর কোনো একটিকেও হালাল বলে, তারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে, অথবা আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞতাপ্রসূত কথা বলে। এসব মাদক যখন মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে ও সামষ্টিকভাবে, বৈষয়িকভাবে, স্বাস্থ্যগতভাবে, কৃষ্টিগতভাবে ও নৈতিকভাবে, এক কথায় সর্বোতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তখন ইসলামি শরিয়ত এগুলোকে কিভাবে বৈধ করবে? ইসলাম তো এসেছেই মানুষকে সার্বিক কল্যাণ, অথবা ন্যূনপক্ষে আপেক্ষিক কল্যাণ উপহার দিতে এবং যাবতীয় ক্ষতিকর ও অকল্যাণকর বস্তু থেকে রক্ষা করতে ও নিরাপদ করতে।

সর্বজ্ঞ ও মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ যখন আঙ্গুর থেকে তৈরি মদ, কম ও বেশি নির্বিশেষে এজন্য নিষিদ্ধ করেছেন যে, তা ক্ষতিকর এবং তার স্বল্প পরিমাণ পান ও বেশি পরিমাণে পানের দিকে আকৃষ্ট করে ও বেশি পরিমাণে পানের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তখন এর চেয়েও অধিক ক্ষতিকর এবং শরীর, বুদ্ধি, ধর্ম, চরিত্র ও স্বভাব বিনষ্টকারী মাদকদ্রব্য কিভাবে বৈধ ও হালাল করে দেবেন? এ ধরনের বক্তব্য প্রদান ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ অথবা কাফের ও বিদআতী ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং এসব মাদক খাওয়া, পান করা, ঘ্রাণ নেয়া বা ইনজেকশন নেয়া যেভাবেই সেবন করা হোক সম্পূর্ণরূপে হারাম। এ ব্যাপারে কোনো অস্পষ্টতা, অসচ্ছতা বা রাখঢাকের কোনোই অবকাশ নেই।

মাদকদ্রব্য নিয়ে ব্যবসা ও তাকে বাণিজ্যিক মুনাফা অর্জনের হাতিয়াররূপে গ্রহণ :

রসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণিত বহু সংখ্যক হাদিসে মদ বিক্রয় হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। তন্মধ্যে বুখারি ও মুসলিমে জাবের রা. থেকে বর্ণিত এ হাদিসটি উল্লেখযোগ্য :

"আল্লাহ তায়ালা মদ, মৃত জন্তু, শুকর ও মূর্তি বিক্রয় হারাম করেছেন।" এই মর্মেও বহু হাদিস বর্ণিত হয়েছে যে, যেসব বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়া আল্লাহ হারাম করেছেন, সেসব বস্তুর বিক্রয় করা ও তার মূল্য ভোগ করাও হারাম। প্রথম প্রশ্নের জবাব থেকে জানা গেছে, শরিয়তের দৃষ্টিতে 'মদ' নামটি এসব মাদকদ্রব্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সুতরাং যেখানে মদ বেচাকেনা হারাম করা হয়েছে, সেখানে ঐ একই নিষেধাজ্ঞা দ্বারা মাদকদ্রব্য বিক্রয়ও হারাম বিবেচিত হবে। আর এখান থেকেই সুস্পষ্টভাবে এসব মাদক দ্রব্যের

ব্যবসায় ও এই ব্যবসায়কে জীবিকা উপার্জনের উপায় বা পেশা হিসেবে গ্রহণও হারাম সাব্যস্ত হবে। উপরন্তু সব মাদক এমন সব গুনাহর কাজে প্ররোচিত করে, যার হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা কুরআন দ্বারাই তার হারাম হওয়া প্রমাণিত : وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ط وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ص

অর্থ : সৎ কর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করো এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অন্যের সাহায্য করোনা।" (সূরা মায়েদা : আয়াত ২)

তাই অধিকাংশ ফকিহর এই অভিমত সম্পূর্ণ সঠিক যে, আঙ্গুরের রস দিয়ে মদ বানায় এমন লোকের নিকট আঙ্গুরের রস বিক্রয় করা হারাম এবং এ ধরনের বিক্রয় বাতিল। কেননা এ দ্বারা পাপ কাজে সাহায্য করা হয়।

বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে মাদকের গাছের চাষ এবং সেবন বা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে তা থেকে মাদক উপাদান বের করা :

সেবন বা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে মাদক উপাদান বের করার জন্য আফিম ও ভাং চাষ করা সন্দেহাতীতভাবে হারাম। এর কারণগুলো নিম্নরূপ :

১. ইবনে আব্বাস থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি ফল পাড়ার মৌসুমে আঙ্গুর এ উদ্দেশ্যে জমা করে রাখে যে, এ দ্বারা যে ব্যক্তি মদ বানাবে, তার কাছে তা বিক্রয় করবে, সে অবশ্যই দোযখে প্রবেশ করবে।" এ হাদিস দ্বারা প্রকারান্তরে প্রমাণিত হয় যে, মদ প্রস্তুতকারীর নিকট বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে আঙ্গুর জমা করে রাখা যখন হারাম, তখন একই উদ্দেশ্যে ভাং ও আফিম চাষ করাও হারাম।

২. এটা পাপ কাজে সহায়তার শামিল। পাপ কাজটি হলো, মাদক ব্যবসায় বা মাদক সেবন। আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, পাপ কাজে সাহায্য করাও পাপ।

৩. যে কৃষক উক্ত উদ্দেশ্যে মাদকের গাছ রোপণ করে, সে এর মাধ্যমে এই সম্মতি ব্যক্ত করে যে, জনগণ মাদক সেবন ও মাদকের ব্যবসায় লিপ্ত হোক। বস্তুত যে কোনো পাপ কাজে সম্মতি দেয়াও পাপ। এর কারণ হলো, অন্যায় কাজকে মন দিয়ে অপছন্দ ও প্রত্যাখ্যান করা প্রকৃতপক্ষে অন্যায়কে ঘৃণা করা ও অন্যায়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করারই সমার্থক, যা প্রত্যেক মুসলমানের উপর সর্বাবস্থায় ফরয। বরঞ্চ সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "যে ব্যক্তি গুনাহর কাজকে মন দিয়ে অপছন্দ ও প্রত্যাখ্যান করেনা, তার অন্তরে একটি সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান নেই।" তাছাড়া, অন্য একটি কারণেও ভাং ও আফিমের চাষ করা গুনাহ। সেটি হলো, দেশে প্রচলিত আইনে এ কাজ নিষিদ্ধ থাকা। কেননা এ বিষয়ে মুসলমানদের ইজমা রয়েছে যে, প্রচলিত যে আইনে বা প্রশাসনিক আদেশে আল্লাহ ও তার রসূলের আদেশ লঙ্ঘিত হয়না, সে আইন ও আদেশ মান্য করা ওয়াজিব। ইমাম নববী "শাসকদের আনুগত্য" শীর্ষক অধ্যায়ে মুসলিমের ব্যাখ্যায় বলেছেন : মাদকদ্রব্য সেবন ও তার ব্যবসায় হারাম প্রমাণ করতে এই শেষোক্ত কারণটি উল্লেখযোগ্য।

মাদক দ্বারা অর্জিত মুনাফা :

এ আলোচনা থেকে জানা গেলো, মাদক বিক্রয় করা হারাম। আর বিক্রয় করা যখন

হারাম, তখন তার মূল্যও হারাম হবে। কেননা আল্লাহ বলেছেন :

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ‌.

"তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করোনা।" (নিসা : ২৯)

অর্থাৎ একজন আরেকজনের সম্পদ অন্যায়ভাবে নিওনা ও ভোগ করোনা। অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ নেয়ার দু'টো পন্থা রয়েছে :

১. যুলুম, চুরি, বিশ্বাসঘাতকতা, জবরদখল এবং অন্যায় পন্থায় অন্যের সম্পদ হস্তগত করা।

২. নিষিদ্ধ ও বেআইনী পন্থায় যথা জুয়ার মাধ্যমে কিংবা অবৈধ চুক্তি যথা সুদের মাধ্যমে এবং আল্লাহ যেসব জিনিস দ্বারা উপকৃত হওয়া হারাম করেছেন, তা বিক্রয় করার মাধ্যমে উপার্জন হারাম, চাই স্বেচ্ছায় ও সানন্দে হোক না কেন। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ যে সকল জিনিস দ্বারা উপকৃত হওয়া হারাম করেছেন, সে সকল জিনিসের বিক্রয় মূল্যও একাধিক হাদিসে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "আল্লাহ যখন কোনো জিনিসকে হারাম করেন, তখন তার মূল্যও হারাম করেন।" -ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আবি শায়বা বর্ণিত।

যাদুল মায়াদে বলা হয়েছে : অধিকাংশ ফকিহর মত হলো, মদ বানাবে এমন ব্যক্তির নিকট আঙ্গুর বিক্রয় করা হলে তার মূল্য ভোগ করা হারাম। কিন্তু আঙ্গুর খাবে এমন ব্যক্তির নিকট আঙ্গুর বিক্রয় করা হলে তা হালাল। অনুরূপ, যখন এমন কোনো ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করা হয় যে কোনো মুসলমানের ওপর তা দিয়ে আক্রমণ করবে, তখন সেই অস্ত্রের বিক্রয়মূল্য ভোগ করা হারাম। আর যখন তা আল্লাহর পথে জিহাদকারীর নিকট বিক্রয় করা হয়, তখন তার বিক্রয় মূল্য হালাল। অনুরূপ, যখন রেশমী কাপড় যার তা পরা হারাম তার কাছে বিক্রয় করা হয়, তখন তার বিক্রয় মূল্য ভোগ করা হারাম। আর যার রেশমী কাপড় পরা হালাল তার কাছে বিক্রয় করা হলে বিক্রয় মূল্য ভোগ করা হালাল। আর যেসব বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়া হালাল, তা যদি কেউ আল্লাহর নাফরমানীর কাজে ব্যবহার করতে চায় এবং তার কাছে ঐ বস্তু বিক্রয় করা হয়, তবে অধিকাংশ ফকিহর মতানুসারে তার বিক্রয় মূল্য ভোগ করা হারাম। আর যে জিনিস দ্বারা উপকৃত হওয়া হারাম যেমন মাদকদ্রব্য, তার বিক্রয় মূল্য ভোগ করা তো হারাম হবেই। আর যেহেতু এই মাদক দ্রব্যের বিক্রয় মূল্য হারাম, তাই তা ইবাদতের কাজে যথা সদকায় ও হজ্জে খরচ করা হলে তা কবুল হবেনা এবং খরচকারী তার জন্য সওয়াব পাবেনা।

মুসলিম আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : "রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র জিনিস ব্যতীত গ্রহণ করেননা। আর আল্লাহ রসূলদেরকে যে আদেশ দিয়েছেন, মুমিনদেরকেও সেই আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

يٰٓاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ط

"হে রসূলগণ, তোমরা হালাল খাও ও সৎ কাজ করো।" তিনি আরো বলেছেন :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ○

"হে মুমিনগণ, তোমাদেরকে আমি যে পবিত্র জীবিকা দিয়েছি তা খাও এবং আল্লাহর শোকর করো, যদি তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করো।" এরপর রসূলুল্লাহ সা. এক

ব্যক্তির বিবরণ দেন, যে দীর্ঘ সফরে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে আল্লাহর নিকট হাত তুলে দোয়া করে : হে আমার রব, হে আমার রব, অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পোশাক হারাম এবং সে হারাম দ্বারাই হৃষ্টপুষ্ট হয়। এমতাবস্থায় কিভাবে তার দোয়া কবুল হবে?"

মুসনাদে আহমদে ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে আছে, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "মহান আল্লাহর কসম, কোনো বান্দা হারাম মাল উপার্জন করে তা থেকে ব্যয় করলে তাতে বরকত পাবে না, তা থেকে সদকা করলে তা কবুল হবেনা, আর তা উত্তরাধিকারস্বরূপ রেখে গেলে তা হবে তার দোযখের পাথেয়। আল্লাহ হারাম সম্পত্তি দ্বারা গুনাহ মোচন করেননা, তবে হালাল সম্পত্তি দ্বারা গুনাহ মোচন করেন। একটা নাপাক জিনিস আরেকটা নাপাক জিনিসকে বিলুপ্ত করেনা।"

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি হারাম মাল উপার্জনের পর তা সদকা করে, সে তা দ্বারা কোনো সওয়াব পাবেনা, বরং তার দায় ও শাস্তি তার উপর বর্তাবে।" -জামেউল উলূম।

কাসেম বিন মুখায়মারা বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "যে ব্যক্তি কোনো গুনাহর কাজ দ্বারা অর্থ উপার্জন করলো, অতপর তা দ্বারা রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করলো, কিংবা সদকা করলো বা আল্লাহর পথে দান করলো, তা একত্রিত করা হবে, অতপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" -জামেউল উলূম।

ইমাম নববীর সংকলিত চল্লিশ হাদিসের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী এ হাদিস উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "যখন কোনো ব্যক্তি হারাম অর্থ দ্বারা হজ্জ করতে বের হয়, অতপর বাহনে আরোহণ করে বলে "লাব্বাইকা"। (তোমার দরবারে আমি হাজির) তখন আকাশ থেকে একজন ফেরেশতা তাকে বলে : তোমার কোনো লাব্বাইকা গ্রহণ করা হবেনা। তোমার হজ্জ তোমাকেই ফেরত দেয়া হলো।" এ হাদিসগুলো সামষ্টিকভাবে প্রমাণ করে যে, হারাম অপবিত্র মাল দ্বারা সম্পাদিত কোনো হজ্জ, সদকা বা অন্য কোনো ইবাদত আল্লাহ কবুল করেননা। এ কারণে কোনো কোনো হানাফি আলেম বলেন, হারাম মাল হজ্জে ব্যয় করাও হারাম।

আমাদের এ আলোচনার সার সংক্ষেপ হলো : ১. আফিম, কোকেন ও ভাং ইত্যাকার মাদক সেবন করা সম্পূর্ণ হারাম। ২. এগুলো দ্বারা ব্যবসা করা এবং এগুলোকে লাভজনক পেশায় খাটানো হারাম। ৩. আফিম, ভাং ইত্যাদির চাষ করা ও তা থেকে নেশাকর উপাদান বের করে তা সেবন করা বা তা দ্বারা ব্যবসা করা হারাম। ৪. এসব জিনিস দ্বারা ব্যবসা করে যে মুনাফা হয়, তা হারাম ও অপবিত্র এবং এগুলোকে সৎ কাজে ব্যয় করা শুধু অগ্রহণযোগ্যই নয়, বরং হারামও।

২. মদখোরের শাস্তি

ফকিহগণ একমত যে, মদখোরকে শাস্তি দেয়া ওয়াজিব এবং তার শাস্তি বেত্রাঘাত। কিন্তু কয়টি বেত্রাঘাত, সে ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হানাফি ও মালেকিদের মতে আশিটি, শাফেয়িদের মতে চল্লিশটি এবং ইমাম আহমদের এক মতে আশিটি ও অপর মতে চল্লিশটি। ইমাম মালেক, সাওরি, আবু হানিফা ও তার শিষ্যগণ আশিটির পক্ষে। এই মতের উপর সাহাবীদেরও ইজমা বা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্ণিত আছে যে, উমর রা. মদ পানের শাস্তি সম্পর্কে জনগণের সাথে (অর্থাৎ সাহাবীদের সাথে) পরামর্শ করলেন। আবদুর রহমান বিন আওফ বললেন : সবচেয়ে হালকা শাস্তিটা এর জন্য নির্ধারণ

করুন। সেটি হচ্ছে আশিটি বেত্রাঘাত। তখন উমর রা. আশি বেত্রাঘাত চালু করলেন এবং সিরিয়ায় খালেদ ও আবু উবায়দাকেও এটাই লিখে পাঠালেন।

পরামর্শের সময় আলী রা. বললেন : মানুষ যখন মাতাল হয়, তখন প্রলাপ বকে। আর যখন প্রলাপ বকে, তখন মিথ্যা বলে। কাজেই তাকে মিথ্যাবাদীর (অর্থাৎ ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপকারীর) শাস্তি দাও, যা সর্বনিম্ন। অর্থাৎ আশিটি বেত্রাঘাত। আর দ্বিতীয় মতটি অর্থাৎ চল্লিশটি বেত্রাঘাত হাম্বলি মাযহাবের একাংশের ও শাফেয়ি মাযহাবের অভিমত। কেননা আলী রা. ওলিদ বিন উকবাকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেছিলেন। তারপর বলেছিলেন : রসূলুল্লাহ চল্লিশটি, আবু বকর চল্লিশটি এবং উমর রা. আশিটি বেত্রাঘাত করেছেন। এর সবই সুন্নত। তবে আমি চল্লিশটিকে অধিক পসন্দ করি। -মুসলিম।

আনাস রা.-বলেছেন : এক ব্যক্তি মদ পান করলে তাকে রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট আনা হলো। তিনি তাকে চল্লিশটির মতো জুতা পিটুনি দিলেন। পরে আবার মদ দান করলে তাকে আবু বকরের নিকট আনা হলো। তিনিও রসূলুল্লাহর মতো আচরণ করলেন। তারপর উমরের নিকট আনা হলে তিনি জনগণের পরামর্শ চাইলেন। এ সময় আবদুর রহমান ইবনে আওফ বললেন : হুদুদের ন্যূনতম পরিমাণ হলো আশিটি বেত্রাঘাত, যা সর্বনিম্ন (বুখারি ও মুসলিম)। অতপর উমর রা. মদখোরটিকে বেত্রাঘাত করলেন। রসূলুল্লাহ সা.-এর কাজ শরিয়তের অকাট্য প্রমাণ। অন্যের কাজের কারণে এটা পবিত্যাগ করা জায়েয নয়। আর যে কাজ রসূলুল্লাহ সা. আবু বকর ও উমরের কাজের পরিপন্থী, তার উপর ইজমা হতে পারেনা। তাই উমর কর্তৃক প্রদত্ত বাড়তি বেত্রাঘাতকে শাসকের মনোপুত শাস্তি (তাযীর) ধরে নেয়া হবে। (অর্থাৎ প্রকৃত শরয়ি শাস্তি বা হদ চল্লিশটি। যেখানে শাস্তি বাড়িয়ে দেয়া কল্যাণকর মনে হবে, সেখানে বাড়ানো জায়েয।) এই মতটি অগ্রগণ্য মনে করা যায় এই বর্ণনার ভিত্তিতে যে, উমর রা. অতি মাত্রায় মদব্যস্ত শক্তিশালী ব্যক্তিকে আশিটি এবং দুর্বল ও পদস্খলনবশত মতো পানকারী ব্যক্তিকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করতেন। তবে বারবার পানকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার বিধান মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে। কুবাইস বিন যুয়াইব রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে মদ পান করে, তাকে বেত্রাঘাত করো। পুনরায় মদ পান করলে আবার বেত্রাঘাত করো। পুনরায় মদ পান করলে পুনরায় বেত্রাঘাত করো। পুনরায় (তৃতীয় বা চতুর্থবার) মদ পান করলে তাকে হত্যা করো। কিন্তু যখন এক ব্যক্তি মদ পান করার দায়ে পরপর তিনবার ধরা পড়লো, তখন তাকে তিনি বেত্রাঘাত করলেন এবং মৃত্যুদণ্ড রহিত করলেন। এটা ছিলো ইচ্ছাধীন ব্যাপার।

শাস্তি কিভাবে প্রমাণিত হবে?

দুই উপায়ের যে কোনো একটি দ্বারা দন্ড প্রমাণিত হবে :

১. মদখোরের স্বীকারোক্তি যে, সে মদ পান করেছে।

২. দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোকের সাক্ষ্য।

মুখের গন্ধ দ্বারা দন্ড প্রমাণে ফকিহদের মতভেদ রয়েছে। মালেকিদের মতে, দু'জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী যদি বিচারকের নিকট গন্ধের ভিত্তিতে সাক্ষ্য দেয়, তাহলে হদ ওয়াজিব হবে। কেননা গন্ধ দ্বারা মদ পান প্রমাণিত হয়, যেমন শব্দ ও পদচিহ্ন দ্বারা কোনো কাজ প্রমাণিত হয়। কিন্তু আবু হানিফা ও শাফেয়ির মতে, গন্ধ দ্বারা হদ প্রমাণিত হয়না। কেননা এতে সন্দেহ থাকে। বিভিন্ন গন্ধ পরস্পরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে থাকে। তাই সন্দেহের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। আর সন্দেহ হদকে বাতিল করে দেয়। তাছাড়া গন্ধটা মিশ্রিত

মদেরও হওয়া সম্ভব, অথবা কেউ জোরপূর্বক মদ পান করিয়েছে এমনও হতে পারে। কোনো কোনো জিনিস এমনও রয়েছে যা মদ নয় কিন্তু তার গন্ধ মদের মতো। ইসলামের মূলনীতি অনুযায়ী হদ থেকে অব্যাহতি দেয়ার বিন্দুমাত্রও সুযোগ থাকলে অব্যাহতি দিতে হবে। কেননা শরিয়ত দন্ড মওকুফ করতে উদগ্রীব।

হদ কার্যকরীকরণের শর্তাবলী

মদ পানের শরয়ি শাস্তি (হদ) কার্যকরী করার জন্য নিম্নলিখিত শর্তাবলী পূরণ জরুরি :

১. সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়া। কেননা শরিয়তের বিধান পালনের দায়িত্ব এটা ছাড়া অর্পিতই হয়না। তাই পাগল মদ পান করলে তার উপর হদ কার্যকরী হবেনা। বুদ্ধি প্রতিবন্ধীও এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

২. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। কোনো বালক বা শিশু মদ পান করলে তার উপর হদ কার্যকরী হবেনা। কেননা শরিয়তের বিধান পালনের দায়িত্ব তার উপর অর্পিত হয়নি।

৪. স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হওয়া : কেউ যদি বলপ্রয়োগে কাউকে মদ পান করায়, তবে পানকারীর উপর হদ কার্যকরী হবেনা, চাই এই বলপ্রয়োগ হত্যার হুমকির মাধ্যমে হোক, ভীষণ কষ্টদায়ক প্রহারের হুমকির মাধ্যমে হোক অথবা সমস্ত সহায় সম্পদ ধ্বংসের হুমকির মাধ্যমে হোক। কারণ বলপ্রয়োগ দ্বারা মানুষ নিজের কৃত গুনাহর দায় থেকে মুক্ত হয়।

রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "আমার উম্মতের উপর থেকে অনিচ্ছাকৃত কাজ বা ভুলক্রমে পরিত্যক্ত কাজের গুনাহ্ অপসারিত হয়েছে।" আর গুনাহ্ বা দায় যখন অপসারিত তখন তার উপর তো হদ কার্যকরী হতেই পারেনা। কারণ গুনাহই হদের কারণ। অনন্যোপায় হয়ে মদ পান বলপ্রয়োগে মদ পানের আওতাভুক্ত। কাজেই যে ব্যক্তি তীব্র পিপাসায় জর্জরিত এবং পানি না পেয়ে মৃত্যুর আংশকার সম্মুখীন, সে যদি মদ পায়, তবে তা পান করা তার জন্য বৈধ। অনুরূপ, ক্ষুধার আতিশয্যে যার মৃত্যুর আশংকা প্রবল, সেও মদ পেলে তা পান করতে পারে। কেননা তখন মদ পানের উপর তার জীবন নির্ভরশীল। বস্তুতঃ অনিবার্য প্রয়োজন নিষিদ্ধ জিনিসকেও বৈধ করে দেয়। আল্লাহ্ বলেন :

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

"কিন্তু যে অনন্যোপায় অথচ নাফরমান কিংবা সীমালঙ্ঘনকারী নয়, তার কোনো পাপ নেই। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" আল মুগনিতে বলা হয়েছে : রোম সম্রাট আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফাকে আটক করে এমন একটা কক্ষে আবদ্ধ করে রাখে যেখানে মদ মিশ্রিত পানি ও শুকরের ভুনা গোশত ছাড়া আর কোনো খাদ্য পানীয় ছিলোনা, যাতে তিনি মদ ও শুকরের গোশত খেতে বাধ্য হন। তাকে এভাবে তিন দিন রাখা হয়। তথাপি তিনি সেই খাদ্য ও পানীয় স্পর্শ করেননি। অতপর তিনি মারা যেতে পারেন এই আশংকায় তাকে মুক্তি দেয়া হয়। মুক্ত হওয়ার পরে তিনি বললেন : "আল্লাহর কসম, আল্লাহ আমার জন্য এই খাদ্য পানীয় হালাল করেছিলেন। কেননা আমার আর কোনো উপায় ছিলোনা। কিন্তু ইসলামের বিধান লঙ্ঘিত হতে দেখে তোমরা খুশি হবে, সেটা আমি হতে দিতে চাইনি।"

৪. পানকারীর জানা থাকা চাই যে, সে যা পান করতে চাইছে, তা মাতালকারী ও নেশাকর। যা পান করছে, তা মদ এ কথা না জেনেই পান করলে অজ্ঞতার জন্য তাকে অব্যাহতি দেয়া হবে এবং তার উপর হদ কার্যকরী করা হবেনা। কিন্তু যদি কেউ তাকে জানিয়ে দেয়া সত্ত্বেও সে পান করে বা করা অব্যাহত রাখে, তাহলে তাকে অব্যাহতি দেয়া

হবেনা। কেননা তার অজ্ঞতা দূর হয়েছে এবং জেনে শুনেও সে আল্লাহর নাফরমানী করতে জিদ ধরেছে। কাজেই সে শাস্তির যোগ্য হয়েছে এবং তার উপর হদ কার্যকরী করা হবে। আর যদি এমন কোনো পানীয় পান করে, যার মদ হওয়া ফকিহদের মধ্যে বিতর্কিত। তবে তার উপর হদ কার্যকরী হবেনা। কেননা বিতর্ক ও মতভেদ সন্দেহের সৃষ্টি করে। আর সন্দেহ সর্বদাই হদ রহিত করে। অনুরূপ, যে ব্যক্তি আঙ্গুরের কাঁচা রস ঘন, জমাট ও ফেনাযুক্ত হওয়ার পর পান করে, অথচ সে কাফের দেশে থাকার কারণে কিংবা অল্পদিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে জানেনা যে, এ ধরনের রস পান হারাম হওয়ার ব্যাপারে সকল ফকিহ্ একমত, তার উপরও হদ কার্যকরী হবেনা। কেননা তার অজ্ঞতা হদ রহিতকারী ওযর হিসেবে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মুসলমানদের দেশে বাস করে এবং অল্পদিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারীও নয়। তার উপর হদ কার্যকর করা হবে এবং অজ্ঞতার জন্য তাকে ছাড় দেয়া হবেনা। কেননা এ জিনিসটি ইসলামের অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞানের আওতাভুক্ত।

হদ কার্যকরকরণে স্বাধীন ও মুসলমান হওয়া শর্ত নয়

হদ কার্যকরকরণে অপরাধীর মুসলমান হওয়া ও স্বাধীন হওয়া শর্ত নয়। একজন গোলামও যদি মতো পান করে তবে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। কেননা সেও আল্লাহর আদেশ নিষেধের অধীন। তবে কয়েকটি কাজ এমন রয়েছে, যা তার মনিবের হুকুম পালনে ব্যস্ত থাকার কারণে করা তার পক্ষে কষ্টকর, যেমন জুমার নামায ও জামাতে নামায পড়া। মদ বর্জন করতে স্বয়ং আল্লাহই নিষেধ করেছেন। এ নিষেধাজ্ঞা স্বাধীন ও গোলাম উভয়ের উপর জারি করা হয়েছে এবং মদ বর্জন করা কোনো কঠিন কাজ নয়। আর মদের যে ক্ষতি, তা স্বাধীন ও গোলাম উভয়েরই হয়। কেবলমাত্র শাস্তি ছাড়া আর কিছুতে তাদের মধ্যে পার্থক্য নেই। কেননা গোলামের শাস্তি হবে অর্ধেক অর্থাৎ বিশ ঘা অথবা চল্লিশ ঘা বেত্রাঘাত। মদ পানের শাস্তি নির্ধারণে যে মতভেদ হয়েছে, তদনুসারেই এই দুই ধরনের শাস্তি।

হদ কার্যকরকরণে স্বাধীন হওয়া যেমন শর্ত নয়, তেমনি মুসলমান হওয়াও শর্ত নয়। কিতাবী ইহুদী ও খৃস্টানরা যদি মুসলিম দেশের নাগরিকত্ব লাভ করে এবং তাদের সাথে একত্রে বসবাস করে, যেমন মিশরে কিতাবীরা বাস করে। অনুরূপ, যে সকল কিতাবী মুসলমানদের দেশে বিশেষ নিরাপত্তা চুক্তির অধীন সাময়িকভাবে বসবাস করে, যেমন বিদেশীরা করে থাকে। তারা মুসলিম দেশে মদ পান করলে তাদের হদ কার্যকর হবে। কেননা তারা মুসলমানদের সমান অধিকার ভোগ করে এবং সমান দায়দায়িত্বও বহন করে। তাছাড়া মদ যেহেতু তাদের ধর্মেও হারাম, যেমন ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

আর ব্যক্তিগত জীবনে ও সামাজিক জীবনে মদের কুফল অত্যন্ত ব্যাপক এবং ইসলাম সমাজকে পবিত্র, ভারসাম্যপূর্ণ ও সুসংহত রাখতে বদ্ধপরিকর, যাতে মুসলমান বা অমুসলমান, কোনো নাগরিকই তাকে দুর্বল ও নোংরা করতে না পারে। এটা অধিকাংশ ফকিহর অভিমত এবং এ অভিমত কোনো মতেই পরিবর্তনযোগ্য নয়।

কিন্তু হানাফিরা মনে করেন, ইসলাম মদকে হারাম করার কারণে তা যদিও মুসলমানদের নিকট সম্পদ নয়, কিন্তু কিতাবীদের নিকট মদ একটা সম্পদ। কোনো মুসলমান কোনো কিতাবীর মদ ঢেলে ফেললে সে তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে মূল্য দিতে বাধ্য কেননা তার মদ পান বৈধ। তাদের ধর্ম ও রীতিনীতি বর্জন করতে আমাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছে। তাই মদপানকারী কোনো কিতাবীকে শাস্তি দেয়া যাবেনা। যদিও তাদের ধর্মগ্রন্থে মদ হারাম

করা হয়েছে। তথাপি আমরা তাদেরকে স্বাধীনতা দেবো। কেননা তারা তাদের ধর্মের এই নিষেধাজ্ঞা মানেনা। তাদের সাথে আমাদের আচরণ হবে তাদের ধারণা বিশ্বাস অনুযায়ী, প্রকৃত সত্য যা রয়েছে, তদনুযায়ী নয়।

মদ দ্বারা চিকিৎসা

ইসলামের পূর্বে জাহেলিয়াত যুগে লোকেরা চিকিৎসার জন্য মদ পান করতো। ইসলাম এসে তাদেরকে মদ দ্বারা চিকিৎসা করাতে নিষেধ করলো এবং মদকে হারাম করে দিলো।

আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ ও তিরমিযি বর্ণনা করেছেন, তারেক বিন সুয়াইদ জা'ফি রসূলুল্লাহ সা. কে মদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। রসূলুল্লাহ সা. জবাবে তাকে মদ পান করতে নিষেধ করলেন। জাফি বললেন : আমরা তো এটা ওষুধ হিসেবে বানাই। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : "এটা ওষুধ নয়, বরং রোগ।"

আবুদ দারদা রা. থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "আল্লাহ তায়ালা রোগ ও ওষুধ, দু'টোই সৃষ্টি করেছেন। কাজেই ওষুধ দিয়ে রোগের চিকিৎসা করো, হারাম জিনিস দ্বারা রোগের চিকিৎসা করোনা।" ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যও লোকেরা ইসলাম পূর্বকালে কখনো কখনো মদ পান করতো। ইসলাম তাও নিষিদ্ধ করেছে। আবু দাউদ বর্ণনা করেন যে, দাইলাম হিময়ারি রসূলুল্লাহ সা.কে জিজ্ঞাসা করলেন : "হে রসূলুল্লাহ : আমরা একটা শীত প্রধান অঞ্চলে বাস করি। আমরা সেখানে অত্যন্ত কষ্টকরভাবে জীবন ধারণ করি। আমরা গম দিয়ে এমন এক পানীয় তৈরি করি, যা দ্বারা আমরা আমাদের কাজের শক্তি অর্জন করি এবং আমাদের দেশের শীতের মোকাবিলা করি। এতে কি কোনো অসুবিধা আছে? রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : এই পানীয়ে কি নেশা হয়?

হিময়ারি বললেন : হাঁ।
রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তাহলে এটা পরিত্যাগ করো।
হিময়ারি বললেন : লোকেরা তো এটা ছাড়তে চাইছেনা।

রসূলুল্লাহ সা. বললেন : লোকেরা যদি ছাড়তে না চায় তবে তাদের সাথে যুদ্ধ করো।

কোনো কোনো আলেম মদ দ্বারা রোগের চিকিৎসার অনুমতি দিয়েছেন। তবে এই শর্তে অনুমতি দিয়েছেন যে, কোনো হালাল জিনিস থেকে তৈরি বিকল্প ওষুধ যদি পাওয়া না যায়। যার চিকিৎসা করা হচ্ছে, আনন্দ উপভোগ ও নেশা করা যেন তার উদ্দেশ্য না হয় এবং চিকিৎসক যে পরিমাণ নির্ধারণ করে তার চেয়ে বেশি যেন সেবন করা না হয়। যে পরিস্থিতিতে অনন্যোপায় হয়ে মদ পান করার অনুমতি রয়েছে, ঠিক সে রকম পরিস্থিতিতে মদ দ্বারা চিকিৎসা করার অনুমতি রয়েছে। ফকিহগণ এর উদাহরণ দিয়েছেন এভাবে : যেমন কোনো ব্যক্তির গলায় খাবারের গ্রাস আটকে গেলো এবং গ্রাসটি গলার নিচে সরিয়ে দিতে মদ ব্যতীত আর কিছু পাচ্ছে না অথবা প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কেউ মরতে বসেছে এবং এক গ্লাস বা এক চুমুক মদ পান করা ব্যতীত মৃত্যু ঠেকানোর আর কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছেনা, অথবা কেউ হৃদ রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে পড়েছে, এমতাবস্থায় জানতে পারলো বা চিকিৎসক তাকে জানালো যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ মদ পান করা ব্যতীত এই আশংকা দূর করার আর কোনো উপায় নেই।

৩. ব্যভিচারের শাস্তি

১. ইসলাম বিয়ে করার আহ্বান জানিয়েছে, উদ্বুদ্ধ করেছে এবং একে জনপ্রিয় করেছে। কেননা এটা যৌন আবেগ প্রশমিত করার সবচেয়ে নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ পন্থা। বংশধর জন্ম দিয়ে স্বামী স্ত্রী মিলে তাকে লালন পালন করার অংগীকারের এটা সর্বোত্তম উপায়। স্নেহ মমতা, সম্মান, মর্যাদা ও পবিত্র সম্পর্ক লালনের এটা সবচেয়ে মহৎ রীতি। একমাত্র এই উপায়েই নতুন প্রজন্মকে তার দায়িত্ব পালনের এবং জীবনের মান উন্নত করার জন্য যথোপযুক্ত চেষ্টা সাধনা করার যোগ্য করে গড়ে তোলা সম্ভব।

২. ইসলাম একদিকে যেমন যৌন আবেগ ও উত্তেজনা প্রশমনের সর্বোত্তম পন্থা হিসেবে বিয়েকে নির্দিষ্ট করেছে। শরিয়ত বিরোধী পন্থায় এই আবেগের ব্যবহার রোধ করেছে এবং নির্দিষ্ট বৈধ পদ্ধতি থেকে বিপথগামী হওয়া ঠেকাতে অন্য কোনো পন্থায় এই আবেগকে উদ্দীপ্ত করা নিষিদ্ধ করেছে। অন্যদিকে অবাধ মেলামেশা, নাচ, অশ্লীল গান, উত্তেজক ছবি, কুদৃষ্টি নিক্ষেপ এবং যৌন উদ্দীপক ও অশ্লীলতার দিকে আহ্বানকারী প্রত্যেকটি কার্যকলাপকে নিষিদ্ধ করেছে, যাতে পরিবার ব্যবস্থাকে দুর্বলকারী উপকরণগুলো সমাজে অনুপ্রবেশ করতে না পারে।

৩. ইসলাম ব্যভিচারকে আইনের দৃষ্টিতে এমন অপরাধ সাব্যস্ত করেছে। যা সর্বোচ্চ শাস্তির উপযুক্ত। কেননা এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ এবং বহু অপরাধ ও অকল্যাণের জনক। তাই অবাধ ও অবৈধ যৌন সম্পর্ক শুধু যে অন্যায় ও ঘৃণ্য আচরণ তা নয়, বরং গোটা সমাজের ধ্বংসের কারণও বটে। আল্লাহ বলেন :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا ۝

“তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়োনা। এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।” অর্থাৎ ব্যভিচারের দিকে টেনে নিয়ে যায় এমন সব কার্যকলাপ, যথা অশ্লীল দৃষ্টি, স্পর্শ, চুমু ইত্যাদি থেকে দূরে থাকো। এভাবে আয়াতটি ব্যভিচারের নিকটবর্তী করে এমন কার্যকলাপকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করছে, সুতরাং ব্যভিচার তো অধিকতর কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

৪. ব্যভিচার মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর সংক্রামক ব্যাধিসমূহের বিস্তার ঘটার প্রত্যক্ষ কারণ। এসব রোগ শুধু যে সংক্রামক তা নয়, বরং পুরুষানুক্রমিকভাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়ে, যেমন গনোরিয়া, সিফিলিস, ফোঁড়া ও চর্মরোগ।

৫. ব্যভিচার হত্যার ন্যায় জঘন্য অপরাধের অন্যতম কারণ। কেননা আত্মসম্মানবোধ প্রত্যেক মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য। একজন সম্ভ্রমী পুরুষ ও সতী নারী প্রায়ই যৌন বিকৃতি সহ্য করতে পারেনা। বরং প্রকৃত ব্যাপার হলো, একজন পুরুষ যখন দেখতে পায় যে, তার ও তার পরিবারের মান সম্ভ্রম কলংকিত ও ভূলুণ্ঠিত হয়েছে, তখন এই কলংক ধুয়ে পরিষ্কার করার জন্য সে রক্তপাত ছাড়া আর কোনো বিকল্প দেখতে পায়না।

৬. ব্যভিচার পরিবার ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেয়, দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয় এবং সন্তানদের লালন পালনকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়। ফলে সন্তানরা বিপথগামী, অপরাধপ্রবণ ও বখাটে হয়ে যায়।

৭. ব্যভিচারের ফলে বংশ পরিচয় বিনষ্ট হয় এবং উত্তরাধিকার বণ্টনের সময় প্রকৃত উত্তরাধিকারীরা সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়।

৮. ব্যভিচারের মাধ্যমে স্বামীকে প্রতারিত করা হয়। কেননা ব্যভিচার থেকে গর্ভে সন্তানও জন্ম নিতে পারে। ফলে স্বামী অন্যের সন্তানকে নিজের মনে করে লালন পালন করে।

৯. ব্যভিচার একটা সাময়িক সম্পর্ক। এর কোনো দায়দায়িত্ব কেউ গ্রহণ করেনা। কাজেই এটা নিছক একটা পাশবিক কাজ, যা থেকে সম্ভ্রান্ত মানুষ মাত্রই দূরে থাকে।

মোটকথা, বৈজ্ঞানিকভাবে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, ব্যভিচারের ক্ষয়ক্ষতি অতীব ভয়াবহ। এটি সমাজে চরম বিশৃংখলা, অরাজকতা, সর্বাধিক প্রাণঘাতী রোগব্যাধি, চিরকুমারত্ব ও পরকীয়া সম্পর্কের বিস্তার ঘটায়। এসব কারণেই ইসলাম ব্যভিচারের শাস্তিকে সবচেয়ে নিষ্ঠুর শাস্তি হিসেবে নির্ধারণ করেছে। আর যে অপরাধের শাস্তি এত কঠোর, তা থেকে সৃষ্টি হওয়া অপরাধের কুফল সমাজের জন্য আরো বেশি ধ্বংসাত্মক হতে বাধ্য। অপরাধ দ্বারা অপরাধীর যতটুকু ক্ষতি হয় এবং সমাজের যতটুকু ক্ষতি হয়, ইসলাম উভয় ক্ষতির তুলনা করে এবং যে ক্ষতি অপেক্ষাকৃত হাল্কা, তার আলোকে ফায়সালা করে। বস্তুতঃ এটাই সুবিচার।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, ব্যভিচারীর শাস্তির ক্ষতিকে সমাজের ক্ষতি দ্বারা পরিমাপ করা যাবেনা অর্থাৎ সমাজে যে ব্যভিচার, অশ্লীলতা ও পাপাচারের বিস্তার ঘটে, তা দ্বারা পরিমাপ করা যায় না। ব্যভিচারের শাস্তি দ্বারা যদি বা ব্যভিচারকারী নিজে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ও, কিন্তু এই শাস্তি প্রয়োগ অনেক প্রাণ, অনেক মান সম্ভ্রম ও অনেক পরিবার সুরক্ষিত হয়। এই পরিবারগুলোই হচ্ছে সমাজের ভিত্তি প্রস্তর। এগুলো ভালো থাকলে সমাজ ভালো থাকে, খারাপ হলে সমাজ খারাপ হয়। জাতির শ্রেষ্ঠত্বের নিয়ামক হচ্ছে তার চরিত্রের পবিত্রতা, তার সুমহান আচার আচরণ এবং নৈতিক অধোপতন ও নোংরামি থেকে তার মুক্তি ও পবিত্রতা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইসলাম সমাজকে এই ব্যভিচারের পংকিলতা থেকে মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে একদিকে যেমন বিয়ের প্রচলন করেছে, অপরদিকে তেমনি একাধিক বিয়েরও অনুমতি দিয়েছে, যাতে বৈধ পথে থাকতে কোনো সংকীর্ণতা না থাকে এবং প্রশস্ততা থাকে। আর যাতে এই অপরাধকারী কোনো ওজর ও অজুহাত দেখাতে না পারে। আর ব্যভিচারের শাস্তির কঠোরতা দিয়ে ব্যভিচারীদেরকে যতখানি ভীত ও আতংকিত করেছে, এই শাস্তি কার্যকরকরণে ততখানি সতর্কতাও অবলম্বন করেছে। যেমন :

১. বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ থাকলে শাস্তি মওকুফ করেছে। অপরাধ সংঘটিত হওয়া সুনিশ্চিত হওয়া ব্যতীত 'হদ' কার্যকরী করা হয়না।

২. চারজন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ পুরুষ সাক্ষীর সাক্ষ্য এই অপরাধ প্রমাণের জন্য অপরিহার্য। মহিলা ও অসৎ লোকদের সাক্ষ্য এক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়না।

৩. ব্যভিচারের কাজটি সকল সাক্ষীর স্বচোক্ষে প্রত্যক্ষ করা জরুরি। সুর্মার শলাকা যেমন সুর্মাদানীতে ঢুকে, ঠিক তেমনি যোনীতে পুরুষাংগ ঢুকেছে দেখা চাই। এভাবে চাক্ষুস দেখার শর্তের কড়াকড়ির কারণে অপরাধ প্রমাণিত হওয়া দুরূহ হয়ে পড়ে।

৪. যদি তিনজন সাক্ষী এভাবে চাক্ষুস সাক্ষ্য দেয় কিন্তু চতুর্থজন তাদের বিপরীত সাক্ষ্য দেয় অথবা চারজনের একজন সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে বাকি তিন সাক্ষীর উপর মিথ্যা অপবাদের শাস্তি আশি বেত্রাঘাত কার্যকর হবে।

এ অপরাধ প্রমাণে ইসলাম এই যে, সতর্কতা অবলম্বন করেছে, এর ফলে অপরাধটি

অকাট্যভাবে প্রমাণিত হওয়া সুনিশ্চিত হয়। ফলে এই শাস্তির যথার্থতা ও কার্যকারিতার চেয়ে এর ভীতি ও আতংক সৃষ্টির ক্ষমতা অনেক বেশি। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয়ে হদ কার্যকর হওয়া যখন এতোই বিরল ঘটনা, তখন ইসলাম এটি চালু করেছে কেন? এর জবাব এই যে, মানুষ যখন শাস্তির ভয়াবহতা লক্ষ্য করে, তখন অপরাধে লিপ্ত হওয়ার আগে হাজার বার চিন্তা করতে বাধ্য হয়। বস্তুত: এ অপরাধের জন্য এটা এক ধরনের প্রবল ভীতি প্রদর্শন। যেহেতু যৌন আবেগ মানুষের একটা অতি প্রবল আবেগ, তাই শাস্তির কঠোরতা দিয়ে এই আবেগের প্রবণতাকে রোধ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ব্যভিচার নিষিদ্ধকরণে পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা

বহু ফকিহ মনে করেন, ব্যভিচারের শাস্তি নির্ধারণে পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যেমন করা হয়েছে রোযা ফরযকরণে ও মদ নিষিদ্ধকরণে। শুরুতে ব্যভিচারের শাস্তি ছিলো শুধুমাত্র তিরস্কার ও ভর্ৎসনা। আল্লাহ্ বলেন :

وَالَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ۗ

অর্থ : তোমাদের মধ্য হতে যে দু'জন এ কাজে লিপ্ত হবে (অর্থাৎ ব্যভিচারে) তাদেরকে তোমরা শাসন করবে। এতে যদি তারা উভয়ে তওবা করে ও নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়, তবে তাদেরকে রেহাই দেবে।" (সূরা নিসা : আয়াত ১৬)

এরপর বিধিটি এখান থেকে বাড়ির ভেতরে অবরুদ্ধ করে রাখায় উন্নীত হয়। আল্লাহ্ বলেন :

وَالّٰتِيْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ۝

অর্থ : তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হতে চারজন সাক্ষী তলব করবে। যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদেরকে গৃহে অবরুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয়, অথবা আল্লাহ্ তাদের জন্য অন্য কোনো ব্যবস্থা করেন।" (সূরা নিসা : আয়াত ১৫)

এরপর পরিস্থিতি স্থিতিশীল হলো এবং আল্লাহ্ অন্য ব্যবস্থা করলেন। এ পর্যায়ে অবিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি একশো বেত্রাঘাত ও বিবাহিতের শাস্তি মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত রজম (প্রস্তর নিক্ষেপ) নির্ধারণ করলেন। এই পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিলো মানব সমাজ উন্নয়ন ও বিকাশের সুযোগ পাক এবং তাকে নম্রতা ও সহযোগিতার মধ্যদিয়ে সততা ও পবিত্রতার দিকে নিয়ে যাওয়া হোক, যেনো এই পরিবর্তনটা মানুষের জন্য দুরূহ না হয় এবং ইসলামের ব্যাপারে তারা কোনো কঠোরতার সম্মুখীন না হয়। এ বিষয়ে উবাদা ইবনুল সামেত বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণ দর্শানো হয়েছে :

রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : তোমরা আমার কাছ থেকে নিয়ে নাও। আল্লাহ্ তাদের জন্য অন্য ব্যবস্থা করেছেন। অবিবাহিত নারীর সাথে অবিবাহিত পুরুষ ব্যভিচার করলে তার শাস্তি একশো বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশ থেকে বহিষ্কার। আর বিবাহিতের সাথে বিবাহিতের ব্যভিচারের শাস্তি একশো বেত্রাঘাত ও রজম। -মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি।

দৃশ্যত: আমাদের নিকট প্রতীয়মান হচ্ছে, এ আয়াত দুটো (সূরা নিসা, ১৫ ও ১৬) নারী সমকাম ও পুরুষ সমকামের বিধান বর্ণনা করেছে। এই দুটির বিধান সূরা নূরে বর্ণিত ব্যভিচারের বিধান থেকে পৃথক।

১. প্রথম আয়াতের মর্ম হলো : যে সমস্ত নারী অশ্লীল কাজে লিপ্ত হবে, অর্থাৎ নারীর সাথে নারী সমকামে লিপ্ত হবে, তাদের ব্যাপারে চারজন পুরুষের সাক্ষ্য তলব করো। চারজন পুরুষ সাক্ষ্য দিলে তাদেরকে গৃহে এমনভাবে অন্তরীণ করো যেন সমকামী নারীদ্বয়ের একজন অপর জন থেকে দূরে থাকে, যতক্ষণ না সে মারা যায় অথবা তওবার মাধ্যমে বা বিয়ের মাধ্যমে সমকাম থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে অন্তরীণাবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার বিকল্প পথ আল্লাহ তৈরি করে দেন।

২. দ্বিতীয় আয়াতের মর্ম হলো, যে দু'জন পুরুষ অশ্লীল কাজ করবে, অর্থাৎ সমকাম করবে, তাদের এই অপকর্ম সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার পর তাদেরকে শাস্তি দাও। শরয়ি হদ কার্যকরী করার মাধ্যমে তাদের উভয়কে শাস্তি দেয়ার আগেই যদি তারা তওবা করে ও নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়, তাহলে তাদের ওপর শাস্তি কার্যকর করা থেকে বিরত হও ও তাদেরকে রেহাই দাও।

যে ব্যভিচারের শাস্তি অপরিহার্য

শরিয়ত বিরোধী যে কোনো যৌন সম্ভোগ ব্যভিচার হিসেবে গণ্য এবং তার উপর নির্ধারিত শাস্তি কার্যকরী হবে। কেননা যেসব অপরাধের জন্য শরিয়ত শাস্তি নির্ধারণ করেছে, এটা তার অন্যতম। যে নারীর সাথে সংগম করা সম্পূর্ণ অবৈধ এবং যার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক থাকার কোনোই সন্দেহ নেই, সেই নারীর যোনিতে পুরুষাংগের অগ্রভাগ বা তার যতটুকু অংশের চামড়া কাটা হয়, ততটুকু অংশ ঢুকে গেলেই শাস্তিযোগ্য ব্যভিচার সম্পন্ন হবে, চাই বীর্যপাত হোক বা না হোক। যে নারীর সাথে সংগম অবৈধ, তার যোনি ব্যতীত অন্য কোথাও কামোত্তেজনা চরিতার্থ করলে ব্যভিচারের জন্য নির্ধারিত শাস্তি প্রযোজ্য হবেনা। তবে তাকে তা'যীর (অর্থাৎ অন্য কোনো শাস্তি) দিতে হবে। কেননা ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত :

এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সা. এর কাছে এসে বললো : আমি মদিনার উপকণ্ঠ থেকে আগত এক মহিলার চিকিৎসা করেছিলাম। চিকিৎসার সময়ে তার সাথে অবৈধ কাজ করেছি, তবে সংগম করিনি। এখন আমি উপস্থিত। আমার উপর যা ইচ্ছা কার্যকরী করুন। উমর রা. বললেন : "আল্লাহ তোমাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। তুমিও নিজেকে লুকিয়ে রাখলেই পারতে।" রসূলুল্লাহ সা. কোনো জবাব দিলেন না। তাই লোকটি রওনা হলো। তৎক্ষণাত রসূলুল্লাহ সা. তার পিছু পিছু একজনকে পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনলেন। অতপর তাকে এই আয়াতটি পড়ে শুনালেন :

وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ۝

"দিনের দুই প্রান্ত ভাগে ও রাতের প্রথমাংশে নামায কায়েম করবে। সৎ কর্ম অবশ্যই অসৎ কর্ম মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে এটা তাদের জন্য এক উপদেশ।" উপস্থিত জনতার মধ্য থেকে একজন জিজ্ঞাসা করলো : হে রসূলুল্লাহ, এটা কি শুধু এই ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট, না সকলের জন্য? রসূলুল্লাহ সা. বললেন : সকলের জন্য।" -মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি।

ব্যভিচারীদের শ্রেণীভেদ

ব্যভিচারী দু'রকমের : বিবাহিত ও অবিবাহিত। উভয়ের জন্য পৃথক পৃথক বিধান রয়েছে :

অবিবাহিতের শাস্তি

ফকিহগণ একমত হয়ে বলেছেন : স্বাধীন অবিবাহিত পুরুষ বা নারী ব্যভিচার করলে তাকে একশো বেত্রাঘাত করা হবে। কেননা আল্লাহ্ সূরা নূরে বলেছেন :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ○

"ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী এদের প্রত্যেককে একশত কষাঘাত করবে, আল্লাহর বিধান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও, মুমিনদের একটি দল যেনো তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।"

এ আয়াতে শরিয়ত নির্ধারিত শাস্তিকে অকার্যকর রাখার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা উচ্চারিত হয়েছে। কারো কারো মতে, প্রহারকে এতটা হাল্কা করতে নিষেধ করা হয়েছে, যাতে অপরাধী গুরুত্বপূর্ণভাবে ব্যথা অনুভব না করে। শাস্তি কার্যকর করার সময় কতজন তা প্রত্যক্ষ করবে, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন : তিনজন বা তার বেশি। কেউ বলেন : সাক্ষীরা ছাড়া চারজন থাকা চাই। আবু হানিফা বলেন : শাস্তি যদি সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হয়, তাহলে শাসক ও সাক্ষীরা থাকলে চলবে।

বেত্রাঘাত ও নির্বাসনের একত্রীকরণ : ফকিহগণ যদিও বেত্রাঘাতের অপরিহার্যতা সম্পর্কে একমত হয়েছেন, কিন্তু তারা এর সাথে নির্বাসন দণ্ডের সংযোজন বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন :

১. শাফেয়ি ও আহমদ বলেছেন : একশকোটি বেত্রাঘাতের সাথে এক বছরের নির্বাসনও দিতে হবে। কেননা বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত :

"জনৈক বেদুইন রসূলুল্লাহ্ সা. এর নিকট এলো এবং বললো : হে রসূলুল্লাহ্, আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, আমার ব্যাপারে আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফায়সালা করে দিন। তার অপর প্রতিপক্ষ তার চেয়ে অধিক অভিজ্ঞ ছিলো। সে বললো : জ্বি হা, আমারও একই কথা। আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করে দিন এবং আমাকে ঘটনার বিবরণ বলার অনুমতি দিন। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন : বলো। সে বললো : আমার ছেলে এই ব্যক্তির বাড়িতে মজুর খাটতো। সে তার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করেছে। আমি শুনেছি, আমার ছেলের 'রজম' এর শাস্তি প্রাপ্য। তাকে সে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য আমি একশো ছাগল ও একজন ক্রীতদাসী মুক্তিপণ হিসেবে এনেছি। পরে জ্ঞানীজনদেরকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, আমার ছেলের প্রাপ্য শাস্তি রজম নয়, একশো বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন। আর এই ব্যক্তির স্ত্রীর প্রাপ্য রজম। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন : আমি অবশ্যই তোমাদের দু'জনের ব্যাপারে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করবো। ছাগলের পাল ও ক্রীতদাসী তুমি ফেরত পাবে। আর তোমার ছেলে পাবে একশো বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন। আর বনু আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বললেন : "হে উজাইস, তুমি এই ব্যক্তির স্ত্রীর নিকট যাও, সে যদি

ব্যভিচারের কথা স্বীকার করে, তবে তাকে রজম করো। লোকটি তার স্ত্রীর কাছে গেলো এবং সে স্বীকারোক্তি করলো। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ সা. তাকে রজম করার আদেশ দিলেন এবং রজম করা হলো।"

বুখারি আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেন : "রসূলুল্লাহ্ সা. অবিবাহিত ব্যভিচারীকে এক বছরের জন্য নির্বাসন ও তার উপর 'হদ' (বেত্রাঘাত) কার্যকর করার আদেশ দিয়েছেন।"

খুলাফায়ে রাশেদীনের সকলেই নির্বাসন দণ্ড কার্যকর করেছেন। কেউ এর বিরোধিতা করেনি। আবু বকর সিদ্দীক রা. ফিদিক অঞ্চলে, উমার ফারুক রা. সিরিয়ায়, উসমান রা. মিশরে ও আলী রা. বসরায় নির্বাসিত করতেন। বেত্রদণ্ড ও নির্বাসন দণ্ড এ দুটির কোন্‌টি আগে ও কোন্‌টি পরে কার্যকর করা হবে, সে ব্যাপারে শাফেয়িরা কোনো ধরা বাঁধা নিয়ম মানা জরুরি মনে করেন না। যে কোনোটা আগে বা পরে করা যায়। তবে নির্বাসনের ক্ষেত্রে শর্ত আরোপিত হয়েছে যে, নামায কসর করা যায় এতটা দূরত্বে করা চাই। কেননা এর উদ্দেশ্য হলো, তার নিজ আবাসিক এলাকা ও আপনজনদের থেকে তাকে দূরে সরিয়ে দেয়া। নামাযের কসর হয়না এমন দূরত্বকে নিজের আবাসিক এলাকা গণ্য করা হয়। শাসক যদি তাকে আরো বেশি দূরত্বে নির্বাসন করা ভালো মনে করেন, তবে করতে পারেন। মহিলাকে নির্বাসিত করতে হলে স্বামী কিংবা মুহাররম ব্যক্তিকে তার সাথে পাঠাতে হবে। যদি সে মজুরি ব্যতীত যেতে না চায়, তবে মজুরি দেয়া বাধ্যতামূলক হবে এবং তা মহিলার সম্পদ থেকে আদায় করে দেয়া হবে।

২. ইমাম মালেক ও আওযায়ি বলেছেন : অবিবাহিত স্বাধীন পুরুষ ব্যভিচারীকে নির্বাসন দেয়া ওয়াজিব, অবিবাহিত স্বাধীন নারী ব্যভিচারিণীকে নয়। নারীকে নির্বাসিত করা হবেনা। কেননা নারী পর্দার বিধানের অধীন। (অজানা বিদেশ ভূমিতে পর্দা মেনে চলার সম্ভাবনা অনিশ্চিত।)

৩. আবু হানিফা র. বলেছেন : নারীর ক্ষেত্রে বেত্রদণ্ডের সাথে নির্বাসন দণ্ড যুক্ত করা হবেনা। অবশ্য শাসক এটাকে ভালো মনে করলে যত দূরত্বে পাঠানো ভালো মনে করেন পাঠাতে পারেন।

বিবাহিত ব্যক্তির 'হদ'

বিবাহিত ব্যক্তির ব্যাপারে ফকিহগণ একমত, সে ব্যভিচার করলে তাকে 'রজম' (পাথর নিক্ষেপ) করে হত্যা করা ওয়াজিব, চাই সে পুরুষ হোক বা স্ত্রী হোক। এর প্রমাণ হিসাবে তারা উল্লেখ করেন :

১. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ্ সা. মসজিদে নববীতে ছিলেন। এ সময় এক ব্যক্তি তার কাছে এসে বললো : হে রসূলুল্লাহ্, আমি ব্যভিচার করেছি। রসূলুল্লাহ্ সা. তার কথা উপেক্ষা করলেন। সে চারবার তার কথা পুনরাবৃত্তি করলো। সে যখন চারবার নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলো, তখন রসূলুল্লাহ্ সা. তাকে কাছে ডাকলেন এবং বললেন : তুমি কি পাগল? সে বললো : না। তিনি আবার বললেন : তুমি কি বিবাহিত? সে বললো : হাঁ। তখন রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন : তোমরা ওকে নিয়ে যাও এবং রজম করো। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেছেন : এই লোকটিকে যারা রজম করেছিল, আমিও তাদের মধ্যে ছিলাম। আমরা তাকে ঈদের নামাযের মাঠে রজম করছিলাম। পাথরের আঘাতে জর্জরিত হয়ে এক সময়ে সে দৌড়ে পালাতে লাগলো। আমরা তাকে হাররাতে ধরে ফেললাম এবং

রজম করে হত্যা করলাম। (বুখারি ও মুসলিম)। এ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, একবার স্বীকারোক্তি করলেই বিবাহিত হওয়া প্রমাণিত হয় এবং 'হাঁ' বলা দ্বারাই স্বীকারোক্তি করা হয়।

২. ইবনে আব্বাস রা. বলেন : উমর রা. ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন : আল্লাহ মুহাম্মদ সা.কে সত্য দীন সহকারে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর উপর কিতাব নাযিল করেছেন। তাঁর উপর যা কিছু নাযিল হয়েছে, তার মধ্যে রজমের আয়াত ছিলো। আমরা সে আয়াত পড়েছি এবং অনুধাবন ও মুখস্থ করেছি। রসূলুল্লাহ সা. রজম কার্যকর করেছেন, আমরাও করেছি। আমার আশংকা হয়, দীর্ঘকাল পেরিয়ে গেলে কেউ বলে বসে কিনা : "আল্লাহর কিতাবে তো আমরা রজম পাইনা।" তারপর তারা আল্লাহর নাযিলকৃত একটা ফরয কাজ পরিত্যাগ করে বিপথগামী হয়ে না যায়! নারী বা পুরুষ যেই হোক, সে যদি বিবাহিত হয় ও ব্যভিচার করে এবং যদি তার বিরুদ্ধে সাক্ষী, স্বীকারোক্তি অথবা গর্ভ পাওয়া যায়, তবে তার উপর রজম কার্যকর করা অপরিহার্য। আল্লাহর কসম, এ আশংকা যদি না থাকতো যে, জনগণ বলবে, উমর আল্লাহর কিতাবে একটি আয়াত সংযোজন করেছে, তাহলে আমি এ আয়াতটা লিখে দিতাম।" -বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী।

নাইলুল আওতারে বলা হয়েছে : রজম এমন একটি বিষয় যার উপর ইজমা (সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত) হয়েছে। কেবল খারেজীদের সম্পর্কে জানা যায়, তারা এটিকে নিষ্প্রয়োজন মনে করতো। কিছু কিছু মুতাযেলীও একটি নিষ্প্রয়োজন মনে করতো। তবে "কুরআনে এর উল্লেখ নেই" বলা ছাড়া এর স্বপক্ষে আর কোনো যুক্তি প্রমাণ তারা দিতে পারেনি। অথচ এই যুক্তি বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। কেননা সর্বস্বীকৃত মুতাওয়াতির হাদিস দ্বারা এটা প্রমাণিত। কেননা উমর রা. বিপুল সংখ্যক লোকের সামনে বলেছেন : "রসূলুল্লাহ সা. এর উপর নাযিলকৃত ওহির মধ্যে রজমের আয়াতও ছিলো, আমরা সেটি পড়েছি এবং মুখস্থও করেছি। রসূলুল্লাহ সা. নিজেও রজম কার্যকর করেছেন, আর তাঁর পরবর্তী সময়ে আমরাও এটি কার্যকর করেছি।"

কোনো আয়াতের তেলাওয়াত রহিত হলেই তার বিধিও রহিত হবে, এটা অপরিহার্য নয়। আবু দাউদ ইবনে আব্বাস রা. থেকে এ উক্তি বর্ণনা করেছেন। আহমদ ও তাবরানি বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর নাযিলকৃত কুরআনে এ আয়াতটি ছিলো :

الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ بِمَا قَضَيَا مِنَ اللَّذَّةِ ○

"কোনো বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা যখন ব্যভিচার করে, তখন তারা যে আনন্দ উপভোগ করেছে তদ্রূপ তাদের উভয়কে অবশ্যই রজম করবে।" আর ইবনে হাব্বান উবাই বিন কা'ব এর এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন :

"সূরা আহযাব ইতিপূর্বে সূরা বাকারার মতো বড় ছিলো এবং তাতে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা সংক্রান্ত আয়াতটি ছিলো।

রজমের শর্তাবলী

বিবাহিত ব্যভিচারীর উপর রজম কার্যকর করতে নিম্নলিখিত শর্তাসমূহ পূরণ জরুরি :

১. ব্যভিচারকারীর প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থমস্তিষ্ক হওয়া চাই। পাগল ও অপ্রাপ্তবয়স্ক হলে 'হদ' নয়, তাযীর (অপেক্ষাকৃত হাল্কা যে কোনো শাস্তি) কার্যকর করতে হবে।

২. ব্যভিচারীর স্বাধীন হওয়া চাই। দাস বা দাসী হলে তার উপর রজম কার্যকরী করা হবেনা। কেননা আল্লাহ দাসীর শাস্তি সম্পর্কে বলেছেন :

فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ○

"তারা (দাসীরা) যদি ব্যভিচার করে, তবে তার উপর কার্যকর হবে স্বাধীন নারীদের অর্ধেক শাস্তি।" যেহেতু রজম কম বা বেশি হতে পারেনা, তাই এখানে 'শাস্তি' দ্বারা রজম নয়, বেত্রদণ্ড বুঝানো হয়েছে।

৩. ইতিপূর্বে বিশুদ্ধভাবে বিয়ে করেছে ও সহবাস করেছে এমন হওয়া চাই। চাই বীর্যপাত করুক বা না করুক। এমনকি হায়েয বা ইহ্রাম অবস্থায় সহবাস করে থাকলেও শর্ত পূরণ হবে। তবে বিয়ে যদি অবৈধ হয়ে থাকে, তাহলে রজমের শর্ত পূরণ হবেনা। বিবাহিত হওয়ার শর্ত পূরণের জন্য বিয়ে টিকে থাকা জরুরি নয়। সে যদি একবার বিধিসম্মতভাবে বিয়ে করে থাকে এবং স্ত্রীর সাথে সহবাস করে থাকে, তারপর বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়ে থাকে, তারপর নতুন কোনো বিয়ে না করেই ব্যভিচার করে, তাহলেও তাকে রজম করা হবে। বিবাহিত নারীর বেলায় একই কথা প্রযোজ্য। তার যদি একবার বিয়ে হয়ে থাকে, তারপর তাকে তালাক দেয়া হয়ে থাকে এবং তালাকের পর ব্যভিচার করে, তাহলে তাকে বিবাহিত গণ্য করা হবে এবং রজম করা হবে।

ব্যভিচারের শাস্তিতে মুসলমান ও অমুসলমান সমান

ব্যভিচার প্রমাণিত হলে মুসলমানের উপর যেমন 'হদ' কার্যকর করতে হবে, তেমনি অমুসলিম বা ইসলাম ত্যাগীর উপরও। কেননা মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিকও দেশের প্রচলিত আইন মেনে চলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সা. দু'জন ইহুদী বিবাহিত ব্যভিচারীকে রজম করেছেন। ইসলাম ত্যাগীর (মুরতাদ) উপর ইসলামের আইন কানুন কার্যকর হবে। তার মুরতাদ হওয়ার কারণে সে আইন কানুনের দায়মুক্ত নয় এবং তার কার্যকরিতা থেকে সে অব্যাহতি পাবেনা।

ইবনে উমর রা. থেকে বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন : ইহুদীরা তাদের মধ্য থেকে দু'জন ব্যভিচারী নারী ও পুরুষকে নিয়ে রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট এলো। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তোমাদের কিতাবে কী আছে? তারা বললো : উভয়ের মুখে কালি মেখে অপমাণিত করা হবে। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তোমরা মিথ্যা বলেছ। নিশ্চয়ই তাতে রজম রয়েছে। যাও, তাওরাত নিয়ে এসো এবং তা পাঠ করো, যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো। তারা নিজেদের মধ্য থেকে একজন পাঠকও নিয়ে এলো। সে পাঠ করলো। একটা জায়গায় এলে সে তার উপর হাত রাখলো। তাকে বলা হলো : তোমার হাত উঠাও। সে হাত উঠালে জায়গাটিতে যা লেখা ছিলো বেরিয়ে পড়লো। সে বললো : হে মুহাম্মদ, এখানে রজম রয়েছে। তবে আমরা এটিকে নিজেদের মধ্যে লুকিয়ে রাখতাম। অতঃপর রসূলুল্লাহ সা.-এর আদেশে উভয়কে রজম করা হলো। ইবনে উমর রা. বলেন : পুরুষটিকে আমি দেখলাম মহিলাটির উপর কুজো হয়ে তাকে পাথর থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে।

জাবের বিন আবদুল্লাহ বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. বনু আসলাম গোত্রের একজনকে ও ইহুদীদের একজনকে রজম করেছেন। -আহমদ ও মুসলিম।

বারা ইবনে আযেব রা. বলেন : রসূলুল্লাহ সা.-এর কাছ দিয়ে জনৈক বেত্রাঘাতপ্রাপ্ত ও মুখে কালি মাখানো ইহুদীকে নিয়ে যাওয়া হলো। রসূলুল্লাহ সা. তাদেরকে ডেকে বললেন : তোমরা কি তোমাদের কিতাবে ব্যভিচারের শাস্তি এ রকমই পাও? তারা বললো : হাঁ। রসূলুল্লাহ সা. তাদের মধ্য থেকে একজন আলেমকে ডাকলেন। তারপর তাকে বললেন : যে আল্লাহ মূসা আ. এর উপর তাওরাত নাযিল করেছেন, তার কসম দিয়ে তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি : তোমরা কি তোমাদের কিতাবে ব্যভিচারীর শাস্তি এ রকমই পাও? সে বললো : না। আপনি যদি কসম দিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা না করতেন, তবে আপনাকে রজমের শাস্তি সম্পর্কে জানাতামনা। কিন্তু আমাদের অভিজাত লোকদের মধ্যে এটা ব্যাপক হয়ে পড়েছে যে, যখন আমরা কোনো অভিজাত ব্যক্তিকে ধরতাম, তাকে ছেড়ে দিতাম। আর দুর্বলকে পেলে তার উপর শাস্তি কার্যকর করতাম। অবশেষে আমরা বললাম : এসো, আমরা এমন একটি জিনিসের উপর একমত হই, যা কুলীন ও অকুলীন উভয়ের উপর কার্যকর করতে পারবো। অতপর আমরা মুখে কালি মাখানো ও বেত্রাঘাতকে রজমের বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করলাম। তখন রসূলুল্লাহ সা. বললেন : "হে আল্লাহ, ওরা যখন তোমার বিধানকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলেছিল, তখন আমিই সর্বপ্রথম তা পুনরুজ্জীবিত করলাম।" অতপর সেই ব্যক্তিকে রজম করার নির্দেশ দিলেন এবং রজম করা হলো। তখন এ আয়াত নাযিল হলো :

يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ○

"হে রাসূল, তোমাকে যেন দুঃখ না দেয় যারা কুফরীর দিকে দ্রুত ধাবিত হয়- যারা মুখে বলে "ঈমান এনেছি", অথচ তাদের অন্তর ঈমান আনেনা এবং ইহুদীদের মধ্যে যারা অসত্য শ্রবণে তৎপর, তোমার নিকট আসেনা এমন এক ভিন্ন দলের পক্ষে যারা কান পেতে থাকে। শব্দগুলো যথাযথ সুবিন্যস্ত থাকার পরেও তারা সেগুলোর অর্থ বিকৃত করে; তারা বলে : এই রকম বিধান দিলে গ্রহণ করো এবং তা না দিলে বর্জন করো।" অর্থাৎ তারা বলে : (ব্যভিচারীর বিচারের জন্য) মুহাম্মদের নিকট এসো। মুহাম্মদ সা. যদি তোমাদেরকে মুখে কালি লেপন ও বেত্রদণ্ড কার্যকর করার আদেশ দেয় তবে তা মেনে নিও, আর যদি রজম করার আদেশ দেয় তবে তা বর্জন করো। এই পর্যায়ে আল্লাহ নাযিল করলেন :

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ○ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ○ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ○

(যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করেনা, সে কাফের। যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করেনা সে যালেম। যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করেনা সে ফাসেক।) ইবনে উমর রা. বলেন : এটা সকল কাফেরের বেলায়ই প্রযোজ্য। (আহমদ, আবু দাউদ ও মুসলিম) ইমাম নববী বলেন : ইহুদীদ্বয়কে রজম করা হয়েছিল তাদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে। রজম সম্পর্কে তাওরাতে যেসব উক্তি রয়েছে তার কিছু উদ্ধৃতি : "যখন কোনো পুরুষকে অন্য কোনো পুরুষের স্ত্রীর

সাথে শায়িত দেখা যাবে, তখন দু'জনকেই হত্যা করা হবে। তাহলে ইসরাইলের অমংগল দূরীভূত হবে। আর যখন কারো বাগদত্তা কুমারী যুবতীকে শহরে একাকিনী পেয়ে কোনো ব্যক্তি তার সাথে শয়ন করে, তখন তাদের উভয়কে শহরের বাইরে নিয়ে যাও ও পাথর মেরে হত্যা করো। যুবতীকে এজন্য যে সে চিৎকার করে শহরবাসীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেনি। আর পুরুষকে এজন্য যে, সে তার বন্ধুর বাগদত্তাকে অপমানিত করেছে। তাদেরকে শাস্তি দিলে শহর থেকে দুর্বৃত্তপনা দূর হয়ে যাবে।" এটা তাওরাতের বাণী। বাইবেলে এই বাণীর বিরোধী কিছু নেই। তাই এটা মান্য করা খৃস্টানদের জন্যও জরুরি।)

ফকীহদের মতামত :

মুসলিম দেশের অনুগত নাগরিক নয় এমন অমুসলিম ব্যভিচারী অবিবাহিত হলে তাকে বেত্রদণ্ড দেয়া হবে। এ ব্যাপারে ফকিহগণ একমত। তবে বিবাহিত হলে তাকে রজম করা হবে কিনা তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। শাফেয়ি, আবু ইউসুফ ও কাসেমির মতে বিবাহিত কাফের যদি প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্ক হয়, স্বাধীন হয় এবং তার ধর্ম অনুসারে বিশুদ্ধভাবে বিয়ে করে থাকে, তাহলে তাকে রজম করা হবে। আবু হানিফা, মুহাম্মদ, যায়দ বিন আলী, নাসের ও ইমাম ইয়াহিয়ার মতে তাকে বেত্রদণ্ড দেয়া হবে, রজম নয়। কেননা তাদের নিকট রজমের জন্য মুসলমান হওয়া শর্ত। রসূলুল্লাহ সা. যে দু'জন ইহুদীকে রজম করেছিলেন, সেটি তাদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাত অনুসারে করেছিলেন। ইমাম মালেকের মতে তার উপর কোনো হদই কার্যকর করা হবেনা। তবে যে অমুসলিম মুসলিম দেশের অনুগত না হয়েও তার নিকট আশ্রয় প্রার্থী, তার উপর শাফেয়ি ও আবু ইউসুফ হদ কার্যকর করার পক্ষপাতী। কিন্তু মালেক, আবু হানিফা ও মুহাম্মদ হদ কার্যকর না করার পক্ষপাতী। ইবনে আবদুল বার বলেছেন, রজমের জন্য অবশ্যই মুসলমান হওয়া শর্ত। তবে শাফেয়ি ও আহমদ এই শর্ত আরোপ করেন না। রবীয়া ও শাফেয়ি মাযহাবের একাংশ মুসলমান হওয়ার শর্ত আরোপ করেন।

বেত্রদণ্ড ও রজম উভয়টি কার্যকরকরণ

ইবনে হাযম, ইসহাক বিন রাহওয়াই ও হাসান বসরীর মতে বিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচার করলে তাকে প্রথমে একশো বেত্রাঘাত করা হবে, তারপর মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত রজম (পাথর নিক্ষেপ) করা হবে। তারা প্রমাণ দর্শান মুসলিম, আবু দাউদ ও তিরমিযি কর্তৃক উবাদা ইবনে সামেত থেকে বর্ণিত এ হাদিস থেকে : "অবিবাহিত পুরুষ অবিবাহিত নারীর সাথে ব্যভিচার করলে একশো বেত্রাঘাত ও এক বছর নির্বাসন। আর বিবাহিত পুরুষ বিবাহিত নারীর সাথে ব্যভিচার করলে একশো বেত্রাঘাত ও রজম।"

আলী রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি শুরাহা নাম্মী মহিলাকে বৃহস্পতিবারে বেত্রাঘাত করলেন এবং শুক্রবারে রজম করলেন। তিনি বললেন : তাকে বেত্রদণ্ড দিচ্ছি আল্লাহর কিতাব অনুসারে আর রজম করছি রসূলুল্লাহ সা.-এর কথা অনুসারে। আবু হানিফা, মালেক ও শাফেয়ি বলেন : তাদের উপর বেত্রাঘাত ও রজম উভয়টা কার্যকর করা হবেনা। কেবল রজম করা জরুরি। আর ইমাম আহমদ থেকে দুটি মত বর্ণিত আছে। একটি মত উভয়টি কার্যকর করার পক্ষে অপরটি বিপক্ষে। তাদের প্রমাণ এই যে, রসূলুল্লাহ সা. মায়েয ও গামেদীকে এবং ইহুদীদ্বয়কে শুধু রজম করেছিলেন, বেত্রাঘাত করেননি। তিনি আনিস আসলামিকে বলেছিলেন, "মহিলা যদি স্বীকার করে তাহলে তাকে রজম করো।"

তাকে রজম করতে বলেননি। আর এটাই তার সর্বশেষ আদেশ। কেননা এ হাদিসের বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা, যিনি বিলম্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কাজেই তার বর্ণিত হাদিস দ্বারা রজম ও বেত্রাঘাত এ দুটির মধ্যে যেটি প্রথম চালু হয়েছে তা রহিত হবে। তারপর আবু বকর ও উমর রা. তাদের খিলাফতকালে রজম কার্যকর করেছেন, রজম ও বেত্রাঘাত উভয়টি কার্যকর করেননি। শায়খ দেহলবী মনে করেন, দুই হাদিসে কোনো বৈপরিত্য নেই এবং কোনো আদেশ রহিতও হয়নি। ব্যাপারটা শাসকের হাতে ন্যস্ত করা হবে। তিনি উভয়টি প্রয়োগ করলে করতে পারেন। তবে শুধু রজম করা মুস্তাহাব। কেননা রসূলুল্লাহ সা. শুধু রজম কার্যকর করেছেন। এর যৌক্তিকতা আমার দৃষ্টিতে এই যে, রজম অপরাধীর মৃত্যু ঘটায়। কাজেই প্রকৃত দমনমূলক পদক্ষেপ এ দ্বারাই গৃহীত হয়েছে। বেত্রাঘাত একটা বাড়তি শাস্তি, যা বাদ দেয়ার অনুমতি আছে। এটাই আমার আমার মতে রজমকে যথেষ্ট মনে করার কারণ।

ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগের শর্তাবলী

ব্যভিচারের শাস্তি কার্যকর করার জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলী পূরণ জরুরি :

১. সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়া ২. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া ৩. স্বাধীন হওয়া ৪. ব্যভিচার হারাম একথা জানা।

সুতরাং অপ্রাপ্তবয়স্ককে ব্যভিচারের শাস্তি দেয়া হবেনা, (তবে অপেক্ষাকৃত হাল্কা দমনমূলক শাস্তি দেয়া হবে) পাগলকে শাস্তি দেয়া হবেনা এবং যাকে ব্যভিচারে বাধ্য করা হয়েছে তাকেও শাস্তি দেয়া হবেনা। কেননা আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তিন ব্যক্তি দায়মুক্ত : ১. ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ জাগ্রত না হয় ২. অপ্রাপ্তবয়স্ক যতক্ষণ প্রাপ্তবয়স্ক না হয় ৩. পাগল যতক্ষণ সুস্থ মস্তিষ্ক না হয়। ব্যভিচার হারাম জানা শর্ত এ জন্য যে, শরিয়ত নির্ধারিত শাস্তি বা 'হদ' হারাম কাজের জন্যই নির্দিষ্ট। অথচ সে হারাম কাজ করেনি। রসূলুল্লাহ সা. মায়েযকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমি কি জানো ব্যভিচার কী? তাছাড়া বর্ণিত হয়েছে, জনৈকা নিগ্রো দাসীকে উমর রা. এর নিকট আনা হলো এবং অভিযোগ করা হলো যে, সে ব্যভিচার করেছে। উমর রা. তাকে চাবুক দিয়ে ক'টা আঘাত করে বললেন : "কোন্ ইতরের সাথে যেনা করেছিস?" সে বললো : গাউসের সাথে দুই দিরহামের বিনিময়ে। (গাউস এক ব্যক্তির নাম) উমর রা. তার পাশে থাকা আলী, উসমান ও আবদুর রহমান বিন আওফকে জিজ্ঞাসা করলেন : আপনারা কী মনে করেন?

আলী রা. বললেন : আমি মনে করি, ওকে রজম করুন।

আবদুর রহমান বললেন : আলী যা বললেন ওটাই আমার মত।

উসমান রা. বললেন : আমার মনে হচ্ছে দাসীটি যা করেছে, তাকে আপনি সহজভাবে গ্রহণ করুন। কারণ সে একে দূষণীয় মনে করেনি। আল্লাহ তার জন্যই 'হদ' নির্ধারণ করেছেন, যে আল্লাহর বিধান জানে।"

উমর রা. বললেন : আপনি সঠিক বলেছেন।

ব্যভিচার কিভাবে প্রমাণিত হবে?

ব্যভিচার স্বীকারোক্তি অথবা সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হবে।

স্বীকারোক্তি দ্বারা ব্যভিচার প্রমাণিত হওয়া

স্বীকারোক্তিকে বলা হয়ে থাকে 'শ্রেষ্ঠ প্রমাণ'। মায়েয ও গামেদির স্বীকারোক্তিকে রসূলুল্লাহ

সা. গ্রহণ করেছিলেন। এ বিষয়ে কোনো ইমাম দ্বিমত করেননি। তবে কয়বার স্বীকারোক্তি দিলে 'হদ' অপরিহার্য হবে, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে।

মালেক, শাফেয়ি, দাউদ, তাবারি ও আবুস্ সাওর বলেন : একবার স্বীকারোক্তি দিলেই হদ কার্যকর করা হবে। কেননা আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত হাদিসে উনাইসকে রসূলুল্লাহ সা. যে মহিলার স্বীকারোক্তি নিতে বলেছিলেন, সে ক্ষেত্রে সংখ্যা উল্লেখ করেননি। হানাফিদের মতে পৃথক পৃথক স্থানে চারবার স্বীকারোক্তি নিতে হবে। আহমদ ও ইসহাকের মতে, চারবার নিতে হবে, তবে পৃথক পৃথক স্থান শর্ত নয়। অবশ্য প্রথমোক্ত মতটিই অগ্রগণ্য।

স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করলে শাস্তি রহিত হবে

শাফেয়ি মাযহাব, হানাফি মাযহাব ও ইমাম আহমদের মতে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করলে হদ রহিত হবে। কেননা আহমদ ও তিরমিযি আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : মায়েয যখন পাথরের আঘাতে অতিষ্ঠ হয়ে পড়লো, তখন ছুটে পালাতে লাগলো। পালানোর সময় এক ব্যক্তির কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। সে নিজের কাছে থাকা উটের হাড় দিয়ে তাকে পিটালো। আশপাশের লোকজনও তাকে প্রহার করলো। ফলে সে মারা গেলো। পরে লোকেরা রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট একথা জানালে তিনি বললেন : তোমরা ওকে ছেড়ে দিলেই পারতে। আবু দাউদ ও নাসায়ী জাবের রা. থেকেও অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে অতিরিক্ত একথাও রয়েছে : "মায়েয পাথরের আঘাতে অস্থির হয়ে চিৎকার করে বললো : তোমরা আমাকে রসূলুল্লাহ সা. এর নিকট ফেরত পাঠাও। আমার গোত্র আমার সর্বনাশ করেছে এবং আমাকে প্রতারণা করে বলেছে যে, রসূলুল্লাহ সা. আমাকে হত্যা করবেন না। কিন্তু আমরা তাকে হত্যা না করা পর্যন্ত তার কাছ থেকে পৃথক হইনি। পরে যখন আমরা রসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে ফিরে গেলাম এবং মায়েযের ঘটনা তাকে জানালাম, তখন তিনি বললেন : তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না কেন এবং আমার কাছে নিয়ে এলেনা কেন?

কোনো মহিলার সাথে ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি করা এবং মহিলা অস্বীকার করা :

কোনো ব্যক্তি যখন কোনো নির্দিষ্ট মহিলার সাথে ব্যভিচার করেছে মর্মে স্বীকারোক্তি করে এবং ঐ মহিলা তা অস্বীকার করে, তখন শুধু পুরুষটির উপর হদ কার্যকর করা হবে, মহিলার উপর নয়। কেননা আহমদ ও আবু দাউদ সাহল ইবনে সা'দ থেকে বর্ণনা করেছেন : এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট এলো এবং জনৈকা মহিলার নামোল্লেখ করে তার সাথে ব্যভিচার করেছে বলে জানালো। তৎক্ষণাৎ রসূলুল্লাহ সা. দূত পাঠিয়ে ঐ মহিলাকে ডাকলেন। মহিলা এলে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন। সে অস্বীকার করলো। রসূলুল্লাহ সা. মহিলাকে ছেড়ে দিলেন এবং পুরুষটির উপর হদ কার্যকর করলেন। এটা ছিলো তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে ব্যভিচারের শাস্তি। ইমাম মালেক ও শাফেয়ির মত অনুযায়ী অপবাদ আরোপের শাস্তি নয়। আওযায়ি ও আবু হানিফা বলেছেন : তাকে শুধু অপবাদের জন্য শাস্তি দেয়া হবে। কেননা মহিলার অস্বীকৃতি সন্দেহের সৃষ্টি করেছে। এই মতটির উপর আপত্তি তুলে বলা হয়েছে যে, মহিলার অস্বীকৃতি পুরুষের স্বীকারোক্তিকে বাতিল করেনা। হাদাবি, মুহাম্মদ ও শাফেয়ির মতে তাকে ব্যভিচার ও অপবাদ উভয়টার জন্য শাস্তি দেয়া হবে। কেননা আবু দাউদ ও নাসায়ী ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : বকর গোত্রের এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সা. এর কাছে এসে জনৈক মহিলার সাথে ব্যভিচার করেছে

মর্মে চারবার স্বীকারোক্তি করলো। লোকটি ছিলো অবিবাহিত। তিনি তাকে একশো বেত্রাঘাত করলেন। এরপর তিনি তাকে মহিলা সম্পর্কে সাক্ষী উপস্থাপন করতে বললেন। তখন মহিলা বললো : হে রসূলুল্লাহ্ সা. এই ব্যক্তি মিথ্যা বলেছে। তখন তিনি তার উপর অপবাদের শাস্তি ৮০ বেত্রাঘাতও কার্যকর করলেন।'

সাক্ষ্য দ্বারা ব্যভিচার প্রমাণিত হওয়া

পুরুষ কিংবা নারী যেই হোক না কেন, ব্যভিচারের অভিযোগ বা অপবাদ তার, তার পরিবারের ও বংশধরের মানমর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করে, সুনাম ও সুখ্যাতি বিনষ্ট করে ও কলংক লেপন করে। এক কথায় তার সার্বিক পতন ঘটায়। এজন্য ইসলাম এই অপরাধ প্রমাণে অত্যধিক কড়াকড়ি আরোপ করেছে, যাতে নিরপরাধ ব্যক্তিকে আনুমানিক ও ভিত্তিহীনভাবে অথবা সামান্য ক্রোধ ও বিদ্বেষের কারণে অভিযুক্ত করা বা অপবাদ আরোপের মাধ্যমে চিরদিনের জন্য কলংকিত করার পথ রুদ্ধ হয়। এ কারণে ব্যভিচারের সাক্ষ্য দানে নিম্নোক্ত শর্তাবলী পূরণ জরুরি :

প্রথমত: চারজন সাক্ষী অপরিহার্য। অথচ অন্যান্য অভিযোগ প্রমাণে চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন হয়না। আল্লাহ্ বলেন :

وَالّٰتِىْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ج فَاِنْ شَهِدُوْا
فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ○

অর্থ : তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হতে চারজন সাক্ষী তলব করো। যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদেরকে গৃহে অবরুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তাদের মৃত্যু হয়, অথবা আল্লাহ্ তাদের জন্য অন্য কোনো ব্যবস্থা করেন।" (সূরা নিসা : আয়াত ১৫)।

আল্লাহ্ সূরা নূরের ৪নং আয়াতে বলেন :

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً ○

"আর যারা সতী রমণীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনা, তাদেরকে আশিটি কষাঘাত করবে।"

সাক্ষী চারজনের কম হলে তা গ্রহণ করা হবেনা।

সাক্ষী চারজনের কম হলে তারা কি অপবাদের শাস্তি পাবে? হানাফি, মালেকি, অগ্রগণ্য শাফেয়ি ফকিহ্গণ ও ইমাম আহমদের মতে তারা অপবাদের শাস্তি পাবে। কেননা যে তিনজন সাক্ষী মুগীরার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিল, উমর রা. তাদের উপর হদ কার্যকর করেছিলেন। অন্যেরা বলেন : তাদেরকে অপবাদের শাস্তি দেয়া হবেনা। কেননা তাদের উদ্দেশ্য ছিলো সাক্ষ্য দেয়া, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা নয়। শাফেয়ি, হানাফি ও যাহেরি মাযহাবের দৃষ্টিতে এ মতটি অগ্রহণযোগ্য।

দ্বিতীয় শর্ত হলো: প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। কেননা আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন :

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ج فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّ امْرَاَتٰنِ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ ○

"সাক্ষীদের মধ্যে যাদের উপর তোমরা রাযী, তাদের মধ্যে দুইজন পুরুষ সাক্ষী রাখবে, যদি দুইজন পুরুষ সাক্ষী না থাকে তবে একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোক।" (বাকারা: ২৮২)

সাক্ষী যদি প্রাপ্তবয়স্ক না হয়, তবে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবেনা। কেননা সে পুরুষ হিসেবেও গণ্য নয়, যাদের সাক্ষ্য দেয়ায় সাধারণ মানুষ রাযী বা সন্তুষ্ট থাকে তাদেরও অন্তর্ভুক্ত নয়। সাক্ষ্য দানের কাজটি বাহ্যত: তার দ্বারা সম্ভবপর হলেও তাতে কিছু যায় আসেনা। তাছাড়া রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "তিন ব্যক্তি দায়মুক্ত: বালক যতক্ষণ না প্রাপ্তবয়স্ক হয়, ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না জাগ্রত হয় এবং পাগল যতক্ষণ না সুস্থ মস্তিষ্ক হয়।"

বালক যেহেতু নিজের সম্পত্তি সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণেরও যোগ্য নয়, কাজেই সে অন্যের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়ারও যোগ্য নয়। সাক্ষ্য দান একটা অভিভাবকসুলভ কাজ।

তৃতীয় শর্ত হলো: সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়া। তাই পাগল ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধীর সাক্ষ্য গৃহীত হবেনা। অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের সাক্ষ্য যখন তার বুদ্ধি অপরিণত থাকার কারণে গৃহীত হয়না, তখন পাগল ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধীর সাক্ষ্য গৃহীত না হওয়া তো অধিকতর যুক্তিসংগত।

চতুর্থ শর্ত হলো: সাক্ষীর ন্যায়পরায়নতা ও সত্যবাদিতা : কেননা আল্লাহ বলেছেন :

"তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে।" (সূরা তালাক ২)

আল্লাহ আরো বলেছেন :

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا
عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ○

"হে মুমিনগণ, যদি কোনো পাপাচারী তোমাদের নিকট কোনো বার্তা নিয়ে আসে, তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশত: তোমরা কোনো সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না কর এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।" (সূরা হুজুরাত : ৬)

পঞ্চম শর্ত হলো : সাক্ষীর মুসলমান হওয়া চাই। চাই কোনো মুসলমানের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করা হোক বা অমুসলমানের বিরুদ্ধে। এ বিষয়টিতে সকল ইমাম একমত।

ষষ্ঠ শর্ত হলো : সাক্ষীর চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করা চাই। অর্থাৎ সাক্ষী তার সাক্ষ্যে সুস্পষ্টভাবে বলবে, সে সুর্মার শলাকা যেমন সুর্মাদানিতে ঢুকে যায়, ঠিক সেইভাবে পুরুষটির লজ্জাস্থান মহিলাটির লজ্জাস্থানে ঢুকে যেতে দেখেছে। কেননা রসূলুল্লাহ সা. মায়েযকে বলেছিলেন : "হয়তো তুমি শুধু চুমু খেয়েছ, কিংবা স্পর্শ করেছ কিংবা নযর দিয়েছ।" সে বললো : হে রসূলুল্লাহ সা., না, তা নয়। এরপর রসূলুল্লাহ সা. আভাস ইংগিত বাদ দিয়ে সুস্পষ্ট ভাষায় তাকে জিজ্ঞাসা করলেন। সে বললো : হাঁ। পুনরায় তিনি বললেন : সুর্মার শলাকা যেভাবে সুর্মাদানিতে অদৃশ্য হয়ে যায়, ঠিক সেইভাবে? সে বললো : হাঁ।

এরূপ ক্ষেত্রে মানুষের শরীরের গোপনীয় অংশে দৃষ্টি দেয়ার অনুমিত দেয়া হয়েছে কেবল প্রয়োজনের খাতিরে সাক্ষ্য দানের উদ্দেশ্যে, যেমন ডাক্তার ও ধাত্রীর জন্য অনুমতি আছে।

সপ্তম শর্ত হলো: নারীর জননেন্দ্রিয়ে পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের প্রবেশের বিষয়টি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করতে হবে, আভাসে ইংগিতে নয়।

অষ্টম শর্ত হলো: একই বৈঠকে সাক্ষ্যদান সম্পন্ন হওয়া চাই। অধিকাংশ ফকিহর মতে এই

সাক্ষ্যের অন্যতম শর্ত হলো, একই স্থানে ও একই সময়ে সকল সাক্ষীর সাক্ষ্য দিতে হবে। তারা যদি আলাদা আলাদাভাবে আসে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবেনা।

শাফেয়ি, যাহেরি ও যায়দি মাযহাব এই শর্ত আরোপ করেনা। একই বৈঠকে বা একাধিক বৈঠকে বিচ্ছিন্নভাবে বা একত্রে সাক্ষ্য দিলে তাদের মতে সাক্ষ্য গৃহীত হবে। কেননা আল্লাহ্ সাক্ষীর উল্লেখ করেছেন, বৈঠক বা স্থানের উল্লেখ করেননি। তাছাড়া, সকল সাক্ষ্য যদি একই রকম হয় এবং কোনো গরমিল না থাকে, তাহলে বৈঠক একাধিক হলেও অন্য সকল সাক্ষ্যের মতোই তা গৃহীত হয়।

নবম শর্ত হলো : সাক্ষীদের সকলের পুরুষ হওয়া শর্ত। এ ক্ষেত্রে মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। ইবনে হাযম বলেন : প্রত্যেক পুরুষের পরিবর্তে দু'জন মুসলমান ন্যায়পরায়ণ মহিলার সাক্ষ্য গৃহীত হবে। কাজেই তিনজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা, দুইজন পুরুষ ও চারজন মহিলা, একজন পুরুষ ও ছয়জন মহিলা বা কোনো পুরুষ ছাড়া আটজন মহিলার সাক্ষ্য গৃহীত হবে।

দশম শর্ত হলো : সাক্ষ্য দানে বিলম্ব না করা : কেননা উমর রা. বলেছেন: কোনো দল যদি কোনো হদ-এর জন্য সাক্ষ্য দেয় এবং ঘটনার অব্যবহিত পরেই সাক্ষ্য না দেয়, তবে তারা কোনো বিদ্বেষের কারণেই সাক্ষ্য দিয়েছে বুঝতে হবে এবং তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবেনা।"

সাক্ষীরা যদি কোনো ব্যভিচারের ঘটনা পুরানো হয়ে যাওয়ার পর তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়, তবে হানাফি মাযহাব অনুসারে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবেনা। তাদের যুক্তি এই যে, কোনো দর্শক কোনো ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পর দুইটি কাজের যে কোনো একটি করার ব্যাপারে তার স্বাধীনতা থাকে : হয় সে সওয়াব পাওয়ার আশায় তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। অথবা অপরাধীর অপরাধ লুকিয়ে রাখবে। যখন সে ঘটনা সম্পর্কে নিরবতা অবলম্বন করে এবং এর ফলে ঘটনাটা পুরানো হয়ে যায়, তখন প্রমাণিত হয় যে সে লুকানোর পন্থাটা অবলম্বন করেছে। এরপর যখন সে সাক্ষ্য দেয়, তখন বুঝা যায় যে, বিদ্বেষই তাকে সাক্ষ্য দিতে প্ররোচিত করেছে। এ ধরনের মানুষের সাক্ষ্য গৃহীত হয়না বিদ্বেষপ্রসূত অভিযোগ আরোপের কারণে যেমন উমর রা. বলেছেন : উমর রা. এর এ উক্তির কেউ বিরোধিতা করেছে বলে শোনা যায়নি। কাজেই এটা ইজমা বা মতৈক্য বলে গণ্য হবে। অবশ্য বিলম্বিত সাক্ষ্য গৃহীত হবেনা শুধু তখনই, যখন সাক্ষীর এমন কোনো ওযর থাকবেনা যা তাকে বিলম্বে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করে। যদি বিলম্বে সাক্ষ্য দানের পক্ষে দৃশ্যমান কোনো ওযর থাকে, যেমন বিচারালয় থেকে সাক্ষীর দূরে অবস্থান, অথবা সাক্ষীর অসুস্থতা ইত্যাদি, তাহলে সাক্ষ্য গৃহীত হবেনা এবং ঘটনা পুরানো হওয়াতে বাতিল হবেনা। যে সকল হানাফি ফকিহ এই শর্তটির প্রবক্তা, তারা এর জন্য কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারণ করেননি। বরঞ্চ তারা বিষয়টিকে বিচারকের হাতে সমর্পণ করেছেন। তিনি সংশ্লিষ্ট প্রতিটি ব্যাপারে পরিস্থিতির আলোকে সময় নির্ধারণ করবেন। কেননা বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন রকমের ওযর থাকায় ঢালাওভাবে সময় নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তবে কোনো কোনো হানাফি ফকিহ এই বিলম্বকে এক মাস এবং কেউ কেউ ছয় মাস নির্ধারণ করেছেন। তবে মালেকি, শাফেয়ি, যাহেরি ও যায়দি শীয়াদের অধিকাংশ ফকিহ সাক্ষী যত বিলম্বেই সাক্ষ্য দিক, তা গ্রহণ করাতে কোনো বাধা নেই বলে মনে করেন। হাম্বলিদের মধ্যে দু'টি মত প্রচলিত আছে। একটি হানাফিদের এবং অপরটি অধিকাংশ ফকিহদের মতের অনুরূপ।

বিচারক কি নিজের জ্ঞাত তথ্য মোতাবেক রায় দিতে পারে?

যাহেরি মাযহাবের মতানুসারে রক্তপাত, কিসাস, অর্থনৈতিক বিষয়াদি, ব্যভিচার ও হুদুদ সংক্রান্ত বিষয়ে বিচারকের নিজের জানা তথ্য অনুযায়ী বিচার করা ফরয, চাই বিচারক নিযুক্ত হওয়ার আগে জানুক বা পরে জানুক। নিজের জানা তথ্য অনুযায়ী যে বিচার করবে, সেটাই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বিচার, তারপর অপরাধীর স্বীকারোক্তি এবং সর্বশেষে সাক্ষ্য অনুযায়ী সম্পাদিত বিচার। কেননা আল্লাহ্ সূরা নিসার ১৩৫ নং আয়াতে বলেন :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ ○

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে।"

আর রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : "তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ কোনো অন্যায় দেখবে, সে যেন স্বহস্তে তা প্রতিহত করে, তা যদি না পারে তবে তার মুখ দিয়ে যেন প্রতিহত করে।"

সুতরাং ন্যায়বিচার তথা সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা যে বিচারকের কর্তব্য, তা সত্য। যালেমকে জেনে শুনে তার যুলুমের উপর বহাল থাকতে দেয়া ও প্রতিহত না করা ন্যায়বিচার নয়। বিচারকের জ্ঞাত যে কোনো অন্যায়কে স্বহস্তে প্রতিহত করা এবং প্রত্যেক হকদারকে তার হক দেয়া বিচারকের কর্তব্য। নচেত সে বিচারক যালিম অত্যাচারী গণ্য হবে।

কিন্তু অধিকাংশ ফকিহর মতে বিচারকের নিজের জানা তথ্য অনুযায়ী বিচার করার অধিকার নেই। আবু বকর রা. বলেছেন : "আমি যদি কোনো ব্যক্তিকে কোনো অপরাধ করতে দেখি, তবে যতক্ষণ আমার কাছে সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত না হবে ততক্ষণ আমি তার উপর শাস্তি কার্যকর করবোনা।" তাছাড়া এর আরো একটা কারণ এই যে, বিচারক দেশের অন্যান্য নাগরিকের মতোই একজন নাগরিক। তাই তার কাছে পূর্ণ সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত সাক্ষীর দেয়া সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কিছু বলা তার জন্য বৈধ নয়। বিচারক কোনো ব্যভিচারীকে যে অবস্থায় দেখেছে, তদনুযায়ী তাকে যদি ব্যভিচারের দায়ে অভিযুক্ত করে, অথচ সেই অভিযোগের স্বপক্ষে তার কাছে পূর্ণ সাক্ষ্য প্রমাণ নেই, তাহলে সে অপবাদদাতা গণ্য হবে এবং তার উপর অপবাদের শাস্তি কার্যকর করা অপরিহার্য হবে। সুতরাং বিচারকের জন্য যখন তার জ্ঞাত তথ্য মোতাবেক কথা বলা নিষিদ্ধ, তখন সে অনুসারে কাজ করা নিষিদ্ধ হওয়া অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। এই মতের ভিত্তি হচ্ছে সূরা নূরের ১৩ নং আয়াতের এই অংশ :

فَإِذْ لَمْ يَأْتُوْا بِالشُّهَدَاۤءِ فَاُولٰۤئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ○

"তারা যখন সাক্ষীগণকে উপস্থিত করায়নি, তখন আল্লাহর নিকট তারা মিথ্যাবাদী।"

গর্ভ দ্বারা কি ব্যভিচার প্রমাণিত হয়?

অধিকাংশ আলেমের মত হচ্ছে, কেবলমাত্র গর্ভবতী হওয়া দ্বারা হদ কার্যকর করা যাবেনা। বরং অপরাধীর স্বীকারোক্তি অথবা সাক্ষ্য অপরিহার্য। এর প্রমাণস্বরূপ তারা সেই হাদিস উদ্ধৃত করেন, যাতে সন্দেহ দেখা দিলেই হদ রহিত হবে বলা হয়েছে। অধিকন্তু আলী রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি জনৈক গর্ভবতী মহিলাকে বলেছিলেন : "তোমাকে কি বলাৎকার করা হয়েছে? সে বললো : না। তিনি বললেন : তাহলে সম্ভবত: তুমি ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় কেউ তোমার কাছে এসেছিল।" তাছাড়া উমর রা. থেকে বর্ণিত আছে যে,

জনৈক মহিলা তাকে জানালো, সে অত্যন্ত গাঢ় ঘুমে অভ্যস্ত। এক ব্যক্তি গভীর রাতে তার কাছে এসেছিল। তাকে সে চিনতে পারেনি। উমর রা. ঐ মহিলার এই ওযর গ্রহণ করে তাকে 'হদ' থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন।

পক্ষান্তরে ইমাম মালেক ও তার শিষ্যরা বলেন : যে মহিলার স্বামী আছে বলে জানা যায়না, সে যদি গর্ভবতী হয় এবং তাকে বলাৎকার করার হয়েছিল বলেও জানা যায়না, তাকে শাস্তি দেয়া হবে। সে যদি দাবি করে, তাকে বলাৎকার করা হয়েছে, তাহলে তাকে অবশ্যই এমন কোনো আলামত বা সাক্ষ্য পেশ করতে হবে, যা দ্বারা তার উপর বলাৎকার হয়েছে প্রমাণিত হয়, যেমন সে কুমারী ছিলো এবং ধর্ষণের পর তার রক্তপাত শুরু হয়েছে, অথবা বলাৎকারের প্রতিক্রিয়ায় সে নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছে। অনুরূপ সে যদি নিজের বিয়ে হয়েছে বলে দাবি করে, তবে সেই দাবি বিনা সাক্ষ্য প্রমাণে গ্রহণ করা হবেনা। এই মতটির স্বপক্ষে উমর রা. এর এই উক্তিকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয় : "নারী হোক বা পুরুষ হোক, প্রত্যেক বিবাহিত ব্যভিচারীর উপর হদ কার্যকর করা ওয়াজিব, যদি সাক্ষ্য অথবা গর্ভ অথবা স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়।" আর আলী রা. বলেছেন : হে জনতা, ব্যভিচার দু'রকমের। গোপন ও প্রকাশ্য। গোপন ব্যভিচার হলো, যা সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা প্রকাশ পায়। আর প্রকাশ্য ব্যভিচার হলো যা স্বীকারোক্তি বা গর্ভ দ্বারা প্রকাশ পায়। এসব হচ্ছে সাহাবীদের উক্তি এবং তাঁদের আমলে কেউ তাদের এসব উক্তির বিরোধিতা করেনি। সুতরাং এটা অবশ্যই ইজমা বা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত।

অভিযুক্তকে নিরাপরাধ প্রমাণিত করে এমন আলামত পাওয়া গেলে হদ রহিত হবে

ব্যভিচারের দায়ে অভিযুক্ত নারী বা পুরুষের মধ্যে যখন এমন কোনো আলামত পাওয়া যায়, যা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, তাদের কারো দ্বারা ব্যভিচার সংগঠিত হয়নি, তখন হদ রহিত হবে। যেমন কুমারী মেয়ের কুমারিত্ব অক্ষুণ্ন থাকা, কিংবা যোনিদ্বার বন্ধ থাকা, অথবা পুরুষের নপুংসকত্ব বা পুরুষাংগ কর্তিত থাকা। রসূলুল্লাহ সা. আলী রা.কে এমন এক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করতে পাঠিয়েছিলেন, যে জনৈক মহিলার কাছে যাতায়াত করতো। আলী রা. গিয়ে দেখলেন, সে পুকুরে গোসল করছে। তিনি তাকে স্বহস্তে পাকড়াও করলেন এবং পানি থেকে টেনে বের করলেন। দেখলেন, তার পুরুষাংগ কর্তিত। অগত্যা তাকে রেখে তিনি রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট ফিরে গেলেন এবং তাকে বিষয়টি জানালেন।

ছয় মাসে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে

বিবাহিত মহিলা যদি বিয়ের ছয় মাস পর সন্তান প্রসব করে তবে তার উপর হদ কার্যকরী করা হবেনা। ইমাম মালেক বলেন : আমি জানতে পেরেছি, উসমান রা. এর নিকট বিয়ের ছয় মাস পর সন্তান প্রসবকারিণী জনৈক মহিলাকে আনা হলে তিনি তাকে রজম করার আদেশ দিলেন। আলী রা. এর বিরোধিতা করে বললেন : এই মহিলার উপর রজম কার্যকর হবেনা। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবে বলেছেন :

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

"তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও স্তন্য ছাড়াতে ত্রিশ মাস লাগে।" আল্লাহ আরো বলেন :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ط

"যে ব্যক্তি স্তন্যদানের মেয়াদ পূর্ণ করতে ইচ্ছুক, তার জন্য জননীগণ তাদের সন্তানদেরকে

পূর্ণ দু'বছর স্তন্য পান করাবে।" এ থেকে প্রমাণিত হয়, ছয় মাসে সন্তান হওয়া সম্ভব। কাজেই তার উপর রজম কার্যকর করা চলেনা।" একথা শুনে উসমান ঐ মহিলার কাছে দূত পাঠালেন। কিন্তু দূত দেখলো, মহিলাকে রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) করা হয়েছে।

হদ কার্যকর করার সময় :

বিদায়াতুল মুজতাহিদ গ্রন্থে বলা হয়েছে : অধিকাংশ ফকিহর মতে প্রচণ্ড গরমে, শীতকালে ও অভিযুক্তের রোগাক্রান্ত থাকাকালে হদ কার্যকর করা হবেনা। ইমাম আহমদ ও ইসহাকের মতে হদ কার্যকর করা হবে। তারা প্রমাণ দর্শান যে, উমর রা. কুদামার উপর তার রুগ্নাবস্থায় হদ কার্যকর করেছিলেন। এই মতভেদের কারণ হলো হলো 'হদ' এর তাৎপর্য সম্পর্কে যাহেরি মাযহাবের ফকিহদের বিরোধিতা। তারা বলেন : হদ এমন অবস্থায় কার্যকর করা হবেনা, যখন 'হদ' প্রয়োগকারীদের মনে এরূপ ধারণা প্রবল হবে যে, হদ কার্যকর করা হলে অপরাধী মারা যাবে। যারা মনে করেন যে, হদ কার্যকর করার আদেশটি শর্তহীন ও ব্যতিক্রমবিহীন, তারা বলেন, রুগ্নাবস্থায়ও হদ কার্যকর করা হবে। আর যারা হদের তাৎপর্যের দিকে দৃষ্টি দেন তারা বলেন : রোগী রোগমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তাকে শাস্তি দেয়া হবেনা। অনুরূপ প্রচণ্ড গরমে এবং ঠাণ্ডায়ও শাস্তি দেয়া হবেনা। শওকানি বলেন : এটা সর্বসম্মত মত যে, শীত ও গরমের তীব্রতা হ্রাস পাওয়া পর্যন্ত অবিবাহিত অপরাধীর হদ কার্যকর করা স্থগিত থাকবে। কিন্তু যদি সে আশা না থাকে, তাহলে শাফেয়ি মাযহাব মতে, রুগ্ন অপরাধীর জন্য সহনীয় হলে খেজুরের কাঁদির থোকা দিয়ে তাকে প্রহার করা হবে। নাসের ও মুয়াইয়িদ বিল্লাহ বলেন : রোগমুক্তির আশা না থাকলেও রুগ্নাবস্থায় হদ কার্যকর করা হবেনা। তবে প্রথমোক্ত মতটিই অগ্রগণ্য। আবু উমামার হাদিস এর প্রমাণ। উপরোক্ত মতামত ছিলো বেত্রদণ্ড নিয়ে। পক্ষান্তরে রজমযোগ্য অপরাধী যদি রুগ্ন হয় বা অনুরূপ অন্য কোনো অস্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, তাহলে শাফেয়ি, হানাফি ও মালেকের মতে, রোগ বা অন্য কোনো কারণে রজম স্থগিত থাকবেনা। কারণ তাকে নিপাত করাই অভিপ্রেত।

মারুযী বলেছেন : অপরাধ অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রমাণিত হোক বা সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হোক, শীত বা গরমের তীব্রতা বা অসুস্থতার কারণে রজম স্থগিত থাকবে। ইসফারাইনি বলেছেন : শুধুমাত্র অসুস্থতার কারণে রজম স্থগিত করা হবে। আর গর্ভবতীকে ততক্ষণ পর্যন্ত রজম করা হবে না, যতক্ষণ সে সন্তান প্রসব এবং তার ধাত্রী না পাওয়া গেলে তাকে স্তন্য পান না করায়। আলী রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. এর জনৈক দাসী ব্যভিচার করেছিল। তিনি আমাকে আদেশ দিলেন যেন তাকে বেত্রাঘাত করি। যখন তার নিকট গেলাম, দেখলাম তার সবেমাত্র নেফাস (প্রসবোত্তর স্রাব) শুরু হয়েছে। আমার আশংকা হলো, তাকে বেত্রাঘাত করলে সে মারা যাবে। রসূলুল্লাহ সা.কে জানালাম। তিনি বললেন : "বেশ করেছ। সে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তাকে অব্যাহতি দাও।" -আহমদ, মুসলিম, তিরমিযি।

যাকে রজম করা হবে তার জন্য গর্ত খুঁড়তে হবে কিনা

যাকে রজম করা হবে, তার জন্য গর্ত খোঁড়া লাগবে কিনা সে সম্পর্কে বিভিন্ন হাদিসে বিভিন্ন রকম বর্ণনা এসেছে। কতক হাদিসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, তার জন্য গর্ত খুড়তে হবে। অন্যান্য হাদিসে এ বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। ইমাম আহমদ বলেছেন : অধিকাংশ হাদিস অনুসারে গর্ত খোঁড়া লাগবেনা। হাদিসের এই বিভিন্নতার

কারণে ফকিহদের মধ্যেও মতভেদ হয়েছে। ইমাম মালেক ও আবু হানিফার মতে গর্ত খোঁড়া হবেনা। আবুস্ সাওর বলেন : খুঁড়তে হবে। আলী রা. থেকে বর্ণিত আছে, আলী রা.কে যখন শুরাহা হামদানিয়া নাম্নী মহিলাকে রজম করার আদেশ দেয়া হলো, তখন তিনি তাকে বাইরে নিয়ে এলেন, তার জন্য একটা গর্ত খোঁড়া হলো, তাকে তার মধ্যে প্রবেশ করানো হলো এবং জনগণ তার উপর পাথর নিক্ষেপের দৃশ্য দেখতে লাগলো। শাফেয়ির মতে, গর্ত খোঁড়া ও নাখোঁড়া দু'টোই জায়েয। তবে ইমাম শাফেয়ির মতে, বিশেষভাবে মহিলাদের জন্য গর্ত খোঁড়া লাগবে। পুরুষের নাভি ও মহিলার স্তন পর্যন্ত গর্ত খোঁড়া মুস্তাহাব। মহিলার পোশাক এমনভাবে গুটিয়ে বেঁধে দেয়া হবে, যাতে গর্তে না ঢুকিয়ে নিলে তার অস্থিরতার দরুন শরীরের গোপনীয় স্থানগুলো খুলে না যায়। আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, নারীকে বসিয়ে রজম করা হবে। পুরুষকে অধিকাংশের মতে দাঁড় করিয়ে ও মালেকের মতে বসিয়ে রজম করা হবে। অন্যদের মত এই যে, এ ব্যাপারে শাসকের সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।

শাসক ও সাক্ষীদের রজমে উপস্থিত থাকা

ইমাম আবু হানিফার মতে, হদ যখন সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়, তখন বিবাহিত ব্যভিচারীর উপর প্রথম পাথর নিক্ষেপ করবে সাক্ষী এবং এজন্য শাসক সাক্ষীকে বাধ্য করবে। এতে শরিয়তের বিধানের প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শনের বিরুদ্ধে সতর্কতা ও সচেতনতার সৃষ্টি হবে এবং শরিয়তের শাস্তি কার্যকর করার উপর দৃঢ়তার জন্ম নেবে। তবে যদি স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে হদ প্রমাণিত হয়, তাহলে শাসক বা তার প্রতিনিধির উপর রজম শুরু করার দায়িত্ব বর্তাবে।

নাইলুল আওতারে বলা হয়েছে : ইমাম শাফেয়ির মতে রজমে শাসকের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক নয়। এটা সঠিক মত। কেননা এটা বাধ্যতামূলক সাব্যস্ত করে এমন কোনো প্রমাণ নেই। তাছাড়া ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হাদিসে জানা গেছে যে, রসূলুল্লাহ্ সা. মায়েযকে রজম করার আদেশ দিলেন। কিন্তু নিজে জনতার সাথে মাঠে বের হননি। অথচ তার স্বীকারোক্তি দ্বারাই ব্যভিচার প্রমাণিত হয়েছিল। তিনি গামেদীর রজমেও উপস্থিত ছিলেন না বলে জানা যায়। তালখীস নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে : উভয় হাদিসের কোনোটি থেকেই জানা যায়না যে, তিনি উপস্থিত থেকেছেন। বরং কোনো বর্ণনা থেকে জানা যায়, তিনি উপস্থিত থাকেননি। ইমাম শাফেয়ি একথা দৃঢ়তার সাথে বলেছেন। তিনি বলেছেন : গামেদী সম্পর্কে সুনান আবু দাউদ ইত্যাদিতে বলা হয়েছে, তিনি উপস্থিত থাকেননি। সুতরাং এদ্বারা প্রমাণিত হলো যে, সাক্ষী বা শাসকের উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক নয়। তবে ফকিহগণ মনে করেন, স্বীকারোক্তি দ্বারা ব্যভিচার প্রমাণিত হলে শাসকের হাত দিয়ে রজম শুরু হওয়া মুস্তাহাব আর সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হলে সাক্ষীদের উপস্থিতি মুস্তাহাব।"

'হদ' কার্যকর করার সময় একদল মুসলমানের উপস্থিতি

আল্লাহতায়ালা সূরা নূরের ২নং আয়াতে বলেন :

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَّلَاتَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

অর্থ : ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী- এদের প্রত্যেককে একশো কষাঘাত করবে; আল্লাহর

বিধান কার্যকরী করণে ওদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও; মুমিনদের একটি দল যেনো ওদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।"

এ আয়াত থেকে আলেমগণ প্রমাণ দর্শান যে, একদল মুসলমান কর্তৃক 'হদ' কার্যকরীকরণ প্রত্যক্ষ করা মুস্তাহাব। তবে এই দলে কতজন লোক থাকা বাঞ্ছনীয় সে ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। কেউ বলেন চারজন, কেউ বলেন তিনজন, কেউ বলেন দু'জন, কেউ বলেন সাতজন বা তার চেয়ে বেশি।

বেত্রদণ্ডের ক্ষেত্রে প্রহারের নিয়ম

আবু হানিফা ও শাফেয়ির মতে মুখমণ্ডল ও লজ্জাস্থান ব্যতীত সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে প্রহারের আওতায় আনা হবে। আবু হানিফার মতে, মাথাও বাদ দেয়া হবে। ইমাম মালেক বলেন : সকল হদের প্রহারে পুরুষ অপরাধীর প্রহারাধীন অঙ্গ থেকে পোশাক খুলে নিতে হবে। শাফেয়ি ও আবু হানিফার মতে, অপবাদের শাস্তি ছাড়া অন্যান্য শাস্তিতে পোশাক খোলা হবে। বিদায়াতুল মুজতাহিদে বলা হয়েছে : বসিয়ে প্রহার করা হবে, দাঁড় করিয়ে নয়। ইমাম নববী বলেছেন : যে বেত দিয়ে প্রহার করা হবে তা মধ্যম আকারের হতে হবে। ছড়ি ও লাঠির মধ্যবর্তী আকারের হতে হবে। গাছের ডাল দিয়ে প্রহার করলে ডাল কাঁচা ও শুকনার মাঝামাঝি ধরনের হওয়া চাই। আর প্রহারও হওয়া চাই দুই চরম ধরনের প্রহারের মধ্যবর্তী ধরনের- অতি জোরদারও নয়, অতি হালকাও নয়। প্রহারকারী নিজের হাত মাথার উপর পর্যন্ত তুলবেনা, আবার শুধু চাবুকটা অপরাধীর গায়ের উপর রেখে দিয়েই ক্ষান্ত হবেনা, বরঞ্চ তার বাহু মধ্যম পরিমাণ উপরে তুলবে।

অবিবাহিত ব্যক্তিকে অবকাশ দান

অবিবাহিত মহিলাকে শীত ও গ্রীষ্মের প্রবলতা হ্রাস পাওয়া পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হবে। যে রুগ্ন অপরাধীর রোগ নিরাময়ের আশা আছে, তাকেও নিরাময় হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হবে। কিন্তু যদি নিরাময়ের আশা না থাকে, তাহলে শাফেয়ি মাযহাব অনুযায়ী তাকে খেজুর গাছের ডাল দিয়ে তার সহনীয় মাত্রায় প্রহার করবে। আবু দাউদ আনসারের জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, সে দীর্ঘ রোগে ভুগে একেবারেই হাড্ডিসার হয়ে গিয়েছিল। এমতাবস্থায় অন্য এক আনসারীর যুবতী দাসী তার কক্ষে এলে সে খুব পুলকিত হলো এবং তাকে ধর্ষণ করলো। পরে যখন তার গোত্রের লোকেরা তাকে দেখতে এলো, তখন তাদেরকে সে এই ঘটনা জানালো এবং বললো, তোমরা আমার সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সা. এর নিকট ফতোয়া জিজ্ঞাসা করো। কারণ জনৈকা দাসী আমার কক্ষে এলে আমি তার সাথে ব্যভিচার করেছি। লোকেরা ঘটনাটা রসূলুল্লাহ সা. কে জানালো। তারা বললো : তার মতো রোগক্লিষ্ট মানুষ আমরা আর দেখিনি। তাকে যদি আমরা আপনার নিকট নিয়ে আসতাম, তবে তার হাড্ডিগুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতো। তার শরীরে চামড়া আর হাড্ডি ছাড়া আর কিছু নেই। তখন রসূলুল্লাহ সা. গাছের একশোটা চিকন ও নরম ডাল সংগ্রহ করে তা দিয়ে তাকে একবার প্রহার করার আদেশ দিলেন।

বেত্রাঘাতের ফলে অপরাধী মারা গেলে দিয়ত দিতে হবে কি?

বেত্রাঘাত প্রাপ্ত অপরাধী (প্রহার সহ্য করতে না পেরে) মারা গেলে তার জন্য কোনো দিয়ত রক্তমূল্য দেয়া লাগবেনা। মুসলিমের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী বলেন : "আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত, যার উপর হদ ওয়াজিব হয়েছে, অতপর শাসক বা তার নিযুক্ত প্রতিনিধি

তার উপর শরয়ি 'হদ' কার্যকর করার দরুন মারা গেলো, তার জন্য শাসক বা প্রতিনিধির উপর কোনো দিয়ত আরোপিত হবেনা। বাইতুল মাল থেকেও দিয়ত দেয়া লাগবেনা।

এ পর্যন্ত ব্যভিচারের বিধান আলোচিত হলো। আরো কয়েকটা অপরাধের বিষয়ে আলোচনা বাকি রয়েছে। এবার সেগুলো নিয়ে আলোচনা করছি :

পুরুষে পুরুষে সমকাম বা পুংমৈথুন

পুরুষে পুরুষে সমকাম অতি জঘন্য অপরাধ। এটা এমন একটা অশ্লীল কাজ, যা শুধু চরিত্রই ধ্বংস করেনা, বরং স্বভাব প্রকৃতি, ধর্ম, দুনিয়া ও গোটা জীবনকেই ধ্বংস করে। আল্লাহ এর জন্য নিষ্ঠুরতম শাস্তি দিয়েছেন। লূত আ. এর জাতিকে গোটা দেশ ধ্বসিয়ে দিয়ে এবং তাদের উপর আকাশ থেকে কংকর জাতীয় পাথর বর্ষণ করে ধ্বংস করে দিয়ে তাদের এই নিকৃষ্ট নোংরা অপরাধের শাস্তি দিয়েছিলেন। আর এই ঘটনাকে পবিত্র কুরআনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যাতে তা কেয়ামত পর্যন্ত পঠিত হতে থাকে ও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা হতে থাকে। সূরা আ'রাফের ৮০ থেকে ৮৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ○ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ط بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ○ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ج اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ○ فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ○ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ط فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ○

অর্থ : আমি লূতকে পাঠিয়েছিলাম, সে তার জাতিকে বলেছিল, 'তোমরা এমন কুকর্ম করছো, যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করেনি। তোমরা তো কাম-তৃপ্তির জন্য নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষের নিকট গমন করো, তোমরা তো সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। উত্তরে তার জাতির লোকেরা শুধু বললো : এদেরকে তোমাদের জনপদ থেকে বহিষ্কৃত করো, এরা তো এমন লোক যারা অতি পবিত্র হতে চায়।' অতপর আমি তাকে ও তার স্ত্রী ব্যতীত পরিজনবর্গকে উদ্ধার করেছিলাম, তার স্ত্রী ছিলো পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। তাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। সুতরাং অপরাধীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল তা লক্ষ্য করো।"

সূরা হূদের ৭৭ থেকে ৮২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالَ هٰذَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ ○ وَجَآءَهٗ قَوْمُهٗ يُهْرَعُوْنَ اِلَيْهِ ط وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ط قَالَ يٰقَوْمِ هٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِيْ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ فِيْ ضَيْفِيْ ط اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ ○ قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِيْ بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ ج وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ ○ قَالَ لَوْ اَنَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِيْٓ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ○ قَالُوْا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْٓا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا امْرَاَتَكَ ط اِنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَآ

أَصَابَهُمْ ط إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ط أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ○ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ○ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ط وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ○

অর্থ : যখন আমার প্রেরিত ফিরিশতাগণ লূতের নিকট এলো যখন তাদের আগমনে সে বিষণ্ন হলো এবং নিজেকে তাদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করলো। তারা বললো, এটা একটা নিদারুণ দিন। তার সম্প্রদায় তার নিকট উদভ্রান্ত হয়ে ছুটে এলো এবং তারা আগে থেকেই কুকর্মে লিপ্ত ছিলো। সে বললো, হে আমার সম্প্রদায়, এরা আমার কন্যা, এদের বিয়ে করো তোমাদের জন্য এরা অধিকতর পবিত্র। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার মেহমানদের প্রতি অন্যায় আচরণ করে আমাকে হেয় করোনা। তোমাদের মধ্যে কি একজনও ভালো মানুষ নেই? তারা বললো : তুমি তো জানো, তোমার কন্যাদেরকে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা কি চাই তা তো তুমি জানোই। সে বললো : 'তোমাদের উপর যদি আমার শক্তি থাকতো অথবা যদি আমি কোনো শক্তিশালী আশ্রয় নিতে পারতাম!' তারা বললো, হে লূত, আমরা তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত ফিরিশতা। ওরা কখনো তোমার নিকট পৌঁছুতে পারবেনা। সুতরাং তুমি রাতের কোনো এক সময়ে তোমার পরিবারবর্গসহ বেরিয়ে পড়ো এবং তোমাদের মধ্যে কেউ যেন পেছনের দিকে না তাকায় তোমার স্ত্রী ব্যতীত। তাদের যা ঘটবে, তারও তাই ঘটবে। প্রভাত হচ্ছে তাদের জন্য নির্ধারিত সময়। প্রভাত কি নিকটবর্তী নয়? অতপর যখন আমার আদেশ এলো তখন আমি গোটা জনপদকে উল্টিয়ে দিলাম এবং তাদের উপর ক্রমাগত পাথর কংকর বর্ষণ করলাম, যা তোমার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নিত ছিলো। এটা যালিমদের থেকে দূরে নয়।"

রসূলুল্লাহ সা. সমকামীকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন এবং তাকে অভিশাপ দিয়েছেন। আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ি ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যখন তোমরা কাউকে লূত আ.-এর সম্প্রদায়ের কুকর্মে লিপ্ত পাবে, তখন যে ব্যক্তি একাজ করে এবং যার সাথে করে, উভয়কে হত্যা করবে।" নাসায়ীর ভাষা হলো : যে ব্যক্তি লূতের সম্প্রদায়ের কুকর্মে লিপ্ত হয় আল্লাহ তার উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করেন। যে ব্যক্তি লূতের সম্প্রদায়ের কুকর্মে লিপ্ত হয়, আল্লাহ তার উপর অভিসম্পাত করান। যে ব্যক্তি লূতের সম্প্রদায়ের কুকর্ম করে, আল্লাহ তার উপর অভিসম্পাত করান।"

ইমাম শওকানি বলেন : এই জঘন্য অপরাধ যারা করে, তারা এমন শাস্তির উপযুক্ত, যা সকলের জন্য দৃষ্টান্ত ও শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে, তাদেরকে এমন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা উচিত যা খোদাদ্রোহী ফাসেকদের কামাবেগকে দমন করবে। কুরআনের ভাষায় এটি এমন একটি অশ্লীল কাজ, যা লূতের জাতির পূর্বে পৃথিবীতে আর কেউ করেনি। তাই এদের কুকর্ম যে করে, তার শাস্তিও হওয়া উচিত লূতের জাতির শাস্তির মতোই কঠোর ও ভয়ঙ্কর। আল্লাহ তাদেরকে মাটির নিচে ধ্বসিয়ে দিয়েছেন। সেই শাস্তিতে তাদের সকলেই সমূলে ধ্বংস হয়ে গেছে। ইসলাম এই অপরাধের শাস্তিকে এতো কঠিন ও ভয়াবহ করেছে শুধু এজন্য যে, ব্যক্তি ও সমাজের উপর এর খারাপ প্রভাব ও ক্ষয়ক্ষতি অত্যন্ত মারাত্মক এবং বিপুল। "ইসলাম ও চিকিৎসা বিজ্ঞান' (আল ইসলাম ওয়াত্তিব্ব') নামক গ্রন্থ থেকে এই ক্ষয়ক্ষতিগুলো নিম্নে উদ্ধৃত করছি :

নারীর প্রতি বিতৃষ্ণা : সমকাম পুরুষদেরকে নারীর প্রতি বিরাগী ও বিতৃষ্ণ করে তোলে, এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে তা পুরুষকে স্ত্রী সহবাসেও অক্ষম করে দেয়। এভাবে বিয়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য নস্যাত হয়ে যায়। সেটি হচ্ছে বংশবিস্তার। এ ধরনের কোনো পুরুষ যদি ঘটনাক্রমে বিয়ে করেও, তবে তার স্ত্রী হবে চরম হতভাগী। সুখ, শান্তি, প্রেম, ভালোবাসা, আদর সোহাগ যা দাম্পত্য জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ এবং স্বাভাবিক প্রাপ্তি, তা থেকে সে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য। ফলে সে সীমাহীন মানসিক নির্যাতনের মধ্য দিয়ে একটা অনিশ্চিত ও ঝুলন্ত জীবন কাটায় মাত্র। এ ধরনের পুরুষের স্ত্রী বিবাহিত স্ত্রীর মর্যাদা নিয়েও থাকেনা। আবার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর মতোও নয়।

স্নায়ুর উপর চাপ সৃষ্টি : এই বদভ্যাস অপরাধীর মনের উপর নিরন্তর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয় এবং তার স্নায়ুর উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। এই চাপের ফলে সে এমন এক ধরনের বিরল মানসিক ব্যাধিতে ভোগে, যা তার অন্তরে এই ধারণা বদ্ধমূল করে দেয় যে, সে পুরুষ হিসেবে সৃষ্টি হয়নি। ফলে সে তারই সমলিংগের প্রতি আকৃষ্ট হয়, নারীর প্রতি কোনো মোহ ও আকর্ষণ অনুভব করেনা। সমকামী শুধু যে বিরল ধরনের মানসিক ব্যাধিতেই আক্রান্ত হয় তা নয়, বরং সে নানা ধরনের স্নায়বিক রোগেও ভোগে, যা তাকে জীবনের স্বাভাবিক সুখ ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে এবং তার মানবিক ও পুরুষোচিত গুণাবলী কেড়ে নেয়। এই মানসিক ও স্নায়বিক রোগ থেকে এক সময়ে তার মধ্যে নানা রকমের দুরারোগ্য শারীরিক ব্যাধিও জন্ম নেয়।

মস্তিষ্কের ভারসাম্যহীনতা : এ ছাড়াও সমকাম মানুষের মস্তিষ্কের ভারসাম্যে মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটায়। তার চিন্তাকে বিক্ষিপ্ত, ধ্যান ধারণাকে স্থবির, বোধ শক্তিকে নির্জীব ও ইচ্ছা শক্তিকে দুর্বল ও নিষ্ক্রিয় করে দেয়। এর ফলে মানব দেহের অভ্যন্তরের অনালগ্রন্থি, কিডনির উপরিভাগের গ্রন্থি ও অন্যান্য গ্রন্থিগুলোর স্বভাবসুলভ বর্জ্য নি:সরণ তৎপরতা হ্রাস পায় এবং এ সবের কর্মক্ষমতা বাধাগ্রস্ত হয়। একজন সমকামির সাথে স্নায়ু প্রদাহের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। ফলে তার মধ্যে নির্বুদ্ধিতা, সিদ্ধান্তহীনতা, চিন্তার বিক্ষিপ্ততা এবং সঠিক উপলব্ধির অভাব দেখা দেয়।

বিষণ্ণতা : সমকাম বিষণ্ণতার প্রত্যক্ষ কারণ অথবা তার উৎপত্তির শক্তিশালী উপকরণ হয়ে থাকে। বিষণ্ণতা নামক ব্যাধিতে যারা আগে থেকেই আক্রান্ত, সমকাম তাদের এই রোগকে দ্বিগুণ করে দেয়।

সমকামির কামাবেগ অতৃপ্ত থাকে : সমকাম কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার একটা অস্বাভাবিক, বিরল ও অপর্যাপ্ত পদ্ধতি। এতে পুরুষের কামাবেগ অতৃপ্ত ও অপূর্ণ থাকে। কারণ এটা স্বাভাবিক মিলন নয়। তাই গোটা স্নায়ুতন্ত্রকে তৃপ্তি দিতে ব্যর্থ হয় মাংসপেশীর চাহিদাকে ভীষণভাবে পদদলিত করে এবং সামগ্রিকভাবে গোটা দেহের উপর খারাপ প্রভাব বিস্তার করে। নর নারীর স্বাভাবিক যৌন সংগমের দৈহিক প্রকৃতি ও সংগমকালে উভয়ের জননেন্দ্রিয় যে স্বভাবসুলভ ভূমিকা পালন করে, তার প্রতি যদি আমরা দৃষ্টি দেই, অতপর সমকামে যা হয়, তার সাথে যদি এর তুলনা করি, তবে উভয়ের মধ্যে ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী পার্থক্য দেখতে পাই। উপরন্তু যে স্থানটিতে এ কাজটি করা হয় তা যে এ কাজের আদৌ উপযোগী নয়, তাতো বলাই বাহুল্য।

মলদ্বারের মাংসপেশী ঢিলা হয়ে যাওয়া ও ছিন্ন ভিন্ন হওয়া : অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে সমকামকে দেখলে দেখা যাবে ওটা মলদ্বারের ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়া। তার মাংসপেশী ঢিলা হওয়া এবং মল ধরে রাখায় অক্ষমতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কারণে এই পাপিষ্ঠদের খোঁজ নিলেই জানা যাবে, তারা ঘৃণিত বর্জ্য দ্বারা সব সময়ই নোংরা থাকে এবং তা তাদের মলদ্বার থেকে অসাড়ে বেরুতে থাকে।

নৈতিকতা ও সমকাম :

সমকাম একটা মারাত্মক চারিত্রিক বিকৃতি ও মানসিক ব্যাধি। এই দোষে দুষ্ট প্রতিটি লোকই চরম দুশ্চরিত্র ও বিকৃত স্বভাব বিশিষ্ট হয়ে থাকে। ন্যায় অন্যায়ের বাছ বিচারের ক্ষমতাও তাদের লুপ্ত প্রায় হয়ে যায়। তাদের ইচ্ছা শক্তি দুর্বল থাকে। তাদের না থাকে কোনো নৈতিক চেতনা, যা তাদেরকে খারাপ কাজে ধিক্কার দেবে, না থাকে কোনো বিবেক, যা তাদেরকে তিরস্কার করে অন্যায় থেকে ফেরাবে। এমনকি শিশু কিশোরদের উপর চড়াও হওয়া থেকেও তাদের কেউ স্বেচ্ছায় বিরত হয়না এবং তাদের বিকৃত ও নিকৃষ্ট যৌন চাহিদা মেটাতে কঠোর ও সহিংস পন্থা অবলম্বনেও তারা কুণ্ঠিত হয়না।

স্বাস্থ্যের সাথে সমকামের সম্পর্ক : এ পর্যন্ত যা যা উল্লেখ করেছি, তা ছাড়াও সমকামিরা হৃদরোগেও আক্রান্ত হয় এবং তাদের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণে তারা প্রায়ই নানা ধরনের রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

জননেন্দ্রিয়গুলোর উপর এর প্রভাব : সমকাম পুরুষের দেহের প্রধান বীর্যপাত কেন্দ্রগুলোকে দুর্বল করে দেয়, এই কেন্দ্রে বীর্যের শক্তি তৈরির প্রক্রিয়াকে ধ্বংস করে দেয় এবং বীর্যের উপাদানসহ নির্মাণকে ব্যাহত করে। এর অল্প কিছুকাল পরে বংশ বৃদ্ধির ক্ষমতা লোপ পায় ও বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়। এভাবে সমকামিরা ক্রমশ নির্বংশ ও বিলীন হবার দিকে এগিয়ে যায়।

টাইফয়েড ও আমাশয় : সমকামের অনিবার্য পরিণামস্বরূপ যেসব সংক্রামক ব্যাধি সৃষ্টির কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করছি, তাছাড়া মলদ্বার থেকে নির্গত বর্জ্যজাত জীবাণুর মাধ্যমে টাইফয়েড জ্বর, আমাশয় ও অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধিরও বিস্তার ঘটে।

সমকামীদের অন্যান্য রোগসমূহ : এটা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, ব্যভিচার দ্বারা যেসব রোগ বিস্তার লাভ করে, সেসব রোগ সমকামের ফলেও ছড়িয়ে পড়ে। এসব রোগ সবচেয়ে মারাত্মকভাবে আক্রমণ করে খোদ সমকামিদেরকে, তাদের দেহকে করে জরাজীর্ণ, তারপর তাদের প্রাণ পর্যন্ত সংহার করে।

এ পর্যন্ত যেসব ক্ষয়ক্ষতির উল্লেখ করা হলো, তা থেকে আমরা স্পষ্টভাবে জানতে পারি ইসলামী আইনে সমকামকে হারাম ঘোষণা করার যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, জানতে পারি এই অপরাধের হোতাদের উপর চরম শাস্তি প্রয়োগের আদেশের যথার্থতা এবং তাদেরকে খতম করে বিশ্বকে তাদের অকল্যাণ ও অমঙ্গল থেকে মুক্ত করার বিধানের উপকারিতা।

সমকাম সম্পর্কে ফকিহদের মতামত

যদিও এই অপরাধের হারাম হওয়া ও এর হোতাদেরকে কঠোরভাবে দমন ও শাস্তি দানের অপরিহার্যতার পক্ষে আলেমদের ইজমা তথা ঐকমত্য রয়েছে, তথাপি এর জন্য নির্ধারিত শাস্তির আকার ও পরিমাণ নির্ণয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এ বিষয়ে মোটামুটি তিনটি মত লক্ষ্য করা যায় :

১. একটি মত হলো, সমকামিকে হত্যা করা।

২. অপর মতানুসারে সমকামির শাস্তি ব্যভিচারের মতো। অবিবাহিতকে বেত্রদণ্ড ও বিবাহিতকে রজম করা হবে।

৩. তৃতীয় মতে, সমকামিকে তাযীর বা ব্যভিচারের শাস্তির চেয়ে লঘুদণ্ড দেয়া হবে।

প্রথম মত : এ মতটি সাহাবিগণের, নাসেরের, কাসেম বিন ইবরাহীমের ও ইমাম শাফেয়ির। তাঁরা বলেন : সমকামে জড়িত দু'জনেরই শাস্তি মৃত্যুদন্ড, চাই বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত হোক। এর স্বপক্ষে তারা নিম্নোক্ত প্রমাণগুলো উল্লেখ করেন :

১. নাসায়ী ব্যতীত অবশিষ্ট পাঁচটি বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থ, হাকেম ও বায়হাকি ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "তোমরা লূতের জাতির অপকর্মে জড়িত দু'জনকেই হত্যা করবে।"

২. বায়হাকি বর্ণনা করেছেন, আলি রা. তার উপর রজম কার্যকর করেছেন। ইমাম শাফেয়ি বলেছেন : এ দ্বারাই আমরা বিবাহিত অবিবাহিত নির্বিশেষে এই ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত উভয় বক্তির রজমের প্রমাণ পাই।

৩. বায়হাকি আবু বকর রা. থেকে বর্ণনা করেনে, জনৈক পুরুষের সমকাম সম্পর্কে তিনি রসূলুল্লাহ সা. এর সাহাবিদের মতামত জিজ্ঞাসা করলেন। সেদিন আলী রা. সবচেয়ে কঠোর মত ব্যক্ত করে বলেন : একজন নবীর উম্মত ব্যতীত আর কোনো উম্মত এই ঘৃণ্য অপরাধে লিপ্ত হয়নি। সেই উম্মতকে আল্লাহ কি শাস্তি দিয়েছিলেন, তাতো আপনাদের জানাই আছে। আমার মত হলো, এই ব্যক্তিকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিন। আবু বকর রা. তৎক্ষণাত খালেদ বিন ওয়ালিদকে চিঠি লিখে আদেশ দিলেন, যেন লোকটিকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেন। ইমাম শওকানি বলেন : এসব হাদিস সম্মিলিতভাবে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। তবে কিভাবে এই অপরাধীর উপর এ শাস্তি কার্যকর করা হবে, তা নিয়ে তারা ভিন্ন ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। আবু বকর ও আলী রা. বলেন : তাকে প্রথমে তরবারি দিয়ে হত্যা করে তারপর আগুন দিয়ে পোড়ানো হবে। কারণ অপরাধটি অতীব গুরুতর। উমর ও উসমান রা. এর মতে, তার উপর একটা প্রাচীর ধ্বসে দিয়ে পিষ্ট করা হবে। ইবনে আব্বাস বলেন : তাকে একটা উঁচু ভবন থেকে ফেলে দেয়া হবে। আর শা'বি, যুহরি, মালেক, আহমদ ও ইসহাকের মতে, তাকে রজম করা হবে। তিরমিযি মালেক, শাফেয়ি আহমদ ও ইসহাক থেকে উক্ত মত উদ্ধৃত করেছেন। নাসায়ী বলেছেন : ব্যভিচারীকে যদি দু'বার রজম করার সুযোগ থাকতো, তাহলে সমকামিকে রজম করা যেত। মুনযেরি বলেছেন : আবু বকর, আলী, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর ও হিশাম বিন আব্দুল মালেক সমকামিকে আগুনে পুড়িয়েছেন।

দ্বিতীয় মত : সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব, আতা বিন আবি রাবাহ, হাসান, কাতাদা, নাখায়ি, সাওরি, আওযায়ি, আবু তালেব, ইমাম ইয়াহিয়া ও শাফেয়ি বলেছেন, সমকামিকে ব্যভিচারীর মতই শাস্তি দেয়া হবে, অবিবাহিতকে বেত্রদণ্ড ও দেশান্তর, আর বিবাহিতকে রজম করা হবে। তাদের প্রমাণ নিম্নরূপ :

১. এটা এক ধরনের ব্যভিচার। কেননা এখানে একটা গোপন অঙ্গে আর এটি গোপন অঙ্গ ঢুকানো হয়। তাই সমকামের উভয় হোতা বিবাহিত ও অবিবাহিত ব্যভিচারী সংক্রান্ত

প্রমাণাদির আওতাধীন। এর সমর্থন পাওয়া যায় রসূলুল্লাহ সা. এর এ হাদিস দ্বারা : "যখন এক পুরুষ অপর পুরুষের সাথে সঙ্গম করবে, তখন তারা উভয়ে ব্যভিচারী।"

২. যদি ধরেও নেয়া হয় যে, ব্যভিচারের শাস্তি সংক্রান্ত আয়াত ও হাদিস সমকামী দু'জনকে অন্তর্ভুক্ত করেনা, তবুও কেয়াস দ্বারা তারা ব্যভিচারীর পর্যায়ভুক্ত।

তৃতীয় মত : আবু হানিফা, আল মুয়াইয়াদ বিল্লাহ, আল মুরতাযা ও শাফেয়ি সমকামিকে তাযীর তথা ব্যভিচারের শাস্তির চেয়ে লঘুতর শাস্তি দেয়ার পক্ষপাতী। তাদের যুক্তি হলো, সমকাম আর ব্যভিচার এক জিনিস নয়। সুতরাং উভয়ের একই বিধি হতে পারেনা।

ইমাম শওকানি যারা হত্যার পক্ষে মত দিয়েছেন, তাদের মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং শেষোক্ত মতকে দুর্বল বলে অভিহিত করেছেন। কারণ এটা হাদিসের পরিপন্থী। দ্বিতীয় মতটির পর্যালোচনা করে তিনি বলেছেন : ঢালাওভাবে উভয় সমকামিকে হত্যার পক্ষে যে হাদিস উল্লেখ করা হয়, তা শুধু সমকামির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ ব্যভিচারের শাস্তি সংক্রান্ত আয়াত ও হাদিস বিবাহিত ও অবিবাহিতের মধ্যে পার্থক্য করে। তাই ব্যভিচার সংক্রান্ত আয়াত ও হাদিসের আওতায় সমকামকে আনা হলে সে ক্ষেত্রেও ঐ পার্থক্য ধর্তব্য হবে। কেয়াস করে সমকামকে এর আওতা বহির্ভূত করা যাবেনা। কেননা হাদিস বা কুরআনের সুস্পষ্ট বাণীর উপস্থিতিতে কেয়াসের অবকাশ থাকেনা।

হস্ত মৈথুন

পুরুষের হস্ত মৈথুন সচ্চরিত্র ও শিষ্টাচারের পরিপন্থী। ফকীহগণ এর সম্পর্কে বিভিন্ন মত পোষণ করেন : কেউ বলেছেন : এটা হারাম। কারো মতে, অবস্থাভেদে হারাম এবং অবস্থাভেদে ওয়াজিব। কারো মতে, এটা মাকরূহ। যারা একে হারাম মনে করেন তারা হচ্ছেন মালেকি, শাফেয়ি ও যায়দি। এ ব্যাপারে তাদের প্রমাণ এই যে, আল্লাহ বিবাহিত স্ত্রী ও দাসী ব্যতীত আর কোথাও কাম চরিতার্থ করতে নিষেধ করেছেন এবং সর্বাবস্থায় লজ্জাস্থানকে হেফাযত করতে বলেছেন। এ দুটি ব্যতিক্রমী অবস্থার বাইরে কেউ যখন হস্ত মৈথুন করে, তখন সে আল্লাহর হালালের সীমা অতিক্রম করে হারাম কাজে লিপ্ত হয়। আল্লাহ সূরা মুমিনুনের ৫, ৬ ও ৭নং আয়াতে বলেন :

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ○ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ○ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ○

"যারা নিজেদের যৌন অংগকে সংযত রাখে, নিজেদের স্ত্রী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীগণ ব্যতীত। এতে তারা নিন্দনীয় হবেনা। কেউ এদের ছাড়া অন্য কাউকে কামনা করলে তারা হবে সীমালঙ্ঘনকারী।"

যারা একে অবস্থাভেদে হারাম ও অবস্থাভেদে ওয়াজিব বলেছেন, তারা হচ্ছেন হানাফি। তারা বলেন : হস্ত মৈথুন না করলে যার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে, তার জন্য হস্ত মৈথুন ওয়াজিব। কেননা দুটি ক্ষতিকর কাজের মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত হালকা, তা করা বৈধ।" তারা আরো বলেছেন : কামোত্তেজনা সৃষ্টির জন্য এটা করা হারাম। তারা আরো বলেন : যখন কামোত্তেজনা অদম্য হয়ে ওঠে, তার কাছে স্ত্রী বা দাসী থাকেনা এবং

শুধু উত্তেজনা প্রশমিত করার উদ্দেশ্যেই হস্ত মৈথুন করে, তখন এটা জায়েয। হাম্বলীদের মত হলো, কেবলমাত্র ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া অথবা স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার আশংকা রয়েছে, অথচ কাছে স্ত্রী বা দাসী নেই- এবং বিয়ে করারও সামর্থ্য নেই এরূপ অবস্থায় ব্যতিত এ কাজ হারাম। ইবনে হাযমের মতে, এটা মাকরূহ এবং এতে কোনো গুনাহ নেই। কেননা বাম হাত দিয়ে পুরুষাংগ স্পর্শ করা সর্বসম্মতভাবে বৈধ। এটুকু যখন বৈধ, তখন এরপর বীর্যপাত ঘটানো হারাম হবেনা। কেননা আল্লাহ বলেছেন :

وَقَدْ فَصَّلَ اللّٰهُ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ○

"আল্লাহ তোমাদের উপর যা যা হারাম করেছেন, তা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন"। এ কাজটি এ ধরনের কাজসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়, যার হারাম হওয়ার কথা আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এটা হালাল। কারণ আল্লাহ বলেছেন "পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।" হস্ত মৈথুন মাকরূহ হওয়ার কারণ হলো, এটা কোনো মহৎ নৈতিক গুণ নয়। বর্ণিত আছে যে, প্রাচীন মনীষীদের কেউ কেউ একে বৈধ এবং অন্যরা মাকরূহ মনে করতেন। যারা মাকরূহ মনে করতেন তাদের মধ্যে ইবনে উমর ও আতা রয়েছেন। আর ইবনে আব্বাস, হাসান ও কতক শীর্ষস্থানীয় সাহাবি একে বৈধ বলে রায় দিয়েছেন। হাসান বলেন : সাহাবিগণ যুদ্ধবিগ্রহ চলাকালে এটা করতেন। মুজাহিদ বলেছেন : অতীতের লোকেরা যুবকদেরকে হস্ত মৈথুন করার আদেশ দিতেন, যাতে তারা ব্যভিচার থেকে বিরত থাকে। এ ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের উভয়ের জন্য একই বিধি প্রযোজ্য।

নারীদের সমকাম

নারীদের সমকাম হারাম। এ ব্যাপারে সকল আলেম একমত। আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ ও তিরমিযি বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : কোনো পুরুষ অন্য পুরুষের গোপন অংগের প্রতি এবং কোনো নারী অন্য নারীর গোপন অংগের প্রতি দৃষ্টি দেবেনা। কোনো পুরুষ অন্য পুরুষের সাথে একই কাপড়ের মধ্যে অবস্থান করবেনা এবং কোনো নারী অন্য নারীর সাথে একই কাপড়ের মধ্যে অবস্থান করবেনা।" নারীদের সমকাম সহবাস বটে। তবে এতে একের লিংগে অন্যের লিংগ প্রবেশ করেনা। তাই এতে 'হদ্' (বেত্রাঘাত বা রজম) নেই, তবে 'তাযীর' অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত লঘু যে কোনো শাস্তি দিতে হবে, যেমন কোনো পুরুষ যদি কোনো নারীর সাথে যোনিতে পুরুষাংগ না ঢুকিয়েই ব্যভিচার করে, তাহলেও একইভাবে 'তাযীর' দেয়া হবে।

পশুর সাথে ব্যভিচার

পশুর সাথে সহবাস হারাম হওয়ার ব্যাপারেও আলেমগণ একমত। তবে অপরাধীর শাস্তি নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। জাবের বিন যায়দ থেকে বর্ণিত : যে ব্যক্তি পশুর সাথে সহবাস করবে, তার উপর 'হদ' কার্যকর করা হবে। আলি রা. বলেছেন : সে বিবাহিত হলে তাকে রজম করা হবে। হাসান বলেছেন : এ কাজ ব্যভিচারের শামিল। আবু হানিফা, মালেক, শাফেয়ি, মুয়াইয়িদ বিল্লাহ, নাসের ও ইমাম ইয়াহিয়ার মতে, পশুর সাথে সহবাসের জন্য তাযীর করা যথেষ্ট এবং ওয়াজিব। কেননা এটা ব্যভিচার নয়। অন্য বর্ণনা অনুসারে ইমাম শাফেয়ি বলেছেন : তাকে হত্যা করা হবে। কেননা আহমদ, আবু

দাউদ ও তিরমিযি ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : "যে ব্যক্তি কোনো পশুর সাথে সহবাস করবে, তাকে ও উক্ত পশুকে হত্যা করো।"

ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : "যে ব্যক্তি কোনো মুহাররম (চির নিষিদ্ধ) নারীর সাথে ব্যভিচার করবে, তাকে হত্যা করো, যে ব্যক্তি কোনো পশুর সাথে সহবাস করবে, তাকে হত্যা করো।"

ইমাম শওকানি বলেছেন : "এ হাদিস দ্বারা পশুকে হত্যা করা উচিত এটা প্রমাণিত হয়। এর কারণ সম্পর্কে আবু দাউদ ও নাসায়ি বর্ণনা করেন : ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, পশুটার অপরাধ কী? তিনি বলেন : "আমার মনে হয়না, রসূলুল্লাহ্ সা. একথা বলেছেন। তবে এ পশুর গোশত খাওয়া যে মাকরূহ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা তার সাথে সেই জঘন্য কাজটি করা হয়েছে।"

আলী রা. ও ইমাম শাফেয়ির মতে, ধর্ষিত পশুর গোশত খাওয়া হারাম এবং তাকে যবাই করা হবে। কাসেমি, অন্য বর্ণনা মোতাবেক শাফেয়ি, আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ এ পশুর গোশত খাওয়া মাকরূহ তানযিহি বলেছেন। বাহরের লেখক বলেছেন : পশুটি যদি নিষিদ্ধও হয়ে থাকে, তবু তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে যাতে তার পেটে কোনো বিকৃত শাবক না জন্মে। কেননা কথিত আছে, জনৈক রাখাল একটি পশুকে ধর্ষণ করার ফলে তার পেটে বিকৃত শাবক জন্মেছিল।

ধর্ষণ বা বলাৎকার

যখন কোনো নারীকে জোরপূর্বক ধর্ষণ তথা ব্যভিচারে বাধ্য করা হয়, তখন সেই নারীর উপর কোনো 'হদ' কার্যকর করা হবেনা। কেননা আল্লাহ্ সূরা বাকারার ১৭৩ নং আয়াতে বলেন : "যে ব্যক্তি অনন্যোপায়, কিন্তু নাফরমান কিংবা সীমা লঙ্ঘনাকারী নয়, তার কোনো পাপ পাপ নাই।" আর রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : "আমার উম্মতের উপর থেকে ভুলক্রমে, অনিচ্ছাকৃতভাবে ও বাধ্য হয়ে কৃত যাবতীয় কাজের দায় রহিত করা হয়েছে।" রসূলুল্লাহ্ সা.-এর আমলে জনৈক মহিলাকে ব্যভিচারে বাধ্য করা হয়েছিল, তাই তিনি তার হদ্ রহিত করেছিলেন।

ব্যভিচারে বাধ্য করা দু'ভাবে হতে পারে : শারীরিকভাবে নারীর উপর চড়াও হয়ে জোরপূর্বক সংগম করা তথা ধর্ষণ করা, আর নারীকে ভয় দেখিয়ে তাকে সম্মত করে সংগম করা। এই দুটোই সমান এবং বলাৎকারের পর্যায়ে পড়ে। এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে কোনোই মতভেদ নেই। মতভেদ হয়েছে শুধু ব্যভিচারে বাধ্যকৃত নারীকে মহর দেয়া লাগবে কিনা তাই নিয়ে। ইমাম মালেক ও শাফেয়ির মতে মহর দেয়া লাগবে। ইমাম মালেক মুয়াত্তায় বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান (উমাইয়া শাসক) জনৈক ধর্ষিত মহিলাকে মহর দিতে ধর্ষণকারীকে আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেছেন : ঐ মহিলা কোনো মহর পাবেনা। 'বিদায়াতুল মুজতাহিদ' গ্রন্থে বলা হয়েছে : মতভেদের মূল কারণ হলো, মহর কি শুধু যৌন সংগমের বিনিময়, না স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দান, এই বিষয় নিয়ে মতভেদ। যারা বলে, এটা শুধু যৌন সংগমের বিনিময়, তাদের দৃষ্টিতে মহর হালাল সঙ্গম ও হারাম সঙ্গম উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আর যারা বলেন, এটা শুধু স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দান, যা আল্লাহ্ শুধু বিবাহিত দম্পত্তির জন্য নির্দিষ্ট

করেছেন, তাদের দৃষ্টিতে এটি ব্যভিচারীর উপর ওয়াজিব নয়। তবে এ বিষয়ে আবু হানিফার মতই সঠিক।

ভুল সংগম

যখন কোনো পুরুষের বাসর ঘরে তার স্ত্রী ব্যতীত অন্য কাউকে ঢুকিয়ে দেয়া হয় এবং তাকে বলা হয়, "এই যে তোমার স্ত্রী" অথবা সে নিজের বিছানায় কোনো মহিলাকে পায়, যাকে সে নিজের স্ত্রী ভেবে সহবাস করে, অথবা নিজের স্ত্রীকে ডাকলো, কিন্তু অন্য কেউ এলো এবং সে ভাবলো, সে-ই তার স্ত্রী, অতপর তার সাথে সহবাস করলো, তখন এই লোকটির উপর কোনো হদ্ প্রযোজ্য হবেনা। এভাবে বৈধ ভেবে ভুলক্রমে কৃত যে কোনো অবৈধ সহবাসের জন্য কোনো হদ্ প্রযোজ্য হবেনা। কিন্তু অবৈধ সহবাসে ভুল করলেও হদ প্রযোজ্য হবে। যেমন কোনো মহিলাকে নিষিদ্ধ জেনেও তাকে আহ্বান করার পর অন্য মহিলা এলো এবং তাকে কাঙ্ক্ষিত মহিলাকে ভেবে তার সাথে সহবাস করলো। এ ক্ষেত্রে সহবাসকারীর উপর হদ প্রযোজ্য হবে। আর যদি সে কোনো নিষিদ্ধ মহিলাকে আহ্বান করার পর তার স্ত্রী আসে এবং তাকে কাঙ্ক্ষিত নিষিদ্ধ মহিলা ভেবে সহবাস করে, তবে হদ প্রযোজ্য হবেনা, যদিও তার ধারণার জন্য তার গুনাহ হবে।

কুমারিত্ব বহাল থাকা

কোনো মহিলার বিরুদ্ধে যখন চার ব্যক্তি ব্যভিচারের সাক্ষ্য দেয় এবং কিছু সংখ্যক বিশ্বস্ত মহিলা সাক্ষ্য দেয় যে, ঐ মহিলা এখনো কুমারী, তখন ঐ মহিলার উপর হদ্ কার্যকর করা হবেনা। কেননা অভিযোগটি সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে সাক্ষীদের উপরও মিথ্যা অপবাদের শাস্তি প্রযোজ্য হবেনা। মতটি আবু হানিফার, শাফেয়ির, আহমদের ও যায়দি শীয়াদের।

মতভেদযুক্ত বিয়েতে সহবাস

যে বিয়ের বিশুদ্ধতা নিয়ে মতভেদ রয়েছে, সে বিয়েতে সহবাসের জন্য কোনো হদ্ প্রযোজ্য হবেনা, যেমন মুত্‌য়া বিয়ে, শিগার বিয়ে, হিল্লা বিয়ে, গুলি ও সাক্ষীবিহীন বিয়ে, বায়েন তালাকের ইদ্দতকালে স্ত্রীর বোনকে বিয়ে করা এবং চতুর্থ স্ত্রী বায়েন তালাকপ্রাপ্ত হয়ে ইদ্দত পালনরত থাকা অবস্থায় পঞ্চম বিয়ে করা। কেননা এই বিয়েগুলোর বিশুদ্ধতা নিয়ে ফকিহদের মধ্যে যে মতভেদ রয়েছে, তা সহবাসের বৈধতা নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করে। আর সন্দেহের কারণে হদ্ রহিত হয়। তবে যাহেরি মাযহাব মতে, এ ক্ষেত্রে হদ প্রযোজ্য। কেননা অশুদ্ধ বিয়ের ভিত্তিতে সংঘটিত প্রত্যেক সহবাসে তারা হদ প্রযোজ্য মনে করেন।

বাতিল বিয়েতে সহবাস

যে বিয়ের বাতিল হওয়া সম্পর্কে ঐক্যমত রয়েছে যেমন চার স্ত্রী বহাল থাকা অবস্থায় পঞ্চম বিয়ে, বিবাহিত ও ইদ্দত পালনরত মহিলার বিয়ে, তিন তালাকপ্রাপ্ত মহিলার অন্যত্র বিয়ে ছাড়াই বিয়ে করা। এসব বিয়েতে সহবাস করা হলে তা ব্যভিচার গণ্য হবে এবং হদ প্রযোজ্য হবে। আক্‌দ থাকলেও তা গ্রহণযোগ্য হবেনা।

৪. হদ্দুল কাযাফ (অপবাদ আরোপের শাস্তি)

শরিয়তের পরিভাষায় 'কাযাফ' অর্থ ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করা।

অপবাদ আরোপ হারাম

মানুষের মান সম্ভ্রমের হেফাজত ইসলামের একটা প্রধান লক্ষ্য। তাদের সুনাম ও সম্মান সংরক্ষণ তার দৃষ্টিতে অতীব জরুরি। এ উদ্দেশ্যেই ইসলাম কুৎসা রটনাকারীদের জিহ্বাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এবং নিরপরাধ লোকদের দোষ অন্বেষণের পথ রোধ করে। অসংযত লোকেরা যাতে মানুষের আবেগ ও অনুভূতিকে আহত করতে ও তাদের মান সম্ভ্রমের হানি ঘটাতে না পারে, সেজন্য ইসলাম গ্রহণ করেছে কঠোর প্রতিরোধ ব্যবস্থা। সর্বাধিক কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা বেহায়াপনা ও ব্যভিচারে বিস্তার ঘটানোকে; যাতে সমাজ জীবন এই ঘৃণ্য পাপাচার থেকে পবিত্র ও মুক্ত থাকে। এই উদ্দেশ্যেই ইসলাম ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। এটিকে একটি কবীরা গুনাহ ও জঘন্য অশ্লীলতা বলে আখ্যায়িত করেছে। অপবাদ আরোপকারীর উপর আশিটি বেত্রাঘাত কার্যকর করা অপরিহার্য করেছে, চাই সে নারী হোক কিংবা পুরুষ। তাকে চিরতরে সাক্ষ্য দানের অযোগ্য ঘোষণা করেছে, তাকে ফাসেক অভিশপ্ত ও আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত বলে অভিহিত করেছে এবং তার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবধারিত বলে ঘোষণা করেছে। কেবলমাত্র তখনই কোনো অপবাদকে কর্ণপাতযোগ্য ও বিবেচনাযোগ্য মনে করা হবে, যখন অকাট্য প্রমাণ দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে তার সত্যতা প্রমাণিত হবে। এই অকাট্য প্রমাণ হলো, অভিযুক্ত ব্যক্তি ব্যভিচার করেছে এই মর্মে চারজন চাক্ষুস সাক্ষীর সাক্ষ্য। মহান আল্লাহ সূরা নূরের ৫ ও ৬ আয়াতে বলেন :

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

"যারা সতী রমণীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনা, তাদেরকে আশিটি কষাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবেনা। এরা তো সত্যত্যাগী। তবে যদি এরপর তারা তওবা করে ও নিজেদেরকে সংশোধন করে, তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" সূরা নূরের ২৩, ২৪ ও ২৫ নং আয়াতে তিনি বলেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝ يَّوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ۝

"যারা সাধ্বী, সরলমনা ও বিশ্বাসী নারীর পতি অপবাদ আরোপ করে তারা দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য আছে মহাশাস্তি। যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত ও তাদের পা তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে, সেদিন আল্লাহ তাদের প্রাপ্য প্রতিদান পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জানবে আল্লাহই সত্য, স্পষ্ট প্রকাশক।" আল্লাহ একই সূরার ১৯ নং আয়াতে বলেন :

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ لا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○

"যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখেরাতে মর্মান্তিক শাস্তি। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানোনা।

বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমরা সাতটা সর্বনাশা গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করো : সাহাবিগণ বললেন : হে রসূলুল্লাহ, সেগুলো কী কী? তিনি বললেন : আল্লাহর সাথে শরিক করা, যাদু করা, আল্লাহ যাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন তাকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, এতিমের সম্পত্তি ভোগদখল করা, যুদ্ধের ময়দান থেকে পালানো এবং সতী সরলমনা মুমিন নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করা।

এই নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. এর বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপের ঘটনা উপলক্ষে। আয়েশা রা. বলেন : যখন অপবাদ থেকে আমার অব্যাহতি সম্বলিত আয়াত নাযিল হলো, তখন রসূলুল্লাহ সা. মিম্বরে দাঁড়িয়ে তা উল্লেখ করলেন এবং কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলো তেলাওয়াত করলেন। মিম্বর থেকে নেমেই তিনি অপবাদ আরোপকারী দু'জন হাসসান ও মিসতাহকে এবং একজন মহিলা হিমনাকে অপবাদ আরোপের শাস্তি প্রদানের আদেশ দিলেন এবং তা প্রদান করা হলো।" -আবু দাউদ।

অপবাদ আরোপের শাস্তির শর্তাবলি

শাস্তিযোগ্য অপবাদ আরোপের জন্য কিছু শর্ত রয়েছে, যা পূর্ণ হওয়া ছাড়া এই অপবাদ আশিটি বেত্রাঘাতের শাস্তির যোগ্য হয় না। এই শর্তগুলোর কয়েকটি অপবাদ আরোপ–কারীদের মধ্যে এবং অপর কয়েকটি যাকে অপবাদ দেয়া হয়েছে তার মধ্যে পূর্ণ হওয়া জরুরি।

অপবাদ আরোপকারীর শর্তাবলি

যে শর্তগুলো অপবাদ আরোপকারীর মধ্যে পূর্ণ হওয়া জরুরি, তা হচ্ছে :

১. সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়া ২. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া ৩. স্বাধীন হওয়া। কেননা এগুলো হচ্ছে দায়িত্ব প্রাপ্তির ভিত্তি। এগুলো উপস্থিত না থাকলে দায়িত্ব আরোপিত হয়না। পাগল, বালক বা বল প্রয়োগের শিকার ব্যক্তি যখন কারো বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করে, তখন তার উপর কোনো 'হদ্' কার্যকর হবেনা। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তিন ব্যক্তি যাবতীয় দায় থেকে অব্যাহতি পেয়েছে : ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না জাগ্রত হয়। বালক যতক্ষণ না বয়োপ্রাপ্ত হয় এবং পাগল যতক্ষণ না সুস্থ মস্কিষ্ক হয়।" তিনি আরো বলেছেন : "আমার উম্মতকে অনিচ্ছাক্রমে কোনো গুনাহ করা, ভুলক্রমে কোনো করণীয় কাজ বাদ দেয়া এবং বল প্রয়োগের শিকার হয়ে কোনো গুনাহ করার দায় থেকে মুক্ত করা হয়েছে।" তবে বালক যখন বয়োপ্রাপ্তির এতটা নিকটবর্তী হয় যে, তার অপবাদ কষ্টদায়ক হয়, তখন তাকে এমন কোনো লঘু দণ্ড (তাযীর) দেয়া হবে, যা সমীচীন মনে হয়।

অপবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তির মধ্যে যে শর্তাবলি থাকা জরুরি

যে ব্যক্তি অপবাদের শিকার, তার মধ্যে নিম্নোক্ত শর্তাবলি পূর্ণ হওয়া জরুরি :

১. **সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়া** কেননা অপবাদ আরোপের 'হদ্' এজন্য প্রবর্তিত হয়েছে যেন

অপবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিসাধনপূর্বক কষ্ট দান ও উত্যক্ত করার কারণে অপবাদকারীকে ধিক্কার দেয়া যায় ও ভর্ৎসনা করা যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি সুস্থ মস্তিষ্ক নয়, অপবাদে তার কোনো ক্ষতি হয়না। তাই তার প্রতি অপবাদ আরোপকারীর উপর 'হদ্' কার্যকর করা হবেনা।

২. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া : একইভাবে অপবাদের শিকার ব্যক্তির প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া শর্ত। সুতরাং অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে ও মেয়ের উপর অপবাদ আরোপকারীর উপর 'হদ' জারি হবেনা। তবে যে অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের সাথে সহবাস করা সম্ভব, তাকে তার প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগে কেউ ব্যভিচারের অপবাদ দিলে অধিকাংশ আলেমের মতে এটা হদযোগ্য অপবাদ নয়। এটা ব্যভিচার নয়। কেননা এই মেয়ে ব্যভিচারের হদের যোগ্য নয়। তবে অপবাদদাতাকে তাযীর করা হবে। ইমাম মালেক বলেছেন : এ অপবাদ হদযোগ্য। ইবনুল আরাবি বলেছেন : বিষয়টি সন্দেহযুক্ত। তবে ইমাম মালেক অপবাদ প্রাপ্তের সম্ভ্রমকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আর অন্যরা অপবাদদাতার পিঠ বাঁচানোর বিষয়টাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অপবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তির সম্ভ্রমকেই অগ্রাধিকার দেয়া উত্তম। কেননা অপবাদদাতা তার জিহ্বা দ্বারা গোপনীয়তা লংঘন করেছেন। তাই তার 'হদ' অবধারিত হয়েছে।

ইবনুল মুনযির বলেছেন : ইমাম আহমদ নয় বছর বয়সী মেয়ের বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপকারীর উপর এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপকারীর উপর 'হদ' জারি করার পক্ষে। ইসহাক বলেছেন : যখন এমন কোনো কিশোরকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া হয়, যার সমান ছেলে সহবাস করতে সক্ষম এবং নয় বছরের বেশি বয়সী মেয়েকে যখন ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া হয়, তখন অপবাদ আরোপকারীর উপর হদ জারি করা হবে। ইবনুল মুনযির বলেছেন : অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে বা মেয়ের উপর অপবাদ আরোপকারী হদযোগ্য নয়। কেননা এটা একটা মিথ্যাচার। তবে এটা কষ্টদায়ক হওয়ায় অপবাদদাতাকে তাযীর করা হবে।

৩. মুসলমান হওয়া : যাকে অপবাদ দেয়া হয় তার মুসলমান হওয়া শর্ত। সে যদি অমুসলমান হয়, তবে অধিকাংশ আলেমের মতে তার উপর 'হদ' কার্যকর করা হবেনা। আর যদি অমুসলমান ব্যক্তি অপবাদ আরোপকারী হয় এবং ইহুদী বা খৃষ্টান ব্যক্তি স্বাধীন মুসলমানদের উপর অপবাদ আরোপ করে, তবে তার উপর একজন মুসলমানের মতোই আশি বেত্রাঘাত কার্যকর করা হবে।

৪. স্বাধীন হওয়া : কোনো গোলামের বিরুদ্ধে স্বাধীন ব্যক্তি অপবাদ আরোপ করলে উক্ত গোলামের উপর হদ কার্যকর হবেনা, চাই ঐ গোলাম অপবাদ আরোপকারীর মালিকানাভুক্ত হোক বা অন্য কারো। কেননা স্বাধীন ব্যক্তির তুলনায় তার মর্যাদা ভিন্নতর। তবে স্বাধীন মানুষ কর্তৃক গোলামের বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ হারাম। কেননা বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি তার গোলামের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে, তবে সেই অপবাদ যদি সত্য না হয়, তাহলে কেয়ামতের দিন তার উপর 'হদ' কার্যকর করা হবে।

আলেমগণ বলেছেন : এই শাস্তিটা আখেরাতে কার্যকরী হওয়ার কারণ হলো, তখন মানুষের উপর মানুষের কোনো মালিকানা থাকবেনা, ছোট বড়, গোলাম ও স্বাধীন সব সমান হয়ে যাবে। সেখানে তাকওয়া ব্যতীত আর কোনো কারণে কেউ কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবেনা। তাই সেদিন মযলুম যালেমের নিকট থেকে প্রতিশোধ নেবে, যদি না সে তাকে ক্ষমা করে দেয়। দুনিয়ায় স্বাধীনের কাছ থেকে গোলামের প্রতিশোধ নেয়ার ব্যবস্থা

হয়নি এজন্য যে, তাতে স্বাধীন ও গোলামদের মধ্যকার সম্পর্ক বিকৃত হয়ে যাবে। স্বাধীনদের কোনো আলাদা মর্যাদা থাকবেনা, এবং গোলামদের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ থাকবেনা। যে ব্যক্তি কোনো মানুষকে গোলাম ভেবে তার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করলো এবং পরে ফাঁস হলো যে, সে স্বাধীন মানুষ, তার উপর 'হদ' আরোপ করা হবে। এটা ইবনুল মুনযিরের মত। হাসান বসরীর মতে, হদ আরোপ করা হবেনা। ইবনে হাযম অধিকাংশ আলেমের বিরোধিতা করে বলেছেন : গোলামের বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপকারীর উপর হদ কার্যকর করা হবে। তার মতে, গোলাম ও স্বাধীনের মধ্যে এ ক্ষেত্রে কোনো ভেদাভেদ নেই। তিনি বলেছেন : এ কথার কোনোই মূল্য নেই যে, গোলাম ও বাঁদীর কোনো মান মর্যাদা নেই। প্রকৃতপক্ষে মুমিন মাত্রই বিপুল মর্যাদার অধিকারী। একটা মূর্খ গোলামও অনেক সময় আল্লাহর দৃষ্টিতে কুরাইশী খলিফার চেয়ে উত্তম।" বস্তুত ইবনে হাযমের এই মতই যথার্থ ও ন্যায় সংগত যদি তা উপরোক্ত হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়।

৫. সতিত্ব : এ দ্বারা ব্যভিচার থেকে মুক্ত থাকা বুঝায়। যার উপর অপবাদ আরোপিত হয়েছে, চাই অন্যান্য অপরাধ থেকে সে মুক্ত থাকুক বা না থাকুক, এমনকি কোনো ব্যক্তি যদি তার প্রথম যৌবনে ব্যভিচার করে থাকে, অত:পর সে তওবা করে ও পরিশুদ্ধ হয় এবং তার জীবন প্রলম্বিত হয়, অতপর কেউ তার বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে, তবে সেই অপবাদ আরোপকারীর উপর হদ কার্যকর হবেনা। তবে এই অপবাদ তাযীরের যোগ্য। কেননা সে এমন একটা জিনিস প্রকাশ করেছে, যা গোপন করা ওয়াজিব।

যে অপরাধের জন্য অপবাদ আরোপিত হয়েছে, তার শর্তাবলি

যে অপরাধের জন্য অপবাদ আরোপিত হয়েছে, সে ব্যাপারে যে শর্তাবলি পূরণ হওয়া হদ কার্যকর হওয়ার জন্য জরুরি, তা হলো, ব্যভিচারের কথা স্পষ্ট ভাষায় বলা চাই অথবা এমন ইংগিত করতে হবে, যার অভিব্যক্তি সুস্পষ্ট। এ ক্ষেত্রে মৌখিকভাবে বলা বা লিখে জানানো সমান।

স্পষ্ট ভাষায় বলার উদাহরণ : যেমন বক্তা বললো : 'হে ব্যভিচারী।' অথবা এরূপ অর্থবোধক কোনো বক্তব্য। যেমন, তার সাথে বংশীয় সম্পর্ক অস্বীকার করা। আর ইশারা ইংগিতে অপবাদ আরোপের উদাহরণ হলো : ঝগড়া বা তর্ক বিতর্কের সময় বলা : "আমিও ব্যভিচারী নই, আমার মাও ব্যভিচারিণী ছিলেননা।" ইশারা ইংগিতে অপবাদ আরোপ সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালেক বলেছেন : ইশারা ইংগিতের ভাষা যদি বোধগম্য হয়, তাহলে তা স্পষ্ট অপবাদ আরোপেরই পর্যায়ভুক্ত। কেননা প্রচলিত ব্যবহার পদ্ধতি ও পরিভাষার আলোকে কখনো কখনো ইশারা ইংগিত বাক্যের বিকল্প হয়ে থাকে, যদিও শব্দ সেখানে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। উমার রা. এ মতটি গ্রহণ করেছেন। ইমাম মালেক উমারা বিনতে আব্দুর রহমান থেকে বর্ণনা করেছেন : দুই ব্যক্তি উমর ইবনুল খাত্তাবের আমলে পরস্পরে গালাগালি বিনিময় করেছিল। একজন অপর জনকে বললো : "আল্লাহর কসম, আমার বাবাও ব্যভিচারী নন, আমার মাও ব্যভিচারী নন।" উমর রা. এ ব্যাপারে সাহাবিদের পরামর্শ আহ্বান করলেন। একজন বললেন : সে তো নিজের বাবা ও মার প্রশংসা করেছে। অন্যেরা বললেন : সে তার বাবা মার অন্য রকম প্রশংসাও করতে পারতো। আমরা মনে করি, তার উপর হদ কার্যকর করা উচিত। উমর রা. তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করে হদ কার্যকর করলে। পক্ষান্তরে ইবনে

মাসউদ, আবু হানিফা, শাফেয়ি, সাওরি, ইবনে আবি লায়লা, ইবনে হাযম, যায়েদি শিয়া ও এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আহমদ বলেছেন : ইশারা ইংগিতে কোনো হদ হয়না। কেননা এতে একাধিক অর্থের সম্ভাবনা থাকে। আর একাধিক অর্থ থাকলেই সন্দেহ সংশয়ের সৃষ্টি হয়, যা হদকে রহিত করে। তবে আবু হানিফা ও শাফেয়ি এরূপ ইংগিতে অপবাদ আরোপাকারী বা কটাক্ষকারীকে তাযীর করা উচিত বলে রায় দিয়েছেন। অপরদিকে আর রওযাতুল নাদিয়া গ্রন্থে এ ব্যাপারে সঠিক পন্থা নির্দেশ করে বলেছেন : প্রকৃত ব্যাপার হলো, আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত সতী মহিলাদের প্রতি অপবাদ আরোপের তাৎপর্য এই যে, অপবাদ আরোপাকারী এমন কথা উচ্চারণ করবে, যা আভিধানিক, পারিভাষিক অথবা শরয়ি অর্থ অনুযায়ী ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করা বুঝায় এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকেও বুঝা যায় যে, বক্তা তার কথা দ্বারা ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করা ছাড়া অন্য কিছু বুঝাতে চায়নি। তাছাড়া সে এর এমন কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যাও দেয়নি, যা দ্বারা, তার কথার অন্য অর্থ গ্রহণ করা যায়। এরূপ ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে অপবাদ আরোপের 'হদ' পাওয়া বক্তার জন্য অবধারিত হয়ে যাবে। অনুরূপ, সে যদি এমন কথা বলে, যা দ্বারা সচরাচর ব্যভিচার বুঝায় না অথবা কদাচিত বুঝায়, কিন্তু সে স্বীকার করে যে, সে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করতেই চেয়েছে, তাহলে তার উপর অপবাদ আরোপ করার হদ কার্যকর করা অপরিহার্য হবে। পক্ষান্তরে সে যদি এমন শব্দ দ্বারা কটাক্ষ করে, যার অর্থ ব্যভিচার হওয়া সম্ভব, কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা পূর্বাপর কোনো কথা প্রমাণ করেনা যে, সে ব্যভিচারের অপবাদ করতে চেয়েছে, তাহলে তার উপর কোনো দায় দায়িত্ব বর্তাবেনা। কেননা নিছক সম্ভাব্যতা দ্বারা কাউকে অভিযুক্ত করার অবকাশ নেই।

হদ্দুল কাযাফ বা অপবাদের শাস্তি কিভাবে প্রমাণিত হয়?

এই হদ দুই উপায়ে প্রমাণিত হয় : ১. অপবাদকারীর স্বীকারোক্তি দ্বারা, ২. দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা।

অপবাদ আরোপকারীর ইহকালীন শাস্তি

অপবাদ আরোপকারী যা বলেছে, তার স্বপক্ষে সাক্ষ্য উপস্থিত করতে না পারলে তার জন্য দুটো শাস্তি অবধারিত হয়ে যাবে: এক, আশিটি বেত্রাঘাত; দুই: চিরতরে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান এবং তাকে ফাসেক বলে আখ্যায়িত করা। কেননা সে আল্লাহ ও মানুষের নিকট অন্যায়পরায়ণ ও অবিশ্বস্ত হয়ে যায়। এই দুটো শাস্তিই সূরা নূরের ইতিপূর্বে উল্লিখিত ৫নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। অপবাদ আরোপকারী তওবা করে শুধরে না গেলে তার এই শাস্তি সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে কোনোই মতভেদ নেই।

এই 'হদ' সম্পর্কে আরো দুইটি প্রশ্ন রয়েছে, যার জবাবে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। প্রথম প্রশ্ন হলো : দাস দাসীর শাস্তি ও স্বাধীন মানুষের শাস্তি কি সমান? দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো : অপবাদ আরোপকারী যখন তওবা করে, তখন তার বিশ্বস্ততা কি ফিরে আসবে এবং তার সাক্ষ্য কি গৃহীত হবে?

প্রথম প্রশ্নের জবাব এই যে, একজন দাস যখন একজন সৎ ও স্বাধীন ব্যক্তিকে ব্যভিচারের অপবাদ দেবে, তখন তার উপর নির্ঘাত হদ ওয়াজিব হবে। তবে সেই হদ স্বাধীন ব্যক্তির সমান, না অর্ধেক, সে ব্যাপারে হাদিস সুস্পষ্টভাবে কিছু বলেনি। এজন্য ফকিহদের মতামত বিভিন্ন হয়েছে। অধিকাংশ ফকিহের মতে, দাসের শাস্তি হবে স্বাধীন মানুষের শাস্তির অর্ধেক

অর্থাৎ চল্লিশটি বেত্রাঘাত। কেননা ব্যভিচারের শাস্তির মতো এই শাস্তি দানের বেলায় অর্ধেক হয়ে যায়। সূরা নিসার ৬৫ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :

فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ط

"(দাসীরা) যদি ব্যভিচার করে, তবে তাদের শাস্তি স্বাধীন নারীদের অর্ধেক।"

ইমাম মালেক বলেছেন : .... "আব্দুল্লাহ্ ইবনের আমের বলেছেন, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব, উসমান ইবনে আফফান ও অন্যান্য খলিফাদের যুগ পেয়েছি। তাদের কাউকে দেখিনি, কোনো গোলামকে অপবাদের শাস্তি চল্লিশ বেত্রাঘাতের বেশি দিয়েছেন। পক্ষান্তরে ইবনে মাসউদ, যুহরি, উমর ইবনে আব্দুল আযীয, কুবায়সা, আওযায়ি ও ইবনে হাযম বলেছেন : তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে। কেননা এটা এমন একটি শাস্তি, যা মানুষের প্রাপ্য হিসেবে প্রবর্তিত হয়েছে। যার প্রতি অপবাদ আরোপিত হয়, এ অপরাধটা তার মান সম্ভ্রমের উপর আঘাত হানে। আর স্বাধীনতা ও দাসত্বের কারণে কখনো অপরাধের রকমফের হয়না।

ইবনুল মুনযির বলেছেন : মুসলিম বিশ্বের সকল অঞ্চলে প্রথমোক্ত মতটিই চালু আছে এবং আমিও তার পক্ষে। 'আল-মুসাওয়া' গ্রন্থে বলা হয়েছে, আলেমগণের নিকট এই মতোই গৃহীত। "আররওযাতুন নাদিয়া" গ্রন্থের লেখক দ্বিতীয় মতটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে বলেছেন : "আয়াতটি স্বাধীন ও গোলাম উভয়ের উপর পরিব্যপ্ত। তবে স্বাধীন ব্যক্তি কর্তৃক স্বাধীন ব্যক্তিকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া অপেক্ষা গোলাম কর্তৃক স্বাধীন ব্যক্তিকে অপবাদ দেয়া অনেক বেশি বিপদজনক। অপবাদের শাস্তির ব্যপারে কুরআনে ও হাদিসে কোথাও নেই যে, গোলামের ক্ষেত্রে তা অধিক হবে। সূরা নিসার ৬৫ নং আয়াতে যে অর্ধেক শাস্তির বিধান দেয়া হয়েছে, সেটা ব্যভিচারের শাস্তির সাথে সংশ্লিষ্ট। এর একটির সাথে অন্যটিকে জুড়ে দেয়া যুক্তিবিরোধী। বিশেষত: যখন এর একটি নির্ভেজাল আল্লাহ্র হকের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং অপরাধী (অপবাদের শাস্তি) বান্দার হকের সাথে জড়িত।

দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব হলো ফকিহ্গণ সর্বসম্মতভাবে বলেছেন : অপবাদ রটনাকারী তওবা না করা পর্যন্ত তার সাক্ষ্য গৃহীত হবেনা। কেননা সে যে কাজ করেছে, তা তাকে ফাসেকে রূপান্তরিত করেছে। আর যে ব্যক্তি ফাসেক হয়, সে ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বাসযোগ্য থাকেনা। অথচ ন্যায়পরায়ণতা সাক্ষ্য গ্রহণের শর্ত। আর তওবা না করায় তার ফাসেকী অক্ষুণ্ন থাকে। বেত্রাঘাতের শাস্তি যদিও তার গুনাহের কাফফারা হয় এবং আখেরাতের শাস্তি থেকে তাকে নিস্তার দেয়, কিন্তু এ দ্বারা তার ফাসেকী দূর হয়না, যা তার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হওয়ার কারণ। তবে সে যদি তওবা করে এবং তা পাক্কা তওবা হয়, তাহলে তার বিশ্বস্ততা ফিরবে কিনা এবং তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে কিনা, সে সম্পর্কে ফকিহ্দের দু'রকমের মত পাওয়া যায় :

১. প্রথম মত হলো, খাঁটি তওবা করলে অপবাদের শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে। এটি ইমাম মালেক, শাফেয়ি, আহমদ, লায়েস, আতা, সুফিয়ান বিন উয়াইনা, শা'বি, কাসেম, সালেম, ও যুহরির মত। উমর রা. অপবাদের জন্য শাস্তি দিয়েছেন এমন একজনকে বললেন : তুমি যদি তওবা করো, তবে তোমার সাক্ষ্য গ্রহণ করবো।

২. দ্বিতীয় মত হলো, তওবা করলেও তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবেনা। এ মতটি হানাফিদের, আওযায়ির, সাওরির, হাসানের। সাঈদ বিন মুসাইয়্যেবের, শুরাইহের ইবরাহিম নখয়ির ও

সাদ্দাদ বিন জুবাইরের। এই মতভেদের ভিত্তি হলো। সূরা নূরের এই উক্তির ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ : "তাদের সাক্ষ্য কখনো গ্রহণ করোনা তারা ফাসেক। কিন্তু যারা তওবা করে...." শেষোক্ত ব্যতিক্রমী উক্তি "কিন্তু যারা তওবা করে..." এ দ্বারা সাক্ষ্য গ্রহণ ও ফাসেক হওয়া এই দুটিই যারা বুঝবে তারা বলেছেন, তওবার পরে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। আর যারা এ দ্বারা শুধু ফাসেক হওয়াকে বুঝিয়েছেন। তাদের মতে, সে যত তওবাই করুক, তার সাক্ষ্য গৃহীত হবেনা। তওবার ফলে সে শুধু ফাসেকী থেকে মুক্ত হবে অর্থাৎ আখেরাতের আযাব থেকে রেহাই পাবে।

তওবা কিভাবে করবে?

উমর রা. বলেছেন : অপবাদ আরোপকারীর তওবা তখনই গ্রহণযোগ্য হবে। যখন সে শাস্তিযোগ্য নয়, এমন অপবাদে নিজেকে মিথ্যুক বলে স্বীকার করবে।

মুগিরার বিরুদ্ধে যারা সাক্ষ্য দিয়েছেন তাদেরকে তিনি বললেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিজেকে মিথ্যুক বলে স্বীকার করবে, তাকে ভবিষ্যতে সাক্ষ্য দেয়ার অনুমতি দেবো। আর যে তা না করবে তাকেও সাক্ষ্য দেয়ার অনুমতি দেবো। শিবল বিন মা'বাদ ও নাফে ইবনুল হারেস নিজেদেরকে মিথ্যুক বলে স্বীকার করলো এবং তওবা করলো। আর আবু বকর সেটা করলো না। ফলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হতো। এটাই শাফেয়ি মাযহাবের অনুসৃত মত এবং মদিনাবাসীরও মত। আলেমদের অন্য একটি দল বলেছেন : নিজেকে মিথ্যুক বলে স্বীকার না করলেও চলবে। কেবল নিজেকে সংশোধন, নিজের কার্যকলাপ পরিবর্তন। মিথ্যা অপবাদ আরোপের জন্য অনুতাপ, ক্ষমা প্রার্থনা ও ঐ অন্যায় কাজটির আর কখনো পুনরাবৃত্তি না করাই যথেষ্ট এবং এভাবেই তাকে তওবা করতে হবে। এটা ইমাম মালেক ও ইবনে জরীরেরও মত।

পিতা মাতা কর্তৃক সন্তানের বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ :

আবুস্ সাওর ও ইবনুল মুনযির বলেছেন : পিতা বা মাতা যদি তার ছেলের বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করে, তাহলে কুরআনের প্রত্যক্ষ উক্তির আলোকে তার উপরও হদ্ কার্যকর করা হবে। কেননা অপবাদ আরোপকারীদের মধ্যে ভেদাভেদ করার কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু হানাফি ও শাফেয়িদের মতে হদ্ কার্যকর করা হবেনা। কেননা অপবাদ আরোপকারী যার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হয়েছে তার পিতা বা মাতা না হওয়া শর্ত। এর কারণ হলো, পিতা বা মাতা সন্তানকে খুন করলে তার বদলায় তাকে খুন করা হয়না। সুতরাং খুনের চেয়ে অনেক ছোট অপরাধ হওয়ায় অপবাদের জন্য তার উপর হদ্ কার্যকর না করা অধিকতর সমীচীন। তবে তারা এই পিতা বা মাতাকে তাযীর করার পক্ষে। কেননা অপবাদ একটা কষ্টদায়ক ও ক্ষতিকর কাজ।

একই ব্যক্তির বিরুদ্ধে বারংবার অপবাদ আরোপ

যখন কেউ একই ব্যক্তির বিরুদ্ধে একাধিকবার অপবাদ আরোপ করে এবং একটির জন্যও তার উপর হদ কার্যকর করা হয়নি, তখন তার উপর একটা হদই কার্যকর করা হবে। আর যদি একবার হদ কার্যকর করার পরও সে পুনরায় অপবাদ আরোপ করে, তাহলে দ্বিতীয়বার তার উপর হদ কার্যকর করা হবে। আর যদি দ্বিতীয়বার হদ কার্যকর করার পর পুনরায় অপবাদ আরোপ করে, তাহলে তার উপর তৃতীয়বার হদ কার্যকর করা হবে। এভাবেই অপবাদ আরোপকারীকে প্রত্যেক অপবাদের জন্য শাস্তি দেয়া হবে।

দলীয় পর্যায়ে অপবাদ আরোপ

কোনো অপবাদ আরোপকারী যখন এক দল লোককে ব্যভিচারের দায়ে অভিযুক্ত করে, তখন তার সম্পর্কে ফকিহদের তিন রকমের মতামত রয়েছে :

১. প্রথম মত : তার উপর একটি হদই কার্যকর করা হবে। এ মতটি ইমাম আবু হানিফা, মালেক, আহমদ ও সাওরির।

২. দ্বিতীয় মত : প্রত্যেক অপবাদের জন্য তার উপর একটি করে হদ কার্যকর করতে হবে। এ মতটি শাফেয়ির।

৩. তৃতীয় মত : সে যদি সবাইকে একই শব্দ দ্বারা অপবাদ দেয় যেমন বলে, "হে ব্যভিচারীর দল", তাহলে তার উপর একটি মাত্র হদ কার্যকর করা হবে। আর যদি প্রত্যেককে "হে ব্যভিচারী" বলে পৃথক পৃথকভাবে অপবাদ আরোপ করে, তাহলে যতজনকে সে একথা বলেছে, ততবার তার উর হদ কার্যকর করা হবে।

ইবনে রুশদ বলেছেন : একটি দলের প্রতি অপবাদ আরোপাকারীদের উপর একটি মাত্র হদ কার্যকরী করার স্বপক্ষে সর্বোত্তম প্রমাণ হলো আনাস রা. এর বর্ণিত হাদিস। আনাস রা. বর্ণনা করেছেন, হিলাল ইবনে উমাইয়া তার স্ত্রীকে শুরাইক বিন সামহার সাথে ব্যভিচারের অপবাদ দিয়েছিলেন। তৎক্ষণাত বিষয়টি রসূলুল্লাহ সা. এর নিকট নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে 'লিয়ান' (অভিশাপের আদান প্রদান) করালেন। কিন্তু শুরাইককে ব্যভিচারের শাস্তি দিলেননা। কেউ যখন নিজের স্ত্রীকে অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, তখন এটাই সর্বসম্মত কর্মপন্থা। আর ফকিহদের মধ্যে যারা মনে করেন যে প্রত্যেকের জন্যই 'হদ' কার্যকর করতে হবে, তাদের সর্বাপেক্ষা জোরদার যুক্তি এই যে, এটা হচ্ছে মানুষের হক। তাই যারা অপবাদের শিকার হয়েছে, তাদের কেউ কেউ যদি ক্ষমা করে দেয় এবং সবাই ক্ষমা না করে, তাহলে 'হদ' রহিত হবেনা, আর যারা এক শব্দে অপবাদ দেয়া ও একাধিক শব্দে অপবাদ দেয়ার মধ্যে পার্থক্য করেন এবং যারা একই বৈঠকে অপবাদ দেয়া ও একাধিক বৈঠকে অপবাদ দেয়ার মধ্যে পার্থক্য করেন, তাদের যুক্তি এই যে, অপবাদ সংখ্যায় যে ক'টি হবে, 'হদ'ও সেই ক'টি হবে। কারণ অপবাদের শিকারের সংখ্যাটি ও অপবাদের সংখ্যাধিক্য যখন একত্রিত হবে, তখন হদের সংখ্যা একাধিক হবে।

হদ আল্লাহর হক, না মানুষের হক?

ইমাম আবু হানিফার মতে অপবাদের শাস্তি বা 'হদ্দুল কাযাফ' আল্লাহর হক। এর অর্থ দাঁড়ায়, শাসকের গোচারিভূত হলে তা কার্যকর করা তার উপর ওয়াজিব হয়ে যায়, চাই অপবাদের শিকার ব্যক্তি তার শাস্তির দাবি করুক বা না করুক। সে ক্ষমা করলেও শাস্তি রহিত হবেনা। অপবাদ আরোপকারী তওবা করলে তা তার আখেরাতে উপকারে আসবে এবং এ উপকার আল্লাহ ও তার মধ্যে সীমাবদ্ধ। আর ব্যভিচারের মতো অপবাদের শাস্তিও গোলাম বাদীর জন্য অর্ধেক হবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ির মতে এটা মানুষের হক। তাই অপবাদের শিকার ব্যক্তি শাস্তি দাবি না করলে শাসক তা কার্যকর করতে পারেনা। অপবাদের শিকার ব্যক্তি মাফ করে দিলে শাস্তি রহিত হবে, মাফ না করলে তার উত্তরাধিকারীরা এর দাবি জানাতে পারবে, আর উত্তরাধিকারী মাফ করলে রহিত হয়ে

যাবে। অপবাদের শিকার ব্যক্তি ক্ষমা না করলে অপবাদ আরোপকারীর তওবায় কোনো লাভ হবেনা।

অপবাদের শাস্তি কখন রহিত হয়?

অপবাদ আরোপকারী চারজন সাক্ষী আনতে পারলে অপবাদের শাস্তি রহিত হবে। কেননা সাক্ষীরা সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করে যে, সে এমন কোনো মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেনি, যার জন্য তার শাস্তি প্রাপ্য হবে। তারা বরঞ্চ তাদের সাক্ষ্য দ্বারা ব্যভিচার সংঘটিত হয়েছে এটাই প্রমাণ করে। তাই এক্ষেত্রে অভিযুক্তের উপর ব্যভিচারের হদ কার্যকর হবে। কেননা তার ব্যভিচার প্রমাণিত। অভিযুক্ত যদি তার ব্যভিচারের অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে, তাহলেও অপবাদের শাস্তি রহিত হবে। স্ত্রী যদি স্বামীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয় তাহলে প্রয়োজনীয় শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে স্ত্রীর উপর হদ কার্যকর করা হবে। পক্ষান্তরে স্বামী যদি স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপবাদ দেয় এবং সাক্ষী উপস্থিত না করে, তাহলে স্বামীর উপর অপবাদের শাস্তি প্রযোজ্য হবেনা। বরং স্বামী ও স্ত্রীকে 'লিয়ান' করানো হবে।

৫. মুরতাদ হওয়ার শাস্তি

মুরতাদের সংজ্ঞা

মুরতাদ শব্দটির মূল ধাতু হলো 'রিদ্দাহ' যার শাব্দিক অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। আর মুরতাদ শব্দের শাব্দিক অর্থ প্রত্যাবর্তনকারী। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে কুফরির দিকে প্রত্যাবর্তন বুঝানো হয়েছে। এর পারিভাষিক অর্থ হলো, সুস্থ মস্তিষ্ক প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানের স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে ও কোনো প্রকার বল প্রয়োগ ব্যতিরেকে ইসলাম থেকে কুফরির দিকে প্রত্যাবর্তন করা, চাই সে পুরুষ হোক কিংবা নারী। সুতরাং পাগল ও বালকের মুরতাদ হওয়া বিবেচ্য বিষয় নয়। কেননা রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "তিনজনকে দায়দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে : ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ না জাগ্রত হয়, বালক যতক্ষণ না যৌবনপ্রাপ্ত হয় এবং পাগল যতক্ষণ না সুস্থ মস্তিষ্ক হয়।" (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ) বল প্রয়োগে কাউকে কুফরিসূচক কথা বলতে বাধ্য করলে তা তাকে ইসলাম থেকে বাইরে নিক্ষেপ করেনা, যতক্ষণ তার মন ঈমানের উপর অবিচল থাকে। আম্মার বিন ইয়াসারকে কুফরিসূচক কথা বলতে বাধ্য করা হয়েছিল। ফলে তিনি কুফরিসূচক কথা বলেছিলেন। সেই প্রসংগে আল্লাহ নাযিল করলেন :

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهٖٓ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

অর্থ : কেউ তার ঈমান আনার পর আল্লাহকে অস্বীকার করলে এবং কুফরির জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আল্লাহর গযব আপতিত হবে এবং তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। তবে যাকে কুফরির জন্য বাধ্য করা হয়, কিন্তু তার চিত্ত ঈমানের উপর অবিচলিত, তার জন্য নয়।" (সূরা আন্-নাহল : আয়াত ১০৬)

ইবনে আব্বাস বলেন, মোশরেকরা আম্মারকে, তার পিতাকে, তার মাতা সুমাইয়াকে, সুহায়েবকে, বিলালকে ও খাব্বাবকে ধরে নিয়ে যায় এবং নির্যাতন করে। সুমাইয়াকে দুটি উটের মাঝখানে বেঁধে দেয় এবং তার লজ্জাস্থানে বর্শা ঢুকিয়ে দেয়া হয় এবং সুমাইয়াকে

বলা হয়, "তুই তো ঐ লোকটার জন্য (ইয়াসারের জন্য) ইসলাম গ্রহণ করেছিস।" অতপর তাকে ও তার স্বামীকে হত্যা করা হয়। এরা দু'জনই ইসলামের প্রথম শহীদ।" আম্মার বাধ্য হয়ে মুখ দিয়ে তাদের ঈপ্সিত কুফরী কথা উচ্চারণ করেন ও হত্যা থেকে রেহাই পান। পরে রসূলুল্লাহ সা. এর নিকট এ ঘটনা বিবৃত করলে তিনি আম্মারকে বলেন, তুমি তোমার মনের অবস্থা কেমন অনুভব করছো? আম্মার বললেন, "ঈমানের উপর অবিচল।" তখন রসূলুল্লাহ সা. বললেন, "তারা যদি পুনরায় কুফরী কথা উচ্চারণ করতে বল প্রয়োগ করে, তবে তুমিও পুনরায় তা উচ্চারণ করবে।"

কোনো কাফের তার ধর্ম ত্যাগ করে অন্য কুফরী ধর্মে প্রবেশ করলে সেও কি মুরতাদ গণ্য হবে?

এ বিষয়ে আমাদের জবাব হলো. মুসলমান যখন ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায়, তখনই সে মুরতাদ হয় এবং মুরতাদ সম্পর্কে আল্লাহর বিধান প্রযোজ্য হয়। প্রশ্ন জাগে যে, মুরতাদ হওয়া কি শুধু ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়া মুসলমানদের মধ্যেই সীমিত; নাকি কোনো অমুসলিম যখন তার ধর্ম ত্যাগ করে অন্য কোনো কুফরী ধর্মে প্রবেশ করে, তখন সেও মুরতাদ নামে আখ্যায়িত হবে? এর সুস্পষ্ট জবাব হলো, কোনো কাফের নিজের ধর্ম ত্যাগ করে অন্য একটা কুফরী ধর্ম গ্রহণ করলে তাকে তার পরিবর্তিত ধর্মে বহাল থাকতে দেয়া হবে এবং এ ব্যাপারে তার উপর কোনো বাধা আরোপ করা হবেনা। কেননা সে একটা বাতিল ধর্ম থেকে অন্য এমন একটা ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে, যা বাতিল হওয়ার দিক দিয়ে তার আগেকার ধর্মের সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ। আর ইসলামের দৃষ্টিতে সকল কুফরী ধর্ম একই ধর্ম। পক্ষান্তরে কেউ যখন ইসলাম থেকে অন্য কোনো ধর্মে ধর্মান্তরিত হয় (নাউজুবিল্লাহ!) তখন সে হেদায়াত ও সত্য ধর্ম থেকে গোমরাহি ও কুফরির ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়। এই মতটি ইমাম মালেক ও আবু হানিফার। আল্লাহ বলেন :

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ج

"কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবুল করা হবেনা। (সূরা আলে-ইমরান : আয়াত ৮৫)

তাবরানি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন :

"যে তার ধর্মকে ইসলামের বিরুদ্ধে নিলো, তাকে হত্যা করো।"

এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ির দুটি মত পাওয়া যায় : একটি হলো ধর্মান্তরিত ব্যক্তি ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়ে থাকলে তা গ্রহণ করা হবে, অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে। ইমাম আহমদের দু'টি মতের একটি এর অনুরূপ। অপরটি হলো, সে যদি তার পূর্বের ধর্মের সমমানের বা তার চেয়ে উচ্চতর ধর্মে ধর্মান্তরিত হয় তাহলে তা মেনে নেয়া হবে, আর যদি তার চেয়ে নিকৃষ্টতর ধর্মে দীক্ষিত হয়, তাহলে তা মেনে নেয়া হবেনা। যেমন কোনো ইহুদি যদি খৃস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়, তাহলে তা মেনে নেয়া হবে। কারণ এই উভয় ধর্মই ঐশী ধর্ম হওয়ার দিক দিয়ে সমান ও সমমান সম্পন্ন। উভয় ধর্মই বিকৃত হয়েছে এবং ইসলাম উভয় ধর্মকেই রহিত ও বাতিল করেছে। অনুরূপ কোনো অগ্নি উপাসক যদি ইহুদি বা খৃস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়, তাহলে তাও মেনে নেয়া হবে। কেননা সে উচ্চতর ধর্মে (অর্থাৎ শেরক থেকে ঐশী ধর্মে) ধর্মান্তরিত হয়েছে। যেহেতু সমমানের ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার অনুমতি আছে, তাই উচ্চতর ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া আরো ভালো

কাজ হিসেবে সমাদৃত হওয়া উচিত। কিন্তু কোনো ইহুদি বা খৃস্টান যখন অগ্নি উপাসনার ধর্মে ধর্মান্তরিত হবে, তখন তা মেনে নেয়া ও অনুমোদন করা হবেনা। কেননা এটা হচ্ছে নিকৃষ্টতর ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার শামিল।

পাপে লিপ্ত হওয়ার দরুন কোনো মুসলমানকে কাফের বলা যাবেনা

ইসলামের দুটি অংশ : আকিদা ও শরিয়ত। আকিদার অন্তর্ভুক্ত হলো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, নবুয়্যতের প্রতি বিশ্বাস, আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস। শরিয়ত ছয়টি বিষয় নিয়ে গঠিত :

১. ইবাদত, যথা- নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি।
২. আদব ও আখলাক : যথা- সত্যবাদিতা, ওয়াদা পালন, আমানতদারি ইত্যাদি।
৩. মুয়ামালাত : যথা- ক্রয় বিক্রয়, ও লেনদেন পারিবারিক সম্পর্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ড।
৪. পারিবারিক সম্পর্ক : যথা- বিয়ে, তালাক ইত্যাদি।
৫. দণ্ডবিধি : যথা- হুদুদ ও কিসাস।
৬. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক : যথা বিভিন্ন রকমের চুক্তি ও সন্ধি ইত্যাদি।

এভাবে আমরা দেখতে পাই, ইসলাম একটা সঠিক জীবন ব্যবস্থা, যার আওতায় রয়েছে জীবনের সকল দিক ও বিভাগের যাবতীয় বিধি ব্যবস্থা। ইসলাম দ্বারা সাধারণত এটাই বুঝা হয়। কুরআন ও সুন্নাহ থেকেও এটাই জানা যায়। অনুরূপ মুসলমানরা ইসলামের শুরু থেকেই এটা বুঝে আসছে এবং নিজেদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনে বাস্তবায়িত করে আসছে।

তবে মানুষের মধ্যে সবার মেধা, ক্ষমতা, দৃঢ়তা ও সচেতনতা সমান নয়। কেউবা প্রখর মেধাবী কেউবা স্বল্প মেধাবী, কেউবা প্রবল কর্মক্ষমতার অধিকারী কেউবা স্বল্প কর্মক্ষমতার অধিকারী, কেউবা কর্ম তৎপর কেউবা কর্মহীন, কেউবা অধ্যবসায়ী কেউবা অলস ও কর্মবিমুখ। শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আত্মিক দিক দিয়ে প্রত্যেকের শক্তি ও সামর্থ্যে পার্থক্য রয়েছে। আর এই পার্থক্যের কারণেই কেউবা পরিপূর্ণ ইসলামের নিকটবর্তী, আবার কেউবা তা থেকে কম বা বেশি দূরে অবস্থিত। আর এই দূরত্বের হ্রাস বৃদ্ধি প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং সার্বিক পরিস্থিতি ও পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আল্লাহ বলেন :

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ج فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ج وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ج وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرٰتِ بِإِذْنِ اللّٰهِ ط

অর্থ : অতপর আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে মনোনীত করেছি তাদেরকে কিতাবের অধিকারী করলাম। তবে তাদের মধ্য কেউবা নিজের প্রতি যালিম, কেউবা মধ্যপন্থী এবং কেউবা আল্লাহর ইচ্ছায় কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী।" (সূরা ফাতির : ৩২)

তবে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম থেকে এই দূরত্ব দূরে অবস্থানকারীকে ইসলামের আওতা থেকে ততক্ষণ বাইরে নিক্ষেপ করেনা যতক্ষণ সে এই দীনের প্রতি অকুণ্ঠ ও অবিচল আনুগত্য পোষণ করে। সুতরাং যখন কোনো মুসলমানের মুখ দিয়ে এমন কোনো শব্দ উচ্চারিত হয়, যা কুফরির অর্থ ব্যক্ত করে, কিন্তু উচ্চারণকারী সেই অর্থটি ব্যক্ত করতে চায়নি, অথবা এমন কোনো কাজ তার দ্বারা সংঘটিত হয়, যা ব্যাহত তাকে কাফের বা অমুসলিম

হিসেবে চিহ্নিত বা পরিচিত করে, অথচ এ কাজের কর্তা তা দ্বারা ইসলামকে ত্যাগ করতে ও কাফেরে পরিণত হতে চায়নি, তখন তাকে কাফের বলে রায় দেয়া যাবেনা। মুসলমান যতই পাপ কাজে লিপ্ত হোক ও অপরাধ সংঘটিত করুক, সে মুসলমানই থাকবে, তাকে মুরতাদ বলা যাবেনা। বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে : "রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই, আমাদের কিবলা অভিমুখী হয়, আমাদের মতো নামায পড়ে এবং আমাদের যবাই করা জন্তুর গোশত খায়, সে মুসলমান। সে অন্যান্য মুসলমানের সমান অধিকার ভোগ করবে এবং অন্যান্য মুসলমানের সমান দায়িত্ব বহন করবে।"

রসূলুল্লাহ সা. মুসলমানদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন যেন কেউ কাউকে কাফের বলে অপবাদ না দেয়। কেননা এটা মারাত্মক অপরাধ। ইবনে উমর রা. থেকে মুসলিম বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "যখন কোনো ব্যক্তি তার ভাইকে কাফের আখ্যায়িত করবে, তখন ঐ দু'জনের যে কোনো একজনের উপর অবশ্যই কুফরী আপতিত হবে।"

মুসলমান কখন মুরতাদ হয় ?

কোনো মুসলমানকে ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের আওতা বহির্ভূত ও মুরতাদ বলে রায় দেয়া যাবেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত তার হৃদয় কুফরীর জন্য উন্মুক্ত হয়ে না যায়, তার মনমস্তিষ্ক প্রশান্তি লাভ না করে এবং কার্যত কুফরিতে প্রবেশ না করে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "যার হৃদয় কুফরির জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়, তার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।" আর রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "উদ্দেশ্য দ্বারাই কাজের পরিচিতি। মানুষ মন দিয়ে যা স্থির করে, তাই পায়।" যেহেতু মানুষের মনে যা থাকে, তা গায়েবী বিষয় এবং আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তা জানেন, তাই তার মন যে কুফরিতে লিপ্ত হয়েছে, এমন অকাট্য প্রমাণ প্রকাশ পাওয়া অপরিহার্য, যার কোনো ব্যাখ্যার অবকাশ থাকবেনা। এমনকি ইমাম মালেক বলেছেন, "যে ব্যক্তি এমন কিছু বলে বা করে, যা নিরানব্বইটি ব্যাখ্যায় কুফরি সাব্যস্ত হয় এবং মাত্র একটি ব্যাখ্যায় ঈমান সাব্যস্ত হয়, তার ঐ কাজ বা কথাকে ঈমান সাব্যস্ত করা হবে।"

কুফরী নির্দেশক কতিপয় আলামত

১. ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পরিচিত জিনিসগুলোকে অস্বীকার করা : যেমন আল্লাহর এককত্বকে অর্থাৎ তিনি বিশ্বজগতের স্রষ্টা এই সত্যকে ফেরেশতাদের অস্তিত্বকে, মুহাম্মদ সা. এর নবুয়্যতকে ও শেষ নবী হিসেবে তাঁর পরিচিতিকে, আল্লাহর কাছ থেকে নাযিল হওয়া ওহি হিসেবে কুরআনকে, কেয়ামত ও পরকালকে এবং ফরয হিসেবে নামায রোযা হজ্জ ও যাকাতকে অস্বীকার করা।

২. যেসব হারাম কাজ বা জিনিসের হারাম হওয়ার উপর সমগ্র মুসলিম জাতি একমত, তাকে হালাল মনে করা, যেমন মদ, ব্যভিচার, সুদ, শুকরের গোশত খাওয়া এবং নিরপরাধ লোকদের রক্তপাত ও তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করাকে বৈধ মনে করা। (তবে কেউ যদি বিশেষ ব্যাখ্যা দিয়ে এ ধরনের কোনো কিছুকে বৈধ বলে রায় দেয়, তাকে কুফরী বলা যাবেনা। যেমন খারেজী গোষ্ঠী বিশেষ ব্যাখ্যা দিয়ে সাহাবিদেরকে হত্যা করা ও তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করাকে এবং কুদামা ইবনে মায়উন মদ পান করাকে বৈধ মনে করতো। এতদসত্ত্বেও অধিকাংশ ফকিহ্ তাদেরকে কাফের নয় বলে রায় দিয়েছেন।)

৩. যেসব জিনিসের হালাল হওয়া সম্পর্কে মুসলামনগণ একমত, তাকে হারাম বলে রায় দেয়া। যেমন পবিত্র ও হালাল জিনিসগুলোকে হারাম বলা।

৪. আল্লাহর নবীদের যে কোনো নবীকে গালাগাল করা বা বিদ্রূপ করা।

৫. ইসলামকে গালি দেয়া, কুরআন বা হাদিসকে কটাক্ষ করা বা নিন্দা করা। কুরআন ও হাদিস অনুয়ায়ী বিচার ফায়সালা বর্জন করা এবং মানব রচিত আইনকে কুরআন ও সুন্নাহর উপর অগ্রাধিকার দেয়া।

৬. কারো এই মর্মে দাবি করা যে, তার উপর ওহি নাযিল হয়।

৭. কুরআন শরিফকে ও হাদীসের গ্রন্থাবলীকে অবস্থা ও তাচ্ছিল্য সহকারে বর্জ্য নিক্ষেপের জায়গায় বা আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করা।

৮. আল্লাহর কোনো নামকে, তাঁর কোনো আদেশ ও নিষেধকে বা প্রতিপত্তিকে অবজ্ঞা করা ও বিদ্রূপ করা। অবশ্য কেউ সদ্য ইসলাম গ্রহণ করেছে বলে তার বিধি নিষেধ ও সীমানা জানেনা এমন হলে তাকে কাফের বলে ফতোয়া দেয়া যাবেনা। সে যদি এসবের কোনো একটি অবজ্ঞাবশত অস্বীকার করে, তবে তার বিরুদ্ধে কাফের ফতোয়া দেয়ার অবকাশ নেই।

কিছু কিছু বিধি এমন রয়েছে, যার উপর মুসলমানরা একমত, তবে বিশিষ্ট লোকেরা ব্যতীত আর কেউ তা জানেনা। তাই সেগুলোকে যারা অস্বীকার করে, তাদেরকে কাফের বলা যাবেনা। বরঞ্চ অজ্ঞতার কারণে তাকে অব্যাহতি দেয়া হবে। কেননা সাধারণ মানুষের মধ্যে এর পর্যাপ্ত জ্ঞান বিস্তার লাভ করেনি : যেমন এমন মহিলাকে বিয়ে করা হারাম যার খালা বা ফুফু আগে থেকেই স্ত্রী হিসেবে বহাল রয়েছে, ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকারী উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয় এবং দাদী সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশের উত্তরাধিকার হয় ইত্যাদি। তবে মানুষের মনে যেসব কুচিন্তা ও কুপ্ররোচনার উদ্ভব ঘটে, সেগুলো এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ আল্লাহ ওসব বিষয়ের জন্য মানুষকে দায়ী করেন না। এ সম্পর্কে মুসলিমে আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "আল্লাহ আমার উম্মতকে সেসব কুচিন্তা ও কুপ্ররোচনার দায় থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন, যা তার মনে আপনা থেকে উদ্ভূত হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তদনুযায়ী কথা না বলে বা কাজ না করে।" মুসলিমে আবু হুরায়রা রা. থেকে আরো বর্ণিত : "রসূলুল্লাহ সা. এর সাহাবিদের মধ্য থেকে কয়েকজন তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, হে রসূলুল্লাহ সা., আমাদের মনে মাঝে মাঝে এমন চিন্তা আসে, যা মুখে আনতেও আমাদের ভয় হয়। তিনি বললেন, তোমাদের কি যথার্থই এরূপ অনুভূতি হয়? তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এটাই তো সত্যিকার ঈমান।" (অর্থাৎ সেই চিন্তাকে বিশ্বাসে পরিণত করা তো দূরের কথা, তা মুখে উচ্চারণ করতেও ভয় পাওয়া ঈমানের পূর্ণতার লক্ষণ।) মুসলিমে আবু হুরায়রা রা. থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, বেশি প্রশ্ন করতে করতে এক সময় লোকদের মনে এ প্রশ্নও জাগবে, আচ্ছা, আল্লাহ এসব সৃষ্টি করেছেন, এটা তো বুঝলাম, কিন্তু আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে? যার মনে এ ধরনের প্রশ্ন জাগবে, সে যেন বলে, আমি আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি।"

মুরতাদের শাস্তি

মুরতাদ হওয়া এমন একটা অপরাধ, যা মুরতাদ হওয়ার পূর্বে কৃত সমস্ত সৎ কাজকে বাতিল করে দেয় এবং আখেরাতে কঠিন আযাব অবধারিত করে। মহান আল্লাহ বলেন :

وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ج وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ○

"যে ব্যক্তি তার দীনকে পরিত্যাগ করে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, দুনিয়া ও আখেরাতে তার সমস্ত কাজ নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তারা দোযখের অধিবাসী হবে। সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।" (সূরা বাকারা : আয়াত ২১৭)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলাম থেকে কুফরির দিকে ফিরে যাবে, তারপর ঐ অবস্থার উপর বহাল থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত কাফের অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে, সে যত সৎকাজ করেছে, তা বাতিল ও বৃথা হয়ে যাবে এবং ইহকালে তার সুফল থেকে সে বঞ্চিত হবে। কাজেই মুসলমানদের স্বাভাবিক অধিকারসমূহ সে পাবেনা। আর সে আখেরাতের নিয়ামত থেকেও বঞ্চিত হবে। সে চিরস্থায়ীভাবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত হবে। এছাড়া ইসলাম মুরতাদের জন্য দুনিয়ার জীবনেও সর্বোচ্চ শাস্তি নির্ধারণ করেছে, যা আখেরাতের অবধারিত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির অতিরিক্ত। এই শাস্তি হলো, তাকে হত্যা করা হবে। (কোনো মুসলমান তাকে নিজ উদ্যোগে হত্যা করলে সে হত্যার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হবেনা। তবে শাসককে ডিঙ্গিয়ে বীরত্ব জাহির করতে গিয়ে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার দায়ে তাকে অন্য কোনো লঘুতর শাস্তি দিয়ে তাযীর (সর্তককরণ) কার্যকর করা হবে।)

বুখারি ও মুসলিম ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজের ধর্মকে পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা করো।" বুখারিতে ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "তিনটি কাজের বদলায় ব্যতীত কোনো মুসলমানকে হত্যা করা হালাল নয়, মুসলমান হওয়ার পর কাফের হওয়া, বিয়ে করার পর ব্যভিচার করা এবং বিনা অপরাধে কাউকে হত্যা করা।" দার কুতনি ও বায়হাকিতে জাবের রা. থেকে বর্ণিত, উম্মে মারওয়ান নাম্নী জনৈক মহিলা মুরতাদ হয়ে গেলে রসূলুল্লাহ সা. আদেশ দিলেন যে, তার সামনে ইসলাম পেশ করা হোক, এতে যদি সেস তওবা করে, তাহলে ভালো, নচেত তাকে হত্যা করা হোক। শেষ পর্যন্ত মহিলাটি পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করলো এবং তাকে হত্যা করা হলো।" এটাও সুবিদিত যে, আবু বকর সিদ্দিক রা. আরবে যারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল তারা ইসলামে ফিরে না আসা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। আলেমদের মধ্যে মুরতাদকে হত্যা করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। কেবল মহিলা মুরতাদ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, মহিলা মুরতাদ হলে তাকে হত্যা করা হবেনা। তবে তাকে বন্দী করা হবে। তারপর প্রতিদিন তাকে বাইরে এনে তার নিকট ইসলাম পেশ করা হবে এবং তাকে তওবা করতে বলা হবে। যতদিন পর্যন্ত সে ইসলামে ফিরে না আসে অথবা মারা না যায়, ততদিন পর্যন্ত এরূপ করা হতে থাকবে। কেননা রসূলুল্লাহ সা. নারীকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।

কিন্তু অন্যান্য ফকিহগণ এই মতের বিরোধিতা করেছেন। তারা বলেছেন, মুরতাদ মহিলার শাস্তি মুরতাদ পুরুষের মতোই। উভয়ের ক্ষেত্রে এ শাস্তি সম্পূর্ণ সমান। কেননা মুরতাদ হওয়ার ফলাফল ও ক্ষয়ক্ষতির দিক দিয়ে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তাছাড়া মুয়ায বিন জাবাল বর্ণিত হাদিসে আছে, রসূলুল্লাহ সা. যখন তাকে ইয়ামানে

পাঠালেন, বললেন : "যে কোনো পুরুষ যদি ইসলাম ত্যাগ করে, তবে তাকে ইসলামে ফিরে আসার দাওয়াত দাও। যদি ফিরে আসে তবে তো ভালো, নচেত তাকে হত্যা করো। আর যে কোনো মহিলা যদি ইসলাম ত্যাগ করে, তবে তাকে ফিরে আসার আহ্বান জানাও। যদি ফিরে আসে তবে তো ভালো কথা। নচেত তাকে হত্যা করো।" বিতর্কের মীমাংসায় এটি একটি সুস্পষ্ট বাণী। হাফেয বলেছেন, হাদিসটি হাসন।

বায়হাকি ও দার কুতনি বর্ণনা করেছেন যে, উম্মে কারফা নাম্নী জনৈক মহিলা ইসলাম গ্রহণ করার পর আবার কাফের হয়ে যায়। আবু বকর রা. তাকে তওবা করার আহ্বান জানালেন। কিন্তু সে তওবা করলো না। ফলে তিনি তাকে হত্যা করলেন।

যে হাদিসে নারীদের হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে, সেটা যুদ্ধাবস্থার বেলায় প্রযোজ্য। কেননা তারা দুর্বল এবং তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনা। এটাই রসূলুল্লাহ সা. কর্তৃক নারীদের হত্যা করতে নিষেধ করার কারণ। এক রেওয়ায়াতে আছে, রসূলুল্লাহ সা. জনৈক নিহত মহিলাকে দেখে বলেছিলেন, "এ তো যুদ্ধ করেনি।" তারপর নারীদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করে দিলেন।

মহিলারা যাবতীয় শাস্তিতে সমভাবে পুরুষের অংশীদার। সেক্ষেত্রে কোথাও কোনো ব্যতিক্রম নেই। কাজেই তার উপর যেমন রজম কার্যকর করা হয়, তেমনি মুরতাদ হওয়ার শাস্তিও কার্যকর করা হবে। কোনো পার্থক্য করা হবেনা।

মুরতাদের মৃত্যুদন্ডের যৌক্তিকতা

ইসলাম একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এতে একদিকে যেমন ধর্মীয় বিধান ও রাষ্ট্রীয় বিধানের সমন্বয় ঘটেছে, তেমনি ইবাদত ও সমর পরিচালনার নীতিমালারও সমাবেশ ঘটেছে। এতে কুরআন ও তরবারির যেমন রয়েছে পাশাপাশি অবস্থান, তেমনি আধ্যাত্মিকতা ও বাস্তবতা এবং ইহকাল ও পরকালের মধ্যে রয়েছে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র। এ জীবন বিধান যুক্তি ও প্রমাণভিত্তিক। এর আকিদা বিশ্বাসে ও আইন কানুনে এমন কিছু নেই, যা মানুষের জন্মগত স্বভাব প্রকৃতির সাথে সাংঘর্ষিক কিংবা যা তার বস্তুগত ও নৈতিক পূর্ণতা অর্জনে অন্তরায়। যে ব্যক্তি ইসলামকে নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করে, সে এর প্রকৃত পরিচয় জানে ও স্বাদ পায়। তাই সে যখন ইসলামকে গ্রহণ ও অনুধাবন করার পর তা আবার ত্যাগ করে, সে আসলে সত্য ও যুক্তি থেকে বেরিয়ে যায়, দলিল ও প্রমাণকে অস্বীকার করে এবং সুস্থ বিবেক ও নির্মল স্বভাব প্রকৃতির আওতা বহির্ভূত হয়ে যায়। মানুষ যখন এই পর্যায়ে পৌঁছে, তখন সে অবনতি ও অধোপতনের সর্বনিম্ন স্তরে নেমে যায়। এ ধরনের মানুষের জীবন রক্ষা করা ও তার বেঁচে থাকা নিশ্চিত করার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা তার জীবনের কোনো উচ্চ লক্ষ্য নেই এবং কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নেই।

অপরদিকে ইসলাম একটা সর্বব্যাপী জীবনব্যবস্থা ও পূর্ণাঙ্গ মানবীয় আচরণ বিধির ধারক হিসেবে তার একটা নিরাপত্তা ব্যূহ ও সুরক্ষা প্রাচীর থাকা অপরিহার্য। কেননা প্রতিটি বিধান ও ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য তার রক্ষণাবেক্ষণের সুষ্ঠু ও অটুট পদ্ধতি অবলম্বন করা জরুরি। আর এক্ষেত্রে ঐ ব্যবস্থাকে তার অনুসারীদের মধ্য থেকে সৃষ্ট বিদ্রোহের কবল থেকে মুক্ত করা সবচেয়ে জরুরিও সবচেয়ে শক্তিশালী পন্থা। কেননা বিদ্রোহ তার অস্তিত্বের প্রতি হুমকি এবং তার পতনের অশনি সংকেত। ইসলাম গ্রহণ ও অনুসরণের পর

তা ত্যাগ করা নিঃসন্দেহে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল। আর বিদ্রোহের শাস্তি সর্বকালেই সেই একই শাস্তি, যার উপর মানবরচিত আইনগুলোও একমত। পুঁজিবাদি রাষ্ট্রে হোক বা কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে হোক, কোনো মানুষ যখন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তখন তার সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং ইসলাম যখন মুরতাদদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নির্ধারণ করে, তখন সে নিজের সাথেও যৌক্তিক আচরণ করে, অন্যান্য মতাদর্শের সাথেও সমন্বয় রক্ষা করে।

মুরতাদকে তওবা করানোর চেষ্টার আবশ্যকতা

প্রায় ক্ষেত্রেই নানা ধরনের সন্দেহ সংশয় থেকে উদ্ভূত কুপ্ররোচনাই ঈমানের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং পরিণামে ইসলাম ত্যাগে প্ররোচিত করে। এসব সন্দেহ সংশয় থেকে মুক্ত করার জন্য মুরতাদকে কিছু সুযোগ দেয়া প্রয়োজন। তার মনে যাতে ঈমান পুনরুজ্জীবিত হয়, বিশ্বাস ও প্রত্যয় ফিরে আসে এবং সন্দেহ সংশয় দূরীভূত হয়। সেজন্য তার সামনে যুক্তিপ্রমাণ তুলে ধরা আবশ্যক। তাই মুরতাদকে তওবা করিয়ে ঈমানের দিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা ওয়াজিব। এমনকি সে যদি বারবার মুরতাদ হয়, তবুও এই চেষ্টা প্রতিবার চালানো জরুরি। তাকে কিছুটা অবকাশ দিতে হবে, যাতে সে আত্মসমালোচনা করার সময় পায়। যেনো তার অন্তরে উদ্ভূত কুপ্ররোচণা ও ভুল বুঝাবুঝি দূরীভূত হয় ও তার চিন্তাধারার পর্যালোচনা করতে পারে। এভাবে যদি তার সন্দেহ দূরীভূত হয় এবং সে তার বিভ্রান্তি থেকে ফিরে আসে, কলেমায়ে শাহাদাত ঘোষণা ইসলামে প্রত্যাবর্তন করে এবং ইসলাম বিরোধী যে ধর্মই গ্রহণ করে থাকুক, তা বর্জন করে, তাহলে তা তার তওবা হিসেবে গৃহীত হবে, নচেত তার উপর শাস্তি কার্যকর করা হবে। কোনো কোনো আলেম তিন দিন সময় নির্ধারণ করেছেন। অন্যেরা সময় নির্ধারণ থেকে বিরত থেকেছেন এবং বলেছেন, তাকে উপদেশ দান ও তার সাথে আলোচনা চালাতে থাকতে হবে। যখন দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি হবে যে, তার ইসলামে ফিরে আসার আশা নেই, তখন তার উপর শাস্তি কার্যকর করা হবে। (এটা অধিকাংশ আলেমের মত। কিন্তু হাসান, তাউস ও যাহেরি মাযহাবের মতে, তাকে তাৎক্ষণিকভাবে হত্যা করতে হবে। মুয়ায বর্ণিত হাদিস এর প্রমাণ। ইবনে আব্বাসের মতে সে যদি জন্মগতভাবে মুসলমান থেকে থাকে, তবে তাকে তওবা করানো হবেনা। অন্যথায় করানো হবে।) যারা তিন দিন সময় দানের প্রবক্তা, তাদের দলীল হলো, এক ব্যক্তি সিরিয়া থেকে উমর রা.এর নিকট এলো। উমর রা. বললেন, দূরবর্তী অঞ্চল থেকে কোনো খবর এনেছো নাকি? সে বললো, হ্যাঁ। জনৈক মুসলমান কাফের হয়েছে উমর রা. বললেন, তোমরা তার সাথে কী আচরণ করেছ? সে বললো, আমরা তার কাছে গেলাম এবং তাকে হত্যা করলাম। তিনি বললেন, তোমরা তাকে একটা ঘরে তিনদিন আটক করে রাখলে না কেন? প্রতিদিন মাত্র একটা করে রুটি খাইয়ে তাকে তওবা করাতে চেষ্টা করলে না কেন? হয়তো সে তওবা করতো এবং আল্লাহর বিধানের দিকে ফিরে আসতো। হে আল্লাহ, আমি উপস্থিত ছিলামনা, আমি কোনো আদেশ দেইনি এবং যখন জানতে পেরেছি, তখন আমি এতে সম্মতি দেয়নি। হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট এই ব্যক্তির হত্যার দায় থেকে অব্যাহতি চাই। (শাফেয়ি কর্তৃক বর্ণিত)

আর যারা দ্বিতীয় মতের পক্ষপাতী, তারা আবু দাউদের এই বর্ণনা থেকে প্রমাণ দেন : মুয়ায আবু মূসা আশয়ারীর পর ইয়ামানে যান। সেখানে আবু মূসার নিকট এক ব্যক্তিকে

বন্দী অবস্থায় পান। তিনি বললেন, এ কী ব্যাপার? আবু মূসা লেলেন, সে প্রথমে ইহুদি ছিলো। পরে মুসলমান হয়। তারপর আবার নিজ ধর্মে ফিরে যায় এবং ইহুদি হয়ে যায়। মুয়ায, ওকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমি বসবোনা। এটা রসূলুল্লাহ সা. এর ফায়সালা।" তিনি তিনবার একথা বললেন। অতপর তাকে হত্যা করা হলো। আবু মূসা মুয়ায আসার আগে বিশ দিন ব্যাপী তাকে তওবা করানোর চেষ্টা করেছেন। আব্দুর রাজ্জাক থেকে বর্ণিত, তাকে দু'মাস ধরে ইসলাম গ্রহণ করানের চেষ্টা চলছিল। ইমাম শওকানি বলেন, যারা তওবা করানোর পক্ষপাতী, তারা কয়বার চেষ্টা করতে হবে, তা নিয়ে মতভেদে লিপ্ত হয়েছেন। কারো মতে, একবার যথেষ্ট। কারো মতে, তিনবার করাতে হবে। কারো মতে, তিন দিন ধরে চেষ্টা চালাতে হবে। ইবনুল বাত্তাল আলী রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তাকে এক মাস ধরে তওবা করাতে হবে। ইবরাহিম নাখয়ির মতে, আজীবন তওবা করানোর চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

মুরতাদের আইনী বিধি বিধান

কোনো মুসলমান যখন মুরতাদ হয় এবং ইসলাম থেকে ফিরে যায়, তখন তার অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং একজন মুসলমান হিসেবে তার সাথে যে আচরণ করা হচ্ছিল, তাতেও পরিবর্তন আসে। তার সম্পর্কে শরিয়তের বেশ কিছু বিধি নির্দিষ্ট রয়েছে, যার সংক্ষিপ্তসার নিম্নে তুলে ধরছি :

দাম্পত্য সম্পর্ক : স্বামী বা স্ত্রী মুরতাদ হলে তার সাথে অপর জনের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। কেননা স্বামী বা স্ত্রীর যে কোনো একজন মুরতাদ হলে অনিবার্যভাবে দাম্পত্য সম্পর্কের অবসান ঘটে। এই সম্পর্কচ্ছেদ বিয়ে বাতিল হওয়ার সমার্থক। পরে যদি মুরতাদ তওবা করে ও পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে, তবে নতুন মহর ধার্য করে নতুন আকদ সম্পাদন করতে হবে, যদি সে দাম্পত্য জীবন পুনর্বহাল করতে চায়। (হানাফি মাযহাব মতে, স্বামীর মুরতাদ হওয়া প্রথম বায়েন তালাকের শামিল) সে যে ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে, সেই ধর্মের অনুসারী স্ত্রীর উপস্থিতিতে অন্য স্ত্রী গ্রহণ তার জন্য বৈধ নয়। কেননা সে হত্যার যোগ্য একজন অপরাধী।

উত্তরাধিকার : মুরতাদের মুসলিম আত্মীয় স্বজনদের কেউ মারা গেলে সে তার উত্তরাধিকারী হয়না। কেননা মুরতাদ অমুসলিম। তাই সে তার মুসলমান আত্মীয়ের উত্তরাধিকারী হবেনা। সে ইসলামে প্রত্যাবর্তন না করেই মারা যায় বা নিহত হয়, তবে তার সম্পত্তি তার মুসলিম উত্তরাধিকারীদের নিকট হস্তান্তরিত হবে। কেননা মুরতাদ হওয়ার মুহূর্ত থেকেই সে মৃত বলে বিবেচিত হয়।

একবার আলী রা. এর নিকট এক বৃদ্ধকে আনা হলো। সে ছিলো খৃস্টান। পরে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারপর আবার ইসলাম ত্যাগ করেছে। আলী রা. তাকে বললেন, তুমি বোধ হয় কোনো উত্তরাধিকার পাওয়ার আশায় মুরতাদ হয়েছো। সেটা পাওয়ার পর আবার ইসলামের দিকে ফিরবে?

বৃদ্ধ বললো : না।

আলী রা. বললেন, তাহলে সম্ভবত কোনো মহিলাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে। কিন্তু তার অভিভাবকরা সম্মত হয়নি। এখন তাকে বিয়ে করতে চাও। তারপর ইসলাম গ্রহণ করবে?

বৃদ্ধ বললো : না।

আলী রা. এবার বললেন, তাহলে তোমাকে আহ্বান জানাচ্ছি, ইসলামে ফিরে এসো।

সে বললো : না, যতক্ষণ না ঈসা মসিহর সাক্ষাৎ পাই।

তখন আলী রা. তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। তাকে হত্যা করা হলো এবং তার মুসলমান সন্তানদের তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি দেয়া হলো।

ইবনে হাযম বলেছেন, ইবনে মাসউদ থেকেও এ ধরনের মত বর্ণিত হয়েছে। লায়েছ বিন সাদ ইসহাক বিন রাহওয়াই, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ ও আহমদের মতও অভিন্ন।

মুরতাদ কারো অভিভাবক হতে পারে না : মুরতাদের কারো অভিভাবক হওয়া গ্রহণযোগ্য নয়। এমনকি তার নিজের অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদের বিয়েতেও সে অভিভাবক হতে পারবেনা। তাদের জন্য সে আকদ সম্পাদন করলে তা বাতিল গণ্য হবে। কেননা মুরতাদ হওয়ার কারণে তার অভিভাবকত্বের বিলুপ্তি ঘটেছে।

মুরতাদের সম্পত্তি : মুরতাদ হওয়ার কারণে তার সম্পত্তির উপর তার মালিকানা বিলুপ্ত হয়না। সে মূল কাফেরের মতো নিজের সম্পত্তির মালিকানা ভোগ করবে, নিজের ধন সম্পদকে যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার ও ভোগ দখল করতে পারবে এবং তার উপর তার ক্ষমতা প্রয়োগ কার্যকর হবে। সে হত্যার যোগ্য হওয়ার কারণে তার সম্পত্তির ভোগ দখলের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেনা। কেননা শরিয়ত মুরতাদের জন্য হত্যা ব্যতীত আর কোনো হদ বা শাস্তি নির্ধারণ করেনি। রজম ও কিসাসের কারণেও কেউ সম্পত্তির মালিকানা ও ভোগ দখল থেকে বঞ্চিত হয়না।

মুরতাদ যদি অমুসলিম শত্রু রাষ্ট্রে আশ্রয় নেয় : মুরতাদ যদি অমুসলিম শত্রু রাষ্ট্রে গিয়ে আশ্রয় নেয়, তাহলেও তার সম্পত্তির উপর তার মালিকানা অক্ষুণ্ন থাকবে এবং তার সম্পত্তিকে একজন বিশ্বস্ত লোকের তত্ত্বাবধানে অর্পণ করা হবে।

যিন্দিক এর শাস্তি :

আবু হাতেম মিজিস্তানি বলেছেন, 'যিন্দিক' মূল ফারসি 'যিন্দা করো' শব্দ থেকে আরবিকৃত শঙ্কর শব্দ। এর অর্থ হলো, কালের চিরস্থায়িত্ব। সালাব বলেন, মূল আরবি ভাষায় যিন্দিক শব্দটি নেই। 'যিন্দাকি' অর্থ ভীষণ চতুর। নাস্তিকের প্রতিশব্দ হচ্ছে 'মুলহিদ' ও 'দাহরি'। দাহরি অর্থ 'দাহর' অর্থাৎ কালের চিরস্থায়িত্বের প্রবক্তা। জাওহারি বলেন, যিন্দিক একটি বিদেশী শব্দ, যা আরবিকৃত হয়েছে। হাফেয ইবনে হাজর বলেন, 'আল মিলাল ওয়ান নিহাল' গ্রন্থে বলা হয়েছে, যিন্দিক মতাদর্শের মূল তত্ত্ব হলো, প্রথমে দীসান ও পরে মানি ও মুযদুকের অনুসরণ। (তাদের মতাদর্শের মূল কথা হলো, আলো ও অন্ধকার দুটো আদি সত্তা। এ দুটি যখন একত্রিত হলো, তখন তা থেকে সারা বিশ্বের উৎপত্তি হলো। যারা দুষ্ট প্রকৃতির তারা অন্ধকার থেকে সৃষ্ট। আর যারা সৎ প্রকৃতির, তারা আলো থেকে সৃষ্ট। অন্ধকার থেকে আলোকে মিশ্রণমুক্ত করার জন্য প্রবৃত্তিকে পরাভূত করা জরুরি। পারস্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বাহরাম প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে মানীকে নিজের কাছে হাজির করলেন এবং তার কাছে ব্যক্ত করলেন যে, তিনি তার আদর্শ মেনে নিয়েছেন। অতপর তাকে ও তার শিষ্যদেরকে হত্যা করলেন। তাদের মধ্য থেকে যে কয়জন প্রাণে বেঁচে গেলো, তারা উল্লিখিত মুযদুকের অনুসারী। অতপর ইসলামের অভ্যুদয় ঘটে। উল্লিখিত আলো ও অন্ধকারের তত্ত্বের বিশ্বাসীদেরকে যিন্দিক বলা হয়। এই যিন্দিকদের একটি

গোষ্ঠী মুসলমানদের হাতে নিহত হওয়ার ভয়ে নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়। এই হচ্ছে যিন্দিকদের মূল তত্ত্ব। শাফেয়িদের একটি দল প্রকাশ্যে ইসলাম ও গোপনে কুফরী মত পোষণকারী প্রত্যেককে যিন্দিক বা নাস্তিক বলে আখ্যায়িত করে থাকে।

ইমাম ননবী বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজেকে অন্য কোনো ধর্মের অনুসারী বলে পরিচয় দেয়, তাকে যিন্দিক বলা হয়। 'আল মুসাওয়া' গ্রন্থে বলা হয়েছে : যে ব্যক্তি সত্য ধর্মের বিরোধী, তাকে স্বীকারও করেনা এবং গোপনে বা প্রকাশ্যে তাতে বিশ্বাসও করেনা, সে কাফের। আর যে ব্যক্তি মুখে ইসলামকে স্বীকার করে, কিন্তু মনে মনে অস্বীকার করে, সে মুনাফেক। আর যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে ও মনে মনে ইসলামকে স্বীকার করে, কিন্তু যেসব জিনিস ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ, সেসব জিনিসের কোনো কোনোটির এমন ব্যাখ্যা দেয়, যা সাহাবি তাবেয়ী ও সমগ্র উম্মতের ব্যাখ্যার বিপরীত, সে যিন্দিক বা নাস্তিক। যেমন স্বীকার করে যে, কুরআন সত্য, কুরআনে যে জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা রয়েছে তাও সত্য কিন্তু জান্নাতের অর্থ হলো, প্রশংসনীয় গুণাবলীর কারণে অর্জিত আনন্দ ও তৃপ্তি। আর জাহান্নামের অর্থ হলো, নিন্দনীয় স্বভাবের দারুন অর্জিত ধিক্কার ও তিরস্কার। এছাড়া বাইরে কোনো বেহেশত ও দোযখ নেই। এ ধরনের লোকেরাই যিন্দিক বা নাস্তিক। আর রসূলুল্লাহ সা. যে বলেছেন, তাদের থেকে আল্লাহ আমাকে নিষেধ করেছেন, এটা মুনাফেকদের সম্পর্কে তার উক্তি, যিন্দিক বা নাস্তিকদের সম্পর্কে নয়। শরিয়ত যেমন মুরতাদের শাস্তি হত্যা নির্ধারণ করেছে। যাতে তা মুরতাদের জন্য হুঁশিয়ারি হিসেবে গণ্য হয় এবং তার অনুমোদিত আদর্শকে সংরক্ষণ করা যায়, তেমনি যিন্দিকত্বের জন্যও মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছে, যাতে তা নাস্তিকতার বিরুদ্ধে সাবধান বাণীরূপে কাজ করে এবং ইসলামের অশুদ্ধ ও মনগড়া ব্যাখ্যাকে প্রতিরোধ করা যায়। ইসলামের ব্যাখ্যা দু'রকমের হতে পারে : (১) এমন ব্যাখ্যা, যা কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট উক্তি ও মুসলমানদের সর্বসম্মত মতের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, (২) এমন ব্যাখ্যা, যা কুরআন ও হাদিসের সুস্পষ্ট উক্তি ও মুসলমানদের সর্বসম্মত মতের পরিপন্থী। শেষোক্ত ব্যাখ্যাই যিন্দিক রূপধারণকারীদের মতাদর্শ। যারা রসূলুল্লাহর সা. শাফায়াত, কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ, কবরের আযাব, মুনকার ও নকীরের প্রশ্ন, হিসাব নিকাশ ও জাহান্নামের উপর দিয়ে পুল পার হওয়া এসব তত্ত্বকে অস্বীকার করে, সে নিঃসন্দেহে যিন্দিক ও নাস্তিক, চাই সে বলুক, আমি এসব হাদিসের বর্ণনাকারীকে বিশ্বাস করিনা, অথবা তাদেরকে বিশ্বাস করি, কিন্তু হাদিসের একটা স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা আছে, অতপর এমন মনগড়া ব্যাখ্যা হাজির করে, যা ইতিপূর্বে কেউ কখনো শোনেনি। অনুরূপ যে ব্যক্তি আবু বকর ও উমর রা. সম্পর্কে বলে যে, তারা জান্নাতবাসী নয়, অথচ তাদের জান্নাতবাসী হওয়ার সুসংবাদ সম্বলিত হাদিস এত বেশি সংখ্যক বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী সূত্রে প্রাপ্ত যে তা মিথ্যা হওয়া অসম্ভব। অথবা বলে যে, রসূলুল্লাহ সা. শেষ নবী সত্য, তবে এর অর্থ হলো, তারপরে আর কাউকে নবী নামে আখ্যায়িত করা যাবেনা। কিন্তু নবুয়্যতের মূল যে অর্থ আল্লাহর পক্ষ হতে মানবজাতির নিকট প্রেরিত হওয়া, তার আনুগত্য করা সকলের জন্য ফরয হওয়া, প্রেরিত ব্যক্তির নিষ্পাপ হওয়া ও ভুলত্রুটি থেকে সুরক্ষিত হওয়া, এ অর্থে অনেক ইমাম রয়েছে। এরূপ মত ও বিশ্বাস যারা পোষণ করে, তারাও যিন্দিক, নাস্তিক ও কাফের। এদের হত্যার ব্যাপারে হানাফি, শাফেয়ি ও পরবর্তীকালের আলেমদের অধিকাংশই একমত।

জাদুকর কি হত্যাযোগ্য?

যে জাদুর ব্যাপারে আলেমগণ একমত : জাদুর কার্যকর প্রভাব রয়েছে। জাদু হারাম এবং জাদুকে হালাল বলে বিশ্বাসকারী কাফের। তবে জাদু কোনো বাস্তব জিনিস, না কাল্পনিক এবং জাদু করা কুফরী কিনা তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এই মতভেদের সূত্র ধরে জাদুকর কাফের কিনা তা নিয়েও মতভেদ রয়েছে।

আবু হানিফা ও মালেক বলেছেন, জাদু শেখা মাত্রই জাদুকর হত্যাযোগ্য হয়ে যায়। অতপর জাদু দ্বারা কাজ করলে তো সে হত্যাযোগ্য হবেই। তাকে তওবার আহ্বান জানানো শর্ত নয়। শাফেয়ি ও যাহেরি মাযহাবের মতে, যে কথা ও কাজ দ্বারা সে জাদু করে, তা যদি কুফরী কালাম ও কুফরী কাজ হয়, তাহলে জাদুকর মুরতাদ এবং তওবা না করলে তার উপর মুরতাদের যাবতীয় হুকুম কার্যকর হবে। আর তার কথা ও কাজ যদি কুফরী সূচক না হয়, তবে তাকে হত্যা করা হবেনা। কেননা সে কাফের নয়। সে শুধু গুনাহগার।

একথা সুবিদিত যে, জাদু একটা কবীরা গুনাহ। জাদুকরকে তার জাদুর জন্য হত্যা করা হবেনা। কেবল যখন সে জাদুকে হালাল বলে বিশ্বাস করবে, তখন তাকে হত্যা করা হবে। কেননা হারামকে হালাল গণ্য করার কারণে সে মুরতাদ বলে হত্যাযোগ্য হয়েছে, জাদুর কারণে নয়। রসূলুল্লাহ সা. যে সাতটি গুনাহকে ধ্বংসকারী মহাপাপ বলে আখ্যায়িত করেছেন, তার মধ্যে জাদু অন্যতম।*

যারা জাদুকরকে কাফের মনে করে ও তাকে হত্যাযোগ্য বলে, তাদের যুক্তিপ্রমাণ পর্যালোচনার পর ইবনে হাযম বলেন, বিশুদ্ধ মত এই যে, জাদু কুফরী নয়। আর কুফরী যখন নয়, তখন জাদুকরকে হত্যা করা বৈধ হতে পারেনা। কেননা রসূলুল্লাহ সা. মুসলমান হওয়ার পর কাফের হওয়া, বিয়ে করার পর ব্যভিচার করা ও নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করা ব্যতীত কাউকে হত্যা করা অবৈধ বলে ঘোষণা করেছেন। সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার আলোকে জাদুকর কাফেরও নয়, হত্যাকারীও নয় এবং বিয়ে করার পর ব্যভিচারের দায়েও অভিযুক্ত নয় এবং কুরআন ও হাদিসের কোথাও তাকে হত্যা করার আদেশও দেয়া হয়নি যে, উক্ত তিনটি কারণের উপর এটিও সংযোজন করা হবে। যেমন রাষ্ট্রদ্রোহীকে সংযোজন করা হয়। কাজেই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, জাদুকরকে হত্যা করা অবৈধ। শিয়ারা অবশ্য জাদুকরকে মুরতাদ ও হত্যার যোগ্য মনে করে।

জ্যোতিষী ও গণক-এর শাস্তি :

যে ব্যক্তি জিনদের মধ্য থেকে গোয়েন্দা লালন করে, যে তাকে সাধারণ মানুষের অজানা বিভিন্ন খবর জানায়, তাকে জ্যোতিষী বা কাহেন বলা হয়। আর যে ব্যক্তি আন্দায অনুমানের ভিত্তিতে বিভিন্ন খবর জানায় এবং গায়েব বা অদৃশ্য তথ্য জানে বলে দাবি করে, তাকে গণক বলা হয়। ইমাম আবু হানিফার মতে, গণক ও জ্যোতিষী উভয়ে হত্যারযোগ্য। কেননা উমর রা. বলেছেন, "প্রত্যেক জাদুকর ও জ্যোতিষীকে হত্যা কর।" অন্য এক বর্ণনা মতে উমর রা. বলেছেন, "এ দুজন তওবা করলে তাদেরকে হত্যা করোনা।"

প্রাচীন হানাফি ফকিহদের মতে, গণক ও জ্যোতিষী যদি বিশ্বাস করে যে, শয়তানেরা তার

---

* এখানে মনে রাখা দরকার, জাদু হলো সেই জিনিস যা মানুষের ক্ষতি সাধনের জন্যে বা কারো উপর প্রভাব বিস্তার করার জন্যে বিশেষ ধরণের মন্ত্র তন্ত্র দ্বারা করা হয়। জাদু আর ম্যাজিক এক জিনিস নয়। ম্যাজিক হলো একটা কৌশল। জাদু নিষিদ্ধ, ম্যাজিক নয়। -সম্পাদক

জন্য যা চায় তাই করতে পারে। তবে তারা কাফের। আর যদি বিশ্বাস করে যে, এসব কল্পনা মাত্র, এর কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই, তাহলে কাফের নয়।

৬. ডাকাতি রাহাজানি সন্ত্রাস ও বিদ্রোহের শাস্তি

সংজ্ঞা

বিদ্রোহ, সন্ত্রাস, ডাকাতি ও রাহাজানি দ্বারা এমন একটি সশস্ত্র গোষ্ঠীর তৎপরতাকে বুঝায়, যারা সমাজে অরাজকতা, রক্তপাত, ধনসম্পদ লুণ্ঠন, ছিনতাই, সম্ভ্রমহানি, ফসল ও গবাদিপশু বিনাশ প্রভৃতি অপরাধ সংঘটিত করে।

এর মাধ্যমে তারা ধর্ম, নৈতিকতা, প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলাকে চ্যালেঞ্জ করে। এ ধরনের অপরাধী গোষ্ঠী মুসলিম, অমুসলিম নাগরিক, চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায় কিংবা যুদ্ধরত অমুসলিম যে দলভুক্তই হোক না কেন, যতক্ষণ তারা মুসলিম শাসিত দেশের অভ্যন্তরে থাকে এবং যতক্ষণ তাদের আগ্রাসী কর্মকাণ্ড সকল শ্রেণীর নিরীহ নাগরিকের উপর আঘাত হানতে থাকে, ততক্ষণ তাদের মধ্যে কোনোই পার্থক্য নেই এবং আইনের চোখে তারা সবাই সমান। দেশের আইন শৃঙ্খলা ও প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে এ ধরনের আইন ও রাষ্ট্রদ্রোহী তৎপরতা একটি দল করুক অথবা কোনো ব্যক্তি করুক, তা সমভাবে বিদ্রোহী ও অপরাধমূলক তৎপরতা হিসেবেই গণ্য হবে। কোনো ব্যক্তি বিশেষ যদি এত বেশি শক্তি ও প্রতাপের অধিকারী হয় যা দ্বারা সে সমাজের জান, মাল ও সম্ভ্রমের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করে, তাহলে সেই ব্যক্তিকে একাধারে দস্যু ও দেশদ্রোহী উভয় নামে আখ্যায়িত করা হবে। এই দস্যুবৃত্তি ও বিদ্রোহের আওতায় বিভিন্ন সন্ত্রাসী ও গেরিলা গোষ্ঠীও এসে যায়, যেমন হত্যাকারী দল, শিশু অপহরণকারী দল, আবাসিক এলাকায় হামলা চালানো চোর ডাকাতের দল, ব্যাংক ডাকাতের দল, গণিকাবৃত্তিতে নিযুক্ত করার উদ্দেশ্যে কুমারী মেয়ে ও অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়ে অপহরণকারী দল, দেশে গোলযোগ ও শান্তি শৃঙ্খলার ব্যাঘাত ও নৈরাজ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শাসক ও রাজনীতিকদেরকে গুপ্ত হত্যাকারী দল এবং ফসল ধ্বংসকারী ও গবাদি পশু হত্যাকারী দল ইত্যাদি।

এ ধরনের সন্ত্রাসী শান্তিশৃঙ্খলা বিনাসী গোষ্ঠীকে একদিকে যেমন রাষ্ট্রদ্রোহীও গণ্য করা হয়, অন্যদিকে তেমনি ইসলামেরও শত্রু ও ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত বলেও আখ্যায়িত করা হয়। কেননা ইসলাম এসেছেই সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে, যা সমাজের প্রতিটি সদস্যের অধিকার সংরক্ষণের মাধ্যমেই করে থাকে।

সুতরাং এ ধরনের একটি গোষ্ঠীর রাষ্ট্র ও সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত হওয়া প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রে বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ারই নামান্তর। তাছাড়া একে রাহাজানিও বলা হয়। কেননা জনগণ এ ধরনের সন্ত্রাসী ও সমাজদ্রোহী গোষ্ঠীর অপরাধী তৎপরতার কারণে রাস্তাঘাটে বের হওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। কারণ তারা যে কোনো সময় শান্তিপ্রিয় নিরীহ মানুষের রক্তপাত, দ্রব্যসামগ্রী ছিনতাই ও লুণ্ঠন, সম্ভ্রমহানি অথবা এমন আরো বহু অপরাধ করে বসবে বলে আশংকা করা হয়, যা প্রতিহত করা নিরস্ত্র নিরীহ পথযাত্রীর পক্ষে সম্ভব নয়। কোনো কোনো ফকিহ একে ডাকাতি রাহাজানি দস্যুবৃত্তি, নাশকতা, (সাম্প্রতিক কালের পরিভাষায় সন্ত্রাস ও ছিনতাই ইত্যাদি) নামে আখ্যায়িত করে থাকেন। (চুরি ও ডাকাতির পার্থক্য হলো, চুরিতে সাধারণত অস্ত্র ব্যবহৃত হয়না এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বা

গৃহেরই আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয় আর ডাকাতি একই সাথে একাধিক ব্যক্তি বা গৃহের ক্ষতিসাধন করে, তাতে অস্ত্র ব্যবহৃত হয় ও রক্তপাত পর্যন্তও গড়ায়)

ডাকাতি, রাহাজানি, সন্ত্রাস ও বিদ্রোহ বৃহত্তর অপরাধ

বস্তুত ডাকাতি, রাহাজানি, সন্ত্রাস ও বিদ্রোহ বৃহত্তর অপরাধরূপে গণ্য হয়ে থাকে। এজন্য পবিত্র কুরআনে এসব অপরাধে লিপ্তদেরকে 'আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত' ও 'দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টায় ব্যাপৃত' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সেই সাথে এর জন্য পরকালে কঠিন শাস্তির পাশাপাশি ইহকালেও এমন ভয়াবহ শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে, যা অন্য কোনো অপরাধের জন্য করা হয়নি। আল্লাহ বলেন :

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○

অর্থ : যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় বিপর্যয়করও ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে, অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে। অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে। অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় এটাই তাদের লাঞ্ছনা এবং পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।" (সূরা আল মায়েদা : আয়াত ৩৩)

আর রসূলুল্লাহ সা. এ ধরনের অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তিকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়ার অযোগ্য ঘোষণা করে বলেছেন : "যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহার করে, সে আমাদের কেউ নয়।" অর্থাৎ যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হয়, সে আমাদের আদর্শের উপর নেই। কেননা ইসলামের আদর্শ হলো, মুসলমানদেরকে সাহায্য করা ও তাদেরকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করা, অস্ত্র ব্যবহার করে মুসলমানদের ক্ষতিসাধন ও ভীতসন্ত্রস্ত করা নয়।

আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "যে আনুগত্য ত্যাগ করে এবং মুসলমানদের সমাজ থেকে পৃথক হয়ে যায়, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করবে।" অর্থাৎ কোনো দেশের জনগণ যে শাসকের আনুগত্য করতে সংঘবদ্ধ থাকে, সেই শাসকের আনুগত্য ত্যাগ করা জাহেলিয়াতের পর্যায়ভুক্ত।

ডাকাতি, সন্ত্রাস ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার শাস্তির শর্তাবলি :

এই অপরাধের শাস্তির জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলি পূরণ হওয়া জরুরি :

১. প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়া চাই।
২. অপরাধীর নিকট অস্ত্র পাওয়া চাই।
৩. অপরাধের স্থান হওয়া চাই সমাজ থেকে দূরে।
৪. অপরাধীর আক্রমণগুলো প্রকাশ্যে সংঘটিত হওয়া চাই।

তবে বিশেষজ্ঞদের সবাই এসব শর্তে একমত নন। এ বিষয়ে বিশদ বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো :

১. প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়া : ইসলামী ও যে কোনো আইন মানার বাধ্যবাধকতার জন্য এ শর্ত দুটি পূরণ অপরিহার্য। তাই এই অপরাধের শরিয়ত নির্ধারিত শাস্তি বা হদ কার্যকর করার জন্যও এ দুটি জিনিসের উপস্থিতি শর্ত।

বস্তুত অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক ও পাগলকে যুদ্ধে লিপ্ত বলে গণ্য করা যাবেনা, চাই এ জাতীয় অপরাধে যত লোকই অংশগ্রহণ করে থাকুক না কেন। কেননা শরিয়তের বিধান অনুযায়ী শরিয়তের আইন মান্য করার দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা তাদের উপর এখনও আরোপিত হয়নি। এ বিষয়ে ফকিহদের মধ্যে মতভেদ নেই। মতভেদ রয়েছে এ বিষয়ে যে, এসব অপরাধে যখন বালক ও পাগলরা অংশগ্রহণ করে, তখন তাদের সাথে সাথে এই অপরাধে জড়িত অন্যান্য প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্কদেরকেও শরিয়তের শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেয়া হবে কিনা?

হানাফিদের মতে, তাদেরকেও অব্যাহতি দেয়া হবে। কেননা একই অপরাধে জাড়িত কতক লোককে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেয়া হলে সকলেই অব্যাহতি পাওয়ার অধিকারী। কেননা তারা সকলেই সামগ্রিকভাবে দায়ী। তবে শুধু ডাকাতি, রাহাজানি, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের অপরাধের শাস্তিই রহিত হবে। এই সাথে সংঘটিত অন্যান্য অপরাধের শাস্তি বিধি অনুযায়ী দিতে হবে। যদি হত্যার অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে, তবে ব্যাপারটা নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের এখতিয়ারে চলে যাবে। সে ক্ষমাও করতে পারে, খুনের বদলে খুনের দাবিও করতে পারে। এভাবে অন্যান্য অপরাধের ক্ষেত্রেও ফায়সালা হবে। মালেকি ও যাহেরি মাযহাব অনুযায়ী বালক ও পাগলের শাস্তি রহিত হলেও অন্যদের শাস্তি রহিত হবেনা। কেননা এ শাস্তি আল্লাহর হক, যা থেকে কেউ রেহাই পেতে পারেনা। এ অপরাধের শাস্তির জন্য স্বাধীন হওয়া ও পুরুষ হওয়া শর্ত নয়। নারী ও গোলাম হওয়াতে ডাকাতির অপরাধের উপর কোনো প্রভাব পড়ে না। কেননা নারী ও গোলাম অস্ত্র বহন ও বিদ্রোহাত্মক তৎপরতায় সমভাবেই অংশগ্রহণ করতে পারে। তাই তারাও সমভাবে শাস্তি পাবে। (এক বর্ণনা অনুযায়ী আবু হানিফার মতে, অপরাধীর পুরুষ হওয়া শর্ত। অপর বর্ণনা অনুযায়ী শর্ত নয়।)

অস্ত্র বহনের শর্ত : সন্ত্রাসী ও রাষ্ট্রদ্রোহীদের শাস্তিযোগ্য হওয়ার জন্য তাদের কাছে অস্ত্র থাকা শর্ত। কেননা তারা অস্ত্রের শক্তির উপর নির্ভর করেই তাদের সন্ত্রাসী ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। তাদের কাছে অস্ত্র না থাকলে তারা সন্ত্রাসী নয় বলে বিবেচিত হবে। কেননা বিনা অস্ত্রে তারা কাউকে কোনো কাজে বাধ্য করতে বা বাধা দিতে পারেনা। লাঠি ও পাথর ব্যবহারকারীরা সন্ত্রাসী বলে বিবেচিত হবে কিনা, তা নিয়ে ফকিহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। শাফেয়ি, মালেকি, হাম্বলি, আবু সাওর, আবু ইউসুফ ও ইবনে হাযমের মতে, তারাও সন্ত্রাসী ও রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে বিবেচিত হবে। কেননা অস্ত্রের ধরন ও আধিক্য বিবেচ্য বিষয় নয়, বিবেচ্য বিষয় হলো, তারা ডাকাতি, লুটপাট, ছিনতাই বা রাহাজানি করে কিনা। আবু হানিফার মতে, তারা সন্ত্রাসী নয়।

লোকালয়ের বাইরে সংঘটিত হওয়ার শর্ত : কোনো কোনো ফকিহর মতে, এ ধরনের সন্ত্রাসী ও সহিংস কর্মকাণ্ড মরুভূমিতে সংঘটিত হওয়া শর্ত। লোকালয়ে এ ধরনের অপরাধ করলে তারা সন্ত্রাসী ও ডাকাত হিসেবে গণ্য হবেনা। যেহেতু ও জাতীয় অপরাধের জন্য ডাকাতির শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে, অথচ ডাকাতি জনবসতহীন এলাকায় সংঘটিত হয়ে থাকে এবং জনবসতিপূর্ণ এলাকায় এ ধরনের অপরাধ সংঘটিত হলে প্রায়ই আক্রান্তদের সাহায্যে লোকজন ছুটে আসে, তাই অপরাধীদের ঔদ্ধত্য ও দাপট বাধাগ্রস্ত হয়, সেহেতু

এরা আত্মসাতকারী গণ্য হবে। আর আত্মসাতকারীর জন্য শরিয়তে কোনো হদ নির্ধারিত নেই। এটা আবু হানিফা, সাওরি, ইসহাক ও অধিকাংশ শিয়া ফকিহদের মত। হাম্বলিদের মধ্য হতে খারকীও এই মত পোষণ করেন। অপর একদল ফকিহর মতে এদের সম্পর্কে শরিয়তের বিধি লোকালয় ও অলোকালয়ে একই রকম। কেননা আয়াতে শুধু সন্ত্রাস বা ডাকাতিরই উল্লেখ করা হয়েছে, কোথায় সংঘটিত হয় তার উল্লেখ নেই। তাই সকল ডাকাত ও সন্ত্রাসী এর আওতাভুক্ত। তাছাড়া লোকালয়ে যখন ডাকাতি ও সন্ত্রাস সংঘটিত হয়, তখন তা অধিকতর ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে। তাই লোকালয় সন্ত্রাসীদের শাস্তি পাওয়ার অধিকতর যোগ্য। আর যে সকল অপরাধী চক্র হত্যা, লুণ্ঠন ও ছিনতাই এর কাজে সংঘবদ্ধ, তারাও এদেরই অন্তর্ভুক্ত। এটা শাফেয়ি, হাম্বলি, আবু সাওর, আওযায়ি, লায়স, মালেকি ও যাহেরি মাযহাবের মত।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এই মতভেদ লোকালয়ের প্রকৃতির বিভিন্নতা কারণে হয়েছে। যিনি লোকালয়ের শর্ত আরোপ করেছেন তিনি সেখানকার অধিকাংশ সময়ে বিরাজমান অবস্থাটাই বিবেচনা করেছেন, অথবা তার আমলে তার শহরে বা জনপদে এ ধরনের ঘটনা ঘটতে না দেখে সেই অবস্থার আলোকেই মত প্রদান করেছেন। আর যিনি এ শর্ত আরোপ করেননি, তিনি তার আমলে ও তার লোকালয়ে এর বিপরীত অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছেন। এজন্যই ইমাম শাফেয়ি বলেছেন, শাসক যখন দুর্বল হয় এবং শহরে বা লোকালয়ে সহিংস ঘটনা ঘটে তখন সেটা সন্ত্রাস ও ডাকাতি গণ্য হবে। অন্যথায় সেটা নিছক আত্মসাত বলে তিনি মনে করেন।

প্রকাশ্যে সংঘটিত হওয়ার শর্ত : ডাকাতি ও সন্ত্রাসের ঘটনা শাস্তিযোগ্য হওয়ার জন্য প্রকাশ্যে সম্পদ হরণ শর্ত। গোপনে কোনো কিছু নিলে সে চোর সাব্যস্ত হবে (চোরের শাস্তি ডাকাতের থেকে ভিন্ন)। আর যদি লুণ্ঠন করে নিয়ে পালিয়ে যায় তবে সে লুণ্ঠনকারী বা লুটেরা। তার কোনো অঙ্গ কাটা হবেনা। অনুরূপ, যখন কোনো একজন বা দুজন কাফেলার শেষপ্রান্তে থাকে এবং লুটেরারা তাদের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তখন এই ছিনতাইকারীর কোনো অঙ্গ কর্তন করা হবেনা। কেননা তারা কোনো প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়না। আর যদি স্বল্পসংখ্যক লোকের উপর চড়াও হয় এবং তাদেরকে পর্যুদস্ত করে, তাহলে আক্রমণকারীরা ডাকাত ও দস্যু গণ্য হবে। এটা হানাফি শাফেয়ি ও হাম্বলিদের মত। মালেকি ও যাহেরিরা এ মতের বিরোধী। মালেকি মাযহাবের ইমাম ইবনুল আরবি বলেছেন : "আমাদের মত হলো, ডাকাতি ও সন্ত্রাস লোকালয়ে বা অলোকালয়ে সর্বত্রই ঘটে থাকে, যদিও একটির চেয়ে অপরটি অধিকতর বিভৎস হতে পারে। যে রকমই ঘটুক, তাকে ডাকাতি বা সন্ত্রাস নামেই আখ্যায়িত করা হয় এবং ডাকাতি ও সন্ত্রাসের চরিত্র তাতে বিদ্যমান থাকে। যদি কেউ লোকালয়ে লাঠি নিয়ে বের হয়, তবে তাকে তরবারি দিয়ে হত্যা করা হবে এবং তাকে অধিকতর কঠোর উপায়ে পাকড়াও করা হবে, সহজতর উপায়ে নয়। কেননা এটা গোপন লুণ্ঠনের ঘটনা। আর গোপন অপরাধ প্রকাশ্য অপরাধের চেয়ে খারাপ। এজন্য প্রকাশ্য হত্যা কিসাসের আওতাধীন এবং ক্ষমারও যোগ্য। কিন্তু গুপ্তহত্যা ক্ষমাযোগ্য নয়। এইধরনের ডাকাতি এবং ডাকাত হত্যার যোগ্য।"

তিনি আরো বলেন : "আমি বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করার সময়ে আমার নিকট এমন একটি দল সম্পর্কে অভিযোগ দায়ের করা হয়, যারা সংঘবদ্ধভাবে ডাকাতিতে ও

সন্ত্রাসে লিপ্ত ছিলো। তারা মহিলাকে ধরে নিয়ে যায় এবং বল প্রয়োগে ধর্ষণ করে। অতপর যখন ডাকাত দলটি ধরা পড়লো, তখন আমি আমার সহযোগী মুফতি ও বিচারকদের নিকট জিজ্ঞাসা করলাম এরা ডাকাতির দায়ে দোষী কিনা? তারা বললেন, ওরা ডাকাত নয়। কেননা ডাকাতি হয়ে থাকে দ্রব্যসামগ্রীর লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে, নারীর সম্ভ্রম লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে নয়। আমি বললাম, কী সর্বনাশ! তোমরা কি জাননা, নারীর সম্ভ্রম লুণ্ঠন সম্পদ লুণ্ঠনের চেয়েও জঘন্য ব্যাপার? সম্পদ চলে যাক এবং চোখের সামনে তা লুণ্ঠিত হোক এটা মানুষ বরদাশত করতে পারে, কিন্তু বৌ ঝির ইজ্জত লুণ্ঠিত হোক-এটা কখনো বরদাশত করতে পারেনা। ডাকাতির জন্য আল্লাহ যে শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তার চেয়ে বড় কোনো শাস্তি যদি থাকতো, তবে তা নারীর ইজ্জত লুণ্ঠনকারীদের জন্যই নির্ধারিত হতো। বস্তুত মূর্খ কাযী ও মুফতিদের সাহচর্য বর্জন করা উচিত।"

কুরতুবি বলেছেন, কারো সম্পদ লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে গোপনে বা প্রতারণার মাধ্যমে তাকে হত্যা করা ডাকাতির সমপর্যায়ের অপরাধ, চাই সে নিজের অস্ত্র প্রকাশ করুক বা না করুক। যেমন কোনো ব্যক্তি অপর একজনের বাড়িতে অতিথি হলো বা সফরসঙ্গী হলো, অতপর তাকে সুকৌশলে বিষ খাইয়ে হত্যা করলো। এ ধরনের ব্যক্তিকে কিসাস হিসেবে নয়, ডাকাতির শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে।

ইবনে হাযম বলেন : ডাকাত বা সন্ত্রাসী একজন দুর্ধর্ষ অপরাধী। সে মানুষের মধ্যে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে ও দেশে নৈরাজ্য ছড়ায়, চাই অস্ত্র দিয়ে হোক বা অস্ত্র ছাড়া রাতে হোক বা দিনে হোক, জনপদে হোক বা নির্জন প্রান্তরে হোক, রাজপ্রাসাদে হোক বা মসজিদে হোক, একাকী করুক বা নিজ বাহিনী সাথে নিয়ে করুক, নির্জন মরুভূমিতে করুক বা গ্রামে করুক, বাড়িতে করুক বা কোনো সুরক্ষিত দুর্গে করুক, বড় শহরে বা ছোট শহরে করুক। অনুরূপ যে ব্যক্তি পথচারীদের উপর আক্রমণ চালায় ও হত্যা, যখম, সম্পদ লুণ্ঠন, সম্ভ্রম লুণ্ঠন ইত্যাদির মাধ্যমে আতঙ্ক ছড়ায়, সে সমাজ, রাষ্ট্র ও জনগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত, চাই তাদের সংখ্যা কম হোক বা বেশি হোক।"

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ডাকাতি সন্ত্রাস ও বিদ্রোহ সম্পর্কে ইবনে হাযমের মতই সবচেয়ে প্রশস্ত ও ব্যাপক। মালেকি মাযহাবও তদ্রূপ। পথেঘাটে বা জনপদে যে কোনো পন্থায় ত্রাস সৃষ্টিকারী ডাকাত, সন্ত্রাসীর বিদ্রোহীর এবং ডাকাতির শাস্তিই তার সমুচিত শাস্তি।

ডাকাতি, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের শাস্তি

ডাকাতি, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ নাযিল করেছেন :

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا۟ عَلَيْهِمْ ۖ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

অর্থ : যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং জমিনে ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায় তাদের শাস্তি হলো, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা

বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় এটাই তাদের লাঞ্ছনা। আখিরাতে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে।"

(বিপরীত দিক থেকে অর্থ ডান হাত ও বাম পা অথবা বাম হাত ও ডান পা) তবে তোমদের আয়ত্তাধীন আসবার আগে যারা তওবা করবে তাদের জন্য নয়। সুতরাং জেনে রাখো আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (আল মায়েদা : আয়াত ৩৩-৩৪)

এ আয়াত কাফেরদের সম্পর্কে নয়, বরং মুসলমানদের মধ্য থেকে যারা ডাকাতি, নৈরাজ্য ও সন্ত্রাস সৃষ্টির কাজে ব্যাপৃত তাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। কাফেররা যখন মুসলমানদের হাতে ধরা পড়ে মুসলমান হয়ে যাবে, তখন তাদের ইসলাম গ্রহণের বদৌলতে তাদের প্রাণ ও সম্পদ নিরাপদ হয়ে যাবে। এমনকি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তারা যদি এমন অপরাধ করে থাকে যা ইহকালেও শাস্তিযোগ্য, তাহলেও তারা ঐ শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাবে। সূরা আনফালের ৩৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন :

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ج

"যারা কুফরী করে তাদের বলো : যদি তারা বিরত হয় তবে অতীতে যা কিছু হয়েছে, তা ক্ষমা করে দেয়া হবে।" এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সূরা মায়েদার ৩৩ ও ৩৪ নং আয়াত মুসলমানদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।" আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করার অর্থ হলো, গোলযোগ, নৈরাজ্য, সন্ত্রাস ও আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও সন্ত্রাস করা এবং ইসলামের নীতিমালা ও নির্দেশাবলী লঙ্ঘন ও অমান্য করার মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়ানো। কাজেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়াকে আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া আখ্যায়িত করে এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করারই শামিল। যেমন আল্লাহ বলেছেন : يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا "তারা আল্লাহ ও মুমিনদের ধোকা দেয়।" (আল বাকারা : আয়াত আয়াত ৯)

এখানে আল্লাহ ও মুমিনদেরকে ধোকা দেয়া যেমন প্রকৃত অর্থে নয় বরং রূপক অর্থে, তেমনি সূরা মায়েদায় আল্লাহ ও রসূলের সাথে তারা যুদ্ধ করে একথাও রূপক অর্থে, প্রকৃত অর্থে নয়। কুরতুবী বলেছেন, "তারা আল্লাহ ও তার রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এ কথাটা রূপক। কেননা আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করা যায়না এবং তাঁকে পরাস্ত করা যায়না। তিনি সকল গুণাবলির পূর্ণ ও সর্বোচ্চ মানের অধিকারী এবং তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই প্রতিপক্ষও কেউ নেই-একথা বিশ্বাস করা ওয়াজিব। এর অর্থ হলো, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রিয়জনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এ দ্বারা তিনি মুসলমানদেরকে কষ্ট দেয়া যে কত বড় পাপ, সে কথাই বুঝিয়েছেন। এভাবে তিনি সূরা বাকারার ২৪৫ নং আয়াতে مَنْ ذَاالَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا "যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে" দ্বারাও তাঁর বান্দাদেরকে ঋণ দেয়া বুঝিয়েছেন এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টির জন্যই এভাবে কথাটা বলেছেন। একটি সহীহ হাদিসে কুদসিতে আল্লাহর উক্তি "আমি তোমার কাছে খাবার রেখেছিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে খাবার দাওনি" দ্বারাও আল্লাহর বান্দাদেরকে আহার করানোর গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে।

সূরা মায়েদার এ আয়াত দুটি নাযিল হওয়ার কারণ সম্পর্কে অধিকাংশ আলেম বলেন : একটি দল মদিনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করলো। এরপর মদিনার আবহাওয়া তাদের

শরীরের উপযোগী না হওয়ায় তারা মারাত্মক চর্মরোগে আক্রান্ত হলো। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ সা. তাদেরকে যাকাতের উটের পাল যেখানে রক্ষিত, সেখানে গিয়ে দুধেল উটের দুধ পান করার আদেশ দিলেন। আদেশ অনুযায়ী তারা কাজ করলো। তারপর যখন সুস্থ হলো, তখন উটের রাখালকে হত্যা করে চোখে উপড়ে রেখে ইসলাম ত্যাগ করে ও উটগুলো হাকিয়ে নিয়ে যায়।

এ ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে রসূলুল্লাহ সা. তাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে তাদেরকে ধরে আনতে লোকজন পাঠালেন। তাদেরকে ধরে আনা হলে রসূলুল্লাহ সা. এর আদেশে তাদের হাত ও পা কেটে, চোখ উপড়ে, মদিনার বাইরে হাররা নামক কালো পাথরে পূর্ণ স্থানে ফেলে রাখা হলো। তারা ঐ অবস্থায় ক্ষুধায় ও পিপাসায় ছটফট করে মারা গেলো। এরা ডাকাতি, হত্যা, ইসলাম গ্রহণের পর ইসলাম ত্যাগ এবং আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার দায়ে দোষী ছিলো। এদের সম্পর্কেই আল্লাহ সূরা মায়েদার উক্ত আয়াত দুটি নাযিল করলেন।

আয়াতে যে শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে

এ আয়াতে আল্লাহ ও তার রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির দায়ে চারটি শাস্তির যে কোনো একটি প্রয়োগের আদেশ দেয়া হয়েছে : (১) মৃত্যুদন্ড, (২) শূলে চড়ানো (৩) বিপরীত দিক থেকে হাত ও পা কেটে দেয়া, (৪) দেশ থেকে নির্বাসিত করা। এই শাস্তিগুলো 'অথবা' অব্যয় ব্যবহার করে উল্লেখ করা হয়েছে, যার অর্থ দাঁড়ায় শাসক এই শাস্তিগুলোর মধ্য থেকে যে কোনো একটি প্রয়োগ করার স্বাধীনতার অধিকারী। তিনি এর মধ্যে যেটি অধিকতর কল্যাণকর মনে করবেন, সেটাই প্রয়োগ করবেন, অপরাধের মাত্রা যাই হোক নাকেন। তবে অধিকাংশ আলেমের মতে, এখানে 'অথবা' বাছাই করার স্বাধীনতাবোধক নয়, বরং বৈচিত্রবোধক। অর্থাৎ অপরাধের গুরুত্বের মাত্রা অনুপাতে শাস্তির রকমফের হবে, যেটা ইচ্ছা প্রয়োগ করা যাবে তা নয়।

'অথবা' কথাটি স্বাধীনতাবোধক- এই মতের প্রবক্তাদের যুক্তি

প্রথমোক্ত দলটি বলেন, আয়াতের শাব্দিক অর্থ থেকে এটাই বুঝায়, আর আয়াতের ভাষাগত বিন্যাসও এর সমর্থক। ওদিকে হাদিস থেকে এর বিপরীত কিছু জানা যায়না। আয়াতের অর্থ দাঁড়াচ্ছে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনাকারী ও দেশে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী যেই হোক না কেন, তার শাস্তি হয় হত্যা, নতুবা শূলে আরোহণ, নতুবা হাত পা বিপরীত দিক থেকে কর্তন অথবা দেশান্তরিত হওয়া। এর মধ্যে কার জন্য কোন্‌টি প্রযোজ্য হবে, তা শাসক স্থির করবেন এবং এই শাস্তিগুলোর যে কোনো একটি কার্যকর করা হবে, চাই অপরাধী উল্লিখিত অপরাধগুলোর সবকটি করুক বা যে কোনো একটি করুক। আয়াতে শাসককে এমন ক্ষমতা দেয়া হয়নি যে, অপরাধীর উপর একাধিক শাস্তি কার্যকর করবেন কিংবা কোনোটাই করবেননা। কুরতুবি বলেন : "আয়াত থেকে সুষ্ঠভাবে জানা যায় যে, উক্ত চারটি শাস্তির যে কোনো একটি কার্যকর করার ব্যাপারে শাসকের স্বাধীনতা রয়েছে।" এটা আবু সাওর, মালেক, ইবনে আব্বাস, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, উমর ইবনে আব্দুল আযিয, মুজাহিদ, দাহহাক ও নাখয়ির অভিমত। ইবনে আব্বাস বলেছেন, কুরআনে যেখানেই অথবা থাকবে সেখানেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্বাধীনতা থাকবে। আয়াত থেকে সুষ্ঠভাবেই এটা প্রতীয়মান।

ইবনে কাসির বলেন, 'অথবা' স্পষ্টতই একাধিকের মধ্যে যে কোনো একটি গ্রহণের স্বাধীনতা ব্যক্ত করে। যেমন সূরা মায়েদার ৯৫ নং আয়াতে ইহরামকারী শিকার বধ করলে

যে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় সে সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا .

.... "তোমাদের ইহ্রামকারীদের মধ্যে কেউ শিকার হত্যা করলে তার উপর হত্যাকৃত জন্তুর সমান বিনিময় বর্তাবে, যার ফয়সালা তোমাদের মধ্যে দুজন ন্যায়বান লোক করবে, সে জন্তুটি হাদিয়া হিসেবে কাবার পৌঁছাতে হবে। অথবা তার উপর কাফফারা বর্তাবে কয়েকজন মিসকিনের খাবার, অথবা তার সমপরিমাণ রোযা রাখবে।"

ফিদিয়ার ব্যাপারে আল্লাহ আরো বলেন :

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ج

"তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে কিংবা তার মাথায় কোনো কষ্ট থাকে, তবে রোযা কিংবা সদকা অথবা কুরবানি দিয়ে তার ফিদিয়া দেবে।"

অনুরূপ কসমের কাফফারার ব্যাপারে আল্লাহ বলেন :

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

"দশজন মিসকিনকে খাদ্য দান করা, মধ্যম ধরনের খাদ্য, যা সাধারণত তোমাদের পরিবারের লোকদেরকে খেতে দাও, অথবা তাদেরকে পোশাক দান করা অথবা একজন দাস বা দাসীকে মুক্ত করা।"

এর সবকটিতেই নির্বাচনের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। কাজেই অনুরূপ স্বাধীনতা এ আয়াতের মধ্যেও রয়েছে।

যারা বলে 'অথবা' কথাটি স্বাধীনতা নয় বৈচিত্র বুঝায় তাদের যুক্তি :

দ্বিতীয় দলটি তাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে সাহাবিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় ভাষাবিদ ও কুরআন বিশারদ ইবনে আব্বাসের বর্ণিত একটি উক্তিকে প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরেন, যা ইমাম শাফেয়ি স্বীয় মুসনাদে উদ্ধৃত করেছেন। সেটি হচ্ছে :

"যখন অপরাধীরা হত্যাও করবে এবং সম্পদও লুণ্ঠন করবে তখন তাদেরকে শূলে চড়াতে হবে। আর যখন শুধু হত্যা করবে, সম্পদ লুণ্ঠন করবেনা, তখন তাদেরকে হত্যা করা হবে, শূলে চড়ানো হবেনা। আর যখন শুধু সম্পদ লুণ্ঠন করবে, হত্যা করবেনা, তখন তাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কাটা হবে। আর যখন শুধু পথিকদেরকে ভীতি প্রদর্শন করবে ও আতঙ্ক ছড়াবে এবং কোনো সম্পদ লুণ্ঠন করবেনা এবং হত্যাও করবেনা, তখন তাদেরকে নির্বাসনে পাঠানো হবে।" ইবনে কাছির বলেছেন, ইবনে জারীরের তাফসিরে বর্ণিত হাদিস সহি হয়ে থাকলে তা ইবনে আব্বাসের উক্ত বিবরণের যথার্থতা প্রমাণ করে। হাদিসটি হচ্ছে: "ইয়াযিদ বিন হাবিব থেকে বর্ণিত হয়েছে, মালেক ইবনে মারওয়ান আনাস বিন মালেককে একটি চিঠি লিখে এ আয়াত সম্পর্কে জানতে চান। তখন আনাস তাকে চিঠি লিখে জানান যে, এ আয়াত বুজায়লা গোত্রের সেই দলটি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল, রাখালকে হত্যা করে উটের পাল হাকিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, ভীতি ও সন্ত্রাস ছড়িয়েছিল এবং নারীদেরকে ধর্ষণ করেছিল। তাদের সম্পর্কে ও রাষ্ট্রদ্রোহীদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সা. জিবরীল (আ.)কে জিজ্ঞাসা করলে

জিবরীল বললেন, যে ব্যক্তি সম্পদ চুরি করবে ও ত্রাস ছড়াবে, চুরির জন্য তার হাত কাটবে এবং ত্রাস ছড়ানোর জন্য তার পা কাটবে। আর যে ব্যক্তি হত্যা করবে তাকে হত্যা করবে। আর যে হত্যা, ত্রাস ছড়ানো ও নারী ধর্ষণ-ছিনতাই করবে তাকে শূলে ছড়াবে।"

এই দলটি বলেছে, অগ্রগণ্য মত হলো, আয়াতে শাস্তির শ্রেণী বিন্যাস করা হয়েছে, নির্বাচনের স্বাধীনতা দেয়া হয়নি। আল্লাহ এই বিপর্যয় ও নৈরাজ্য সৃষ্টির অপরাধের জন্য কয়েক মাত্রার শাস্তি নির্ধারণ করেছেন। কেননা এই নৈরাজ্য সৃষ্টিরও কয়েকটি মাত্রা রয়েছে, যেমন হত্যা, সম্পদ লুণ্ঠন, সম্ভ্রমহানি এবং ফসল ও জীবজন্তুর বংশ বিনাশ করা। কোনো কোনো দস্যু এ অপরাধগুলোর মধ্যে হতে এক বা একাধিক অপরাধ সংঘটিত করে থাকে। এটা যুক্তিসংগত হতে পারে না যে, শাসক এসব অপরাধীর মধ্য হতে যাকে যে শাস্তি দিতে চান, দিতে পারবেন। বরং তার কর্তব্য, এদের প্রত্যেককে তার নৈরাজ্য ও অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী যথোপযুক্ত শাস্তি দেয়া। এটাই যথাযথ সুবিচার। আল্লাহ সূরা আশ শূরার ৪০ নং আয়াতে বলেছেন, "মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ" এ হচ্ছে শাফেয়ি মাযহাবের মত। সর্বাধিক বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী এটা ইমাম আহমদেরও মত। ইমাম আবু হানিফাও এই মত পোষণ করেন, তবে তার মতে এর কিছু বিশদ বিবরণ রয়েছে। ফাসানি বাদায়ে গ্রন্থে 'অথবা'কে নির্বাচনের স্বাধীনতা দেয়ার অর্থে গ্রহণকারীদের মতের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে বলেন, "বিভিন্ন বিধিতে বাহ্যত স্বাধীনতা বোধক 'অথবা' অব্যয় দ্বারা যে স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে, সেটিকে বাহ্যিক অর্থে তখনই গ্রহণ করা হবে যখন সব কটির ওয়াজিব হওয়ার কারণ একই থাকে, যেমন কসমের কাফফারা ও শিকার হত্যার কাফফারার ক্ষেত্রে হয়েছে। কিন্তু যখন কারণটি বিভিন্ন হয়, তখন প্রত্যেক বিধিতে তা পৃথকভাবে ঐ বিধির বিবরণ অনুযায়ী অর্থ ব্যক্ত করবে। যেমন সূরা কাহফের ৮৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّآ اَنْ تُعَذِّبَ وَاِمَّآ اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا ۝

"আমি বললাম, হে যুলকারনাইন, হয় শাস্তি দাও, না হয় এদের সাথে উত্তম ব্যবহার করো।" এখানে 'হয়' ও 'না হয়' (যা 'অথবা'র অর্থবোধক) উল্লিখিত দুটি জিনিসের যে কোনোটি গ্রহণের স্বাধীনতা প্রদান বুঝায় না, বরং প্রত্যেকটার আলাদা ব্যাখ্যা দান বুঝায়। কারণ এখানে উভয় বিধির কারণ ভিন্ন ভিন্ন। অর্থাৎ 'হয় যে যুলুম করে তাকে শাস্তি দাও, না হয় যে ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তার সাথে উত্তম ব্যবহার করো।" কেননা এর পরবর্তী আয়াতে যুলকারনাইনের জবাব উল্লেখ করা হয়েছে :

قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّكْرًا ۝ وَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَآءَ نِ الْحُسْنٰى ج

"সে বললো, যে যুলুম করবে তাকে আমি শাস্তি দেব, অতপর সে তার প্রভুর নিকট ফিরে যাবে, তিনিও তাকে কঠোর শাস্তি দেবেন। আর যে ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে, তার জন্য তার বিনিময়ে উত্তম পুরস্কার রয়েছে।"

ডাকাতির শ্রেণীভেদ রয়েছে। যেমন এটা শুধু সম্পদ লুণ্ঠন হতে পারে, শুধু হত্যাকাণ্ডও হতে পারে, আবার উভয়টির সমাবেশও ঘটানো হতে পারে। আবার কখনো এটা শুধু ভয় দেখানোর মধ্যেও সীমিত থাকতে পারে।

সুতরাং বিধিটির কারণ বিভিন্ন হয়ে যাওয়ায় একে স্বাধীনতা দানের অর্থে নেয়া চলবেনা, বরং প্রত্যেকটি বিধি পৃথক বিবরণের অর্থে নেয়া হবে। অথবা এই দুটির যে কোনো একটির অর্থে নেয়া হবে। তবে নির্দিষ্ট না হওয়ায় এটা প্রমাণ হিসেবে পেশ করা যাবেনা। আর যখন সংশ্লিষ্ট আয়াতকে সাধারণ ডাকাত বা সন্ত্রাসীর ক্ষেত্রে দৃশ্যমান স্বাধীনতা প্রদানের অর্থে গ্রহণ করা সম্ভব হবেনা।' তখন প্রত্যেক বিধিতে ডাকাতির বিভিন্ন শ্রেণীর বিবরণ সুপ্ত রয়েছে ধরে নেয়া হবে। অর্থাৎ আয়াতটিতে আল্লাহর বক্তব্য এ রকম ধরে নেয়া হবে : "যারা আল্লাহ ও তার রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায়, তাদের একমাত্র শাস্তি এই যে, তারা যদি কাউকে হত্যা করে থাকে তবে তাদেরকে হত্যা করা হবে, অথবা সম্পদ হরণ ও হত্যাকাণ্ড উভয়টি করলে শূলে চড়ানো হবে, অথবা শুধু সম্পদ হরণ করলে হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কাটা হবে, অথবা শুধু ভীতি ও আতঙ্ক ছড়ালে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হবে।" একদল মানুষ ইসলাম গ্রহণের জন্য মদিনায় এলে তাদের উপর আবু বুরদা আসলামি যখন ডাকাতি করলো, তখন রসূলুল্লাহ সা.কে জিবরীল এভাবেই ব্যবস্থা নিতে বলেছিলেন। রসূলুল্লাহ সা. বলেন : "যে হত্যা করবে, তাকে হত্যা করা হবে, যে সম্পদ লুণ্ঠন করবে কিন্তু হত্যা করবেনা, তার হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কাটা হবে, আর যে হত্যাও করবে সম্পদও লুণ্ঠন করবে, তাকে শূলে চড়ানো হবে। আর যে ব্যক্তি মুসলমান হয়ে যাবে তার অতীতের শিরকের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।"

অপরাধের শ্রেণীভেদে শাস্তির প্রকারভেদের ব্যাখ্যা

আমরা বলেছি, অধিকাংশ ফকিহর মত হলো, অপরাধের শ্রেণীভেদ অনুসারে শাস্তিতে পার্থক্য হবে। শাস্তির এই পার্থক্যটা নিম্নরূপ হবে :

১. নৈরাজ্য সৃষ্টির অপরাধটা শুধু পথচারীকে ভীতিপ্রদর্শন ও তার দ্রব্যসামগ্রী কেড়ে নেয়ার মধ্যে সীমিত থাকবে, এর বেশি কিছু ঘটবেনা। এদেরকে নির্বাসিত করা হবে। অথবা যে শহরে তারা নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে, তাদেরকে সেখান থেকে মুসলিম দেশের অন্য কোনো শহরে নির্বাসিত করা হবে। তবে তারা কাফের হলে তাদেরকে অমুসলিম দেশেও দেশান্তরিত করা যাবে। এর যৌক্তিকতা এই যে, এতে তারাও নিজেদের কর্মফল ভোগ করবে ও নির্বাসনের মজা টের পাবে, আর যে এলাকায় তারা নৈরাজ্য ছড়িয়েছে সে এলাকা তাদের অপরাধ ও ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবে এবং এলাকাবাসী তাদের অপতৎপরতার কুপ্রভাব থেকে মুক্ত হবে। ইমাম মালেক থেকে বর্ণিত, নির্বাসনের অর্থ নিজ শহর থেকে অন্য শহরে তাদেরকে বহিস্কার করা এবং সেখানে তাদের তওবা প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত কারাগারে রাখা। এটা ইবনে জারীরেরও মত। পক্ষান্তরে হানাফিরা মনে করেন নির্বাসন অর্থ কারাগারে পাঠানো এবং তারা কারাগারেই থাকবে যতক্ষণ না প্রকাশ পাবে যে, তারা ভালো হয়ে গেছে। কারণ কারাগার অতি সংকীর্ণ জায়গা। তাই কারাবন্দী নির্বাসিতের মতই। সে যেন তার এলাকা থেকে কারাগারে নির্বাসিত হয়েছে।

২. নৈরাজ্য ও সন্ত্রাস সৃষ্টি হত্যাকাণ্ড ছাড়া শুধু সম্পদ হরণের মধ্য দিয়ে সংঘটিত হলে তার শাস্তি হলো, ডান হাত ও বাম পা কেটে দেয়া। কেননা এই অপরাধটাতে চুরির চেয়ে অতিরিক্ত কিছু যুক্ত হয়েছে। সেটি হলো সশস্ত্রভাবে ভীতির প্রদর্শন বা আক্রমণ। হাত ও পায়ের অংশ কাটা হলে তার অবশিষ্টাংশে তাৎক্ষণিকভাবে রক্ত পড়া বন্ধ করতে হবে, যাতে করে সে রক্তক্ষরণের কারণে মরে না যায়। বিপরীত দিক থেকে কর্তনের কারণ

হলো, এক হাত ও এক পা থাকলে তা দিয়ে সে কাজ চালাতে পারবে। এভাবে এক হাত ও এক পা কর্তিত হওয়ার পর সে যদি পুনরায় ডাকাতি করে, তাহলে তার অবশিষ্ট বাম হাত ও ডান পা কেটে দেয়া হবে। অধিকাংশ ফকিহদের মতে, কেড়ে নেয়া সম্পদ 'নেছাব' পরিমাণ হওয়া এবং সংরক্ষিত স্থান থেকে নেয়া শর্ত। কেননা চুরি ও ডাকাতি একটা অপরাধ, যার জন্য নির্ধারিত শাস্তি রয়েছে। অপরাধ যখনই সংঘটিত হয়, তখনই তার প্রতিফল দেয়া হবে চাই তা কোনো ব্যক্তি দ্বারা অথবা দল দ্বারা সংঘটিত হোক। হৃত সম্পদ বা সামগ্রী যদি নেছাব পরিমাণ না হয় এবং সংরক্ষিত স্থান থেকে না নেয়া হয়, তাহলে হাত পা কর্তন করা হবেনা। আর যদি অপরাধী একাধিক হয়, তাহলে প্রত্যেকের অংশ নেছাব পরিমাণ হওয়া শর্ত কিনা তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। সম্মিলিতভাবে ডাকাতদের অপহৃত সম্পদ যদি নেছাব সমান হয়, তাহলে পৃথকভাবে প্রত্যেকের অংশ নেছাব সমান না হলেও সবার হাত পা কাটা হবে, যেমন চুরির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তবে শাফেয়ি ও যুক্তিবাদীদের মতানুসারে প্রত্যেকের অংশ নেছাব পরিমাণ না হলে হাত পা কাটা হবেনা। আর এটাও শর্ত যে, তাদের ব্যাপারে কোনো রকম সন্দেহ সংশয় যেন না থাকে। মালেকি মাযহাব ও যাহেরি মাযহাব এই মত সমর্থন করেন না। তারা অপহৃত সম্পদের কোনো পরিমাণ নির্ধারণের পক্ষপাতী নন এবং তা সংরক্ষিত স্থানে থাকাও শর্ত মনে করেন না। কেননা ডাকাতি স্বয়ং একটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ, চাই তা নেছাব পরিমাণ হোক বা না হোক এবং সংরক্ষিত স্থান থেকে নেয়া হোক বা না হোক। ডাকাতি চুরি থেকে ভিন্ন অপরাধ। উভয়ের শাস্তি ভিন্ন রকমের। আল্লাহ চুরির জন্য সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন, কিন্তু ডাকাতির জন্য করেননি। বরং ডাকাতের শাস্তিরই শুধু উল্লেখ করেছেন, যার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, কেউ ডাকাতি করলেই তাকে শাস্তি দেয়া হবে।

অপরাধীদের মধ্যে কেউ যদি হৃত সম্পদের মালিকের রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় থাকে, তাহলে তার হাত পা কাটা হবেনা, অবশিষ্টদের কাটা হবে। এটা হাম্বলি ও শাফেয়ির মত। হানাফিদের মতে, কারোই হাত পা কাটা হবে না। কারণ আত্মীয়ের কারণে সন্দেহের সৃষ্টি হয়ে গেছে। আর অপরাধীরা একে অপরের লাভক্ষতির যিম্মাদার। তাই আত্মীয়ের উপর থেকে যখন শাস্তি রহিত হয়েছে তখন অন্যদের উপর থেকেও শাস্তি রহিত হবে। ইবনে কুদামা শাফেয়ি ও হাম্বলিদের মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি বলেন, সন্দেহ কেবল একজনের সাথে সংশ্লিষ্ট। কাজেই অবশিষ্টদের শাস্তি রহিত হবেনা। অর্থাৎ রহিত হওয়ার কারণটা একজেরন মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাই শাস্তি শুধু ঐ একজনেরই রহিত হবে। কেননা সন্দেহ তাকে ছাড়িয়ে অন্যদের মধ্যে সংক্রমিত হচ্ছেনা।

৩. ডাকাতির অপরাধটা যদি শুধু হত্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, সম্পদ হরণ তার সাথে যুক্ত না হয়, তাহলে অপরাধী অবশ্যই মৃত্যুদন্ডযোগ্য। শাসক যখনই তাকে ধরতে পারবেন, তখনই হত্যা করবেন। সকল ডাকাতকেই হত্যা করা হবে যদিও হত্যাকারী তাদের একজন হয়। সাহায্যকারীদেরও হত্যা করা হবে। কেননা তারাও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ও অরাজকতায় অংশীদার। নিহত ব্যক্তির অভিভাবক যদি ক্ষমা করে দেয় বা দিয়াতে সম্মত হয় তাহলেও তা গ্রহণযোগ্য হবেনা। কারণ নিহতের অভিভাবকের ক্ষমা বা দিয়াতে সম্মতি কিসাস অর্থাৎ খুনের মামলায় গ্রহণযোগ্য, ডাকাতিতে নয়।

৪. ডাকাতির সময় যদি অপরাধীরা হত্যা ও লুঠতরাজ দুটোই চালায়, তাহলে তাদেরকে হত্যা ও ক্রুশবিদ্ধ দুটোই করা হবে। অর্থাৎ জীবিতাবস্থায় শূলে চড়ানো হবে যাতে মারা

যায়। অপরাধীকে একটা কাঠ বা স্তম্ভ বা অনুরূপ কিছুর সাথে দাঁড় করিয়ে দু'হাত ঝুলন্ত রেখে বাধা হবে, তারপর মেরে ফেলা হবে। কোনো কোনো ফকিহর মতে, প্রথমে হত্যা করা হবে, তারপর অন্যদেরকে শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে শূলে চড়ানো হবে। কেউ কেউ বলেন, শূলের কাঠের উপর অপরাধীকে তিন দিনের বেশি রাখা হবেনা।

এ পর্যন্ত যা কিছু বলা হলো তার সবই ইমামদের ইজতিহাদ এবং আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই ইজতিহাদ করা হয়েছে। বস্তুত প্রত্যেক ইমামেরই সঠিক যুক্তি রয়েছে। যিনি মনে করেন, নির্ধারিত শাস্তিগুলোর যে কোনো একটা নির্বাচনে শাসককে ক্ষমতা দেয়া উচিত, তার যুক্তি হলো 'অথবা' অব্যয়টি দ্বারাই এটা বুঝা যায়। বিষয়টি সম্পূর্ণ শাসকের বিবেচনার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। যাকে যে শাস্তি দিলে অপরাধী দমন হবে ও জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত হবে বলে তিনি মনে করবেন, তাকে সেই শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা তার রয়েছে।

যিনি মনে করেন, আয়াতে প্রত্যেক অপরাধের জন্য পৃথক শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে, তার যুক্তি হলো, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের সাথে সাথে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কাজেই শরিয়তের মূল উদ্দেশ্য যে অপরাধ দমন ও জনকল্যাণ নিশ্চিত করা (অন্য কথায় দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন) এবং সেটি বাস্তবায়িত করাই যে জরুরি সে ব্যাপারে সবাই একমত। এই ইজতিহাদ সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীলদেরকে কুরআন ও হাদিসের উক্তিসমূহ উপলব্ধি করা ও ইজতিহাদের সঠিক পথ অনুসরণ করা সহজ করে দেয়। আর শিক্ষার্থীদের জন্যও সত্যোপলব্ধির সহায়ক। তবে ফকিহগণ যে কয়টি ধ্বংসাত্মক কাজের উল্লেখ করেছেন, নৈরাজ্যসৃষ্টিকারীরা ও ডাকাতরা যে এছাড়াও আরো বহু ধরনের নাশকতাকারী তৎপরতা চালিয়ে থাকে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। উল্লিখিত আয়াত থেকে ফকিহগণ শরিয়তের যেসব খুটিনাটি বিধি প্রণয়ন করেছেন, তার আলোকে নিত্যনতুন যাবতীয় ধ্বংসাত্মক কাজের জন্যও উপযুক্ত বিধি প্রণয়ন করা সম্ভব।

একটি আপত্তির জবাব :

তফসির আলমানারে বলা হয়েছে, ইবনে জারীর মুজাহিদের এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, এ আয়াতে 'ফাসাদ' অর্থাৎ ধ্বংসাত্মক কাজ দ্বারা ব্যভিচার, চুরি, নরহত্যা এবং ফসল ও পশুর বংশ বিনাশকে বুঝানো হয়েছে। এ চারটি কাজ নিঃসন্দেহে ধ্বংসাত্মক কাজ। কিন্তু কোনো কোনো ফকিহ মুজাহিদের এই উক্তির উপর একটি আপত্তি তুলেছেন। সেটি হলো, এ সকল পাপ কাজ ও ধ্বংসাত্মক কাজের জন্য আয়াতে যে শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে, শরিয়তে তার জন্য তো তা থেকে ভিন্নতর হদ বা শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। ব্যভিচার ও চুরির জন্য হদ এবং হত্যার জন্য কিসাস ও দিয়াত ইত্যাদি নির্ধারিত রয়েছে। আর শস্য ও পশু হত্যার জন্য ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে এবং সেই ক্ষতিপূরণে দায়ী ব্যক্তিকে বাধ্য করা হবে, উপরন্তু শাসক স্বীয় বিচার বিবেচনা অনুযায়ী তাকে তাযীর বা স্বতন্ত্র শাস্তিও দিতে পারবেন। এমতাবস্থায় এ আয়াতে একই অপরাধের পৃথক শাস্তি নির্ধারণের হেতু কী? এর জবাব এই যে, এ আয়াতে যে বিশেষ ধরনের শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে, তা কেবল সেই সব অপরাধীর জন্য নির্দিষ্ট, যারা শাসকদের প্রতিও আনুগত্যহীন, শরিয়তের প্রতিও আস্থাহীন। আর ঐসব হদ হলো সেই সব ব্যভিচারী ও চোরদের জন্য ব্যক্তিগত শাস্তি, যারা কার্যত শরিয়তের বিধানের অনুগত। পবিত্র কুরআনে এই দুই শ্রেণীর অপরাধীকে এক বচনের কর্তাবাচক শব্দ দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন সূরা মায়েদার

৩৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا

"পুরুষ চোর ও নারী চোর, উভয়ের হাত কেটে দাও।" আর সূরা নূরের ২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন : اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۝

"ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশো কষাঘাত করো।" এই সব অপরাধী নিজেদের কৃত কাজকে ঘৃণ্য কাজ বলে স্বীকার করে এবং প্রকাশ্যে অপরাধ ও অরাজকতা করে বেড়ায়না যে, তাদের অপকর্মের পদাংক অনুসরণ অন্যদের মধ্যেও বিস্তার লাভ করবে। তাছাড়া তারা নিজেদের সশস্ত্র বাহিনী সৃষ্টি করে নিজেদেরকে শরিয়তের শাস্তি থেকে রক্ষা করার জন্য শক্তি ও সহিংসতার আশ্রয় নেয় না। তাই তাদেরকে আল্লাহ ও তার রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত বলা মানানসই নয়। অথচ এ আয়াতে যে শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে, তা উল্লিখিত দুটি বৈশিষ্ট্যধারীদের জন্য (আইন ও শরিয়তের অবাধ্য এবং শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রকাশ্যে অপরাধ করা ও তার প্রসার ঘটানো)। ফকিহগণ যখন যুদ্ধে লিপ্ত শব্দটির উল্লেখ করেন, তখন তা দ্বারা সহিংস পন্থায় প্রকাশ্য ধ্বংসাত্মক অপরাধীদেরকেই বুঝান।

ডাকাতি ও সন্ত্রাসী তৎপরতার ব্যাপারে শাসক ও সমাজের করণীয়

শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা, ব্যক্তির অধিকার নিশ্চিত করা এবং জনগণের প্রাণ, সম্পদ ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য শাসক ও সমাজ উভয়েই দায়িত্বশীল। যখন একটি গোষ্ঠী সমাজ ও রাষ্ট্রের অবাধ্য হয়ে ত্রাস ছড়ায় ও ডাকাতি করে এবং মানুষের জীবনে বিভীষিকাময় অরাজকতা ও অস্থিরতার সৃষ্টি করে, তখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা শাসকের কর্তব্য, ঠিক যেমন রসূলুল্লাহ সা. বুজায়লা গোত্রের 'উরনী' বিদ্রোহীদের সাথে করেছিলেন এবং তাঁর পরে খলিফাগণ যেমন করেছিলেন। সর্বস্তরের মুসলমানদেরও কর্তব্য তাদের দাপট খর্ব করতেও মূলোৎপাটন করতে শাসককে সহযোগিতা করা, যতক্ষণ না জনগণের মধ্যে শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা ফিরে আসে এবং প্রত্যেকটি মানুষ নিজের, পরিবারের ও সমাজের কল্যাণার্থে সর্বাত্মক চেষ্টা সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে সক্ষম হয়। কোনো হত্যা ও লুণ্ঠন সংঘটিত করার আগেই যদি এসব সন্ত্রাসী রণে ভঙ্গ দেয়, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের দাপট চূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে আর তাদের পিছু ধাওয়া করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাদের অপতৎপরতা যদি খুন ও রাহাজানির পর্যায়ে উপনীত হয়, তাহলে তাদেরকে পুরোপুরি পর্যুদস্ত না করা পর্যন্ত তাদেরকে পাকড়াও করার জন্য সর্বাত্মক অভিযান চালাতে হবে এবং তাদের উপর ডাকাতি রাহাজানির শাস্তি কার্যকর করতে হবে।

নাগালে পাওয়ার আগেই যদি সন্ত্রাসী ও ডাকাতরা তওবা করে

সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও ডাকাতি রাহাজানিতে লিপ্তরা যদি ধরা পড়ার আগে তওবা করে এবং শাসক তাদেরকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়, তাহলে আল্লাহই তাদের অতীতের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেবেন এবং তাদের পার্থিব শাস্তিও রহিত করে দেবেন। আল্লাহ বলেন :

ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ ج فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

"দুনিয়ায় এটাই তাদের লাঞ্ছনা। উপরন্তু পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে। তবে তোমাদের আয়ত্তাধীন আসবার আগে যারা তওবা করবে, তাদের জন্য আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

এর কারণ হলো, ধরা পড়া ও সরকারের নিয়ন্ত্রণে আসার আগে তওবা করা থেকে প্রমাণিত হয়, তাদের বিবেক জেগে উঠেছে এবং নৈরাজ্য ছড়ানো ও আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মনোভাব পরিত্যাগ করে নতুন করে পবিত্র ও শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনে তারা বদ্ধপরিকর হয়েছে। তাই ইতিপূর্বে তারা যদি আল্লাহর হক সংক্রান্ত. কোনো শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেও থাকে, তবে তারা আল্লাহর ক্ষমা লাভ করবে। তবে মানুষের অধিকার হরণ করে থাকলে তা ক্ষমা করা হবেনা। সেক্ষেত্রে রক্তপাতজনিত অপরাধের শাস্তি ডাকাতি ও সন্ত্রাসের মামলার প্রক্রিয়ায় হবে না, বরং কিসাসের প্রক্রিয়ায় হবে। তখন ব্যাপারটা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের মর্জির উপর ন্যস্ত হবে, শাসকের বিবেচনার উপর নয়। তারা যদি হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে থাকে, তবে হত্যার বদলে হত্যার বাধ্যবাধকতা থাকবেনা, নিহতের অভিভাবক ও উত্তরাধিকারীর হত্যার বদলে হত্যার অধিকারও থাকবে, রক্তপণ বা দিয়াত নিয়ে ক্ষমা করার অধিকারও থাকবে। আর যদি তারা হত্যা ও লুঠতরাজ দুটোই করে থাকে, তাহলে শূলে চড়ানো ও হত্যার বাধ্যবাধকতা রহিত হয়ে কিসাস ও আর্থিক ক্ষতিপূরণ অবশিষ্ট থাকবে। আর যদি শুধু সম্পদ লুণ্ঠন করে থাকে, তবে হাত পা কাটা রহিত হবে, কিন্তু লুণ্ঠিত সামগ্রী তাদের হাতে থেকে থাকলে তা নিয়ে নেয়া হবে, আর পুরোপুরি বা আংশিক খরচ করে থাকলে তার মূল্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিতে হবে। কেননা এটা অনধিকার জবর দখলের পর্যায়ভুক্ত। কাজেই এভাবে উপার্জিত সম্পদের মালিক হওয়া তাদের জন্য বৈধ নয়। ঐ সম্পদ তার মালিকদেরকে ফেরত দেয়া হবে। প্রকৃত মালিকের সন্ধান পাওয়া পর্যন্ত তা শাসকের কাছে থাকবে। লুণ্ঠিত সম্পদ মালিকের নিকট ফেরত না দেয়া পর্যন্ত তাদের তওবাও শুদ্ধ হবেনা। আর যদি বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে শাসক নৈরাজ্যবাদীদের উপর থেকে কোনো আর্থিক দাবি রহিত করা উচিত মনে করেন, তাহলে মালিককে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

ইবনে রুশদ বিদায়াতুল মুজতাহিদ গ্রন্থে আলেমদের এ সংক্রান্ত মতামতের সারাংশ তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন : তওবা দ্বারা কোন্ কোন্ দায় থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে, সে সম্পর্কে চারটি মত পাওয়া যায় :

১. একটি হলো, কেবলমাত্র ডাকাতি, রাহাজানির শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে। এছাড়া আল্লাহর ও মানুষের আর যত হক রয়েছে, তার সব কিছুর জন্যই তাকে দায়ী করা হবে। এটা ইমাম মালেকের মত।

২. দ্বিতীয় মত হলো, ডাকাতি রাহাজানি, ব্যভিচার, মদপান ও চুরির দায়ে হাত কাটার শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাবে। কিন্তু আর্থিক ও রক্তপাতজনিত মানবাধিকার নষ্ট করে থাকলে তার দায় থেকে সে অব্যাহতি পাবেনা। কেবল নিহতের অভিভাবকরা ক্ষমা করলেই অব্যাহতি পাবে। (আমাদের নিকট এটাই সর্বাপেক্ষা ন্যায়সংগত মত। ইতিপূর্বে আমরা এ মতটি উল্লেখ করেছি।)

৩. তৃতীয় মতটি হলো, তওবা দ্বারা আল্লাহর হক সংক্রান্ত সমস্ত অপরাধ মাফ হয়ে যায়। কেবল রক্তপাত, লুণ্ঠন ও অপহরণের জন্য দায়ী থাকবে। লুণ্ঠিত মালের মধ্য থেকে যেটুকু অবিকৃত ও অক্ষত অবস্থায় অবশিষ্ট আছে, তা আদায় করে নেয়া হবে।

৪. চতুর্থ মত হলো, তওবা দ্বারা আর্থিক ও দৈহিক যাবতীয় ক্ষতি থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। কেবল লুণ্ঠিত সম্পদের যেটুকু অক্ষত থাকে, তা ফেরত দিতে হবে।

তওবার শর্তাবলি :

তওবার দুটি রূপ আছে : প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য। ফিকহ শাস্ত্র প্রকাশ্য রূপটিই বিবেচনা করে, অপ্রকাশ্য রূপটি নয়। কেননা অপ্রকাশ্যটি আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেনা। কোনো রাষ্ট্রদ্রোহী বা সন্ত্রাসী যদি গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে তওবা করে তবে তার তওবা গৃহীত হবে এবং তওবার যাবতীয় সুফলও কার্যকর হবে। কোনো কোনো ফকিহ তওবাকারীর জন্য শর্ত আরোপ করেছেন যে, তাকে শাসকের কাছ থেকে নিরাপত্তা চেয়ে নিতে হবে এবং শাসক কর্তৃক নিরাপত্তাপ্রাপ্ত হতে হবে। অন্যরা বলেন, এটা শর্ত নয়। বরং প্রত্যেক তওবাকারীর তওবার প্রতি স্বীকৃতি দেয়া শাসকের দায়িত্ব। কেউ কেউ বলেন, শাসকের কাছে না গিয়েও কেউ যদি অস্ত্র ফেলে দেয়, অপরাধমূলক তৎপরতা ত্যাগ করে ও জনগণকে আশ্বস্ত করে, তাহলে সেটা যথেষ্ট হবে।

ইবনে জারির বলেন, মূসা মাদানি বর্ণনা করেছেন যে, আলি আসাদ বিদ্রোহী তৎপরতায় লিপ্ত হয়, সন্ত্রাস ছড়ায় এবং হত্যা ও লুণ্ঠন সংঘটিত করে। ফলে শাসক ও জনগণ তার খোঁজাখুঁজি শুরু করে। কিন্তু সে আত্মরক্ষায় সফল হলো। কেউ তাকে গ্রেফতার করতে পারলো না। অবশেষে একদিন সে এক ব্যক্তিকে সূরা যুমারের ৫৪ নং আয়াতঞ্জ:

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ۚ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُالرَّحِيْمُ۝

“বলো, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছো, আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না, আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন, তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু” পড়তে শুনলো। শুনে সে ঐ ব্যক্তির নিকট থমকে দাঁড়ালো এবং তাকে বললো : হে আল্লাহর বান্দা, আয়াটি আবার পড়ো। সে পুনরায় পড়লো। তৎক্ষণাত আলি আসাদি তরবারি কোষবদ্ধ করলো এবং তওবা করে শেষ রাতে মদিনায় এলো। মদিনায় এসে গোসল করে মসজিদে নববীতে উপস্থিত হলো এবং ফজরের নামায পড়লো। তারপর বহু সংখ্যক সাহাবির সাথে আবু হুরায়রার নিকট বসলো। ভোর হলো জনগণ তাকে চিনে ফেললো। অমনি সকলে তাকে ধরার জন্য তার দিকে এগিয়ে গেলো। সে জনতাকে বললো, আমাকে পাকড়াও করার কোনো অধিকার তোমাদের নেই। তোমরা আমাকে নাগালে পাওয়ার আগেই আমি তওবা করে হাজির হয়েছি। আবু হুরায়রা রা. বললেন, সে সত্য বলেছে। অতপর তার হাত ধরে আমীর মুয়াবিয়ার অধীনস্থ মদিনার শাসক মারওয়ান ইবনুল হাকামের নিকট নিয়ে গেলেন। তাকে গিয়ে বললেন, এই আলি তওবা করে চলে এসেছে। তোমাদের তাকে গ্রেফতার করা বা হত্যা করার অধিকার নেই। মারওয়ান তাকে তার সকল অপরাধ থেকে অব্যাহতি দিলো। এরপর আলি আল্লাহর পথে জেহাদ করতে সমুদ্র পথে রওনা হলেন। পথিমধ্যে রোমক বাহিনীর সম্মুখীন হলেন। রোমকদের জাহাজের সাথে তার জাহাজে টক্কর হলো। এক পর্যায়ে তিনি রোমকদের জাহাজে উঠে পড়লে রোমক সৈন্যরা তার ভয়ে জাহাজের অপর কিনারে চলে গেলো। এতে জাহাজ কাত হয়ে গেলো এবং তাকে ও রোমকদের নিয়ে ডুবে গেলো।

অপরাধীকে শাসকের নিকট নেয়ার আগে তওবা করলে শাস্তি মাফ

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাষ্ট্রদ্রোহী বা ডাকাত গ্রেফতার হওয়ার আগে তওবা করলে তাকে ডাকাতি বা রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধের শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেয়া হবে। কেননা সূরা মায়েদার ৩৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ج فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

"তবে তোমাদের আয়ত্তাধীন আসবার আগে যারা তওবা করবে, তাদের জন্য আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" এই অব্যাহতি শুধু ডাকাত বা বিদ্রোহীর জন্য নির্দিষ্ট নয়, রবং এটা সকল শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যে ব্যক্তি কোনো 'হদ' যোগ্য অপরাধ করে এবং ধরা পড়ে শাসকের নিকট নীত হওয়ার আগে তওবা করে, তার হদ রহিত হবে। কেননা ডাকাত, সন্ত্রাসী ও রাষ্ট্রদ্রোহীর হদ যদি রহিত হয়, তাহলে অন্যদের হদ রহিত হওয়া অধিকতর অগ্রগণ্য। কেননা তারা এদের চেয়ে অনেক হালকা অপরাধের জন্য দায়ী। ইবনে তাইমিয়াও একই ধরনের মত ব্যক্ত করে বলেছেন : "যে ব্যক্তি গ্রেফতার হওয়ার আগে ব্যভিচার, চুরি ও মদপান থেকে তওবা করে, তার হদ রহিত হবে। যেমন গ্রেফতার হওয়ার আগে তওবা করলে বিদ্রোহী ও ডাকাতের হদও সর্বসম্মতক্রমে রহিত হয়।" কুরতুবি বলেন, মদখোর, ব্যভিচারী ও চোর যখন তওবা করে ও নিজেকে সংশোধন করে এবং এই তওবার কথা জানাজানি হয়ে যায়, অতপর ধরা পড়ে শাসকের নিকট নীত হয়, তার উপর হদ কার্যকর করা সমীচীন নয়। আর শাসকের কাছে নীত হওয়ার পর সে যদি বলে, আমি তওবা করেছি, তবে তাকে ছাড়া হবেনা। এ অবস্থায় সে সেই বিদ্রোহীর মতো যে পরাজিত হয়েছে।

এই মতভেদটি খোলাসা করে ইবনে কুদামা বলেছেন, শাস্তিযোগ্য ডাকাত বা রাষ্ট্রদ্রোহী যদি তওবা করে ও নিজেকে সংশোধন করে, তবে তার সম্পর্কে দুটো রেওয়ায়াত রয়েছে :

এক, তার শাস্তি রহিত হবে। কেননা আল্লাহ সূরা নিসার ১৬ নং আয়াতে বলেন :

وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا ج فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ○

"তোমাদের মধ্যে যে দুজন ব্যভিচারে লিপ্ত হবে, তাদেরকে শাসন করো, যদি তারা তওবা করে ও নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তবে তাদেরকে রেহাই দেবে।" আর চোরের শাস্তির উল্লেখ করার পর আল্লাহ সূরা মায়েদায় বলেন :

فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

"যে ব্যক্তি নিজের উপর অবিচার করার পর তওবা করে ও নিজেকে সংশোধন করে নেয়, তার জন্য আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

আর রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, গুনাহ থেকে তওবাকারী যার কোনো গুনাহ নেই তার মতো।" আর যার গুনাহ নেই, তার কোনো হদও নেই।

রজমের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে মায়েয রা. ছুটে পালানোর চেষ্টা করেছিলেন শুনে রসূলুল্লাহ সা. বলেছিলেন, তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না কেন? তাহলে সে তওবা করতো এবং

আল্লাহ তাকে ক্ষমা করতেন। তাছাড়া যেহেতু এটা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হক, তাই তওবা দ্বারা এর শাস্তি রহিত হয়ে যায় যেমন ডাকাতি ও সন্ত্রাসের অপরাধে তওবা দ্বারা শাস্তি রহিত হয়।

দুই. তার শাস্তি রহিত হবেনা। এটা মালেকও আবু হানিফার মত এবং শাফেয়ির দুটি মতের একটি। আল্লাহ যে বলেছেন, "ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারীকে একশ'টি কশাঘাত করো" এটা তওবাকারী ও অতওবাকারী উভয়ের জন্য। অনুরূপ পুরুষ চোর ও নারী চোরের হাত কেটে দেয়ার আদেশ যে আয়াতে দিয়েছেন তাও তওবার শর্তমুক্ত। তাছাড়া রসূলুল্লাহ সা. মায়েয ও গামেদি গোত্রের মহিলাকে এবং আরো একজনকে চুরির স্বীকারোক্তি করা সত্ত্বেও শাস্তি দিয়েছিলেন। অথচ তারা সবাই তওবা করে এসেছিল এবং নিজেদের উপর হদ কার্যকরী করিয়ে নিজেদেরকে পবিত্র করার ইচ্ছা নিয়ে এসেছিল। রসূলুল্লাহ সা. তাদের কাজকে তওবা আখ্যা দিয়েছিলেন। গামেদি মহিলা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, "সে এমন তওবা করেছে যা মদিনার সত্তরজন অধিবাসীর মধ্যে বণ্টন করলেও তা তাদের জন্য যথেষ্ট হবে।" আমর ইবনে সামুরা রা. রসূলুল্লাহ সা. এর নিকট এসে বললো, হে রসূলুল্লাহ সা., আমি অমুক গোত্রের উট চুরি করেছি, আমাকে পবিত্র করে দিন।" তখন রসূলুল্লাহ সা. তার উপর হদ কার্যকর করলেন। তাছাড়া যেহেতু হদ হচ্ছে কাফফারা। তাই কাফফারা রহিত হয়না। উপরন্তু সে আয়ত্তাধীন। তাই তার হদ রহিত হবেনা যেমন ডাকাত ও সন্ত্রাসীর হদ ধরা পড়ার পর রহিত হয়না। এখন আমরা যদি তওবা করলে হদ রহিত হবে, এই মতটি গ্রহণ করি, তাহলে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, সেক্ষেত্রে শুধু তওবাই কি যথেষ্ট, না তওবার সাথে সাথে নিজেকে সংশোধন করতে হবে? এ ব্যাপারে দুটো মত রয়েছে। একটি হলো, শুধু তওবা করলেই হদ রহিত হবে। এটাই আমাদের ইমামদের অধিকাংশের মত। কেননা এটা হদ রহিতকারী তওবা। তাই ডাকাত, সন্ত্রাসী ও বিদ্রোহীর ধরা পড়ার আগে তওবা করার সাথে এর সাদৃশ্য রয়েছে। দ্বিতীয় মতটি হলো, তওবাকারীর চরিত্রে সংশোধনও জরুরি। কেননা আল্লাহ বলেছেন, তারা যদি তওবা করে ও নিজেদেরকে সংশোধন করে নয়, তাহলে তাদেরকে অব্যাহতি দাও। এমত অনুসারে অপরাধীর তওবা সঠিক কিনা ও তার নিয়ত আন্তরিক কিনা তা জানার জন্য কিছুদিন অপেক্ষা করা দরকার। তবে এর জন্য কোনো মেয়াদ নির্দিষ্ট নেই। শাফেয়ি মাযহাবের কিছু আলেম এক বছর মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন। তবে এ মেয়াদ নির্ধারণ অনধিকার চর্চা ও অবৈধ।

মানুষের আত্মরক্ষা ও অন্যের জানমাল রক্ষার লড়াই

যখন কোনো আক্রমণকারী হত্যা করার লক্ষ্যে কারো উপর আক্রমণ চালায়, অথবা তার সম্পদ হরণ বা তার পরিবারের মহিলাদের সম্ভ্রম হানির অপচেষ্টা চালায়, তখন নিজের জান, মাল ও সম্ভ্রম রক্ষার্থে আগ্রাসীর বিরুদ্ধে লড়াই করার অধিকার আক্রান্ত ব্যক্তির রয়েছে। সে সহজতর উপায়ে প্রতিরোধ শুরু করে ক্রমান্বয়ে কঠোরতর উপায় অবলম্বন করতে পারে। যেমন প্রথমে কথা তারপর চিৎকার, তারপর মানুষের সাহায্য নিতে হবে। এর কোনোটিতে প্রতিহত না হলে প্রহারে কাজ হয় কিনা দেখার জন্য প্রহার করতে হবে, তাতেও যদি কাজ না হয় এবং হত্যা ছাড়া যদি প্রতিহত করা না যায় তবে তাকে হত্যা করতে হবে। এমতাবস্থায় হত্যাকারীর উপর কোনো কিসাস আরোপিত হবেনা, কোনো কাফফারাও নয়। নিহত ব্যক্তির কোনো দিয়াতও প্রাপ্য হবেনা। কেননা সে হত্যাকারী ও

আগ্রাসী। আগ্রাসী অত্যাচারীর রক্ত হালাল। এর জন্য কোনো ক্ষতিপূরণের প্রয়োজন নেই। এই আত্মরক্ষার লড়াই এ যদি আক্রান্ত ব্যক্তি নিহত হয় তবে সে শহীদ হবে।

আল্লাহ বলেন : وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ○

"যে ব্যক্তি অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ নেয়, তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই।" (সূরা শূরা : আয়াত ৪১)

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সা.এর নিকট এসে বললো, হে রসূলুল্লাহ সা., যদি কেউ আমার সম্পদ কেড়ে নিতে আসে তাহলে আমি কী করবো? রসূলুল্লাহ সা. বললেন, তাকে তোমার সম্পদ নিতে দিওনা। সে বললো, লোকটি যদি আমার সাথে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়? রসূলুল্লাহ সা. বললেন, তাহলে তুমি তার সাথে যুদ্ধ করবে। সে বললো, সে যদি আমাকে হত্যা করে? রসূলুল্লাহ সা. বললেন, তাহলে তুমি শহীদ। সে বললো, আর যদি আমি তাকে হত্যা করি? রসূলুল্লাহ সা. বললেন, তাহলে সে দোযখবাসী হবে।

বুখারি বর্ণনা করেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয়, সে শহীদ। আর যে ব্যক্তি নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ।

বর্ণিত আছে, জনৈক মহিলা কাঠ আহরণ করতে গেলে এক ব্যক্তি খারাপ মতলব নিয়ে তার দিকে অগ্রসর হলো। তখন ঐ মহিলা পাথর নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করলো। পরে ঘটনাটা উমর রা. এর নিকট ব্যক্ত করা হলে তিনি বললেন, সে আল্লাহর হাতে নিহত। আল্লাহ কখনো তাকে দিয়াত দেবেন না (অর্থাৎ সে দিয়ত পাবেনা)। নিজের জানমাল ও সম্ভ্রম আক্রান্ত হলে তা রক্ষার জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। তবে শর্ত হলো, নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত রেখে তা করতে হবে। কেননা অন্যের জানমালও সম্ভ্রম রক্ষার চেষ্টা, অন্যায় প্রতিরোধ ও অন্যের হক রক্ষার দায়িত্বের আওতাভুক্ত। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ অন্যায় দেখলে তা হাত দিয়ে প্রতিহত করো, তা না পারলে মুখ দিয়ে প্রতিহত করো, তা না পারলে মন দিয়ে ঘৃণা করো। আর মন দিয়ে ঘৃণা করা সবচেয়ে দুর্বল ঈমানের কাজ।" বস্তুত এটা অন্যায় প্রতিহত করার শামিল।

৭. চুরির শাস্তি

ইসলাম সম্পদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কেননা তা বেঁচে থাকার উপকরণ। ইসলাম সম্পদের উপর ব্যক্তির মালিকানাকেও সম্মান করে। তিন কারণে সম্মান করে : প্রথমত. এটাই স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত. এটা প্রেরণার উজ্জীবক। তৃতীয়ত. এটা ন্যায়সংগত। নিজের সম্পদের উপর মানুষের মালিকানা ও অধিকারকে ইসলাম একটা পবিত্র অধিকার গণ্য করেছে। তাই এই অধিকারের উপর যে কোনো ধরনের আক্রমণ বা আগ্রাসন চালানো কারো জন্য বৈধ নয়। এ কারণেই ইসলাম চুরি, জবর দখল, আত্মসাৎ, খেয়ানত, সুদ, প্রতারণা বা জালিয়াতি, মাপে ও ওজনে কারচুপি এবং ঘুষকে হারাম করেছে। আইনসম্মত উপায়ে অর্জিত নয় এমন যে কোনো সম্পদ ও সামগ্রীকে বাতিল ও অবৈধ পন্থায় অর্জিত সম্পদ বলে ঘোষণা করেছে।

চুরির বিরুদ্ধে ইসলাম অতিশয় কঠোর। তাই চোরের হাত কাটার দণ্ড প্রবর্তন করেছে। কেননা এই হাতই চুরির কাজে ব্যবহৃত হয়। এর যৌক্তিকতা সুস্পষ্ট। কেননা পরস্ব

হরণকারী বিশ্বাসঘাতক হাত শরীরের রোগগ্রস্ত অঙ্গের মতো। শরীরকে নিরাপদ ও রোগমুক্ত রাখার স্বার্থেই তা কেটে বিচ্ছিন্ন করা জরুরি। বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করা যেমন জরুরি, তেমনি গোটা জাতির স্বার্থে দু'চারজন ব্যক্তিকে চরম দণ্ড দেয়া সকল আইন, শরিয়ত ও যুক্তির চোখে সর্বসম্মতভাবে বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া কোনো ব্যক্তির বৃত্তি যদি তাকে অন্যের সম্পদ হস্তগত করতে প্ররোচিত করে, তবে তার জন্য চোরের হাত কাটার শাস্তি অত্যন্ত শিক্ষামূলক। এটা তাকে অন্যের সম্পদের দিকে হাত বাড়ানোর দুঃসাহস থেকে নিবৃত্ত করবে। এভাবেই মানুষের ধনসম্পদ রক্ষা পায় ও নিরাপদ থাকে। আল্লাহ্ বলেন :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءً م بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

"পুরুষ কিংবা নারী চুরি করলে তাদের হাত কেটে দাও। এটা তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহ্র নির্দেশিত আদর্শ দণ্ড। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।" (সূরা মায়েদা, আয়াত ৩৮).

চুরির শাস্তি এতো কঠোর হওয়ার যৌক্তিকতা

মানুষের ধনসম্পদের উপর অন্যায় আগ্রাসনমূলক অপরাধ আরো অনেক রয়েছে। কিন্তু চুরি ছাড়া অন্যান্য অপরাধে এতো কঠোর শাস্তি নির্ধারিত হয়নি। ইমাম নববী সহীহ্ মুসলিমের যে টীকা লিখেছেন, তাতে এর যৌক্তিকতা এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে : কাযী ইয়ায রা. বলেছেন, চোরের হাত কাটা বাধ্যতামূলক করার মাধ্যমে আল্লাহ্ ধনসম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করেছেন। চুরি ছাড়া অন্যান্য অপরাধে এটা করেননি, যেমন লুটপাট, আত্মসাত করা ও জবর দখল। কেননা ঐসব অপরাধের সংখ্যা চুরির চেয়ে কম। তাছাড়া শাসকদের নিকট অভিযোগ দায়ের করে এগুলোর প্রতিকার করা সম্ভব। এগুলোর বিরুদ্ধে সাক্ষী উপস্থিত করাও অপেক্ষাকৃত সহজ। চুরি তেমন নয়। চুরির সাক্ষী উপস্থিত করা খুবই বিরল ব্যাপার ও কঠিন। তাই এটা একটা মারাত্মক অপরাধ এবং এর শাস্তিও কঠোর যাতে এর বিরুদ্ধে অধিকতর কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়।

চুরির প্রকারভেদ

চুরি প্রথমত দু'প্রকারের : ১. যে চুরিতে তাযীর জরুরি। ২. যে চুরিতে দণ্ড জরুরি।

যে চুরিতে হদ কার্যকর করার শর্তাবলি পূরণ হয়না, তাতে তাযীর জরুরি। যে চুরিতে হাত কাটার শাস্তি ধার্য নেই। তাতে রসূলুল্লাহ সা. চোরের উপর দ্বিগুণ জরিমানা ধার্য করেছেন। এটা করেছেন, গাছে ঝুলন্ত ফল ও মাঠে চরণশীল ছাগলের চোরের ক্ষেত্রে। প্রথম প্রকারের ক্ষেত্রে খেজুর ও অন্যান্য ফলমূলের চোরকে হাত কাটার শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে, কেউ যদি এসব ফলমূল থেকে কিছু খেয়ে নেয় এবং সে তার প্রয়োজনও বোধ করে, তবে এজন্য তার কোনো শাস্তি বা জরিমানা হবেনা। আর যদি কেউ এর কিছু নিয়ে চলে যায়, তবে তাকে এর দ্বিগুণ পরিমাণ জরিমানা ও শাস্তি দেয়া হবে। আর যদি কেউ এর কিছু অংশ তার থলিতে করে চুরি করে নিয়ে যায়, তবে তার হাত কেটে দিতে হবে। তবে এজন্য শর্ত হলো, চোরাই মাল সেই নেসাবের পরিমাণ হওয়া চাই, যা হাত কাটার জন্য জরুরি।

দ্বিতীয় প্রকারের ক্ষেত্রে চারণ ক্ষেত্র থেকে ছাগল চুরি করে নিলে চোরকে ছাগলের মূল্যের দ্বিগুণ জরিমানা করা হবে এবং কিছু মারধোর করা হবে। আর যে পশুকে তার গোয়াল

থেকে নেয়া হয়, তার মূল্য যদি হাত কাটার নেসাবের সমান হয়, তবে এই চোরের হাত কাটা হবে। -আহমদ, নাসায়ী ও হাকেম।

শরিয়ত নির্ধারিত হদ যে চুরিতে প্রযোজ্য, তা দু'প্রকারের : এক, ছোট চুরি। এই চুরিতে হাত কাটা ওয়াজিব। দুই, বড় চুরি : সশস্ত্র অবস্থায় বলপূর্বক সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া, যাকে ডাকাতি বলা হয়। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এখানে শুধু ছোট চুরির মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে।

চুরির সংজ্ঞা

চুরি হচ্ছে গোপনে অন্যের সম্পদ হরণ করা। চুরি করে কথা শোনাকে বলা হয় গোপনে আড়ি পেতে শোনা। লুকিয়ে চুরি করে দেখা অর্থ করে দেখা। পবিত্র কুরআনের সূরা আল হিজরের ১৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে : إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ۝

"কেউ চুরি করে সংবাদ শুনতে চাইলে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা তার পিছু ধাওয়া করে।" এখানে লুকিয়ে লুকিয়ে কিছু শোনাকে বলা হয়েছে চুরি করে শোনা। 'কামুসে' বলা হয়েছে : "চুরি হচ্ছে সংরক্ষিত অবস্থান থেকে অন্যের সম্পদ নেয়ার জন্য লুকিয়ে লুকিয়ে আসা।" ইবনে আরাফা বলেন : আরবদের নিকট 'সারেক' বা চোর হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে, সংরক্ষিত স্থানে সংগোপনে আসে তার মালিকানাভুক্ত নয় এমন সম্পদ নেয়ার জন্য।" কামুস ও ইবনে আরাফার সংজ্ঞা থেকে জানা যায়, চুরির উপাদান তিনটি : (১) অন্যের সম্পদ নেয়া (২) সংগোপনে ও লুকিয়ে লুকিয়ে নেয়া (৩) সংরক্ষিত স্থান থেকে নেয়া।

সুতরাং সম্পদ যদি অন্যের না হয়। কিংবা প্রকাশ্যে নেয়া হয় কিংবা যে সম্পদ নেয়া হয় তা নেয়ার সময় সংরক্ষিত ছিলনা, তাহলে এই চুরিতে হাতকাটার শাস্তি কার্যকর হবেনা।

আত্মসাতকারী লুটেরা ও খেয়ানতকারী চোর নয়

উল্লিখিত কারণেই খেয়ানতকারী, লুটপাটকারী ও আত্মসাতকারীকে চোর গণ্য করা হয়না এবং এদের কাউকেই হাত কাটার শাস্তি দেয়া হবেনা। তবে তাযীর করতেই হবে। কেননা জাবের রা. বর্ণনা করেছেন রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "কোনো খেয়ানতকারী, লুটেরা ও আত্মসাতকারীর হাত কাটা লাগবেনা। -আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, হাকেম ও বায়হাকি।

খেয়ানতকারী হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে অন্যের সম্পদ হরণ করে এবং মালিকের শুভাংকাঙ্ক্ষী সাজে। আর লুটেরা হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে প্রকাশ্যে জোরপূর্বক অন্যের সম্পদ হরণ করে। আর আত্মসাতকারী হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে অন্যের সম্পদ প্রকাশ্যে হরণ করে ও পালিয়ে যায়।

মুহাম্মদ বিন শিহাব যুহরি বলেছেন, একবার মারওয়ান ইবনুল হাকামের নিকট এমন এক ব্যক্তিকে আনা হলো, যে একটা জিনিস আত্মসাত করেছিল। মারওয়ান তার হাত কাটার সিদ্ধান্ত নিলেন। তখন এ কাজটা ঠিক হবে কিনা জানার জন্য যায়দ বিন ছাবেতের রা. নিকট দূত পাঠানো হলো। যায়দ বললেন : "আত্মসাতের জন্য হাতকাটা হয়না।" -মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক।

ইবনুল কাইয়েম বলেছেন, নূন্যপক্ষে তিন দিরহাম চুরিতে চোরের হাত কাটা এবং আত্মসাতকারী ও লুটেরার হাত না কাটা শরিয়তের খুবই বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত। কেননা চোর থেকে পুরোপুরি আত্মরক্ষা সম্ভব নয়। সে ঘরবাড়িতে সিধ কাটে, সংরক্ষিত স্থানে প্রবেশ করে ও তালা ভাঙ্গে। সম্পদের মালিক এর চেয়ে বেশি সম্পদ চোরের হাত থেকে

বাঁচাতে সক্ষম নয়। এমতাবস্থায় তার হাত যদি কাটা না হতো, তাহলে লোকেরা পাইকারি হারে একে অপরের মাল চুরি করতো, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতো এবং চোরদের কারণে সমাজে মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি হতো। লুটেরা ও আত্মসাতকারীর অবস্থা এর বিপরীত। লুটেরা তো প্রকাশ্যে সম্পদ লুণ্ঠন করে ও লোক চক্ষুর সামনেই করে। তাই তাকে পাকড়াও করে লুণ্ঠন থেকে বিরত রাখা, মজলুমের হক বুঝিয়ে দেয়া অথবা আদালতে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়া জনগণের পক্ষে সম্ভব। আর আত্মসাতকারী তো তার মালিকের অসাবধানতার মুহূর্তে তার সম্পদ নিয়ে নেয়। কাজেই এক্ষেত্রে মালিক এক ধরনের শৈথিল্য দেখায় যা আত্মসাতকারীর আত্মসাত কার্যে সহায়ক হয়। নচেত পূর্ণ সতর্কতা ও নিশ্ছিদ্র প্রহরা বহাল থাকলে আত্মসাত করা সম্ভব নয়। তাই আত্মসাতকারী চোরের মতো নয়, বরং খেয়ানতকারীর সাথে তার সাদৃশ্য অধিক। তাছাড়া আত্মসাতকারী বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মালিকের অসতর্ক অবস্থায়ই সম্পদ হরণ করে। প্রকৃতপক্ষে আত্মসাতকারী নিজেই মালিককে অসাবধান করে দেয় এবং তার সম্পদের প্রতি অসাবধান হওয়া ও চোখের আড়ালে থাকার মুহূর্তেই তার সম্পদ হরণ করে। তাই এটি থেকে আত্মরক্ষা করা অনেকাংশেই সম্ভব। সুতরাং আত্মসাতকারী ও লুণ্ঠনকারী একই পর্যায়ের। কিন্তু জবর দখলকারীর অপরাধটা সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য। সে লুণ্ঠনকারীর চেয়েও হাত কাটার শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাওয়ার অধিক হকদার। তবে এসব অপরাধীর উপদ্রব ঠেকানো প্রহার, অপমান, দীর্ঘ কারাদণ্ড ও জরিমানা দ্বারা সম্ভব।

ধার নিয়ে অস্বীকার করা

ধার নিয়ে তা অস্বীকার করা নিঃসন্দেহে অপরাধ। তবে তা হাত কাটার উপযুক্ত চুরি কিনা, তা নিয়ে ফকিহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ ফকিহর মতে, ধার নিয়ে অস্বীকারকারীর হাত কাটা হবেনা। কেননা কুরআন ও সুন্নাহ চোরের হাত কাটার আদেশ দিয়েছে। অথচ ধার নিয়ে অস্বীকারকারী চোর নয়। পক্ষান্তরে আহমদ, ইসহাক, যুফার, খারেজী ও যাহেরি মাযহাবের মতে হাত কাটতে হবে। কেননা আহমদ, মুসলিম ও নাসায়ী আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, "বনু মাখযুম গোত্রের জনৈক মহিলা বিভিন্ন সামগ্রী ধার নিতো ও পরে তা অস্বীকার করতো। তাই রসূলুল্লাহ সা. তার হাত কেটে দেয়ার আদেশ দিলেন। তখন তার পরিবার উসামা বিন যায়দের নিকট এসে তাকে রসূলুল্লাহ সা. নিকট সুপারিশ করার অনুরোধ জনালো। উসামা মহিলাকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য রসূলুল্লাহ সা.কে সুপারিশ করলেন। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : "হে উসামা, আল্লাহর নির্ধারিত একটি শাস্তির ব্যাপারে তুমি সুপারিশ করবে, এটা আমি দেখতে চাইনা। তারপর রসূলুল্লাহ সা. ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে তিনি বললেন : "তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা শুধু এজন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মধ্যে অভিজাত শ্রেণীর কেউ যদি চুরি করতো, তাকে তারা ছেড়ে দিতো। আর দুর্বল শ্রেণীর কেউ চুরি করলে তার হাত কাটতো। আল্লাহর কসম, এই মহিলা যদি মুহাম্মদের মেয়ে ফাতিমা হতো তাহলেও আমি তার হাত কেটে দিতাম।" অতপর তিনি বনু মাখযুম গোত্রের মহিলাটির হাত কেটে দিলেন।"

ইবনুল কাইয়েম এই মতটির সমর্থন করেছেন। তিনি ধার গ্রহণ করার পর তা অস্বীকারকারীকে শরিয়তের দাবি মোতাবেক চোর গণ্য করেছেন। যাদুল মায়াদ গ্রন্থে তিনি বলেন : "রসূলুল্লাহ সা. যেভাবে সকল ধরনের মাদককে মদ হিসেবে গণ্য করেছেন, ঠিক সেভাবেই ধার অস্বীকারকারীকে চোর হিসেবে গণ্য করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এভাবেই তিনি

উম্মতকে আল্লাহর কথার তাৎপর্য বুঝিয়েছেন।" আররওযাতুন নাদিয়া গ্রন্থের মন্তব্য : "ধার অস্বীকারকারী যদি অভিধানিক অর্থে চোর নাও হয়, তথাপি সে শরিয়তের পরিভাষায় অবশ্যই চোর। আর শরিয়ত সব সময় অভিধানের উপর অগ্রগণ্য। ইবনুল কাইয়েম 'ইলামুল মুকেঈন' গ্রন্থে বলেছেন, ধার গ্রহণ করার পর তা অস্বীকার করাকে চুরি হিসেবে গণ্য করার যৌক্তিকতা ও সার্থকতা খুবই স্পষ্ট। কেননা ধারের লেনদেন সব মানুষের জন্য একদিকে যেমন উপকারী, অন্যদিকে তেমনি অপরিহার্যও। ধার গ্রহণকারীর প্রয়োজন ও ঠেকার সময়ে এটা অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়, চাই তা ভাড়ার বিনিময়ে হোক কিংবা কোনো বিনিময় ছাড়াই হোক। আর সব সময় অন্যান্যদের পক্ষে ধারের সাক্ষী হওয়া যেমন সম্ভবপর হয়না, তেমনি সতর্কতার খাতিরে ধারের লেনদেন বন্ধ করে দেয়াও শরিয়ত বা প্রচলিত রীতিপ্রথা-কোনোটার দৃষ্টিতেই সম্ভব হয় না। কার্যত সেই দুই ব্যক্তির মধ্যে কোনোই পার্থক্য নেই, যাদের একজন চুরির মাধ্যমে অন্যের জিনিস হরণ করে এবং অপরজন ধারে নিয়ে অস্বীকার করার মাধ্যমে অন্যের দ্রব্যসামগ্রী আত্মসাত করে। কিন্তু আমানত হিসেবে কোনো দ্রব্য বা নগদ অর্থ গ্রহণ করার পর তা অস্বীকার করাকে শরিয়তের ভাষায় চুরি বলা যায়না। কেননা দ্রবের মালিক নিজেই দ্রব্যটি নিজের হাতছাড়া করে অন্য একজনকে তা হস্তগত করার অবকাশ দিয়েছেন।

কাফন চোর

যে কারণে ধারের জিনিস অস্বীকার করে আত্মসাত করাকে চুরি হিসেবে গণ্য করার ব্যাপারে যে মতভেদ রয়েছে, সেই মতভেদ কাফন চোরের বেলায়ও প্রযোজ্য। অধিকাংশ ফকিহর মতে, হাত কেটে দেয়াই কাফন চোরের শাস্তি। কেননা সে যথার্থই চোর। কারণ কবর একটা সুরক্ষিত স্থান এবং সেখান থেকে গোপনে কাফন সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যথার্থই চুরি। কিন্তু আবু হানিফা, মুহাম্মদ, আওযায়ি ও সাওরির মতে তার শাস্তি হাত কাটা নয়, তার চেয়ে লঘু কোনো শাস্তি তথা তাযীর। কেননা সে এমন একটা বস্তু নিয়েছে, যার কোনো মালিক নেই। মৃত ব্যক্তি কোনো জিনিসের মালিক থাকেনা। তাছাড়া কবর তাদের মতে সুরক্ষিত স্থান নয়, অরক্ষিত স্থান।

চুরির শাস্তির জন্য পালনীয় শর্তাবলি

ইতিপূর্বে চুরির যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে, তা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, চোরের চোরাইকৃত মালের ও চুরির স্থানের কিছু সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার উপস্থিতি চুরির অপরাধটির শরিয়ত নির্ধারিত দণ্ডের যোগ্য বলে বিবেচিত হওয়ার জন্য অপরিহার্য। এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে দণ্ড প্রয়োগের শর্তাবলিও বলা যেতে পারে। নিম্নে এই শর্তাবলির উল্লেখ করা হলো :

চুরির শাস্তিযোগ্য হওয়ার জন্য চোরের মধ্যে যে শর্তাবলী জরুরি

১. চোরের সুস্থ বুদ্ধি সম্পন্ন ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া জরুরি। সুতরাং পাগল এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু ও বালক-বালিকা দণ্ডের (হাত কাটা) যোগ্য নয়। কেননা তাদের উপর শরিয়তের বিধান বলবত হয়নি। তবে অপ্রাপ্তবয়স্ক চুরি করলে তাকে লঘু শাস্তি দিতে হবে। হদের জন্য চোরের মুসলমান হওয়া শর্ত নয়। কাজেই অমুসলিম ও মুরতাদ (ইসলাম ত্যাগকারী) যখন চুরি করে, তখন তার হাত কাটা হবে। অনুরূপ, কোনো মুসলমান যখন অমুসলমানের সম্পদ চুরি করে, তখন তারও হাত কাটা হবে।

২. স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী হওয়া চাই। অন্য কথায়, চৌর্য কর্মটি চোরের স্বাধীন ইচ্ছার ভিত্তিতে সংঘটিত হওয়া জরুরি। কাউকে যদি চুরি করতে বাধ্য করা হয়, তাহলে তাকে চোর বলে গণ্য করা হবেনা। কেননা যখনই তাকে বাধ্য করা হয়, তখনই তার স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়। আর স্বাধীনতা যার থাকেনা, তার উপর শরিয়তের বিধান বলবত হয় না।

৩. চোরাই মালের মালিকানা সম্পর্কে চোরের মনে কোনো সন্দেহ না থাকা চাই। কোনো সন্দেহ থাকলে তার হাত কাটা হবেনা। যেমন ছেলের মাল চুরি করার জন্য পিতা বা মাতার হাত কাটা হবেনা। কেননা রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "তুমি ও তোমার যাবতীয় সম্পত্তি তোমার পিতার।" অনুরূপ, মা-বাবার বা তাদের কোনো একজনের সম্পত্তি চুরি করার দায়ে সন্তানের হাত কাটা যাবেনা। কেননা সন্তান সাধারণত তার মা-বাবার সম্পত্তি খরচ করার অধিকার রাখে বলে মনে করে। অনুরূপ দাদা ও দাদার দাদা এবং পৌত্র ও প্রপৌত্রের হাত কাটা যাবেনা।

এরপর আসে রক্ত সম্পর্কীয় মাহরাম আত্মীয়দের প্রসঙ্গ, যেমন খালা, ফুফু, বোন, চাচা, মামা ও ভাই। আবু হানিফা ও সাওরির মতে, এই শ্রেণীর কারও হাত কাটা হবেনা। কেননা তাদের হাত কাটার পরিণামে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে, যা আল্লাহ বহাল রাখার আদেশ দিয়েছেন। তাছাড়া যেহেতু বাড়িতে প্রবেশে তাদের অধিকার রয়েছে, তাই তারা বাড়ির মালিকের বন্ধু। এ কারণে তাদের হাত থেকে বাড়ির দ্রব্যসামগ্রী পুরোপুরি সংরক্ষিত নয়। এক্ষেত্রে এই আত্মীয়তা বাড়িতে আগত অতিথির মতো, যাকে বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়েছে। এ কারণেই অতিথি চুরি করলে তার হাত কাটা যায়না।

মালেক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক বলেন, এদের মধ্য থেকে কেউ চুরি করলে তার হাত কাটা হবে। কেননা চুরিকৃত মালের মালিকানায় কোনো সন্দেহ নেই। আর স্বামী-স্ত্রী একে অপরের জিনিস চুরি করলে তাদের হাত কাটা হবেনা। কারণ তাদের পারস্পরিক মেলামেশা ও একত্র অবস্থানের কারণে তাদের দ্রব্যসামগ্রী একদিকে যেমন পুরোপুরি সংরক্ষিত নয় এবং অনিবার্যভাবে দ্রব্যাদির মালিকানায় সন্দেহের সৃষ্টি করে। তাই হাত কাটা রহিত হবে। এটা আবু হানিফার মাযহাব। এক বর্ণনা অনুযায়ী এটা শাফেয়ি ও আহমদেরও মাযহাব। কিন্তু মালেক ও সাওরির মত এবং আহমদ ও শাফেয়ির দুটি মতের একটি অনুসারে, স্বামী ও স্ত্রীর যদি আলাদা আলাদা ঘর থাকে এবং নিজ নিজ ঘরে উভয়ের জিনিসপত্র সংরক্ষিত থাকে, তাহলে দু'জনের যে কেউ অপরজনের দ্রব্য চুরি করলে তার হাত কাটা হবে। কেননা এখানে দ্রব্যগুলো পুরোপুরি সংরক্ষিত এবং স্বামী স্ত্রীর প্রত্যেকের অবস্থান স্বতন্ত্র। যে ভৃত্য স্বয়ং মনিবের সেবা করে, সে চুরি করলে তার হাত কাটা হবেনা। কারণ আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত : এক ব্যক্তি তার এক ভৃত্যকে নিয়ে উমর রা. এর কাছে এসে বললেন, এর হাত কাটুন। এ আমার স্ত্রীর আয়না চুরি করেছে। তখন উমর রা. বললেন, না, ওর হাত কাটা হবেনা। সে তোমাদের সেবক হিসেবে তোমাদের জিনিস নিয়েছে। এটা উমর রা. ও ইবনে মাসউদের মত হলেও কোনো সাহাবী তাদের মতের বিরোধিতা করেনি। কোনো মুসলমান সরকারের কোষাগার থেকে চুরি করলে তার হাত কাটা যাবেনা। কেননা বর্ণিত আছে যে, উমর রা. এর অধীনস্থ কোনো এক কর্মকর্তা তার কাছে চিঠি লিখে জানতে চাইলেন বাইতুল মাল (সরকারি কোষাগার) থেকে কেউ চুরি করলে তার কি করা হবে। তিনি বললেন, তার হাত কেটনা। কেননা প্রত্যেক মুসলমানেরই বাইতুল মালে হক রয়েছে। শাবি বর্ণনা করেছেন : এক

ব্যক্তি বাইতুল মাল থেকে চুরি করেছে শুনে আলী রা. মন্তব্য করলেন, ওরও তো বাইতুল মালে অংশ রয়েছে। তিনি তার হাত কাটলেন না। এখানে আলী রা. ও উমর রা. এর কথার মধ্যে বাইতুল মাল থেকে চুরি করার কারণে হাত না কাটার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। কারণটি হলো, বাইতুল মালে সবার অংশ থাকায় কিছুটা সন্দেহের উদ্রেক করে এবং সেই সন্দেহটুকু দণ্ড রহিত করে। ইবনে কুদামা বলেন, কোনো সম্পত্তিতে যার অংশীদারত্ব রয়েছে, কেউ ঐ সম্পত্তি থেকে এবং গণিমতের অংশীদার কেউ গণিমত থেকে চুরি করলে তার হাত কাটা হবেনা। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। তবে ইমাম মালেকের মতে, হাত কাটা হবে। কেননা সংশ্লিষ্ট আয়াতটিতে যে কোনো ধরনের চোরেরই হাত কাটার আদেশ রয়েছে।

ইবনে মাজাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, গনিমত হিসেবে প্রাপ্ত গোলামদের একজন গনিমতের সম্পদ চুরি করে ধরা পড়লে রসূলুল্লাহ সা. তার হাত কাটেননি। তিনি বললেন, "চোর ও চুরিকৃত সামগ্রী উভয়েই আল্লাহর সম্পদ। তারা একে অপরকে চুরি করেছে।"

ঋণ নিয়ে তা পরিশোধে টালবাহানাকারী বা ঋণ অস্বীকারকারী খাতকের সম্পদ থেকে ঋণদাতা চুরি করলে ঋণদাতার হাত কাটা হবেনা। কেননা এর মাধ্যমে ঋণ ফেরত নেয়া হয়েছে। তবে খাতক যখন ঋণ স্বীকার করে ও ঋণ ফেরত দিতে সক্ষম থাকে, তখন ঋণদাতা খাতকের সম্পদ চুরি করলে তার হাত কাটা হবে। কেননা এক্ষেত্রে তার চুরিতে কোনো সন্দেহ নেই। ধার গ্রহণকারীর নিকট থেকে ধারে নেয়া দ্রব্য চুরি হলে তাতে চোরের হাত কাটা যাবে না। কেননা ধার গ্রহণকারী ধারে নেয়া দ্রব্যের মালিক নয়, আমানতদার। আর যদি কোনো ব্যক্তি কোনো জিনিস জবর দখল করে বা চুরি করে ও নিজের কাছে সংরক্ষণ করে, অতপর তার কাছ থেকে কোনো চোর তা চুরি করে, তবে এই চোরের হাত শাফেয়ি ও আহমদের মতে কাটা হবেনা। কেননা চোরাই দ্রব্যটি এমন জায়গায় সংরক্ষিত ছিলো, যার প্রতি তার মালিক সম্মত ছিলনা। কিন্তু ইমাম মালেকের মতে হাত কাটা হবে। কেননা সে এমন দ্রব্য চুরি করেছে, যা নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই এবং সংরক্ষিত স্থান থেকে চুরি করেছে। আর যখন জনসাধারণ কোনো দুর্যোগের কবলে পড়ে এবং কোনো ব্যক্তি কোনো খাদ্য দ্রব্য চুরি করে, তবে সেই খাদ্য যদি বর্তমান থেকে থাকে, তাহলে চোরের হাত কাটা হবে। কেননা জিনিসটি চুরি করা তার জন্য জরুরি ছিলনা। আর যদি না থেকে থাকে, তবে হাত কাটা হবেনা। কেননা তার প্রয়োজন ছিলো বিধায় জিনিসটি নেয়ার অধিকার তার ছিলো। উমর রা. বলেছেন, দুর্ভিক্ষের বছর কোনো হাত কাটা হবেনা। মুয়াত্তায় ইমাম মালেক বর্ণনা করেছেন হাতেবের কতিপয় দাস মুযায়না গোত্রের এক ব্যক্তির একটি উট্নী চুরি করলো এবং তা যবাই করলো। বিষয়টি উমর রা. এর নিকট নীত হলে তিনি কুসাইয়ির ইবনুস সাল্তকে তাদের হাত কেটে দেয়ার আদেশ দিলেন।" তারপর উমর রা. বললেন, "আমি দেখতে পাচ্ছি, তুমি তাদেরকে অভুক্ত রেখে কষ্ট দিয়ে থাকো।" আল্লাহর কসম, আমি তোমার উপর এমন জরিমানা আরোপ করবো, যা দিতে তুমি হিমসিম খাবে।" তারপর মুযায়না গোত্রের লোকটাকে বললেন, তোমার উটনীর দাম কত? সে বললো, আল্লাহর কসম, আমি চারশো দিরহাম দাম হলেও উটনীটা দেইনি। উমর রা. বললেন, ওকে আটশো দিরহাম দিয়ে দাও। ইবনে ওহাব বর্ণনা করেন উমর ইবনুল খাত্তাব রা. চোরদের হাত কেটে দিতে

কুসাইয়ির ইবনুস সাল্তকে আদেশ দেয়ার পর একজন দূতকে পাঠিয়ে দিলেন যেন সে দাসগুলোকে তার দরবারে নিয়ে আসে। সে যথাসময় তাদেরকে নিয়ে এলো। তখন উমর রা. হাতেবের ছেলে আব্দুর রহমানকে বললেন, আমি যদি না মনে করতাম যে, তোমরা তাদেরকে কাজে খাটাও, অথচ খাবার দাওনা, এমনকি তাদের অবস্থা এমন হয় যে, হারাম খাবার পেলেও তা খেতো, তাহলে তাদের হাত কেটে দিতাম। তবে আল্লাহর কসম, ওদেরকে যখন ছেড়ে দিয়েছি, তখন তোমার উপর এমন জরিমানা আরোপ করবো, যা তোমার জন্য কষ্টকর হবে।

চুরি শাস্তিযোগ্য হওয়ার জন্য চুরিকৃত দ্রব্যের মধ্যে যে শর্তাবলি জরুরি

চুরিকৃত দ্রব্যের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যগুলো বা শর্তাবলি থাকা জরুরি, তা হচ্ছে :

প্রথমত, দ্রব্যটি সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হওয়া চাই, তার ওপর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এমন হওয়া চাই, তা বিক্রি করা ও তার বিনিময়ে অন্য কিছু গ্রহণ করা বৈধ হওয়া চাই। অতএব কেউ মদ ও শুকর চুরি করলে তার হাত কাটা হবেনা, এমনকি এ দুটির মালিক যদি অমুসলিম হয় তবুও না। কেননা আল্লাহ এ দুটির মালিক হওয়া ও এ দুটির দ্বারা উপকৃত হওয়া মুসলমান ও অমুসলমান উভয়ের জন্য হারাম করেছেন। (ইমাম আবু হানিফা যদিও অমুসলিমের মদ ও শুকরের মালিক হওয়া বৈধ এবং এ দুটি কেউ ধ্বংস করলে এর মূল্য পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক বলে রায় দিয়েছেন, তবে এ দুটি চুরি করলে তার কাটা হবেনা, একথা সমর্থন করেছেন। কেননা এ দুটি পূর্ণাঙ্গ সম্পদ নয়। অথচ দণ্ড প্রয়োগের জন্য পূর্ণাঙ্গ সম্পদ হওয়া শর্ত।) অনুরূপ, গান বাজনা ও নৃত্য ইত্যাদির যন্ত্র ও সরঞ্জামাদি যে ব্যক্তি চুরি করবে, তার হাতও কাটা যাবেনা। কেননা এসব যন্ত্র ও সর ামের ব্যবহার বহু সংখ্যক আলেমের নিকট বৈধ নয়। কেননা এগুলো সম্পদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়না। এগুলোর উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়না, এগুলোর বিক্রিও বৈধ নয়। তবে যারা এগুলোর ব্যবহার বৈধ বলেন, তারাও এগুলোর চোরের হাত কাটা হবেনা- এ বিষয়ে একমত। কেননা এসব দ্রব্যসামগ্রীতে সন্দেহ রয়েছে যা দণ্ড রহিত করে।

স্বাধীন অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু, যার ন্যায়-অন্যায়, বাছবিচারের ক্ষমতা তখনো হয়নি, তাকে চুরি করার ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আবু হানিফা ও শাফেয়ির মতে যেহেতু সম্পদ নয়, তাই তার চোরের হাত কাটা হবে না, তবে তাযীর অবশ্যই করা হবে। এ ধরনের শিশুর পরনে যদি কাপড় বা সোনা রূপার গহনাও থাকে, তাহলেও তার চোরের হাত কাটা হবেনা (কেননা তার গায়ে যেসব গহনা থাকে, তা তারই অনুসঙ্গ, পৃথকভাবে তা চুরি করা ঈপ্সিত নয়। আবু ইউসুফ বলেন, গহনা যদি নেসাব পরিমাণ হয়, তাহলে হাত কাটা হবে।) ইমাম মালেক বলেছেন, শিশুকে চুরি করার জন্য চোরের হাত কাটা হবে। কারণ সে হচ্ছে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এখানে নির্দিষ্ট কোনো সম্পদ চুরির কারণে চোরের হাত কাটা হবেনা, কাটা হবে শুধু এর সাথে জীবন্ত মানুষের সংশ্লিষ্টতা থাকার কারণে। আর স্বাধীন মানুষের সাথে সংশ্লিষ্টতা দাসদাসীর সাথে সংশ্লিষ্টতার চেয়ে বেশি। ন্যায়-অন্যায় বাছবিচারের ক্ষমতা এখনো জন্মেনি। এমন অপ্রাপ্তবয়স্ক দাসের চোরের হাত কাটা হবে। কেননা এ ধরনের দাস সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। পক্ষান্তরে যে দাসের ন্যায়-অন্যায় বাছবিচারের ক্ষমতা জন্মেছে, তাকে চুরি করলে চোরের হাত কাটা হবেনা। কেননা সে ক্রয়বিক্রয় যোগ্য সম্পদ হলেও তার নিজের উপর তার কর্তৃত্ব রয়েছে। তাই সে

মালিকের সংরক্ষিত মালিকানায় আছে বলে বিবেচিত হবেনা। পক্ষান্তরে যেসব জিনিসের মালিক হওয়া বৈধ, কিন্তু বিক্রয় বৈধ নয়, যেমন পাহারা দেয়া, শিকার ধরা ও কৃষি কাজের নিমিত্তে পালিত কুকুর এবং কুরবানীর গোশত। এগুলো সম্পর্কে মালেকি মাযহাবের আশহাব বলেন, এ ধরনের কুকুরের চোরের হাত কাটা হবে। কিন্তু পাহারা দেয়া, শিকার ধরা ও কৃষিকাজ ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে পালিত কুকুরের চোরের হাত কাটা হবেনা। কুরবানীর গোশতের চোর সম্পর্কে মালেকি মাযহাবের আসবাগ বলেন, কুরবানীর জানোয়ারকে যবাই করার আগে চুরি করলে তার হাত কাটা হবে, যবাইয়ের পরে চুরি করলে তার কাটা হবেনা।

পানি, বরফ, ঘাস, লবণ ও মাটির চোর সম্পর্কে মতভেদ আছে। আল মুগনির লেখক বলেন, পানি চোরের হাত কাটা হবেনা। কেননা এটা (শরিয়তের দৃষ্টিতে) সম্পদ বলে গণ্য হয়না। এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই। তবে ঘাস ও লবণ সম্পর্কে মতভেদ আছে। আবু বকর বলেছেন, এ দুটির চোরের হাত কাটা হবেনা। কেননা শরিয়ত যে কটি জিনিসে সকল মানুষের সম্মিলিত মালিকানা রয়েছে বলে ঘোষণা করেছে, এ দুটি তার আওতাভুক্ত। আবু ইসহাক বলেন, হাত কাটা হবে। কেননা এ দুটি সম্পদ হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। বরফ সম্পর্কে কাযী বলেছেন, এটা পানির মতোই। কেননা এটা জমাট পানি মাত্র। আর মাটি যদি এমন হয়, যার প্রতি সাধারণত খুব কম লোকেরই আগ্রহ দেখা যায়, যেমন প্রলেপ দেয়া বা নির্মাণ কাজের জন্য ব্যবহার্য মাটি (অথবা মৃৎ শিল্প বা ইট বানানোর মাটি) তবে কাটা হবেনা। কেননা এ ধরনের মাটি সম্পদ হিসেবে গণ্য হয়না। যদি খুব মূল্যবান মাটি হয়, যেমন ওষুধ বা সাবান তৈরিতে রং দেয়ার কাজে ব্যবহৃত হয় এমন মাটি হয়, তাহলে তা নিয়ে দুটি মত লক্ষ্য করা যায় : (১) হাত কাটা হবেনা। কেননা তা পানির মতোই সম্পদ পদবাচ্য নয়। (২) হাত কাটা হবে। কেননা তা সাধারণ সম্পদ রূপে গণ্য হয় এবং বাণিজ্যিকভাবে বিদেশে রপ্তানী হয়।

আর যে সমস্ত জিনিস মৌলিকভাবে হালাল ও সকলের জন্য উন্মুক্ত, যেমন মাছ ও পাখি (মোরগ, মুরগী, হাঁস ও কবুতরসহ) সেগুলো চুরি করলে হাত কাটা হবেনা যদি তা কোনো ব্যক্তি বিশেষের মালিকানার আওতাধীন সুরক্ষিত থাকা অবস্থায় চুরি না হয়। সুরক্ষিত থাকা অবস্থায় চুরি হলে সে সম্পর্কে ফকিহদের মতভেদ রয়েছে। মালেকি ও শাফেয়ি মাযহাব অনুযায়ী হাত কাটা হবে। কেননা চোর এমন একটা জিনিস চুরি করেছে, যার সুরক্ষিত ছিলো এবং যার মূল্য ছিলো। হাম্বলি ও হানাফি মাযহাব মতে, হাত কাটা হবেনা। কেননা রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি শিকার ধরবে, শিকার তারই। এ হাদিস এমন একটা সন্দেহের উদ্রেক করে, যা দণ্ড রহিত করে।

আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াসার বলেন, এক ব্যক্তি মুরগী চুরি করে ধরা পড়ে ও উমর ইবনে আব্দুল আযীযের দরবারে নীত হয়। তিনি তার হাত কাটার সিদ্ধান্ত নিলেন। তখন সালেম ইবনে আব্দুর রহমান তাকে বললেন, উসমান (রা) বলেছেন, পাখি চুরিতে হাত কাটা হবেনা। অন্য বর্ণনায় আছে, উমর ইবনে আব্দুল আযীয নিজেই সায়েব ইবনে ইয়াযীদের নিকট ফতোয়া জানতে চাইলে তিনি বললেন, আমি পাখি চুরির জন্য কারো হাত কাটা হতে দেখিনি এবং এজন্য হাত কাটা জরুরিও নয়। তখন উমর ইবনে আব্দুল আযীয মুরগী চোরটির হাত কাটা হতে নিবৃত্ত হলেন। কোনো কোনো ফকিহ বলেছেন, যে পাখি

সকলের জন্য বৈধ, তা হলো শিকার করা হয়ে থাকে এমন পাখি। মোরগ মুরগী ও হাঁস এর অন্তর্ভুক্ত নয়। হাঁস ও মুরগীর চুরিতে হাত কাটা অপরিহার্য। কেননা তারা গৃহপালিত প্রাণী হিসেবে গণ্য। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, তাজা খাবার, যথা দুধ, গোশত ও তাজা ফল চুরিতে, ঘাস ও জ্বালানী কাঠ চুরিতে এবং ত্বরিত বিনষ্ট হয় এমন জিনিস চুরিতে হাত কাটা হবেনা, এমনকি চোরাই মাল যদি ন্যূনতম নেসাবের সমপরিমাণও হয় তবু নয়। কেননা এসব জিনিসের প্রতি সাধারণ মানুষের তেমন কোনো আকর্ষণ থাকেনা। আর এর মালিক সাধারণত কৃপণতা করেনা যে তাকে শায়েস্তা করার প্রয়োজন হবে। তাছাড়া এখানে রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ। আর রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন, "তিনটে জিনিসে সকল মানুষের সমান অধিকার রয়েছে : পানি, আগুন ও ঘাস।" ফকিহদের আরেকটি মতভেদপূর্ণ বিষয় হলো কুরআন শরিফ চুরি করা। আবু হানিফা বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন শরিফ চুরি করবে, তার হাত কাটা হবেনা। কেননা এটা কোনো সম্পদ নয়। তাছাড়া এতে সকলেরই অধিকার রয়েছে। কিন্তু ইমাম মালেক, শাফেয়ি, আবু সাওর, আবু ইউসুফ ও ইবনুল মুনযির বলেন, কুরআন শরিফের মূল্য হাত কাটার ন্যূনতম নেসাবের সমান হলে যে তা চুরি করবে তার হাত কাটা হবে।

দ্বিতীয় যে শর্তটি চুরিকৃত মালে পূরণ হওয়া জরুরি তা হলো, তা হাত কাটার ন্যূনতম নেসাবের সমান হবে। কারণ হদ কার্যকর করার জন্য এমন একটা জিনিস জরুরি, যা তার মাপকাঠি হবে। তাছাড়া জিনিসটির এতটা মূল্য থাকা চাই, যার কারণে জিনিসটি খোয়া গেলে জনগণের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সামান্য মূল্যের জিনিস খোয়া গেলে জনগণ তা মেনে নিতে অভ্যস্ত। তাই প্রাচীন মনীষীগণ তুচ্ছ জিনিস চুরি করার দায়ে চোরের হাত কাটতেন না। নেসাবের পরিমাণ কত, তা নিয়ে ফকিহ্দের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ আলেমের মতে, স্বর্ণের তৈরি এক দিনারের এক চতুর্থাংশ অথবা রূপার তৈরি তিন দিরহামের সমান হওয়া জরুরি। এভাবে পরিমাণ নির্ধারণের যৌক্তিকতা সুস্পষ্ট। এটা একজন মধ্যম ধরনের মানুষের নিজের ও তার পরিবারের একদিনের খরচের অনুরূপ। আর একজন মানুষের নিজের ও পরিবারের একদিনের খরচই হলো নেসাব। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. সিকি দিনার বা তদুর্ধ্ব পরিমাণ সামগ্রী চুরির জন্য চোরের হাত কেটে দিতেন। -আহমদ, মুসলিম ইবনে মাজাহ।

নাসায়ীর অপর একটি রেওয়ায়াতে আছে : "ঢালের চেয়ে কম দামী জিনিসের জন্য হাত কাটা হবেনা।" আয়েশা রা. কে জিজ্ঞাসা করা হলো : ঢালের দাম কত? তিনি বললেন : সিকি দিনার। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত ইবনে উমরের এই রেওয়ায়াতটি উপরোক্ত হাদিসের সমর্থক যে, রসূলুল্লাহ সা. তিন দিরহামের একটি ঢালের জন্য চোরের হাত কেটেছিলেন।

হানাফিদের মাযহাব হলো, দশ দিরহাম বা তদুর্ধের জন্য হাত কাটা হবে, তার চেয়ে কমের জন্য হাত কাটা হবেনা। বায়হাকি, তাহাবি ও নাসায়ীর হাদিস দ্বারা তাদের মতের পক্ষে প্রমাণ দর্শান। পক্ষান্তরে হাসান বসরি ও দাউদ যাহেরির মত হলো, আয়াতে যেহেতু কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণের উল্লেখ নেই, তাই কম হোক, বেশি হোক, চুরি করলেই হাত কাটা হবে। তাছাড়া বুখারি ও মুসলিমের আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "আল্লাহ চোরের উপর অভিশাপ বর্ষণ করুন। সে একটা ডিম চুরি করলেও

তার হাত কাটা হয়, একটা উট চুরি করলেও তার হাত কাটা হয়।" অন্যান্য ফকিহ হাসান বসরি ও দাউদ যাহেরির মত খণ্ডন করে এই হাদিসটি সম্পর্কে বলেন : "এ হাদিসের বর্ণনাকারী আ'মাশ হাদিসটির ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, ডিম দ্বারা লোহার ডিম বুঝানো হয়েছে, যা যুদ্ধের পোশাক হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং তা ঢালের মতোই। এর মূল্য ঢালের মূল্যের চেয়ে বেশিও হয়ে থাকে। আর উটের মূল্য কয়েক দিরহাম বলে মনে করা হতো। আর সিকি দিনার তিন দিরহাম দিয়ে ভাঙানো হতো। কেননা ইমাম শাফেয়ি 'আর রওযাতুন নাদিয়া' গ্রন্থে বলেছেন : সিকি দিনার তিন দিরহামের রেওয়ায়াতের সাথে সংগতিপূর্ণ। রসূলুল্লাহ সা. এর আমলে এক দিনারকে বারো দিরহাম দ্বারা ভাঙানো হতো। এটা দিয়াত নির্ধারণ সংক্রান্ত রেওয়াতগুলোর সাথে সংগতিপূর্ণ। দিয়াত স্বর্ণ দিয়ে দিতে হলে এক হাজার দিনার এবং রৌপ্য দিয়ে দিতে হলে বারো হাজার দিরহাম দিতে হতো। আবু হানিফা ও তাঁর শিষ্যগণ কমের পক্ষে দশ দিরহাম বা এক দিনার চুরি করলেই হাত কাটা বাধ্যতামূলক মনে করেন। নগদ মুদ্রা ছাড়া অন্য কোনো দ্রব্যসামগ্রী চুরি করলে তা দশ দিরহাম বা এক দিনার মূল্যের হলে হাত কাটা হবে। এর চেয়ে কম হলে হাত কাটা হবেনা। কেননা আমর বিন শুয়াইবের রেওয়ায়াত অনুসারে রসূলুল্লাহ সা. এর সময়ে একটা ঢালের মূল্য ছিলো দশ দিরহাম। ইবনে আব্বাস প্রমুখ থেকেও এই মূল্যায়ন বর্ণিত আছে। তাদের মতে, এই মূল্যায়ন অনুসারে ঢালের মূল্য নির্ধারণ করাই অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। তবে প্রকৃত ব্যাপার হলো, ঢালের মূল্য দশ দিরহাম নির্ধারণ করা হলে তা হবে নির্ভুলতম হাদিসের লঙ্ঘন। মালেক ও আহমদ বলেন : চুরির সর্বনিম্ন পরিমাণ হচ্ছে, সিকি দিনার অথবা তিন দিরহাম অথবা তিন দিরহাম মূল্যের সামগ্রী। মূল্য নির্ধারণের কাজটা বিশেষভাবে দিরহাম দ্বারা সম্পন্ন করা উচিত।

কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন যে, হাত কাটার দিয়াত বা ক্ষতিপূরণ যেখানে পাঁচশো দিনার, সেখানে মাত্র সিকি দিনারের জন্য হাত কাটা কিভাবে ন্যায়সঙ্গত হয়! এর জবাব এই যে, ইসলাম এত কম পরিমাণ সম্পদ চুরিতে হাত কাটার বিধান রেখেছে কেবল সম্পদের সুরক্ষা করার উদ্দেশ্যে, আর হাতের দিয়াত পাঁচশো দিনার নির্ধারণ করেছে হাতের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে। হাত যখন আমানতদার ও সৎ ছিলো তখন তা দামী ছিলো। আর যখন তা অসৎ ও চোর হয়েছে, তখন তার দাম কমে গেছে।

চোরাই মালের মূল্য নির্ধারণ কখন করা হবে?

মালেকি, শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাব অনুসারে চোরাই মালের মূল্য নির্ধারণ করা হবে যেদিন চুরি হয়েছে সেই দিনের বাজার দর অনুসারে।

দলগত চুরি

যখন এক দল চোর এতটা সম্পদ চুরি করে যে, তা দলের সকল সদস্যের মধ্যে বণ্টন করলে প্রত্যেকের অংশে যা পড়ে, তাতে হাত কাটা অনিবার্য হয়ে পড়ে, তখন ফকিহদের সর্বসম্মত মতানুসারে সকলের হাত কাটা হবে। কিন্তু যদি চোরাই মালের পরিমাণ এমন হয় যে, তা একত্রে হাত কাটার নেসাবের সমান হয়, কিন্তু বন্ট করে দিলে নেসাবের সমান হয়না, তখন ফকিহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ ফকিহর মতানুসারে সকলের হাত কাটা হবে। আবু হানিফা বলেন : প্রত্যেকের অংশ নেসাব পরিমাণ না হলে হাত কাটা হবেনা। ইবনে রুশ্‌দ বলেন : যারা মনে করেন সবার হাত কাটা হবে, তাদের দৃষ্টিতে

শাস্তিটা চোরাই মালের পরিমাণের সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ মানুষের সম্পদের সুরক্ষার স্বার্থে এই পরিমাণ সম্পদই চুরিতে হাত কাটাকে অপরিহার্য করে। আর যারা মনে করেন শুধু এই পরিমাণের উপরই হাত কাটা নির্ভরশীল, এর কমে হাত কাটা যাবেনা হাতের সম্মানের খাতিরে, তারা বলেন : শরিয়ত যে পরিমাণ সম্পদ চুরিতে হাত কাটা বাধ্যতামূলক করেছে, তাতে অধিক সংখ্যক হাত কাটা যাবেনা।

যে জায়গা থেকে চুরি হয়েছে, তার জন্য যে শর্তাবলি পূরণ জরুরি

যে স্থান থেকে চুরি হয়, তার জন্য অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে সুরক্ষিত হওয়া, যেমন বাড়ি, দোকান, আস্তাবল, খোয়াড় বা গোয়াল ঘর, শস্য মাড়ানো ও শুকানোর খোলান ইত্যাদি। এর জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা শরিয়তের পক্ষ থেকেও দেয়া হয়নি, অভিধানের দিক থেকেও দেয়া হয়নি। এক্ষেত্রে একমাত্র প্রচলিত পরিভাষার উপরই নির্ভর করা হয়। শরিয়ত সে স্থানকেই সংরক্ষিত মনে করে, যা প্রমাণ করে যে, জিনিসটির মালিক জিনিসটিকে নষ্ট হওয়ার হাত থেকে রক্ষায় যথাসাধ্য সচেষ্ট ও যত্নবান। এর প্রমাণ হলো, আমর বিন শুয়াইবের দাদা কর্তৃক বর্ণিত হাদিস। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সা. কে তার চারণভূমিতে বিচরণশীল পশুর চুরি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাব দিলেন : এ ধরনের পশু চুরি করলে তার দ্বিগুণ মূল্য আদায় করা হবে ও অপমানসূচক পিটুনি দেয়া হবে। আর গোয়াল থেকে যা নেয়া হবে তা যদি ঢালের সমমূল্যের হয়, তবে তার হাত কাটা হবে। (অর্থাৎ গোয়াল থেকে ছাগল বা ভেড়া চুরি করলে চোরের হাত কাটা হবে। কেননা গোয়াল তার রক্ষণাবেক্ষণের স্থান। আর চারণভূমি থেকে চুরি করলে হাত কাটা হবেনা।) লোকটি বললো : হে রসূলুল্লাহ, যে কাপড়ের আঁচলে করে কিছু নিয়ে যায়? তিনি বললেন : যে ব্যক্তি তার মুখে করে কিছু নিয়ে যায় এবং কাপড়ের আঁচলে বেঁধে নেয়না, তার কোনো সাজা নেই। আর যে ব্যক্তি বহন করে কিছু নিয়ে যায়, তার কাছ থেকে তার মূল্যের দ্বিগুণ জরিমানা আদায় করা হবে ও অপমানসূচক প্রহার করা হবে। আর ফসল সংরক্ষণের জায়গা থেকে যা কিছু নেয়া হবে, তা ঢালের সমমূল্যের হলে হাত কাটা হবে। -আহমদ, নাসায়ী, হাকেম, তিরমিযি।

অপর হাদিসে রসূলুল্লাহ সা. বলেন : গাছে ঝুলন্ত খেজুর ও পাহাড়ে বিচরণরত পশু চুরিতে হাত কাটা হবেনা। তবে যদি তা খোয়াড়ে বা সংরক্ষিত চাতালে রক্ষিত হয়, তা হলে ঢালের সমমূল্যের হলে হাত কাটা হবে। এ দুটো হাদিস থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে হাত কাটার জন্য সংরক্ষিত স্থান থেকে চুরি হওয়া চাই। ইবনুল কাইয়েম বলেন : রসূলুল্লাহ সা. গাছ থেকে ফল চুরির জন্য হাত কাটা রহিত ও সংরক্ষিত স্থান থেকে চুরির জন্য হাত কাটা কার্যকর করেছেন।

আবু হানিফা রহ. এর মতে, গাছের ফল চুরিতে হাত না কাটার। কারণ গাছের ফলমূল পচনশীল হওয়ার কারণে তার মূল্য কমে যায়। বস্তুত প্রত্যেক পচনশীল জিনিসের ক্ষেত্রেই এই নীতি প্রযোজ্য। তবে অধিকাংশ ফকিহর মতই সঠিক। কেননা রসূলুল্লাহ সা. গাছের ফলের তিনটে অবস্থা নির্দেশ করেছেন। এক, কেউ ফল পেড়ে খেয়ে গেলে কোনো শাস্তি নেই। দুই, গাছ থেকে পেড়ে বা ছিড়ে ফল নিয়ে চলে গেলে দ্বিগুণ জরিমানা আদায় ও মারপিট করা হবে, কিন্তু হাত কাটা হবেনা। তিন, ফল শুকানো ও সংরক্ষণের জায়গা

থেকে চুরি করলে হাত কাটা হবে, চাই তা পুরো শুকিয়ে থাকুক বা না শুকিয়ে থাকুক। সুতরাং গুরুত্ব হলো সংরক্ষণের ও সংরক্ষণের স্থানের। ফল শুকনো না কাঁচা তার কোনো গুরুত্ব নেই। এর প্রমাণ হলো, রসূলুল্লাহ্ সা. চারণক্ষেত্র থেকে ছাগল চুরির দায়ে হাত কাটার রহিত করেছেন। গোয়াল বা খোয়াড় থেকে চুরির জন্য হাত কাটা হবে। কেননা ওটা একটা সংরক্ষিত স্থান। অধিকাংশ ফকিহর মতে হাত কাটার জন্য সংরক্ষিত স্থান থেকে চুরি হওয়ার গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু তা শর্ত নয়। এই ফকিহদের মধ্যে রয়েছেন আহমদ, ইসহাক, যুফার ও যাহেরি মাযহাব। কেননা "পুরুষ ও মহিলা যে-ই চুরি করুক, তার হাত কেটে দাও" এ আয়াতে হাত কাটা কোনো শর্তের আওতাভুক্ত নয়। আর আমর বিন শুয়াইবের হাদিসগুলো বিতর্কিত হওয়ার কারণে কোনো শর্ত আরোপের অযোগ্য।

সম্পদভেদে রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থার বিভিন্নতা

সম্পদের বিভিন্নতার কারণে সংরক্ষণ ব্যবস্থাও ভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। প্রচলিত রীতি নীতিই এর চূড়ান্ত মানদণ্ড। বস্তুত : একই জিনিস কখনো সংরক্ষিত গণ্য হয়, আবার কখনো হয়না। যেমন বাড়ি তার ভেতরকার ফার্নিচার ইত্যাদির জন্য সুরক্ষিত স্থান, সুরক্ষিত ঘর ফলমূলের জন্য সুরক্ষিত স্থান, আস্তাবল পশুর জন্য সুরক্ষিত স্থান এবং খোয়াড় ছাগল ভেড়ার জন্য সুরক্ষিত স্থান।

মানুষ নিজের জন্য নিজেই সুরক্ষিত স্থান

মানুষ তার পোশাক পরিচ্ছদ ও ঘুমানোর খাট পালং ও ঘর বিছানার জন্য নিজেই সুরক্ষিত স্থান অর্থাৎ রক্ষক, চাই সে মসজিদের ভেতরে থাকুক বা অন্য কোথাও। যদি কেউ পথিমধ্যে বিশ্রাম নেয় এবং তার সাথে তার যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী থাকে, তবে সে নিজেই সেসব দ্রব্য সামগ্রীর রক্ষক, চাই সে ঘুমিয়ে থাকুক বা জেগে থাকুক। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো মানুষের কাছ থেকে তার নগদ অর্থ বা দ্রব্যসামগ্রী চুরি করে, তবে সে তা হস্তগত করা মাত্রই তার হাত কাটা যাবে। কেননা জিনিসগুলো তার মালিকের হাতছাড়া হয়ে গেছে। ফকিহগণ ঘুমিয়ে থাকা ব্যক্তির ব্যাপারে শর্ত আরোপ করেছেন যে, চুরি হওয়া দ্রব্যটি তার দেহের নিচে বা মাথার নিচে থাকা চাই। এই শর্তের পক্ষে তারা প্রমাণ দর্শান। আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, নাসায়ী ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত এই হাদিস থেকে : "সাফওয়ান বিন উমাইয়া বলেন : আমি মসজিদে আমার একটা চাদর বিছিয়ে ঘুমিয়েছিলাম। সেই চাদর চুরি হয়ে গেলো। আমরা চোরকে ধরে রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট নিয়ে গেলাম। তিনি তার হাত কাটার আদেশ দিলেন। আমি বলমাল : হে রসূলুল্লাহ্ মাত্র ত্রিশ দিরহাম মূল্যের একটা চাদরের জন্য? ওটা আমি ওকে দান করলাম। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তুমি এই কাজটি ওকে আমার কাছে নিয়ে আমার আগে করলেনা কেন? অর্থাৎ আমার কাছে নিয়ে আসার আগে তাকে ক্ষমা করলেনা কেন এবং চাদরটি দান করলেনা কেন?

এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, চুরি হওয়া দ্রব্যটির দাবি জানানো ও অভিযোগ দায়ের করা হাত কাটার পূর্বশর্ত। মালিক যদি দ্রব্যটি চোরকে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার আগে দিয়ে দেয় বা তার কাছে বিক্রি করে, তাহলে চোরের হাত কাটার শাস্তি রহিত হবে। এটা স্বয়ং রসূলুল্লাহ সা. এর এই উক্তি থেকেই জানা যায় যে, আমার কাছে ওকে নিয়ে আসার আগে দান করলেনা কেন?

পকেটমার

পকেটমার সম্পর্কে ফকিহদের মতভেদ রয়েছে। একদল বলেন : পকেটমারের হাত কাটা হবে। চাই পকেটে হাত দিয়ে পকেটে যা আছে তুলে নিক অথবা পকেট কেটে যা আছে তা পড়ে যাওয়ার পর তুলে নিক। এটা ইমাম মালেক, আওযায়ি, আবু সাওর, ইয়াকুব, হাসান ও ইবনুল মুনযিরের মত। কিন্তু আবু হানিফা, মুহাম্মদ ও ইসহাকের মতে, পকেটে থাকা টাকা যদি বাহির থেকে দেখা যায় এবং তা কেটে চুরি করে, তবে হাত কাটা হবেনা। আর যদি পকেটের ভেতরে অদৃশ্য থাকে এবং তার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে বের করে নেয়, তাহলে হাত কাটা হবে।

মসজিদ সুরক্ষিত স্থান

মসজিদের বিছানা, বাতি, চাটাই ইত্যাদি সাধারণত: মসজিদেই রাখা হয়। সেগুলোর জন্য মসজিদ সুরক্ষিত স্থান গণ্য হয়। মসজিদে মহিলাদের নামাযের জায়গায় রক্ষিত তিন দিরহাম মূল্যের একটা ঢাল চুরি করার দায়ে রসূলুল্লাহ সা. চোরের হাত কেটে দিয়েছিলেন। (আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী) অনুরূপ যে চোর মসজিদের দরজা বা শোভা বর্ধক কোনো মূল্যবান উপকরণ চুরি করে, তারও হাত কাটা হবে। কেননা এগুলো যে সুরক্ষিত জিনিস, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। শাফেয়ি আলেমগণ মসজিদের বাতি ও চাটাই চুরির দায়ে হাত কাটার বিরোধী। কারণ এগুলো মুসলমানদের সুবিধার জন্যই রাখা হয়। চোরেরও অধিকার রয়েছে এই সুবিধা ভোগ করার। তবে চোর অমুসলিম হলে ভিন্ন কথা। তখন তার হাত কাটা হবে। কেননা তার এতে কোনো অধিকার নেই।

বাড়ি থেকে চুরি

বাড়ির দরজা বন্ধ না থাকলে বাড়ি সুরক্ষিত স্থান নয়- এটা সকল ফকিহর সর্বসম্মত মত। অনুরূপ এ ব্যাপারেও ফকিহগণ একমত যে, চোর একক মালিকানাধীন কোনো বাড়ি থেকে চুরি করে, সে ঐ বাড়ি থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত তার হাত কাটা হবেনা। কিন্তু যখন দুই ব্যক্তি যৌথভাবে কোনো বাড়িতে সিধ কাটে বা ছিদ্র করে অতপর একজন ঢুকে ভেতর থেকে কোনো জিনিস নিয়ে অপর জনের নিকট হস্তান্তর করে এবং শেষোক্ত জন বাড়ির বাইরে থাকে অথবা বাড়ির ভেতর থেকে একজন ছুড়ে দেয় এবং বাহির থেকে অপর জন নিয়ে নেয়। তবে সেই ক্ষেত্রে ফকিহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালেক, শাফেয়ি ও আহমদের মতে, ভেতরের চোরের হাত কাটা হবে, বাইরের চোরের নয়। আবু হানিফার মতে, কারোই নয়। আর যখন একটি দল বাড়িতে প্রবেশের জন্য সিধ কাটে বা ছিদ্র করে এবং সবাই ভেতরে প্রবেশ করে, অতপর কয়েকজন নেসাব পরিমাণ মাল হস্তগত করে আর অপর কয়েকজন কিছুই হস্তগত করতে পারেনা এবং তাদের পক্ষ থেকে হস্তগতকারীদের কোনো সহযোগিতাও করা হয়না, তখন আবু হানিফা ও মুহাম্মদের মতে গোটা দলের হাত কাটা হবে। মালেক ও শাফেয়ির মতে কেবল যারা মাল হস্তগত করতে পেরেছে তাদেরই হাত কাটা হবে। পক্ষান্তরে যে ভেতরে ঢুকেছে, সে যদি মাল ছিদ্রের কাছে এনে রেখে দেয় এবং বাইরের জন হাত ঢুকিয়ে দিয়ে তা বাড়ির বাইরে নিয়ে আসে। তবে আবু হানিফার মতে দু'জনের কারোই হাত কাটা হবেনা। ইমাম মালেকের মতে যেজন মাল বাইরে এনেছে তার হাত কাটা হবে। আর ভেতরের যেজন ছিদ্রের কাছে এনে রেখেছে তার সম্পর্কে ইমাম মালেকের শিষ্যদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। কত লোক বলেন,

তার হাত কাটা হবে। কত লোক বলেন, কাটা হবেনা। শাফেয়ির মতে, শুধু যেজন মাল বাইরে এনেছে তার হাত কাটা হবে। আহমদের মতে, উভয়েরই হাত কাটা হবে।

শেখ আবু ইসহাক বলেন : যদি দুই ব্যক্তি সিঁধ কেটে বাড়িতে ঢোকে অতপর তাদের একজন মাল ধরে এনে ছিদ্রের কাছে রাখে এবং অপরজন তা ধরে বাইরে আনে তাহলে এ ব্যাপারে দুটি মত রয়েছে : একটি হলো দু'জনেরই হাত কাটা হবে। কারণ এ দু'জনের হাত যদি না কাটা হয়, তাহলে এটা হাত কাটা রহিত করার একটি স্থায়ী কৌশলে রূপ নেবে। অপর মতটি হলো, দু'জনের কারোই হাত কাটা হবেনা। এই শেষোক্ত মতটি আবু হানিফার এবং এটাই সঠিক। কেননা দু'জনের কেউ সুরক্ষিত স্থান থেকে মাল বাইরে নিয়ে আসেনি। আর যদি একজন সিঁধ কাটে এবং অপরজন ভেতরে ঢোকে ও মাল বের করে, তবে এ সম্পর্কে দুটি মত রয়েছে। একটি পূর্বোক্ত মতের ন্যায় : অর্থাৎ একদল বলেন দু'জনেরই হাত কাটা হবে, আর আবু হানিফা বলেন দুজনকেই হাত কাটা থেকে অব্যাহতি দেয়া হবে। অপর মতটি হলো, দু'জনের কারোই হাত কাটা হবেনা। কেননা একজন সিঁধ কেটেছে কিন্তু মাল বাইরে আনেনি। আর অপরজন মাল বাইরে এনেছে বটে, তবে সুরক্ষিত স্থান থেকে নয়।

চুরির শাস্তির জন্য মালিকের নালিশ কি অপরিহার্য?

চোরাই মালের মালিক যতক্ষণ চোরের উপর হদ কার্যকর করার দাবি না জানাবে, ততোক্ষণ আহমদ, শাফেয়ি ও আবু হানিফার মতানুসারে দণ্ড কার্যকর করা যাবেনা। ইমাম মালেকের মতে মালিক দাবি না করলেও কার্যকর করতে হবে। আবু হানিফা, শাফেয়ি ও আহমদের মতে, চোরাই মালের দাবি জানানো ও চোরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা দণ্ডের পূর্বশর্ত। দু'জন সৎ লোকের সাক্ষ্য দ্বারা অথবা অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি দ্বারা দণ্ড সাব্যস্ত হবে। সাক্ষ্য বা স্বীকারোক্তি একবার দেয়াই মালেক শাফেয়ি ও হানাফিদের মতে যথেষ্ট। কেননা রসূলুল্লাহ সা. ঢালের চোরকে ও সাফওয়ানের চাদরের চোরকে স্বীকারোক্তি একাধিকবার করার আদেশ না দিয়েই তাদের হাত কেটেছিলেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে পুনরাবৃত্তি করতে দেখা যায়, তা নিছক বিষয়টির দৃঢ়তা নিশ্চিত করার জন্য। তবে ইমাম আহমদ, ইসহাক ও ইবনে আবি লায়লার মতে অন্তত: দু'বার পুনরাবৃত্তি করা জরুরি।

চোর যদি চোরাই মাল নিজের বলে দাবি করে

সুরক্ষিত স্থান থেকে নেসাব পরিমাণ মাল চুরি করেছে একথা সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হওয়ার পর চোর যদি দাবি করে যে, চোরাই মাল তার নিজের মালিকানাধীন দ্রব্য, তাহলে ইমাম মালেকের মতে, তার দাবি মানা হবেনা এবং তার হাত কেটে দেয়া হবে। আবু হানিফা, শাফেয়ী বলেছেন : হাত কাটা হবেনা। শাফেয়ি এ ধরনের চোরকে "রসিক চোর" নামে আখ্যায়িত করেছেন।

'দণ্ড' রহিত হয় এমন কৌশল চোরকে শেখানো

বিচারকের জন্য চোরকে এমন কলাকৌশল শিক্ষা দেয়া মুস্তাহাব, যাতে সে দণ্ড থেকে রেহাই পায়। আহমদ, আবু দাউদ ও নাসায়ী বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. নিকট জনৈক চোরকে আনা হলে সে স্বীকার করলো, কিন্তু তার কাছে চোরাই মাল পাওয়া গেল না। তখন রসূলুল্লাহ সা. বললেন, তুমি চুরি করেছ বলে আমার তো মনে হয়না। তখন লোকটি দুবার বা তিনবার বললো, হ্যাঁ, আমি অবশ্যই চুরি করেছি।"

আতা বলেছেন, বিচারকদের নিকট চোরকে আনা হলে বিচারক বলতেন : তুমি কি চুরি করেছ? বলো, না।' আতা আবু বকর ও ওমরের নামোল্লেখ করে বলেছেন যে, তারা উভয়ে বিচারক থাকাকালে এ রকম করতেন। আবু দারদার নিকট একটি দাসীকে আনা হলো, যে চুরি করেছিল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুই কি চুরি করেছিস? বল : না।' তখন দাসীটি বললো, না। তখন তাকে মুক্ত করে দিলেন। উমর রা.-এর নিকট এক ব্যক্তিকে আনা হলো। সে চুরি করেছিল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি চুরি করেছ? সঙ্গে সঙ্গে তাকে শিখিয়ে দিলেন : বলো, চুরি করিনি। সে বললো, চুরি করিনি। অমনি তাকে ছেড়ে দেয়া হলো।

চুরির দণ্ড

চুরির অপরাধ যখন প্রমাণিত হয়ে যাবে, তখন চোরের উপর দণ্ড কার্যকর করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। তার ডান হাত কবজি থেকে কেটে ফেলা হবে। আল্লাহ বলেছেন :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوٓا اَيْدِيَهُمَا ○

"পুরুষ কিংবা নারী যেই হোক, চুরি করলে তার হাত কেটে দাও।" জাহেলি যুগেও চোরের হাত কাটার রেওয়াজ চালু ছিলো। ইসলাম এই রেওয়াজকে কিছু শর্ত যোগ করে বহাল রেখেছে। কথিত আছে, জাহেলি যুগে কুরাইশই সর্বপ্রথম বনু খোজায়া গোত্রের মুলাইহ নামক এক ব্যক্তির মুক্ত গোলাম দুরাইকের হাত কেটেছিল। সে কাবার ভেতর থেকে মূল্যবান ধনরত্ন চুরি করেছিল। কেউ কেউ বলেন, এটা অন্য এক দল চুরি করে তার কাছে রেখে তাকে ফাঁসিয়ে দিয়েছিল। কুরতুবি নিশ্চিত করে বলেছেন যে জাহেলি যুগে চোরের হাত কাটা হতো। জাহেলি যুগে সর্বপ্রথম ওলিদ বিন মুগিরার হাত কাটা হয়েছিল। পরে আল্লাহ ইসলামের অভ্যুদয়ের পরও পুনরায় তার হাত কাটার আদেশ দেন। ইসলামের অভ্যুদয়ের পর সর্বপ্রথম রসূলুল্লাহ সা. পুরুষদের মধ্য থেকে খিয়ার বিন আদির হাত এবং মহিলাদের মধ্য থেকে মুরা বিনতে সুফিয়ানের হাত কাটেন। আবু বকর জনৈক ইয়ামানী নাগরিকের ডান হাত এক গাছা হার চুরির জন্য কেটে দিয়েছিলেন। আর উমর রা. ইবনে সামুরার হাত কেটে দিয়েছিলেন। চোরাই মালের মালিক বা শাসক কারো জন্যই চোরের দণ্ড মাফ করা জায়েয নেই। এমনকি অন্য কোনো লঘুতর দণ্ডে পরিবর্তিত করা, স্থগিত রাখা বা বিলম্বিত করাও জায়েয নেই। কিন্তু শিয়াদের মতে, যার মাল চুরি হয়েছে সে মাফ করে দিলে দণ্ড মাফ হয়ে যাবে। তাদের মতে, শাসকও কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণে কোনো কোনো ব্যক্তির দণ্ড রহিত বা বিলম্বিত করতে পারেন। কিন্তু আহলে সুন্নত এই মতের ঘোর বিরোধী। কেননা রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "তোমরা নিজেদের ভেতরে দণ্ড এড়িয়ে চলতে থাকো। কিন্তু যখন মামলা শাসক পর্যন্ত গড়াবে, তখন শাসক মাফ করলেও আল্লাহ মাফ করবেন না।" দ্বিতীয়বার চুরি করলে পা কাটা হবে। তৃতীয়বার চুরি করলে আবু হানিফার মতে, লঘু শাস্তি কারাগারে আটক রাখা হবে। শাফেয়ি ও অন্যান্যদের মতে, বাম হাত কাটা হবে। পুনরায় চুরি করলে লঘু শাস্তি দিয়ে কারাবন্দী করা হবে।

চোরের হাত কাটার পর রক্ত বন্ধ ও ক্ষতস্থান নিরাময় করতে হবে

চোরের হাত কাটার পর এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে রক্ত বন্ধ হয় এবং সে মারা না

যায়। দার কুতনি, হাকেম, বায়হাকি ও ইবনে হিব্বান আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন :

একটা চাদর চুরির দায়ে এক ব্যক্তিকে রসূলুল্লাহ সা. এর নিকট আনা হলো। তিনি বললেন, আমার মনে হয়না সে চুরি করেছে (যাতে সে স্বীকারোক্তি না করে ও স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে)। চোর বললো, হে রসূলুল্লাহ সা., আমি সত্যিই চুরি করেছি। তখন তিনি বললেন, তোমরা ওকে নিয়ে যাও, হাত কেটে দাও ও রক্ত বন্ধ করার ব্যবস্থা করো। এ দ্বারা প্রমাণিত হয়, রক্ত বন্ধের ব্যবস্থা করার ব্যয় নির্বাহ চোরের নয়, সরকারের দায়িত্ব। তারপর তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। অতপর তার হাত কাটা হলো এবং রসূলুল্লাহ সা. এর নিকট আনা হলো। তিনি বললেন, আল্লাহর কাছে তওবা করো। সে বললো, তওবা করেছি। তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাকে মাফ করুন।"

চোরের কাটা হাত তার ঘাড়ে ঝুলানো

চোরকে শায়েস্তা করা ও অন্যদের সতর্ক করার উদ্দেশ্যে শরিয়ত চোরের কাটা হাত তার ঘাড়ে ঝুলিয়ে রাখার আদেশ দিয়েছে। আবু দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযি বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ বিন মুহায়রিব বলেছেন, আমি ফুযালাকে জিজ্ঞাসা করলাম, চোরের হাত কেটে তা তার ঘাড়ে ঝুলানো কি সুন্নত? তিনি বললেন, হাঁ, জনৈক চোরকে রসূলুল্লাহ সা. এর নিকট আনা হয়েছিল। তার হাত কাটা হলো। অতপর সে হাত তার ঘাড়ে ঝুলানোর আদেশ দেয়া হলো। (সম্ভবত এটা কোনো পাক্কা চোরের বিষয় ছিলো)।

ক্ষতিপূরণ ও হদ উভয়টির প্রয়োজনীয়তা

চোরাই মাল যখন অক্ষত থাকে তবে তা তার মালিকের নিকট ফেরত দিতে হবে। কেননা রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "চোর যা চুরি করেছে, তাকে তা ফেরত দিতে হবে।" এটা শাফেয়ী ও ইসহাকের মত। চোরের কাছ থেকে যখন চুরি করা মাল নষ্ট হয় বা খোয়া যায়, তখন তাকে তার বদলা দিতে হবে এবং হাতও কাটা হবে। এ ব্যাপারে একজন অপরজনকে বাধা দিতে পারবেনা। কেননা ক্ষতিপূরণ মানুষের হক। আর হাত কাটা আল্লাহর হক। তাই কেউ কাউকে বাধা দিতে পারেনা যেমন বাধা দিতে পারেনা দিয়ত ও কাফফারা দিতে। আবু হানিফার মতে, চোরাই মাল খোয়া গেলে চোরকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হবেনা। শুধু হাত কাটা হবে। ইমাম মালেকের মতে, চোর সচ্ছল হলে ক্ষতিপূরণ দেবে, নচেত শুধু হাত কাটা হবে।

আঠারোতম অধ্যায়

ফৌজদারী অপরাধ (হত্যা জখম)

ধর্ম, জীবন, বুদ্ধি, সম্ভ্রম ও সম্পদ-এর যে কোনোটির জন্য ক্ষতিকর হওয়ার কারণে শরিয়ত নিষিদ্ধ করে, এমন যে কোনো কাজই ফৌজদারী অপরাধ। এসব অপরাধকে ফকিহগণ দুই ভাগে ভাগ করেছেন। যথা : দণ্ড বা হদযোগ্য অপরাধ ও কিসাসযোগ্য অপরাধ। হদযোগ্য অপরাধ সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। কেবল কিসাসযোগ্য অপরাধ নিয়ে আলোচনা বাকি রয়েছে। কিসাসযোগ্য অপরাধ হলো সেসব অপরাধ, যা মানুষের প্রাণহানি ঘটায় অথবা তার চেয়ে কম কোনো যখম বা অঙ্গহানির কারণ হয়। এগুলো হচ্ছে অতি জরুরি জনস্বার্থ সংক্রান্ত মৌল বিধিমালা, যা সংরক্ষণ করা ও মান্য করা জনগণের রক্ষণাবেক্ষণ ও তাদের সামষ্টিক জীবনের নিরাপত্তা বিধানের জন্য অপরিহার্য।

এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম আমরা মানুষের প্রাণরক্ষায় ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভূমিকা স্বরূপ কয়েকটি কথা বলবো। এই সাথে ইসলাম ও জাহেলিয়াতে কিসাসের তুলনামূলক আলোচনা এবং তারপর প্রাণহানিজনিত কিসাস ও অপেক্ষাকৃত লঘু অঙ্গহানিজনিত কিসাস নিয়ে আলোচনা করবো। প্রচলিত আইনের যেগুলো ফৌজদারী অপরাধ গণ্য হয়, সেগুলো সবচেয়ে মারাত্মক অপরাধ। দণ্ডবিধিতে এসব অপরাধের শাস্তি হয় মৃত্যুদণ্ড, না হয় সশ্রম কারাদণ্ড।

জীবনের নিরাপত্তা

মানুষের মর্যাদা

মহান আল্লাহ মানুষকে একটি সম্মানিত প্রাণী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। নিজ হাতে তাকে সৃষ্টি করেছেন, তার দেহে প্রাণ সঞ্চার করেছেন, তার সামনে ফেরেশতাদেরকে সিজদা করিয়েছেন, আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টিকে তার অনুগত করেছেন, তাকে নিজের প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করেছেন এবং তাকে নানাবিধ শক্তি ও গুণাবলী দিয়েছেন, যাতে সে পৃথিবীতে নিজের কর্তৃত্ব ও পরাক্রম প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং যাতে তার জন্য বরাদ্দকৃত বস্তুগত শ্রেষ্ঠত্ব ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সর্বোচ্চ মার্গে উন্নীত হতে পারে। মানুষের পক্ষে তার সৃষ্টির সকল উদ্দেশ্য সফল করা ও চূড়ান্ত লক্ষ্যে উপনীত হওয়া ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয়, যতক্ষণ না উন্নতির সকল উপায় উপকরণ তার হস্তগত হয় এবং তার সকল অধিকার সে অর্জন করে। ইসলাম তার এসব অধিকারের নিরাপত্তা দিয়েছে। এসব অধিকারের অন্যতম হচ্ছে বেঁচে থাকার অধিকার, মালিকানার অধিকার, মানসম্ভ্রম রক্ষার অধিকার, স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার। মানুষ হিসেবেই প্রত্যেক মানুষের এসব অধিকার অবশ্য প্রাপ্য, চাই তার ধর্ম, বর্ণ, জাতীয়তা, দেশ বা সামষ্টিক কেন্দ্র যাই হোক না কেন। আল্লাহ বলেন :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا○

অর্থ : আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি, তাদেরকে উত্তম জীবিকা দান করেছি এবং আমার সৃষ্টি করা অনেকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।" (সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত ৭০)

বিদায় হজ্জে রসূলুল্লাহ সা. বলেছিলেন : "হে জনতা, তোমাদের প্রাণ ও সম্পদ তোমাদের সকলের নিকট সম্মানার্হ যেমন তোমাদের এই শহর, আজকের এই দিন এবং তোমাদের মাল সম্মানার্হ... প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে অপর মুসলমানের প্রাণ, সম্পদ ও সম্ভ্রম সম্মানার্হ।"

জীবনের অধিকার

জীবনের বা বাঁচার অধিকার হচ্ছে এসব অধিকারের মধ্যে সর্বপ্রথম অধিকার। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধিকার এবং এমন পূত পবিত্র অধিকার যে, তার পবিত্রতা ক্ষুণ্ন করা কারো জন্য বৈধ নয়। আল্লাহ বলেন : وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

"আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হতা করোনা।" (সূরা ইসরা : আয়াত ৩৩)

যে যথার্থ কারণ বা সঙ্গত কারণে প্রাণ হরণ করা বৈধ, তা ইবনে মাসউদ বর্ণিত হাদিসে রসূলুল্লাহ সা. নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করেছেন : "আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং আমি তার রসূল, একথা স্বীকার করে এমন কোনো মুসলমানকে তিনটে কারণ ব্যতীত হত্যা করা যাবে না। তাহলো : বিবাহিত অবস্থায় ব্যভিচার করা, কোনো মানুষকে হত্যা করেনি এমন ব্যক্তিকে হত্যা করা এবং ইসলাম ত্যাগ করা তথা মুরতাদ হওয়া।" -বুখারি ও মুসলিম।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ط اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ○

"দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করোনা। তাদেরকে ও তোমাদেরকে আমিই রিযক দিয়ে থাকি। তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।" (সূরা ইসরা : আয়াত ৩১)

আল্লাহ আরো বলেন : وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ، بِاَيِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ -

"যখন জীবন্ত প্রোথিত শিশু কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কোন্ অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল।" (সূরা আত তাকবীর : আয়াত ৮-৯)

মহান আল্লাহ প্রথম হত্যার দৃষ্টান্ত স্থাপনকারীর জন্য এমন কঠোর আযাব নির্ধারণ করে রেখেছেন, যা তার আর কোনো সৃষ্টির জন্য রাখেননি। রসূলুল্লাহ সা. বলেন :

অন্যায়ভাবে যে কোনো মানুষ নিহত হয়, আদমের ছেলে (কাবিলকে) সেই অপরাধের শাস্তির একটা অংশ ভোগ করানো হবে, যে সর্বপ্রথম (হাবিলকে) হত্যা করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল।" -বুখারি, মুসলিম। ইসলাম মানুষের জীবন রক্ষায় যে অতিশয় ব্যাকুল ও যত্নবান, তার একটি প্রমাণ এই যে, সে মানুষের প্রাণ হননকে বৈধ গণ্যকারীকে কঠোরতম শাস্তির হুমকি দিয়ে রেখেছে। আল্লাহ বলেন :

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا ○

অর্থ : যে ব্যক্তি কোনো মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে, তার প্রতিফল চিরস্থায়ী জাহান্নাম, তার উপর আল্লাহর কোপানল বর্ষিত হবে, অভিশাপ পড়বে এবং তার জন্য আল্লাহ ভয়াবহ আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।" (সূরা নিসা : আয়াত ৯৩)

এ আয়াত থেকে স্থির হলো যে, পরকালে একজন হত্যাকারীর শাস্তি হচ্ছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব, জাহান্নামে চিরস্থায়ী অবস্থান, আল্লাহর গযব অভিশাপ ও কঠিন শাস্তি। এজন্য ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিনকে যে হত্যা করে, তার তওবার সুযোগ নেই। কেননা এ আয়াত সর্বশেষে নাযিল হওয়া আয়াতসমূহের অন্যতম। পরবর্তীতে আর কোনো আয়াত এ আয়াতকে রহিত বা সংশোধিত করেনি। অবশ্য অধিকাংশ আলেম ইবনে আব্বাসের মতের সমর্থক নন।

রসূলুল্লাহ সা. বলেন : "একজন মুমিনের অন্যায়ভাবে নিহত হওয়ার চেয়ে গোটা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহর কাছে তুচ্ছ।" -ইবনে মাজাহ।

আবু সাঈদ রা. থেকে তিরমিযি বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "আকাশ ও পৃথিবীর সকল প্রাণীও যদি একজন মুমিনের হত্যায় শরিক থাকতো, তবে তাদের সকলকে আল্লাহ জাহান্নামে নিক্ষেপ করতেন।"

বায়হাকি ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের হত্যায় একটি শব্দের অর্ধেক উচ্চারণ করেও সাহায্য করে, কেয়ামতের দিন তার দুই চোখের মাঝখানে লেখা থাকবে : "আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হতাশ।" কারণ হত্যা হচ্ছে আল্লাহ যা গড়তে চান তা ভাঙ্গার নামান্তর। আক্রান্ত ব্যক্তির প্রাণ সংহারের পদক্ষেপ। তাকে নিয়ে তার যে আত্মীয় স্বজন গর্ববোধ করে ও তার দ্বারা উপকৃত হয়, তাকে হারিয়ে যারা অসহায় হয়ে পড়ে, তাদের উপর আগ্রাসনের শামিল। এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় সকল হত্যাকাণ্ড এসে পড়ে, যেমন মুসলমান হত্যা, অমুসলিম হত্যা ও আত্মহত্যা। অমুসলিম হত্যা সম্পর্কে একাধিক সুস্পষ্ট হাদিস রয়েছে, যাতে হত্যাকারীর জন্য জাহান্নাম অবধারিত ঘোষণা করা হয়েছে। বুখারি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিক হত্যা করে, সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবেনা। অথচ জান্নাতের ঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।" (চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম সেই অমুসলিমকে বলা হয় যে, কোনো মুসলিম নাগরিক কর্তৃক নিরাপত্তা প্রদত্ত ও আশ্রিত, অথবা মুসলিম শাসকের সাথে সন্ধি চুক্তি অনুযায়ী মুসলিম দেশে বসবাস করে অথবা জিযিয়া প্রদানের চুক্তি অনুযায়ী নাগরিকত্ব লাভ করে। আর "জান্নাতের ঘ্রাণ পাবেনা, কথাটার অর্থ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা।)

আর আত্মহত্যা সম্পর্কে আল্লাহ স্বয়ং নিম্নরূপ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন :

وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ –

"তোমরা নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করোনা।" (বাকারা : ১৯৫)

আল্লাহ আরো বলেন : وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ○

"তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করোনা। আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াশীল।" (নিসা : ২৯)

আর বুখারি ও মুসলিম আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন :

"যে ব্যক্তি কোনো পাহাড়ের উপর থেকে নিজেকে নিচে ফেলে দেয় এবং নিজকে হত্যা করে, সে দোযখের আগুনে চিরদিন অবস্থান করে উপর থেকে নিচে নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি বিষ পান করে নিজেকে হত্যা করে, সে দোযখের আগুনে অনন্তকাল অবস্থান করে নিজের হাতে বিষ নিয়ে পান করতে থাকবে, আর যে ব্যক্তি নিজেকে কোনো লোহার অস্ত্র দিয়ে হত্যা করবে, সেই লোহার অস্ত্র হাতে নিয়েই সে অনন্ত কাল ব্যাপি দোযখে অবস্থান করে নিজেকে আঘাত করতে থাকবে।"

বুখারি আবু হুরায়রা রা. থেকে আরো বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "যে ব্যক্তি নিজেকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে, সে দোযখে নিজের শ্বাসরোধ করতে থাকবে, যে ব্যক্তি নিজেকে কোপায়, সে দোযখে নিজেকে কোপাতে থাকবে, আর যে নিজেকে ফেলে দেয়, সে দোযখে নিজেকে ফেলে দিতে থাকবে।"

জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বুখারি বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে এক ব্যক্তির দেহে ক্ষত ছিলো। সে তার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়লো। তারপর একখানা ছুরি দিয়ে নিজের হাত কাটলো। তারপর আর রক্তপাত বন্ধ হলোনা। অবশেষে মারা গেলো। আল্লাহ বললেন, আমার বান্দা নিজের ব্যাপারে আমাকে ডিঙ্গিয়ে গেলো। আমি তার উপর বেহেশত হারাম করে দিলাম।"

হাদিসে একথাও বলা হয়েছে, "কোনো ব্যক্তি যে জিনিস দিয়ে নিজেকে হত্যা করবে, তাকে কেয়ামতের দিন সেই জিনিস দিয়েই বারবার হত্যা করা হবে।" হত্যাকারীদের নিন্দায় ইতিপূর্বে যা কিছু বলা হয়েছে, তার অতিরিক্ত সর্বাধিক যে ধিক্কার বাণী উচ্চারিত হয়েছে তা হলো, ইসলাম কোনো একক ব্যক্তির হত্যাকারীকে গোটা মানবজাতির হত্যাকারী হিসেবে বিবেচনা করে। এই জঘন্য অপরাধের বিরুদ্ধে এর চেয়ে বড় নিন্দাবাদ আর কিছু কল্পনা করা যায়না। আল্লাহ বলেন :

أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا م بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ط

অর্থ : নরহত্যা অথবা দেশে ধ্বংসাত্মক কাজ করার কারণ ছাড়াই কেউ একজন মানুষকে হত্যা করলে সে যেন সকল মানুষকেই হত্যা করলো, আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন সকল মানুষের প্রাণই রক্ষা করলো।" (আল মায়েদা : আয়াত ৩২)

আর মানুষের প্রাণের গুরুত্ব ও রক্তপাতের ভয়াবহতার কারণেই হত্যাকাণ্ড সেই অপরাধ যার বিচার কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হবে।" (মুসলিম) আর এই গুরুত্ব বিবেচনা করেই আল্লাহ হত্যাকারীর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ, যারা এখনো এ অপরাধে জড়িত হয়নি তাদেরকে সতর্কীকরণ এবং সামাজিক শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত হয় ও জননিরাপত্তা ব্যাহত হয় এমন অপরাধ থেকে সমাজকে পবিত্রকরণের নিমিত্তে কিসাসের বিধান প্রবর্তন ও হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করেছেন এবং বলেছেন :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَّأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○

অর্থ : হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমারে জন্য কিসাসের মধ্যে জীবন রয়েছে যাতে তোমরা সাবধান হতে পারো।" (আল বাকারা : আয়াত ১৭৯)

এই শাস্তি ইতিপূর্বে আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত সকল শরিয়তে নির্ধারিত ছিলো। মূসা আ.-এর শরিয়তের এ সংক্রান্ত বিধান তাওরাতে একবিংশ অধ্যায়ে এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

"যে ব্যক্তি কোনো মানুষকে প্রহার করলো এবং প্রহারের ফলে সে মারা গেলো, তাকে হত্যা করতে হবে। আর যখন কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির উপর আক্রমণ চালায় ও তাকে হত্যা করে, তখন তাকে হত্যা করতে হবে। আর যে ব্যক্তি তার বাবা ও মাকে হত্যা করে, তাকে হত্যা করতে হবে। আর যদি কেউ শুধু আহত করে, তবে (আহত হওয়ার পর মারা গেলে) প্রাণের বদলায় প্রাণ, চোখের বদলায় চোখ, দাঁতের বদলায় দাঁত, হাতের বদলায় হাত, পায়ের বদলায় পা, জখমের বদলে জখম এবং ভাঙ্গার বদলে ভাঙ্গার মাধ্যমে শাস্তি দাও।"

ঈসা আ.-এর শরিয়ত সম্পর্কে কারো কারো ধারণা, হত্যাকারীকে হত্যা করা এ শরিয়তের মূলনীতিতে ছিলোনা। মতির বাইবেলে উদ্ধৃত ঈসা আ.-এর নিম্নোক্ত উক্তি থেকে তারা এর প্রমাণ দর্শান :

"অন্যায়কে প্রতিহত করোনা। বরং যে তোমার ডান গালে চড় দিয়েছে, তার দিকে বাম গালটিও ফিরিয়ে দাও। আর যে ব্যক্তি তোমার সাথে ঝগড়া বাধাতে চায় এবং তোমার পোশাক কেড়ে নেয়, তাকে চাদরটাও দিয়ে দাও। আর যে ব্যক্তি তোমাকে বিদ্রূপ করতে করতে এক মাইল যায়, তার সাথে দুই মাইল যাও।"

আবার কারো কারো ধারণা, ঈসা আ. এর শরিয়তে মৃত্যুদণ্ড রয়েছে। এ ব্যাপারে তারা তাঁর নিম্নোক্ত উক্তি থেকে প্রমাণ দেন :

"আমি ওহির প্রত্যাদেশকে বাতিল করতে আসিনি। আমি তো এসেছি শুধু তাকে পূর্ণতা দান করতে।" এই মতটি কুরআনের এই বাণী দ্বারা সমর্থিত হয় : (ঈসা বললেন, আমি এসেছি) "আমার সামনে যে তাওরাত রয়েছে, তার সমর্থক রূপে।"

বস্তুত সূরা মায়েদার ৪৫ নং আয়াতটি এ দিকেই ইঙ্গিত করে :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ لا وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ لا وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ط

অর্থ : আমি তাতে (তাওরাতে) বিধান দিয়েছিলাম, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং সকল জখমের সমপরিমাণ বদলা নিতে হবে।"

শরিয়ত মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য করেনি। প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ হরণ একটা অধিকার, চাই নিহত ব্যক্তি অভিজাত শ্রেণীর হোক বা নিম্নতর শ্রেণীর হোক, পুরুষ হোক বা স্ত্রীলোক হোক। কারণ প্রত্যেকেরই বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। কারো জীবনে এমনভাবে হস্তক্ষেপ করা যাবেনা, যা তাকে বিনষ্ট করে, তা সে যেভাবেই হোক। এমনকি অনিচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রেও আল্লাহ হত্যাকারীকে দায় থেকে অব্যাহতি দেননি, বরং তার উপর গোলাম আযাদ করা ও দিয়্যত দেয়া বাধ্যতামূলক করেছেন। আল্লাহ বলেন :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ج وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّآ أَنْ يَّصَّدَّقُوا ط

অর্থ : কোনো মুমিনকে হত্যা করা কোনো মুমিনের কাজ নয়, তবে ভুলবশত করলে তা স্বতন্ত্র। কেউ কোনো মুমিনকে ভুলবশত হত্যা করলে একজন মুমিন দাসকে মুক্ত করা এবং নিহতের পরিজনবর্গকে রক্তপণ (দিয়াত) অর্পণ করা বিধেয়, যদি না তারা ক্ষমা করে।"(সূরা আল মায়েদা : আয়াত ৪৫)

ইসলাম এই আর্থিক দণ্ড ভুলবশত সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের বেলায়ই প্রয়োগ করেছে মানুষের জীবনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের খাতিরে, যাতে কেউ এই অপরাধকে গুরুত্বহীন মনে করতে না পারে, যাতে মানুষ প্রাণ হনন ও রক্তপাতের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করে, যাতে গোলযোগের পথ বন্ধ হয় এবং যাতে 'ভুলক্রমে হত্যা করেছি' বলে একজন আরেকজনকে হত্যা করেও পার পেয়ে না যায়। মানুষের প্রাণ রক্ষায় ইসলাম কত কঠোরভাবে যত্নবান, তার প্রমাণের জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে শিশুর শরীরে প্রাণ সঞ্চারিত হওয়ার পর গর্ভপাত ঘটানোকে হারাম করেছে। তবে এমন বাস্তব কারণ যদি থেকে থাকে, যা গর্ভপাতকে অনিবার্য করে তোলে, যেমন প্রসূতির মৃত্যুর আশংকা ইত্যাদি, কেবল সেক্ষেত্রেই গর্ভপাত করা যাবে।

কিসাস : ইসলাম ও জাহেলিয়তে

জাহেলি যুগে আরবে কিসাস (হত্যাকারীকে হত্যা করা) প্রথা চালু ছিলো বটে। তবে তার ভিত্তি ছিলো এই যে, কোনো গোত্রের এক ব্যক্তি হত্যাকাণ্ড ঘটালে তার সমগ্র গোত্রটিকে ঐ অপরাধের জন্য দায়ী করা হতো। এর ব্যতিক্রম হতো কেবল তখন, যখন গোত্র ঐ ব্যক্তিকে ত্যাজ্য ঘোষণা করতো এবং সকল সামাজিক সভা সমিতিতে তা প্রচার করতো। এজন্য নিহতের অভিভাবক হত্যাকারী ও তার গোত্রের অন্যান্যদের নিকট থেকে কিসাস দাবি করতো। এই দাবি কখনো কখনো এত ব্যাপক রূপ নিতো যে, তার ফলে খুনী ও নিহতের গোত্রদ্বয়ের মধ্যে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠতো।

নিহত ব্যক্তি যদি অভিজাত কিংবা গোত্রপতি হতো, তাহলে তো কথাই নেই। কিসাসের দাবি আরো ব্যাপক রূপ ধারণ করতো। অপরদিকে কোনো কোনো গোত্র কিসাসের এই দাবিকে অগ্রাহ্য ও উপেক্ষা করতো এবং হত্যাকারীর পক্ষপাতিত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতা করতো। নিহতের উত্তরাধিকারীদের দাবির প্রতি ভ্রুক্ষেপও করতোনা। ফলে যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয়ে বহু নিরাপরাধ মানুষ মারা যেতো। ইসলাম এসে এই অবিচারমূলক ব্যবস্থার অবসান ঘটালো এবং ঘোষণা করলো যে, কেবলমাত্র অপরাধী নিজেই তার কৃত অপরাধের জন্য দায়ী। তার পাপের জন্য তাকেই পাকড়াও করতে হবে। আল্লাহ বলেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ۖ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ۖ فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ۖ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝

অর্থ : হে মুমিনগণ, নিহতের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হলো। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাসের ও নারীর বদলে নারী। তবে তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমতা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির অনুসরণ

করা ও সততার সাথে তার পাওনা প্রদান করা বাঞ্ছনীয়। এটা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ। এরপরও যে ব্যক্তি সীমালংঘন করে তার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে। হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে যাতে তোমরা সাবধান হতে পারো।" (সূরা বাকারা : আয়াত ১৭৮)

ক্ষমার পরিবর্তে কিসাসই যখন একমাত্র দাবি হয়ে দাঁড়ায় :

উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে বায়হাকি বলেছেন : "জাহেলি যুগে আরবের দুটো গোত্রের মধ্যে খুন ও তার প্রতিশোধ গ্রহণের প্রবণতা লেগেই থাকতো। এ ধরনের দুই গোত্রের একটি অপরটি থেকে অধিকতর শক্তিশালী হলে শপথ করতো যে, ক্রীতদাস হত্যার প্রতিশোধে আমরা তোমাদের স্বাধীন লোককে এবং নারী হত্যার বিনিময়ে পুরুষকে হত্যা করবো। ইসলামের অভ্যুদয়ের পর তারা যখন রসূলুল্লাহ সা. এর কাছে এ বিষয়ে সুবিচার প্রার্থনা করলো, তখন উক্ত আয়াত নাযিল হলো এবং তিনি তাদেরকে আদেশ দিলেন যেন তাদের শপথ থেকে তারা পরস্পরে অব্যাহতি গ্রহণ করে।"

এ আয়াতটির বক্তব্য হলো :

১. আল্লাহ তায়ালা জাহেলি রীতিপ্রথাকে বাতিল করেছেন এবং হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে সমতাকে বাধ্যতামূলক করেছেন। কাজেই লোকেরা যখন ক্ষমার পরিবর্তে প্রতিশোধ গ্রহণ তথা কিসাসকেই অগ্রাধিকার দেয় এবং তা কার্যকর করার দাবি জানায় তখন একজন স্বাধীন ব্যক্তি আরেক জন স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করে থাকলে হত্যাকারী স্বাধীন ব্যক্তিকেই হত্যা করা হবে, অনুরূপ ক্রীতদাসকে হত্যা করার প্রতিশোধস্বরূপ খুনী ক্রীতদাসকেই হত্যা করা হবে এবং নারীকে হত্যার প্রতিশোধ স্বরূপ খুনী নারীকেই হত্যা করা হবে।

২. নিহতের উত্তরাধিকারী যখন অপরাধীকে ক্ষমা করে দেয়, তখন দিয়াত (রক্তপণ) দাবি করার অধিকার তার থাকবে। তবে দাবিটা হওয়া চাই ন্যায়সঙ্গত, তার সাথে যেন কোনো সহিংসতা বা নিষ্ঠুরতার সংমিশ্রণ না ঘটে, সেটা অবশ্যই নিশ্চিত করা চাই। আর হত্যাকারীরও উচিত কোনো গড়িমসি ও কম বেশি না করে তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষমাকারীকে দিয়াত প্রদান করা।

৩. আল্লাহর প্রবর্তিত এই বিধি অর্থাৎ কিসাস কার্যকর করাও জায়েয এবং তা মাফ করিয়ে দিয়াত দেয়াও জায়েয। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিরাট রেয়াত ও দয়া। কেননা এই দুইটির মধ্যে যে কোনোটি অবলম্বনের অবকাশ তিনি রেখেছেন এবং এর যে কোনো একটিকে বাধ্যতামূলক করেননি।

৪. যে ব্যক্তি সীমালংঘনপূর্বক অপরাধীকে ক্ষমা করার পর হত্যা করে, তার জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। এই মর্মন্তুদ শাস্তি ইহকালে মৃত্যুদণ্ডের আকারে অথবা পরকালে দোযখের আযাবের আকারে ভোগ করতে হতে পারে।

বুখারি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন : "বনী ইসরাইলে কিসাসের প্রচলন ছিলো, দিয়াত ছিলোনা। তাই আল্লাহ এই উম্মাহকে দিয়াতের সুযোগ দিলেন। বললেন, নিহতের ব্যাপারে তোমাদের উপর কিসাস চালু করলাম ..... যাকে তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কোনো ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়, সে যেন যথাযথ বিধির অনুসরণ করে ও সততার সাথে পাওনা প্রদান করে।" ... বস্তুত ক্ষমা হলো ইচ্ছাকৃত ক্ষেত্রে দিয়াত গ্রহণ করা।

"এ হচ্ছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ।" অর্থাৎ অতীতের জাতিগুলোর তুলনায় এটা ভার লাঘব ও অনুগ্রহ।

৫. আল্লাহ কিসাস প্রবর্তন করেছেন। কারণ এতেই রয়েছে মানুষের জীবন ও স্থিতির নিশ্চয়তা। হত্যাকারী যখন জানবে যে, সে হত্যা করলে নিজেও নিহত হবে, তখন সে ভয় পাবে ও সংযত হবে। তার এই সংযম দ্বারা একদিকে তার নিজের জীবনও বাঁচাবে, অপরদিকে যাকে হত্যা করতে চেয়েছিল তার জীবনেও বাঁচাবে।

৬. ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে হত্যার কিসাস বা শাস্তি দাবি করার যে অধিকার নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের ছিল, ইসলাম সেটি বহাল রেখেছে। আল্লাহ্ বলেন :

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّى الْقَتْلِ ط اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا○

"কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে তো আমি তার প্রতিকারের অধিকার দিয়েছি। কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে। সে তো সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছেই।"

আয়াতে উত্তরাধিকারী অর্থ নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী, যার খুনের বদলা দাবি করার অধিকার রয়েছে। বস্তুত খুনের বদলা বা শাস্তি দাবি করার অধিকার একমাত্র তারই, শাসক বা সরকারের নয়। সে যদি কিসাস দাবি না করে, তবে অপরাধীর কাছ থেকে কিসাস নেয়া যাবেনা। প্রতিকারের অধিকার দ্বারা হত্যাকরীর উপর কর্তৃত্ব বুঝায়। এই কর্তৃত্ব তাকে দেয়া হয়েছে, এজন্য যাতে তার অসম্মতিতেই খুনীকে কেউ ক্ষমা করে দিতে না পারে। কেননা অপরাধ দ্বারা সেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই স্বভাবতই তার মনই সংক্ষুব্ধ হবে, প্রতিশোধ নিতে চাইবে এবং হত্যাকাণ্ড ও অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

৭. এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাফসীর আল মানারের গ্রন্থাকার বলেছেন : "এ আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, জীবনের নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা বিধানই মূল উদ্দেশ্য। কিসাস হলো তার একাধিক উপকরণের মধ্য হতে একটি উপকরণ। কারণ যে ব্যক্তি জানবে যে, সে কাউকে হত্যা করলে তার বদলে তাকে হত্যা করা অবধারিত, সে হত্যা থেকে নিবৃত্ত হবে। এভাবে সে নিজের জীবন ও যাকে হত্যা করতে চেয়েছিল তার জীবন রক্ষা করবে। কেবলমাত্র দিয়াত (রক্তপণ বা ক্ষতিপূরণ) সবাইকে শত্রুর রক্তপাত থেকে নিবৃত করতে পারেনা। রক্তপণের সুযোগ থাকলে নিজের সাধ্য অনুসারে সে শত্রুকে হত্যা করতে পারে। কেননা শত্রুকে নিপাত করার উদ্দেশ্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে চাইবে- সমাজে এমন লোকের অভাব নেই। আর আয়াতটির বাচনভঙ্গী এত চমৎকার ও চিত্তাকর্ষক যে, শাস্তি হিসেবে অপরাধীর প্রাণ সংহারকে খারাপ ও বর্বরোচিত কাজ ভাবার মানসিকতা দূর করে দেয় এবং মানুষকে সমতার বিধান মেনে নিতে উদ্বুদ্ধ করে। কেননা এখানে কিসাসকে হত্যা বা মৃত্যুদণ্ড নামে অভিহিত না করে মানুষের মধ্যে সাম্য নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যা তাদের জীবনকে নিরাপদ ও সুখময় করে।

প্রাণহানিতে কিসাস

প্রাণঘাতী আক্রমণ মাত্রই এর হোতাকে কিসাসের সম্মুখীন করে না। এ আক্রমণ ইচ্ছাকৃত হতে পারে, অনিচ্ছাকৃত তথা ভুলক্রমেও হতে পারে, আবার এতদুভয়ের মধ্যবর্তী ধরনেরও হতে পারে, অন্য কোনো ধরনেরও হতে পারে। এজন্য হত্যাকাণ্ড কত রকমের ও কি কি, তা বর্ণনা করা এবং কোন্ হত্যাকাণ্ডে কিসাস ওয়াজিব হয় তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

হত্যাকাণ্ডের প্রকারভেদ

হত্যাকাণ্ড তিন প্রকার : ১. ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড, ২. আধা ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড, ৩. অনিচ্ছাজনিত হত্যাকাণ্ড

ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড : যখন কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্কিষ্ক ব্যক্তি কোনো নিরপরাধ মানুষকে স্বেচ্ছায় এমন কোনো উপায়ে হত্যা করে, যে উপায়টি হত্যার ব্যাপারে কার্যকর বলে প্রবল ধারণা জন্মে, তখন তাকেই ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড বলা হয়। এই সংজ্ঞা থেকে বুঝা যায় ইচ্ছাকৃত হত্যার অপরাধ ততক্ষণ সংঘটিত হবেনা, যতক্ষণ তাতে নিম্নোক্ত উপাদানগুলো বিদ্যামান থাকবেনা :

১. হত্যাকারীর সুস্থ মস্তিষ্ক, প্রাপ্তবয়স্ক ও হত্যায় ইচ্ছুক হওয়া। সুস্থ মস্তিষ্ক ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া যে অপরিহার্য, তার প্রমাণ আলী রা. বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদিস : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, তিন ব্যক্তিকে সকল দায়দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে : পাগল যতক্ষণ না সুস্থ মস্তিষ্ক হয়, ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না জাগ্রত হয় এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু যতক্ষণ না প্রাপ্তবয়স্ক হয়।" -আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি।

আর ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার বিষয়টি নিম্নোক্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়। আবু হুরায়রা রা. বলেছেন : "রসূলুল্লাহ সা. এর আমলে এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে হত্যা করলো। ঘটনাটা রসূলুল্লাহ সা. কে জানানো হলো। তিনি হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর নিকট সমর্পণ করলেন। হত্যাকারী বললো : হে রসূলুল্লাহ সা., আমি তো তাকে হত্যা করতে ইচ্ছুক ছিলামনা। তখন রসূলুল্লাহ সা. উত্তরাধিকারীকে বললেন, হত্যাকারী যা বলছে, তা যদি সত্য হয় এবং তারপরও তাকে তুমি হত্যা করো। তবে তুমি দোযখবাসী হবে। একথা শুনে উত্তরাধিকারী তাকে ছেড়ে দিলো।" -আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, তিরমিযি।

আবু দাউদ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী ক্ষমা না করলে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।" ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কাউকে হত্যা করবে তার জন্য মৃত্যুদণ্ড। আর যে ব্যক্তি হত্যাকারী ও নিহতের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়াবে (অর্থাৎ বিচারে বাধা হয়ে দাঁড়াবে) তার উপর আল্লাহর, ফেরেশতাদের ও সকল মানুষের অভিশাপ। আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার কাছ থেকে কোনো বিনিময় ও মুক্তিপণ গ্রহণ করবেন না।"

২. নিহত ব্যক্তির মানুষ হওয়া ও নিরপরাধ হওয়া অর্থাৎ তাকে হত্যা করা অবৈধ হওয়া জরুরি।
৩. যে অস্ত্র দ্বারা হত্যা করা হয়েছে, তা এমন হওয়া চাই, যা দ্বারা সচরাচর হত্যা করা হয়।

এই তিনটে উপাদান উপস্থিত না থাকলে হত্যাকাণ্ডটিকে ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড গণ্য করা হবেনা।

হত্যার উপকরণ বা অস্ত্র : যে জিনিসটি দ্বারা হত্যা করা হয়, তা এমন হওয়াই যথেষ্ট যে, তা দ্বারা সচরাচর হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়ে থাকে, চাই তা ধারালো, হোক বা ধ্বংসকারী হোক। কেননা প্রাণ হননে উভয়ই সমান ক্ষমতার অধিকারী। বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সা. দুটি পাথরের মাঝে জনৈক ইহুদীর মাথা গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন।" এ হাদিস আবু হানিফা, শাবি, নাখয়ির এই মত খণ্ডন করে যে, ভারি কোনো জিনিস দ্বারা হত্যা করা হলে তাতে কিসাস নেই। আগুন দিয়ে পোড়ানো, পানিতে ডোবানো বা চুবানো,

উপর থেকে নিচে ফেলে দেয়া, দেয়ালের নিচে চাপা দিয়ে পিষ্ট করা, শ্বাসরোধ করা, মানুষকে আটক করে খাদ্য ও পানীয় না দিয়ে ক্ষুধা পিপাসায় রাখা যতক্ষণ না মারা যায় এবং হিংস্র জন্তুর সামনে নিক্ষেপ করা ইত্যাদিও তদ্রূপ। এর সব কটিতেই কিসাস হবে। অনুরূপ, একজন নিরপরাধ মানুষকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে হত্যা করানো এবং তাকে হত্যা করানোর পর সাক্ষ্য প্রত্যাহার করা ও বলা যে, আমরা তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলাম। এ সবই এমন উপকরণ যা দ্বারা সচরাচর হত্যা করা যায়। আর যে ব্যক্তি কাউকেও বিষ মেশানো খাবার খাইয়ে অর্থাৎ সে জানে যে, তাতে বিষ মেশানো অথচ আহারকারী জানে না, অতপর সেই খাবার খেয়ে সে মারা যায়, সেই পরিবেশনকারীর উপর কিসাস কার্যকর করা হবে।

বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, জনৈকা ইহুদি মহিলা একটি বকরির গোশতে বিষ মিশিয়ে রসূলুল্লাহ সা. কে খেতে দিয়েছিল। তিনি তা থেকে এক গ্রাস খেয়েই উগরে ফেলে দেন। কিন্তু বিশর বিন বারা রা. তার সাথে খান। রসূলুল্লাহ সা. প্রথমে মহিলাটিকে কোনো শাস্তি না দিয়ে মাফ করে দেন। অর্থাৎ যারা খেয়েছিল তাদের কেউ মারা না যাওয়া পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করেন। কিন্তু যেই মাত্র বিশর বিন বারা মারা গেলো, অমনি ইহুদি মহিলাকে তার বদলাস্বরূপ হত্যা করলো। আবু দাউদের বর্ণনায় তাকে হত্যা করার আদেশ দিলেন।"

আধা-ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড : কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যখন একজন নিরপরাধ মানুষকে এমন উপায়ে হত্যা করে, যে উপায়ে সাধারণত হত্যা করা হয়না, যেমন হালকা লাঠি বা ছোট পাথর দ্বারা একটা কি দুটো আঘাত করলো এবং তাতেই সে মারা গেলো, তখন এই হত্যাকাণ্ডকে আধা-ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড বলা হয়। (এটি আবু হানিফা, শাফেয়ি ও সাধারণ ফকিহদের মত। ইমাম মালেক ও লায়েসের মত এর বিপরীত। শেষোক্ত ফকিহদের মতানুসারে সচরাচর যে উপায়ে বা যে অস্ত্র দ্বারা হত্যা করা হয়না, যেমন লাঠি, চাবুক ও চড় থাপ্পড় ইত্যাদি, তা দ্বারা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলে তাও ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড গণ্য হবে এবং তাতে কিসাস কার্যকর হবে। কেননা নীতিগতভাবে তারা প্রাণ হননের উপায় বা অস্ত্রের গুরুত্ব দেননা, তারা গুরুত্ব দেন প্রাণ হননের। তাদের মতে যে কোনো উপায়ে বা যে কোনো অস্ত্র দ্বারা প্রাণ হনন করা হোক না কেন, তা কিসাস যোগ্য)

যদি কাউকে হত্যার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে প্রহার করা হয়, অথবা প্রহৃত ব্যক্তি এতটা অল্পবয়স্ক বা রুগ্ন যে, এ ধরনের প্রহারে সাধারণত মারা যায়, অথবা সুস্থ সবল ব্যক্তিকে ক্রমাগত পিটাতে পিটাতে হত্যা করা হয়, তাহলে সেটা ইচ্ছাকৃত হত্যা গণ্য হবে। কিন্তু আধা ইচ্ছাকৃত নামে আখ্যায়িত করার কারণ এই যে, এই হত্যাকাণ্ডটি ইচ্ছাকৃত না অনিচ্ছাকৃত তা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সংশয় রয়েছে। কেননা এখানে প্রহারই উদ্দেশ্য, হত্যা উদ্দেশ্য নয়। তাই একে আধা-ইচ্ছাকৃত নাম দেয়া হয়েছে। কেননা এটা পুরোপুরি ইচ্ছাকৃত নয়, পুরোপুরি অনিচ্ছাকৃতও নয়। আর যেহেতু পুরোপুরি ইচ্ছাকৃত নয়, তাই কিসাস রহিত। কেননা প্রাণ রক্ষাই মূলনীতি। সুতরাং সুস্পষ্ট কারণ ছাড়া কারো উপর কিসাস কার্যকর করা বৈধ হতে পারেনা।

পক্ষান্তরে যেহেতু এটা পুরোপুরি অনিচ্ছাকৃত নয়, কারণ প্রহার করাই আসল উদ্দেশ্য ছিলো, হত্যা করা নয়, তাই এতে কঠোর দিয়াত দিতে হবে। ইবনে আব্বাস রা. দার কুতনি থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "ইচ্ছাকৃত হত্যায় কিসাস অবধারিত। আর অনিচ্ছাকৃত হত্যা এমন অপরাধ, যাতে কিসাস নেই। আর যে ব্যক্তি পাথর, লাঠি বা

চাবুকের আঘাতে মারা যায়, তার ক্ষেত্রে বয়স্ক উট দিয়ে কঠোর দিয়াত দেয়া অপরিহার্য।" আহমদ ও আবু দাউদ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "আধা-ইচ্ছাকৃত হত্যায় কঠোর দিয়াত। হত্যাকারীকে হত্যা করা হবেনা। কেননা শয়তান মানুষের ভেতরে উস্কানি দেয়। এর ফলে হিংসা বিদ্বেষ ও অস্ত্র বহন ছাড়া রক্তপাত সংঘটিত হয়ে থাকে।" আহমদ, আবু দাউদ ও নাসায়ি বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. মক্কা বিজয়ের দিন বলেছিলেন : জেনে রাখ, চাবুক লাঠি ও পাথরের আঘাতে যে নিহত হয়, সে আধা-অনিচ্ছাকৃতভাবে নিহত।

অনিচ্ছাকৃতভাবে নিহত : অনিচ্ছাকৃত হত্যা হলো, একজন প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তি তার জন্য যে কাজ বৈধ, তাই করলো, যেমন শিকার করলো বা অনুরূপ কোনো বৈধ কাজ করলো, কিন্তু এটা করতে গিয়ে কোনো নিরপরাধ ব্যক্তি আহত হলো ও পরে মারা গেলো, অথবা কোনো কূয়া খনন করা হলো এবং তার ভেতরে পড়ে কেউ মারা গেলো, কিংবা কোনো নিষিদ্ধ স্থানে ফাঁদ পাতা হলো এবং কোনো ব্যক্তি সে ফাঁদে জড়িয়ে মারা গেলো। অপ্রাপ্তবয়স্ক বা পাগল কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড অনিচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড গণ্য হয়।

হত্যার পরিণতি

আমরা বলেছি, হত্যা তিন প্রকারের : ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত ও আধা-ইচ্ছাকৃত। এই তিন প্রকারের হত্যাকাণ্ডের প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক ফলাফল ও পরিণতি রয়েছে। নিচে প্রত্যেকটির ফলাফল বা পরিণতি দেয়া হলো :

অনিচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের পরিণতি : অনিচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড দুটি পরিণতি অনিবার্য করে তোলে : (১) অপেক্ষাকৃত লঘু দিয়াত, যা তিন বছর ধরে পরিশোধ করা যায়। দিয়াত সংক্রান্ত আলোচনায় এ বিষয়ে বিশদ বিবরণ দেয়া হবে। (২) কাফফারা অর্থাৎ কর্মক্ষমতা ও উপার্জন ক্ষমতার প্রতিবন্ধক দোষত্রুটি থেকে মুক্ত একজন মুমিন ক্রীতদাসকে মুক্ত করা। এর সামর্থ না থাকলে এক নাগাড়ে দু'মাস রোযা রাখা। মহান আল্লাহ বলেন :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ
مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ○

অর্থ : কোনো মুমিনকে হত্যা করা কোনো মুমিনের কাজ নয়, তবে ভুলবশত করলে ভিন্ন কথা। আর কেউ কোনো মুমিনকে ভুলবশত হত্যা করলে একজন মুমিন দাসকে মুক্ত করা এবং তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ করা বিধেয়, যদি না তারা ক্ষমা করে। যদি সে নিহত ব্যক্তি তোমাদের শত্রুপক্ষের লোক হয় এবং মুমিন হয়, তবে একজন মুমিন দাস মুক্ত করা বিধেয়। আর যদি সে এমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত হয়, যার সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ, তবে তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ এবং মুমিন দাস মুক্ত করা বিধেয়। আর যে সংগতিহীন, সে একাদিক্রমে দু'মাস রোযা রাখবে। তওবার জন্য এটা আল্লাহর ব্যবস্থা এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা নিসা : আয়াত ৯২)

(শাফেয়ীর মাযহাব অনুযায়ী হত্যার কাফফারাদাতা যদি বার্ধক্য, অসুস্থতা অথবা কঠিন পরিশ্রম হওয়ার কারণে রোযা রাখতে অক্ষম হয়, তবে তার জন্য ষাটজন দরিদ্রকে আহার করানো বৈধ। প্রত্যেককে এক ওয়াক্তের খাবার দিলেও চলবে। অন্যান্য ফকিহ্গণ এ ব্যাপারে শাফেয়ি মাযহাবের বিরোধিতা করেছেন। কেননা তাদের মতের স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই।) আর যখন একটি দল কোনো এক ব্যক্তিকে ভুলক্রমে হত্যা করে, তখন অধিকাংশ আলেমের মতে, প্রত্যেককে স্বতন্ত্রভাবে পূর্ণ কাফফারা দিতে হবে। অন্য একদল ফকিহ্ বলেন, সকলে মিলে একটি কাফফারা দিলে চলবে।

কাফফারার উদ্দেশ্য : কুরতুবি বলেছেন : কেউ কেউ বলেছেন, হত্যাকারীর গুনাহ মোচনের লক্ষ্যে এই কাফফারা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তার গুনাহ এই যে, সে যথোপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করেনি, যার ফলে তার হাতে একজন নিরপরাধ ব্যক্তি নিহত হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, নিহত ব্যক্তির নিকট আল্লাহ্র যে সকল হক ছিলো, তা অকার্যকর করার প্রতিফলস্বরূপ কাফফারা ওয়াজিব করা হয়েছে। নিহতের নিকট আল্লাহ্র যে হক প্রাপ্য ছিলো, তা হলো, সে বেঁচে থাকবে এবং তার জন্য আল্লাহ্ যা কিছু হালাল করেছেন, তা ভোগ দখল করবে। হত্যাকারীর নিকটও আল্লাহ্র একটা হক পাওনা ছিলো। সেটি হলো, সে আল্লাহ্র একজন বান্দা ছিলো। সে ছোট হোক বা বড় হোক, স্বাধীন হোক বা দাস হোক, মুসলমান হোক বা অমুসলিম হোক, বান্দা হিসেবে তার মধ্যে যেন এমন গুণাবলী থাকে, যা দ্বারা সে পশু থেকে পৃথক হয়, আর সেই সাথে এরূপ আশাও করা হয়, যেন তার পরবর্তী প্রজন্মে আল্লাহ্র অনুগত ও তার হুকুম পালনকারী লোক জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু হত্যাকারী এই দুটো হকই অকার্যকর করে দিয়েছে। এজন্যই তার উপর কাফফারার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। তবে এই দুটি হকের যেটিই বিবেচনায় নেয়া হোক। এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আয়াতটি যদিও ভুলক্রমে হত্যাকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকারীও একই বিধির আওতাভুক্ত। বরং ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকারীর উপর কাফফারা ওয়াজিব হওয়া আরো বেশি যৌক্তিক। পরবর্তীতে এর বিস্তারিত বিবরণ আসছে।

আধা-ইচ্ছাকৃত হত্যার পরিণতি : আধা-ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড দুটি পরিণতিকে অনিবার্য করে তোলে :

১. গুনাহ্, কারণ এটা এমন প্রাণ হনন, যা ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতীত হত্যা করা আল্লাহ্ নিষিদ্ধ করেছেন।

২. হত্যাকারীর উপর আরোপিত পরিপূর্ণ রক্তপণ বা দিয়াত, যার বিশদ বিবরণ সামনে আসছে।

ইচ্ছাকৃত হত্যার পরিণতি : ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের অনিবার্য ফল চারটি :

১. গুনাহ্।

২. নিহতের ওসিয়ত ও উত্তরাধিকার থেকে হত্যাকারীর বঞ্চনা।

৩. কাফফারা

৪. ক্ষমা অথবা কিসাস।

সুতরাং হত্যাকারী যদি নিহতের উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে তবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির কিছুই সে পাবেনা। তার নিজস্ব সম্পত্তি থেকেও নয়, দিয়াত থেকেও নয়, চাই হত্যাকাণ্ডটি ইচ্ছাকৃত হোক বা আধা-ইচ্ছাকৃত হোক। এ ব্যাপারে ফকিহ্দের অনুসৃত মূলনীতি হচ্ছে :

"যে ব্যক্তি কোনো জিনিস নির্দিষ্ট সময়ের আগেই পাওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করে, তাকে তা থেকে বঞ্চিত করেই শাস্তি দেয়া হয়।" বায়হাকি বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি একটা পাথর ছুঁড়ে মারলে তা তার মায়ের গায়ে লাগলো এবং তাতেই তার মা মারা গেলো। তখন সে মায়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে নিজের অংশ দাবি করলে তার ভাইরা বললো, "তোর কিছুই প্রাপ্য নেই।" অতপর তারা ফায়সালার জন্য আলী রা. এর নিকট গেলো। আলী রা. বললেন, "তোমার মায়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে শুধু ঐ পাথরটাই তোমার প্রাপ্য।" অতপর তিনি তার উপর জরিমানাস্বরূপ দিয়াত ধার্য করলেন এবং তার উত্তরাধিকার থেকে কিছুই তাকে দিলেননা। আমর বিন শুয়াইব বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "নিহতের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে হত্যাকারীর কিছুই পাওনা নেই।

আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "হত্যাকারী কিছুই পাবেনা। নিহতের যদি আর কোনো উত্তরাধিকারী না থাকে, তবে তার নিকটতম আত্মীয়ই তার উত্তরাধিকারী। হত্যাকারী কিছুই পাবেনা।" (অর্থাৎ হত্যাকারী উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে এবং যে বা যারা এ অপরাধে জড়িত হয়নি, তারা উত্তরাধিকার পাবে, হত্যাকারী ছাড়া তার যদি আর কোনো উত্তরাধিকারী না থাকে, তাহলেও হত্যাকারীকে বাদ দিয়ে তার নিকটতম আত্মীয়দের মধ্যে উত্তরাধিকার বণ্টিত হবে। উদাহরণস্বরূপ, জনৈক পুত্র তার পিতাকে হত্যা করলো এবং হত্যাকারী পুত্র ছাড়া তার আর কোনো উত্তরাধিকারী নেই, তবে হত্যাকারীর একটি ছেলে আছে। এরূপ ক্ষেত্রে নিহতের উত্তরাধিকার হত্যাকারীর ছেলে পাবে এবং হত্যাকারী বঞ্চিতই থাকবে।- মায়ালিমুস্ সুনান, খাত্তাবি) এটাই হানাফি ও শাফেয়ি মাযহাবসহ অধিকাংশ আলেমের অভিমত। তবে ইমাম মালেক ও হাদোবী মাযহাবের মতে, হত্যাকারী দিয়াত ব্যতিরেকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ পাবে। যুহরি ও সাঈদ ইবনুল জুবাইর প্রমুখ বলেছেন, হত্যাকারী উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবেনা।

অনুরূপ ওসিয়তকারী যার পক্ষে ওসিয়ত করে, সে যদি ওসিয়তকারীকে হত্যা করে, তবে ওসিয়ত বাতিল গণ্য হবে। বাদায়ে গ্রন্থে বলা হয়েছে : "বিনা অপরাধে হত্যা করা একটা ভয়ংকর অপরাধ, যার বিরুদ্ধে কঠোরতম ধিক্কার প্রয়োজন। উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চনার মতো ওসিয়ত থেকে বঞ্চনা একটা সমুচিত ধিক্কার। হত্যাকাণ্ড চাই ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলক্রমে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে হোক, তার বিরুদ্ধে ধিক্কার ও তিরস্কার অপরিহার্য। কেননা অনিচ্ছাকৃতভাবে বা ভুলক্রমে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডও হত্যাকাণ্ডই এবং তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা ও বিচার দাবি করা সঙ্গতভাবেই বৈধ, চাই নিহত ব্যক্তি হত্যাকারীর জন্য হত্যার পূর্বে ওসিয়ত করুক বা পরে করুক।

নিহতের উত্তরাধিকারী ক্ষমা করলে বা দিয়াতে রাযী হলে কাফফারা : হত্যাকারীর উপর যখন কিসাস কার্যকর করা হবে, তখন তার উপর আর কাফফারা ওয়াজিব হবেনা।

ইমাম আহমদ ওয়াসেলা ইবনুল আসকা থেকে বর্ণনা করেন : বনু সুলাইম গোত্র থেকে একদল লোক রসূলুল্লাহ সা. এর নিকট এসে বললো : আমাদের গোত্রের এক ব্যক্তি একজনকে হত্যা করে নিজের উপর দোযখ ওয়াজিব করে নিয়েছে। রসূলুল্লাহ সা. বললেন, তাহলে সে যেনো একটি দাস মুক্ত করে দেয়। তাহলে আল্লাহ মুক্ত দাসের প্রতিটি অংগের বিনিময়ে তার প্রতিটি অঙ্গকে দোযখ থেকে অব্যাহতি দেবেন।" হাদিসটি সামান্য শাব্দিক হেরফেরসহ আবু দাউদ ও নাসায়িতেও বর্ণিত হয়েছে।

শওকানি নায়লুল আওতার গ্রন্থে বলেছেন : "ওয়াসেলার হাদিসে ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের কাফফারার বিধান প্রমাণিত। তবে এটা শুধু তখনই, যখন হত্যাকারীকে নিহতের উত্তরাধিকারী ক্ষমা করে দেয় কিংবা দিয়াতে রাযী হয়ে যায়। তবে তার উপর কিসাস কার্যকরী হলে কাফফারা দিতে হবেনা। বরং কিসাসই তার জন্য কাফফারা। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "হত্যাই (অর্থাৎ কিসাসই) কাফফারা।"

কিসাস বা ক্ষমা : কিসাস, দিয়াতের বিনিময়ে ক্ষমা অথবা দিয়াত ছাড়াই সন্ধি এর সব কটাই বৈধ। এমনকি সন্ধির বিনিময়ে যদি দিয়াতের চেয়ে বেশি কিছুও ব্যয় হয়, তবে তাও বৈধ।। নিহতের উত্তরাধিকারী সম্পূর্ণ বিনা ব্যয়েও ক্ষমা করার অধিকার রাখে এবং সেটাই সর্বোত্তম পন্থা। আল্লাহ বলেন :

وَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَلَا تَنْسَوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ○

অর্থ : তোমরা যদি ক্ষমা করে দাও তবে সেটাই তাকওয়ার নিকটতম। নিজেদের মধ্যে বদান্যতা ভুলে যেওনা।" (আল বাকারা : আয়াত ২৩০)

আর যখন নিহতের উত্তরাধিকারী হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেয়, তখন শাসক তার উপর আর (কোনো তাযীর কার্যকর করার অধিকার রাখেনা। তবে ইমাম মালেক ও লায়েস বলেন, তাকে তাযীরস্বরূপ এক বছরের কারাদণ্ড ও একশো কষাঘাত করা হবে। (ফকিহগণ বলেন, হত্যাকারী যদি কোনো দাগী অপরাধী বা চিহ্নিত দুর্বৃত্ত হয়, অথবা শাসকের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, তাকে শাস্তি দেয়া জনস্বার্থের দাবি, তবে যেভাবে জনস্বার্থের দাবি পূরণ হবে বলে প্রতীয়মান হয়, সেভাবে তাকে শাস্তি দেয়া যাবে, চাই জেল বা হত্যা যেভাবেই হোক।)

কিসাস বা ক্ষমা সংক্রান্ত বিধির উৎস হচ্ছে সূরা বাকারার ১৮৭ নং আয়াত :

"হে মুমিনগণ, নিহতের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হলো। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী। কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা ও সততার সাথে তার দেয় আদায় করা বাঞ্ছনীয়। এটা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে লাঘব ও অনুগ্রহ। এর পরও যে সীমালংঘন করে, তার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।"

বুখারি ও মুসলিম আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "যার কেউ নিহত হয়, সে হয় তার রক্তপণ নেবে, না হয় হত্যাকারীকে হত্যা করবে।" এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়, নিহতের উত্তরাধিকারীর স্বাধীনতা রয়েছে, হয় কিসাস না হয় দিয়াত আদায় করবে, চাই হত্যাকারী রাযী থাক বা না থাক। কেউ কেউ বলেন, কিসাস ছাড়া আর কিছু আদায় করার অধিকার তার নেই। হত্যাকারীর সম্পত্তি ব্যতিরেকে দিয়াত নিতে পারবেনা। তবে প্রথমোক্ত মতটাই সঠিক। সুতরাং ক্ষমা ও কিসাসের মধ্য হতে কোন্‌টি গ্রহণ করা হবে, সেটি ফায়সালা করার একক অধিকার নিহতের উত্তরাধিকারীদের। তারা চাইলে কিসাস দাবি করবে, চাইলে ক্ষমা করে দেবে। এমনকি একজন উত্তরাধিকারীও যদি ক্ষমা করে দেয়, তবে কিসাস রহিত হয়ে যাবে। কেননা কিসাস খণ্ডিত হয়না। ইমাম আবু হানিফার শিষ্য মুহাম্মাদ বিন হাসান বর্ণনা করেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর নিকট এমন এক ব্যক্তিকে আনা হলো, যে ইচ্ছাকৃতভাবে একজনকে হত্যা করেছিল। উমর রা.

তাকে হত্যা করার আদেশ দিলেন। ইতিমধ্যে উত্তরাধিকারীদের কেউ কেউ তাকে মাফ করে দিলো। তথাপি উমর রা. তাকে হত্যার আদেশ দিলেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বললেন : নিহত ব্যক্তির বদলে হত্যাকারীর প্রাণ হননের অধিকার ওদের সকলের ছিলো। কিন্তু একজন যখন তাকে ক্ষমা করলো, তখন সে তাকে বাঁচিয়ে দিলো। কিন্তু যে ক্ষমা করেনি, তার অধিকার সে হরণ করতে পারে না। উমর রা. বললেন, তাহলে কী করা উচিত মনে করো? তিনি বললেন, "আমি মনে করি, হত্যাকারীর সম্পদ থেকে দিয়াত দেয়া হোক এবং যে জন হত্যাকারীকে ক্ষমা করেছে, দিয়াতের তার অংশ থেকে তাকে অব্যাহতি দেয়া হোক। উমর রা. বললেন, আমিও তাই মনে করি। মুহাম্মদ বলেন, আমারও এটাই সঠিক মনে হয়, এটা ইমাম আবু হানিফারও মত।

উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কেউ অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকলে তার বয়োপ্রাপ্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে, যাতে সে স্বাধীনভাবে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। কারণ কিসাস সকল উত্তরাধিকারীর অধিকার। অপ্রাপ্তবয়স্কের বয়োপ্রাপ্তির পূর্বে কোনো ক্ষমতা থাকেনা। আর যখন সকল উত্তরাধিকারী বা তাদের কেউ কেউ দিয়াতের বিনিময়ে ক্ষমা করে দেয়, তখন হত্যাকারীর উপর নিজের সম্পদ থেকে পূর্ণ দিয়াত দেয়া অপরিহার্য হবে।

কিসাস ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি

নিম্নোক্ত শর্তাবলী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত কিসাস ওয়াজিব হবেনা :

১. নিহত ব্যক্তির এমন কোনো অপরাধে দায়ী না হওয়া, যার জন্য সে হত্যার যোগ্য সাব্যস্ত হয়। সে যদি কোনো যুদ্ধরত কাফের হয়, বিবাহিত ব্যভিচারী হয়, কিংবা মুরতাদ হয়, তাহলে হত্যাকারীর উপর কোনো ধরনের বিনিময় প্রদান করার দায়িত্ব থাকবেনা, কিসাসও নয়, দিয়াতও নয়। কেননা এদের সবাইকে হত্যা করা বৈধ।

বুখারি ও মুসলিম ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণনা করেন রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল এই সাক্ষ্য দানকারী কোনো মুসলমানকে হত্যা করা তিনটি কারণের যে কোনো একটি ব্যতীত বৈধ নয় :

১. বিবাহিত হয়েও ব্যভিচার করা, কাউকে হত্যা করা এবং ইসলাম ত্যাগ করে মুসলমানদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া যাওয়া।

২. হত্যাকারীর প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া

৩. হত্যাকারীর সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়া।

অতএব, অপ্রাপ্তবয়স্ক, পাগল ও অসুস্থ মস্তিষ্ক এদের কারো উপর কিসাস কার্যকর হবেনা। কেননা শরিয়তের বিধান পালনের দায়িত্ব তাদের উপর অর্পিত নয়, তাদের কোনো সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতাও নেই এবং স্বাধীন ইচ্ছাও নেই। তবে যদি কোনো পাগল এমন হয় যে, মাঝে মাঝে সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে যায় এবং সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকা অবস্থায় কাউকে হত্যা করে। তাহলে তার উপর কিসাস কার্যকর হবে। অনুরূপ যে ব্যক্তির অতি মাত্রায় মদ পান করে মাতাল হওয়ার কারণে বুদ্ধি-বিবেক লোপ পায়, সে কাউকে হত্যা করলে তার উপরও কিসাস কার্যকর হবে। মালেক থেকে বর্ণিত, মারওয়ান ইবনুল হাকাম মুয়াবিয়াকে লিখে জানালেন যে, তার কাছে একজন মাতাল লোককে আনা হয়েছে, যে একজনকে হত্যা করেছে। মুয়াবিয়া তার জবাবে তাকে লিখলেন, ওকে ঐ হত্যার বদলে হত্যা করো। তবে যদি কেউ এমন কোনো পানীয় পান করে, যার সম্পর্কে তার ধারণা ছিলো যে, তা

মাতাল করবেনা, কিন্তু তাতে তার বুদ্ধি লোপ পেলো এবং সেই অবস্থায় হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে বসলো, তাহলে তার উপর কিসাস কার্যকর হবেনা। কেননা ইতিপূর্বে একটি হাদিসে তিন ব্যক্তিকে অপরাধের দায় থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে, যার একজন হচ্ছে পাগল যতক্ষণ না সুস্থ হয়।

মালেক বলেন, আমাদের নিকট সর্বসম্মত মত এই যে, বালকদের উপর কোনো কিসাস কার্যকর হয়না এবং বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বালকের হাতে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড অনিচ্ছাকৃত বা ভুলক্রমে হত্যার শামিল।

৪. হত্যাকারীর সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় ও স্বাধীন অবস্থায় হত্যাকাণ্ড ঘটানো। বল প্রয়োগ স্বাধীন বিবেচনা শক্তির বিলোপ ঘটায়। আর যার স্বাধীন বিবেচনা শক্তি নেই, তার কোনো দায়দায়িত্ব নেই। কাজেই কোনো পরাক্রমশালী লোক যখন অন্য একজনকে হত্যা করতে কাউকে বাধ্য করে এবং সে কোনো মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তখন আদেশদান কারীকে হত্যা করা হবে, আদিষ্টকে নয়। তবে আদিষ্টকেও শাস্তি দেয়া হবে। এটাই আবু হানিফা, দাউদ ও শাফেয়ির মত। হানাফিগণ বলেন, কেউ যদি এমন ব্যক্তির আদেশক্রমে কোনো মুসলমানের সম্পদ বিনষ্ট করতে বাধ্য হয়, যার আদেশ অমান্য করলে তার প্রাণহানি কিংবা অঙ্গহানির আশংকা আছে, তবে তার জন্য ঐ কাজ করা বৈধ। তবে সম্পদের মালিক বলপ্রয়োগকারীকে তার ক্ষতি পূরণ করতে বাধ্য করতে পারবে। আর যদি হত্যার ভয় দেখিয়ে কেউ অন্য একজনকে হত্যা করতে বাধ্য করে, তবে হত্যাকাণ্ড ঘটানো তার জন্য বৈধ নয়।। নিজে নিহত হওয়া পর্যন্ত তাকে ধৈর্যধারণ করতে হবে। আর যদি হত্যাকাণ্ড ঘটায়, তবে গুনাহগার হবে। হত্যাকাণ্ডটি ইচ্ছাকৃত হলে বল প্রয়োগকারীর উপর কিসাস কার্যকর হবে। কেউ কেউ বলেন, আদিষ্ট ব্যক্তিকেই হত্যা করা হবে, আদেশকারীকে নয়। এটা ইমাম শাফেয়িরও অন্য একটি মত। ইমাম মালেক ও হাম্বলি ইমামগণসহ একদল বলেন, উত্তরাধিকারী ক্ষমা না করলে উভয়কে হত্যা করা হবে। আর যদি সে ক্ষমা করে, তবে দিয়াত দেয়া ওয়াজিব হবে। কেননা হত্যাকারী অপর ব্যক্তিকে হত্যা করে নিজে বাঁচতে চেয়েছিল। আর বল প্রয়োগকারী এমন পন্থায় হত্যার কারণে পরিণত হয়েছে, যে পন্থা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে ছাড়ে। আর যখন কোনো সুস্থ মস্তিষ্ক ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি কোনো পাগল বা বালককে অন্য একজনকে হত্যা করার আদেশ দেয়, তখন কিসাস কার্যকর হবে আদেশদাতার উপর। কেননা হত্যাকারী তার হাতের ক্রীড়নক মাত্র। তাই তার উপর কিসাস কার্যকর হবেনা। কিসাস কার্যকর হবে হত্যাকাণ্ড ঘটানোর আদেশদাতার উপর। আর যখন শাসক কোনো অন্যায় হত্যার আদেশ দেয়, তখন দেখতে হবে, আদিষ্ট ব্যক্তি জানে কিনা যে, আদেশটি অন্যায় ও যুলুম। যদি আদেশটি যুলুম জেনেও কার্যকর করে ফেলে, তবে তার উপর কিসাস কার্যকর হবে। অবশ্য নিহতের উত্তরাধিকারী যদি মাফ করে দেয়, তবে ভিন্ন কথা। সেক্ষেত্রে তার উপর দিয়াত ওয়াজিব হবে। কেননা সে অন্যায় ও যুলুম জেনেও হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। তাই তাকে দায়মুক্ত করা হবেনা। একথা বলার অবকাশ নেই যে, সে শাসকের পক্ষ থেকে আদিষ্ট। কেননা ইসলামের মূলনীতি হলো, "স্রষ্টার আদেশ লংঘন করে সৃষ্টির আদেশ মান্য করা যাবেনা।" রসূলুল্লাহ সা. স্বয়ং একথা ঘোষণা করেছেন। আর যদি হত্যাকারী না জানে যে, নিহত ব্যক্তি হত্যার অযোগ্য এবং তাকে আদেশ অনুসারে হত্যা করে, তাহলে উত্তরাধিকারী ক্ষমা না করলে আদেশদাতার উপর কিসাস আর ক্ষমা করলে আদেশদাতার

উপর দিয়াত কার্যকর হবে, হত্যাকারীর উপর নয়। কেননা আল্লাহর নাফরমানী হয় এমন কাজে শাসকের হুকুম পালনের ব্যাপারে সে দায়মুক্ত। আর যে ব্যক্তি কোনো অপ্রাপ্তবয়স্ক বা অসুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তির নিকট হত্যার অস্ত্র সমর্পণ করে এবং হত্যার আদেশ না দেয়, তথাপি সে হত্যা করে, তবে অস্ত্রদাতার উপর কোনো দায় বর্তাবেনা।

৫. হত্যাকারীর নিহতের পিতা বা পিতামহ না হওয়া। সুতরাং পিতাকে সন্তান হত্যা ও দাদাকে পৌত্র-পৌত্রী হত্যার জন্য হত্যা করা হবেনা, চাই তা যে কোনো প্রকারের ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড হোক না কেন। পক্ষান্তরে সন্তান যদি মা বা বাবাকে হত্যা করে, তবে সর্বসম্মত মতানুসারে তাকে হত্যা করা হবে। তিরমিযি ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "সন্তান হত্যার জন্য পিতাকে হত্যা করা হবেনা।" ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ বর্ণনা করেন, বনু মুদাল্লাজের কাতাদা নামক এক ব্যক্তি তার ছেলেকে তরবারি দিয়ে কুপিয়ে আহত করে এবং ক্ষতস্থান থেকে রক্তপাতের কারণে পরে সে মারা যায়। সুরাকা ইবনে যুশাম উমর রা. এর নিকট গিয়ে এ ঘটনার কথা জানালে তিনি তাকে বললেন, "একশো বিশটি উট প্রস্তুত করে রাখো। আমি আসছি।" পরে তিনি এসে উক্ত একশো বিশটি উট থেকে একশোটা নিয়ে বললেন, নিহতের ভাই কোথায়? সে বললো, এই যে আমি। তিনি বললেন, এগুলো নাও। কেননা রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, হত্যাকারীর জন্য কিছুই প্রাপ্য নেই। ইমাম মালেক এই মতের বিরোধিতা করে বলেছেন, পিতা যখন সন্তানকে শুইয়ে দিয়ে যবাই করে, তখন তার উপর অবশ্যই কিসাস কার্যকর করা হবে। কেননা এটা প্রকৃত ইচ্ছাকৃত হত্যা। অন্য কিছু হবার সম্ভাবনা নেই। হত্যাকাণ্ডের ইচ্ছাকৃতভাবে হওয়া একটা গোপন ব্যাপার। পরিবেশ ও পরিস্থিতি দ্বারা যা প্রকাশ পায়, তা ছাড়া আর কিছু সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত হয়না। তবে হত্যাকাণ্ডটি যদি এমন কোনো পন্থায় সংঘটিত হয়, যা দ্বারা প্রাণ হননের উদ্দেশ্য নাও থাকতে পারে বলে প্রতীয়মান হয়, বরং কেবল শাসন করার উদ্দেশ্য ছিল বলে অনুমিত হয়। তবে সন্তান ব্যতীত অন্যের ক্ষেত্রে হলে একে ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডই গণ্য করা হবে। পিতা ও অন্যদের মধ্যে পার্থক্য করার কারণ হলো, সন্তানের প্রতি পিতার স্নেহ-মমতা থাকা স্বাভাবিক। তাই সে যখন পিতার ক্রোধের উদ্রেককারী কোনো কাজ করে, তখন পিতা তাকে শাসন করতে চাইতে পারে। কাজেই এ ঘটনাকে ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড হিসেবে গণ্য করা হবেনা। কারণ পিতা ও ছেলের মধ্যে মমতার বন্ধন অত্যন্ত জোরদার।

৬. হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার সময় নিহত ব্যক্তির ধর্ম ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দিক দিয়ে হত্যাকারীর সমকক্ষ হওয়া। তাই কোনো মুসলমান কোনো কাফেরকে হত্যা করলে সেজন্য উক্ত মুসলমানের উপর কিসাস কার্যকর হবেনা। অনুরূপ, একজন স্বাধীন ব্যক্তি একজন দাসকে হত্যা করলে সেজন্য স্বাধীন ব্যক্তির উপর কিসাস কার্যকর হবেনা। কেননা এখানে হত্যাকারী ও নিহতের মধ্যে সমকক্ষতা নেই। পক্ষান্তরে কাফের মুসলমানকে কিংবা গোলাম স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করলে হত্যাকারীর উপর কিসাস কার্যকর হবে।

ইসলাম এক্ষেত্রে মুসলমানদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ রাখেনি। মুসলমানদের মধ্যে উঁচুজাত ও নিচুজাত, সুন্দর ও অসুন্দর, ধনী ও দরিদ্র, লম্বা ও খাটো, সবল ও দুর্বল, সুস্থ ও রোগী, পূর্ণাঙ্গ ও অপূর্ণাঙ্গ, ছোট ও বড় এবং নারী ও পুরুষে কোনো ভেদাভেদ স্বীকার করা

হয়নি। তবে মুসলমান ও কাফেরের মধ্যে এবং দাস ও স্বাধীনের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করা হয়েছে। এই দুই শ্রেণীকে হত্যার শাস্তির ব্যাপারে সমকক্ষ করা হয়নি। তাই কোনো মুসলমান কোনো কাফেরকে অথবা কোনো স্বাধীন ব্যক্তি কোনো দাসকে হত্যা করলে হত্যাকারীর উপর কিসাস কার্যকর হবেনা। এই বিধির উৎস হলো আলী রা. এর বর্ণিত হাদিস, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন :

"মনে রেখো, কোনো কাফেরের বিনিময়ে কোনো মুমিনকে হত্যা করা হবেনা।" -আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, হাকেম।

বুখারি আলী রা. থেকে আরো বর্ণনা করেছেন, আবু জুহাইফা আলীকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমাদের নিকট কি এমন কোনো ওহি আছে, যা কুরআনে নেই? তিনি বললেন : না, মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর কসম, আল্লাহ কোনো ব্যক্তিকে কুরআনের যে জ্ঞান দান করেন তা এবং এই পুস্তকটিতে যা আছে, তা ব্যতীত আর কিছু নেই। আবু জুহাইফা বললেন, ঐ পুস্তিকাটিতে কী আছে? তিনি বললেন, মুমিনদের প্রাণের বিনিময়ে (কিসাস ও দিয়াতে) সমকক্ষতা, বন্দীর মুক্তি এবং কোনো মুসলমানকে কোনো কাফেরের বিনিময়ে হত্যা করা যাবেনা।

অবশ্য এখানে যে কাফেরের কথা বলা হলো, সে হচ্ছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফের। কোনো মুসলমান তাকে হত্যা করলে তার শাস্তিস্বরূপ তাকে হত্যা করা যাবেনা। এটা সর্বসম্মত মত বা ইজমা। কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে চুক্তিবদ্ধ ও অনুগত অমুসলিম নাগরিক সম্পর্কে ফকিহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ ফকিহর মতে, এক্ষেত্রে মুসলমানকে উক্ত দুই শ্রেণীর অমুসলিমের বিনিময়ে হত্যা করা হবেনা। কেননা এর স্বপক্ষে বহু সহীহ হাদিস রয়েছে এবং এর বিপক্ষে কিছু নেই।

তবে হানাফি ফকিহগণ ও ইবনে আবি লায়লা বলেছেন, "কোনো মুসলমান যখন কোনো যুদ্ধরত কাফেরেকে হত্যা করবে, তখন তাকে হত্যা করা হবেনা। তবে চুক্তিবদ্ধ ও অনুগত কাফেরের ব্যাপারে তাদের ভিন্নমত রয়েছে। তারা বলেন, কোনো চুক্তিবদ্ধ ও অনুগত (যিম্মি) কাফেরকে সঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে হত্যা করলে তাকে হত্যা করা হবে। কেননা আল্লাহ বলেছেন : وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ○

"আমি লিখে দিয়েছি যে, প্রাণের বদলে প্রাণ...." আল্লাহর এই উক্তি মুসলমান ও কাফের নির্বিশেষে সবার উপর প্রযোজ্য। বায়হাকি বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সা. একজন চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের বদলে একজন মুসলমানকে হত্যা করিয়েছেন এবং বলেছেন, যে ব্যক্তি তার চুক্তি মেনে চলে আমি তাকে সম্মান করি।

ফকিহগণ আরো বলেছেন, মুসলমানরা এ ব্যাপারে একমত হয়েছে যে, কোনো চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিকের মাল চুরি করলে মুসলমানের হাত কাটা হবে। সুতরাং অমুসলিম নাগরিকের মাল যেমন মুসলিম নাগরিকের মালের ন্যায় পবিত্র ও সম্মানার্হ, তেমনি তার প্রাণও মুসলিম নাগরিকের প্রাণের ন্যায় পবিত্র ও সম্মানার্হ।

একবার বিচারপতি ইমাম আবু ইউসুফেরে নিকট এমন মুসলমানকে ধরে আনা হলো। যে জনৈক অমুসলিম নাগরিককে (যিম্মিকে) হত্যা করেছে। তিনি তৎক্ষণাত তার বিরুদ্ধে কিসাসের রায় দিয়ে দিলেন। সহসা এক ব্যক্তি তার কাছে এসে তাকে এক টুকরো কাগজ দিয়ে গেলো, যাতে লেখা ছিলো : "হে কাফেরের বিনিময়ে মুসলমানকে হত্যাকারী, তুমি যুলুম করেছো, আর জেনে রেখো, যালেম ও সুবিচারক কখনো সমান নয়। বাগদাদে ও

তার আশেপাশে বসবাসকারী ওহে আলেমগণ ও কবিগণ, তোমরা "ইন্না লিল্লাহ" পড়ো, তোমাদের ধর্মের জন্য কাঁদো ও সবর করো। কারণ সবরকারীর জন্য সওয়াব রয়েছে। আবু ইউসুফ একজন কাফেরের বিনিময়ে মুসলমানকে হত্যা করে ইসলামের উপর যুলুম করেছে।" এটি পড়েই আবু ইউসুফ হারুনুর রশীদের দরবারে গেলেন এবং তাকে কাগজটি পড়ে শোনালেন। তখন হারুনুর রশীদ বললেন, এই অভিযোগ নিরসন করো, যাতে কোনো গোলযোগ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা না হয়।"

আবু ইউসুফ বাইরে গেলেন এবং নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদেরকে বললেন, তোমরা অভিযোগের সত্যতার প্রমাণ করো। লোকেরা কোনো প্রমাণ আনতে পারলোনা। অগত্যা আবু ইউসুফ কিসাস রহিত করে দিলেন।

মালেক ও লায়েস বলেছেন, "যিম্মির (অমুসলিম নাগরিকের) বিনিময়ে মুসলমানকে হত্যা করা যাবেনা। অবশ্য তাকে শুইয়ে যবাই করে হত্যা করে থাকলে, বিশেষত তার ধনসম্পদের লোভে করে থাকলে সেটা স্বতন্ত্র ব্যাপার।

এতো গেলো অমুসলিম নাগরিকের কথা। পক্ষান্তরে দাসের বদলে স্বাধীন মানুষকে হত্যা করা হবেনা। অপরদিকে দাস যদি স্বাধীন মানুষকে হত্যা করে, তবে সেই হত্যাকারী দাসকে তার বিনিময়ে হত্যা করা হবে।

দার কুতনিতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি তার দাসকে বন্দী রেখে স্বেচ্ছায় হত্যা করে। রসূলুল্লাহ সা. তাকে (হত্যাকারীকে) একশো কষাঘাত করলেন, এক বছরের জন্য নির্বাসিত করলেন এবং মুসলমানদের জন্য আগত সম্পদে তার হিসসা বাতিল করলেন। তবে তার উপর কিসাস কার্যকর করলেন না, রবং তাকে কুরআনের আয়াত অনুযায়ী একজন দাসকে মুক্ত করার আদেশ দিলেন। তাছাড়া আল্লাহর বাণী "স্বাধীন ব্যক্তির বিনিময়ে স্বাধীন ব্যক্তি" এর অর্থ হলো, স্বাধীন ব্যক্তিকে শুধু স্বাধীন ব্যক্তির বিনিময়েই হত্যা করা যাবে, অস্বাধীন তথা দাসের বিনিময়ে নয়। তবে হত্যা করা যখন যাবেনা, তখন নিহত দাসের মূল্য অবশ্যই হত্যাকারী স্বাধীন ব্যক্তি দিতে বাধ্য, চাই সে মূল্য স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যার দায়ে দেয় দিয়াতের চেয়েও বেশি হয়ে যাক না কেন। এখানে মনে রাখতে হবে যে, এখানে যে বিধিটি উল্লেখ করা হলো, তা হত্যাকারীর নিজের গোলাম ব্যতীত অন্যের গোলামকে হত্যা বেলায় প্রযোজ্য। কোনো মনিব যদি নিজের গোলাম হত্যা করে তাহলে তার বিধান হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, (মনিবকে তার বিনিময়ে হত্যা করা হবেনা।) এটাই ইমাম মালেক, শাফেয়ি, আহমদ ও হাদবী মাযহাবসহ অধিকাংশ ফকিহর মত। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা বলেন, মনিব ব্যতীত আর যে কোনো স্বাধীন ব্যক্তি কোনো দাসকে হত্যা করলে তার বিনিময়ে হত্যাকারী স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে। কেননা কুরআনে আল্লাহ যে বলেছেন, "আমি লিখে দিয়েছি, প্রাণের বদলে প্রাণ।" এটা সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে যতক্ষণ না হাদিস দ্বারা কোনো ক্ষেত্রকে ব্যতিক্রম ঘোষণা করা হয়।

আর যেহেতু বায়হাকি বর্ণিত রসূলুল্লাহ সা. এর উক্তি : "দাসকে হত্যার কারণে মনিবের এবং সন্তানকে হত্যার কারণে পিতার উপর কিসাস কার্যকর হবেনা" দ্বারা পিতা ও মনিবের ক্ষেত্র দুটিকে উক্ত সাধারণ ঘোষণা থেকে ব্যতিক্রম ঘোষণা করা হয়েছে, তাই আবু হানিফার মতানুসারে এই দু'জনকে (পিতাকে সন্তান হত্যার ও মনিবকে নিজের

গোলাম হত্যার বিনিময়ে) কিসাসের জন্য হত্যা করা হবেনা। অপরদিকে ইবরাহিম নাখয়ি বলেছেন, আয়াতের মর্ম অনুযায়ী নির্বিশেষে যে কোনো ব্যক্তিকে হত্যার বিনিময়ে যে কোনো হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে।

৭. হত্যাকারীর সাথে এমন কেউ শরিক না থাকা চাই, যার উপর কিসাস প্রযোজ্য নয়। এ ধরনের কেউ যদি তার সাথে শরিক হয়, যেমন দু'জনের একজন ইচ্ছাকৃত হত্যাকারী, অপরজন অনিচ্ছাকৃত হত্যাকারী, একজন প্রাপ্তবয়স্ক অপরজন শিশু বা বালক, তাহলে দু'জনের কারো উপর কিসাস প্রযোজ্য হবেনা, উভয়ের উপর দিয়াত কার্যকর হবে। কেননা কোন্ জন প্রকৃত হত্যাকারী তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। আর সন্দেহ দ্বারা হদ ও কিসাস রহিত হয়ে যায়। যেহেতু হত্যা এমন একটা অপরাধ, যা অবিভাজ্য এবং এটা যার উপর কিসাস প্রযোজ্য নয়, তার দ্বারাও সংঘটিত হয়ে থাকতে পারে, আবার যার উপর কিসাস প্রযোজ্য, তার দ্বারাও সংঘটিত হয়ে থাকতে পারে; তাই এই সন্দেহ কিসাস ও হদকে রহিত করে দেয়। আর কিসাস যখন রহিত হলো, তখন তার বিকল্প কার্যকর হবে। এই বিকল্প হচ্ছে দিয়াত। ইমাম মালেক ও শাফেয়ি এই মতের বিরোধিতা করে বলেছেন, প্রাপ্তবয়স্কের উপর কিসাস ও অপ্রাপ্তবয়স্কের উপর দিয়াত কার্যকর হবে। ইমাম মালেক এই দিয়াত সমগ্র গোত্রের সদস্যদের উপর বণ্টন করে দেয়ার পক্ষপাতি। আর শাফেয়ি সন্দেহভাজন হত্যাকারীর সম্পদ থেকে আদায় করার পক্ষপাতি।

প্রতারণাপূর্ণ হত্যা, গুপ্ত হত্যা ও অপহরণপূর্বক হত্যা

ইমাম মালেক বলেন, যখন কেউ প্রতারণাপূর্বক অন্যের ঘরে প্রবেশ করে, অতপর তাকে হত্যা করে তখন আমাদের মতে, এ ধরনের অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। নিহতের উত্তরাধিকারীর তাকে ক্ষমা করার কোনো অধিকার নেই। ক্ষমা করার ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হবে শাসকের নিকট। অন্যান্য ফকিহগণ বলেন, হত্যা প্রতারণাপূর্ণই হোক, গুপ্তই হোক বা অন্য কোনো প্রকারের হোক, সবই সমান। কিসাস বা ক্ষমার অধিকার সর্বত্র একই রকম। নিহতের উত্তরাধিকারীর হাতেই ক্ষমা বা কিসাসের ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে। যখন একটি দল কাউকে হত্যা করে, তখন নিহতের উত্তরাধিকারী তাদের মধ্য হতে যাকে চায় হত্যা করতে পারে। অথবা যার কাছ থেকে ইচ্ছা দিয়াত আদায় করতে পারে। এটা ইবনে আব্বাস, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, শাবী, ইবনে সিরীন, আতা, কাতাদা, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাকের মত।

উমর ইবনুল খাত্তাবের রা. আমলে জনৈকা মহিলা ও তার পরকিয়া প্রেমিক মহিলার সৎ ছেলেকে হত্যা করে। উমর রা. এর নিযুক্ত আঞ্চলিক শাসক ইয়ালা বিন উমাইয়া উমর রা.কে ঘটনা অবহিত করে তাঁর মতামত জানতে চাইলেন। উমর রা. ঘটনা সম্পর্কে নিজের মতামত জানাতে কিছু বিলম্ব করলেন। ইত্যবসরে আলী রা. বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন, পাঁচ থেকে সাত জনের একটি দল যদি একটি উট বা বকরী চুরি করে, অতপর তাদের এক একজন পশুটির এক একটি অঙ্গ ভাগ করে নেয়, তাহলে আপনি কি সবার হাত কাটবেন? উমর রা. বললেন, হ্যাঁ। আলী রা. বললেন, তাহলে এখানেও সে রকম হবে। এরপর আমিরুল মুমিনীন ইয়ালাকে লিখলেন : "উক্ত মহিলা ও তার পরকিয়া প্রেমিক উভয়কে হত্যা করো। এই হত্যাকাণ্ডে যদি সানয়ার সকল অধিবাসী জড়িত থাকতো, তবে আমি তাদের সবাইকে হত্যা করতাম।"

ইমাম শাফেয়ির মতে নিহতের উত্তরাধিকারী দলের সকল সদস্যকে নিহতের বিনিময়ে হত্যা করতে পারবে, আবার তাদের মধ্য হতে যাকে চায় তাকেও হত্যা করতে পারবে এবং অন্যদের নিকট থেকে আনুপাতিক হারে দিয়াত নিতে পারবে। হত্যাকারী দলে যদি দুজন থাকে এবং তাদের একজনের উপর কিসাস কার্যকর করা হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে অবশিষ্ট জনের কাছ থেকে অর্ধেক দিয়াত আদায় করা যাবে। আর দলের সদস্য যদি তিনজন হয় এবং দুজনের উপরে কিসাস কার্যকর করা হয়ে থাকে, তাহলে তৃতীয় জনের কাছ থেকে দিয়াতের এক তৃতীয়াংশ আদায় করতে পারবে।

একজনের বিনিময়ে গোটা দলকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া

যখন কোনো একটি দল কোনো একজনকে হত্যা করতে সংঘবদ্ধ হয়, তখন তার বিনিময়ে তাদের সকলকে হত্যা করা হবে, চাই দলের সদস্য সংখ্যা বেশি হোক বা কম হোক এবং চাই তাদের সবাই হত্যায় সরাসরি জড়িত থাক বা না থাক। কেননা ইমাম মালেক মুয়াত্তায় বর্ণনা করেন, একটি দল এক ব্যক্তিকে প্রতারণাপূর্বক হত্যা করেছিল। উমর রা. নিহতের বিনিময়ে দলটির সকল সদস্যকে মৃত্যুদণ্ড দেন। তিনি আরো বললেন, এই এক ব্যক্তির হত্যাকাণ্ডে যদি সমগ্র সানাবাসী সংঘবদ্ধ হতো তাহলে আমি সানার সব অধিবাসীকে হত্যা করতাম।

শাফেয়ি ও হাম্বলিগণ এই শর্ত আরোপ করেছেন যে, হত্যায় জড়িত প্রত্যেকের কাজ এমন হওয়া চাই যে, সে একা হলেও তার হাতে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হতো। প্রত্যেকের একার কাজ যদি হত্যাকাণ্ড ঘটানোর জন্য যথেষ্ট না হয়, তাহলে কারো উপরই কিসাস প্রয়োগ করা হবেনা। ইমাম মালেক বলেন, ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে নিহত একজন স্বাধীন মানুষের বিনিময়ে হত্যাকাণ্ডে জড়িত একাধিক স্বাধীন মানুষকে হত্যা করা হবে। নারী ও গোলামের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য।

আল মুসাওয়া গ্রন্থে বলা হয়েছে, অধিকাংশ আলেমের মতে, যখন কোনো দল এক ব্যক্তিকে হত্যার জন্য সংঘবদ্ধ হয়, তখন কিসাসস্বরূপ তাদের সবাইকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। এই ফকিহরা মনে করেন, জনস্বার্থেই এরূপ হওয়া প্রয়োজন। কেননা কিসাস হচ্ছে মানুষের প্রাণের রক্ষাকবচ। একটা দল সম্মিলিতভাবে কোনো একজনকে হত্যা করলে যদি কিসাস থেকে রক্ষা পেতো, তাহলে যে ব্যক্তিই কাউকে হত্যা করতে চাইত, সে একদল সহযোগী জুটিয়ে নিয়ে তাদের সাহায্য নিয়ে তাকে হত্যা করতো, যাতে কিসাস থেকে রক্ষা পায়। এভাবে কিসাসের আইনগত বাধ্যবাধকতার পেছনে কোনো যুক্তি থাকতোনা। ইবনুয যুবাইর, যুহরি, দাউদ ও যাহেরি মাযহাবের ফকিহগণের মতে, একজনের হত্যার জন্য একটি দলকে হত্যা করা হবেনা। কেননা আল্লাহ বলেছেন, "প্রাণের বদলে প্রাণ।" (প্রাণের বদলে প্রাণগুলো বলেননি)।

একজন যখন কাউকে জাপটে ধরে এবং অপরজন হত্যা করে

যখন কোনো ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে জাপটে ধরে এবং অপরজন তাকে হত্যা করে, তখন যদি দেখা যায় যে, জাপটে ধরা ছাড়া হত্যাকারী তাকে হত্যা করতে পারতোনা এবং জাপটে ধরার পর নিহত ব্যক্তি পালাতে সক্ষম ছিলো না, তাহলে যে ব্যক্তি জাপটে ধরেছে এবং যে ব্যক্তি হত্যা করেছে, তাদের উভয়কে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। কেননা তারা উভয়ে এই হত্যাকাণ্ডে অংশীদার। এটা লায়েস, মালেক ও ইবরাহিম নাখয়ির অভিমত। শাফেয়ি

ও হানাফিগণ এ মতের বিরোধী। তারা বলেন, হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে। আর যে নিহতকে ধরে রেখেছিল, তাকে ধরে রাখার শাস্তিস্বরূপ আমৃত্যু বন্দী করে রাখা হবে। কেননা দার কুতনিতে উবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "যখন কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তিকে জাপটে ধরে রাখে এবং অপর একজন তাকে হত্যা করে, তখন যে হত্যা করেছে তাকে হত্যা করা হবে, আর যে ধরে রেখেছে তাকে আটক করে রাখা হবে।"

ইমাম শাফেয়ি বর্ণনা করেছেন এক ব্যক্তি একজনকে ধরে রেখেছিল এবং অপর একজন তাকে হত্যা করেছিল। এই হত্যার ঘটনায় আলী রা. ফায়সালা ঘোষণা করেন : "হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে এবং অপরজনকে তার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত কারাগারে বন্দী রাখা হবে।"

কিসাস কিভাবে সাব্যস্ত হবে

কিসাস সাব্যস্ত হবে নিম্নোক্ত উপায়সমূহের যে কোনো একটি দ্বারা-

এক. স্বীকারোক্তি দ্বারা, কেননা স্বীকারোক্তিকে শ্রেষ্ঠতম প্রমাণ বলে গণ্য করা হয়। ওয়ায়েল বিন হাজার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রসূলুল্লাহ সা. এর নিকট বসেছিলাম। সহসা এক ব্যক্তি অপর একজনকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ধরে নিয়ে এলো। সে বললো, হে রসূলুল্লাহ সা., এই ব্যক্তি আমার ভাইকে হত্যা করেছে।" সে আরো বললো, সে যদি স্বীকার না করে, তবে আমি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করবো। রসূলুল্লাহ সা. বললেন, তুমি কি তাকে হত্যা করেছো? সে বললো, হ্যাঁ, আমি তাকে হত্যা করেছি।" .... -মুসলিম, নাসায়ী।

দুই. দু'জন সত্যবাদী পুরুষের সাক্ষ্য দ্বারা কিসাস সাব্যস্ত হবে। রাফে বিন খাদীজ রা. বর্ণনা করেন, খয়বরে জনৈক আনসারী নিহত হলো। তখন তার উত্তরাধিকারীরা রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট গিয়ে ঘটনা জানালো। তিনি বললেন, তোমাদের সাথীর নিহত হওয়ার ব্যাপারে দু'জন সাক্ষীকে সাক্ষ্য দিতে পাওয়া যাবে কি?.... -আবু দাউদ।

উবনে কুদামা আল মুগনিতে বলেছেন, হত্যার মামলায় একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলার সাক্ষ্য গৃহীত হবেনা, একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য ও বাদীর শপথও গৃহীত হবেনা। এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে কোনো মতভেদ আছে বলে আমাদের জানা নেই। কেননা কিসাস হচ্ছে একটা অপরাধের শাস্তিস্বরূপ একজন মানুষকে মৃত্যু দণ্ড দেয়ার নাম। তাই হদের ন্যায় এতেও দু'জন সৎ মানুষের সাক্ষ্য গ্রহণের শর্ত পূরণ করে সতর্কতার পরিচয় দিতে হবে, চাই কিসাস কোনো মুসলমান, কাফের, গোলাম বা স্বাধীন যার উপরই কার্যকর হোক না কেন। কেননা শাস্তি যাতে রহিত বা বাতিল না হয়, সেই জন্যই সতর্কতা প্রয়োজন।

অপরাধীর উপর কিসাস কার্যকর করার শর্তাবলি

কিসাস কার্যকর করার জন্য তিনটে শর্ত রয়েছে-

১. কিসাসের দাবিদারের বাদীর সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়া ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া।

২. দাবিদার যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক বা পাগল হয় এবং তার পিতা, অভিভাবক বা শাসক তার প্রতিনিধি না হয়, তাহলে অপ্রাপ্তবয়স্ক দাবিদার প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত এবং পাগল দাবিদার সুস্থ মস্তিষ্ক না হওয়া পর্যন্ত অপরাধীকে আটক রাখা হবে। মুয়াবিয়া রা. হাদবা

ইবনে খাসরামকে নিহত ব্যক্তির ছেলে বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আটক রেখেছিলেন। এ ঘটনা সাহাবীদের জীবদ্দশায় ঘটেছিল এবং কেউ তাতে আপত্তি তোলেনি।

২. নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের সকলের কিসাস আদায়ে একমত হওয়া জরুরি। তাদের কেউ ভিন্নমত পোষণ করলে চলবেনা। তাদের কেউ যদি অনুপস্থিত, অপ্রাপ্তবয়স্ক, কিংবা পাগল হয়, তাহলে অনুপস্থিতের প্রত্যাবর্তন, অপ্রাপ্তবয়স্কের বয়োপ্রাপ্তি এবং পাগলের মস্তিষ্ক সুস্থ হওয়া ও স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কেননা যার কোনো ব্যাপারে স্বাধীনতা রয়েছে, তার মত ছাড়া সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার অন্য কারো নেই। কেননা তাতে তার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয়।

আবু হানিফা বলেন, উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক, তারা কিসাস আদায় করার অধিকারী, অপ্রাপ্তবয়স্কদের বয়োপ্রাপ্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করার প্রয়োজন তাদের নেই। উত্তরাধিকারীদের কোনো একজনও ক্ষমা করে দিলে কিসাস রহিত হবে। কেননা কিসাস অবিভাজ্য।

৩. কিসাস অপরাধীকে অতিক্রম করে অন্য কোনো নিরীহ ব্যক্তিকে আক্রান্ত না করে এমনভাবে কার্যকর করতে হবে। সুতরাং কিসাস যদি কোনো গর্ভবতী মহিলার উপর প্রযোজ্য হয়, তবে তার সন্তান প্রসব করা ও সন্তানকে দুধ পান করানো শেষ করার পূর্বে তাকে হত্যা করা যাবেনা। কেননা তাকে প্রসবের পূর্বে হত্যা করা হলে তার গর্ভস্থ সন্তানও মারা যাবে, আর তাকে দুধ পান করানোর পূর্বে হত্যা করা হলে সন্তান ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অতপর দুধ পান করানোর পর যদি কোনো ধাত্রী পাওয়া যায় তবে সন্তানকে তার কাছে সোপর্দ করে মহিলার উপর কিসাস কার্যকর করা হবে। কেননা এখানে সন্তানের লালন পালনের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তার বিকল্প বিদ্যমান। আর দুধ পান করানো ও লালন পালনের জন্য বিকল্প যদি না পাওয়া যায়, তাহলে পুরো দু'বছর দুধ পান করানো পর্যন্ত তাকে সুযোগ দেয়া হবে।

ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "যখন কোনো মহিলা কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তখন সে গর্ভবতী হয়ে থাকলে সন্তান প্রসব না করা ও সন্তান পালন না করা পর্যন্ত তাকে হত্যা করা হবেনা। আর যখন কোনো মহিলা ব্যভিচার করে, তখন সে গর্ভবতী হয় থাকলে সন্তান প্রসব না করা ও সন্তান পালন না করা পর্যন্ত তাকে রজম (প্রস্তরাঘাত হত্যা) করা হবে না।" একইভাবে কোনো মহিলা কারো অঙ্গহানি ঘটালে তার উপরও সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত অঙ্গহানির কিসাস কার্যকর করা হবেনা। তবে এক্ষেত্রে দুধ পান করানো শর্ত নয়।

কিসাস কার্যকর করার সময়

কিসাস যদি উল্লিখিত উপায়গুলোর মধ্য হতে যে কোনো একটি উপায়ে সাব্যস্ত হয়ে যায় এবং নিহতের উত্তরাধিকারীরা বয়োপ্রাপ্ত হয় ও কিসাসের দাবিদার হয়, তাহলে নিহতের উত্তরাধিকারীরা উপস্থিত হওয়া মাত্রই কিসাস কার্যকর করা হবে। তবে ইতোপূর্বেই যেমন বলেছি, গর্ভবতী মহিলার কিসাস তার সন্তান প্রসব পর্যন্ত বিলম্বিত করা হবে।

কিসাস কিসের দ্বারা কার্যকর করা হবে

কিসাসের মূল কথা হলো, হত্যাকারী যে পন্থায় হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, ঠিক সেই পন্থায় তাকেও হত্যা করতে হবে, কেননা ওটাই সাম্যের দাবি। তবে এ পন্থায় নির্যাতন দীর্ঘস্থায়ী

হলে তরবারীই (অর্থাৎ তরবারীর এক আঘাতে হত্যাই) তার জন্য অপেক্ষাকৃত কম কষ্টদায়ক। আল্লাহ বলেন :

فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۝ وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَاعُوْقِبْتُمْ بِهٖ ط

অর্থ : যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করো, তবে ঠিক ততখানি গ্রহণ করবে যতখানি অন্যায় তোমাদের উপর করা হয়েছে।" (সূরা বাকারা : আয়াত ১৯৪)

বায়হাকি বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "যে আমাদের উপর তীর নিক্ষেপ করবে, আমরাও তাদের উপর তীর নিক্ষেপ করবো। যে আমাদেরকে আগুনে পোড়াবে আমরাও তাদেরকে আগুনে পোড়াবো। আর যে আমাদেরকে পানিতে ডোবাবে, আমরাও তাদেরকে পানিতে ডোবাবো।" যে ইহুদি জনৈকা মুসলিম মহিলার মাথা পাথর দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল রসূলুল্লাহ সা. সেই ইহুদির মাথাও পাথর দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন।

তবে আলেমগণ এখানে এরূপ শর্ত আরোপ করেছেন যে, যে পদ্ধতিতে হত্যা করা হয়েছে, সেই পদ্ধতি ইসলামী শরিয়তে বৈধ হওয়া চাই। যদি সে পদ্ধতি অবলম্বন করা বৈধ না হয়, তাহলে সেই পদ্ধতিতে হত্যা করা যাবেনা। যেমন জাদুর বাণ দ্বারা হত্যা করা চলবেনা। কেননা ওটা হারাম। শাফেয়ি মাযহাবের কেউ কেউ বলেছেন, কাউকে যদি মদ দিয়ে হত্যা করা হয়, তাহলে তাকে সেটা দিয়ে হত্যা করা হবে। কেউ কেউ বলেন, সমপদ্ধতিতে শাস্তি প্রদানের নীতি অনুসরণ করা জরুরি নয়। হানাফি ও হাদবীদের মতে, তরবারী দ্বারা ব্যতীত কিসাস কার্যকর করা যাবেনা। কেননা আবু বকরা থেকে বাযযার বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "তরবারী দ্বারা ব্যতীত কোনো কিসাস কার্যকর করা হবেনা।" রসূলুল্লাহ সা. লাশ বিকৃত করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, যখন তোমরা হত্যা করবে, তখন উত্তম পন্থায় হত্যা করো। যখন যবাই করবে, তখন উত্তম পন্থায় যবাই করো।" আবু বকরার বর্ণিত হাদিসের জবাবে হানাফিগণ বলেন, ঐ হাদিসের সব কটি সূত্র দুর্বল। আর লাশ বিকৃত করার নিষেধাজ্ঞা যে হাদিসে এসেছে তা সূরা নাহলের আয়াত "যদি তোরা প্রতিশোধ নাও, তবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে, ততখানিই প্রতিশোধ নাও" এবং সূরা বাকারার আয়াত : "যে তোমার প্রতি আক্রমণ চালিয়েছে, তার প্রতি ঠিক সেই রূপ আক্রমণ চালাও যেরূপ সে চালিয়েছে।" এই দুই আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট।

হত্যাকারীকে কি হারাম শরিফে হত্যা করা যাবে?

আলেমগণ একমত যে, যে ব্যক্তি হারাম শরিফে হত্যা করেছে, তাকে হারাম শরিফে হত্যা করা বৈধ। আর যদি হারাম শরিফের বাইরে হত্যা করে, তারপর হারাম শরিফে আশ্রয় নেয়, অথবা অন্য কোনো কারণে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব হয়ে গিয়ে থাকে, যেমন মুরতাদ হওয়া অতপর সে হারাম শরিফে আশ্রয় নেয়, তাহলে ইমাম মালেক বলেন, তাকে হারাম শরিফের মধ্যেই হত্যা করা হবে। আর ইমাম আহমদ ও আবু হানিফার মতে হারাম শরিফের অভ্যন্তরে হত্যা করা চলবেনা। তবে তাকে চাপের মধ্যে রাখতে হবে।

তার কাছে কিছু বিক্রি করা হবেনা। তার কাছ থেকে কিছু ক্রয় করাও হবেনা। ফলে এক সময় সে বের হতে বাধ্য হবে। আর বের হলেই তাকে হারাম শরিফের বাইরে হত্যা করা হবে।

কিসাস রহিত হওয়া

কিসাস ওয়াজিব হওয়ার পরও নিম্নোক্ত কারণসমূহের যে কোনো একটি পাওয়া গেলে কিসাস রহিত হবে :

১. নিহতের উত্তরাধিকারীদের সবাই বা কোনো একজন ক্ষমা করে দিলে। তবে শর্ত হলো, ক্ষমাকারী সুস্থ মস্তিষ্ক ও ন্যায় অন্যায় বাছবিচারের ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া চাই। কেননা এটা এমন একটা একচেটিয়া ক্ষমতা, যা কোনো অপ্রাপ্তবয়স্ক বা পাগলের থাকেনা। (নিহতের উত্তরাধিকারীরা ক্ষমা করে দিলে শাসক সেখানে ক্ষমা করতে বাধা দিয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারেনা। অনুরূপ, উত্তরাধিকারীরা কিসাস চাইলে শাসক একাই তাতে বাধা দিতে পারেনা।)

২. অপরাধীর মৃত্যু হলে বা অপরাধী পক্ষ হাতছাড়া হয়ে গেলে। যার উপর কিসাস কার্যকরী করা হবে সে যদি আগেই মারা যায় বা যে অঙ্গ কিসাস প্রযোজ্য, সেই অঙ্গ হারিয়ে বসে, তাহলে কিসাস কার্যকর করা অসম্ভব হওয়ার কারণে তা রহিত হবে। আর কিসাস যখন রহিত হয়, তখন তার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নিহতের উত্তরাধিকারীদের জন্য দিয়াত প্রাপ্য হবে। এটা হাম্বলি ও শাফেয়িদের মত। পক্ষান্তরে মালেক ও হানাফিগণ বলেন, দিয়াত দেয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা তাদের প্রাপ্য ছিলো প্রাণের বদলে প্রাণ, যা হাতছাড়া হয়ে গেছে। কাজেই খুনীর উত্তরাধিকারীদের কাছে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিকানা চলে যাওয়ার পর সেই সম্পত্তিতে নিহতের উত্তরাধিকারীদের কোনো অধিকার নেই। হাম্বলি ও শাফেয়িদের মতের পক্ষে যুক্তি এই যে, নিহতের উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য তার প্রাণে অথবা তার সম্পত্তিতে ঝুলন্ত রয়েছে। এই দুটোর যে কোনোটিই গ্রহণের তাদের স্বাধীনতা রয়েছে। কাজেই যখন এই দুটির একটি হাতছাড়া হয়ে যায়, তখন অপরটি নিশ্চিতভাবে প্রাপ্য হবে।

৩. অপরাধী ও অপরাধের শিকার বা তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কোনো আপোষ হলে।

কিসাস বাস্তবয়নে আদালতের অধিকার

আগেই বলা হয়েছে যে, কিসাস দাবি করা নিহতের উত্তরাধিকারীর অধিকার। তবে উত্তরাধিকারীর সেই অধিকার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা বা তাকে সেই অধিকার পাওয়ার সুযোগ দেয়া আদালতের অধিকার।

কুরতুবি বলেছেন, হত্যাকাণ্ডে কিসাস যে শাসক ব্যতীত কেউ কার্যকর করতে পারেনা, তাতে কোনোই মতভেদ নেই। তার উপর কিসাস কার্যকর করার ও হুদুদ বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ সকল মুমিনের কাছ থেকে কিসাস দাবি করেছেন। তাছাড়া সকল মুমিন কিসাসের উপর একমত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হবে, এটাও সম্ভব নয়। তাই কিসাস ও হুদুদ বাস্তবায়নে তারা শাসককে নিজেদের স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছে। এর কারণ আল্লামা সাওরি তাফসীরে জালালাইনের টীকায় লিখেছেন। সেটি হলো :

"অতপর যখন প্রমাণিত হলো যে, ইচ্ছাকৃত হত্যা একটা আগ্রাসন, তখন শরিয়ত সম্মত শাসকের কর্তব্য নিহতের উত্তরাধিকারীকে হত্যাকারীর উপর ক্ষমতা প্রদান করা, যাতে সে হত্যাকারীকে হত্যা করা, ক্ষমা করা বা দিয়াত আদায় করা- এই তিনটের যেটি চাইবে,

শাসক তাই করবে। তবে শাসকের অনুমতি ব্যতিরেকে হত্যাকারীর উপর সর্বময় কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা নিহতের উত্তরাধিকারীর জন্য বৈধ নয়। কেননা তাতে সমাজে বিশৃংখলা ও বিপর্যয় ঘটে যাবে।"

শাসক ফায়সালা প্রদানের আগে সে যদি হত্যাকারীকে হত্যা করে, তবে তাকে তাযীর করা হবে। যে অস্ত্র দ্বারা কিসাস কার্যকর করা হবে, তা পরিদর্শন করা শাসকের কর্তব্য। যাতে তাকে মাত্রাতিরিক্ত কষ্ট দেয়া না হয়। সুষ্ঠুভাবে কিসাস কার্যকর করতে পারে, এমন কাউকে নিয়োগ দেয়া তার কর্তব্য। এজন্য প্রদেয় পারিশ্রমিক বাইতুল মাল (সরকারি কোষাগার) থেকে দেয়া হবে। (নিহতের যদি কোনো উত্তরাধিকারী না থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে কিসাসের বিষয়টি শাসকের দায়িত্বে ন্যস্ত হবে। তিনি বিষয়টির এমনভাবে নিষ্পত্তি করবেন, যাতে মুসলমানদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত হয়। তিনি চাইলে কিসাস নিবেন, নচেত অর্থের বিনিময়ে ক্ষমা করে দেবেন। অর্থ ব্যতিরেকে ক্ষমা করার অধিকার তার নেই। কেননা এ অধিকার তার নয়, এটা মুসলমানদের।

নিহতের উত্তরাধিকারী যখন নিখোঁজ থাকে

ইবনে কুদামা বলেন, নিহতের উত্তরাধিকারী ব্যতীত অন্য কেউ যদি হত্যাকারীকে হত্যা করে, তাহলে তার হত্যাকারীর উপর কিসাস কার্যকর হবে এবং প্রথম হত্যাকারীর উত্তরাধিকারীরা দিয়াত পাবে। এটা ইমাম শাফেয়ির মত। আর হাসান ও মালেক বলেন হত্যাকারীর হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে এবং প্রথম নিহতের বাবদে দিয়াত বাতিল হবে। কেননা তার আর প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ নেই। কাতাদা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, দ্বিতীয় হত্যাকারীর উপর কিসাস কার্যকরী হবেনা। কেননা সে যাকে হত্যা করেছে, তাকে হত্যা করা বৈধ। কাজেই তাকে হত্যার কারণে কিসাস প্রযোজ্য হবেনা। কিন্তু অধিকাংশ আলেমের মতে, হত্যাকারীর উপর কিসাস কার্যকর হবে। কারণ তার হত্যার কার্যকারিতা নিশ্চিত হয়নি। আর নিহতের উত্তরাধিকারী ব্যতীত অন্য কারো জন্য তাকে হত্যা করা বৈধ নয়। তাই তাকে হত্যার জন্য কিসাস প্রযোজ্য হবে।

কিসাস নিয়ে বিতর্ক

মৃত্যুদণ্ড নিয়ে ইদানিং বিতর্ক শুরু হয়ে গেছে। বহু লেখক, দার্শনিক ও আইনবিদ এই বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছেন। এদের মধ্যে রুশো, বেন্টম বোকারিয়া প্রমুখ ব্যক্তিরাও রয়েছেন। কেউ কেউ একে সমর্থন করেছেন। আবার কেউবা এর বিরোধিতা করেছেন ও বাতিল করার দাবি তুলেছেন। যারা একে বাতিল করার দাবি তুলেছেন তাদের যুক্তি হলো :

এক. শাস্তি হলো এমন একটি অধিকার যা রাষ্ট্র তার লালিত সমাজের স্বার্থে ও তার রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনে সংরক্ষণ করে। আর সমাজ ব্যক্তিকে জীবন দান করেনি যে, তার বাজেয়াপ্ত করার হুকুম জারি করতে পারবে।

দুই. কখনো কখনো দুর্ভাগ্যবশত এবং পরিস্থিতির শিকার হয়ে নিরাপরাধ ব্যক্তিও ভুলক্রমে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে থাকে। তখন এই ভুল সংশোধনের কোনো উপায় থাকেনা। যাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে, তাকে আয়ু ফিরিয়ে দেয়ার কোনো সুযোগ থাকেনা।

তিন. এটা একটা নিষ্ঠুর অবিচারমূলক দণ্ড।

চার. এটা জরুরি বা অপরিহার্য নয়। কেননা যেসব অপরাধের জন্য এ দণ্ড দেয়া হয়, তা এ দণ্ডের প্রভাবে হ্রাস পায় এমন কোনো প্রমাণ নেই।

পক্ষান্তরে যারা মৃত্যুদণ্ড চালু রাখার পক্ষপাতি, তারা এসব যুক্তির জবাব দিয়েছেন :

প্রথম যুক্তি : "সমাজ ব্যক্তিকে জীবন দান করেনি বিধায় জীবন হরণের অধিকার তার নেই।" এর জবাবে তারা বলেন, সমাজ মানুষের স্বাধীনতা সৃষ্টি করে দেয়নি, তথাপি সে অন্যান্য শাস্তিতে এই স্বাধীনতা হরণের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। তাছাড়া মৃত্যুদণ্ড শুধু যে, অপরাধীর অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত তা নয়, উপরন্তু তা সমাজের বেঁচে থাকার অধিকারের নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা প্রদান করে। সমাজের অস্তিত্ব ও শান্তি শৃংখলা বিপণ্নকারী প্রতিটি সদস্যকে ছাঁটাই ও নির্মূল করার মাধ্যমে সমাজের শান্তি শৃংখলা ও অস্তিত্ব নিশ্চিত করে। তাই একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, মানুষের প্রাণ রক্ষা ও সমাজের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে মৃত্যুদণ্ড অপরিহার্য।

দ্বিতীয় যুক্তি : "মৃত্যুদণ্ড যখন অন্যায় ও অবিচারমূলকভাবেব দেয়া হয় তখন তা মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে। অথচ তার প্রতিকার বা সংশোধনের কোনো সুযোগ থাকেনা।" এর জবাবে তারা বলেন, অন্যান্য শাস্তিতেও ভুলভ্রান্তির আশংকা থাকে ভুলক্রম যা কার্যকর হয়ে যায়, তার প্রতিকারের কোনো উপায় থাকেনা। অবশ্য একথাও সত্য যে, ভুলক্রমে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার ঘটনা খুবই বিরল। কেননা বিচারকগণ সচরাচর এই শাস্তি প্রয়োগে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করে থাকেন। অভিযোগের পক্ষে অকাট্য সাক্ষ প্রমাণ না থাকলে এই চরম শাস্তি দেয়া থেকে তারা বিরত থাকেন।

তৃতীয়ত: "মৃত্যুদণ্ড অবিচারমূলক" এ বক্তব্যের জবাবে তারা বলেন, কর্ম ও কর্মফল একই প্রকৃতির আর মৃত্যুদণ্ড নিষ্প্রয়োজন-এ যুক্তি আদৌ ধোপে টেকেনা। কারণ অপরাধ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে শাস্তি অপরাধ দমনের একটি হিতকর উপকরণ। অন্য কথায়, সমাজকে অপরাধের ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা করাই শাস্তির উদ্দেশ্য। আর এ উদ্দেশ্যের সফলতার জন্য শাস্তি অপরাধের ভয়াবহতার সমানুপাতিক হোক-এটাই কাঙ্ক্ষিত। কেননা অপরাধ অপরাধীর মনের একটা·কদর্য বাসনা চরিতার্থ করে। একমাত্র শাস্তির ভীতিই তাকে এই বাসনা চরিতার্থ করা থেকে ফিরিয়ে রাখে। শাস্তি যখন অপরাধের সমানুপাতিক হয়, তখনই তা অপরাধীকে অপরাধ ঘটানো থেকে বিরত রাখতে পারে।। কেননা এটা তার সামনে দুটো জিনিস পাশাপাশি তুলে ধরে : ঈপ্সিত অপরাধ ঘটাতে পা বাড়ানো এবং তার জন্য নির্ধারিত শাস্তি মাথা পেতে নেয়া। শাস্তি যখন অপরাধ থেকে বিরত রাখার যোগ্য হয়, কেবল তখনই শাস্তির ভীতি তার অপরাধের দিকে পা বাড়ানো প্রতিহত করতে পারে। এই দু'টি মতামতের আলোকেই পৃথিবীর অধিকাংশ আইন মৃতুদণ্ড বহাল রেখেছে।

প্রাণহানির চেয়ে লঘুতর আঘাতের কিসাস

প্রাণহানিতে যেমন কিসাস প্রতিষ্ঠিত, তেমনি প্রাণহানির চেয়ে লঘুতর আঘাতেও কিসাস রয়েছে। এটা দুই ধরনের :

১. অঙ্গ প্রতঙ্গের উপর আঘাত ,

২. ক্ষত বা জখম।

তাওরাতে কিসাসের যে ব্যাপক বিধান দেয়া ছিলো, কুরআন তা পুরোপুরিভাবে উদ্ধৃত করেছে। আল্লাহ সূরা মায়েদার ৪৫ নং আয়াতে বলেন ;

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ لا وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ

وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ۙ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ ؕ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ ؕ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

"তাদের জন্য তাতে (তাওরাতে) বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং অনুরূপভাবে সকল জখমের বদলে জখম। তবে কেউ তা মাফ করে দিলে তা তার জন্য গুনাহর কাফফারা হবে। যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তদনুযায়ী বিধান দেয় না তারা যালিম।"

অর্থাৎ আল্লাহ তাওরাতে ইহুদীদের উপর বিধান দিয়েছিলেন যে, কেউ যখন কাউকে হত্যা করে, তখন তাকে হত্যা করে প্রাণের বদলে প্রাণ সংহার করা হবে। আর কেউ কারো চোখ নষ্ট করে দিয়ে থাকলে তার চোখ নষ্ট করে দেয়া হবে। এক্ষেত্রে ছোট চোখ ও বড় চোখ এবং শিশুর চোখ ও বুড়োর চোখে কোনো ভোদাভেদ করা হবেনা। আর নাকের বদলে নাক ও কানের বদলে কান কাটা হবে। আর দাঁত ভাঙ্গ বা উপড়ানোর শাস্তিস্বরূপ অপরাধীর দাঁত ভাঙ্গা বা উপড়ানো হবে। অপরাধীর দাঁত আহতের দাঁতের চেয়ে ছোট হোক বা বড় হোক, তাতে কিছু এসে যায়না। আর অন্যান্য যাবতীয় জখমের কিসাসও যতটা সম্ভব সমভাবে আদায় করা হবে।

বস্তুত তাওরাতের এই বিধান যদিও আমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য নির্ধারিত ছিলো, তবুও তা আমাদের জন্যও বহাল রয়েছে। কেননা কুরআনে এটা উদ্ধৃত করা ছাড়াও রসূলুল্লাহ সা. নিজেও এটা বহাল বলে ঘোষণা করেছেন। বুখারি ও মুসলিম আনাস বিন মালেক রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : "রুবাই বিনতে নাদার তার এক দাসীর দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছিল। তখন তাদের উপর জরিমানা ধার্য করা হলো। কিন্তু দাসীটির পরিবার পরিজন জরিমানা প্রত্যাখ্যান করে কিসাস না নিয়ে ছাড়বেনা বলে জানালো। রুবাই এর ভাই আনাস রসূলুল্লাহ সা. এর কাছে এসে বললো, "হে রসূলুল্লাহ সা., রুবাইয়ের দাঁত ভাঙ্গা হবে নাকি? আল্লাহর কসম, ওর দাঁত ভাঙ্গবেন না।" রসূলুল্লাহ সা. বললেন, হে আনাস, কিসাস হলো আল্লাহর বিধান। এ পর্যায়ে দাসীর পরিবার ক্ষমা ঘোষণা করলো। তখন রসূলুল্লাহ সা. বললেন : আল্লাহর কোনো কোনো বান্দা এমন রয়েছে, যারা আল্লাহর নামে কসম খেলে আল্লাহ নিজেই কসম পূরণ করেন।"

কিসাসের এই গোটা বিধান ইচ্ছাকৃত অপরাধেই প্রযোজ্য। ভুলবশত বা অনিচ্ছাবশত ঘটে যাওয়া জখমে দিয়াতই নির্ধারিত।

প্রাণহানির চেয়ে লঘুতর অপরাধে কিসাসের শর্তাবলি

প্রাণহানির চেয়ে লঘুতর অপরাধে অপরাধীর জন্যে নিম্নোক্ত শর্তাবলি প্রযোজ্য-

১. সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়া।

২. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। (সর্বনিম্ন পনেরো বা আঠারো বছর বয়স হওয়া অথবা স্বপ্নদোষ হওয়াই প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার জন্য যথেষ্ট। গোঁফ-দাড়ি ও নিম্নাঙ্গের পশম গজানো নিয়ে মতভেদ আছে।)

৩. ইচ্ছাকৃতভাবে অপরাধ করা।

৪. অপরাধের শিকার ব্যক্তির আভিজাত্য ও সামাজিক মর্যাদায় অপরাধীর সমকক্ষ হওয়া। দাসত্ব বা স্বাধীনতা এবং ইসলাম বা কুফরীর মাপকাঠি দিয়েই এই সমকক্ষতা নির্ণয় করা হবে। কাজেই কোনো স্বাধীন মানুষ কোনো গোলামকে এবং কোনো মুসলমান অমুসলমানকে আহত বা অঙ্গহানি করলে কিসাস আদায় করা হবেনা। কেননা উভয়ের মধ্যে সমকক্ষতা অনুপস্থিত। কারণ গোলামের রক্ত স্বাধীনের রক্ত অপেক্ষা এবং অমুসলিমের রক্ত মুসলমানের রক্ত অপেক্ষা নিম্নমানের। এসব ক্ষেত্রে কিসাস ওয়াজিব নয় বলে এর বিকল্প দিয়াত ওয়াজিব। আর যখন গোলাম স্বাধীনকে ও অমুসলিম মুসলমানকে আহত বা অঙ্গহানি করে, তখন অপরাধীর নিকট থেকে কিসাস নেয়া হবে। হানাফিদের মতে, অঙ্গহানির ক্ষেত্রে মুসলমান ও কাফেরের মাঝে কিসাস ওয়াজিব হওয়ায় কোনো ভেদাভেদ নেই। তারা আরো বলেন, নারী ও পুরুষের মাঝে সংঘটিত অপরাধে প্রাণহানির চেয়ে লঘুতর অপরাধে কোনো কিসাস নেই।

অংগ-প্রত্যংগের কিসাস

অঙ্গ-প্রতঙ্গের কিসাস সংক্রান্ত মূলনীতি হলো, যে অঙ্গের সন্ধি বা গ্রন্থি আছে, তাতে কিসাস আছে, যেমন হাতের কনুই ও কবজি। আর যে অঙ্গের সন্ধি বা গ্রন্থি নেই, তাতে কিসাস নেই। কেননা যে অঙ্গে গ্রন্থি আছে, তাতে সমতা রক্ষা সম্ভব। আর যে অঙ্গে গ্রন্থি নেই, তাতে সমতা রক্ষা সম্ভব নয়। যেমন কোনো অপরাধী গোড়া থেকে কারো আঙ্গুল ও কব্জি বা কনুই থেকে হাত কেটে নিলে, কিংবা গিরা থেকে পা কেটে নিলে বা চোখ উপড়ে নিলে, কান বা নাক কেটে নিলে, দাঁত উপড়ে নিলে, পুরুষাঙ্গ কেটে নিলে বা অণ্ডকোষদ্বয় কেটে নিলে, ঠিক সমপরিমাণে কিসাস তার কাছ থেকে আদায় করা হবে।

অংগ-প্রত্যংগের কিসাসের শর্তাবলি

অঙ্গ-প্রতঙ্গের কিসাসের জন্য তিনটে শর্ত পূরণ জরুরি-

১. অবিচারের আশংকা থেকে নিরাপদ হওয়া। যেমন গ্রন্থি বা সন্ধিস্থল থেকে কাটা কিংবা এমন অঙ্গ থেকে কাটা, যার নির্দিষ্ট সীমা আছে, ইতিপূর্বে এর একাধিক উদাহরণ দেয়া হয়েছে। সুতরাং দাঁত ব্যতীত অন্য কোনো হাড় ভেঙ্গে দিলে, বা পেট ফেড়ে দিলে বা হাতের বাহুর একাংশ আহত করলে কিসাস হবেনা। কেননা এসব জিনিসে কিসাস আদায় করলে অবিচার ও অসমতা থেকে নিরাপদ থাকার সম্ভাবনা নেই।

২. নাম ও অবস্থানে সাদৃশ্য : এ কারণে বাম হাতের বদলে ডান হাত, ডান হাতের বদলে বাম হাত, বুড়ো আঙ্গুলের বদলে শাহাদাত আঙ্গুল, বা শাহাদাত আঙ্গুলের বদলে বুড়ো আঙ্গুল কাটা হবেনা। কেননা এতে নামের ক্ষেত্রে সমতা বজায় থাকেনা। উভয় পক্ষ সম্মত হলেও অতিরিক্ত অংশের বদলে মূল অংশ নেয়া যাবেনা। কেননা এতে অঙ্গের অবস্থান ও উপকারিতার দিক দিয়ে সমতা বজায় থাকবেনা। তবে অবস্থান ও প্রকৃতিগতভাবে সমতা থাকলে অতিরিক্ত গ্রহণযোগ্য হবে।

৩. আক্রমণকারী ও আক্রান্তের অঙ্গের পূর্ণতা ও সুস্থতার দিক দিয়ে সমতা। তাই অবশ অঙ্গের বদলে সচেতন অঙ্গ কিংবা যে হাতে সবক'টা আঙ্গুল নেই, তার বদলে পূর্ণাঙ্গ হাত কাটা যাবেনা। তবে এর বিপরীত করা যাবে। সুস্থ হাতের বদলে অবশ হাত কাটা যাবে।

ইচ্ছাকৃত জখমের কিসাস

ইচ্ছাকৃত জখমে কোনো কিসাস ওয়াজিব হয়না। তবে যথার্থ সমানুপাতির কিসাস যদি সম্ভব হয়, তাহলে ওয়াজিব হবে। আক্রমণকারীর দেহে আক্রান্তের জখমের সমান জখম করেই কিসাস আদায় করতে হবে, কমও করা যাবেনা, বেশিও নয়। নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে কিছু বেশি করা, অথবা বেশি করার ঝুঁকি নেয়া অথবা প্রতিপক্ষের কোনো ক্ষতিসাধন করা ছাড়া সম্পূর্ণ সমান কিসাস কার্যকর করা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে কিসাস ওয়াজিব হবেনা, বরং দিয়াত ওয়াজিব হবে। কেননা রসূলুল্লাহ সা. মাথার হাড়ের মধ্য ভাগের ও পেটের জখমে কিসাস রহিত করেছেন। যে সকল জখমের প্রাণঘাতি হওয়ার আশংকা প্রবল, যেমন ঘাড়ের হাড় ভাঙ্গা, পিটের হাড় ভাঙ্গা, উরুর হাড় ভাঙ্গা বা অনুরূপ জখমসমূহও মাথার হাড় ও পেটের জখমের বিধিভুক্ত। মাথার হাড় বের হয়ে যায় এমন ইচ্ছাকৃত জখম ব্যতীত মাথা ও মুখমণ্ডলের কোনো জখমেই কিসাস নেই। মাথা ও মুখমণ্ডলের অন্যান্য জখমের বিধান দিয়াত সংক্রান্ত আলোচনায় আসবে।

জিহ্বার জখমে এবং দাঁত ব্যতীত অন্য কোনো হাড় ভাঙ্গায় কিসাস ওয়াজিব হবেনা। কেননা যুলুম ব্যতীত কিসাস আদায় করা এসব ক্ষেত্রে অসম্ভব।

যদি কেউ কারো পেটে জখম করে, অতপর আক্রান্ত ব্যক্তি তা থেকে নিরাময় লাভ করে। অথবা হাতের বাহুর মাঝখান থেকে কেটে ফেলে, তবে তাকে কিসাস দিতে হবেনা। আক্রান্তের জন্য আক্রমণকারীর হাতের সেই স্থান থেকে কেটে দেয়া বৈধ হবেনা। তবে সে কব্জি থেকে কেটে দিতে পারে। আর অর্ধেক বাহু কাটার বিচার শালিশির মাধ্যমে আদায় করতে পারে। দাঁত ব্যতীত অন্য কোনো হাড় ভাঙ্গলে, অবশ হাত কেটে দিলে, আংগুলবিহীন পা কেটে দিলে, বোবার জিভ কেটে দিলে, চোখ উপড়ে দিলে অথবা হাতের অতিরিক্ত আংগুল কেটে দিলে একজন সৎ ব্যক্তির শালিশীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে।

কর্তনে বা জখমে দলগতভাবে অংশগ্রহণ করলে

এক দল লোক যদি কারো এমন কোনো অঙ্গ কর্তনে বা এমন কোনো জখম করায় অংশ নেয়, যা কিসাসযোগ্য, তাহলে হাম্বলিদের মতে, কে কতটুকু জখম বা কর্তন করলো তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা না গেলে তাদের সকলের উপর কিসাস ওয়াজিব হবে। কেননা আলী রা. এর নিকট দু'জন সাক্ষী এক ব্যক্তি চুরি করেছে বলে সাক্ষ্য দিলো। অমনি তার হাত কেটে দেয়া হলো। এরপর অপর এক ব্যক্তি এলো। তাকে দেখে সাক্ষীদ্বয় বললো, এই লোকই চোর। ইতিপূর্বে আমরা যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছি, তার ব্যাপারে আমরা ভুল করেছি। আলী রা. দ্বিতীয় ব্যক্তি সম্পর্কে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করলেন এবং প্রথম জনের হাত কাটার জন্য তাদের উভয়ের উপর দিয়াত ধার্য করলেন। আলী রা. আরো বললেন, আমি যদি জানতাম যে তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে এ রকম সাক্ষ্য দিয়েছ, তাহলে তোমাদের উভয়ের হাত কেটে দিতাম। আর যদি দলের প্রত্যেকের আঘাত ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়, অথবা তাদের প্রত্যেকে পৃথক পৃথক অঙ্গ কাটে, তাহলে তাদের উপর কোনো কিসাস প্রযোজ্য হবেনা। তবে ইমাম মালেক ও শাফেয়ি বলেন, যখন সম্ভব হবে তাদের কাছ থেকে কিসাস আদায় করা হবে। তাদের অঙ্গগুলো কাটা হবে এবং প্রত্যেক জখমের কিসাস তাদের কাছ থেকে নেয়া হবে, যেমন একটি দল যখন কারো হত্যায় দলগতভাবে অংশ নেবে, তখন তার বদলে তাদের সবাইকে হত্যা করা হবে। হানাফি ও যাহেরি মযহাব

অনুসারে এক হাতের বদলে দু'হাত কাটা হবেনা। সুতরাং দুই ব্যক্তি যখন একজনের হাত কেটে দিবে, তখন তাদের কারো উপর কিসাস প্রযোজ্য হবেনা। বরং উভয়ের উপর অর্ধেক অর্ধেক দিয়াত প্রযোজ্য হবে।

প্রহার, থাপ্পড়, লাথি ও গালির কিসাস

কেউ যদি অপর কাউকে থাপ্পড়, লাথি বা ঘুষি মারে, অথবা প্রহার করে বা গালি দেয়, তাহলে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য আক্রমণকারীর নিকট থেকে কিসাস নেয়া বৈধ হবে। :

... فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ص وَاتَّقُوا اللّٰهَ ○

"যে ব্যক্তি তোমাদের উপর আক্রমণ চালায়, তার উপর ঠিক অনুরূপ আক্রমণ চালাও, যেরূপ সে আক্রমণ চালিয়েছে এবং আল্লাহকে ভয় করো" (সূরা বাকারা : ১৯৪) এবং "মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ।" (সূরা শূরা : ৪০) এভাবেই কিসাসের বিধান চালু রয়েছে।

আক্রান্ত ব্যক্তি কিসাসস্বরূপ যে থাপ্পড়, ঘুষি, প্রহার বা গালি দেবে, তা আক্রমণকারীর দেয়া থাপ্পড়, ঘুষি, প্রহার বা গালির সমান হওয়া শর্ত। কেননা এটাই ন্যায়বিচারের দাবি, যা কায়েম করার জন্য কিসাস প্রবর্তিত হয়েছে। অনুরূপ এটাও শর্ত যে থাপ্পড় যেন চোখে বা এমন কোনো স্থানে না পড়ে, যার কারণে অঙ্গহানির আশংকা থাকে।

গালির কিসাসে বিশেষভাবে এ শর্ত আরোপিত যে, তা যেন নিষিদ্ধ ধরনের গালি না হয়। উদাহরণস্বরূপ, গালিদাতা যদি তাকে কাফের বলে গালি দিয়ে থাকে, তবে তার বদলে কাফের বলে গালি দেয়া যাবেনা। যে মিথ্যাবাদী বলে গালি দেয় তাকে মিথ্যাবাদী বলে গালি দেয়া যাবেনা। যে তার পিতাকে বা মাতাকে অভিশাপ দেয়, তার পিতা বা মাতাকে অভিশাপ দেয়া যাবেনা। কেননা কোনো মুসলমানকে কাফের বা মিথ্যাবাদী বলা ইসলামে প্রথম থেকেই নিষিদ্ধ। তাছাড়া যেহেতু গালিদাতার মা ও বাবা তাকে অভিশাপ দেয়নি বা তিরস্কার করেনি, যার বদলে তার মা ও বাবাকে সে অভিশাপ দেবে বা গালি দেবে। অভিশাপকারীকে কিসাসস্বরূপ অভিশাপ দেয়া যাবে ভর্ৎসনা করা যাবে এবং রূঢ় ভাষা ব্যবহারকারীকে অনুরূপ রূঢ় ভাষায় জবাব দেয়া যাবে।

কুরতুবি বলেছেন : "যে বক্তি তোমার উপর যুলুম করেছে, তাকে তোমার উপর কৃত যুলুমের সমান ফেরতে দেয়ার অধিকার তুমি গ্রহণ করো। যে ব্যক্তি তোমাকে তিরস্কার করে, তাকে তার বলা কথার সমান তিরস্কার করো। যে তোমাকে অপমান করে, তুমিও তাকে অপমান করো। গালি দিতে গিয়ে সীমা লঙ্ঘন করে তার পিতামাতা, ছেলে বা আত্মীয়-স্বজনকেও জড়িত করোনা। তবে সে যদি তোমার বিরুদ্ধে মিথ্য অপবাদ আরোপ করে, তাহলে তার উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করোনা। কেননা একটা গুনাহের বিনিময়ে গুনাহ করা যায়না। উদাহরণস্বরূপ, সে যদি তোমাকে বলে ঃ হে কাফের, তাহলে তাকে তুমি "তুমি কাফের" বলতে পারো। আর যদি সে তোমাকে বলে, "হে ব্যভিচারী", তাহলে তুমি তাকে "হে মিথ্যাবাদী" "হে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা" বলে কিসাস বা প্রতিশোধ নিতে পারো। তুমি যদি তাকে বলো, "হে ব্যভিচারী, তাহলে তুমি মিথ্যাবাদী হয়ে যাবে এবং বলার জন্য গুনাহগার হবে। আর ধনী হয়েও সে যদি বিনা ওযরে তোমার ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করে, তাহলে তাকে বলতে পারো : হে যুলুমকারী, হে জনগণের

সম্পদ গ্রাসকারী।" রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : ধনীর গড়িমসি তাকে অপমান করা ও শাস্তি দেয়াকে বৈধ করে দেয়। তার অপমানের ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে দিয়েছি। আর তার শাস্তি হলো, কারাগারে বন্দী হওয়া। (কুরতুবি, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৬০)

কিল, ঘুষি, থাপ্পড়, প্রহার ও গালিতে কিসাস খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কেরামের আমলে চালু ছিলো। বুখারি আবু বকর রা, আলী রা, ইবনুয যুবাইর ও সুয়াইয়দ বিন মুকররন থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, তারা বড় থাপ্পড় ইত্যাদির কিসাস আদায় করেছেন।

ইবনুল মুনযির বলেছেন : বেত, লাঠি বা পাথরের আঘাত ইচ্ছাকৃত হলে তাতে কিসাস আছে। বুখারিতে আছে : উমর রা. একটি বেত্রাঘাতের কিসাস আদায় করেছেন। আর আলী রা, তিনটে বেত্রাঘাতের কিসাস আদায় করেছেন। শুরাইহ একটি বেত্রাঘাত ও চিমটির পর্যন্ত কিসাস আদায় করেছেন। তবে এ ধরনের কোনো কিছুতেই আঞ্চলিক ফকিহগণ কিসাস শরিয়তসম্মত মনে করেন না। কেননা এগুলোতে সমতা বজায় রাখা প্রায়ই অসম্ভব হয়ে পড়ে। আর কিসাস প্রয়োগ যখন প্রযোজ্য হয় না, তখন তাযীর ওয়াজিব। অবশ্য ইমাম ইবনে তাইমিয়া প্রথম মতটিকে অগ্রগণ্য মনে করেছেন। তিনি বলেন : 'যারা বলেন যে, এসব ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখা অসম্ভব, তাদের জবাব এই যে, যেহেতু এগুলোও অপরাধ, তাই এর কোনো না কোনো শাস্তি থাকা চাই। হয় কিসাস না হয় তাযীর। যখন তাযীরের প্রকৃতি ও পরিমাণ কোনোটাই নির্দিষ্ট নেই, তখন তার চেয়ে অধিকতর নির্দিষ্ট হওয়ার কাছাকাছি কিসাসই অগ্রগণ্য। আর কিসাসেই সাধ্যমত সুবিচার প্রতিষ্ঠিত। এ কথা সুবিদিত যে, প্রহারকারীকে যখন তার প্রহারের মতো বা তার কাছাকাছি পর্যায়ে প্রহার করা হবে, তখন তাকে বেত্রাঘাত দিয়ে যে তাযীর করা হবে তার চেয়ে সুবিচারের নিকটতর হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি যুলুমের ভয়ে এসব ব্যাপারে কিসাস নিষিদ্ধ করে, সে তার চেয়ে বৃহত্তর যুলুমকে ঠিক মনে করে। সুতরাং শরিয়ত যে কিসাস প্রবর্তন করেছে, সেটাই অধিকতর সুবিচার সম্মত এবং আদর্শ স্থানীয়।

সম্পদ বিনাশে কিসাস

যখন কোনো মানুষ অন্যের সম্পদ ধ্বংস করে, যথা- গাছ কাটে, ফসল নষ্ট করে বা ঘরবাড়ি ধ্বংস করে, বা কাপড় পুড়িয়ে দেয়, তখন ক্ষতিগ্রস্ত আক্রান্ত ব্যক্তি কি আক্রমণকারীর নিকট থেকে হুবহু এই সব কাজের মাধ্যমে কিসাস নিতে পারবে?

এ বিষয়ে আলেমদের দুটো মত রয়েছে :

১. এ ক্ষেত্রে কিসাসের কোনো অবকাশ নেই। কারণ এটা একটা ধ্বংসাত্মক ও নাশকতামূলক কাজ, যা শরিয়তে মূলতই নিষিদ্ধ। জমি ও কাপড়ের মধ্যে কোনো সমতা নেই।

২. দ্বিতীয় মত হলো, কিসাস নেয়া বৈধ ও শরিয়ত সম্মত। কেননা প্রাণহানি ও অঙ্গহানি সম্পদ নাশের চেয়ে অনেক বেশি গুরুতর ব্যাপার। সেসব ক্ষেত্রে যখন কিসাস চালু রয়েছে। তখন তার চেয়ে অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সম্পদ বিনাশে কিসাস অগ্রগণ্যতার দাবিদার। তাই আগ্রাসী শক্তি যখন আমাদের সম্পদ যথা ফলবান বৃক্ষ ও ফসল ইত্যাদি ধ্বংস করে, তখন তাদের সম্পদ ধ্বংস করাও আমাদের জন্য বৈধ। অবশ্য বিনা প্রয়োজনে এরূপ করা অনুচিত বলে কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন।

ইবনুল কাইয়েম শেষোক্ত মতটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে বলেন : সম্পদ বিনাশের ঘটনায় যদি দেখা যায়, প্রতিপক্ষ এমন সম্পদ নষ্ট করেছে, যার ক্ষতিসাধন নিষিদ্ধ, যেমন গবাদি

পশু বা দাসদাসী, তাহলে প্রতিপক্ষের এই সম্পদ নষ্ট করে কিসাস নেয়া যাবেনা। আর যদি নিষিদ্ধ সম্পদ না হয়, যেমন কাপড়, যা ছেঁড়া বা কাটা যায়। কিংবা বাসন-কোসন, যা ভাঙ্গা যায়, তাহলে তা ধ্বংস করা যাবেনা, বরং প্রতিপক্ষের কাছ থেকে তার ধ্বংকৃত সম্পদের সমমূল্যের সম্পদ বা মূল্য আদায় করা হবে। তবে কিসাস বা যুক্তির দাবি এই যে, প্রতিপক্ষ যে ধরনের ধ্বংসাত্মক কাজ করে তার ক্ষতিসাধন করেছে, তদ্রূপ ক্ষতি সাধনের অধিকার তারও রয়েছে। সে যেমন তার কাপড় চোপড় ছিঁড়েছে। তেমনি আক্রান্তব্যক্তিও তার কাপড় ছিঁড়তে পারে। সে যেমন তার লাঠি ভেঙ্গেছে, আক্রান্তব্যক্তিও তেমনি তার লাঠি ভাংতে পারবে। অবশ্য সমতা সর্বক্ষেত্রেই বজায় রাখতে হবে। এটাই ন্যায় বিচার। এ থেকে বিরত থাকতে হবে বলে কুরআন ও সুন্নাহর কোনো সুস্পষ্ট বাণী নেই, কিয়াসও নেই, ইজমাও নেই। এটা আল্লাহর হকের জন্যও নিষিদ্ধ নয়। আর প্রাণ ও অংগ প্রতংগের চেয়ে ধন সম্পদ অধিক মর্যাদাসম্পন্ন নয়। তাই শরিয়ত যখন প্রাণ ও অংগ প্রত্যংগের বদলে প্রাণ ও অংগ প্রত্যংগ নষ্ট করার অধিকার দিয়েছে, তখন সম্পদ বিনাশের বিনিময়ে সম্পদ বিনাশের অধিকার আরো বেশি অগ্রগণ্য। আর সমভাবে প্রতিশোধ গ্রহণে যে ক্রোধ প্রশমন ঘটে ও আক্রান্তের মনে যে প্রশান্তি ফিরে আসে, তাতেই কিসাসের যৌক্তিকতা নিহিত। কোনো বিকল্প পন্থায় এ উদ্দেশ্য সফল হয়না। তাছাড়া আক্রান্ত ব্যক্তিকে কষ্ট দেয়া ও তার সম্পদ নষ্ট করা আক্রমণকারীর বিশেষ উদ্দেশ্যও থাকতে পারে। সে যদি তার মূল্য পরিশোধ করে ক্ষতিপূরণ দেয়, তবে তাতে তার হয়তো কোনো কষ্টই হবেনা। কারণ তার অগাধ ধনসম্পদ রয়েছে। তাই এ দ্বারা সে নিজের মনকে প্রবোধ দিতে পারবে। অথচ আক্রান্ত ব্যক্তি মনের ক্ষোভ ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির গ্লানী নিয়েই বেঁচে থাকবে। সুতরাং মূল্য পেয়ে তার গ্লানী ও ক্ষোভের উপশম কিভাবে হবে? যে কষ্ট সে আক্রমণকারীর কাছ থেকে পেয়েছে তার প্রতিশোধ নিয়ে তার মনের প্রশান্তি কিভাবে ফিরিয়ে আনবে?

কাজেই ইসলামী শরিয়তের প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা এই ক্ষতিপূরণের বিপক্ষে। সূরা বাকারার "আক্রমণকারী যেভাবে আক্রমণ করেছে, সেভাবেই তার উপর আক্রমণ কর।" সূরা শূরার "মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ।" এবং সূরা নাহলের :

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَاعُوْقِبْتُمْ بِهٖ ط

"তোমরা যদি শাস্তি দাও, তবে যে রকম অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে, ঠিক তদ্রূপ শাস্তি দাও।" এ সকল উক্তি স্পষ্টত কিসাসের বৈধতাই প্রতিষ্ঠিত করে।

ফকিহগণ আক্রমণধারী কাফেরদের ক্ষেতের ফসল জ্বালিয়ে দেয়া ও তাদের বৃক্ষরাজি কেটে ফেলাকে সম্পূর্ণ বৈধ বলে রায় দিয়েছেন, যখন তারা মুসলমানদের সাথে অনুরূপ আচরণ করে। এটাই যথার্থ বিধি।

সাহাবিগণ কর্তৃক ইহুদীদের খেজুর গাছ ধ্বংসকে আল্লাহ সমর্থন ও অনুমোদন করেছিলেন। কেননা এর মাধ্যমে তাদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হয়েছিল। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ অত্যাচারী আক্রমণকারীর অবমাননা ও লাঞ্ছনাকে পছন্দ করেন। একজন বিশ্বাসঘাতক মুসলমানদের উপর আগ্রাসন চালিয়ে তাদের গনিমতের মাল চুরি করে নিয়েছিল- এই অপরাধে তার সম্পদ জ্বালিয়ে দেয়া যখন বৈধ ছিলো, তখন কেউ যদি কোনো নিরীহ মুসলমানের ধন সম্পদ পুড়িয়ে দেয়, তবে তার সম্পদও পুড়িয়ে দেয়া বৈধ হবে।

আল্লাহর হক আদায় করার ব্যাপারে তিনি অপেক্ষাকৃত উদার হওয়া সত্ত্বেও তাতে যখন আর্থিক দণ্ড বিহিত করেছেন, তখন বান্দার হকের ব্যাপারে আর্থিক দণ্ড বিহিত করবেনই এটা আরো বেশি প্রত্যাশা করা যায়। আল্লাহ মানুষকে অন্যের জান ও মালের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানো থেকে বিরত রাখা ও সতর্ক করার জন্য কিসাস প্রবর্তন করেছেন। অথচ আক্রান্ত ব্যক্তি যুলুমের ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্যে যে কোনো আক্রমণ ও আগ্রাসনে দিয়াত চালু করা যেতো। কিন্তু তিনি ইচ্ছাকৃত আক্রমণে যে কিসাস চালু করেছেন, সেটাই বান্দাদের জন্য অধিকতর কল্যাণকর, তাদের সংশোধনে অধিকতর সহায়ক, আক্রান্তের মনের ক্ষোভ ও গ্লানী-নিরসনে অধিকতর কার্যকর এবং প্রাণ ও অংগ প্রত্যংগের নিরাপত্তার অধিকতর নিশ্চয়তা দানকারী। নচেত কারো বিরুদ্ধে কারো মনে কোনো আক্রোশ থাকলেই সে তাকে হত্যা বা জখম করতো এবং দিয়াত দিয়ে পার পেয়ে যেতো। কিন্তু এটা মানুষের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক মমত্ববোধ, মানুষের স্বার্থ ও কল্যাণবোধ এবং বিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার পরিপন্থী। ধন সম্পদের বিরুদ্ধে আগ্রাসনের ব্যাপারেও অবিকল এই যুক্তি প্রযোজ্য।

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, বিনষ্ট সম্পদের ক্ষতিপূরণ দিলেও এই উদ্দেশ্য পূরণ হবে কিনা? তবে এর জবাব এই যে, আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যদি এতে সন্তুষ্ট হয়, তাহলে সেটা হবে তার দৈহিক ক্ষতিসাধনের পর ক্ষতিপূরণে সম্মত হওয়ার মতোই। তবে এটা শুধুই কেয়াস বা অনুমান। এই মত আহমদ ইবনে হাম্বল ও আহমদ ইবনে তাইমিয়ার। তারা বলেন : ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি স্বাধীন। ইচ্ছা করলে পাল্টা প্রতিপক্ষের একই সম্পদের সমপরিমাণ ক্ষতিসাধন করবে। নচেত তার সমমূল্যের সম্পদ বা মূল্য গ্রহণ করবে।

সমপরিমাণ জিনিস দিয়ে ক্ষতিপূরণ

আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, কেউ কোনো খাদ্য, পানীয় বা ওজন দ্বারা পরিমাপযোগ্য জিনিস নষ্ট করলে একটি জিনিস সমপরিমাণ দিয়ে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আয়েশা রা. বলেন :

আমি সফিয়ার মতো খাদ্য প্রস্তুতকারী আর দেখিনি। তিনি রসূলুল্লাহ সা.-এর জন্য একটা খাবার তৈরি করে পাঠালেন। এতে আমার আত্মসম্মান বোধে এত আঘাত লাগলো যে, আমি কাঁপতে লাগলাম এবং আমার হাত থেকে পাত্রটি পড়ে ভেংগে গেলো। তখন আমি বললাম : হে রসূলুল্লাহ, আমি যে কাজ করেছি এর কাফফারা কী? তিনি বললেন : পাত্রের সমান পাত্র এবং খাবারের সমান খাবার। -আবু দাউদ।

তবে ওজনে বা মাপে পরিমাণ নির্ণয় করা যায়না এমন জিনিস নষ্ট করলে বা ব্যবহার করে শেষ করে ফেললে কী করা যাবে, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। হানাফি ও শাফেয়ি মাযহাব অনুসারে একই জিনিস সমপরিমাণ দিয়ে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। উক্ত জিনিস সমপরিমাণ পাওয়া না গেলেই কেবল মূল্য দেয়া যাবে। এটা সকল জিনিসে ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মালেকি মাযহাব অনুসারে মূল্য দিতে হবে, একই জিনিস সমপরিমাণ নয়।

আহত করা বা সম্পদ লুট করা

যখন কোনো মানুষ অন্য কারো উপর আক্রমণ চালিয়ে আহত করে বা তার সম্পদ লুণ্ঠন করে। তখন আক্রান্ত ব্যক্তির সাধ্যে কুলালে, তার প্রাপ্য নিজেই আদায় করে নিতে পারবে

কিনা? এ ব্যাপারে আলেমদের বিবিধ মত রয়েছে। কুরতুবির মতে এটা বৈধ হওয়াই অগ্রগণ্য। তিনি বলেন : সঠিক মত এটাই যে, এটা বৈধ। যেভাবেই নিজের হক আদায় করা সম্ভব, আদায় করে নিতে পারবে। শুধু এতটুকু সাবধান হতে হবে যে কাজটা চুরি বলে গণ্য না হয়। এটা শাফেয়ি, মালেক, ইবনুল মুনযির ও ইবনুল আরাবির মত। এটা খেয়ানত নয়, বরং নিজের হক আদায় করা। রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : "তোমার ভাই যালেম অথবা মজলুম, যা-ই হোক, তাকে সাহায্য কর।" বস্তুত: যালেমের নিকট থেকে হক আদায় করা তাকে সাহায্য করার শামিল।

একবার আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উতবা রসূলুল্লাহ্ সা. কে বললো : আবু সুফিয়ান ভীষণ কৃপণ। আমার ও আমার সন্তানদের ভরণপোষণে যতোটা অর্থ সম্পদ দরকার, ততোটা দেয়না। তবে তার সম্পদ থেকে আমি তার অজ্ঞাতসারে যা প্রয়োজন নিয়ে নেই। এতে কি আমার কোনো গুনাহ্ হবে? রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন : প্রচলিত রীতি অনুসারে তোমার ও তোমার সন্তানের যতোটা যথেষ্ট হয়, ততোটা নিতে পারো।"

অর্থাৎ কিনা রসূলুল্লাহ্ সা. তাকে তার যতটুকু প্রয়োজন শুধু ততটুকু নেয়ার অনুমতি দিলেন।

তবে যখন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি আক্রমণকারী কর্তৃক লুণ্ঠিত সামগ্রীটি হুবহু না পেয়ে তার অন্য রকম সামগ্রী নাগালে পায়, তখন কী করবে, সে ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একদল বলেন : শাসকের ফায়সালা ব্যতীত নিতে পারবেনা। শাফেয়ির একটি মতে, একই সামগ্রী পেলে যেমন নিতে পারবে, তেমনি অন্য রকম সামগ্রী পেলেও নিতে পারবে। তাঁর অন্য মত হলো, ভিন্ন ধরনের সামগ্রী হলে তা নিতে পারবেনা।

কেউ কেউ বলেন : লুণ্ঠিত সামগ্রীর মূল্য কত জেনে নিতে হবে এবং সেই মূল্যের সমপরিমাণ সামগ্রী নিতে পারবে।

শাসকের নিকট থেকে কিসাস আদায়

কোনো জাতির শাসক সে জাতিরই একজন সদস্য। সমগ্র জাতির উপর যেসব আইন কানুন প্রযোজ্য, তার উপরও সেসব আইন কানুন প্রযোজ্য। জাতির অন্যান্য সদস্যের মাঝে তার বৈশিষ্ট্য শুধু ততটুকু যতটুকু একজন প্রতিনিধি বা দায়িত্বশীলের থাকে। কাজেই শাসক যখন জাতির কোনো সদস্যের প্রতি কোনো অন্যায় করে, তখন তার কাছ থেকে কিসাস আদায় করা হবে। কেননা আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে তার মধ্যে ও অন্যদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আল্লাহর আইন সর্বব্যাপী এবং সকল মুসলমান তার আওতাভুক্ত। আবু নাদরা থেকে বর্ণিত : উমর ইবনুল খাত্তাব রা. একদিন আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন : "হে জনতা, আমি তোমাদের নিকট যেসব শাসক পাঠাই, তোমাদেরকে প্রহার করা বা তোমাদের সম্পদ ছিনিয়ে আনার জন্য তাদেরকে পাঠাইনা। তাদেরকে পাঠাই কেবল তোমাদেরকে তোমাদের দীন শেখাতে ও তোমাদের নবীর সুন্নত শেখাতে। কারো সাথে যদি এ ছাড়া অন্য কিছু করা হয়, তবে সে যেন আমার নিকট অভিযোগ দায়ের করে। আল্লাহর কসম, যার হাতে উমরের জীবন, আমি অবশ্যই তার কাছ থেকে কিসাস আদায় করবো। এ পর্যায়ে আমর ইবনুল আস বললেন : কেউ যদি কোনো প্রজাকে আদব শেখায়, তাহলেও কি আপনি তার কাছ থেকে কিসাস নিবেন? উমর রা. বললেন : হা, আল্লাহর কসম, তাহলেও আমি কিসাস নেবো। আমি কিসাস না নিয়ে কিভাবে পারি? আমি তো রসূলুল্লাহ সা. কেও কিসাস নিতে দেখেছি।" -আবু দাউদ, নাসায়ী।

নাসায়ী ও আবু দাউদ আরো বর্ণনা করেছেন, আবু সাঈদ বিন জুবাইর বলেন : একদিন রসূলুল্লাহ সা. আমাদের মধ্যে একটা জিনিস বন্টন করছিলেন। এই সময় হঠাৎ এক ব্যক্তি তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো। তখন রসূলুল্লাহ সা. তার হাতে থাকা একটা খেজুরের কাঁদির ডগা দিয়ে আঘাত করলেন। সংগে সংগে লোকটি চিৎকার করে উঠলো। তখন রসূলুল্লাহ সা. বললেন : "এসো, আমার কাছ থেকে কিসাস নাও।" লোকটি সংগে সংগে বললো : "হে রসূলুল্লাহ, আমি বরং মাফ করে দিয়েছি।" আর এক ব্যক্তি আবু বকর সিদ্দিক রা. এর নিকট অভিযোগ করলো যে, জনৈক সরকারি কর্মচারী তার হাত কেটে দিয়েছে। আবু বকর বললেন : তুমি যদি সত্য বলে থাক, তবে আমি অবশ্যই তার কাছ থেকে কিসাস আদায় করবো।

অপর এক বর্ণনায় উমর রা. বলেন : আমি রসূলুল্লাহ সা. কে নিজের কাছ থেকে কিসাস দিতে দেখেছি, আবু বকরকে নিজের কাছ থেকে কিসাস দিতে দেখেছি এবং আমি নিজেও নিজের কাছ থেকে কিসাস দিয়ে থাকি।"

স্ত্রীকে আঘাত করলে স্বামীর নিকট থেকে কিসাস নেয়া হবে কি?

ইবনে শিহাব যুহুরি বলেন : প্রচলিত সুন্নত (রীতি) এই যে, স্বামী যদি স্ত্রীকে জখম করে দেয়, তবে তার জন্য তাকে অর্থদণ্ড জরিমানা দিতে হবে, কিসাস নয়।

ইমাম মালেক এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন : ইচ্ছাকৃতভাবে স্বামী যদি স্ত্রীকে আঘাত করে তার চোখ ফুটো করে দেয়, হাত ভেঙ্গে দেয়, আংগুল কেটে দেয় বা অনুরূপ আরি কিছু করে, তাহলে এ জন্য তার কাছ থেকে কিসাস নেয়া হবে। আর যদি স্বামী স্ত্রীকে দড়ি দিয়ে বা বেত দিয়ে প্রহার করে এবং অনিচ্ছা সত্যেও তাতে কোনো জখম হয়ে যায়, তাহলে স্বামী এর ক্ষতিপূরণ বা জরিমানা দেবে, কিসাস নয়।

আল মুসাওয়াতে বলা হয়েছে : আলেমগণ ইমাম মালেকের এই ব্যাখ্যায় একমত।

জখম না সারা পর্যন্ত কোনো কিসাস নয়

আক্রান্ত ব্যক্তির ক্ষতস্থান নিরাময় না হওয়া ও অন্যান্য অংগে ক্ষত ছড়িয়ে পড়বেনা- এ ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আক্রমণকারীর কাছ থেকে কিসাস নেয়া হবেনা। দেহের অন্যান্য অংশে ক্ষত ছড়িয়ে পড়লে আক্রমণকারীকে তারও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। প্রচন্ড গরমে ও তীব্র শীতে কিসাস নেয়া হবেনা, বরং কিসাস বিলম্বিত করা হবে, যাতে কিসাসদাতার তাতে মৃত্যু না ঘটে। প্রচণ্ড গরমে বা শীতে কিসাস নেয়া অথবা ভোতা বা বিষ মাখানো অস্ত্র দিয়ে কিসাস নেয়ার কারণে কোনো বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটলে তার উপর অবশিষ্ট দিয়াত ওয়াজিব হবে। আহমদ ও দারকুতনিতে আমর বিন শুয়াইব থেকে বর্ণিত :

এক ব্যক্তির ঘাড়ে একটা শিং দিয়ে আঘাত করা হলো। তৎক্ষণাত সে রসূলুল্লাহ সা. এর নিকট এলো এবং বললো : আমাকে কিসাস আদায় করে দিন। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তোমার ক্ষত নিরাময় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো। তখন সে চলে গেলো। কয়েকদিন পর আবার এলো এবং বললো : কিসাস আদায় করে দিন। তখন রসূলুল্লাহ সা. কিসাস আদায় করে দিলেন। কয়েকদিন পর লোকটি পুনরায় এসে বললো : হে রসূলুল্লাহ, আমি খোঁড়া হয়ে গিয়েছি। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তোমাকে নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু তুমি আমার

নিষেধ মানোনি। আল্লাহ তোমাকে দূর করে দিন। তোমার খোঁড়া হওয়ার কোনো প্রতিকার আমার কাছে নেই।"

অত:পর রসূলুল্লাহ সা. আহত ব্যক্তির ক্ষত নিরাময় হওয়ার আগে কোনো কিসাস আদায় করতে নিষেধ করে দিলেন। এ হাদিস থেকে ইমাম শাফেয়ি এই সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছেন যে, ক্ষত নিরাময় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা মুস্তাহাব। কেননা রসূলুল্লাহ সা. নিরাময়ের পূর্বেও কিসাস নিতে প্রস্তুত ছিলেন এবং নিয়েছেনও। অন্যান্যদের মতে অপেক্ষা করা ওয়াজিব। নিরাময়ের পূর্বে তিনি যে কিসাস নিয়েছেন, সেটা এর সম্ভাব্য ক্ষতির কথা জানার আগে নিয়েছেন। আক্রমণকারী যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কারো আংগুল কেটে দেয়, অত:পর আহত ব্যক্তি মাফ করে দেয়, কিন্তু মাফ করার পর সেই ক্ষত গোটা হাতের তালুতে ছড়িয়ে পড়ে বা প্রাণঘাতী হয়ে পড়ে, যদি এই ক্ষমা কোনো বিনিময় ছাড়াই হয়ে থাকে তাহলে এর কোনো ক্ষতিপূরণ বা প্রতিকার আদায় করা হবেনা। আর যদি কোনো অর্থের বিনিময়ে ক্ষমা করা হয়ে থাকে, তাহলে আহত ব্যক্তি ক্ষত ছড়িয়ে পড়ার বিনিময়ে দিয়াত পাবে। মাফ করে দেয়া অংশের ক্ষতিপূরণ ছড়িয়ে পড়া ক্ষতের ক্ষতিপূরণ থেকে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট দিয়াত দেয়া হবে।

কিসাস আদায়ের কারণে মৃত্যু ঘটলে

কিসাস আদায়ের কারণে সংঘটিত ক্ষত থেকে যদি কিসাসদাতার মৃত্যু ঘটে তবে তা নিয়ে আলেমদের মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশের মতে এতে কিসাস গ্রহণকারীর উপর কোনো দায় বর্তাবেনা। কেননা সে কোনো সীমালঙ্ঘন করেনি। তাছাড়া যেহেতু চোরের হাত কাটার কারণে তার মৃত্যু ঘটলে সর্বসম্মতভাবে তার দায় কারো ওপর পড়েনা, তাই এ ঘটনাও তদ্রূপ। কিন্তু আবু হানিফা, সাওরি ও ইবনে আবি লায়লার মতে, কিসাসদাতা মারা গেলে কিসাস গ্রহিতার পিতৃসম্পর্কীয় আত্মীয়দের উপর দিয়াত ওয়াজিব হবে। কেননা এটা একটা অনিচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড।

দিয়াত বা রক্তপণ

সংজ্ঞা

অপরাধের কারণে অপরাধ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে বা তার উত্তরাধিকারীকে যে সম্পদ দেয়া বাধ্যতামূলক, তাকে দিয়াত বলে। যে অপরাধে কিসাসের প্রচলন আছে এবং যে অপরাধে কিসাসের প্রচলন নেই, সেই দুই ধরনের অপরাধেই দিয়াত প্রচলিত। আরবে দিয়াতের প্রথা চালু ছিলো। ইসলাম তা বহাল রেখেছে। এর মূল সূত্র নিম্নোক্ত আয়াতে বিদ্যমান :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ج وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَّصَّدَّقُوْا ط فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ط وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ م بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ج فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ز تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

অর্থ : কোনো মুমিনকে হত্যা করা কোনো মুমিনের কাজ নয়। তবে ভুলবশত: করলে সেটা স্বতন্ত্র কথা। কেউ কোনো মুমিনকে ভুলবশত: হত্যা করলে এক মুমিন দাস মুক্ত করবে এবং নিহতের পরিজনবর্গকে রক্তপণ প্রদান করবে, যদি তারা ক্ষমা না করে। নিহত ব্যক্তি যদি তোমাদের শত্রুপক্ষের লোক হয় এবং মুমিন হয়, তবে এক মুমিন দাস মুক্ত করা বিধেয়। আর যদি সে এমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত হয়, যার সাথে তোমরা অংগীকারাবদ্ধ, তবে তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ এবং মুমিন দাস মুক্ত করা বিধেয়। যে সংগতিহীন সে একাদিক্রমে দু'মাস রোযা রাখবে। তওবার জন্য এটা আল্লাহর ব্যবস্থা। আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।" (সূরা নিসা : আয়াত ৯২)

আমর বিন শুয়াইব থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেন : রসূলুল্লাহ সা. এর আমলে দিয়াতের মূল্য দাঁড়াতো আটশো দিনার বা আট হাজার দিরহাম। তখনকার দিনে আহলে কিতাবের দিয়াত ছিলো মুসলমানের দিয়াতের অর্ধেক। উমর রা. এর খেলাফতের পূর্ব পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকে। উমর রা. খলিফা হয়েই এক ভাষণ দিয়ে বললেন : শুনে রাখো, এখন উটের দাম বেড়ে গেছে। অত:পর তিনি স্বর্ণমুদ্রাধারী দেশ সিরিয়া ও মিশরে এক হাজার দিনার, রৌপ্যমুদ্রাধারী দেশ ইরাকে বারো হাজার দিরহাম, গরু পালনকারীদের উপর দুইশো গরু, ছাগল পালনকারীদের উপর দু'হাজার ছাগল এবং যাদের কাপড় দিয়ে দিয়াত দেয়া সুবিধাজনক তাদের উপর দুশো জোড়া পাজামা পাঞ্জাবী অথবা চাদর লুংগী ধার্য করলেন।"

ইমাম শাফেয়ি মিশরে ঘোষণা করলেন : রৌপ্যমুদ্রাধারী বা স্বর্ণমুদ্রাধারীদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক উটের দামই আদায় করা হবে, চাই তার দাম যতই হোক। তবে অগ্রগণ্য মত হলো, রসূলুল্লাহ সা. উট ব্যতিত অন্য কিছু দ্বারা দিয়াত ধার্য করেছেন বলে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি। সম্ভবত: উমর রা. নব উদ্ভূত কোনো অনিবার্য কারণে দিয়াতের আরো কয়েকটি শ্রেণীর প্রচলন করেন।

দিয়াতের উদ্দেশ্য

দিয়াতের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো, সতর্ক করা, অপরাধ প্রবণতা প্রতিহত করা ও জীবনের নিরাপত্তা বিধান করা। এ কারণে দিয়াত এমন হওয়া জরুরি, যা পরিশোধ করা সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তিদের পক্ষে অত্যধিক কষ্টকর ও বেদনাদায়ক হয়। দিয়াতের পরিমাণ যখন বিরাট ও বিপুল হবে, তা দিতে গেলে নিজের সম্পত্তি থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ঘাটতি হবে এবং সে কারণে তা ক্ষতিগ্রস্তদেরকে দিতে গিয়ে খুবই কষ্ট অনুভূত হবে, কেবল তখনই দিয়াত একটি কষ্টকর ও যন্ত্রণাদায়ক জিনিস বলে প্রমাণিত হবে। বস্তুত: দিয়াত এমন একটা কর্মফল, যাতে একাধারে শাস্তি ও ক্ষতিপূরণ উভয়ের সমাবেশ ঘটেছে। -তারিখুল ফিক্‌হ, পৃ: ৮২।

দিয়াতের পরিমাণ

রসূলুল্লাহ সা. নিজেই দিয়াত ধার্য করেছেন ও তার পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। স্বাধীন মুসলমান পুরুষের দিয়াত ধার্য করেছেন উটজীবীদের জন্য একশো উট, গরুজীবীদের জন্য দুশো গরু, ছাগলজীবীদের জন্য দু'হাজার ছাগল, স্বর্ণমুদ্রাধারীদের জন্য এক হাজার দিনার, রৌপ্যমুদ্রাধারীদের জন্য বারো হাজার দিরহাম এবং যাদের জন্য কাপড়ের মাধ্যমে দিয়াত

দেয়া সুবিধাজনক তাদের জন্য দু'শো জোড়া লুংগী-চাদর অথবা পাজামা পাঞ্জাবী। যার উপর দিয়াত দেয়া ওয়াজিব হয়েছে, সে উল্লিখিত শ্রেণীসমূহের মধ্য থেকে যে শ্রেণীর দিয়াত উপস্থিত করবে, নিহতের উত্তরাধিকারীকে তা গ্রহণ করতে হবে, চাই উত্তরাধিকারী উক্ত শ্রেণীর সাথে সংশ্লিষ্ট হোক বা না হোক। কারণ তার নিকট সেই মূল দিয়াতই উপস্থাপন করা হয়েছে, যা ধার্য করা হয়েছে।

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমদ বলেছেন : ইচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত হলো পঁচিশটি এক বছর বয়স্ক উটনী। পঁচিশটি ২ বছর বয়স্কা উটনী, পঁচিশটি ৪ বছর বয়স্কা উট্নী এবং পঁচিশটি পাঁচ বছর বয়স্কা উটনী। আধা-ইচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াতই তাদের উভয়ের মতে অনুরূপ। ভিন্ন বর্ণনা অনুসারে ইমাম শাফেয়ির মতে, ত্রিশটি ৪ বছর বয়স্কা উট্নী, ত্রিশটি পাঁচ বছর বয়স্কা উট্নী, এবং চল্লিশটি গর্ভবতী উট্নী। আর ভুলবশত হত্যার দিয়াত বিশটি পাঁচ বছর বয়স্কা উট্নী, বিশটি চার বছর বয়স্কা উটনী, বিশটি দুই বছর বয়স্কা উট্নী, বিশটি এক বছর বয়স্ক উট ও বিশটি এক বছর বয়স্কা উট্নী। ইমাম মালেক ও শাফেয়ি এক বছর বয়স্ক উটের স্থলে দুই বছর বয়স্ক উট ধার্য করেছেন।

যে হত্যাকাণ্ডে দিয়াত ওয়াজিব হয়

আলেমগণ একমত যে, ভুলবশত হত্যা, আধা ইচ্ছাকৃত হত্যা ও অপ্রাপ্তবয়স্ক অথবা পাগলের হাতে সংঘটিত ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি হচ্ছে দিয়াত। (ইমাম আবু হানিফা ও মালেকের মতে পাগল বা অপ্রাপ্তবয়স্ক কর্তৃক সংঘটিত হত্যাকাণ্ডে হত্যাকারীর পিতৃপক্ষীয় আত্মীয়দের উপর দিয়াত ওয়াজিব হবে। আর ইমাম শাফেয়ির মতে দিয়াত ওয়াজিব হবে অপ্রাপ্তবয়স্কের সম্পত্তিতে।) অনুরূপ, নিহত যখন হত্যাকরীর চেয়ে কম সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোক হবে তখনও ইচ্ছাকৃত হত্যায় দিয়াত ওয়াজিব হবে, যেমন স্বাধীন ব্যক্তি যখন দাসকে হত্যা করে। যে ঘুমন্ত ব্যক্তি পাশ ফিরে শুতে গিয়ে আরেক জনের উপর পড়ে গিয়ে তাকে হত্যা করে, যে জাগ্রত ব্যক্তি উপর থেকে আরেক জনের উপর পড়ে যাওয়ায় সে চাপা পড়ে নিহত হয় এবং যে ব্যক্তি কোনো গর্ত খনন করে ও তাতে পড়ে কেউ মারা যায়, এসব ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি মৃত্যুর কারণ হয়েছে তার উপর দিয়াত ওয়াজিব হবে।

আলী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ সা. আমাকে ইয়ামানে পাঠালেন, আমরা এমন একটা গোত্রের কাছে পৌছলাম যারা সিংহকে আটকে রাখার একটা গভীর কূপ খনন করেছিল। লোকেরা ঐ কূপের পাশে পরস্পরে ধাক্কাধাক্কি করছিল। হঠাৎ একজন কূপে পড়ে যাওয়ার সময় অন্য একজনকে ধরে ঝুলে রইল। অত:পর সেও পড়ে যেতে গিয়ে অন্য একজনকে ধরে ঝুলে রইল। শেষ পর্যন্ত চারজন গর্তের ভেতরে পড়ে গেলো। সিংহটি তাদেরকে ক্ষতবিক্ষত করলো। তখন এক ব্যক্তি একটি বর্শা দিয়ে সিংহটাকে মেরে ফেললো এবং আহত চারজনও সবাই মারা গেলো। তখন মৃত ব্যক্তিদের উত্তরাধিকরীরা পরস্পরে সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলো। তারা অস্ত্র বের করে পরস্পরে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে গেলো। তাদের উত্তেজনা প্রশমিত করতে আলী রা. এসে বললেন : রসূলুল্লাহ সা. জীবিত থাকতে তোমরা যুদ্ধে লিপ্ত হতে যাচ্ছো? আমি তোমাদের বিরোধের একটা নিষ্পত্তি করে দিচ্ছি। তোমরা যদি এটা মেনে নাও তাহলে তো এটাই হবে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি। নচেত তোমরা পরস্পরকে সংযত রাখবে এবং রসূলুল্লাহর সা. কাছে চলে যাবে। তখন তিনিই

তোমাদের বিরোধের চূড়ান্ত ফায়সালা করবেন। যে ব্যক্তি সেই ফায়সালা মানবেনা সে কিছুই পাবেনা। এখন আমি যে ফায়সালা করছি তা হলো : তোমরা যে সকল গোত্র এই কূপ খনন করেছে তাদের কাছ থেকে একটা দিয়াতের এক চতুর্থাংশ, দিয়াতের এক তৃতীয়াংশ, দিয়াতের অর্ধেক ও একটা পূর্ণ দিয়াত একত্রিত করো। এরপর প্রথম জনের বাবদে এক চতুর্থাংশ দিয়াত দেয়া হবে। কেননা সে তিন জনের উপর থেকে মারা গেছে। আর দ্বিতীয় জনের বাবদে দিয়াতের এক তৃতীয়াংশ। তৃতীয়জনের বাবদে দিয়াতের অর্ধেক এবং চতুর্থ জনের বাবদে পূর্ণ দিয়াত দেয়া হবে।

আলী রা.-এর ফায়সালা শোনার পর তারা রসূলুল্লাহ সা. এর কাছে যেতে কৃতসংকল্প হলো। রসূলুল্লাহ সা. যখন মাকামে ইবরাহিমে, তখন তারা তাঁর নিকট উপস্থিত হলো। পুরো ঘটনা শোনার পর রসূলুল্লাহ সা. আলীর ফায়সালা সঠিক বলে ঘোষণা করেন।" (আহমদ, আহমদের আরেক বর্ণনার ভাষা হলো, রসূলুল্লাহ সা. যে সকল গোত্র কূপের পাশে ভিড় করেছিল তাদের উপর দিয়াত ধার্য করলেন।)

আলী বিন রাবাহ লাখমির বর্ণনা থেকে জানা যায়, উমর রা. এর খেলাফতকালে জনৈক চক্ষুষ্মান ব্যক্তি জনৈক অন্ধকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলতো। একদিন তারা উভয়ে একটা কূয়ায় পড়ে গেলো। অন্ধ লোকটি চক্ষুষ্মানের উপর পড়লো এবং চক্ষুষ্মান লোকটি মারা গেলো। উমর রা. অন্ধ লোকটির উপর চক্ষুষ্মান লোকটির দিয়াত ধার্য করলেন (যেহেতু তার কারণেই চক্ষুষ্মানের মৃত্যু হয়েছে) এ কারণে অন্ধ লোকটি হজ্জের মৌসুমে জনতার সামনে নিজের দু:খের কাহিনী বর্ণনা করে কবিতা আবৃত্তি করতো। তাতে সে বলতো : হে জনতা, আমি একটা অন্যায়ের শিকার হয়েছি। একজন অন্ধ কি একজন সুস্থ চক্ষুষ্মান ব্যক্তির হত্যার জন্য দায়ী ও দিয়াত দিতে বাধ্য হতে পারে। তারা দু'জনেই এক সাথে চলতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিল।" (দার কুতনি) একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে : এক ব্যক্তি কিছু সংখ্যক গৃহবাসীর নিকট এসে পিপাসা নিভৃত করতে পানি চাইল। কিন্তু তারা পানি না দেয়ায় লোকটি মারা গেলো। উমর রা. উক্ত গৃহবাসীদের উপর দিয়াত আরোপ করলেন।

কেউ যদি আকস্মিকভাবে কারো কাছে গিয়ে বিকট চিৎকার করে এবং তাতে সে মারা যায়, তবে তার উপর দিয়াত ওয়াজিব হবে। আর যদি কণ্ঠস্বর পাল্টে চিৎকার করে কোনো শিশু বা বালককে ভয় দেখিয়ে পাগল বা বেহুঁশ করে, তাহলে চিৎকারকারী ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।

হালকা ও ভারী দিয়াত

দিয়াত দু'রকমের হয়ে থাকে : হালাক ও ভারী। হালকা দিয়াত ভুলবশত সংঘটিত হত্যায় দিতে হয়। আর ভারী দিয়াত দিতে হয় আধা-ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডে। আর ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডে নিহতের উত্তরাধিকারীরা কিসাস মাফ করে দিলে শাফেয়ি ও হাম্বলিদের মতে ভারী দিয়াত দিতে হবে। কিন্তু ইচ্ছাকৃত হত্যায় ইমাম আবু হানিফার মতে কোনো দিয়াত দিতে হয়না। তাঁর মতে, দুই পক্ষ আপোষ রফার মাধ্যমে যা স্থির করে সেটা দিতে হয় এবং তা তাৎক্ষণিকভাবেই দিতে হয়, বাকি রাখার অনুমতি নেই। ভারী দিয়াত হচ্ছে একশোটা উট, যার মধ্যে চল্লিশটি গর্ভবতী। আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : জেনে রাখো, ইচ্ছাকৃতভাবে বেত, লাঠি ও পাথর

দ্বারা হত্যা করলে তাতে ভারী দিয়াত দিতে হবে : অর্থাৎ একশোটি উটনি, তন্মধ্যে চল্লিশটি ৬ষ্ঠ বছরে পদার্পণকারী থেকে নবম বছরে পদার্পণকারী, যার সবই গর্ভবতী। ভারী দিয়াত উটনি ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে হয়না। কেননা শরিয়তের বিধান এভাবেই রচিত হয়েছে। এখানে কোনো চিন্তাগবেষণার অবকাশ নেই। যেভাবে শ্রুত হয়েছে সেভাবে পালন করতে হবে। এটা সে সব বিধির অন্তর্ভুক্ত, যা অটল ও অকাট্য।

নিষিদ্ধ মাসে নিষিদ্ধ শহরে ও আপন জনের বিরুদ্ধে আক্রমণে ভারী দিয়াত

ইমাম শাফেয়ি প্রমুখের মতে হত্যা ও জখম উভয় ক্ষেত্রে ভারী দিয়াত ধার্য হবে, যদি অপরাধটি নিষিদ্ধ শহরে, নিষিদ্ধ মাসে ও রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়ের উপর সংঘটিত হয়। কেননা শরিয়ত এই নিষিদ্ধ জিনিসগুলোকে কঠোরতর নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছে। তাই অপরাধ গুরুতর হওয়ায় দিয়াতও গুরুতর হবে।

উমর, কাসেম বিন মুহাম্মদ ও ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এসব ক্ষেত্রে দিয়াতে এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ বৃদ্ধি করা হবে। কিন্তু আবু হানিফা ও মালেকের মতে, এসব কারণে দিয়াত ভারী দিয়াতে পরিণত হবেনা। কেননা ভারী দিয়াতে পরিণত করার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। দিয়াত হচ্ছে শরিয়ত প্রণেতার সিদ্ধান্তনির্ভর। যে অপরাধ ভুলক্রমে ঘটে, তাতে দিয়াতকে ভারী দিয়াতে পরিণত করা শরিয়তের মূলনীতির পরিপন্থি।

দিয়াত কার কার উপর ওয়াজিব

হত্যাকারীর উপর বাধ্যতামূলকভাবে আরোপিত দিয়াত দু'প্রকার :

১. অপরাধীর সম্পদের উপর আরোপিত দিয়াত। ইবনে আব্বাস বলেন : "হত্যাকারীর পিতৃসম্পর্কীয় আত্মীয়রা ইচ্ছাকৃত হত্যায় আত্মস্বীকৃত হত্যার ও ইচ্ছাকৃত হত্যার আপোষ মীমাংসায় কোনো দায় বহন করবেনা।" ইবনে আব্বাসের এই মতের বিরোধিতা কোনো সাহাবি করেননি।

ইবনে শিহাব থেকে মালেক বর্ণনা করেন : "ইচ্ছাকৃত হত্যায় যখন নিহতের উত্তরাধিকারীরা কিসাস মাফ করে দেয় তখন শুধুমাত্র হত্যাকারীর সম্পদের উপরই দিয়াত আরোপিত হয়ে থাকে। এটা চিরাচরিত রীতি। তবে পিতৃসম্পর্কীয় আত্মীয়রা যদি স্বত:প্রবৃত্ত হয়ে তাকে সাহায্য করে, তবে সেটা ভিন্ন কথা।"

পিতৃসম্পর্কীয় আত্মীয়দেরকে নিম্নলিখিত তিন ধরনের অবস্থার কোনোটিতেই দিয়াত দিতে হবেনা : ইচ্ছাকৃত হত্যায়, আত্মস্বীকৃত হত্যায় এবং হত্যার পর সন্ধি হলে দিয়াত দিতে হবেনা। কেননা ইচ্ছাকৃত হত্যায় শাস্তি অবধারিত। তাই পিতৃসম্পর্কীয় আত্মীয়রা হত্যাকারীর পক্ষ থেকে দিয়াতের কোনো অংশ বহন করার মাধ্যমে তাকে ছাড় দেয়ার প্রশ্নই ওঠেনা। অনুরূপ আত্মস্বীকৃত হত্যায়ও পিতৃসম্পর্কীয় কারণে ওয়াজিব হয়, খোদ হত্যার কারণে নয়। স্বীকারোক্তি এমন একটা প্রমাণ, যা শুধু স্বীকারোক্তিকারীর উপরই দিয়াত আরোপ করে, অন্য কারো উপর নয়। পিতৃসম্পর্কীয় আত্মীয়রা সন্ধির মাধ্যমে স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রেও দিয়াত দিতে বাধ্য নয়। কারণ সন্ধিতে যে বিনিময় দিতে হয়, তা হত্যার কারণে ওয়াজিব হয়না। বরং ওয়াজিব হয় সন্ধি চুক্তির কারণে। তাছাড়া স্বীকারোক্তির মাধ্যমে অপরাধী নিজেই তার অপরাধের দায় স্বীকার করে। তাই নিহত প্রাণের ক্ষতিপূরণ হন্তার উপরই বর্তায়।

২. আরেক ধরনের দিয়াত হচ্ছে যা হত্যাকারীর উপর ওয়াজিব হয় এবং তার পক্ষে তা বহন করে পিতৃসম্পর্কীয় আত্মীয়রা সহযোগিতা হিসেবে। এটা হচ্ছে আধা ইচ্ছাকৃত হত্যা ও অনিচ্ছাকৃত বা ভুলবশত: হত্যা (অপ্রাপ্তবয়স্ক ও পাগলের ইচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াতও তাদের পিতৃসম্পর্কীয় আত্মীয়দের উপর ওয়াজিব হয়। কিন্তু কাতাদা, আবু সাওর, ইবনে আবি লায়লা ও ইবনে শাবরুমা বলেছেন : আধা ইচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত অপরাধীর সম্পদ থেকেই দেয়া হবে। তবে এই শেষোক্ত মতটি দুর্বল।) এ ক্ষেত্রে হত্যাকারী পিতৃসম্পর্কীয় আত্মীয়দেরই অন্তর্ভুক্ত। কেননা সে হত্যাকারী। কাজেই তাকে এ দলের বহির্ভূত করার কোনো অর্থ হয়না। ইমাম শাফেয়ি বলেন : ভুলবশত হত্যাকারীর উপর দিয়াতের কোনো অংশ ওয়াজিব হয়না। কেননা সে ক্ষমার যোগ্য।

পিতৃসম্পর্কীয় যে আত্মীয়দের উপর আধা ইচ্ছাকৃত হত্যা ও ভুলবশত: হত্যার দিয়াত ওয়াজিব হয়। তাদের মধ্যে কেবল প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্ক ও সচ্ছল পুরুষ আত্মীয়রাই অন্তর্ভুক্ত। বিত্তশালী অন্ধ বিকলাঙ্গ ও বৃদ্ধ ব্যক্তিও এর আওতাভুক্ত। মহিলা, দরিদ্র, অপ্রাপ্তবয়স্ক, অসুস্থ মস্তিষ্ক ও অপরাধীর ধর্মের বিরোধিরা এদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা এর ভিত্তিই হলো সাহায্য। অথচ এই সকল লোক সাহায্য করার যোগ্য নয়।

পিতৃসম্পর্কীয় আত্মীয়দের উপর দিয়াত আরোপের সূত্রপাত কিভাবে হলো, সে সম্পর্কে বুখারি ও মুসলিম আবু হুরায়রা থেকে নিম্নোক্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। রসূল সা. এর আমলে হুযাইল গোত্রের দু'জন মহিলা মারামারি করলো। মারামারিতে একজন আরেকজনকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করে ফেললো। মহিলা তার গর্ভস্থ সন্তানসহই মারা গেলো। তখন রসূলুল্লাহ সা. মহিলার দিয়াত তার পিতৃসম্পর্কীয় আত্মীয়দের উপর অর্পণ করলেন। রসূলুল্লাহ সা. এর আমলে পিতৃসম্পর্কীয় আত্মীয় বলতে হত্যাকারীর গোটা গোত্রকেই বুঝানো হতো। উমর রা. এর আমল পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকে। অবশেষে যখন সেনাবাহিনী ও বেসরকারি প্রশাসন পুরোমাত্রায় গঠিত হলো। তখন বেসরকারী প্রশাসনের উপরই দিয়াতের দায় অর্পিত হলো। অথচ রসূলুল্লাহ সা. এর আমলে এর বিপরীত ব্যবস্থা চালু ছিলো। উমর রা. যে ব্যবস্থা চালু করলেন, তার সমর্থনে সারাখসি বলেন : যদি প্রশ্ন করা হয়, কিভাবে রসূলুল্লাহ সা. এর ফায়সালার পরিপন্থি ব্যবস্থায় সাহাবীগণ একমত হয়ে গেলেন? তবে এর জবাবে বলবো : এটা রসূলুল্লাহ সা. এর সিদ্ধান্তের সমন্বয়ের উপর সাহাবীদের মতৈক্য। কেননা তারা জানতেন, রসূলুল্লাহ সা. গোত্রের নিকট দিয়াতের ভার অর্পণ করেছেন কেবল এ জন্য যে, এতে কিছু সাহায্য পাওয়া যাবে। আর সেকালে মানুষ তার গোত্রের মাধ্যমেই শক্তি ও সাহায্য লাভ করতো। পরে যখন উমর রা. রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থাকে সংগঠিত করলেন, তখন যাবতীয় শক্তির উৎস হয়ে উঠলো রাষ্ট্রীয় প্রশাসন। পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত এই পর্যায়ে গড়ালো যে, লোকেরা নিজ প্রশাসনের পক্ষ হয়ে নিজ গোত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করতো। এটা হানাফিদের অভিমত। কিন্তু মালেকি ও শাফেয়িগণ এই মত প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ রসূলুল্লাহ সা. এর পরে শরিয়তের প্রতিষ্ঠিত কোনো বিধি রহিত করার সুযোগ নেই। রসূলুল্লাহ সা. এর আমলে যে সকল বিধিব্যবস্থা কার্যকর ছিলো, তা পরিবর্তন করার অধিকার কারো নেই।

পিতৃসম্পর্কীয় আত্মীয়দের উপর যে দিয়াত ওয়াজিব হয়, আলেমদের সর্বসম্মত মতানুসারে তা তিন বছরে পরিশোধ করা যায়। কিন্তু যে দিয়াত হত্যাকারীর সম্পদ থেকে দেয়া ওয়াজিব, তা ইমাম শাফেয়ির মতে তাৎক্ষণিকভাবে দিতে হবে। হানাফিদের মতে, এটাও

ভুলবশত: সংঘটিত হত্যার দিয়াতের মতো তিন বছরে পরিশোধযোগ্য। আধা-ইচ্ছাকৃত ও ভুলবশত: হত্যার দিয়াত পিতৃসম্পর্কীয় আত্মীয়দের উপর ওয়াজিব করাটা ইসলামের সাধারণ মূলনীতির ব্যতিক্রম। মূলনীতিটি হলো : মানুষ শুধু তার নিজের কাজের জন্য দায়ী এবং নিজের কার্যকলাপের জন্যই তাকে হিসেব দিতে ও জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ বলেন :

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى . "কেউ অন্য কারো ভার বহন করবেনা।" আর রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "কাউকে তার পিতার বা ভাই এর পাপের জন্য দায়ী করা হবেনা।" -নাসায়ী।

পিতৃসম্পর্কীয় আত্মীয়দেরকে এ ক্ষেত্রে দিয়াতে অংশ গ্রহণের বিধান ইসলাম শুধু অপরাধীর প্রতি সহানুভূতি ও তার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই জারি করেছে। কেননা সে এমন একটি অপরাধে জড়িত, যা সে ইচ্ছাকৃতভাবে করেনি। এটা ঐতিহ্যবাহী আরবীয় সমাজব্যবস্থা বহাল রাখার জন্যই করা হয়েছে। সেখানে প্রতিটি গোত্রের অভ্যন্তরে যে পারস্পরিক সাহায্য, সহযোগিতা ও অংশিদারিত্ব বিরাজ করতো, তার পরিপ্রেক্ষিতে এটা ছিলো উক্ত সমাজব্যবস্থার বাস্তব দাবি। এর যৌক্তিকতা সুস্পষ্ট। গোত্র যখন উপলব্ধি করবে যে, গোত্রের কোনো সদস্য দ্বারা এ অপরাধ সংঘটিত হলে সমগ্র গোত্রকে তার দিয়াতের ভার বহনে শরিক হতে হবে, তখন গোত্র সর্বদা সচেষ্ট থাকবে তার আওতাধীন প্রতিটি লোককে অপরাধ থেকে নিবৃত্ত রাখতে এবং তাদেরকে এমন নির্মল জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করবে যা তাদেরকে ভুলভ্রান্তি থেকে মুক্ত রাখবে।

ফকিহদের অধিকাংশের মত হলো, পিতৃসম্পর্কীয় আত্মীয়রা ভুলবশত: সংঘটিত অপরাধের দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশের অতিরিক্ত দায়িত্ব নেবে, আর এক-তৃতীয়াংশের কম হলে তা অপরাধীর সম্পত্তি থেকে দেয়া হবে। (ইমাম শাফেয়ি বলেছেন : অপরাধ ছোট হোক বা বড় হোক, ভুলবশত:কৃত অপরাধের দিয়াত পিতৃসম্পর্কীয় আত্মীয়দেরকেই পুরো বহন করতে হবে। অনুরূপ ইচ্ছাকৃত অপরাধের দিয়াত পুরোপুরি অপরাধীর সম্পত্তি থেকেই দেয়া হবে, তা কম হোক বা বেশি হোক।)

মালেক ও আহমদ রা. এর মতে, পিতৃসম্পর্কীয় আত্মীয়দের কারো উপর দিয়াতের কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ ওয়াজিব হয়না। শাসক চেষ্টা করবেন তাদের প্রত্যেকের উপর ততখানি আরোপ করতে, যতখানি তার পক্ষে দেয়া সহজ হয়। আর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় দিয়ে শুরু করবেন এবং তারপর অবশিষ্টদের মধ্যে যেজন ঘনিষ্ঠতর, তারপর যেজন ঘনিষ্ঠতর, এভাবে পর্যায়ক্রমে বণ্টন করবেন।

ইমাম শাফেয়ি বলেন : পিতৃসম্পর্কীয় আত্মীয়দের মধ্যে ধনীর উপর এক দিনার, দরিদ্রের উপর আধা দিনার। তার মতে, দিয়াত আত্মীয়দের উপর তাদের ঘনিষ্ঠতা অনুযায়ী ধার্য হবে। সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ হলো বাবার সন্তানেরা, তারপর দাদার সন্তানেরা, তারপর বাবার সন্তানদের সন্তানেরা। আর হত্যাকারীর যদি কোনো পিতৃসম্পর্কীয় আত্মীয় বংশের ভেতর বা মিত্রদের ভেতর না থেকে থাকে তাহলে দিয়াতের ভার পড়বে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের উপর। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "যার কোনো অভিভাবক নেই, তার অভিভাবক আমি।" অনুরূপ অপরাধী যদি দরিদ্র হয় এবং তার পরিবারও যদি দরিদ্র হয় এবং দিয়াত বহনে অক্ষম হয়, তাহলে বাইতুলমাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগারই দিয়াতের দায়িত্ব বহন করবে।

যুদ্ধের সময় যদি মুসলমানরা কাউকে কাফের ভেবে হত্যা করে, অত:পর জানা যায় যে,

সে মুসলমান, তাহলে তার দিয়াত বাইতুলমাল থেকে দেয়া হবে। কেননা ইমাম শাফেয়ি প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, হুযাইফার পিতা ইয়ামানের দিয়াত রসূলুল্লাহ সা. পরিশোধ করেছিল। মুসলমানরা ওহুদ যুদ্ধে তাকে চিনতে না পেরে হত্যা করেছিল। ভিড়ের চাপে কেউ মারা গেলে তার দিয়াতও বাইতুলমাল থেকে দেয়া হবে। মুসাদ্দাদ বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি জুমার দিনে ভিড়ের চাপে মারা গেলো। আলী রা. বাইতুলমাল থেকে তার দিয়াত পরিশোধ করলেন। তবে হানাফিদের মতে, বর্তমান যুগে দিয়াত অপরাধীর সম্পত্তি থেকেই দেয়া হবে। দুররুল মুখতার গ্রন্থে বলা হয়েছে : "পারস্পরিক সহযোগিতা ও সাহায্যই এর ভিত্তি। এটা যেখানে বিদ্যমান, সেখানে পিতৃসম্পর্কীয় আত্মীয়দের দিয়াত প্রদান চলবে। যেখানে তা নেই, সেখানে চলবেনা।" আর যেখানে কোনো গোত্রও নেই, পারস্পরিক সাহায্যও নেই, সেখানে দিয়াত পরিশোধ করবে বাইতুলমাল । আর বাইতুলমাল না থাকলে দিয়াত দেয়া হবে অপরাধীর সম্পত্তি থেকে। ইবনে তাইমিয়ার মতে, পিতৃসম্পর্কীয় আত্মীয়দের দিয়াত প্রদান অসম্ভব হলে যার দ্বারা ভুলক্রমে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তার সম্পত্তি থেকেই দেয়া হবে।

অংগ প্রত্যংগের দিয়াত

মানুষের অংগ প্রত্যংগ তিন রকমের : একক অংগ, জোড়া অংগ, দুই এর অধিক অংগ। একক অংগের উদাহরণ হলো : নাক, জিহ্বা ও পুরুষাংগ। আর জোড়া অংগের উদাহরণ চোখ, কান, ঠোঁট, গাল, হাত পা, অণ্ডকোষ, স্তন, নিতম্ব ও ভ্রু ইত্যাদি।

কেউ যখন অন্য কারো একক বা জোড়া অংগ পুরো আহত করতঃ নষ্ট করে দেয়, তখন পুরো দিয়াত ওয়াজিব হবে। আর যখন জোড়া অংগের একটা নষ্ট করে তখন অর্ধেক দিয়াত ওয়াজিব হবে। সুতরাং নাক আহত করে নষ্ট করলে পুরো দিয়াত ওয়াজিব হবে। কেননা নাকের কাজ হলো নাসারন্ধ্রে ঘ্রাণ সঞ্চয় করা, অত:পর তা মস্তিষ্কে তুলে নেয়া। এ কাজটা সম্পূর্ণই বন্ধ হয়ে যায় নাকের উপরের নরম অংশটি কেটে দিলে। অনুরূপ কেউ জিহ্বা কেটে নিলে পুরো দিয়াত ওয়াজিব হবে। কেননা যে বাকশক্তি দ্বারা মানুষ বাকশক্তিহীন পশু থেকে পৃথক হয়, সেটাই তাতে লোপ পায়। বাকশক্তি হচ্ছে এমন একটা পরম কাঙ্ক্ষিত সুবিধা, যার অভাবে মানুষ সকল স্বার্থ ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। এ দ্বারাই সে অন্যদেরকে নিজের উদ্দেশ্য জানাতে পারে ও নিজের মনোভাব ব্যক্ত করতে পারে। অনুরূপ, জিহ্বার অংশ বিশেষ কেটে নিলে যদি মোটেই কথা বলতে না পারে, তবে সে ক্ষেত্রেও পুরো দিয়াত ওয়াজিব হবে। কারণ পুরো জিহ্বা কেটে নিলে যেমন তার উপকারিতা লোপ পায়, অংশ বিশেষ কেটে নেয়াতেও তদ্রূপ ক্ষতি সাধিত হয়েছে। যার জিহ্বা কাটা হয়েছে, সে যদি কিছু অক্ষর উচ্চারণ করতে পারে, আর কিছু অক্ষর উচ্চারণ করতে না পারে, তাহলে অক্ষরের সংখ্যা অনুপাতে দিয়াত নির্ধারিত হবে। আলী রা. থেকে বর্ণিত : তিনি অক্ষর অনুপাতে দিয়াত নির্ধারণ করেছিলেন। যে কটা অক্ষর সে উচ্চারণ করতে সক্ষম, সে ক'টা অনুপাতে দিয়াতের পরিমাণ হ্রাস করেন। আর যে ক'টা অক্ষর উচ্চারণে অক্ষম, সে ক'টার বাবদ দিয়াত আরোপ করেন।

পুরুষাংগের শুধু অগ্রভাগ কেটে ফেললেও পুরো দিয়াত দিতে হবে। কেননা সহবাস ও প্রস্রাব ধরে রাখার কাজ এই অংশ দিয়েই সম্পন্ন হয়। যদি কারো পিঠে আঘাত করা হয় এবং তার ফলে সে চলতে অক্ষম হয়, তাহলেও পুরো দিয়াত ওয়াজিব হবে। দুই চোখ নষ্ট

করলে পুরো দিয়াত এবং এক চোখ নষ্ট করলে অর্ধেক দিয়াত। দুই পলককে আহত করলে পুরো দিয়াত, এক চোখের দুই পলক আহত করলে অর্ধেক দিয়াত, এক চোখের এক পলক আহত করলে এক-চতুর্থাংশ দিয়াত। দুই কানে পুরো দিয়াত, এক কানে অর্ধেক দিয়াত। দুই ঠোঁটে পুরো দিয়াত ও এক ঠোঁটে অর্ধেক দিয়াত ওয়াজিব, চাই নিচের ঠোঁট হোক বা উপরের ঠোঁট হোক। দুই হাতের জন্য পুরো দিয়াত, এক হাতের জন্য অর্ধেক দিয়াত। দুই পায়ের জন্য পুরো দিয়াত। এক পায়ের জন্য অর্ধেক দিয়াত, দুই পায়ের আঙ্গুলগুলোর জন্য পুরো দিয়াত, দুই হাতের আঙ্গুলগুলোর জন্য পুরো দিয়াত এবং প্রত্যেক আঙ্গুলের জন্য দশটা উট (অর্থাৎ দিয়াতের এক-দশমাংশ) ওয়াজিব। আঙ্গুলে কোনো পার্থক্য নেই। বুড়ো আঙ্গুল ও কনিষ্ঠ আঙ্গুল ও অন্যান্য আঙ্গুল সব সমান। হাত পায়ের আঙ্গুলগুলোর প্রত্যেক আঙ্গুলের অগ্রভাগের জন্য দিয়াতের এক দশমাংশের এক-তৃতীয়াংশ ওয়াজিব। প্রত্যেক আঙ্গুলে তিনটে জোড়া থাকে। কিন্তু বুড়ো আঙ্গুলে দুটো জোড়া। প্রত্যেক জোড়ায় দিয়াতের এক-দশমাংশের অর্ধেক ওয়াজিব। অণ্ডকোষদ্বয়ের জন্য পূর্ণ দিয়াত এবং এর একটিতে অর্ধেক দিয়াত ওয়াজিব। নিতম্বদ্বয়ের জন্য এবং পুরুষ বা স্ত্রীর উভয় স্তনের জন্য পূর্ণ দিয়াত, আর এর একটির জন্য অর্ধেক দিয়াত ওয়াজিব। সবক'টি দাঁতের জন্য পূর্ণ দিয়াত এবং প্রত্যেক দাঁতের জন্য পাঁচটি উট ওয়াজিব। সকল দাঁত সমান।

অংগ প্রত্যংগের উপকারিতা বাবদ দিয়াত

প্রহারের দরুন কারো মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটলে পূর্ণ দিয়াত ওয়াজিব হবে। কেননা মস্তিষ্কই মানুষকে পশু থেকে পৃথক করে। অনুরূপ কোনো ইন্দ্রিয়, যেমন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, ঘ্রাণশক্তি, আস্বাদনশক্তি বা বাকশক্তি পুরোপুরি বিলুপ্ত হলেও পুরো দিয়াত ওয়াজিব হবে। কেননা এই ইন্দ্রিয়গুলোর প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক কাঙ্ক্ষিত উপকারিতা রয়েছে এবং এগুলো সংশ্লিষ্ট মানুষটির সৌন্দর্য ও জীবনের পূর্ণতা সাধনের উপকরণ। জনৈক ব্যক্তি অপর একজনকে প্রহার করার কারণে তার শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, বোধশক্তি ও ঘ্রাণশক্তি লোপ পাওয়ায় উমর রা. প্রহারকারীর উপরে চারটা পূর্ণ দিয়াত আরোপ করেন। অথচ আহত লোকটি জীবিত ছিলো।

যখন দুই চোখের একটির দৃষ্টিশক্তি অথবা দুই কানের একটির শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়, তখন অর্ধেক দিয়াত ওয়াজিব হয়, চাই অপরটি সুস্থ থাক বা না থাক।

মহিলার উভয় স্তন আহত করলে পূর্ণ দিয়াত ও একটি আহত করলে অর্ধেক দিয়াত ওয়াজিব হবে। আর এক চোখ কানার ভালো চোখটি নষ্ট করে দিলে পূর্ণ দিয়াত দিতে হবে। উমর, উসমান, আলী ও ইবনে উমর এরূপ ফায়সালা করেছেন এবং কোনো সাহাবী তাদের বিরোধিতা করেনি। কেননা যার এক চোখ অন্ধ, তার সুস্থ চোখ দিয়ে দুই চোখের কাজ হয়ে থাকে। তাই সেই সুস্থ চোখটি নষ্ট হওয়া উভয় চোখ নষ্ট হওয়ার সমান। মাথার সমস্ত চুল, সমস্ত দাড়ি, উভয় ভ্রু ও উভয় চোখের পাতার সমস্ত চুল কেটে দিলে পূর্ণ দিয়াত দিতে হবে। আর একটি ভ্রুর চুল কাটলে অর্ধেক দিয়াত ওয়াজিব হবে। এক চোখের পাতার চুলে সিকি দিয়াত দিতে হবে। আর গোঁফের ব্যাপারটি বিচারকের মতামতের উপর ন্যস্ত করতে হবে।

মাথা ও মুখমন্ডলে যখমের দিয়াত

মাথা ও মুখমণ্ডলে আঘাত দশ প্রকারের। তন্মধ্যে নয়টিই কিসাসবিহীন। একমাত্র 'মুযিহা' অর্থাৎ হাড় বেরিয়ে যাওয়া জখম যদি ইচ্ছাকৃত হয়, তবে, তাতে কিসাস কার্যকর হবে। এই যখমগুলা নিম্নরূপ :

১. খারেসা : সামান্য চামড়া ছিন্ন হওয়া।

২. বাযেয়া : চামড়া ছিন্ন হয়ে কিঞ্চিৎ গোশতও ছিন্ন হওয়া।

৩. দামিয়া বা দামেগা : যে যখমে রক্ত প্রবাহিত হয়।

৪. মুতালাহিমা : গোশতের ভেতরে গভীর ক্ষত।

৫. সামহাক : যে ক্ষতে হাড়ের উপর পাতলা আবরণ বহাল থাকে।

৬. মুযিহা : যে ক্ষতে হাড়ে আবরণ থাকেনা। হাড় বের হয়ে যায়।

৭. হাঁশেমা : যে ক্ষত হাড় ভেংগে চূর্ণ হয়ে যায়।

৮. মুনকিলা : যে ক্ষতে হাড় এতটা চূর্ণ ও দৃষ্টিগোচর হয় যে তা স্থানান্তরিত হয়ে যায়।

৯. মামুমা বা আম্মাহ : মাথার চামড়ায় যে ক্ষত সৃষ্টি হয়।

১০. জায়েফা : পেটে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়।

মুযেহা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষতে একজন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ বিচারকের ফায়সালা অনুসরণ করা হবে। কারো কারো মতে, চিকিৎসকের ফি দিতে হবে। মুযেহা ইচ্ছাকৃত হলে তাতে কিসাস দিতে হবে। আর অনিচ্ছাকৃত হলে দিয়াতের এক-দশমাংশের অর্ধেক দিতে হবে, চাই ক্ষত ছোট হোক বা বড় হোক। দিয়াতের এক-দশমাংশের অর্ধেক বলতে পাঁচটা উট বুঝায়। আমর ইবনে হাযমের নিকট রসূলুল্লাহ সা. যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন তা থেকে এটা প্রমাণিত হয়। মুযেহা যদি একাধিক হয়, তবে তার প্রত্যেকটি বাবদ পাঁচটা করে উট দিতে হবে। মাথা ও মুখ ব্যতীত অন্য কোথাও মুযেহা হলে একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির শালিশীর মাধ্যমে তার নিষ্পত্তি করা হবে। আর হাশেমাতে একটা দিয়াতের এক-দশমাংশ অর্থাৎ দশটা উট দিতে হবে। যায়দ বিন ছাবেত থেকে এর বর্ণনা পাওয়া যায়, যার বিরোধিতা কোনো সাহাবী করেননি। মুনকিলাতে এক-দশমাংশ ও এক-দশমাংশের অর্ধেক অর্থাৎ পনেরোটা উট। আম্মা বা মামুমাতে সর্বসম্মতভাবে দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ। আর জায়েফাতেও সর্বসম্মতভাবে দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ। জখম যদি পেটের গভীরে পৌঁছে যায় তবে তাকে দু'টো জায়েফা ধরা হবে এবং দিয়াতের দুই-তৃতীয়াংশ দিতে হবে।

নারীর দিয়াত

ভুলক্রমে যখন কোনো নারীকে হত্যা করা হয় তখন পুরুষের দিয়াতের অর্ধেক ওয়াজিব হবে। নারীর অংগ প্রত্যংগ আহত হলে ও অন্যান্য স্থানে যখম হলেও পুরুষের যখমের দিয়াতের অর্ধেক দিতে হবে। এটাই অধিকাংশ আলেমের অভিমত। উমর রা, আলী রা, ইবনে মাসউদ রা. ও যায়দ বিন ছাবেত রা. বলেছেন : নারীর দিয়াত পুরুষের দিয়াতের অর্ধেক। এ বিষয়ে উক্ত চার সাহাবীর মতের বিরোধিতা আর কেউ করেননি। সুতরাং এটা একটা ইজমা। তাছাড়া যেহেতু নারী সাক্ষ্যদানে ও উত্তরাধিকার প্রাপ্তিতে পুরুষের অর্ধেক গণ্য হয়ে থাকে, তাই এখানেও তদ্রূপ হবে। আবার অন্যেরা বলেন : দিয়াতে নারী ও পুরুষ এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সমান, অত:পর অন্যান্য ক্ষেত্রে নারী পুরুষের অর্ধেক। নাসায়ী

ও দার কুতনি বর্ণনা করেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশে পৌঁছা পর্যন্ত নারী ও পুরুষের দিয়াত সমান। মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক ও বায়হাকিতে বর্ণিত, রবীয়া ইবনে আব্দুর রহমান বলেন : আমি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াবকে জিজ্ঞাসা করলাম, "নারীর আঙ্গুলে কত দিয়াত?" তিনি বললেন : দশটা উট।

আমি বললাম : দুইটা আঙ্গুলে? তিনি বললেন : বিশটা উট।

আমি বললাম : তিনটাতে? তিনি বললেন ত্রিশটা উট।

আমি বললাম : চারটাটে? তিনি বললেন : বিশটা উট।

আমি বললাম : যখন তার যখম আরো বড় হলো ও তার বিপদ আরো কঠিন হলো, তখন কি তার বুদ্ধি কমে গেলো?

সাঈদ বললেন : তুমি কি ইরাকের অধিবাসী? (ইরাকিরা তার্কিক বলে খ্যাতি ছিলো।) আমি বললাম : বরং একজন আলেম অথবা একজন জ্ঞানপিপাসু অজ্ঞ ব্যক্তি।

সাঈদ বললেন : হে আমার ভাতিজা, এটাই সুন্নত।"

ইমাম শাফেয়ি এই মতটির পর্যালোচনা করে বলেছেন : এখানে সুন্নত দ্বারা সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব যায়দ বিন ছাবেতের প্রচলিত সুন্নত বা রীতি বুঝিয়েছেন। রসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নত নয়। ইমাম শাফেয়ি বলেন : "সাধারণভাবে সুন্নত দ্বারা তো রসূলুল্লাহর সা.-এর সুন্নতই বুঝানো হয়। কিন্তু জানা যায়, শীর্ষ স্থানীয় সাহাবীগণ এই মতের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েছেন। এটা যদি রসূলুল্লাহ সা. এর সুন্নত হতো, তাহলে তারা এর বিরোধিতা করতেন না। তাছাড়া এ মতটি যেহেতু একটি অবাস্তব বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত করে, অর্থাৎ যখম যখন অধিকতর কষ্টদায়ক ও মারাত্মক হয়, তখন তার দিয়াত কমে যাওয়া, তাই এটা রসূলুল্লাহর সা. সুন্নত হতে পারেনা। কেননা রসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নত থেকে শরিয়তের যৌক্তিকতা প্রতিভাত হয়। এ মতটিকে রসূলুল্লাহ সা. এর সুন্নত বলে পরিচয় দেয়া চলেনা। কেননা শরিয়ত একটা অপরাধীকে শাস্তিবিহীন ঘোষণা করবে- এটা অসম্ভব।

আহলে কিতাবের দিয়াত

ভুলবশত আহলে কিতাবের কেউ নিহত হলে তার দিয়াত মুসলমান নিহত হলে যে দিয়াত ওয়াজিব হয় তার অর্ধেক ওয়াজিব হবে। পুরুষ হলে মুসলমান পুরুষের দিয়াতের অর্ধেক, আর নারী হলে মুসলিম নারীর দিয়াতের অর্ধেক। ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন : রসূলুল্লাহ সা. ফায়সালা করেছেন, আহলে কিতাবের দিয়াত মুসলমানের দিয়াতের অর্ধেক, যখমের দিয়াতেও তেমনি। এটা ইমাম মালেক ও উমর ইবনে আব্দুল আযিযের অভিমত। আর আবু হানিফা, সাওরি, উমর রা. উসমান রা. ও ইবনে মাসউদ রা. এর মতে, আহলে কিতাবের দিয়াত মুসলমানদের দিয়াতের সমান। কারণ আল্লাহ বলেন :

وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

"আর যদি সে (নিহত ব্যক্তি) এমন সম্প্রদায়ভুক্ত হয়, যার সাথে তোমরা অংগীকারাবদ্ধ, তবে তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ ও মুমিন দাস মুক্ত করা বিধেয়।"

ইমাম ইবনে শিহাব যুহরী বলেছেন : ইহুদি, খৃস্টান ও যে কোনো অনুগত অমুসলিম নাগরিকের দিয়াত মুসলমানের দিয়াতেরই মতো। রসূলুল্লাহ সা. আবু বকর, উমর,

উসমান ও আলী রা.-এর আমলেও এ রকমই ছিলো। যখন মুয়াবিয়ার যুগ এলো, তখন তিনি অমুসলিমদের দিয়াতের অর্ধেক বাইতুলমালে জমা করতে লাগলেন এবং বাকি অর্ধেক নিহতের পরিজনকে দিতে লাগলেন। পরে উমর ইবনে আব্দুল আযীয অর্ধেক দিয়াত আদায়েরই সিদ্ধান্ত নিলেন এবং মুয়াবিয়া যে অর্ধেক বাইতুলমালের জন্য নিতেন, তা বাতিল করলেন। কিন্তু অনুগত অমুসলিম নাগরিক (যিম্মী) দের দিয়াত যে পূর্ণ দিয়াত ছিলো, সে কথা উমর ইবনে আব্দুল আযীযকে স্মরণ করিয়ে দেয়া আমার নসিবে হয়নি।"

ইমাম শাফেয়ির মতে, আহলে কিতাব ও যিম্মীদের দিয়াত মুসলমানের দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ, আর চুক্তিবদ্ধ ও আশ্রয় প্রার্থী মুশরেক ও অগ্নি উপাসকের দিয়াত মুসলমানের দিয়াতের এক-দশমাংশের দুই-তৃতীয়াংশ। অর্থাৎ কিনা মূল দিয়াত যেখানে বারো হাজার দিরহাম, সেখানে দিতে হবে আটশো দিরহাম। উমর রা., উসমান রা. ও ইবনে মাসউদ রা. বলেন : যিম্মী ও আহলে কিতাবের মহিলাদের দিয়াত এর অর্ধেক। ইবনে আব্বাস, শা'বি, নাখয়ি, শাফেয়ি ও তাবারির মতে, যিম্মী ও চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম হত্যায় দিয়াতের সাথে কাফফারাও দিতে হবে।

গর্ভস্থ সন্তানের দিয়াত

গর্ভবতী মহিলার উপর ইচ্ছাকৃত বা ভুলবশত আঘাতের ফলে গর্ভস্থ সন্তান মারা গেলে ও গর্ভধারিণী মারা না গেলে "গাররা" তথা মধ্যম মানের দিয়াত দেয়া ওয়াজিব হবে, চাই গর্ভস্থ সন্তান মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হোক, অথবা গর্ভেই মারা যাক এবং চাই ছেলে হোক বা মেয়ে হোক। জীবিত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়ে মারা গেলে পূর্ণ দিয়াত দিতে হবে। ছেলে হলে একশো উট ও মেয়ে হলে পঞ্চাশ উট দিতে হবে। হাঁচি, শ্বাসপ্রশ্বাস, কাঁদা, চিৎকার করা, নড়াচড়া ইত্যাদি দ্বারা জীবিত বুঝা যাবে।

মায়ের পেটে সন্তান মারা গেলে ইমাম শাফেয়ির মতে, এটা জানা শর্ত যে, সন্তানের দেহ তৈরি হয়েছে ও তাতে প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে। তিনি এর ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, মানুষের আকৃতি তথা হাত ও আঙ্গুল ইত্যাদি প্রকাশ পাওয়া দরকার। ইমাম মালেকের মতে, এ শর্ত জরুরি নয়। তিনি বলেন : গর্ভধারিণী যাই প্রসব করুক, চাই তা এক টুকরো গোশত বা জমাট রক্ত হোক, যা দ্বারা বুঝা যায় যে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তাতেই "গাররা" দিতে হবে। তবে শাফেয়ির মতটি অগ্রগণ্য। তাই যখন পূর্ণ দেহ সৃষ্টির কথা জানা যাবেনা, তখন কিছুই দিতে হবেনা।*

'গাররা'র পরিমাণ : গাররা হচ্ছে পাঁচশো দিরহাম। এটা শা'বি ও হানাফিদের বক্তব্য। আর আবু দাউদ ও নাসায়ীর বর্ণনা অনুসারে একশো ছাগল। কারো কারো মতে পাঁচটা উট। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. ফায়সালা করেছেন : গর্ভস্থ সন্তানের দিয়াত এক গাররা। চাই সে দাস হোক বা স্বাধীন হোক।

---

* আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, সন্তান পেটে থাকতেই যখন মা মারা যায়, তখন কোনো দিয়াত নেই। তবে পেটের উপর আঘাত করার কারণে মা মারা গেলে এবং তারপর সন্তান মৃত ভূমিষ্ঠ হলে ফকিহদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। অধিকাংশ ফকিহর মতে, কোনো দিয়াত নেই। লায়েস ও দাউদের মতে, গাররা দিতে হবে। কেননা প্রহারের সময় মা জীবিত ছিলো এটাই বিবেচ্য বিষয়।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব থেকে বর্ণিত, মায়ের পেটে নিহত শিশুর ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সা. এর সিদ্ধান্ত হলো, গাররা দিতে হবে। এ ফায়সালা তিনি যার উপর আরোপ করেন সে বললো : যে সন্তান কিছু খেলনা, পান করলোনা, কথা বললোনা, কলেমা পড়লোনা, তার জন্য কিভাবে আমি জরিমানা দেবো ? এ ধরনের আঘাতের তো কোনো শাস্তি হয়না। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : এ-তো দেখছি গণকদের ভাই। এ হলো মুসলিম মায়ের গর্ভস্থ সন্তানের বিধান। যিম্মী মায়ের সন্তান সম্পর্কে বিদায়াতুল মুজতাহিদ গ্রন্থে বলা হয়েছে : ইমাম মালেক, শাফেয়ি ও আবু হানিফা বলেছেন : এতে মায়ের দিয়াতের এক-দশমাংশ দিয়াত বিধেয়। তবে আবু হানিফা তার মূলনীতিতে অবিচল যে, যিম্মী ও মুসলমানের দিয়াত সমান। ইমাম শাফেয়িও তার মূলনীতিতে অটল যে, যিম্মীর দিয়াত মুসলমানের দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ। আর ইমাম মালেক তার মূলনীতিতে অবিচল যে, যিম্মীর দিয়াত মুসলমানের দিয়াতের অর্ধেক।

কার উপর গাররা ওয়াজিব : ইমাম মালেক তাঁর শিষ্যবৃন্দ, হাসান বসরী ও বসরার ফকিহগণ বলেছেন : এটা অপরাধীর সম্পত্তি থেকে ওয়াজিব হবে। কিন্তু হানাফি, শাফেয়ি ও কুফার ফকিহগণের মতে, এটা 'আকেলা' অর্থাৎ পিতৃসম্পর্কীয় আত্মীয়দের উপর আরোপিত হবে। কেননা এটা একটা ভুলবশত কৃত অপরাধ, তাই এটা পিতৃসম্পর্কীয় আত্মীয়দের উপর আরোপিত হবে। জাবের রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. গর্ভস্থ সন্তান হত্যায় আঘাতকারীর আকেলার উপর গাররা আরোপ করেছেন এবং তা গর্ভধারিণীর স্বামী ও পুত্র দিয়ে শুরু করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম মালেক ও হাসান বলেন : ইচ্ছাকৃতভাবে প্রহার করে থাকলে এই দিয়াত ইচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াতের মতোই। তবে প্রথম মতটাই সঠিক।

গাররা কার প্রাপ্য : মালেকি শাফেয়ি ও অন্যান্যরা বলেন : গর্ভস্থ সন্তানের দিয়াত তার উত্তরাধিকারীরা পাবে এবং তা তাদের আইনানুগ উত্তরাধিকার থেকে আদায়যোগ্য। সাধারণ দিয়াত যেমন উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তর যোগ্য, তেমনি এই দিয়াতও উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তরযোগ্য। কারো কারো মতে, এটা পাবে সন্তানের মা। কেননা গর্ভস্থ সন্তান তার অংগ প্রত্যংগের মতো। কাজেই তার দিয়াত একান্তভাবে তারই প্রাপ্য।

কাফফারাও ওয়াজিব কিনা : আলেমগণ একমত যে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মারা গেলে তার জন্য দিয়াত ও কাফফারা দুটোই দিতে হবে। তবে সন্তান মৃত ভূমিষ্ঠ হলে গাররার সাথে কাফফারাও ওয়াজিব হবে কিনা এই প্রশ্নে ইমাম শাফেয়ি প্রমুখ বলেন : ওয়াজিব হবে। কেননা ইচ্ছাকৃত ও ভুল উভয় প্রকারের হত্যা বা যখমে তার মতে কাফফারা ওয়াজিব। আবু হানিফার মতে, কাফফারা ওয়াজিব নয়। কেননা এ ঘটনা ইচ্ছাকৃত অপরাধের সাথে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ এবং তার মতে ইচ্ছাকৃত অপরাধে কাফফারা হয়না। ইমাম মালেকের মতে, কাফফারা মুস্তাহাব।

নিরাময়ের আগে দিয়াত দিতে হয়না

ইমাম মালেক বলেন : আমাদের নিকট সর্বসম্মত মত হলো, ভুল বা অনিচ্ছাকৃত অপরাধে আহত ব্যক্তি সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া ও তার ক্ষত সেরে যাওয়ার আগে কোনো দিয়াত ওয়াজিব হয়না। আর অপরাধী যদি কোনো মানুষের হাতের পায়ের বা শরীরের অন্য কোনো

জায়গার হাড় ভুলক্রমে ভেঙ্গে দেয়, অত:পর আহত ব্যক্তি সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে যায়, তাহলে দিয়াত দিতে হবেনা। আর যদি সুস্থ হতে কিছু বাকি থাকে, অথবা এমন দিয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়, যাতে দিয়াত হ্রাস পায়, তাহলে যে পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে, সেই অনুপাতে তার দিয়াত ওয়াজিব হবে। ঐ হাড়টি যদি এমন হয়, যার সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সা. নির্দিষ্ট দিয়াত ধার্য করেছেন, তাহলে রসূলুল্লাহ সা. যে পরিমাণ দিয়াত ধার্য করেছেন, সেই হিসাবে দিয়াত দিতে হবে। আর যদি রসূলুল্লাহ সা. এর ধার্যকৃত দিয়াতের অন্তর্ভুক্ত না হয় এবং সে ব্যাপারে কোনো সুন্নতও প্রচলিত না থাকে এবং কোনো নির্দিষ্ট দিয়াতও প্রচলিত না থাকে, তাহলে তা নিয়ে ইজতিহাদ বা গবেষণা করতে হবে। (আহত ব্যক্তি সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে গেলে দিয়াত দিতে হবেনা এটা আবু হানিফার মাযহাব। কেননা আহত ব্যক্তির ব্যথা পাওয়া ছাড়া কোনো স্থায়ী ক্ষতি হয়নি। শুধু ব্যথা পাওয়ার কোনো মূল্য দেয়া যায়না। এটা কাউকে মনে কষ্ট দেয়ার মতো তিরস্কার করা বা গালি দেয়ার সাথে তুলনীয়। কেননা গালি ও তিরস্কারের কোনো ক্ষতিপূরণ দেয়ার বিধান নেই। অবশ্য গালিদাতা বা তিরস্কারকারী শাস্তি থেকে রেহাই পাবেনা। তাকে তাযীর বা কিসাস নিতে হবে। ইমাম আবু ইউসুফের মতে, অপরাধীর উপর মনে কষ্ট দেয়ার একটা কিছু দিয়াত বা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যা কোনো ন্যায়পরায়ণ শালিস নির্ধারণ করবে। ইমাম মুহাম্মদের মতে, অপরাধীকে চিকিৎসকের ফি ও ওষুধের মূল্য দিতে হবে।)

বিবাদরত জনগোষ্ঠীর মধ্যে যখন লাশ পাওয়া যায়

একটি জনগোষ্ঠী যখন পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদে লিপ্ত হয়, অতঃপর তাদের মাঝে কোনো লাশ পাওয়া যায় এবং হত্যাকারী সনাক্ত করা না যায়, তখন তাতে দিয়াত দিতে হবে। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে যখন পাথর মারামারি, বেত চালাচালি বা লাঠি দিয়ে মারামারি হয় এবং তাতে কেউ মারা যায়, তবে সেটি ভুলক্রমে সংঘটিত হত্যার আওতাভুক্ত। এই হত্যার দিয়াত ভুলবশতঃ হত্যার দিয়াতের মতোই। আর যাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হয়, সে কিসাসযোগ্য। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত হত্যার কিসাসে বাধা দেবে, তার উপর আল্লাহর অভিশাপ ও গযব। সে যত নফল বা ফরয ইবাদত করুক, কিছুই গৃহীত হবেনা।

এখন কার উপর দিয়াত ধার্য হবে, তা নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে।

আবু হানিফা বলেন : যে গোত্রে লাশ পাওয়া গেছে, নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা যদি সেই গোত্র ছাড়া আর কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ না তোলে, তাহলে সেই গোত্রের উপরই দিয়াত ধার্য হবে। ইমাম মালেক বলেন : ঐ গোত্রের সাথে যারা বিরোধে লিপ্ত তাদের উপর দিয়াত ধার্য হবে।

ইমাম শাফেয়ির মতে, উত্তরাধিকারীরা যদি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে, তাহলে তাদের সকলের উপর 'কাসামা' পদ্ধতিতে দিয়াত বণ্টিত হবে। নচেত কোনো কিসাসও হবেনা, দিয়াতও নয়।

ইমাম আহমদ বলেন : নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা যদি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে, তবে কাসামা হবে। নচেত অন্যদের পিতৃসম্পর্কীয় আত্মীয়দের উপর দিয়াত আরোপিত হবে।

ইবনে আবি লায়লা ও আবু ইউসুফ বলেছেন : বিবাদমান উভয় গোষ্ঠীর উপর একই সাথে দিয়াত আরোপিত হবে। আওযায়ি বলেন : বিবাদমান গোষ্ঠীদ্বয় ব্যতীত অন্য কারো বিরুদ্ধে প্রমাণ পাওয়া গেলে তার উপর কিসাস ও দিয়াত ধার্য হবে। নচেত উভয় গোষ্ঠীর উপর দিয়াত ধার্য হবে।

দিয়াত পরিশোধের পর হত্যা

নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী দিয়াত গ্রহণের পর তার আর হত্যাকারীকে হত্যা করা বৈধ নয়। আবু দাউদ জাবের বিন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি দিয়াত গ্রহণের পর হত্যা করে, তার যেন সম্পদ বৃদ্ধি না হয় এবং সে যেন স্বয়ম্ভর না হয়।" দার কুতনি বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি নিহত বা আহত হয়, তার তিন উপায়ে প্রতিকারের স্বাধীনতা রয়েছে। সে যদি এ ছাড়া চতুর্থ কোনো উপায় অবলম্বন করতে চায়, তবে তোমরা তাকে প্রতিহত করো। তিনটে উপায় হচ্ছে : হয় সে কিসাস নেবে, নয়তো ক্ষমা করবে, নচেত দিয়াত গ্রহণ করবে। এ তিনটার যে কোনো একটা গ্রহণ করার পর যদি সে সীমা লঙ্ঘন করে, তবে তার জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী জাহান্নাম।

এরপর যে ব্যক্তি হত্যাকারীকে হত্যা করবে, আলেমদের মধ্যে কতক বলেন : সে প্রথম হত্যাকারীর মতো। উত্তরাধিকারী ইচ্ছা করলে তাকে হত্যা করতে পারবে, অথবা ক্ষমা করতে পারবে এবং তা সত্ত্বেও আখেরাতে তার জন্য আযাব রয়েছে। আবার কেউ বলেন : তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। শাসক উত্তরাধিকারীকে ক্ষমা করার অধিকার দিতে পারবে না। আবার কেউ বলেন : তার ব্যাপার শাসকের হাতে ন্যস্ত করা হবে। তিনি যা ভালো বুঝবেন করবেন।

পারস্পারিক সংঘর্ষে দুই লড়াকু নিহত হলে

ইমাম আবু হানিফা ও মালেক বলেন : দুই লড়াকু সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে উভয়ে মারা গেলে উভয়ের জন্য দিয়াত দিতে হবে এবং একজনের পিতৃসম্পর্কীয় আত্মীয়দের উপর অপরজনের দিয়াত ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ি বলেন : উভয়ের উপর অপরজনের দিয়াতের অর্ধেক ওয়াজিব হবে। কেননা উভয়ে নিজের কৃতকর্ম ও প্রতিদ্বন্দ্বির কৃতকর্মের কারণে মৃত্যু বরণ করেছে।

পালিত পশুর ক্ষতির প্রতিকার

কোনো পশু যদি তার হাত, পা বা মুখ দ্বারা কারো কোনো ক্ষতি সাধন করে, তাহলে ইমাম শাফেয়ি, ইবনে আবি লায়লা ও ইবনে শাবরামার মতে পশুর মালিক ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। কিন্তু ইমাম মালেক, লায়েস ও আওযায়ির মতে পশুর আরোহী বা চালকের পক্ষ থেকে যদি প্রহার বা প্ররোচনামূলক কোনো কারণ না ঘটানো হয়, তবে সে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেনা। কিন্তু যদি তার দিক থেকে কোনো কারণ ঘটানো হয়ে থাকে, যেমন তাদের কেউ পশুটিকে কোনো ধরনের উস্কানি দিয়েছে এবং তার ফলে সে কোনো জিনিস নষ্ট করেছে। তাহলে নষ্টকৃত জিনিসের ক্ষতিপূরণ দিতে সে বাধ্য থাকবে। আর এটা যদি এমন কোনো অপরাধ হয়, যার জন্য কিসাস ওয়াজিব হয় এবং

উস্কানিটাও ইচ্ছাকৃত হয়, তাহলে এতে কিসাস দিতে হবে। কেননা এ ক্ষেত্রে পশুটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আর যদি উস্কানিটা অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়ে থাকে, তাহলে এতে পিতৃসম্পর্কীয় আত্মীয়দের উপর দিয়াত ওয়াজিব হবে। আর নষ্ট হওয়া জিনিস যদি কোনো সম্পদ হয় তাহলে অপরাধীর সম্পত্তি থেকেই জরিমানা দেয়া হবে। ইমাম আবু হানিফা বলেন : কোনো মানুষ তার পশুর পিঠে আরোহী থাকা অবস্থায় যদি পশুটি অন্য কোনো মানুষকে পেছনের পা দিয়ে লাথি মারে, তাহলে কোনো ক্ষতিপূরণ দেয়া লাগবেনা। আর যদি সামনের পা দিয়ে আঘাত করে, তাহলে আরোহী তার জন্য দায়ী হবে। কেননা সে সামনের দিক থেকে তাকে ফেরাতে পারে। পেছনের দিক থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনা। আর যখন কোনো পশুকে চালাতে গিয়ে তার পিঠের উপর থেকে জিন বা লাগাম বা যার উপর মালপত্র বহন করা হয় তা পড়ে যাওয়ায় কোনো মানুষের ক্ষতি সাধিত হয়, তাহলে চালক ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। আর যদি কোনো ব্যক্তি কোনো পশুর উপর আরোহণ করে, অতঃপর অন্য কেউ পশুটাকে প্রহার করে বা গুতো দিয়ে উত্তেজিত করে, ফলে সে কোনো মানুষকে লাথি মারে অথবা ছুটে যাওয়ার সময় কাউকে আঘাত করে ও আঘাত করে হত্যা করে, তাহলে যে ব্যক্তি পশুটাকে গুতো দিয়ে উত্তেজিত করেছিল সে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে, আরোহী নয়। আর যদি পশুটি উস্কানিদাতাকে লাথি মেরে হত্যা করে, তবে এই হত্যার জন্য কেউ দায়ী হবেনা। কেননা এর কারণ সে নিজেই। আর যদি আরোহীকে ফেলে দিয়ে হত্যা করে, তাহলে যে ব্যক্তি পশুকে উত্তেজিত করেছিল সে দিয়াত দিতে বাধ্য থাকবে। আর পশু যখন রাস্তার উপর চলার সময় পেশাব বা পায়খানা করে এবং তার উপর কোনো মানুষ পা পিছলে আছাড় খেয়ে মারা যায়, তবে এই ক্ষতির দায় কারো উপর বর্তাবেনা। অনুরূপ, পেশাব বা পায়খানার জন্য পশুকে বেঁধে রাখার পর এরূপ ঘটনা ঘটলেও একই বিধি কার্যকর হবে।

চালক ও আরোহী কর্তৃক জন্তুর ক্ষতির প্রতিকার

যখন জন্তুর আরোহী বা চালক থাকে এবং সেই অবস্থায় পশু কারো ক্ষতি সাধন করে, তখন উক্ত আরোহী বা চালককে উক্ত ক্ষতিপূরণের দায় বহন করতে হবে। জনৈক ব্যক্তি নিজের ঘোড়া দাবড়ানোর কারণে এক ব্যক্তি পদদলিত হয়ে মারা গেলে উমর রা. তার উপর দিয়াত আরোপ করেন। যাহেরি মাযহাবের ফকিহগণের মতে, এ ক্ষেত্রে চালক বা আরোহীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবেনা। কারণ রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : অবলা প্রাণীর আঘাত দায়মুক্ত, কূয়া দায়মুক্ত ও খনি দায়মুক্ত।" তবে যাহেরি মাযহাবের ফকিহদের এই হাদিস থেকে প্রমাণ দর্শানোর সুযোগ থাকে তখন, যখন জন্তুর কোনো চালক বা আরোহী থাকেনা। সে ক্ষেত্রে জন্তু যত ক্ষতিই করুক, সর্বসম্মতভাবে তার জন্য কেউ দায়ী নয়।

বেঁধে রাখা জন্তুর ক্ষয়ক্ষতি

বেঁধে রাখা বা আটক রাখা জন্তু যখন কোনো ক্ষতি সাধন করে তখন আবু হানিফার মতে, ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। বৈধ স্থানে বেঁধে রাখা হয়েছে বলে ক্ষতিপূরণ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার সুযোগ নেই। নু'মান বিন বশীর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: যে ব্যক্তি জনসাধারণের চলাচলের পথে কোনো জন্তু বেঁধে রাখে অথবা কোনো সাধারণ

বাজারে বেঁধে রাখে এবং সে পা বা হাত দিয়ে দলিত মথিত করে, তবে সে ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। -দার কুতনি।

ইমাম শাফেয়ি বলেছেন : জন্তুকে যেভাবে রাখা উচিত, সেভাবে রাখলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবেনা। কিন্তু যেভাবে রাখা উচিত, সেভাবে না রাখলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

গবাদি পশু কর্তৃক নষ্ট করা ফসলাদির ক্ষতিপূরণ

মালেকি, শাফেয়ি ও অধিকাংশ হেজাযী ফকিহসহ অধিকাংশ আলেমের মতে গবাদি পশু দিনের বেলায় মালিক ব্যতীত অন্য কারো জান ও মালের ক্ষতি করলে মালিককে তার কোনো ক্ষতিপূরণের দায় বহন করতে হবেনা। কেননা জনগণের সুবিদিত প্রথা হলো, দিনের বেলায় প্রাচীর ও বাগানের মালিকরা বাগানের রক্ষণাবেক্ষণ করে আর গবাদি পশুর মালিকগণ তাদের পশুদেরকে দিনের বেলা অবাধে বিচরণ করার সুযোগ দেয় এবং রাতের বেলায় গোয়ালে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি এই প্রথা লঙ্ঘন করে, সে রক্ষণাবেক্ষণের নিয়মবহির্ভূত কাজ করে এবং ক্ষতিকর তৎপরতায় লিপ্ত হয়।

উপরোক্ত বিধি শুধু সেই গবাদি পশুর উপর প্রযোজ্য, যার মালিক তাদের সাথে থাকেনা। পক্ষান্তরে যেসব পশুর সাথে তাদের মালিক, চালক বা আরোহী থাকে, তাদের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের দায় মালিক, চালক বা আরোহীকে বা যার কাছে পশুগুলো অবস্থান করে তাকে বহন করতে হবে, চাই জন্তু তার পা দিয়ে, হাত দিয়ে বা মুখ দিয়ে ক্ষতি সাধন করুক। এই মতের স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে মালেক বর্ণিত এই হাদীস পেশ করা হয় যে বারা ইবনে আযেবের রা. উটনি এক ব্যক্তির বাগানে ঢুকে ক্ষতি সাধন করলে রসূলুল্লাহ সা. ফায়সালা করলেন যে, বাগানের মালিকদের দায়িত্ব দিনের বেলা বাগানের রক্ষণাবেক্ষণ করা, আর রাতের বেলা পশুদের দ্বারা ফসলের যে ক্ষতি সাধিত হয়, পশুর মালিকরা তার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। মালেকি ফকিহ সাহনুনের মতে, এ হাদিস মদিনার ন্যায় প্রাচীর বেষ্টিত বাগানের এলাকায় প্রযোজ্য। আর যেসব দেশে উন্মুক্ত বাগান ও ফসলের ক্ষেত বিদ্যমান, সেখানে পশুর মালিকরা পশুর সাধিত ক্ষতিপূরণ করতে বাধ্য থাকবে, চাই তা রাতেই হোক বা দিনেই হোক। আর হানাফি ফকিহদের মত হলো, পশুর সাথে তার মালিক না থাকলে পশুর সাধিত ক্ষয়ক্ষতির দায় কারো উপর থাকবেনা, চাই তা দিনে হোক বা রাতে হোক। কেননা রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "অবলা পশুর আঘাত দায়মুক্ত।" হানাফিগণ পশুর আঘাতের উপর তার যাবতীয় কর্মকান্ডকে কেয়াস করেন এবং সকল কর্মকাণ্ডকেই দায়মুক্ত গণ্য করেন।

পক্ষান্তরে পশুর মালিক যদি পশুর সাথে থাকে, তাহলে দেখতে হবে, সে পশুকে পেছন থেকে হাঁকায়, না সামনে থেকে টেনে নেয় বা আরোহী হয়ে চালায়। যদি পেছন থেকে হাঁকিয়ে নিয়ে যায়, তবে সে সর্বাবস্থায় ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। আর যদি টেনে নেয় বা আরোহী হয়ে চালায়, তবে মুখ ও সামনের পা দিয়ে সাধিত ক্ষতির ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেনা।

অধিকাংশ ফকিহ তাদের মতের স্বপক্ষে বলেন : হানাফি ফকিহগণ যে হাদীস দ্বারা প্রমাণ দেন, তা একটা সাধারণ হাদীস, যার প্রয়োগক্ষেত্র অনির্দিষ্ট করে দিয়েছে। উল্লেখ্য, এ বিধিটি কৃষিক্ষেত্রের ফসল ও শস্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্যান্য জিনিস সম্পর্কে ইবনে কুদামা বলেন :

পশু যদি ক্ষেতের ফসল ছাড়া অন্য কিছু নষ্ট করে। তবে তার মালিক তার দায় বহন করতে বাধ্য থাকবেনা, চাই তা রাতে হোক বা দিনে হোক, যতক্ষণ না ঐ ক্ষতিতে তার কোনো হাত থাকে। তবে তার হাত থাকলে ভিন্ন কথা।

শুরাইহ সম্পর্কে জানা যায়, একটি ছাগল রাত্রিকালে এক ব্যক্তির বাগানের ভেতরে ঢুকে ক্ষতি সাধন করলে তিনি তার ক্ষতিপূরণের পক্ষে রায় দেন। এর প্রমাণস্বরূপ শুরাইহ সূরা আম্বিয়ার ৮৭ নং আয়াত উদ্ধৃত করেন, যাতে একটি গোত্রের মেষপাল রাত্রিকালে এক কৃষকের ক্ষেতে ঢুকে তার ক্ষতি সাধন করলে হযরত দাউদ ও সুলায়মান আ. মেষপালের মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করেছিলেন বলে উল্লেখ রয়েছে।

সাওরি বলেন : দিনে হলেও ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। কেননা সে পশুকে ছেড়ে দিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে।

কিন্তু আমাদের মত হলো, অবলা পশুর ক্ষতি দায়মুক্ত- একথা স্বয়ং রসূলুল্লাহ সা. ঘোষণা করেছেন। তাই এ ক্ষেত্রে কেউ ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য নয়। আয়াতে যে কথা বলা হয়েছে, তা রাতের বেলায় পশুর বিচরণের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর ঐ ঘটনাটা ছিলো ক্ষেতের ফসল সংক্রান্ত, যা স্বভাবসুলভভাবেই পশু নষ্ট করে থাকে এবং তা খেতে আগ্রহী হয়। ফসল ব্যতীত অন্যান্য জিনিস সে খেতে আগ্রহী হয়না। কাজেই ফসল ও অ-ফসলকে একই বিধির আওতায় আনা ঠিক নয়।

পাখি কর্তৃক বিনষ্ট জিনিসের ক্ষতিপূরণ

কোনো কোনো ফকিহর মতে, মৌমাছি, কবুতর, মোরগ-মুরগী, পাখি ও হাস চতুষ্পদ জন্তুর মতোই। এগুলোকে যদি কেউ পোষ মানায় ও দিনের বেলা ছেড়ে দেয়, আর তখন তারা যদি কোনো শস্য দানা খুটে খায়, তবে তার জন্য কেউ দায়ী হবেনা। কেননা এগুলোকে ছেড়ে রাখাই প্রচলিত রীতি। কোনো কোনো ফকিহর মতে, যে ব্যক্তি ছেড়ে দেয়, সে ক্ষতির জন্য দায়ী ও ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। অনুরূপ, যখন কেউ কোনো পাখিকে শিকার ধরার প্রশিক্ষণ দেয় যে বাজপাখি এবং মানুষের পশুপাখি মারে, তবে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এ মতটি বিশুদ্ধ।

বিড়াল ও কুকুরের ক্ষতির প্রতিকার

'আলমুগনি' গ্রন্থে বলা হয়েছে : যে ব্যক্তি একটি দংশনকারী কুকুর লালন করলো ও পোষ মানালো, অতঃপর তাকে ছেড়ে দিলো, আর সেই সুযোগে কুকুরটি কোনো মানুষকে বা জীবজন্তুকে কামড়ালো অথবা কোনো মানুষের কাপড় কামড়ে ছিঁড়ে দিলো, সে কুকুর যে ক্ষতি সাধন করে, তার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। কেননা সে কুকুর পালনে সীমা অতিক্রম করেছে। তবে কোনো ব্যক্তি যদি তার বাড়িতে তার অনুমতি ব্যতিরেকে ঢুকে পড়ে এবং কুকুর তাকে কামড়ায়, তাহলে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেনা। কেননা সে অন্যের বাড়িতে প্রবেশের নিয়ম লঙ্ঘন করে কুকুরের হামলা ও কামড়ের কারণ ঘটিয়েছে। আর যদি কুকুরের মালিকের অনুমতি নিয়ে ঢুকে থাকে, তাহলে সে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। কেননা মালিক এই ক্ষতির কারণ ঘটিয়েছে। তবে কুকুর যদি কামড়ানো ছাড়া অন্য কোনো ক্ষতি সাধন করে, যেমন কারো পানাহারের পাত্র জিভ দিয়ে

চাটে কিংবা পেশাব পায়খানা করে। তবে কুকুরের পালক সে জন্য দায়ী হবেনা। কেননা এটা শুধু দংশনকারী কুকুরের একক বৈশিষ্ট নয়। কাযী বলেন : কেউ যদি এমন বিড়াল পোষে, যা মানুষের পালিত মুরগী ইত্যাদির ছানা খেয়ে ফেলে, তাহলে ঐ ব্যক্তি বিড়ালের ক্ষতির জন্য দায়ী হবে ঠিক যেমন দংশনকারী কুকুরের ক্ষতির জন্য তার মালিক দায়ী হয়ে থাকে। এই ক্ষতি দিনে করুক বা রাতে করুক, তাতে কিছু এসে যায়না। তবে এ ধরনের ক্ষতি সাধন যদি বিড়ালটির অভ্যাস না হয়ে থাকে, তবে তার মালিক তার ক্ষতির জন্য দায়ী হবেনা যেমন কুকুর যদি স্বভাবগতভাবে দংশনকারী না হয়েও ঘটনাক্রমে কাউকে দংশন করে বসে তবে মালিক তার জন্য দায়ী হয়না। আর যদি কামড়ানো স্বভাবধারী কুকুর ও ক্ষতিকর স্বভাবধারী বিড়াল কারো কাছে তার ইচ্ছা ও পোষ মানানোর চেষ্টা ছাড়াই অবস্থান করতে থাকে এবং সেই সুবাদে সে কারো ক্ষতি সাধন করে, তবে ঐ ব্যক্তি তার জন্য দায়ী হবেনা। কেননা এখানে কুকুরটি বা বিড়ালটি নিজেই ক্ষতির কারণ হয়েছে, তার মালিক নয়।

কোন্ কোন্ জন্তু হত্যা করা যাবে এবং কোন্ কোন্ জন্তুকে হত্যা করা যাবেনা

রসূলুল্লাহ সা. যে কটি প্রাণীকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন, সে কয়টি ব্যতীত আর কোনো প্রাণীকে হত্যা করা যাবেনা। হত্যার আদেশ দেয়া প্রাণী কয়টি হলো : কাক, চিল, গিরগিটি, ইঁদুর, সাপ, বিচ্ছু, দংশনকারী কুকুর। এছাড়া ক্ষতিকর হওয়ার দিক দিয়ে এই কটা প্রাণীর সাথে যাদের সাহায্য সাদৃশ্য আছে, সেগুলো যদি আক্রমণ নাও করে, তথাপি সেগুলোকেও হত্যা করা যাবে। সেগুলো হচ্ছে : বাঘ, সিংহ, ভিমরুল ও বোলতা। আয়শা রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. পাঁচটি পাপিষ্ঠ প্রাণীকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন, চাই তারা হারাম শরীফের ভেতরে থাকুক বা বাহিরে থাকুক : কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর, দংশনকারী কুকুর।" (বুখারি, মুসলিম) বুখারি ও মুসলিমে উম্মে শুরাইক থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সা. গিরগিটি হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন এবং একে 'পাপিষ্ঠ ক্ষুদ্র প্রাণী' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এসব প্রাণীকে হত্যা করা হলে সেজন্য কেউ দায়ী হবেনা। অনুরূপ, অন্যান্য হিংস্র প্রাণী এবং ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ হত্যা করাও সর্বসম্মতভাবে দূষণীয় নয়, তা যতোই গৃহপালিত হোক না কেন। কিন্তু বিড়াল যদি আগ্রাসী বা হিংস্র আচরণ না করে, তবে তাকে হত্যা করলে তার মূল্য দিতে হবে। কাঠঠোকরা পাখি, পিপড়ে, মৌমাছি ও ব্যাঙ হত্যা করা যাবেনা। কেননা এদের দ্বারা সচরাচর কোনো ক্ষতি সাধিত হয়না। নাসায়ি ইবনে আমর থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি চড়ুই পাখি বা তার চেয়ে বড় কোনো পাখিকে সংগত পদ্ধতি ব্যতীত হত্যা করবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। জিজ্ঞাসা করা হলো : হে রসূলুল্লাহ, সংগত পদ্ধতি কি? তিনি বললেন : তাকে যবাই করা ও খাওয়া, মাথা কেটে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া নয়।" আর যদি কেউ অন্যায়ভাবে এগুলোকে হত্যা করে, তবে সে যেন আল্লাহর নিকট তওবা করে। তবে তাকে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবেনা। ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. চারটা প্রাণী : পিপড়ে, মৌমাছি, কাঠঠোকরা ও সারাদ (পাখি বিশেষ) হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।

যেসব ক্ষতি দায়মুক্ত

যালিমের যুলুম প্রতিরোধের ফলে যালিমের কোনো ক্ষতি সাধিত হলে তা সম্পূর্ণ দায়মুক্ত। তাতে কিসাসও নেই, দিয়াতও নেই। এর কয়েকটি উদাহরণ নিম্নরূপ :

১. দংশনকারীর দাঁত পড়ে গেলে : কোনো মানুষ যখন অন্য কাউকে কামড়ায় এবং যাকে কামড়ায় সে তা প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করায় যদি দংশনকারীর দাঁত পড়ে যায়, কিংবা চোয়াল ভেঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে প্রতিরোধকারী দায়ী থাকবেনা। কেননা সে আক্রমণকারী নয়। বুখারি ও মুসলিম ইমরান বিন হুসাইন থেকে বর্ণনা করেন : এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির হাত কামড়ে ধরলো তখন লোকটি তার মুখ থেকে নিজের হাত সরিয়ে নিল। ফলে তার সামনের দাঁত দুটো পড়ে গেলো। তখন উভয়পক্ষ রসূলুল্লাহ্ সা. এর নিকট বিচারার্থে উপস্থিত হলো। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন : তোমাদের একজন অপরজনকে ষাড়ের মতো কামড়ে দেবে এটা কেমন কথা? এ জন্য তুমি কোনো দিয়াত পাবেনা।" ইমাম মালেক বলেন : দিয়াত দিতে হবে। তবে উল্লিখিত হাদিস তার মত খণ্ডন করে।

২. অন্যের ঘরে বিনা অনুমতিতে দৃষ্টি দিলে : দরজার ফাঁক দিয়ে, কোনো ছিদ্র দিয়ে বা অন্য কোনো ফাঁক ফোকর দিয়ে কারো ঘরের ভিতরে দৃষ্টি দেয়া অনিচ্ছাকৃত হলে দূষণীয় নয়। মুসলিম বর্ণনা করেন : রসূলুল্লাহ্ সা. কে জিজ্ঞাসা করা হলো : হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে গেলে কী করণীয়? তিনি বলেন : চোখ ফিরিয়ে নাও। আবু দাউদ ও তিরমিযি বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা.আলী রা. কে বললেন : তুমি প্রথম দৃষ্টির পর পুনরায় আর দৃষ্টি দিওনা। প্রথম দৃষ্টি তোমার জন্য বৈধ, দ্বিতীয় দৃষ্টি নয়।" কেউ যদি গৃহস্থের অনুমতি ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে অন্দর মহলের দিকে দৃষ্টি দেয় তবে গৃহস্থের জন্যে তার চোখ ফুটো করে দেয়ার অধিকার রয়েছে। এতে তার উপর কোনো ক্ষতিপূরনের দাবি আরোপিত হবেনা। আহমদ ও নাসায়ি আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : 'যে ব্যক্তি কারো বাড়ির ভেতরে তার অনুমতি ছাড়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং বাড়িওয়ালা তার চোখ উপড়ে ফেলে, তবে সে কোনো দিয়াতও পাবেনা, কিসাসও পাবেনা।" বুখারি ও মুসলিম আরো বর্ণনা করেন : কেউ যদি তোমার অনুমতি ব্যতীত তোমার গৃহাভ্যন্তরে তাকায় এবং তুমি তাকে পাথর ছুঁড়ে মারো এবং তাতে তার চোখ নষ্ট হয়ে যায়, তবে তুমি দায়মুক্ত।" সাহল বিন সা'দ বলেন : এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ সা. এর দরজার ফাঁক দিয়ে তাকাচ্ছিল। তখন রসুলুল্লাহ্ সা. এর একটা চিরণী ছিলো, যা দ্বারা তিনি নিজের মাথা আঁচড়াচ্ছিলেন। রসুলুল্লাহ্ সা. লোকটাকে বললেন : আমি যদি জানতাম, তুমি তাকাচ্ছ, তবে এইটা দিয়ে তোমার চোখে আঘাত করতাম। মানুষকে দৃষ্টি দেয়া থেকে বিরত রাখার জন্যই তো অনুমতি নেয়ার বিধান করা হয়েছে।" এ হাদীস দ্বারাই শাফেয়ি ও হাম্বলিগণ তাদের বিধি তৈরী করেছেন। কিন্তু হানাফি ও মালেকিগণ এর বিরোধিতা করে বলেন : যে ব্যক্তি গৃহস্থের অনুমতি ব্যতিরেকে গৃহের অভ্যন্তরে তাকায় এবং সে জন্য গৃহস্থ যদি তার প্রতি পাথর বা কাঠ নিক্ষেপ করে আহত করে, তবে এর জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। কেননা কেউ যদি তার বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে, ভেতরের দিকে তাকায়, এমনকি তার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার ব্যতীত অন্য কোনো অশ্লীল কাজও করে, তবুও তার

চোখ নষ্ট করা বা তার অন্য কোনো বিপদ ঘটানো বৈধ নয়। কেননা এ ধরনের দুষ্কর্মের এ ধরনের শাস্তি দেয়া বিধেয় নয়। ইতিপূর্বে যে সকল সহীহ হাদিস উদ্ধৃত করা হয়েছে, এটা তার পরিপন্থি। ইবনে কাইয়েম প্রথমোক্ত মতটিকে অগ্রগণ্য আখ্যায়িত করে বলেছেন : এই সুন্নতগুলোকে ফিকহী মূলনীতির পরিপন্থি বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ শুধু চোখের বিনিময়ে চোখ উৎপাটন বৈধ করেছেন, তাকানোর বিনিময়ে নয়। এজন্য কেউ যদি তার জিহ্বা দিয়ে কারো ক্ষতি করে বা কষ্ট দেয় তবে সে জন্য তার জিহ্বা কাটা যাবেনা। আর যদি আড়ি পেতে অন্যের গোপন কথা শোনে, তবে সে জন্য কান কেটে দেয়া বৈধ হবেনা। কাজেই বলা যায় যে, এই সুন্নতগুলোই সর্বোচ্চ মূলনীতি। এগুলোর পরিপন্থি যা হবে, সেটাই হবে মূলনীতির বিরোধী। "আল্লাহ্ চোখের বদলে চোখ উৎপাটনের বিধান দিয়েছেন"এ বক্তব্য কিসাসের ক্ষেত্রে সঠিক বটে, তবে যে অংগ অপরাধপ্রবণ সীমালঙ্ঘনকারী এবং যাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া ছাড়া তার ক্ষতি ও আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব নয়, তার বিষয়টি আয়াতে ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোনোভাবেই আসেনি। কুরআন যখন এ বিষয়ে পরিপূর্ণ নিরবতা অবলম্বন করেছে, তখন হাদীস এ বিষয়ে বিধি বর্ণনা করেছে। এটা কুরআনের বিরোধী কোনো বিধান নয়। এটা কিসাস হিসেবে চোখ নষ্ট বা উৎপাটন করা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা ব্যাপার। অনুরূপ, এটা আক্রমণকারীকে প্রতিহত করা থেকেও ভিন্ন ব্যাপার, যা সহজ থেকে সহজতর পন্থায় করা যায়। কেননা উদ্দেশ্য হলো, তার কূটকৌশলের ক্ষতি প্রতিহত করা। এ কাজটা যদি লাঠি দিয়ে সম্পন্ন করা যায়, তবে তরবারি দিয়ে প্রতিহত করা হবেনা। তবে যে ব্যক্তি অবৈধ জিনিসের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে, অথচ তা থেকে সংযত থাকা সম্ভব নয়, সে ঐ কাজটি গোপনে ও আড়ি পাতার মাধ্যমেই করেছে। সুতরাং ওটা ঐ আক্রমণকারী ও অপরাধীর কাজের চেয়ে ভিন্নতর, যার আক্রমণ বাস্তবায়িত হয়নি। সম্ভবত: এটা গোপনে ছাড়া সংঘটিত হয়না। এমতাবস্থায় যার প্রতি দৃষ্টি দিয়েছে, তার উপর যদি দৃষ্টিদাতার অপরাধের প্রমাণ উপস্থাপনের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়, তবে সেটা অবশ্যই তার পক্ষে সম্ভব হবেনা। আর যদি সহজ থেকে সহজতর উপায়ে তা প্রতিরোধ করার আদেশ দেয়া হয়, তাহলে তার দিকে ও তার অন্দর মহলের দিকে দৃষ্টি দিয়ে সে যে অপরাধ করেছে, তার আর কোনো শাস্তি হবেনা।

ইসলামী শরিয়ত একটা পূর্ণাঙ্গ বিধান, যা উল্লিখিত দুটো পন্থাই প্রত্যাখ্যান করে। তার দৃষ্টিতে আমাদের ও অপরাধীর জন্য সর্বোত্তম, সবচেয়ে নিরাপদ ও সর্বাপেক্ষা ব্যবস্থা সেটাই, যা হাদিসে এসেছে, যার বিরোধিতা কোথাও করা হয়নি এবং যার বিশুদ্ধতার বিপক্ষেও কোনো প্রমাণ নেই। বস্তুত: সেই ব্যবস্থা হলো, তার দিকে পাথর বা যা সেখানে পাওয়া যায় তা ছুঁড়ে মারা। যদি কেউ সীমালঙ্ঘনপূর্বক তাকিয়ে না থাকে, তবে পাথরের টুকরো ইত্যাদি নিক্ষেপে তার কোনো ক্ষতি হবেনা। আর যদি তাকিয়ে থাকে, তাহলে যে ক্ষতি হবে সে জন্য সে নিজেই নিজেকে তিরস্কার করবে। কেননা সে নিজেই এই ক্ষতি ডেকে এনেছে। নিক্ষেপকারী তার উপর কোনো যুলুম করেনি। বরং যে ব্যক্তি লুকিয়ে অন্যের অন্দর মহলের দিকে তাকায় সে-ই যুলুম ও খেয়ানতকারী। যে ব্যক্তির সম্ভ্রম এভাবে নষ্ট করা হলো, ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ও প্রতাপান্বিত শরিয়ত তার প্রতি পরিচালিত এই

যুলুমের প্রমাণ পাওয়ার পরও তাকে প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারেনা। বস্তুত: আল্লাহ তার রসূলের উপর যে শরিয়ত নাযিল করেছেন, সেই অনুসারেই শাসনের ফায়সালা দিয়েছেন। আর মুমিনদের জন্য আল্লাহর শাসনের চেয়ে উত্তম কোনো শাসন নেই।

৩. প্রাণ, সম্পদ ও সম্ভ্রম রক্ষার্থে হত্যা করা : যে ব্যক্তি কোনো মানুষকে বা পশুকে নিজের বা অন্যের প্রাণ, সম্পদ বা সম্ভ্রম রক্ষার্থে হত্যা করে, তার উপর কোনো শাস্তি বা ক্ষতিপূরণের দায় থাকবেনা। কেননা প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতি প্রতিরোধ করা ওয়াজিব। হত্যা না করে যদি প্রতিরোধ করা সম্ভব না হয়, তাহলে তাকে হত্যা করা তার পক্ষে বৈধ। হত্যা করলে হত্যাকারীর কোনো অপরাধ হবেনা।

মুসলিম আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেন : এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সা. এর নিকট এসে বললো : হে রসূলুল্লাহ! কেউ যদি আমার সম্পদ কেড়ে নিতে আসে তাহলে আমি কী করবো?
রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তাকে তোমার সম্পদ দেবেনা। সে বললো : যদি সে আমাকে হত্যা করতে তেড়ে আসে?
রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তুমিও তাকে হত্যা করতে তার উপর আক্রমণ করো।
সে বললো : সে যদি আমাকে মেরে ফেলে?
রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তাহলে তুমি শহীদ।
সে বললো : আর যদি আমি তাকে হত্যা করি?
রসূলুল্লাহ সা. বললেন : সে দোযখবাসী।"

ইবনে হাযম বলেছেন : যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ কেড়ে নিতে চায়, চাই সে ডাকাত হোক বা অন্য কেউ হোক, তাকে যদি ঠেকানো সম্ভব হয় ও প্রতিহত করা যায় তাহলে তাকে হত্যা করা বৈধ হবেনা। তখন তাকে হত্যা করলে তার উপর কিসাস কার্যকর হবে। আর যদি ন্যূনতম আশংকাও থাকে যে, ডাকাত তাকে কোনো অবকাশ না দিয়ে হত্যা করবে। তাহলে তাকে হত্যা করা উচিত। এতে তার উপর কোনো দায় বর্তাবেনা। কেননা সে তো কেবল আত্মরক্ষা করেছে।

৪. আত্মরক্ষার্থে হত্যার দাবি : হত্যাকারী যখন দাবি করে যে, সে নিহতকে নিজের প্রাণ সম্পদ বা সম্ভ্রম রক্ষার্থে হত্যা করেছে, সে যদি তার দাবির স্বপক্ষে প্রমাণ বা সাক্ষী উপস্থাপন করতে পারে, তবে তার দাবি গ্রহণ করা হবে এবং তার উপর কিসাস ও দিয়াত রহিত হবে। আর যদি দাবির স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ দিতে না পারে, তাহলে তার দাবি গৃহীত হবেনা এবং তার ভাগ্য নিহতের উত্তরাধিকারীদের হাতে ন্যস্ত হবে। তারা মাফ করতে চাইলে করবে, নচেত কিসাস আদায় করবে। কেননা নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে না পারলে সে দোষী সাব্যস্ত হবেই।

নিজের স্ত্রীর সাথে জনৈক বেগানা পুরুষকে পেয়ে উভয়কে হত্যা করেছিল এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আলী রা. কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : সে যদি চারজন সাক্ষী হাজির করতে না পারে (মতান্তরে দু'জন সাক্ষী) তাহলে তাকে নিহতের উত্তরাধিকারীদের নিকট হস্তান্তর করা হবে, যাতে তারা তাকে হত্যা করতে পারে। হত্যাকারী যদি সাক্ষী হাজির

না করে এবং উত্তরাধিকারী স্বীকার করে যে, সে আত্মরক্ষার্থে হত্যা করেছে, তাহলে সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে এবং কিসাস ও দিয়াত কোনোটাই তাকে দিতে হবেনা।

সাঈদ বিন মানসূর বর্ণনা করেন : একদিন উমর রা. দুপুরের খাবার খাচ্ছিলেন। সহসা এক ব্যক্তি দৌড়ে তার কাছে এলো। তার হাতে তখনো একখানা রক্তাক্ত তরবারী। আর একদল লোক তার পিছু পিছু ছুটে আসছিল। লোকটি এসে উমর রা. এর নিকট বসলো। সেই সাথে অন্যেরাও এলো। তারা বললো : হে আমীরুল মুমিনীন, এই লোকটা আমাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। উমর রা. তাকে বললেন : এরা কী বলছে? সে বললো : হে আমীরুল মুমিনীন, আমি তো আমার স্ত্রীর দুই উরুর উপর তরবারী মেরেছি। দুই উরুর মাঝে যদি কেউ থেকে থাকে, তবে আমি তাকে হত্যা করেছি। উমর রা. তাদেরকে বললেন : সে কী বলছে? তারা বললো : হে আমীরুল মুমিনীন, সে তরবারী দিয়ে আঘাত করেছে। সে আঘাত লোকটির দেহের মাঝখানে ও মহিলার উরুদ্বয়ের উপর পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে উমর রা. লোকটির কাছ থেকে তরবারী নিজ হাতে নিলেন, তরবারীটি দোলালেন এবং তার কাছে দিয়ে বললেন : ওরা যদি পুনরায় এরূপ কাজ করে, তবে তুমিও পুনরায় হত্যা করবে।"

বর্ণিত আছে, একদিন ইবনুয্ যুবাইর রা. সেনাবাহিনী থেকে পেছনে পড়ে রইলেন এবং তার কাছে তার একটা বাদী ছিলো। তখন দুই ব্যক্তি তার কাছে এসে বললো : আমাদেরকে কিছু দাও। তিনি তাদেরকে কিছু খাবার জিনিস দিলেন। তারা উভয়ে বললো : বাঁদীটা আমাদেরকে দিয়ে দাও। তিনি তৎক্ষণাৎ উভয়কে তরবারীর এক কোপে হত্যা করে ফেললেন।

ইবনে তাইমিয়া বলেন : হত্যাকারী যদি দাবি করে যে, নিহত ব্যক্তি তার উপর আক্রমণ চালিয়েছিল এবং নিহতের উত্তরাধিকারীরা তা অস্বীকার করে, তাহলে নিহত ব্যক্তি যদি সৎ লোক হিসেবে পরিচিত থেকে থাকে এবং তাকে সে সন্দেহাতীতভাবে হত্যা করে থাকে, তাহলে হত্যাকারীর কথা গৃহীত হবেনা। আর যদি নিহত ব্যক্তি পাপী হিসেবে এবং হত্যাকারী সৎ লোক হিসেবে খ্যাত থেকে থাকে, তাহলে হত্যাকারী কসম খেয়ে যা বলবে, সেটাই গ্রহণ করা হবে। বিশেষতঃ সে যদি এই ঘটনার আগেই পরিচিত থেকে থাকে।

৫. আগুনের ক্ষতির দায় : যদি কেউ অভ্যাস মোতাবেক বাড়িতে আগুন জ্বালায়। কিন্তু বাতাসে আগুন স্থান থেকে স্থানান্তরে চলে যাওয়ায় জান ও মালের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়, তাহলে সে জন্য সে দায়ী হবেনা।

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনে আগুন জ্বালালো। অতঃপর আগুনের একটা অংশ উড়ে এক প্রতিবেশীর বাড়িতে গিয়ে তার কিছু সম্পদের ক্ষতি সাধন করলো। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি আব্দুল আযীয বিন হুসাইনকে ঘটনাটা জানিয়ে চিঠি লিখলো। আব্দুল আযীয জবাবে লিখলেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : বাকশক্তিহীন প্রাণী দায়মুক্ত। আমি মনে করি আগুনও দায়মুক্ত।

৬. অপরের ক্ষেতের শস্য নষ্ট করা : কেউ যদি নিজের যমীতে সেচ দিতে গিয়ে স্বাভাবিক চাহিদার চেয়ে বেশি পানি ব্যবহার করে এবং তাতে পার্শ্ববর্তী যমীর ফসল নষ্ট

হয়, তাহলে সে দায়ী হবে। তবে যদি অজানা কোনো জায়গা থেকে পানির ঢল আসে, তাহলে তার জন্য সে দায়ী হবেনা। কেননা তার পক্ষ থেকে কোনো বাড়াবাড়ি হয়নি।

৭. নৌকা ডুবির দায় : কোনো নৌকা মানুষ ও জীবজন্তু নিয়ে পার হওয়ার সময় ডুবে গেলে নৌকার মালিকের যদি তাতে প্রত্যক্ষ কোনো হাত না থেকে থাকে, তবে ক্ষয়ক্ষতির জন্য সে দায়ী হবেনা। আর যদি নৌকা ডুবির কারণ তার সৃষ্টি করা হয় তবে সে দায়ী হবে।

৮. চিকিৎসকের দায় দায়িত্ব : আলেমদের এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই যে, যার চিকিৎসা বিদ্যা সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই, সে যদি কোনো রোগীর চিকিৎসা করতে গিয়ে বিপত্তি ঘটায়, তাহলে সে ঐ রোগীর যে ক্ষতি সাধন করবে তার জন্য দায়ী হবে এবং ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। কেননা এই কাজ দ্বারা সে একজন সীমালঙ্ঘনকারী বিবেচিত হবে এবং তার সম্পদ থেকেই ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে। কেননা রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি চিকিৎসক সাজে অথচ ইতিপূর্বে সে চিকিৎসক বলে পরিচিত ছিলোনা, সে দায়ী হবে।" -আবু দাউদ, নাসায়ী।

উমর বিন আব্দুল আযীযের ছেলে আব্দুল আযীয বলেন, আমার পিতার নিকট আগত প্রতিনিধি দলের এক ব্যক্তি আমাকে বলেছে, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি ইতিপূর্বে চিকিৎসা করেছে বলে জানা যায়না, অথচ কোনো জনগোষ্ঠীর চিকিৎসা করতে শুরু করলো এবং রোগীর ক্ষতি সাধন করলো, সে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য।" (আবু দাউদ) তবে চিকিৎসক চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া সত্ত্বেও যদি ভুল করে, তবে ফকিহগণ মনে করেন, তার দিয়াত দিতে হবে। কিন্তু অধিকাংশ ফকিহর মতে, দিয়াত দেবে চিকিৎসকের পিতৃসম্পর্কীয় আত্মীয়গণ। (রোগী মারা গেলে কিসাস নয়, দিয়াত দিতে হবে। কেননা চিকিৎসা রোগীর অনুমতি নিয়ে করা হয়েছে)। আবার কেউ কেউ বলেন : চিকিৎসকের নিজের সম্মতি থেকেই দিয়াত আদায় করা হবে। ক্ষতিপূরণ দেয়ার এই বাধ্যবাধকতা মানুষের প্রাণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, চিকিৎসকদেরকে দায়িত্ব সচেতন করা এবং তাদের জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত তৎপরতার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের অপরিহার্যতার দিক নির্দেশক। পক্ষান্তরে ইমাম মালেক বলেন : তাকে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবেনা।

৯. স্বামীর সহবাসে যদি স্ত্রীর যোনি ফেটে প্রশস্ত হয়ে যায় : কোনো ব্যক্তি যখন স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে গিয়ে তার যোনি বিদীর্ণ করে প্রশস্ত করে দেয়, তবে স্ত্রী যদি এরূপ প্রাপ্তবয়স্কা হয় যে, তার সমান মহিলার সাথে সাধারণ সহবাস করা হয়ে থাকে, তাহলে তার কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবেনা। এটা ইমাম আবু হানিফা ও আহমদের মত, শাফেয়ি ও মালেকের মতে দিয়াত দিতে হবে। তবে মালেকের যে মতটি অধিক প্রসিদ্ধ, তদনুসারে সালিশী দ্বারা ফায়সালা করা হবে। আর যদি এমন অপ্রাপ্তবয়স্কা হয়, যার সমান মেয়ের সাথে সচরাচর সহবাস করা হয়না, তাহলে তার উপর দিয়াত ওয়াজিব। উল্লেখ্য যে, এই বিধিটি তখনই প্রযোজ্য, যখন যোনি বিদীর্ণ হয়ে মলদ্বারের সাথে একাকার হয়ে যায় এবং এই দুই অঙ্গের মধ্যে কোনো আড়াল থাকেনা।

১০. কোনো ব্যক্তির উপর প্রাচীর ভেংগে পড়ে মৃত্যু ঘটলে : যখন কারো প্রাচীর রাস্তার দিকে ধ্বসে পড়ে ও তার নিচে চাপা পড়ে কেউ মারা যায়, তাহলে দেখতে হবে, ঐ প্রাচীর

আগেই ঝুঁকে পড়েছিল কিনা এবং প্রাচীরের মালিককে তা ভেঙ্গে ফেলতে বলা হয়েছিল কিনা। যদি বলা হয়ে থাকে এবং তার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও না ভেঙ্গে থাকে, তাহলে প্রাচীর ধ্বসের ঘটনায় যে ক্ষতি সাধিত হবে তার জন্য সে দায়ী হবে। নচেত দায়ী হবেনা। এটা হানাফি মাযহাবের অভিমত। ইমাম মালেকের মতে, প্রাচীরটি যদি এত নুয়ে পড়ে থাকে যে, তা ভাঙ্গা নিরাপদ মনে হয়না, তাহলে সে ইতিপূর্বে ভাঙ্গার উদ্যোগ নিয়ে থাকুক বা না নিয়ে থাকুক এবং তার উপর কোনো সাক্ষী রেখে থাকুক বা না থাকুক, ক্ষয়ক্ষতির জন্য দায়ী হবে। আহমদ ও শাফেয়ির মতে দায়ী হবেনা।

১১. কূয়া খননকারীর দায় এবং অন্যান্য বিষয় : যখন কোনো ব্যক্তি কোনো কূয়া খনন করে এবং তাতে কোনো মানুষ পড়ে মারা যায়, তখন সে যদি নিজের মালিকানাভুক্ত যমীতে কূয়া খনন করে থাকে অথবা অন্যের মালিকানাধীন যমীতে খনন করে থাকে এবং মালিকের অনুমতি নিয়ে করে থাকে, তবে সে ক্ষতির জন্য দায়ী হবেনা। আর যদি অন্যের যমীতে মালিকের অনুমতি ছাড়া খনন করে থাকে, তবে দায়ী হবে। পতিত যমীতে খনন করলে দায়ী হবেনা। কেননা রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "কূয়া দায়মুক্ত।" অর্থাৎ এ অবস্থায় কেউ কূয়ায় পড়ে মারা গেলে সে মৃত্যু দায়মুক্ত ও দিয়াতমুক্ত। ইমাম মালেক বলেছেন : এমন জায়গায় যদি কূয়া খনন করে যে, সে ধরনের জায়গায় কূয়া খনন করার রীতি প্রচলিত আছে, তাহলে দায়ী হবে না। তবে কূয়া খননে যদি প্রচলিত রীতিনীতি লঙ্ঘন করে থাকে, তবে দায়ী হবে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থমস্তিষ্ক লোককে যদি কেউ কোনো কূয়ায় নামতে বা গাছে আরোহণ করতে আদেশ দেয় এবং লোকটি আদেশ মান্য করার পর কূয়ায় ডুবে বা গাছ থেকে পড়ে মারা যায়, তবে আদেশকারী যেহেতু তার উপর বলপ্রয়োগ করেনি তাই সে তার মৃত্যুর জন্য দায়ী হবেনা। অনুরূপ কোনো সরকারি কর্মকর্তা ও দায়িত্বশীল ব্যক্তি যদি কাউকে মজুরির ভিত্তিতে কাজে নিয়োগ করে এবং সেই কাজ করার সময় সে মারা যায়, তবে সে দায়ী হবেনা। কেননা সে কোনো অপরাধ বা আইন লঙ্ঘন করেনি। আর কেউ যদি নিজেকে বা তার সন্তানকে সাঁতার শেখার জন্য সাঁতার প্রশিক্ষণের নিকট সোপর্দ করে অতঃপর সে ডুবে মারা যায়, তবে সাঁতার প্রশিক্ষক দায়ী হবেনা।

খাদ্যসামগ্রী গ্রহণে অনুমতি

অধিকাংশ আলেমের মত হলো, অন্য কারো পশুর দুধ মালিকের অনুমতি ব্যতীত দোহন করা অবৈধ। তবে প্রবল ক্ষুধায়, যদি উপায়ান্তর না থাকে এবং মালিক অনুপস্থিত থাকে, তবে দোহন করার অধিকার তার থাকবে। দোহন করে সে দুধ পান করতে পারবে। কিন্তু মালিককে তার মূল্য দিতে বাধ্য থাকবে। অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী ও গাছে ঝুলন্ত ফলও তদ্রূপ। কেননা অনন্যোপায় অবস্থা অন্যের অধিকারকে রহিত করেনা।

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন কখনো অন্যের পশুর দুধ তার অনুমতি ছাড়া দোহন না করে। তোমাদের কেউ কি পছন্দ করবে তার বাড়ি কেউ প্রবেশ করুক এবং তার দ্রব্য ভাণ্ডার ভেঙ্গে তা থেকে তার খাদ্যসামগ্রী নিয়ে যাক? তাদের গবাদি পশুর ওলান তো তাদের খাদ্যভাণ্ডার। কাজেই কেউ যেন

কোনোক্রমেই অন্যের পশুর দুধ তার অনুমতি ছাড়া দোহন না করে।" -মুয়াত্তা ইমাম মালেক।

ইমাম শাফেয়ি বলেন : মূল্য দিতে বাধ্য থাকবেনা। কেননা অনন্যোপায় অবস্থা দায়মুক্ত করে। কেননা এ ব্যাপারে শরিয়তের অনুমতি রয়েছে। একটা জিনিসের অনুমতিও থাকবে আর সে জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়ার বাধ্যবাধকতাও থাকবে তা হতে পারেনা।

কাসামা বা গণশপথ

যখন কোনো জনপদে একটি নিহত লাশ পাওয়া যায় এবং তার হত্যাকারী সনাক্ত করা সম্ভব হয়না, তখন ঐ জনপদবাসীর মধ্য থেকে যে গোষ্ঠীটির মধ্যে হত্যাকারীর থাকার কথা এবং তাদের বাইরে থাকা সম্ভব বলে প্রতীয়মান হয়না, এবং তাদের মধ্যে তার হত্যার সাথে জড়িত থাকার কিছু আলামতও পাওয়া যায়, যেমন নিহত ব্যক্তিকে তার শত্রুগোষ্ঠী বেষ্টিত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং তাদের সাথে অন্য কেউ মিশ্রিত থাকেনা, অথবা কোনো ঘরে বা প্রান্তরে একদল লোক বিদ্যমান, কিন্তু তারা নিহত ব্যক্তি থেকে দূরে থাকে, অথবা লাশটি একপ্রান্তে পাওয়া যায় এবং পাশেই এক ব্যক্তিকে তার রক্তে রঞ্জিত দেখা যায়, সেই সন্দেহভাজন জনগোষ্ঠীটির কাসামা বা গণশপথ অনুষ্ঠিত হবে। নিহত ব্যক্তি যদি কোনো শহরে কিংবা তার কোনো সড়কে বা শহরের উপকণ্ঠে থাকে, তবে ঐ শহরের অধিবাসীদের কাসামা অনুষ্ঠিত হবে। আর যদি তার লাশ দুটি শহরের বা জনপদের মাঝখানে পাওয়া যায়, তবে যে জনপদটি লাশের নিকটতর তার অধিবাসীদের কাসামা অনুষ্ঠিত হবে।

কাসামার নিয়ম হলো, নিহতের উত্তরাধিকারী উক্ত শহর বা জনপদ থেকে পঞ্চাশজন লোক বাছাই করে তাদেরকে এই মর্মে শপথ করাবে যে, "আল্লাহর শপথ, আমরা তাকে হত্যা করিনি এবং কে হত্যা করেছে তাও জানিনা।" যদি তারা শপথ করে, তবে দিয়াতের দায়িত্ব তাদের উপর থেকে রহিত হবে। আর যদি শপথ করতে অস্বীকার করে, তবে গোটা শহরবাসীর উপর দিয়াত ওয়াজিব হবে। আর যদি বিষয়টা রহস্যপূর্ণ ও অমীমাংসিতই থেকে যায়, তবে তার দিয়াত সরকারি কোষাগার থেকে দেয়া হবে।

কাসামা আরবীয় প্রথা, যা ইসলাম বহাল রেখেছে

কাসামা আরবে জাহেলি যুগে প্রচলিত একটি প্রথা। ইসলাম এটি যথাযথভাবে বহাল রেখেছে। ইসলাম যে এটি বহাল রেখেছে, তার যৌক্তিকতা এই যে, এটা মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বিধানে সচেতনতার একটি নিদর্শন। যাতে একটি মানুষের হত্যাও বিনা বিচারে বা বিনা শাস্তিতে না যায়।

বুখারি ও নাসায়ী ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন : জাহেলি যুগে প্রথম কাসামার ঘটনাটি ছিলো এ রকম : বনু হাশেমের এক ব্যক্তিকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অপর একটি কুরাইশি গোত্রের এক ব্যক্তি মজুর নিয়োগ করে। অতঃপর সে ঐ ব্যক্তির উট পালের সাথে তার সঙ্গে রওনা হলো। এ সময়ে বনু হাশেমের অপর এক ব্যক্তি তার কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। লোকটির পশমের গাইটের হাতল খুলে গিয়েছিল। সে বললো : আমাকে এক গাছা রশি দিয়ে সাহায্য করো, আমি আমার পশমের গাইটের হাতল বাঁধবো। একটা রশির কমতি

থাকলে তোমার উটের পাল পালাতে পারবেনা। পরে যখন যাত্রা বিরতি করা হলো, তখন দেখা গেলো, সকল উট রশি দিয়ে বাধা আছে। কিন্তু একটা উট বাঁধা নেই। তার নিয়োগকারী তাকে বললো : এই উটটার কী হয়েছে যে, অন্যান্য উটের মতো তাকে বাঁধা হয়নি? সে বললো : ওর রশি নেই। মনিব বললো : তার রশি কোথায়? ... অতঃপর সে তাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করলো। ঐ আঘাতেই তার মৃত্যু আসন্ন হয়ে উঠলো। এ সময় ইয়ামানের এক ব্যক্তি তার কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। সে তাকে বললো : তুমি কি আসন্ন হজ্জের মৌসুমে শরিক হবে? সে বললো : এবার শরিক হবোনা। আবার হতেও পারি। সে বললো : তুমি কি আমার পক্ষ থেকে একটা বার্তা যে কোনো সময়ে পৌছাতে পারবে? সে বললো : হ্যাঁ, পারবো। সে বললো : যখন হজ্জে শরিক হবে, তখন প্রথমে হে কুরাইশ বলে সম্বোধন করবে। যখন কুরাইশ সাড়া দেবে, তখন হে বনু হাশেম বলে সম্বোধন করবে। বনু হাশেম যখন সাড়া দেবে, তখন আবু তালেবকে সন্ধান করো এবং তাকে বলো : একটা রশির জন্য অমুকে আমাকে হত্যা করেছে। এরপর হাশেমী শ্রমিকটি মারা গেলো।

শ্রমিকটির নিয়োগ কর্তা যখন পৌছলো, তখন আবু তালেব তাকে জিজ্ঞাসা করলো : আমাদের গোত্রের অমুক লোকটির খবর কী? সে বললো : তার অসুখ হয়েছিল। আমি তার যথোচিত যত্ন নিয়েছি এবং মারা গেলে তার দাফনের ব্যবস্থা করেছি। আবু তালেব বললেন : তুমি যা করেছ, সে তার উপযুক্ত ছিলো বটে। অতঃপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। তারপর যে ইয়ামানী লোকটিকে শ্রমিকটি তার বার্তা পৌছানোর ওসিয়ত করেছিল, সে হজ্জের মৌসুমে হাজির হলো। সে বললো : ওহে কুরাইশ! তারা বললো : এই তো আমরা কুরাইশ উপস্থিত। তখন সে বললো : ওহে বনু হাশেম। বনু হাশেম বললো : এই তো আমরা বনু হাশেম উপস্থিত। সে বললো : আবু তালেব কোথায়? তারা আবু তালেবকে দেখিয়ে বললো : ইনি আবু তালেব। সে বললো : অমুক আমাকে অনুরোধ করেছে আপনার নিকট এই ফরিয়াদ জানাতে যে, অমুক উট মালিক একটি মাত্র রশির কারণে তাকে হত্যা করেছে। তৎক্ষণাৎ আবু তালেব তার কাছে পৌছে গেলেন এবং তাকে বললেন : আমাদের পক্ষ হতে তিনটে ব্যবস্থার যে কোনো একটা গ্রহণ করো। ইচ্ছা করলে তুমি একশোটা উট দিতে পারো। কারণ তুমি আমাদের লোককে হত্যা করেছো। আর যদি চাও তবে তোমার গোত্র থেকে পঞ্চাশ জনকে শপথ করানো হবে যে, তুমি তাকে হত্যা করোনি। এর কোনোটাই যদি গ্রহণ না করো, তাহলে তৃতীয় ব্যবস্থা হলো, তোমাকে আমরা হত্যা করবো। তখন আবু তালেব সেই গোত্রের নিকট গেলেন। গোত্রটি বললো : আমরা শপথ করবো। এরপর বনু হাশেমের জনৈকা মহিলা আবু তালেবের নিকট এলো। সে উক্ত গোত্রের এক ব্যক্তির স্ত্রী ছিলো এবং সে তার ঔরস থেকে একটি ছেলেও প্রসব করেছিল। সে বললো : হে আবু তালেব, আমি চাই আমার এই ছেলে গোত্রের পঞ্চাশজনের একজনের অভাব পূরণ করুক অর্থাৎ একজনের অংশে দিয়াতের যতটুকু আসে তা প্রদান করুক এবং শপথের জন্য অপেক্ষা করা না হোক। অতঃপর ছেলেটি তাই করলো। এরপর আবু তালেবের নিকট তাদের একজন এলো। সে বললো : হে আবু তালেব, আমি এমন পঞ্চাশ জন লোক চাই, যারা একশো উটের বিনিময়ে শপথ করবে। এতে করে প্রত্যেক ব্যক্তির ভাগে দু'টি করে উট পড়বে। এই যে দুটো উট। আমার পক্ষ

হতে এ দুটো গ্রহণ করুন এবং আমার পক্ষ হতে গ্রহণ করুন। এবং আমার শপথের অপেক্ষা করবেন না। তিনি উট দু'টি গ্রহণ করলেন। অতঃপর আটচল্লিশজন এলো এবং তারা সবাই শপথ করলো। ইবনে আব্বাস রা. বলেন : আল্লাহর কসম, এরপর এক বছরও ঘুরলো না। উক্ত আটচল্লিশজনের সবাই মারা গেলো।

কাসামার ভিত্তিতে বিচার ফায়সালার শরয়ী মর্যাদা

এ বিষয়ে ফকিহদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। অধিকাংশ ফকিহর মতে, কাসামার ভিত্তিতে বিচার ফায়সালা করা ওয়াজিব। অপর এক দল বলেন : এর ভিত্তিতে বিচার ফায়সালা করা জায়েয নয়। যারা ওয়াজিব বলেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন মালেক, শাফেয়ি, আবু হানিফা, আহমদ, সুফিয়ান, দাউদ ও তাদের শিষ্যগণ। আর যারা নাজায়েয বলেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ, আবু কুলাবা, উমর ইবনে আবদুল আযীয ও ইবনে ইলয়া।

যারা এর ভিত্তিতে বিচার ফায়সালাকে ওয়াজিব বলেন, তারা এর প্রমাণ দর্শানোর জন্য নির্ভর করেন হুয়াইসা ও মুহাইসা বর্ণিত হাদিসের উপর। যা সহীহ। আর অপর পক্ষের একে নাজায়েয বলার প্রমাণ হলো, শরিয়তের যেসব মূলনীতির উপর ঐকমত্য রয়েছে, কাসামা তার পরিপন্থি। তন্মধ্যে একটি প্রধান মূলনীতি হলো, কোনো জিনিস সুনির্দিষ্টভাবে না জেনে বা ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব না করে সে সম্বন্ধে শপথ করা জায়েয নয়। এমতাবস্থায় যারা নিহত ব্যক্তিকে দেখেনি, তারা কিভাবে শপথ করে। কখনো তো এমনও হতে পারে যে, নিহত ব্যক্তি এক শহরে, আর শপথকারীরা অন্য শহরে।

এজন্য বুখারি আবু কুলাবা থেকে বর্ণনা করেন একদিন উমর ইবনে আব্দুল আযীয সকল শ্রেণীর মানুষকে তার দরবারে আসার অনুমতি দিলেন। সবাই এলো। তারপর তিনি বললেন : কাসামা সম্পর্কে তোমাদের মত কি? সবাই ক্ষণিকের জন্য চুপ করে রইল এবং বললো : কাসামার ভিত্তিতে কিসাস কার্যকর করা জায়েয। খলিফাগণ এ দ্বারা কিসাস কার্যকর করেছেন।

উমর ইবনে আব্দুল আযীয বললেন : হে আবু কুলাবা, তোমার মত কী? আমি বললাম : হে আমীরুল মুমিনীন, আপনার নিকট আরবের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ ও সেনাপতিগণ রয়েছেন। আচ্ছা, যদি পঞ্চাশজন লোক কারো বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় যে সে দামেস্কে ব্যভিচার করেছে, অথচ তারা তাকে দেখেনি, আপনি কি তাকে রজম করবেন? তিনি বললেন : না। আমি বললাম : পঞ্চাশজন লোক যদি আপনার কাছে এসে সাক্ষ্য দেয় যে, সে হিমসে চুরি করেছে, অথচ তারা তাকে চুরি করতে দেখেনি। আপনি কি তার হাত কাটবেন? তিনি বললেন : না। অগত্যা উমর ইবনে আব্দুল আযীয কাসামা সম্পর্কে ফরমান লিখলেন যে, তারা যদি দু'জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী নিয়ে আসে যে, অমুক তাকে হত্যা করেছে, তাহলে কিসাস নাও, নচেত হলফকারী পঞ্চাশজনের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কিসাস নেয়া হবেনা।

আর এটি একটি মূলনীতি হলো, রক্তপাতের উপর শপথের কোনো কার্যকারিতা নেই। আর একটি মূলনীতি হলো, বাদীর দায়িত্ব সাক্ষ্য হাজির করা, আর আসামী অঙ্গীকার করলে তার কর্তব্য কসম খাওয়া। তারা এই যুক্তিও প্রদর্শন করেন যে, তারা ঐ সকল হাদিসে দেখতে পাননি যে, রসূলুল্লাহ সা. কাসামার আদেশ দিয়েছেন। এটা ছিলো জাহেলি

যুগের একটা রীতি। পরে রসূলুল্লাহ সা. জনগণের সাথে উদার নীতি অবলম্বন করেন, যাতে তাদেরকে দেখিয়ে দিতে পারেন, ইসলামের মূলনীতির উপর কাসামার সংযোজন অপরিহার্য নয়। এজন্য তিনি রক্তপনের দাবিদারদের অর্থাৎ আনসারদেরকে বললেন : তোমরা কি পঞ্চাশ ব্যক্তিকে শপথ করাবে? তারা বললো : কিভাবে শপথ করবো? আমরা তো দেখিনি। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তাহলে ইহুদীরা তোমাদের জন্য শপথ করাক? তারা বললেন : একটা কাফের গোষ্ঠীর শপথ কিভাবে মেনে নেই?

সুতরাং শপথ করা যদি সুন্নত হতো এবং তারা শপথ করতে রাজি না হতো, তাহলে রসূলুল্লাহ সা. তাদেরকে বলতেন, এটা সুন্নত। অতএব, এসব হাদিস যখন কাসামার ভিত্তিতে ফায়সালা করার জন্য অকাট্য প্রমাণ গণ্য হয়না, কেবল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাকে কাসামার প্রমাণ ধরে নেয়া হয়, তখন ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের মাধ্যমে এগুলোকে শরিয়তের প্রতিষ্ঠিত মূলনীতির স্বপক্ষে নেয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত ও অগ্রগণ্য। পক্ষান্তরে যারা কাসামার প্রবক্তা, ইমাম মালেকের নাম তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, তারা মনে করেন, কাসামা স্বয়ং একটা স্বতন্ত্র সুন্নত, যা অন্য সকল সুন্নতের ন্যায় মূলনীতিকে সীমাবদ্ধ ও শর্তযুক্ত করার ক্ষমতা রাখে। তারা এও মনে করেন যে, এর মূল উদ্দেশ্য হলো, মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বিধানমূলক সচেতনতা সৃষ্টি। কারণ হত্যাকাণ্ড যখন বেড়ে যায় এবং হত্যাকারী হত্যাকাণ্ড ঘটানোর জন্য প্রায়শঃ গোপন স্থান ও সময় খোঁজে বিধায় তার সাক্ষীর অভাব প্রকট হয়ে পড়ে, তখনই জীবনের নিরাপত্তার জন্য এই সুন্নত প্রবর্তিত হয়। তবে এ যুক্তিটা প্রধানতঃ চুরি ও ডাকাতির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কেননা চোর ডাকাতদের অপরাধের সাক্ষী পাওয়া কঠিন। এ কারণেই ইমাম মালেক মূলনীতির পরিপন্থি হওয়া সত্ত্বেও ছিনতাইকারীর বিরুদ্ধে যাদের সম্পদ ছিনতাই করা হয়েছে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য বলেছেন। যেহেতু যাদের সম্পদ ছিনতাই হয়েছে, তারা ছিনতাই মামলায় বাদী, তাই মূলনীতি অনুযায়ী তারা সাক্ষী হতে পারেনা। কেননা একই ব্যক্তির বাদী ও সাক্ষী হওয়া অবৈধ। -বিদায়াতুল মুজতাহিদ।

তাযীর

১. তাযীরের সংজ্ঞা

শরিয়তের পরিভাষায় কারো দ্বারা সংঘটিত অপরাধের কারণে তাকে সংশোধন ও সতর্ক করার উদ্দেশ্যে তাকে শাস্তি দেয়া ও অপমান করাকে তাযীর বলা হয়।

শরিয়তে তাযীরের উদ্দেশ্য হলো, যে পাপের কাফফারাও নেই, হদও নির্ধারিত নেই, তার জন্য তাকে শাস্তি দেয়া। অর্থাৎ এটা এমন একটা সংশোধনমূলক শাস্তি, যা একজন শাসক (যিনি ইসলামী নীতিমালা অনুসরণ করেন, তার আইন ও বিধিমালা বাস্তবায়ন করেন ও তার নির্ধারিত শাস্তিসমূহ কার্যকর করেন) কোনো ফৌজদারী অপরাধ (যার শাস্তি সাধারণত মৃত্যুদণ্ড, কারাদণ্ড বা সশ্রম কারাদণ্ড) বা এমন কোনো পাপাচারের জন্য দিয়ে থাকেন, যার জন্য শরিয়ত কোনো শাস্তি নির্ধারণ করেনি, অথবা শাস্তি নির্ধারণ করেছে, কিন্তু ঐ শাস্তি কার্যকর করার শর্তাবলি পূরণ হয়নি, যেমন যৌনাংগ ব্যতীত অন্য কোথাও সহবাস করা, হাত কাটা লাগেনা এমন দ্রব্য চুরি করা, কিসাস নেই এমন ফৌজদারী অপরাধ করা, মহিলার সাথে মহিলার সংগম, ও ব্যভিচার ব্যতীত অন্য কোনো অপরাধের অপবাদ দেয়া। উল্লেখ্য, অপরাধ তিন রকমের :

১. যে অপরাধে নির্দিষ্ট দণ্ড থাকে, কাফফারা নেই, যেমন ইতিপূর্বে আলোচিত দণ্ডসমূহ।

২. যে অপরাধে কাফফারা থাকে, দণ্ড নেই; যেমন রমযানের দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস এবং এহরাম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস।

৩. যে অপরাধে কাফফারাও নেই, দণ্ডও নেই, যেমন উপরোল্লিখিত পাপাচারসমূহ। এগুলোতে তাযীর ওয়াজিব।

২. তাযীরের শরয়ী ভিত্তি

এর শরয়ী ভিত্তি হচ্ছে আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী ও বায়হাকি কর্তৃক বর্ণিত হাদিস : রসূলুল্লাহ সা. অপবাদের ঘটনায় (অপবাদদাতাকে) বন্দী করেছিলেন।" এই বন্দী করাটা ছিলো সতর্কতামূলক বা নিরাপত্তামূলক এবং সত্য উদঘাটনই ছিলো এর উদ্দেশ্য। আর বুখারি, মুসলিম ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আল্লাহর নির্ধারিত হদ ব্যতীত অন্য কোনো ব্যাপারে দশটির বেশি বেত্রাঘাত করোনা।"

উমর রা. চুল কামিয়ে, দেশান্তরী করে ও প্রহার করে তাযীর করতেন বলে প্রমাণ রয়েছে। তাছাড়া তিনি মদখোরদের দোকান ও আড্ডা এবং মদ বিক্রির বসতি জ্বালিয়ে দিতেন। কুফায় সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস জনগণের কাছ থেকে দূরে থাকতেন বলে তার প্রাসাদ তিনি জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি একখানা বেত হাতে নিয়ে চলতেন এবং যাকে প্রহারযোগ্য মনে করতেন তাকে প্রহার করতেন। একটা বাড়িকে কারাগার হিসেবে ব্যবহার করতেন। জনৈকা পেশাদার ক্রন্দনকারিণীকে তিনি এত প্রহার করেন যে, তার চুল বের হয়ে গিয়েছিল। -ইগাছাতুল লাহফান-ইবনুল জাওযী।

ইমাম আবু হানিফা, মালেক ও আহমদের মতে, শরিয়তে যেসব অপরাধ তাযীর যোগ্য তাতে তাযীর ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ির মতে ওয়াজিব নয়।

৩. শরিয়তে তাযীর প্রচলনের যৌক্তিকতা এবং তাযীর ও হৃদের পার্থক্য

ইসলাম তাযীরের প্রচলন করেছে পাপীদেরকে ও শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদেরকে শিষ্টাচার শেখানোর উদ্দেশ্যে। কাজেই এর যৌক্তিকতা ও উদ্দেশ্য হুবহু হৃদের উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা। তবে হৃদের সাথে এর তিনটে পার্থক্য।

১. হৃদ সকল মানুষের উপর সমভাবে প্রযোজ্য। তাযীর মানুষের শ্রেণী ও মর্যাদা ভেদে বিভিন্ন মাত্রিক। কোনো সম্মানিত ব্যক্তির পদস্খলন ঘটলে তাকে ক্ষমা করা জায়েয। আর যদি শাস্তি দেয়া হয়, তবে তার চেয়ে নিম্নতর শ্রেণী ও মর্যাদাধারীদের অনুরূপ পদস্খলনে যে শাস্তি দেয়া হয়, তার চেয়ে হালকা শাস্তি দেয়া হবে।

আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী ও বায়হাকি বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "হৃদ ব্যতীত অন্যান্য পদস্খলনে সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে ক্ষমা করে দাও।" অর্থাৎ যখন এমন কারো কোনো পদস্খলন ঘটে যে অসৎ লোক হিসেবে পরিচিত নয়, অথবা ছোটখাটো কোনো পাপ করে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবেই করে কিন্তু সেটি তার প্রথম পাপ, তবে সেজন্য তাকে শাস্তি দিওনা। আর যদি শাস্তি দেয়া অনিবার্য হয়, তবে হালকা শাস্তি দেয়া বাঞ্ছনীয়।

২. হৃদের ক্ষেত্রে মামলা আদালতে যাওয়ার পর কোনো সুপারিশ করা জায়েয নয়। তবে তাযীরে সুপারিশ বৈধ।

৩. তাযীরের কারণে অপরাধী মারা গেলে তার ক্ষতিপূরণ দেয়া বাধ্যতামূলক। উমর ইবনুল খাত্তাব রা. জনৈকা মহিলাকে প্রচণ্ডভাবে ভীতি প্রদর্শনের ফলে আতঙ্কে তার পেট চুপসে যায় এবং সে মৃত সন্তান প্রসব করে। এ কারণে তিনি তার দিয়াত বহন করেন। (এরূপ ক্ষেত্রে কারো মতে, বাইতুলমাল কর্তৃক, কারো মতে, দায়ী ব্যক্তির পিতৃসম্পর্কীয় আত্মীয় কর্তৃক দিয়াত দিতে হবে।) আবু হানিফা ও মালেকের মতে, কোনো ক্ষতিপূরণ দেয়া লাগবেনা। কেননা এ ক্ষেত্রে তাযীর ও হৃদ সমান।

৪. তাযীরের পদ্ধতি

তাযীর শুধু কথা দিয়েও কার্যকর করা যায়। যেমন, ধমক, তিরস্কার ও উপদেশ। আবার কাজ দ্বারাও করা যায় পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী। যেমন প্রহার, বন্দী করা, আটক করা, দেশান্তর করা, পদচ্যুত করা।

আবু দাউদ বর্ণনা করেন, জনৈক হিজড়াকে রসূলুল্লাহ সা. এর নিকট আনা হলো। তার দুই হাত ও দুই পা মেহেদী রঞ্জিত। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : এর ব্যাপার কী? লোকেরা বললো : সে মহিলাদের মতো বেশ ধারণ করেছে। রসূলুল্লাহ সা. তৎক্ষণাৎ তাকে বাকি এলাকায় নির্বাসিত করলেন। লোকেরা বললো : হে রসূলুল্লাহ! ওকে হত্যা করে ফেলি? রসূলুল্লাহ সা. বললেন : যারা নামায পড়ে তাদের হত্যা করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। তবে দাড়ি কামিয়ে দিয়ে, ঘরবাড়ি ভেঙে, বাগানের গাছপালা, ক্ষেতের ফসল ইত্যাদি নষ্ট করে তাযীর করা জায়য নেই। অনুরূপ নাক, কান, ঠোঁট, আঙ্গুল ইত্যাদি কেটেও নয়। কেননা কোনো সাহাবি থেকে এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়নি।

৫. দশটার বেশি বেত্রাঘাত করা

ইতিপূর্বে এই মর্মে হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে যে, দশটার বেশি বেত্রাঘাত করা যাবেনা। আহমদ লায়েস, ইসহাক ও একদল শাফেয়ি ফকিহ এই হাদিস অনুসরণ করেন। কিন্তু মালেক, শাফেয়ি, যায়দ বিন আলী প্রমুখ দশটার বেশি বেত্রাঘাত জায়েয বলেছেন, তবে তা যেন কোনোক্রমেই হদের সর্বনিম্ন পরিমাপের পর্যায়ে না পৌঁছে। অন্য একদলের মত হলো, পাপ কাজে তাযীর করতে গিয়ে তার জন্য নির্ধারিত হদের সমান, অরক্ষিত স্থান থেকে চুরির ক্ষেত্রে হাতকাটার সমান, ব্যভিচারের অপবাদের সমার্থক নয় এমন গালির জন্য অপবাদের হদের সমান শাস্তি দেয়া যাবেনা। কেউ কেউ বলেন : তাযীরের পরিমাণ নির্ধারণে শাসক ইজতিহাদ করবেন এবং বৃহত্তর কল্যাণ ও অপবাদের পরিমাণ অনুপাতে শাস্তি নির্ধারণ করবেন।

৬. হত্যার মাধ্যমে তাযীর

কোনো কোনো আলেমের মতে, হত্যার মাধ্যমে তাযীর করা বৈধ, কারো মতে অবৈধ। ইবনে তাইমিয়ার বরাত দিয়ে ইবনে আবেদীন বলেন : "হানাফিদের মূলনীতি অনুযায়ী যেসব অপরাধের শাস্তি হত্যা নয়, যেমন ভোতা ও ভারী অস্ত্র দ্বারা হত্যা ও পুরুষে পুরুষে সমকাম ইত্যাদি যখন বারবার করা হয়, তখন শাসক অপরাধীকে হত্যা করতে অথবা কল্যাণকর মনে করলে নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে বেশি শাস্তি দিতে পারবে।

৭. সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার মাধ্যমে তাযীর

আবু ইউসুফ ও মালেকের মতে, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার মাধ্যমে তাযীর করা জায়েয। মুয়ীনুল হুক্কাম গ্রন্থে বলা হয়েছে : "যারা বলেন, আর্থিক দণ্ড রহিত, তারা ইমামদের মাযহাব অনুযায়ী ভুল বলেন। যুক্তি ও বর্ণনা উভয়ের আলোকেই ভুল। রহিত হওয়ার দাবিদারদের পক্ষে এমন কোনো সুন্নতও নেই, ইজমাও নেই, যা তাদের দাবিকে সঠিক প্রমাণিত করে। তারা শুধু বলতে পারে : আমাদের ইমামদের মতে জায়েয নেই। ইবনুল কাইয়েম বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. ছিনতাইকারীকে তার প্রাপ্য হিসসা থেকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে তাযীর করেছেন এবং যাকাত দিতে অস্বীকারকারীর সম্পদের অর্ধেক বাজেয়াপ্ত করার মাধ্যমে তাযীর করেছেন। আহমদ, আবু দাউদ ও নাসায়ীর বর্ণনা মোতাবেক রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি সওয়াবের আশায় যাকাত দেবে, সে সওয়াব পাবে, আর যে যাকাত দিতে অস্বীকার করবে, আমরা তার যাকাত তো আদায় করবোই, উপরন্তু তার সম্পত্তির অর্ধেক নিয়ে দেবো। এটা আল্লাহর কঠোর ও অনমনীয় সিদ্ধান্ত।

৮. তাযীর শাসকের অধিকার

তাযীর শাসকের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, জনগণের উপর তার সর্বময় কর্তৃত্ব বিদ্যমান। 'সুবুলুস সালাম' গ্রন্থে বলা হয়েছে : "শাসক ব্যতীত আর কারো তাযীরের ক্ষমতা নেই কেবল তিন ব্যক্তি এর ব্যতিক্রম :

১. পিতা : সে তার অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে তাযীর তথা শাস্তি প্রদান করতে পারে, খারাপ কাজ থেকে ফেরাতে কঠোরভাবে ধমক দিতে পারে। শিশুকাল ও বাল্যকালের লালন পালনকালে মায়েরও এ অধিকার রয়েছে। তিনি নামাযের আদেশ দিতে

তাকে প্রহার করতে পারেন। ছেলে প্রাপ্ত বয়ষ্ক হবার পর নির্বোধ হলেও পিতা তাকে তাযীর করতে পারবেনা।

২. মনিব : মানব নিজের হক ও আল্লাহর হক আদায়ের জন্য তার অধীনস্তের উপর তাযীর কার্যকর করতে পারে।

৩. স্বামী : অবাধ্য স্ত্রীকে তাযীর করার অধিকার স্বামীর রয়েছে। এ বিষয়ে কুরআন দ্ব্যর্থহীন আদেশ দিয়েছে। নামায তরক করার কারণে তাকে ভর্ৎসনা করা যথেষ্ট না হলে স্বামী প্রহার করতে পারবে। কেননা এটা অন্যায়কে প্রত্যাখ্যান ও প্রতিহত করার দায়িত্বের আওতাভুক্ত। অন্যায়কে হাত দিয়ে, জিহ্বা দিয়ে ও মন দিয়ে প্রতিহত করার দায়িত্ব যাদের উপর অর্পিত, স্বামী তাদের একজন। শিক্ষার্থী বালক বালিকাকে শাস্তি দেযার অধিকার শিক্ষকের রয়েছে।

৯. তাযীরের ক্ষতিপূরণ

পিতা যখন তার সন্তানকে শাস্তি দেয় তখন তাকে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হয়না। স্বামীও যখন স্ত্রীকে শাস্তি দেয় তখন তাকে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হয়না। অনুরূপ, শাসক যখন প্রজাকে শাস্তি দেয়, সীমা অতিক্রম না করে এবং যতটুকু শাস্তি দিলে উদ্দেশ্য সফল হয়, তার চেয়ে বেশি না দেয়, তখন তাকেও ক্ষতিপূরণ দিতে হবেনা। এদের কেউ যদি সীমা অতিক্রম বা বাড়াবাড়ি করে, তবে বাড়াবাড়ির কারণে যতটুকু ক্ষতি হয়, তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

সাইয়্যেদ সাবেক

ফিক্‌হুস সুন্নাহ

২য় খণ্ড

সাইয়্যেদ সাবেক